বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
কলিকাতা, ১২

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৮১

—প্রকাশক ও মুদ্রাকর—

শ্রীশশিভূষণ দত্ত

'বসুমতী' প্রেস, কলিকাতা

—নাট্যকার—

রসরাজ অমৃতলাল বসু

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

সাধন-সমৃদ্ধ

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ।

ভূমিকা

হলহেডের ইংরেজীতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছাপা হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ব্যাকরণের বাংলা উদাহরণগুলি ছাপা হয়েছিল উইলকিনস নির্মিত বাংলা বিচল হরফে। সেই থেকে বাংলা মুদ্রণ শুরু।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার দু'শ বছর পূর্ণ হল ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী বরাবরই বাংলা মুদ্রণের উন্নয়নে উৎসাহী। সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন মুদ্রণের দ্বি-শত-বার্ষিকী যথাযোগ্য কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে জুলাই, ১৯৭৮, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান করে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়। পর্ষদ দ্বি-শতবর্ষ-পূর্তি উৎসবের জন্য তিনটি প্রধান কার্যক্রম নির্দ্ধারিত করেন:

১ দুই শতকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বাংলা বই ও পত্রিকার একটি প্রদর্শনী। এই সঙ্গে থাকবে ক্রয়লভ্য সাম্প্রতিক বাংলা বইয়ের দোকান। তাছাড়া দর্শকরা যাতে মুদ্রণের কলাকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হবে। প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে একটি সচিত্র স্মারকগ্রন্থ।

বিড়লা তারামণ্ডলের উল্টো দিকের মাঠে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯; চলেছিল ২১শে পর্যন্ত। প্রদর্শনী ছিল সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। স্মারকগ্রন্থটিও বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে।

২ যে বইটি দিয়ে বাংলা মুদ্রণের সূত্রপাত, হলহেডের সেই ব্যাকরণ এখন দুষ্প্রাপ্য। বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই অমূল্য নিদর্শনটি যাতে সহজলভ্য হতে পারে সে জন্য উপদেষ্টা পর্ষদ হলহেডের বাংলা ব্যাকরণের অবিকল প্রতিরূপ প্রকাশের প্রস্তাব দেন। সেই অনুসারে ব্যাকরণটির ফ্যাকসিমিল সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯শে জুলাই, ১৯৮০। একটি তথ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ ভূমিকা সহ বইটি সম্পাদনা করেছেন শ্রীনিখিল সরকার।

৩ তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রস্তাব ছিল বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশ। এই প্রস্তাব বর্তমান গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে।

সংকলনের একচল্লিশটি প্রবন্ধ তিনটি ভাগে বিন্যস্ত: মুদ্রণ, প্রকাশন ও নানা প্রসঙ্গ। নানা প্রসঙ্গের প্রথম দু'টি নিবন্ধ মুদ্রণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় এ দু'টি রচনাকে যথাস্থানে দেওয়া যায়নি।

পরিশিষ্টে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের জীর্ণ মূল কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে হলহেডের ব্যাকরণের মুদ্রণ সম্পর্কিত আলোচনা এবং একটি সরকারী ছাপাখানা স্থাপনের প্রস্তাব। স্টেট আর্কাইভসের সৌজন্যে এই প্রায় অনালোচিত মূল দলিলটি ছাপানো সম্ভব হল।

একটি নির্বাচিত পাঠপঞ্জী এবং নির্বাচিত নির্ঘণ্টও সংযোজন করা হয়েছে। প্রবন্ধ-সংকলনে নির্ঘণ্ট দেওয়া জরুরী নয়। তথাপি পাঠকদের সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় নাম ও প্রসঙ্গগুলির নির্ঘণ্ট দেওয়া হল।

আমাদের সংস্কৃতির এক বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যমূলক সমীক্ষার প্রয়াস এই প্রবন্ধ-সংকলন। প্রত্যেকটি পৃথক প্রবন্ধ এই সমীক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়েছে এবং পূর্ণ করেছে। সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মুদ্রণ ও প্রকাশনশিল্পে যে বিবর্তন ঘটেছে তারই রূপ-রেখা বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনকে বিবর্তনের পথে এগিয়ে নিয়েছেন এখানে আলোচিত হয়েছে তাঁদের কথা: বোলট্‌স, উইলকিন্স, হলহেড, কেরী, পঞ্চানন, গঙ্গাকিশোর, বিদ্যাসাগর, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, শ্রীরামপুর মিশন, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, প্রভৃতি। তাছাড়া আছে নানা প্রসঙ্গের আলোচনা: বইয়ের ব্যবসা, গ্রন্থচিত্রণ, বাংলা হরফের রূপান্তর, সরকারী নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাযন্ত্র, প্রতিষ্ঠিত বাঙালী প্রকাশকদের কথা, একালের মুদ্রাকর, প্রকাশক ও হরফ নির্মাতার সমস্যা, ভাবীকালের মুদ্রণ, ফটোটাইপসেটিং ইত্যাদি। মুদ্রণোত্তর যুগে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটায় আমাদের পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, কোষগ্রন্থ, পত্রপত্রিকা কোন ধারা অনুসরণ করে চলেছে বিভিন্ন লেখক তার পরিচয় দিয়েছেন। মুদ্রণ সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করেছে আমাদের কবিতাকে, একেবারে জন্মান্তর ঘটেছে বলা যায়। একটা জাতির মুদ্রণ ও সংস্কৃতির ইতিহাস যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এই উপলব্ধি জাগ্রত হলে সংকলনটির প্রকাশ সার্থক হবে।

উইলকিনসের পূর্বেও বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে সলতে পাকানোর পালা ছিল। সে পালার নায়ক দুঃসাহসী অভিযাত্রী উইলিয়াম বোলট্‌স। উইলকিনসের অন্ততঃ পাঁচ বছর পূর্বেই তিনি বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের সুন্দর বিচল হরফ তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর হরফের প্রতিলিপি আদৌ প্রচারিত না হওয়ায় দেশের এবং বিদেশের লেখকরা বোলট্‌সের ব্যর্থতার কথাই বলেছেন। যে বহু-নিন্দিত বিদেশী বাংলা মুদ্রণের সূচনাকর্তা তাঁকে এই সংকলনে কিছুটা স্বীকৃতি দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বইয়ের চিত্র ও অলংকরণের নিদর্শনগুলি অবহেলায় একে একে লুপ্ত হতে চলেছে। প্রায় পৌনে দু'শ নির্বাচিত নিদর্শন বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের আয়ু অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বাড়ল। গ্রন্থের শিরোনামগুলি উইলকিনসের হরফের ছাঁদে ব্লক করে ছাপা। নামপত্রটি ছাপা হয়েছে আধুনিকতম ফটোটাইপসেটিং মুদ্রণ রীতিতে।

সম্পাদনার কাজে বহু গুণীজনের সাহায্য পেয়েছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় লেখকদের কথা যাঁরা লেখা দিয়ে সহায়তা করেছেন। বিনয় ঘোষ বইটি দেখে যেতে পারলেন না, এজন্য গভীর বেদনা বোধ করছি। ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা বোলট্‌স নির্মিত হরফের প্রতিলিপিটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ডঃ অতুল সুর, অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়, শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীনিখিল সরকার, শ্রীপবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীজগমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজয় সেনগুপ্ত, শ্রীসুনীল দাস, শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। প্রচ্ছদ, পুস্তানি, পাঠ্যাংশের ছবি ও অলংকরণের দায়িত্ব সানন্দে বহন করেছেন শ্রীবিপুল গুহ ও তাঁর সহকর্মী শ্রীনির্মলেন্দু মণ্ডল। আনন্দবাজার পত্রিকার ফোটো ও ব্লক ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। আনন্দ পাবলিশার্সের শ্রীবাদল বসু এবং তাঁর প্রেসের সহকর্মীরা হাসিমুখে আমাদের অনেক অত্যাচার সয়েছেন। বই ছাপার কাজ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ডঃ চিত্রা দেব আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর সাগ্রহ সহযোগিতা না পেলে বইয়ের প্রকাশ আরও বিলম্বিত হত। আমি প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।

সবশেষে বলা উচিত প্রকাশক বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে কোনো কার্পণ্য করেননি। ত্রুটি-বিচ্যুতি যা রয়ে গেল তার জন্য দায়ী সম্পাদক।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা
বৈশাখ ১৩৮৮
এপ্রিল ১৯৮১

সূচী

মুদ্রণ

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ছাপাখানা : চীন থেকে চিনসুরা ১৩
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য পুঁথির পরে বই ২১
সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলা মুদ্রণের পশ্চাৎপট ২৯
পবিত্র সরকার হলহেড : জীবনকথা ৩৪
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম হলহেডের বাংলা চর্চা ৪৫
নিশীথরঞ্জন রায় তিন পথিকৃৎ : উইলকিন্স-পঞ্চানন-মনোহর ৫০
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মিশনপ্রেস : শ্রীরামপুর ৫৯
শিশিরকুমার দাশ 'সাহেবদের ঠাকুর' ৬৭
প্রবীর সরকার কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ৮৪
বরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা মুদ্রণের চারযুগ ৮৮
সুবীর রায়চৌধুরী বাংলা হরফের তিনদশা ১০৪
শুভেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায় বর্ণমালা ও বানান সমস্যা ১১৫
প্রসূন দত্ত সরস্বতী মুদ্রণালয় ১২২
শ্রীপান্থ তলোয়ার বনাম কলম : প্রথম শতবর্ষে ১২৯
বিনয় ঘোষ মুদ্রণ ও সংস্কৃতি ১৪১

প্রকাশন

অরবিন্দ পোদ্দার অনুবাদ সাহিত্য : একটি সমীক্ষার খসড়া ১৫৩
নিখিল সরকার আদিযুগের পাঠ্যপুস্তক ১৬৫
অশ্রুকুমার সিকদার মুদ্রণ ও বাংলা কবিতার জন্মান্তর ১৭৭
অজিতকুমার ঘোষ বাংলা নাটকের দুশ বছর ১৯৭
অমলেন্দু বসু বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে ২০৯
নির্মাল্য আচার্য বাংলা গদ্যের দুই শতাব্দী ২২৬
লীলা মজুমদার ছোটদের জন্য বই ২৪০
চিত্রা দেব বাংলা শিশুসাহিত্য ২৫২

সুকুমার সেন বটতলার বই ২৬৯
দেবীপদ ভট্টাচার্য বাংলা সাময়িকপত্র ২৮৩
অমলেন্দু ঘোষ অভিধান ও কোষগ্রন্থ ৩০১
কমল সরকার বাংলা বইয়ের ছবি ৩১৩
রঘুনাথ গোস্বামী দুই শতকের গ্রন্থচিত্রণ ৩৩২
গোপালচন্দ্র রায় বাংলা বইয়ের ব্যবসা ৩৫১

নানা প্রসঙ্গ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বোলট্সের বিচল হরফ ৩৬৭
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা মুদ্রণে নবযুগ ও আনন্দবাজার ৩৭৬
দীপঙ্কর সেন ভাবীকালের মুদ্রণ ৩৮৪
নীলমণি সেনগুপ্ত ছবি ছাপার কলাকৌশল ৩৯২
অতুল সুর কাগজ ও কালি ৪০০
সুধীর মুখোপাধ্যায় মুদ্রণের সমস্যা ৪০৮
শ্রীশকুমার কুণ্ড প্রকাশকের কথা ৪১৪
শঙ্কর রুদ্র হরফ নির্মাণ ও বিপণন ৪১৯
তারাপদ মুখোপাধ্যায় লণ্ডনে বাংলা বই ৪২৩
শিবদাস চৌধুরী পুরনো বইয়ের সংগ্রহ ৪৩২
—স বাংলা বইয়ের খবর ৪৪১
Appendix ৪৫১
প্রদীপ চৌধুরী নির্বাচিত পাঠপঞ্জী ৪৬৪
নির্ঘণ্ট ৪৮৩

চিত্র

আর্টপ্লেট

উইলকিনস মুখপাত
হলহেড ৪৪ পৃষ্ঠার পর
রবীন্দ্রনাথ ১৮০ পৃষ্ঠার পর
বাংলা লাইনোর উদ্বোধন ৩৮০ পৃষ্ঠার পর
ওয়েব অফসেট ৩৮০ পৃষ্ঠার পর
প্রসেসার সমেত ফটোটাইপসেটিং মেশিন ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর

সাদা-কালো

গুটেনবার্গ ১৪
'দ্যুতরিনা খ্রীষ্টার' একটি পৃষ্ঠা ১৬
আরবী লিপিতে বাংলা পুথি ২২
সিলেটী নাগরী লিপিতে বাংলা পুথি ২৩
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র একটি পৃষ্ঠা ২৬
ওয়ারেন হেস্টিংস ৩০
এলিজাবেথ লিনলি ৩৬
হলহেডের ব্যাকরণের আখ্যাপত্র ৪৬
'কোড অব জেণ্টু লজে' বাংলা হরফের নমুনা ৪৯
বাংলা ব্যাকরণের একটি পৃষ্ঠা ৫৪
কেরী ও মার্শম্যান ৬১
'আইন' বইয়ের হরফের নমুনা ৬৪
পুরনো বাংলা হরফের নমুনা ৭৬-৮০
কৃষ্ণচন্দ্রের খোদাই করা ছবি ৮৫
'ইঙ্গরাজি বাঙ্গালি বোকেবিলরির' একটি পৃষ্ঠা ৯২
১৮০১-এ ছাপা বাইবেলের একটি পৃষ্ঠা ৯৪
প্রথম লাইনো ছাপার নমুনা ১০৩
পুরনো বাংলা হরফের নমুনা ১০৫-১০৮
যোগেশচন্দ্র রায়ের নবলিপি ১১১
মেটকাফ ও বাকিংহাম ১৩৮
'বসন্তকে'র ব্যঙ্গচিত্র ১৩৯
হিকির গেজেটের শিরোনাম ১৪৫
পিয়ার্সে'র বাংলা হরফের নমুনা ১৫০
'বিদ্যাহারাবলী'র নামপত্র ১৫৫
'আরবীয়োপাখ্যান': নামপত্র ১৫৭
স্কুল বুক সোসাইটির মোহর ১৬৭
অবনীন্দ্রনাথের 'চিত্রাক্ষর' থেকে ১৬৮
হিন্দু কলেজের সীল ১৬৯
'শিশুশিক্ষা'র একটি পৃষ্ঠা ১৭৩
'বর্ণপরিচয়ের' নামপত্র ও একটি পৃষ্ঠা ১৭৪
মাইকেল মধুসূদন ১৭৯
বিহারীলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৬
নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাস ১৮৯
রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু ২০৩
গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল ২০৫
বঙ্কিম ও প্যারীচাঁদ ২১২
শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ ২১৪
তারাশঙ্কর ও মাণিক ২১৫
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ২২৯
কালীপ্রসন্ন ও অক্ষয়কুমার ২৩০
কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ২৩৭

প্রমথ চৌধুরী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৩৮
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২৪১
সুকুমার রায় ২৪৩
'আবোলতাবোলে'র নামপত্র ২৪৫
স্বর্ণকুমারী ও অবনীন্দ্রনাথ ২৫৫
যোগীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জন ২৫৭
হেমেন্দ্রকুমার রায় ও সুনির্মল বসু ২৬১
'বালক'পত্রের প্রচ্ছদ ২৬৭
'ঋতুসংহারে'র একটি পৃষ্ঠা ২৭০
'কামিনীর লক্ষাহিরা বেস' ২৭২
জন্মাষ্টমী ২৭৩
সখীপরিবৃত রাধাকৃষ্ণ ২৭৬
'গীতাবলী'র একটি পৃষ্ঠা ২৭৯
ভাইফোঁটা ২৭৯
ঘোড়া ঘেতুর ও হানিফা ২৮০
'সমাচার দর্পণ' ২৮৪
'সমাচারচন্দ্রিকা' ও 'সংবাদপ্রভাকর': শিরোনাম ২৮৫
'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা': শিরোনাম ২৮৬
'বিবিধার্থ-সংগ্রহ': নামপত্র ২৮৮
'সোমপ্রকাশ': শিরোনাম ২৮৯
হিন্দুমেয়ের পর্দা ফাঁক: ব্যঙ্গচিত্র ২৯১
অশ্লীলতা নিবারণী সভার কালী ২৯২
কেরীর বাংলা অভিধানের নামপত্র ৩০৩
রামকমল সেন ৩০৫
'বিশ্বকোষে'র নামপত্র ৩০৯
'সন্দেশাবলি'র একটি প্রসঙ্গের প্রতিলিপি ৩১২
সুন্দরের বর্ধমান প্রাসাদে প্রবেশ ৩১৪
'গৌরীবিলাসে'র একটি ছবি ৩১৫
'বত্রিশ সিংহাসনে'র একটি ছবি ৩১৬
'পক্ষীর বিবরণ': নামপত্র ৩১৭
রেলগাড়ী ৩১৮
শ্রীশ্রীশিব পূজা ৩১৯
সরস্বতী ৩২৪
বিদ্যাসাগর ৩২৫
'ধর্মপুস্তক': নামপত্র ৩৩৩
'মহাভারত': নামপত্র ৩৩৪
উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণ ৩৩৬
সরস্বতী: 'দেবীযুদ্ধ' থেকে ৩৩৭
চ্যাং ব্যাং ৩৩৮
'টুনটুনির বই' ও 'আবোলতাবোলে'র ছবি ৩৩৮
গাছ ৩৩৯
'হনুমানের স্বপ্নে'র একটি ছবি ৩৪০
সতীশচন্দ্র সিংহের গ্রন্থচিত্রণ ৩৪০
কালো ঘোড়া ৩৪১
শকুন্তলা: অবনীন্দ্রনাথ ৩৪২
'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' ৩৪২
নন্দলাল বসুর তিনটি ছবি ৩৪৩
সময় দে ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ছবি ৩৪৪

'বহুরূপী' ও 'আম আঁটির ভেঁপু'র তিনটি ছবি ৩৪৫
'ফেলুদা অ্যান্ড কোং' ৩৪৬
শকুন্তলা: মাখন দত্তগুপ্ত ৩৪৬
'শকুন্তলা'র দুটি ছবি ৩৪৭
'উজান গঙ্গা' ৩৪৮
শৈল চক্রবর্তী ও সমীর সরকারের দুটি ছবি ৩৪৮
জীববিজ্ঞানের গ্রন্থচিত্র ৩৪৯
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ৩৫৭
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরির বইয়ের বিজ্ঞাপন ৩৫৮-৫৯
চিন্তামণি ঘোষ ৩৬২
বোলটস ও উইলকিন্সের হরফ ৩৭২
বোলটসের চিঠি ৩৭৩
সুরেশচন্দ্র মজুমদার ৩৭৭
প্রথম বাংলা লাইনোটাইপ মেশিন ৩৭৯
প্রথম লাইনোতে ছাপা আনন্দবাজার ৩৮০
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনাম ৩৮২
দৈনিক আনন্দবাজারের প্রথম সংখ্যার শিরোনাম ৩৮২
ব্রিটিশ মিউজিয়াম ৪২৫
ইন্ডিয়া আপিস ৪২৫
ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলা ক্যাটালগ ৪২৭
এসিয়াটিক সোসাইটি ৪৩৩
কেরী লাইব্রেরি ৪৩৪
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার ৪৩৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৪৩৭
ন্যাশনাল লাইব্রেরি ৪৩৮
রেভারেন্ড লং ৪৪২
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ৪৪৩
বাংলা বইয়ের প্রথম ক্যাটালগ ৪৪৪

পাদপূরক

চতুর্দশ শতকের চৈনিক অক্ষর-ডালা ২০
পুথির পাটা-চিত্র ২৮, ৩৩, ৪৪, ২৩৯, ৪৪০
'রেখাক্ষর বর্ণমালা'র 'ঞ' (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১১৪
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ লাইব্রেরির মোহর ১৪৯
বিগত শতকের পাদপূরক চিত্র ১৬৪
পুরনো জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে গ্রহমণ্ডল ১৭৬
অলংকৃত আদ্যাক্ষর ১৯৬, ৪০৭
সমাপ্তিসূচক পাদপূরক ২২৫, ৫০৫
পরীর ছবি: পুরনো লিথো ২৫১
'ক্ষীরের পুতুলে'র একটি ছবি ২৬৮
মাসিক পত্রিকার বিভাগীয় শিরোনাম চিত্র ৩০০, ৪৮২
ইলেকট্রোটাইপে ছাপা একটি ছবি ৩০১
নিউ বেঙ্গল প্রেসের মোহর ৩৫০
বিগত শতকের একটি পুস্পিকা ৩৬৪
তিনটি বই ৩৭৫
'গোলে দেওগান্ধার পুথি'র নামপত্র ৩৮৩
অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপতরীর দেশ': চিত্রাংশ ৩৯১
'বিচিত্রার' রবীন্দ্ররচনার শিরোনাম চিত্র ৪১৩, ৪১৮
মধুসূদনের প্রকাশক আই. সি. বসুর মোহর ৪৩১
হেস্টিংসের স্বাক্ষর ৪৬৩

মুদ্রণ

ছাপাখানাঃ চীন থেকে চিনসুরা

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

আজকাল আমরা ছাপা বলতে যা বুঝি তা হল ধাতুর তৈরি হরফ, ব্লক ইত্যাদি দিয়ে বা আরও নতুন কায়দায় ছাপা লেখা ও ছবি। ইউরোপে ১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি উপরোক্ত ধরনে ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ছাপার মূল কথা কিভাবে ছাপা হচ্ছে তা নয়। মৌলিক অর্থে ছাপা হল একটি লেখা বা একটি ছবির এক বা ততোধিক প্রতিরূপ করা। এইভাবে দেখলে ছাপার ইতিহাস এগার শ বছরের কিছু বেশী পুরনো।

বারুদ, রেশম, চা, পোর্সেলেন ইত্যাদির মতন কাগজ, ছাপা আর কালির আবিষ্কারের বাহাদুরি চীনের। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। ছাপাব পক্ষে কাগজের মতন উপযোগী কোন জিনিস নেই এবং ছাপার সূচনা ও পূর্ণ বিকাশে কাগজের গুরুত্ব অপরিসীম। চীন দেশে ছাপার শুরু হয় কাঠ-খোদাই দিয়ে। একটা চৌকো ধরনের কাঠের ওপর লেখা বা ছবি কুঁদে তাতে কালি মাখিয়ে সম্ভবতঃ রোলার দিয়ে ঘষে কাগজের ওপর ছাপা হত। এইভাবে চীনে এক-রঙা ছবি প্রথম ছাপা হয় তাং রাজত্বকালে (৬১৮-৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কাঠ-খোদাই দিয়ে পৃথিবীর প্রথম বই ছাপা হয় ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি 'হীরকসূত্র' নামে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের চীনা অনুবাদ, মুদ্রাকরের নাম ওয়াং চিয়েহ্। তিনি বইটি ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ষোল ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া আমাদের দেশের জড়ানো পটের মতন চেহারার এই বইয়ে দু ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া ছটি পাতা আছে। এছাড়া বইটির সামনের পাতায় রয়েছে একটি চমৎকার কাঠ-খোদাই ছবি। হাতে ঘষে ছাপা বলে এই বইয়ে কয়েক শতাব্দী পরের ইউরোপীয় কাঠ-খোদাই বইয়ের মতন কাগজের এক পিঠে ছাপা হয়। ১৯০৭ সালে চীন দেশের অন্তর্গত তুর্কিস্থানের তুং হুয়াং গুহায় বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক অরেল স্টাইন আরও অনেক পুঁথির সঙ্গে এই বইটি খুঁজে পান। এটি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে।

এইভাবে ছাপা কষ্টকর ও সময়-সাপেক্ষ হলেও ক্রমশঃ চীনের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং অজস্র বই, ছবি ইত্যাদি ছাপা হয়। চীন থেকে কাঠ-খোদাই প্রথম জাপানে যায়। জাপানে প্রথম ছাপা বইয়ের নাম 'ধরণীসূত্র'। বহুদিন পর্যন্ত অনেকে এটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ছাপা বই বলে মনে করতেন। এখন প্রমাণ হয়েছে এই বই 'হীরকসূত্রের' দু একশ বছর পরে ছাপা।

কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার পর চীনা মুদ্রাকররা ছাপার নতুন প্রণালী নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ১০৪০ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাটির

ছাঁচে তৈরি 'মুভেবল' বা অদল-বদল করা যায় এমন আলাদা আলাদা হরফ দিয়ে ছাপার কায়দা বার করেন পি-সেঙ। এর পরে মাটির হরফের বদলে এই ধরনের কাঠের হরফ দিয়ে কিছু কিছু ছাপা হয়। ছাপার ইতিহাসে এই চেষ্টা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই কৌশলকে তখন কাজে লাগানো যায়নি। তার কারণ লাতিন বর্ণমালার মতন অল্পসংখ্যক অক্ষর ও সাংকেতিক চিহ্নের জায়গায় চীনা ভাষায় হাজার হাজার ইডিওগ্রাম বা ছবির বর্ণমালা ব্যবহৃত হত। বলা বাহুল্য এই ধরনের বর্ণমালাকে আলাদা আলাদা করে কেটে তখন কেন, এখনও কাজে লাগানো সম্ভব নয়। এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বাংলা বর্ণমালার ৫১০টি অক্ষর ও সাংকেতিক চিহ্নকে মোনোটাইপে ২৯২টিতে দাঁড় করিয়েও ছাপার ব্যাপারে খুব সুবিধা হচ্ছে না বলে আরও কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। অজস্র 'অক্ষর' ছাড়া, পলকা হরফ আর উপযুক্ত কালির অভাবের জন্য আলাদা আলাদা করে হরফ সাজিয়ে ছাপানোর অসুবিধা ছিল। কেউ কেউ অবশ্য বলেন ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ব্রোঞ্জের মুভেবল টাইপ চীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

গুটেনবার্গ

জাপানের পর কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা কোরিয়ায় যায় এবং তারপর তিব্বত ও নেপালে পৌঁছয়। যতদূর জানা যায় ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাঠের বদলে ধাতু দিয়ে ছাপার চেষ্টা কোরিয়াতে প্রথম হয়। ১৫শ শতাব্দীতে কোরিয়ার মুদ্রাকররা পুরো পাতা বা ছবি ধাতুর ওপর খোদাই করে ছাপার ব্যবস্থা করেন। ছাপার ইতিহাসে এটা একটা বিরাট ঘটনা এবং একে পুরনো কাঠ-খোদাই আর আধুনিক ধাতুর হরফ ও ব্লক দিয়ে ছাপার মাঝামাঝি স্তর বলা যেতে পারে।

চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত ও নেপাল বাদ দিলে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের আর কোন জায়গায় আধুনিক ছাপাখানা আসার আগে ছাপা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। এইসব দেশে সমানে হাতে লেখা পুথি চলে আসছে। মহেঞ্জোদারোর সীলের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দেশে কাপড়ের ওপর ছাপা অনেক দিনের ব্যাপার। মঙ্গলকাব্যে গুজরাটি ছিটের কথা শোনা যায়। চিনৎজ (অর্থাৎ ছাপা ক্যালিকো, গুজরাটি ছিট শব্দের ইংরেজী অপভ্রংশ) কথাটা ইংরেজী অভিধানে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঢোকে। নামাবলীর বয়স আমাদের জানা নেই। এটা সত্য কাগজ আমাদের দেশে আসার আগে ভোজপাতা, তালপাতা বা গাছের ছালের ওপর কাঠ-খোদাই দিয়ে ছাপা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কাগজও তো আমাদের দেশে কম দিন আসেনি। সবচেয়ে পুরনো কাগজে জৈন পুথি ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়; তারিখ না দেওয়া পুথির কিছু কিছু আরও পুরনো হওয়া অসম্ভব নয়। মুঘলদের সময় থেকে লেখা ও আঁকার জন্য কাগজের ব্যবহার বাড়ে অথচ আশ্চর্যের কথা কাঠ-খোদাই দিয়ে কাগজে ছাপার কথা এদেশে কেউ ভাবলে না। হাতে ধর্মগ্রন্থ লিখলে পুণ্য হয় এই মনোভাব ছাপার প্রতিবন্ধক ছিল বললে কথাটা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। ইউরোপেও ছাপার আগে সেই মনোভাব ছিল এবং ছাপা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা একেবারে দূর হয়ে যায়নি। পুরো বইয়ের কথা বাদ দিলেও চীন ও ইউরোপে কাঠ-খোদাইয়ে ছাপার একেবারে গোড়ার দিকে যে এক পাতার লেখা বা ছবি ছাপানো হত তা-ও আমাদের দেশে হয়নি। বরঞ্চ অন্য দেশগুলির ছাপার নিয়ম উলটে দিয়ে আমাদের দেশে কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা ধাতুতে ছাপার পরে হয়, কারণ এভাবে ছবি ছাপা ধাতুর 'ব্লক' ব্যবহারের চেয়ে সস্তা ছিল।

ইউরোপে ছাপার শুরু ও প্রসারের কথা বলার আগে চীন থেকে কি করে কাগজ পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ল তা খুব সংক্ষেপে বলা দরকার। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা চীনাদের কাছ-থেকে সমরকন্দ দখল করার পর কিছু চীনা সৈনিককে বন্দী করে নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। এই বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন কাগজ তৈরির কলা-কৌশল জানত। আরবরা তাদের কাছ থেকে বিদ্যাটা শিখে নেয়। আজ অবধি সবচেয়ে পুরনো আরবী কাগজের পুথি যা পাওয়া গেছে তা প্রায় এগার শ বছর আগে লেখা। আরব দেশ থেকে কাগজ প্রথম গ্রীসে যায়। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে আরবের সঙ্গে স্পেনের সবচেয়ে বেশী ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। তাই আরবদের মারফৎ কাগজ তৈরির কায়দা স্পেনে ১২শ শতাব্দীর মাঝা-

যায়। এর কিছু পরে ফ্রান্সে কাগজ তৈরি শুরু হয়। ইতালীতে কাগজ যায় ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ, জার্মানীতে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। এর কিছু পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও ইংলণ্ডে কাগজ তৈরি ও কাগজের ব্যবহার শুরু হয়। এর পর ক্রমশঃ পার্চমেন্ট, ভেলাম ও অন্যান্য ধরনের দামী পালিশ করা চামড়ার বদলে পুথি লেখার জন্য কাগজের ব্যবহার বাড়তে থাকে।

কাগজের ব্যবহার কায়েম হওয়ায় ইউরোপে আধুনিক রীতিতে ছাপার আবিষ্কারের একটা বনিয়াদ হয়। চীনের মতন ইউরোপেও কাঠ-খোদাই দিয়ে ছাপার সূত্রপাত হয় ১৫শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ইউরোপীয় কাঠ-খোদাইয়ের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন হল খেলার তাস। এর পর এল এক পাতার ইস্তাহার আর ছবি। এই ধরনের সবচেয়ে পুরনো তারিখ দেওয়া ছবি ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। এখানে বলা দরকার ইউরোপের প্রথম 'ব্লকবুক' বা কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা বই ধাতুর হরফে ছাপা বইয়ের পরে বেরোয়।

১৪৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ মানুষের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়, কারণ এই সময়ে আধুনিক প্রণালীতে ছাপার জন্ম বলে ধরা হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশে ছাপার উদ্ভাবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গেলে ছোটোখাটো মহাভারত লিখতে হয়। এক কথায় বলতে গেলে মানুষের ইতাহাসে আগুন ও যন্ত্রের ব্যবহার আবিষ্কারের মতন ছাপা আক্ষরিক অর্থে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। আমাদের আজকের পৃথিবীর চেহারার মূলে ছাপার আবিষ্কার রয়েছে বললে খুব অত্যুক্তি হবে না; কারণ সভ্যতার গোড়া থেকে মানুষের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান সব কিছুকে ভঙ্গুর পুথি থেকে উদ্ধার ও সংরক্ষণ করা এবং ছাপা উদ্ভাবনের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতিতে নতুন অগ্রগতির সার্বজনিক প্রচার করা ছাপার মারফৎই সম্ভব হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে চিন্তার আদান-প্রদান, খবরাখবর, শিক্ষা ও আনন্দ বিতরণের জন্য ফিল্ম, রেডিও, টেলিভিশান, ভিডিও টেপ ইত্যাদি যেসব 'মাধ্যম' উদ্ভাবিত হয়েছে তার পেছনেও ছাপা রয়েছে। এখানে বলা দরকার এই সব চোখে-দেখা কানে-শোনা 'মিডিয়ার' ক্রমবর্ধমান প্রসার সত্ত্বেও ছাপার আধিপত্য বেড়েছে বই কমেনি। ছাপার যুগ শেষ হয়ে এল বলে অনেকে যে ধুয়ো তুলেছেন তার কোন ভিত্তি নেই।

পৃথিবীর সমস্ত ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মতন ছাপার আবিষ্কারের পেছনেও অর্থনীতিক ও সামাজিক কারণ ও চাপ ছিল। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ ১৪শ শতাব্দীতে ইউরোপের নবজাগরণের ফলে মানুষের মনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার একটা বিরাট স্পৃহা দেখা দেয়। ব্যবসায় ও শিক্ষা বিস্তারের ফলে ১৪-১৫শ শতাব্দীতে ইউরোপের সব জায়গাতেই বইয়ের চাহিদা অভাবনীয়রূপে বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য হাতে-লেখা পুথি দিয়ে এই চাহিদা মেটানো কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তখন পুথি এত দুর্মূল্য ছিল যে তা কেনা বেশির ভাগ লোকেরই সাধ্যাতীত ছিল। এই অবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রের মতন জিনিসের উদ্ভাবন অপরিহার্য হয়ে পড়ল এবং অবশেষে ১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি তা বাস্তবে পরিণত হল।

ধাতুর তৈরি 'মুভেবল' বা অদল-বদল করা যায় এমন হরফ দিয়ে মুদ্রাযন্ত্রে ছাপানোর গৌরব কার প্রাপ্য এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। কিন্তু একথা আজ প্রায় সর্ববাদিসম্মতভাবে স্বীকৃত যে আধুনিক ছাপার জনক জোহান গুটেনবার্গ। তিনি সত্যিই বলতে পারতেন যে, 'ছাব্বিশটি ধাতুর তৈরি সৈন্য নিয়ে আমি পৃথিবী জয় করেছি'। গুটেনবার্গ ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর মেনজ্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় স্বর্ণকার ছিলেন। ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি মেনজে তাঁর ছাপাখানা খোলেন এবং প্রথম তিন চার বছরে তিনি কিছু ধর্মবিষয়ক ইস্তাহার ইত্যাদি ছাপেন। তারপর ১৪৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর ভুবন-বিখ্যাত গুটেনবার্গ বাইবেল ছাপান যা আধুনিক মুদ্রণশিল্পের সূচক বলে ধরা হয়।

মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা পৃথিবীর এই প্রথম বই নানান যুগের নানান দেশের মুদ্রণ-বিশারদদের মতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছাপা বইগুলির মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর প্রথম ছাপা বই কি করে মুদ্রণশিল্পের উৎকর্ষের চরম নিদর্শন হতে পেরেছিল এ নিয়ে আজও মুদ্রণ-বিশারদদের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত নেই। কেউ কেউ এর পেছনে ঐশী প্রেরণা ছিল বলে মনে করেন, কারণ গুটেনবার্গ তো ধর্মগ্রন্থ ছাপছিলেন। এটা খানিকটা 'শকুন্তলা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মতন ব্যাপার। গুটেনবার্গ বাইবেলের অপরিসীম সৌন্দর্যের একটা কারণ হয়ত এই যে, তিনি নিজে তাঁর আবিষ্কারের আসল তাৎপর্য ধরতে পারেননি। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা হেঁয়ালির মতন শোনাচ্ছে বলে একটু টীকার দরকার। গুটেনবার্গ ভেবেছিলেন যে তিনি যে কল বের করেছেন তা পুথিকে অল্প সময়ে কম খরচায় 'বহুকরণে'র উপায়। তাঁর সামনে অন্য কোন ছাপা বই না থাকায় তিনি তখনকার হাতে-লেখা পুথিকে আদর্শ করে তার অনুকরণে তাঁর বাইবেল ছাপেন। হাতে-লেখা বর্ণাঢ্য এই ধরনের পুথি গুটেনবার্গের সময়ে শিল্প ও সৌন্দর্যের চরম শিখরে উঠেছিল। গুটেনবার্গের বাইবেলে ছাপার অংশটা কেবলমাত্র কালো অক্ষরের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বাকি সব কিছু অর্থাৎ প্রত্যেক

পাতার দু পাশে বাহারি বর্ণোজ্জ্বল ছবি ও নকশা, বড় বড় রঙিন 'ড্রপ লেটার' ইত্যাদি ওস্তাদ শিল্পী ও 'ক্যালিগ্রাফার' বা শ্রেষ্ঠ লিপিকরদের দিয়ে আঁকিয়ে ও লিখিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ছাপা বাইবেল সমকালীন শ্রেষ্ঠ 'ইলুমিনেটেড মিশাল', 'বুক অফ আওয়ারস্' ইত্যাদি অনুপম সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত পুঁথিগুলির মতন দাঁড়ায়। পুঁথির প্রভাব কাটিয়ে ছাপা বই কখন তার স্বকীয় রূপ নেয় তা আমরা একটু পরে দেখব।

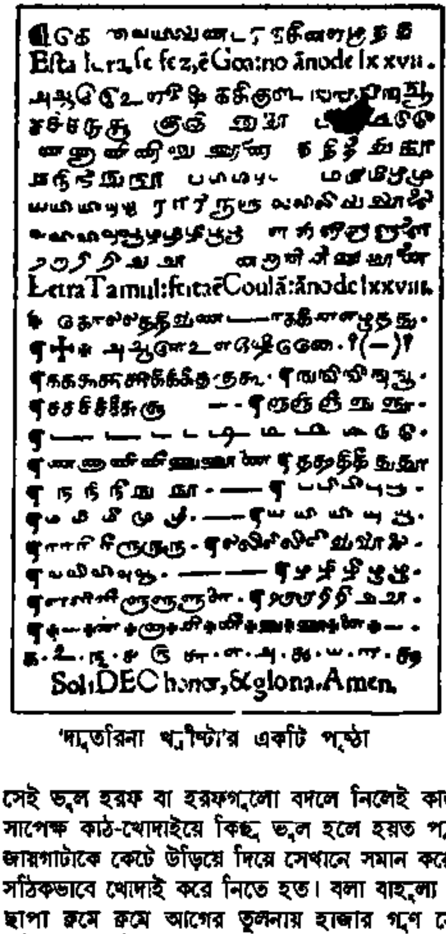
Efta letra fe fez, e Gomno ãnode lxxvii.

Letra Tamul: feita e Coulã ãnode lxxviii.

Soli DEO honor, & gloria. Amen.

'দাতরিনা খ্রীষ্টা'র একটি পৃষ্ঠা

গুটেনবার্গের আবিষ্কৃত ছাপার প্রণালীর মূলে কথা তিনটি, এবং যদিও যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক ইত্যাদি কথার ব্যবহারে আমাদের সবিশেষ আপত্তি আছে তবুও সেগুলি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি। এই তিনটি হল হাতের চাপ বা রোলার ঘষে ছাপার বদলে কলের ব্যবহার, কাঠের হরফের বদলে ধাতুর হরফের ব্যবহার আর সর্বোপরি 'মুভেবল' বা অদল-বদল করা যায় এমন হরফের আবিষ্কার। হাতের বা পেশীর জোরের বদলে কলের ব্যবহারের কত সুবিধা এবং সভ্যতার ইতিহাসে এটা যে কত বড় অগ্রগতি তা এখানে খুলে বলার কোন দরকার নেই। কাঠ-খোদাইয়ের বদলে ধাতুর ব্যবহার একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার। কাঠ-খোদাই কিছু পরিমাণ ছাপার পর ভোঁতা হয়ে যেত কিন্তু ধাতুর হরফ মজবুত হওয়ায় তা দিয়ে লাখ লাখ পাতা ছাপার রাস্তা খুলে গেল। এখানে বলা দরকার যে ধাতুর হরফ ও এনগ্রেভিং আবিষ্কারের পরেও অনেক দিন পর্যন্ত অনেক বইয়ে, বিশেষ করে বড় বড় অক্ষর কাঠের হরফে এবং অনেক ছবি কাঠ-খোদাইয়ে ছাপা হত এবং এ্যালব্রেকট্ ডুরার ও হ্যানস্ হলবাইন সর্বকালের কাঠ-খোদাই ও 'এনগ্রেভার'দের মধ্যে অন্যতম। অদল-বদল করা যায় এমন হরফ ব্যবহারের ফলে হরফ-সাজানোর ব্যাপারে বিপ্লব এলো। আলাদা আলাদা হরফ দিয়ে পাতা সাজানোর সময় কোথাও ভুল হলে সেই ভুল হরফ বা হরফগুলো বদলে নিলেই কাজ হাসিল হওয়া সম্ভব হল। কিন্তু অতি সময়-সাপেক্ষ কাঠ-খোদাইয়ে কিছু ভুল হলে হয়ত পুরো কাঠ-খোদাইটি বরবাদ হয়ে যেত কিংবা সেই জায়গাটাকে কেটে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে সমান করে নতুন কাঠের টুকরো বসিয়ে তাতে ভুল শুধরে সঠিকভাবে খোদাই করে নিতে হত। বলা বাহুল্য এটা মহা ঝকমারির ব্যাপার ছিল। এইসব কারণে ছাপা ক্রমে ক্রমে আগের তুলনায় হাজার গুণ সোজা হয়ে গেল আর ছাপার গতি এবং ছাপার পরিমাণের সীমা হাজার গুণ বেড়ে গেল। ফলে ছাপার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বই একটা বিরাট দুর্মূল্য এবং অসাধারণ জিনিস থেকে সস্তা ও সর্বব্যাপী হয়ে পড়ল।

গুটেনবার্গের বাইবেল বেরোবার পর ছাপা দেখতে দেখতে জার্মানী ও ইউরোপের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মেনজ্ শহরের ফুস্ট ও শ্যফার বলে দুজন মুদ্রাকর তাঁদের সুবিখ্যাত 'সলটার' ধর্মগ্রন্থ ছাপান। এখানে এই বইয়ের উল্লেখ করার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ এই বইয়ে প্রথম রঙিন ছাপার আরম্ভ হয়। এর প্রত্যেক পাতায় কালো ছাড়া আরও তিনটি রঙে ছাপা হয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশের পুঁথির মতন এই বইয়ের শেষে ছাপা বইয়ের মধ্যে প্রথম মুদ্রাকরের নাম, কোথায় ও কখন ছাপা হয়েছিল তার হদিস দেওয়া আছে। এই নির্দেশকে 'কলোফোন' বলা হত যার পরবর্তী রূপ হল 'টাইটেল পেজ' বা আখ্যাপত্র। জার্মানীর বাইরে প্রথমে ছাপাখানা খোলা হয় ইতালীর সুবিয়াকো শহরের বেনেডিকটিন সম্প্রদায়ের একটি মঠে ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই ছাপাখানা সোয়াইনহাইম এবং প্যানারটজ্ বলে দুজন জার্মান মুদ্রাকর বসান ও চালান। ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের বাসল্ শহরে ছাপাখানার পত্তন হয়।

এইখানে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছাপাখানা শুরুর সন তারিখ দেওয়ার আগে দুজন মুদ্রাকরের কথা একটু বলা দরকার। কারণ এঁদের আওতায় ছাপা বই পুঁথির প্রভাবে কাটিয়ে

আধুনিক ছাপা বইয়ের আকার নেয়। এই দুজন হলেন নিকোলাস জেনসন ও আলডুস মানুটিউস। এ'দের কাজ দেখলে বুঝতে পারা যায় যে এ'রা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে ছাপাখানা আর কলম এবং বুরুশ এক জিনিস নয়। তাঁরা বুঝেছিলেন যে ছাপাখানা একটা যন্ত্র, তার একটা নিজস্ব ধর্ম, নিজস্ব কায়দা, নিজস্ব 'এস্‌থেটিকস্' আছে।

নিকোলাস জেনসন জাতে ফরাসী হলেও ইতালীতে তাঁর কর্মজীবন কাটান। ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ভেনিসে তাঁর ছাপাখানায় অনেকগুলি অসাধারণ বই ছাপান। জেনসনের কাটা রোমান হরফগুলির মধ্যে একটি, বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের হরফগুলির মধ্যে এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উৎকর্ষের চরম নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এখানে বলা দরকার, এই শতাব্দীর তিরিশ দশকে বিখ্যাত ইংরেজ 'টাইপোগ্রাফার' স্ট্যানলি মরিসন লণ্ডনের টাইমস কাগজের জন্য যে নতুন হরফ কাটেন তা জেনসনের এই বিশেষ রোমান হরফটিরই হেরফের। এছাড়া জেনসন রোমান অক্ষরের ছোট হাতের হরফেরও প্রবর্তন করেন।

ছাপার ইতিহাসে হরফের বিবর্তন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ শুধু ছুঁয়ে যেতে গেলেও একটা বড় আলাদা প্রবন্ধ লেখা দরকার। এখানে আমরা শুধু বলতে চাই যে, ছাপা-পাতা পড়ার সুবিধা, ছাপার সৌন্দর্য এবং লেখার বিষয়বস্তুর 'মুডের' উপযুক্ত চাক্ষুষ রূপ ফুটিয়ে তোলাটা হরফের উৎকর্ষ, চেহারা ও সঠিক ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। শেষোক্ত উক্তিটির তাৎপর্য বোঝাতে গেলে একটা মোটা উদাহরণ দেওয়া দরকার। 'লিরিক' কবিতার বই মোটা কালো গথিক হরফে ছাপালে সেটা ঠিক মানানসই হয় না, তা ছাপা যতই ভালো হোক না কেন। এই ধরনের কবিতার সুকুমার সৌকর্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানানসই সূক্ষ্ম, সুন্দর হরফ ব্যবহার করা দরকার। গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও বিলাতে বড় বড় 'টাইপোগ্রাফার'রা অজস্র রকমের ভাল ভাল বই ছাপার ও 'ডিসপ্লে' টাইপ তৈরি করেছেন। ফলে পশ্চিমের মুদ্রাকররা বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে উপযুক্ত হরফ ব্যবহারের সুযোগ পান। ভারতীয় ভাষাগুলির হরফে বৈচিত্র্য খুব কম তাই বিষয়োপযোগী হরফ নির্বাচনের সুযোগ একান্তই সীমিত।

আলডুস মানুটিউস তাঁর ভেনিসের ছাপাখানা থেকে অনেকগুলি নতুন জিনিস চালু করেন। মানুটিউসই 'ইটালিক' বা হেলানো হরফের উদ্ভাবক। এই ধরনের হরফ ও তাঁর ছাপা বইয়ে ব্যবহৃত হরফগুলি ফ্রানচেসকো গ্রিফো বলে একজন হরফশিল্পী কাটেন। মানুটিউস-এর আগে ছাপায় কেবল 'ফুলস্টপ' ব্যবহার করা হত। তিনিই প্রথম 'কমা' ও 'সেমিকোলোনে'র ব্যবহার শুরু করেন। তাছাড়া আজকে আমরা যাকে পকেট বুক বলি, তিনিই পৃথিবীতে প্রথম সেই ধরনের ছোট ছোট সস্তা বই প্রকাশ করেন। সর্বোপরি তিনি দুষ্প্রাপ্য গ্রীক ও রোমান অনেকগুলি ক্লাসিকের পুঁথি উদ্ধার করে সেগুলির সঠিক পাঠোদ্ধার, প্রয়োজনমত অনুবাদ ও সম্পাদনা করে সেগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে পাঠকমহলে প্রচার করতে সহায়তা করেন।

১৪৭০ থেকে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছাপা ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে। বিলাতে উইলিয়াম ক্যাকস্‌টন ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপাখানা বসান। ক্যাকস্‌টন খুব উঁচুদরের মুদ্রাকর ছিলেন না কিন্তু তিনি সম্পাদক ও অনুবাদক হিসাবে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

১৫শ শতাব্দীর পর থেকে পরের কয়েক শতাব্দীতে ইউরোপে ছাপার প্রসারের ইতিহাস ও মুদ্রণশিল্পের বিবর্তন এই লেখায় আলোচনার দরকার নেই। তার কারণ ছাপার আদিযুগে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ছাপার যে কাঠামোটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে তার মূলগত বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। যদিও গুটেনবার্গের হাতে চালানো ছোট্ট ছাপার কলের সঙ্গে আধুনিক প্রেসের আকার ও জটিলতার আকাশ-পাতাল তফাত, তবুও ছাপার মূল পদ্ধতিটা প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। এই শতাব্দী অবধি হরফ কাটা, ঢালাই, হরফ সাজানো, ব্লক তৈরির প্রণালী ইত্যাদিকে আদিযুগের এইসব কাজের মার্জিত সংস্করণ বললে খুব ভুল বলা হবে না। সেই রকম ছাপার হরফ ১৫শ শতাব্দীতে পুঁথির প্রভাবমুক্ত হয়ে যে চেহারা নেয় তা-ও আজ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বরঞ্চ এই শতাব্দীতে 'টাইমস্ রোমানে'র মতন আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট হরফ ১৫শ শতাব্দীর পুরনো হরফের ভিত্তিতে কাটা হয়েছে। সব শেষে ১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে ছাপা বই যে আকার নেয়, অর্থাৎ তার ভেতরের ও বাইরের চেহারার কাঠামোটা এখনও বজায় আছে।

তফাত যেখানে হয়েছে সেটা হল বই ছাপা, বই প্রকাশন ও বই বিক্রির শ্রম বিভাগে। ছাপার আদিপর্বে মুদ্রাকররা একাই একশ ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র তৈরিতে সাহায্য করা থেকে হরফ ডিজাইন, পাঞ্চকাটা, হরফ ঢালাই, ছাপা, বাঁধাই সব কিছুই তাঁরা নিজেরা সহকর্মীদের সাহায্য নিয়ে করতেন। তাছাড়া তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বই প্রকাশ করতেন এবং বিক্রির ব্যবস্থা করতেন। মানুটিউস ও ক্যাকস্‌টনের মতন অনেক মুদ্রাকর নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং

তাঁরা ছাপার জন্যে বই বেছে সেগুলির অনুবাদ ও সম্পাদনাও করতেন। শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতন মুদ্রণশিল্পের যত বিস্তার ও উন্নতি হতে লাগল ততই এর নানান বিভাগ দেখাশোনার জন্য নতুন নতুন দক্ষ কর্মীর আবির্ভাব হতে লাগল।

এখানে বলা দরকার ছাপার ইতিহাস বলতে গিয়ে আমরা এতক্ষণ বইয়ের কথাই বলেছি। এর কারণ শুধু শুরুতেই নয় তার অনেক যুগ পর পর্যন্ত ছাপা বলতে প্রধানতঃ বই ছাপাই বোঝাত। যন্ত্রযুগের পর থেকে ছাপা বহুমুখী হয়ে পড়ল। খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, অজস্র রকমের ব্যবসায়িক ও বিজ্ঞাপনী প্রচার-পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি আধুনিক যুগের ব্যাপার।

ইউরোপ থেকে ছাপাখানা ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যায়। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গুটেনবার্গ বাইবেল ছাপার ঠিক একশ বছর পরে এবং পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের বছরে আমাদের দেশে ছাপার আবির্ভাব হয় গোয়ায়। গোয়ায় ছাপাখানা আসার পেছনে একটা ব্যাপার ছিল। ইউরোপ থেকে প্রথম প্রথম বাইরে ছাপাখানা পাঠানোর একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হল সেই ছাপাখানাকে যে দেশে পাঠানো হচ্ছে সেই দেশের ভাষায় ধর্মগ্রন্থ ও পুস্তিকা ছাপিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচারে সহায়তা করা। ১৫২৬-২৭ সাল থেকে আবিসিনিয়ার পর্তুগীজ মিশনারিরা পর্তুগালে তাঁদের কর্তৃপক্ষকে একজন মুদ্রাকর ও একটা ছাপাখানা পাঠানোর জন্য বার বার অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়ার গির্জার নবনিযুক্ত ধর্মযাজক ছাপাখানা নিয়ে রওনা দিলেন। তখনকার দিনে পাল-তোলা জাহাজকে পর্তুগাল থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আবিসিনিয়া যেতে হলে গোয়া হয়ে যেতে হত। জাহাজ গোয়ায় পৌঁছনোর পর নানান কারণে এই ধর্মযাজককে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মারা যাওয়া অবধি গোয়াতেই থেকে যেতে হয় এবং ছাপাখানাটাও শেষ অবধি আবিসিনিয়ায় যায়নি।

অনন্ত কাকবা প্রিয়োলকার তাঁর 'দি প্রিন্টিং প্রেস ইন ইণ্ডিয়া' বইতে যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তা থেকে দেখা যায় ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোয়ায় মোট ৩৪টি বই ছাপা হয়, যদিও তার মধ্যে ১৫৫৬ থেকে ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছাপা প্রথম পাঁচটি বইয়ের এখন আর কোন হদিস পাওয়া যায় না। গোয়ায় অর্থাৎ আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ছাপা বই এবং যা দিয়ে ভারতের ছাপার পত্তন হয় সে বইটির নাম আমাদের এখানে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করা দরকার। সেটি হল 'কনক্লুসোয়েস এ উত্তরাস কয়সাস' বলে একটি পর্তুগীজ ধর্মগ্রন্থ। সবচেয়ে পুরনো যে বই এখনও সংরক্ষিত আছে তা হল গোয়ায় ছাপা ষষ্ঠ বই ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ছাপা। এই বইটির নাম 'কম্পেণ্ডিও স্পিরিচুয়াল ডা ভিডা খৃষ্টা', লেখকের নাম গ্যাসপার ডি লিয়াও। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ ভারতের ছাপার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। এই বছর 'দক্তরিনা খৃষ্টা' বলে একটি বই তামিল হরফে ছাপা হয়। এই সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষার হরফ গনসালভস বলে একজন স্প্যানিশ মুদ্রাকর কেটেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, মূল বইটি পর্তুগীজ ভাষায় ১৫৫৬-৬১ খৃষ্টাব্দে গোয়ায় ছাপা হয়েছিল।

গোয়ার পর ১৬৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ছাপার শুরু হয়। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ভীমজী পারেখ বলে একজন গুজরাটি ভদ্রলোক বিলাত থেকে একটা ছাপাখানা ও একজন মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞকে বোম্বাইয়ে পাঠানোর জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখে অনুরোধ জানান যাতে তিনি কিছু সংস্কৃত বই ছেপে বার করতে পারেন। তিনি আরও জানান এই বাবদে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতি বছর ৫০ পাউণ্ড খরচা দেবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী হন, কারণ এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী তাঁদের বোম্বাইয়ে খৃষ্টধর্মীয় বই ছাপানোরও সুবিধা হবে। কিন্তু যখন হেনরি হিলস নামে একজন মুদ্রাকর ছাপাখানা নিয়ে বোম্বাই এলেন তখন ভীমজীর তাতে কোন কাজ হল না। এর কারণ হিলস হরফ কাটার ব্যাপারটা একদম জানতেন না। ভীমজী আবার সাহেবদের একজন হরফ-কাটিয়েকে বিলাত থেকে পাঠানোর জন্য আর্জি করেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। প্রিয়োলকার মনে করেন হিলস হয়ত ছাপাখানার সঙ্গে কিছু ইংরেজী হরফ এনেছিলেন এবং ইংরেজীতে কিছু ছাপার কাজ করেছিলেন, যদিও আজ অবধি এই ধরনের কাজের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অনুমান করা হয় যে, বোম্বাইয়ে ছাপা প্রথম বইয়ের নাম 'ক্যালেণ্ডার ফর দি ইয়ার অফ আওয়ার লর্ড ১৭৮০' এবং এই বই রুস্তম কারসেটজি বলে একজন পারসী ভদ্রলোক ছাপেন। কিন্তু এই বইয়ের কোন কপি এখন পাওয়া যায় না। এর পর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে 'বোম্বে গেজেট' এবং ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে 'ক্যুরিয়ার' বলে দুটি পত্রিকা ছাপা আরম্ভ হয়। বোম্বাইয়ে ছাপা সবচেয়ে পুরনো বই যা পাওয়া যায় তা হল হেনরি বীচার বলে একজন সাহেবের টিপু সুলতানের রাজ্যে বন্দিজীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী। বোম্বাইয়ে প্রথম দেশীয় ভাষায় প্রেস খোলেন ফারদুনজি মারজবান। তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তাঁর গুজরাটি ছাপাখানা থেকে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ১৮৭১ সম্বতের গুজরাটি পাঁজি বার করেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম

তামিল বই ছাপা হলেও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তামিলে ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। কেন তা হল, তার কারণ কি, জোর করে বলা শক্ত। তবে অনেকে মনে করেন যে, গোয়া ও অন্যান্য জায়গায় পর্তুগীজ পাদ্রিদের মধ্যে অনেকেই কালক্রমে এত অলস ও বিলাসী হয়ে পড়েন যে তাঁরা শুধু যে কষ্ট করে দেশীয় ভাষা শিখে ধর্মপ্রচারের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেন তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেশীয় ভাষা মারফৎ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে তার বিরোধিতা করতে থাকেন। এই, এবং অন্যান্য নানা কারণে এর পর শুধু তামিল ভাষায় নয়, পুরো ছাপার ব্যাপারেই দক্ষিণ ভারতে ভাঁটা পড়ে যায়। তারপর ১৭শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাদ্রাজের কাছে ট্রাংকুএবার শহরে ছাপা চালু করবার চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার পেছনে বারথোলোমিউ-জিয়েগেনবালগ্ বলে একজন তরুণ দিনেমার পাদ্রি ছিলেন। তিনি ও তাঁর একজন সহকর্মী গ্রুনড্লার আবার তামিল ভাষায় ধর্মের বই ছাপার কথা ভাবতে শুরু করেন। তাঁরা ডেনমার্কে তাঁদের কর্তৃপক্ষকে ট্রাংকুএবারের জন্য একটা ছাপাখানা, একজন মুদ্রাকর ও হরফ-কাটিয়েকে পাঠানোর জন্য লেখালেখি করতে লাগলেন। এর বছর দশেক আগে বিলাতে "দি সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীষ্টিয়ান নলেজ" বলে একটা সমিতি স্থাপিত হয়। ডেনমার্ক থেকে জিয়েগেনবালগ্ আর গ্রুনড্লারের চিঠিগুলি এই সমিতিকে পাঠানো হয়। এর ফলে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ড থেকে কিছু পর্তুগীজ বাইবেল, একটি ছাপাখানা ও একজন মুদ্রাকরকে ভারতে পাঠানো হল। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ছাপাখানা আর বই ট্রাংকুএবার পৌঁছয় কিন্তু মুদ্রাকর পথিমধ্যে উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে মারা যান। সৌভাগ্যবশতঃ জিয়েগেনবালগ্রা এ-দেশেই একজন জার্মান মুদ্রাকরকে পেয়ে যান এবং কিছুদিনের মধ্যেই ছাপাখানা চালু হয়ে যায়। প্রথমে পর্তুগীজ ও তামিল ভাষায় ছাপা আরম্ভ হয়। প্রিয়োলকার এই প্রেসে ছাপা সবচেয়ে পুরনো যে বই দেখেছেন তা হল ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দের। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি কাগজের কল বসানো হয়, আর তার কিছু আগে একটি হরফ ঢালাইয়ের কারখানা চালু করা হয়। খাস মাদ্রাজে ছাপা আরম্ভ হওয়ার পেছনে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আয়ার কুট ফরাসীদের কাছ থেকে পণ্ডিচেরি দখল করে সেখান থেকে অন্যান্য নানা জিনিসের সঙ্গে একটা ছাপাখানা ও কিছু হরফ লুঠ করে নিয়ে যান। কিন্তু নিয়ে গেলে কি হবে, কল চালানোর লোকের অভাবে মাদ্রাজে তা অচল হয়ে পড়ে রইল। তখন উপায় না দেখে ফাবরিসিউস নামে একজন তামিল ভাষায় পণ্ডিত সাহেবকে এই কড়ার করে প্রেসটা ব্যবহার করতে দেন যে তাঁদের দরকার পড়লে তাঁরা প্রেস ফেরত নিয়ে নেবেন। ফাবরিসিউস এই ছাপাখানায় একটা প্রার্থনা সঙ্গীতের বই ছাড়া তাঁর সুবিখ্যাত তামিল-ইংরেজী অভিধান ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাপান। ১৯শ শতকের গোড়ায় মাদ্রাজে তেলুগু ও কানাড়ী ভাষায় ছাপা আরম্ভ হয়।

গোয়ায় ছাপাখানা আসার ২২২ বছর পরে অবশেষে বাংলাদেশে ছাপাখানা এল। বাংলাদেশে ছাপাখানা আসার পেছনে অন্যান্য কারণ ছাড়া রাজনীতিক প্রয়োজন ছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সুবে বাংলার শাসনভার পুরোপুরিভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে গেল। অতএব রাজ্য চালানোর জন্যে সাহেবদের বাংলা ভাষা শেখার দরকার হয়ে পড়ল। ওয়ারেন হেস্টিংস ও উইলিয়াম জোনসের অনুপ্রেরণায় সাহেবদের মধ্যে শুধু দেশীয় ভাষা শিক্ষা ছাড়া সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব চর্চার দিকেও ঝোঁক দেখা দিতে লাগল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন উইলিয়াম জোনসের শিষ্য ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড। তিনি হেস্টিংস-এর নির্দেশ অনুসারে রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার এবং অন্যান্য সংস্কৃত পণ্ডিতের সাহায্যে মনুসংহিতা ও অন্যান্য সুপ্রাচীন হিন্দু আইন ও দণ্ডবিধির সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ তৈরি করেন। এই অনুবাদ 'এ কোড অফ জেন্টু লজ' নামে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ছাপা হয়, তার কারণ তখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন ছাপাখানা ছিল না। এর পর সাহেবদের বাংলা শেখার সুবিধার জন্য হলহেড 'এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যানগুয়েজ' লেখেন।

'এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যানগুয়েজ' বইটি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে ছেপে প্রকাশিত হয়। এর মুদ্রাকর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ রাজকর্মচারী চার্লস উইলকিনস। হলহেডের 'গ্রামার' দিয়ে শুধু বাংলাদেশে ছাপার পত্তন হল তাই নয়, এই বই দিয়েই বাংলা ছাপা শুরু হল। বইটি ইংরেজীতে লেখা হলেও এতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে ভূরি ভূরি উদ্ধৃতি আছে। হলহেডের বইয়ের আগে ১৬৭৭ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ আজ অবধি আটটি বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে যাতে বাংলা অক্ষরে কিছু কিছু ছাপা ছিল। কিন্তু সেই সব বইয়ে ব্যবহৃত বাংলা অক্ষরগুলি সবই হাতে লিখে প্লেটে কেটে ছাপা হয়। উইলকিনস প্রথম বাংলা অক্ষর এঁকে, পাঞ্চ কেটে, আলাদা আলাদাভাবে ঢালাই করে বাংলা ছাপার হরফের সাট তৈরি করেন। উইলকিনস এই বিরাট কাজ সাধন করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়। হলহেডের ব্যাকরণের হরফের ভিত্তিতে পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাই মনোহর কর্মকার পরে উইলিয়াম কেরীর শ্রীরামপুরে প্রেসের জন্য বাংলা হরফ

কাটেন, যেগুলির মতন ঝরঝরে সুন্দর বাংলা হরফ আজ অবধি কেউ কাটতে পারেননি একমাত্র বোধহয় মনোহরের ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ছাড়া। চার্লস উইলকিনস ও পঞ্চানন কর্মকার এই দুজনের নাম বাংলা ছাপার ইতিহাসে পথিকৃৎ হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠপঞ্জী

শ্রীপান্থ, যখন ছাপাখানা এলো। কলিকাতা ১৯৭৭

McMurtrie, Douglas C. *The Book,* 3rd ed. New York 1943

Priolkar, Anant Kakba *The Printing Press in India,* Bombay 1958

Steinberg, S.H. *Five Hundred Years of Printing,* London 1974

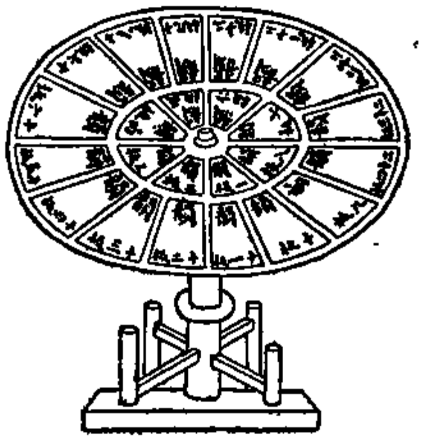

পুথির পরে বই

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

বাংলা পুথি রচনার সূত্রপাত বহু শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল। বৌদ্ধ গান ও দোহাকে হাজার বছরের পুরান বাংলার নিদর্শন বলা হইয়াছে। সন তারিখ সহ গ্রন্থ রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখযুক্ত প্রাচীন বাংলা পুথির বয়ঃক্রম প্রায় পাঁচ শত বৎসর। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ রচনার আরম্ভ ১৩৯৫ শক, অর্থাৎ এখন হইতে ৫০৪ বৎসর পূর্বে এবং সমাপ্তি ১৪০২ শক, অর্থাৎ ৪৯৭ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল:

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন॥

দুঃখের বিষয় কালনির্দেশক এই প্রাচীনতম পুথিটি এখন অপ্রাপ্য।

বাংলা পুথি বঙ্গদেশ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার নানা গ্রন্থাগারে ছড়াইয়া আছে। লিপিকালের উল্লেখযুক্ত প্রাচীনতম পুথি যা এখন পাওয়া যায় তার বয়স ৪৪০-এর বেশি।[১] প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে অনুলিখিত আরও কয়েকটি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রে সন-তারিখযুক্ত শেষ পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দিল্লী মহাফেজখানার রক্ষিত দলিলাদির মধ্যে বঙ্গলিপিতে লিখিত প্রাচীনতম দলিলের লিপিকাল বাংলা ১১২৫ সন।[২]

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের (১৭৭৮ খৃী) সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বই হাতে লেখার জগৎ ত্যাগ করিয়া মুদ্রণের জগতে প্রবেশ করিল। এই নিবন্ধে প্রাক্-মুদ্রণ যুগের পুথি এবং মুদ্রণোত্তর যুগের গ্রন্থের কোন কোন সাদৃশ্যের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করা হইবে।

পুথিতে গ্রন্থের রচনাকাল নানাভাবে দেওয়া হইত। কবিতায়—

পুস্তক লিখন সন। কহি তার বিবরণ
শকাব্দ সহিতে মাঘি গত।
মাঘি পরিমাণ হইহ। সহস্রেক চৌরাশই
শকাব্দা চৌরপম সেলা গত।

অর্থাৎ, মাঘি ১০৯৪, শকাব্দ ১৬৫৪ বা খৃী ১৭০২।[৩]

অতীতের লেখকদের লিপিকাল নির্দেশ করিবার রীতিও ছিল। কিন্তু এই জাতীয় লিপিকাল

নির্দেশের পাঠোদ্ধার সহজ নহে। একই শব্দের একাধিক অর্থ করা যায়। 'নেত্র' অর্থে সাধারণতঃ ২ অঙ্ক বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু স্থলবিশেষে ইহা ৩ অঙ্কও নির্দেশ করে। অনুরূপ ভাবে 'রস' শব্দের দ্বারা ৬ অঙ্ক (ষড় রস) ও ৯ অঙ্ক (নব রস) দুই-ই বুঝাইতে পারে। ফলে আঙ্কিক শব্দ-যোগে নির্দেশিত লিপিকাল দুই রকম হইয়া পড়িতে পারে। আঙ্কিক শব্দযুক্ত লিপিকালের পাঠোদ্ধারে "অঙ্কস্য বামাগতি" সূত্র সাধারণতঃ মানিয়া চলা হয়। যেমন,

সিন্ধু (৭) ইন্দু (১) বেদ (৪) মহী (১) শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান॥[৫]

অর্থাৎ ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খৃঃ।

'অঙ্কস্য বামাগতি' সূত্র মানিয়া চলা হয় নাই এমন দৃষ্টান্তও আছে। যথা—

অতঃপর কহী সুন সন বিবরন।
গোপালের (১২) পাঁচ্টে অম্বর (০) সোজন॥
দক্ষিনেতে গ্রহ (৯) করিয়া সাজন।
সিংহ রাষ্যে (ভাদ্র মাসে) পুথি সাঙ্গ সুন সর্ব্বজন॥
রুদ্রান্তক (১২) রোজ হইল কি বলিব আর।
কুহান্তক (শুক্র পক্ষ) হইয়া প্রতিপদ সার॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত শল্যপর্ব[৬]

অর্থাৎ, ১২০৯ সন ভাদ্র মাসের ১২ তারিখের শুক্র প্রতিপদ তিথিতে এই পুথি নকল করা হইয়াছিল।

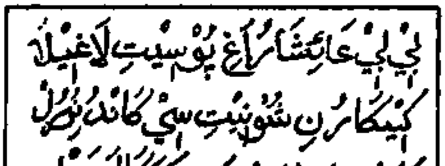

আরবী লিপিতে বাংলা পুথি

বাংলা পুথির লিপিকাল নির্দেশ করিতে গিয়া নকলকারকেরা পঁচিশ রকম অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা: অমলি বা আমলী সন; ইংরাজী সন; খৃষ্টাব্দ (ইংরাজী সনের সমার্থক); চৈতন্যাব্দ; জমিদারী সন; ত্রিপুরাব্দ; দানিশাব্দ; নসরৎশাহী সন; নৃপশক; নেপাল সংবৎ; পরগণাতি সন; বঙ্গাব্দ; বিশ্বসিংহ শক; বিষ্ণুপুরী সন; মঘী সন; মন্দারণ সন; মল্লাব্দ; যবন নৃপতে শকাব্দ (বঙ্গাব্দের নামান্তর); রাজপাঠস্য নৃপতি শকাব্দ; রাজড়া সন; রাজ সন; শকাব্দ; সংবৎ; সদর সন; হিজরী। ইহাদের মধ্যে খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ; শকাব্দ, সংবৎ ও হিজরী সন সুপরিচিত। অন্যান্য অব্দগুলি স্থানীয় রাজা জমিদার অথবা কোন পূজনীয় মহাপুরুষের নামানুসারে প্রচলিত হইয়াছে। অধিকাংশ মুসলমান বিজয়ের পরবর্তী কালের।

সাধারণতঃ বাংলা পুথিতে একটিমাত্র অব্দ উল্লেখ করিয়া লিপিকাল নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কোন কোন পুথিতে দুই তিন এমন কি চারিটি অব্দের উল্লেখ পাশাপাশি করা হইয়াছে। এই সকল উল্লেখ হইতে এক অব্দের সঙ্গে অন্য অব্দের পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে। চারি অব্দের উল্লেখযুক্ত পুথি হইতে একটি দৃষ্টান্তঃ "ইতি সন ১৭৩৯ শকাব্দ, সন ১২২৪ বাঙ্গালা, সন ১৮১৭ ইংরাজী, সন ১১৭৯ মঘী তারিখ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রোজ বৃহস্পতিবার তিথি চতুর্দশী শ্রীরামমোহন দাস পাঠিত।" নিত্য মঙ্গল চণ্ডিকার পাঁচালী।[৭]

প্রথম যুগের মুদ্রিত অনেক গ্রন্থে কাল নির্দেশের অনুরূপ রীতি লক্ষ্য করা যায়। আঙ্কিক শব্দযোগে লিপিকালের নির্দেশ—

বৈশ্বানর (৪) দণ্ডধর (২) নরকর (২) নিশাকর (১)।
শাক বঙ্গী শন কর সঙ্কেতে।

'অঙ্কস্য বামাগতি' সূত্রানুসারে ১২২৪ বঙ্গাব্দ, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ। রামচন্দ্র রচিত 'ইংলিস দর্পণ ব্যাকরণ' প্রকাশের তারিখ।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শব্দসিন্ধু অভিধান' সমাপ্তির কালজ্ঞাপক চরণ দুটি এই:

অত্র (০) মুত্তাব্দ (প্রতি-৪, অব্দ-৭) ভূমি: (১)
পরিগত গগনে শাক ইদুগ দ্বিজাতিঃ
শ্রীযুৎ পীতাম্বরাখ্যোহ বুধগণহিতধীঃ পুস্তকং।

অর্থাৎ ১৭৪০ শকাব্দ বা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছিল।

মুদ্রণোত্তর যুগের প্রথম দিকে প্রকাশিত গ্রন্থে খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, সংবৎ প্রভৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থে প্রধানতঃ একটি অব্দ মুদ্রিত হয়। বাংলা গ্রন্থে অব্দের প্রাচুর্য পুথির ঐতিহ্য হইতেই আসিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্করে' (১১২ সংখ্যা, ১২ বালম) চারটি অব্দের উল্লেখ দেখা যায়: "১৮৫১ সাল ২ জানুয়ারি। দানিশাব্দ ১০০। আব্দুল রাজাব্দ ৮০। বাঙ্গালা ১২৫৭ সাল ১৯ পৌষ বৃহস্পতিবার।"

পুথির লিপিবৈচিত্র্য প্রাক্-মুদ্রণযুগের একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলা পুথি যে বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশের বাহিরে সযত্নে পঠিত হইত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে বিভিন্ন লিপিতে অনুলিখিত বাংলা পুথির উল্লেখ করিতে পারি। বাংলা পুথি অধিকাংশই বঙ্গলিপিতে লিখিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত বঙ্গলিপি ব্যতীত সাতটি বিভিন্ন লিপিতে লিখিত বাংলা পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যথা, আরবী লিপি, ওড়িয়া লিপি, কায়থী লিপি, নাগরী লিপি, নেওয়ারী লিপি, রোমান লিপি ও সিলেটী নাগরী লিপি।

আরবী লিপিতে লিখিত বেশ কিছু বাংলা পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়ের সংগ্রহে পঞ্চাশের অধিক এবং কুমিল্লার মৌলবী আলী আহমদ মহাশয়ের সংগ্রহে দুইখানি আরবী লিপিতে লেখা বাংলা পুথি আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুথি 'নছিয়ত নামা', মোহাম্মদ খান রচিত 'দজ্জাল নামা', এবং সৈয়দ সুলতান রচিত 'ওফাত-ই রসুল' (আ. ক. সাহিত্য বিশারদ সংগ্রহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। আরবী লিপিতে গ্রন্থানুলেখনের কথা কোন কোন লিপিকর উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

বার মাস লেখা হৈল আর লেখিব কি।
পূর্বে ছিল বাঙ্গালা করিলাম আরবী॥[৭]

উড়িষ্যায় ওড়িয়া লিপিতে লিখিত বাংলা পুথি পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের রাজ্য প্রদর্শশালায় এই শ্রেণীর কয়েকটি পুথি আছে। এদের মধ্যে অন্যতম কাশীরাম দাসের মহাভারত (বিরাট পর্ব) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুথিশালায় কায়থী লিপিতে লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের দুইটি পুথি আছে। ইহাদের অবলম্বন করিয়া বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল সম্পাদন করিয়া ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন।

নাগরী লিপিতে লিখিত বেশ কিছু বাংলা পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সিউড়ীর রতন সংগ্রহে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে এবং পাটনা গুলজার বাগের শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরিতে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাস রচিত 'বন পরিক্রমা' (এসিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ) এবং 'কলাবতী সত্যনারায়ণ' (রতন সংগ্রহ)।

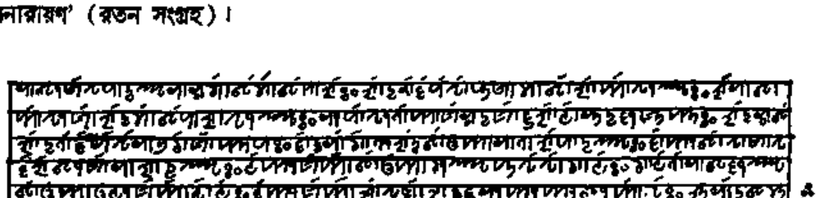

সিলেটী নাগরী লিপিতে বাংলা পুথি

নেওয়ারী লিপির সঙ্গে বঙ্গলিপির সাদৃশ্য আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'নেপালে বাংলা নাটক' গ্রন্থখানি নেওয়ারী লিপিতে লিখিত চারিখানি নাটকের পুথি অবলম্বনে সংকলিত।

রোমান লিপিতে বাংলা পুথির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দোম আন্তোনিও দ্য রোজারিও রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমানকাথলিক সংবাদ'। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে।

সিলেটী নাগরী লিপি শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত। এই লিপিতে লিখিত অনেক পুথি পাওয়া যায়, বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য 'মুজমারাগ হরিবংশ'

পুঁথিটি। এই লিপিতে মুদ্রিত পুস্তকও আছে। সিলেটী নাগরী লিপি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়।

মুদ্রণের যুগে বাংলা রচনা অন্য লিপিতে রূপান্তরিতকরণ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। রোমান-লিপিতে কিছু বই ছাপা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' (১৯১৯) এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৮৯) রোমানলিপিতে ছাপা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থ নাগরী লিপিতে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে 'একোত্তরশতী' অন্যতম।

মুদ্রণপূর্ব যুগের পুঁথির ক্ষেত্রে পদ্যে রচিত পুঁথি প্রায় সর্বত্র এক নাগাড়ে লেখা হইত। ইহাই ছিল সাধারণ রীতি, সুতরাং দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

ছাপা আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ অনুসারে পংক্তি সাজাইবার রীতি প্রবর্তিত হয়। হলহেডের ব্যাকরণেই (১৭৭৮) পদ্যের পংক্তি বিন্যাসের এই পদ্ধতির সূত্রপাত বলা চলে। যেমন,

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভূতি ভূসন অঙ্গ জটাভার কেশ॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া ঠাকুরে।
বিভিন্ন প্রকারে রাজা স্তুতি করে॥ পৃ ৪১

শ্রীরামপুরের প্রেসেও পাশ্চাত্ত্য রীতিতে ছন্দানুসারী পংক্তি সাজাইবার রীতি ১৮০২ খৃষ্টাব্দ হইতেই পাওয়া যায়। ঐ বৎসরে প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের তৃতীয় খণ্ডের ৩৫৩ পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে:

চিরকাল বৈশে পাণ্ডু বনের ভিতর
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত সহচর।
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ অন্বেষণে
পর্বত কন্দর ঘোর মহা সালবনে।

পুঁথির প্রচলিত রীতি অনুসারে লিখিতে হইলে পংক্তি বিন্যাসের রীতি হইবে এইরূপ: "ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ। বিভূতি ভূসন অঙ্গ জটা ভার কেশ॥"

হয়ত এমন দুই একটি পুঁথি ছিল যাহাতে পংক্তি ভাঙ্গিয়া পদ্য লেখা হইয়াছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতির ২৮৪ সংখ্যক পুঁথি সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে: "প্রতি পৃষ্ঠায় চারিদিকে রুল টানিয়া চারি পংক্তিতে এক একটি স্তবক রচনা করিয়া প্রতি পৃষ্ঠায় ৫ স্তবক হিসাবে সযত্নে লিখিত।" পুঁথিটি আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী'।

হলহেড রচিত ব্যাকরণে অথবা শ্রীরামপুর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত মহাভারতে পদ্য বিন্যাসের আধুনিক পদ্ধতি দেখা গেলেও বহু মুদ্রাকর ও প্রকাশক ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত পুঁথির রীতিতেই কবিতা ছাপিয়াছেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল (১৮৫২) প্রভৃতি পুস্তকে কবিতার লাইন একটানা মুদ্রিত হইয়াছে। এখন শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতি ঐ ভাবেই ছাপা হয়।

মুদ্রণপূর্ব যুগের নকলকারকেরা পংক্তিসমূহ নিখুঁতভাবে একই মাপের করিয়া পুঁথি লিখিয়াছেন। ফলে ১, ২, ৩, ৪ অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের এক বা দুই অক্ষর প্রথম পংক্তিতে থাকিয়া অবশিষ্ট এক বা দুই অক্ষর দ্বিতীয় পংক্তিতে, স্থলভেদে পরবর্তী পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। অনুরূপ রীতি মুদ্রণোত্তর যুগেও দেখা যায়। যথা, কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা শিরোমণির 'পুরাণ বোধোদ্দীপনী' (১৮২৭ খৃ) গ্রন্থের ১৪৩ ও ১৪৪ পৃষ্ঠায় 'শ্বেতদ্বীপ' শব্দটি বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পৃষ্ঠা শেষ হইয়াছে 'শ্বেতদ্বী-' পর্যন্ত; পরবর্তী পৃষ্ঠা শুরু হইয়াছে 'পে' দিয়া মুদ্রণের উৎকর্ষ বৃদ্ধির পর এইরূপ শব্দবিভাজন ধীরে ধীরে দূর হইয়া যায়।

বাংলা প্রাচীন পুঁথিতে প্রায় সর্বত্র 'পত্রাঙ্ক' নির্দেশ করা আছে। পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ নাই। পত্রাঙ্ক সাধারণতঃ ১, ২; /. ./.; ক, খ প্রভৃতি নানাভাবে করা আছে। মুদ্রিত গ্রন্থে কোথাও পত্রাঙ্ক নির্দেশ করা হয় নাই। সর্বত্র পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম যুগের গ্রন্থের পৃষ্ঠা নির্দেশে পুঁথির মতই বৈচিত্র্য ছিল।

এখন মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রাকরের নাম, ঠিকানা, মুদ্রণ সমাপ্তির তারিখ ইত্যাদি দেওয়া হয়। পুঁথিতেও অনুলিখনের স্থান, কাল ও লেখকের নাম উল্লেখ করা হইত। কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের একটি পুঁথি (সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা ৬৬২) হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে: "সন ১২৪৪ বার সত্ত চৌতালিষ সাল তারিখ ২৮ কার্ত্তিক শনিবার বেলা এক প্রহরের সময় শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কোঙারের বাহির বাটীর পূর্বদ্বারি ঘরের পীড়ায় উত্তর দিগে পূর্বমুখে বসিয়া লিখিলাম এবং সমাপ্ত করিলাম ইতি।"

মুদ্রিত পুস্তকে বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করা হয়। পুঁথির আমলে নকলকারীর পারিশ্রমিক এবং পুঁথির ক্রয়মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হইত। একটি পুঁথি হইতে জানিতে পারি যে

চারখণ্ডে সম্পূর্ণ রামায়ণের জন্য অনুলেখক সাত টাকা পারিশ্রমিক পান। পুস্তক সাঙ্গ হইলে বস্ত্র, মোয়া ও গামছা পাইবার প্রতিশ্রুতিও ছিল।[৮] পরিষদের আর একটি পুঁথি হইতেও দেখা যায় যে ৫৪৩ পত্রের একখানি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঁচ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। (২৫৭৪ নং পুঁথি)

এদেশে পুঁথি দান ছিল পুণ্যকর্ম। ভক্তবৃন্দের দানেই মঠ-মন্দিরের পুঁথির সংগ্রহ সমৃদ্ধ হইয়াছে। বর্তমান কালেও ব্রাহ্মণদিগকে গীতা দান করিবার রীতি প্রচলিত। এই প্রাচীন রীতি মুদ্রণোত্তর যুগে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। বহু গ্রন্থকার রচিত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। একজন অবাঙালী রচিত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণের কথা বলিব। ইনি রামমোহন রায়ের সমসাময়িক আসামের কৃতী সন্তান হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। ইঁহার কৃতী পুত্র আনন্দরাম ঢেকিয়াল অসমীয়া গদ্যের জনকরূপে স্বীকৃত। হলিরাম ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় 'আসাম বুরঞ্জি' প্রকাশ করেন। গ্রন্থের অনুষ্ঠানপত্রে তিনি বলিয়াছেন: "অপর এই পুস্তক যিনি গ্রহণেচ্ছুক হইবেন তিনি বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদ্যপি এই পুস্তক বিবিধ লোকের উপকারক হয় তবে ইহার তুল্য মূল্য কি হইতে পারে এবং মূল্য গ্রহণ করিলে দরিদ্রের উপকার হয় না অতএব বিনামূল্যে পুস্তক দেওয়া যাইবেক ইতি।..."

হলিরামের পূর্বে এবং পরে বিনামূল্যে বহু পুস্তক বিতরিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'করুণানিধান বিলাস'; 'ক্রিয়াম্বুধি' ও 'শব্দাম্বুধি'; 'পাষণ্ড পীড়ন'; 'শব্দকল্পদ্রুম'; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' (১৭ খণ্ড), প্রভৃতি। রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পদ্রুম' যে শুধু এই দেশে বিতরণ করিয়াছেন তাহা নহে, ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতবর্গ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহেও তিনি এই বিরাট গ্রন্থ বিনামূল্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

মুদ্রণোত্তর যুগের সূত্রপাত হইতেই অনুবাদ গ্রন্থের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মুদ্রণের সঙ্গেই অনুবাদ আসিয়াছে এরূপ ধারণা করিলে কিন্তু ভুল হইবে। পাণ্ডুলিপির যুগেও বহু অনুবাদ হইয়াছে। বলাবাহুল্য সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে সংস্কৃত হইতে। ইহা ব্যতীত আরবী, ফারসী, মঘা (ভাষা), উর্দু প্রভৃতি ভাষা হইতেও অনুবাদ হইয়াছে। একটি আরবী পুঁথির অনুবাদক ভাষান্তরকরণের কারণ হিসাবে বলিয়াছেন:

আরবী জোবান সব লোকে না বুজীব।
বাঙ্গালা জোবানে সবে তত্ত্ব পাইব॥[৯]

আজকাল বইয়ের মলাটে লেখকের পরিচিতি দিবার রীতি হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নতুন নহে। পুঁথির আমলে লেখক নিজেই আত্মপরিচয় দিতেন এবং তাহা পুঁথির সঙ্গেই থাকিত, মলাটের মত মূল গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত না। রতিদেব রচিত 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিতে এই পরিচিতি আছে:

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী।
জন্মস্থান সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥
জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ।
ধরণী লোটাইয়া বন্দম জন্য গুরুজন॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শ্বশুর।
মন্ত্রগুরু দায়শীল মোক্ষদা ঠাকুর॥[১০]

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শব্দসিন্ধু' অভিধানে লেখক-পরিচিতি এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে:

উত্তরপাড়া গ্রামবাসী বিপ্রবংশ জাত।
অকিঞ্চন পীতাম্বর মুখটীতে খ্যাত॥[১]

প্রশ্নোত্তর ধারাতেও লেখক-পরিচিতি দিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ রচিত 'সাধু ভাষার ব্যাকরণসার' (১৮৪০ খ্রী) নামক গ্রন্থে:

শিষ্য। ভাল, এই উত্তম পুস্তক কে প্রস্তুত করিয়াছেন?

শিক্ষক। গোরীতা গ্রাম নিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ নামক একজন পণ্ডিত।

শিষ্য। ভাল, মহাশয়। তিনিই কি সধন নিধন সাধারণ মানবগণ হিতার্থে সাধারণ শিক্ষা সম্পাদক সভান্থ সদাশয় মহাশয় সংস্থাপিত চুঁচুড়া গ্রামে মহম্মদ মহসীনের বিদ্যামন্দিরে নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে একজন?

শিক্ষক। হাঁ বাপু তিনি তথা নিযুক্ত।[১২]

ছাপার ভুল থাকিলে গ্রন্থকার বা প্রকাশক নানা কারণ দেখাইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। ছাপাখানার ভূতকে সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধী করিয়া দাঁড় করানো হয়। পুঁথি এবং মুদ্রণের

আদিপর্বে লেখক নিজে সব ত্রুটির জন্য বিনীতভাবে দোষ স্বীকার করিয়া লইতেন। পুথির লেখক রামকুমার সেন প্রার্থনা জানাইতেছেন:

মুই অধমেরে এবং মূর্খেরে মন্দ নাহি বলিবা।
সুজনের পুত্র তোমরা পণ্ডিত সুজন॥[১৩]

আনন্দ দাস অনুরোধ জানাইতেছেন:

আপনি শুদ্ধ করি করিবে পঠন।
লিখকের অপরাধ করিবে মার্জন॥[১৪]

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাঙলা ইংরাজী অভিধানে' মোহনপ্রসাদ ঠাকুর পাঠকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন:

এই নিবেদন করি পণ্ডিতের কাছে।
শুধিয়া দিবেন শব্দ অশুদ্ধ যা আছে॥[১৫]

মুদ্রিত পুস্তকে দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ নিবেদন প্রকাশিত হইত।

অনেক সময় পুথির রচয়িতা পুথি পাঠের অধিকারী কে তাহা নির্দেশ করিয়া দিতেন। সকলের হাতে পুথি পড়ুক এরূপ অভিপ্রায় লেখকদের ছিল না। নরোত্তম দাস তাঁহার 'নবরাধাতত্ত্ব নিরূপণ' গ্রন্থে উপদেশ দিয়াছেন:

এই গ্রন্থ নিজ শিষ্য বিনে অন্যরে না দিবে।
প্রাণের সমান করি গোপনেতে থোবে॥[১৬]

মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' নির্দেশ দিয়াছেন:

পাষণ্ড নিন্দুক জনে কভু না শুনাইহ।
যোড় হাতে বলি আমি বচন পালিহ॥[১৭]

মুদ্রণোত্তর যুগে যে এইরূপ নির্দেশনামা বাতিল হইয়া গিয়াছে তাহা নহে। এখনও শিশু, নব-সাক্ষর, প্রাপ্তবয়স্ক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের জন্য বিভিন্ন ধরনের বই চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়।

এখন একটি বই কয়েক শত হইতে কয়েক হাজার কপি ছাপা হয়। একটি কপি হারাইলে আর একটি কপি সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু বড় বড় পুথি বড় কষ্ট করিয়া লিখিতে হয়। পুথির কয়টি কপি করাই বা সম্ভব? একটি কপি হারাইলে পুথির মালিকের পক্ষে আর একটি কপি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ছিল। সেই জন্য পুথি অপহরণকারীর প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে দেখা যায়। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রসিক তরঙ্গিণী'তে আছে:

কলিকাতা মধ্যে খ্যাত শ্যাম সরবব।
তথায় নিবাস পঞ্চানন কবিবর॥
দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং চৌরেন নিয়তে যদি।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য গর্দভঃ॥[১৮]

তিরস্কার করিয়া অপহরণকারীকে নিরস্ত করিবার প্রয়াসের আর একটা দৃষ্টান্ত: "এ পুস্তক জে হরে/তাহার চোদ্য পুরুস নরকে পড়ে।"[১৯]

পুথির লিপি ছাপার হরফকে অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত করিয়াছে দেখিতে পাই। পুথির জগতের সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারাই জানেন লিপিকর ভেদে এবং আঞ্চলিক ব্যবধানের ফলে যে লিপিবৈচিত্র্য ঘটে তাহা পাঠোদ্ধারের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। একই অক্ষরের নানা রূপ, বিশেষ করিয়া যুক্তাক্ষরের পাঠোদ্ধার দুরূহ করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একমাত্র 'উ'কার আছে চার শ্রেণীর।

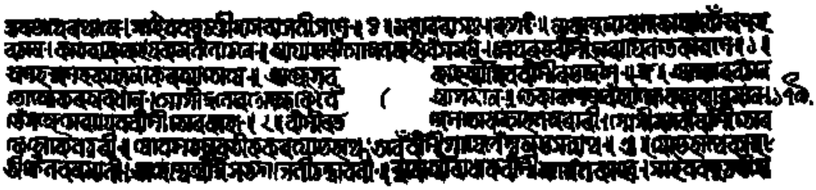

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পৃষ্ঠা

বর্ণের নীচে ‿ চিহ্ন; বর্ণের নীচে '৩'-এর ন্যায় চিহ্ন; বর্ণের নীচে 'ব'-ফলা এবং বর্ণের ডান পাশে বক্র '৩'এর মতো চিহ্ন। পুথিতে 'ব'-এর নীচে বিন্দুযুক্ত এবং পেটকাটা—এই উভয়বিধ 'র'-এর বহুল প্রচলন রহিয়াছে। এমনকি, পুথির একই পংক্তিতে এই দুই রূপেরই

প্রয়োগ দেখা যায়। আর একটি দৃষ্টান্ত 'য' ফলায়। অনেক ক্ষেত্রে 'য' ফলা (্য) বর্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ; অন্যত্র মূল বর্ণ ও 'য'-ফলার মধ্যে ফাঁক দেখা যায়। 'ন', 'শ', 'স' প্রভৃতি বর্ণের সঙ্গে 'য'-ফলা যুক্ত করিবার সময় এই দুইটি ভিন্ন রূপের উদ্ভব হয়।

এইরূপ লিপিবৈচিত্র্যের প্রভাব মুদ্রিত গ্রন্থের উপরেও পড়িয়াছে। হলহেডের ব্যাকরণের বাংলা উদ্ধৃতাংশে 'র' ও 'ৰ' এই উভয় রূপই আছে। আবার পুথির ত্তু (ত্তু) হলহেডের ব্যাকরণেও স্থান পাইয়াছে (পৃ ৪১)। 'য'-ফলা যুক্ত 'ন', 'স' প্রভৃতি বর্ণের দুইটি রূপ এখনও হাতে কম্পোজ করা মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে।

পুথির লিপিবৈচিত্র্য পাঠকের পক্ষে যে অসুবিধার কারণ ছিল মুদ্রণ প্রচলিত হইবার পর সে অসুবিধা প্রায় দূর হইয়াছে, এখন বাংলা লিপি একরূপতা লাভ করিয়াছে, বলা যায়। তথাপি ছাপার হরফে আজও দুই ধারা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। একটি পুথির প্রভাব প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছে, আর একটি ধারায় পুথির লিপিশৈলীর নমুনা দুর্লভ নয়। উইলকিনস, কেরী এবং অন্যান্য বিদেশী মুদ্রাকরদের পক্ষে পাণ্ডুলিপির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া অসুবিধা-জনক ছিল। ভাষা আয়ত্ত করিলেও পুথির বিচিত্র ছাঁদের লিপি আয়ত্ত করা ছিল কঠিন। তাই প্রথম হইতেই তাঁহারা হাতে লেখা অক্ষরকে যথাসম্ভব সরল করিয়া লইবার জন্য প্রয়াসী হইয়া-ছিলেন। কিন্তু দেশীয় মুদ্রাকর ও লেখকরা যে-সব বই প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত হস্তলিখিত পুথির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়, এখনও তাহা সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। ইহার কারণ, বিদেশী মুদ্রাকরদের সম্মুখে বিদেশী পুস্তকের পরিচ্ছন্ন আদর্শ ছিল অনুসরণ করিবার। দেশীয় মুদ্রাকরদের পাণ্ডুলিপির উপর বহুলাংশে নির্ভর করিতে হইত, কারণ মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না। পাদ্রিদের ছাপা বাংলা বই শ্রদ্ধার বস্তু হইতে পারে নাই। সুতরাং হরফের আদল, পুস্তকের আকার, বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে পুথির প্রভাব অনিবার্যরূপেই পড়িয়াছে। হলহেড এবং কেরী পদ্যের বিন্যাস ছন্দানুসারে করিলেও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁহার প্রকাশিত 'অন্নদামঙ্গলে' পংক্তিগুলি পুথির রীতিতে একটানা সাজাইয়াছেন, ছন্দ বিচার করিয়া পংক্তি ভাঙ্গা হয় নাই। হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের প্রায় চল্লিশ বছর পরেও পদ্যের পংক্তি বিন্যাসের আধুনিক পদ্ধতি গঙ্গাকিশোর গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পুথির আকারে বহু পুস্তক বর্তমান শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ধর্মগ্রন্থ। বিগত শতকের শেষভাগেও বটতলার পুস্তকে 'ত্তু' ছাপা হইয়াছে পুথির রীতিতে 'ত্ত'-এর ন্যায়।[১০] যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে পুথির প্রভাব বেশী দেখা যায়। লাইনো ও মনো প্রবর্তিত হইবার পর হরফের এই বৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। বর্ণের দ্বৈত রূপ সম্পূর্ণ দূর হইলে মুদ্রণ অনেক সহজ হইবে।

নির্দেশিকা

১ পীতাম্বর রচিত 'নলোপাখ্যান', ১৪৫৮ শকাব্দে অনুলিখিত। রংপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত। পুথি সংখ্যা ৭৩
২ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন।' কলিকাতা ১৯৪২
৩ 'ইউসুফ জোলেখার' পুথি; দ্র আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি'; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮
৪ বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসা বিজয়'
৫ কাশীরাম দাস রচিত 'মহাভারত (শল্যপর্ব)', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা, ৩য় খণ্ড পৃ ৬৮০
৬ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত 'বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ', ১ম খণ্ড, পৃ ২৪
৭ আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি', পৃ ৩৭৪
৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সংগ্রহের রামায়ণের পুথি
৯ 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি' (উপরোক্ত ৩ নং) পৃ ৮১

১০ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', ১ম খণ্ড পৃ. ৩২
১১ যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, 'বাংলা অভিধানগ্রন্থের পরিচয় (১৭৪৩-১৮৬৭)'; ১৯৭০ খৃী, পৃ. ৩৭
১২ কর্ণা বর্মণ, 'বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস (১৭৪৩-১৮৬৭)', পৃ. ২৭৩। অপ্রকাশিত থিসিস
১৩ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ', ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১
১৪ এসিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পুঁথির তালিকা; খণ্ড ৯ (সাপ্লিমেণ্ট), পৃ. ২০০
১৫ উপরোক্ত ১১, পৃ. ৩৭
১৬ উপরোক্ত ১৪, পৃ. ১২২
১৭ মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'
১৮ বরেন্দ্র বিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুঁথির তালিকা, পৃ. ৭০
১৯ কাশীরাম দাস—'মহাভারত', উদ্যোগপর্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুঁথি সংখ্যা ৫৭৬
২০ ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা', দ্বিতীয় সংস্করণ। ঢাকা, ১৯৭৬; পৃ. ১৮৩

বাংলা মুদ্রণের পশ্চাৎপট

সুখময় মুখোপাধ্যায়

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বইটি ইংরেজীতে লেখা হলেও এর বাংলা দৃষ্টান্তগুলি উইল্‌কিনসনির্মিত বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়েছিল। এই থেকেই বাংলা মুদ্রণশিল্পের সূচনা। কিন্তু এই সূচনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণ পরম্পরা যার মূলে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে নিহিত।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর ইংরেজরা কার্যতঃ বাংলার প্রভু হয়ে বসল। তাদের প্রভুত্ব চলত নবাবদের সহায়তায়, জনসাধারণের সঙ্গে ইংরেজদের কোন প্রশাসনিক যোগ ছিল না। প্রজার উপর ছড়ি ঘোরাত নবাবের কর্মচারীরা; এরা ছিল যেমন অযোগ্য তেমনি দুর্নীতিপরায়ণ।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পেল। কিন্তু তার পরেও সরাসরি শাসনভার হাতে তুলে নিতে কোম্পানী আগ্রহ বোধ করল না। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নবাবের হাতেই রয়ে গেল। কোম্পানীর কর্মচারীদের মূল লক্ষ্য ছিল যে কোন প্রকারে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করা।

সুতরাং ১৭৬৫-র আগে ও পরে প্রকৃত প্রস্তাবে চলছিল দ্বৈত শাসন। আসল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল কোম্পানীর হাতে, অথচ দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল নবাবের উপর। রাজস্ব আদায়ের নাম করে নবাবের কর্মচারীরা জনসাধারণের উপর নানাভাবে অত্যাচার করত। এই দ্বৈত শাসনের পর্বটি বাংলার ইতিহাসে এক ভয়াবহ অধ্যায়। এর পরিণতি দেখা যায় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মধ্যে।

দ্বৈত শাসনের বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তার একটি ফল কিন্তু আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্বটিতে শুধু যে প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল তাই নয়, জনকল্যাণের ক্ষেত্রে রাজশক্তির যে ভূমিকা থাকে তা এই পর্বে একেবারেই অনুপস্থিত, কারণ এই সময় দেশে সত্যকার কোন সরকার ছিল না। কোম্পানীর শাসন করবার ইচ্ছা নেই; নবাবের উদ্দেশ্য যে কোনো উপায়ে

রাজস্ব আদায় করা। দুর্ভিক্ষে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেলেও পরবৎসরই শতকরা দশ টাকা হারে খাজনা বাড়িয়ে তা নির্মমভাবে আদায় করতে দ্বিধা হয়নি নবাবের। সুতরাং জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটা উপেক্ষিতই ছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনকে পরবর্তী চল্লিশ বছর গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।[২] বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ কাহিনী পেঁৗছেছিল লন্ডনে। সর্বত্র কোম্পানীর কু-শাসনের কঠোর সমালোচনা হল। এতদিন কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য করে অর্থোপার্জন করা। প্রথম বাণিজ্যের সুবিধার উদ্দেশ্যেই কোম্পানী ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ করে প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিল। সমালোচনায় নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এদেশে সুপরিকল্পিত শাসন ব্যবস্থার কথা ভেবে কোম্পানী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্নর করে বাংলাদেশে পাঠাল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে হেস্টিংস প্রথম ভারতে এসেছিলেন, ফিরে গিয়েছিলেন ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই চোদ্দ বছরে তিনি রেখে গিয়েছিলেন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়।

হেস্টিংসের সর্বপ্রধান কাজ হল দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করা। রাজস্ব আদায়ের ভার নবাবের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া হল। প্রতি জেলায় রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হল একজন করে কালেক্টর। রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত হল রেভিনিউ বোর্ডের উপরে। বিচার-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জেলায় জেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হল। প্রশাসনিক আরও কিছু সংস্কারের ফলে জনসাধারণের মনে একটা আস্থা ও নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ ধীরে ধীরে গড়ে উঠল। হেস্টিংসের ব্যক্তিগত আগ্রহ ব্যতীত এত অল্প সময়ে এই পরিবেশ গড়ে উঠতে পারত কিনা সন্দেহ। রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কতকগুলি ধারণা ছিল। এই ধারণাগুলি কার্যে পরিণত করবার সুযোগ পাওয়া গেল যখন হেস্টিংস ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) অনুসারে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

হেস্টিংস কী চেয়েছিলেন তা জানা যাবে ১১ই নভেম্বর (১৭৭৩) তারিখে বোর্ড অব ডিরেক্টরকে লেখা একটি চিঠি থেকে। তিনি লিখছেন, পূর্ববর্তী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে লাভ নেই। কারণ এত বড় বিরাট সাম্রাজ্য একটা ব্যবসায়ী সংস্থা সুষ্ঠু-ভাবে শাসন করতে পারবে তা আশা করা যায় না। কর্মচারীরা ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করত, তাদের মধ্যে ছিল "সোস্যাল ফীলিংসের" অভাব। প্রশাসনে এই "সামাজিক অনুভূতি" সৃষ্টি করাই ছিল হেস্টিংসের লক্ষ্য।[২]

দ্বৈত শাসন দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর সরকারকে শাসিতদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। প্রত্যক্ষ পরিচয় সুদৃঢ় করবার জন্য দেশীয় লোকদের ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা ও রীতিনীতি জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই জানা নিছক সৌহার্দ্যের তাগিদে নয়, প্রশাসনের জন্যও তা ছিল অত্যাবশ্যক। ভারতীয়দের আস্থাভাজন হবার জন্য হেস্টিংস স্থির করলেন, হিন্দুরা শাসিত হবে তাদেরই প্রাচীন আইন অনুসারে।[৩] মুসলমানদের ক্ষেত্রেও আদালত তাদের নিজস্ব আইন দিয়েই সব মীমাংসা করবে। ফারসী জানা ইংরেজের তখন অভাব ছিল না। অভাব ছিল এমন লোকের যে সংস্কৃত পুঁথি থেকে হিন্দু আইনের মর্ম উদ্ধার করে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দেবে মক্কেল, উকিল ও বিচারকের ব্যবহারের জন্য। হেস্টিংসের উদ্যোগে কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে আনা হল কলকাতায়। তাঁরা পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে নির্বাচন করলেন প্রয়োজনীয় বিধি। তা অনুবাদ করা হল ফারসীতে। ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড তা অনুবাদ করলেন ইংরেজীতে 'এ কোড অব জেণ্টু লজ' (১৭৭৬) নামে। আরবী

থেকে ফারসীতে আইন অনুবাদ করাবার ব্যবস্থাও হেস্টিংস করেছিলেন এবং আংশিক ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

ইম্পে কোড উইলিয়াম চেম্বারস্ ফারসীতে অনুবাদ করেছিলেন ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে। এ কাজের জন্য তিনি মাসে দু হাজার টাকা করে পেতেন। জোনাথান ডানকান ঐ কোড বাংলায় অনুবাদ (১৭৮৫) করবার জন্য পেয়েছিলেন পনেরো হাজার টাকা।[৫] দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য হেস্টিংস এমনি অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে শিক্ষার বিস্তার যে অপরিহার্য তা হেস্টিংস উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যও শিক্ষার দরকার। সে সময় এদেশে শিক্ষার মান বেশ উঁচু ছিল, কিন্তু একালের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুরু শিক্ষা দিতেন। হিন্দুরা উচ্চশিক্ষা পেতেন চতুষ্পাঠীতে, শিক্ষার বাহন ছিল সংস্কৃত। নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষার বাহন ছিল বাংলা, সে শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালায়। মুসলমানদের মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের ভাষা ছিল ফারসী। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন না থাকলেও কোন কোন মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬] তবে তাঁরা লেখাপড়া শিখতেন বাড়ীতে, তাঁদের জন্য কোন পৃথক শিক্ষালয় ছিল না। যা হোক, সে যুগের কোন একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যে কোন দেশের মাপকাঠি অনুযায়ী উচ্চশিক্ষিত বলে গণ্য হবার মত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। হেস্টিংস প্রথম এদেশে আধুনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হল কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১)। সংস্কৃত কলেজ বারাণসীতে জোনাথান ডানকান স্থাপন করেছিলেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। হেস্টিংস অবশ্য এই কলেজটি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যা চর্চার জন্য তিনি উইলিয়াম জোনস এবং অন্যান্য ইংরেজদের প্রেরণা দিয়েছিলেন এসিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তুলতে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল[৬] এবং হেস্টিংস তারপর যে অল্প সময় ভারতে ছিলেন সোসাইটি তাঁর আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি।

ব্যক্তিগত জীবনে হেস্টিংস সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। চৌদ্দ বছর ভারতে থাকবার সুযোগে তিনি এ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন কিছু পুরনো পুঁথি। দ্বিতীয়বার ভারতে এসে বন্ধু চার্লস উইলকিনসকে অনুরোধ করলেন গীতার ইংরেজী অনুবাদ করতে। অনুবাদ সম্পূর্ণ হবার পর কোম্পানীর টাকায় তা ছাপার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন হেস্টিংস। গীতা যে তিনি বেশ ভালো করেই পড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠি থেকে।[৭] চিঠিতে গীতার কোন কোন শ্লোকের উল্লেখ আছে। হেস্টিংস উইলকিনস-কৃত অনুবাদ গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তা থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর মোটামুটি ভালো জ্ঞানই ছিল।

ক্লাইভের সময় এবং তার পরেও বিভিন্ন দেশের বিদেশী বণিকরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করত পর্তুগীজ ভাষার এক বিকৃত রূপের সাহায্যে। হেস্টিংস উপলব্ধি করলেন বাণিজ্য এবং রাজ্য শাসনের জন্য দেশের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ অত্যাবশ্যক এবং সে যোগাযোগ একমাত্র স্থানীয় ভাষার সাহায্যেই হতে পারে। তিনি নিজে বাংলা ও ফারসী খুব ভালো জানতেন, উর্দু এবং আরবীতেও দখল ছিল।[৮] ফারসী তখন প্রশাসন ও আদালতের ভাষা। সুতরাং ইংরেজ কর্মচারীরা অনেকেই ফারসী শিখত। রাজকার্যের এই ভাষা এদেশে আসবার পূর্বেই যাতে কর্মচারীরা শিখে আসতে পারে তার জন্য হেস্টিংস ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রস্তাব দিয়েছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করতে। রাজকার্যের ভাষা যে সর্বত্র জনসাধারণের ভাষা ছিল না একথা হেস্টিংস জানতেন। তাই স্থানীয় ভাষা শেখানোর জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। তাঁর প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক মিল স্বীকার করেছেন, "He was the first, or among the first, of the servants of the Company, who attempted to acquire any language of the natives, and who set on foot those liberal enquiries into the language and literature of the Hindus... He had the great art of a ruler, which consists in attaching to the Governor those who are governed."[৯]

বাংলা ভাষা চর্চায় হেস্টিংসের বিশেষ আগ্রহের কতকগুলি কারণ ছিল। পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) পাশ করার পরিণতি হিসাবে কলকাতা হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। যে জনপদ ছিল করেকটি ছড়ানো-ছিটানো কুঁড়ে ঘরের সমাহার তা পৃথিবীর পরশাসিত বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানী হবার পথে যাত্রা শুরু করল। রাজধানী গড়ে তোলবার কর্মযজ্ঞে নানা শ্রেণীর কর্মীর আগমন আরম্ভ হল। তাদের অধিকাংশই ছিল বাঙালী।

শুধু ইটকাঠের কাজ নয়, সাংস্কৃতিক আলোচনাও প্রেরণা পেল হেস্টিংসের কাছ থেকে।

উইলকিনস, জোনস, হলহেড প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার আগ্রহী ব্রিটিশ কর্মীদের কাজে সহায়তা করবার জন্য বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এলেন পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা। রেনেলের "বেঙ্গল অ্যাটলাস" (১৭৮১) সংকলন করতেও নিশ্চয় ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কলকাতা আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হেস্টিংস "...encouraged bodies of learned pundits to settle in Calcutta, and supported them while they translated out of the Sanskrit into more acceptable dialects, the poems and mythological and moral treatises of their native land."[১০]

হলহেডের "জেণ্টু লজ" সংকলনে সহায়তা করবার জন্য যে-সব পণ্ডিত মফঃস্বল থেকে কলকাতা এসেছিলেন তাঁদের নাম: রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার; বীরেশ্বর পঞ্চানন; কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালংকার; বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার; কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত; কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম; গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত; কৃষ্ণকেশব তর্কালংকার; সীতারাম ভট্টাচার্য; কালীশংকর ভট্টাচার্য ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।[১১]

এই পণ্ডিতরা যে কত নির্লোভ ছিলেন হেস্টিংস এক চিঠিতে তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। অনেক বেশী পারিশ্রমিক দিতে চাইলেও তাঁরা কলকাতায় থাকা-খাওয়া বাবদ দৈনিক মাত্র এক টাকা করে নিতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ উল্লেখ অন্যত্রও দেখা যায়: "These Hindus who form the substance of the population are pure in their affections, simple in their domestic habits, gentle in intercourse, expert in business, quick of perception, patient of inert labour, respectful to authority, and grateful for benefits conferred upon them."[১২]

কলকাতা যত বাড়তে লাগল ততই বাঙালীরা আসতে লাগল ভিড় করে। কেউ চায় চাকরি, কেউ করবে ব্যবসা। আর কলকাতার চারদিকেও বাঙালী। বাংলাদেশে কোম্পানীর রাজধানী। ব্যবসার দিক থেকেও বাংলার প্রাধান্য। সুতরাং হেস্টিংস স্থির করলেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ধু ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড ইংরেজীতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখে দিলেন। বাংলা অক্ষরে ব্যাকরণে ব্যবহৃত দৃষ্টান্তগুলি ছাপবার জন্য আর এক বন্ধু চার্লস উইলকিনস বাংলা হরফ তৈরি করে দিলেন। বাংলা মুদ্রণের সূচনার এই ইতিহাস সুপরিচিত। কিন্তু অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে হেস্টিংসের প্রেরণা ও তাগিদ না থাকলে বাংলা মুদ্রণ আরও অনেক বিলম্বিত হত। হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় স্পষ্ট বলেছেন, হেস্টিংসের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁরা এ কাজে নেমেছেন।[১৩] গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায় যে হেস্টিংস কী জোরের সঙ্গে কোম্পানীর সহায়তায় ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য দাবি জানিয়েছেন। ২০শে ফেব্রুয়ারির (১৭৭৮) কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায়, ব্যাকরণ ছাপার জন্য যে অগ্রিম টাকা দেওয়া প্রয়োজন তার অনুমোদন আনতে হবে লণ্ডন থেকে। অনেক দিনের ব্যাপার, ছাপা বন্ধ থাকবে। কিন্তু বন্ধ থাকবে এটা তিনি চান না। সুতরাং লণ্ডন থেকে অনুমোদন আসবার আগে নিজের দায়িত্বে টাকা দেবার সুপারিশ করলেন। কোম্পানী টাকা অনুমোদন না করলে দু বছর পরে তিনি নিজে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন। হেস্টিংসের এমন আগ্রহ ও সহৃদয়তা না থাকলে হলহেডের ব্যাকরণ হয়ত কোন দিনই ছাপা হত না এবং ফলে বাংলা মুদ্রণশিল্পের আবির্ভাব বিলম্বিত হত।

ইতিহাসের কি বিচিত্র গতি! বাংলা মুদ্রণশিল্পের প্রবর্তক হিসাবে হলহেড ও উইলকিনসের নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু এ ব্যাপারে যাঁর দান কোন অংশে কম নয় সেই ওয়ারেন হেস্টিংস রাজনীতির আবর্তে পড়ায় আমাদের সমালোচনার পাত্র হয়ে আছেন, আমাদের কাছ থেকে অন্ততঃ একটি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য তা তিনি পাননি।

নির্দেশিকা

১ Smith. *The Oxford History of India,* 1928 p. 507

২ ঐ পৃ ৪১৭

৩ 'জেণ্টু লজ'-এর একাংশ লর্ড ম্যানসফিল্ডকে পাঠিয়ে হেস্টিংস ২১শে মার্চ ১৭৭৪ লিখেছিলেন যে তিনি "ডিক্লায়ার্ড টু ফাউণ্ড দ্য অথরিটি অব দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইন বেঙ্গল

অন ইটস এনশেণ্ট লজ।" স্মিথের 'অক্সফোর্ড হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ায়' উদ্ধৃত, পৃ ৫১৪

৪ Kopf, David. *British Orientalism and the Bengal Renaissance.* 1969. p. 19

৫ Datta, K. K. *Studies in the History of the Bengal Subah*, 1936, pp 25-28

৬ Mukherjee, S. N. *Sir William Jones*. pp 77-79

৭ Feiling, K. G. *Warren Hastings.* 1954 p 399

৮ Kulkarni, V. B. *British Statesmen in India.* 1961, pp 28-29

এই প্রসঙ্গে 'সিলেক্শানস ফ্রম আন্পাব্লিশ্ড রেকরড্স অব গভর্নমেণ্ট'-এর ভূমিকায় লঙ্ সাহেবের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

"At an early period the Government awoke to a sense of the importance of their servants knowing the country language, and we find a Mr. Bristow was recalled from Cuttack in consequence of his ignorance of it. The Court sent out an order that public proclamations were to be in different languages. Lord Clive bears testimony of the great services of Mr. Watts by his thorough knowledge of the language and people of this country. Still they thought that Rs. 300 a month was too high salary for a Translator.

"In 1764 the Government passed an order 'that as Major Munro is entirely unacquainted with the language of the country as well as of the manners and customs of the people, one of the Members of the Board shall accompany him to the field'"

৯ অক্সফোর্ড ইতিহাসে স্মিথ উদ্ধৃত করেছেন; পৃ ৫৪৯-৫০

১০ Gleig, G. R. *Memoirs of the Life of the Rt. Hon Warren Hastings* Vol. III, 1841, p 156

১১ 'জেণ্টু লজের' ভূমিকা পৃ ৬ ও
Sinha, N. K. *The Economic History of Bengal*, Vol II pp 226-p27

১২ ঐ পৃ ১৮৭

১৩ Halhed, N. B. *A Grammar of the Bengal Language*, 1778. ভূমিকা পৃ ii ও xxiii

পরিশিষ্টে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের কার্যবিবরণী দ্র

হলহেড: জীবন কথা

পবিত্র সরকার

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেডের জীবন খানিকটা তাঁর সমসময়কার অনেক উচ্চবিত্ত ইংরেজ সন্তানের জীবনের মতোই বিচিত্র। ইংলন্ডে ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং তারই সূত্র ধরে পৃথিবীব্যাপী তার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পটভূমিকা মনে রাখলে এই বৈচিত্র্য অভাবিত বা আকস্মিক বলে বোধ হবে না। বরং তা যেন একটি সাধারণ প্যাটার্নে বাঁধা। প্রথমে ভালো পাবলিক স্কুলে, তারপর অকসফোরড বা কেমব্রিজে উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা, কচিৎ লন্ডনের কোনো 'বার'-এ একটু আইন জেনে নেওয়া, তারপর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে প্রাচ্যদেশ যাত্রা, আর সেখানে বেশ উঁচু ও দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজকর্ম করে দেশে ফেরা এবং সচ্ছল জীবন এবং শৌখিন রাজনীতিতে জাঁকিয়ে বসা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখকের রচনায় যে-সব 'নাবোব' বা 'পাক্কা সাহিব'-দের দেখা পাই তাদেরই মতো এদের জীবনও একই ধারাবাহিকতার পুনরাবৃত্তি। ব্যতিক্রমের মধ্যে হলহেড লিখেছিলেন একটি অপরিচিত প্রাচ্যভাষার ব্যাকরণ। আর শেষ জীবনে সুখদুঃখের হিসাব তাঁর ক্ষেত্রে একটু আলাদা। ব্যাকরণ রচনাও এমন কিছু ব্যতিক্রম নয়। হলহেডেরই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, তাঁর অগ্রজ বন্ধু উইলিয়াম জোনস লিখেছিলেন ফারসী ভাষার ব্যাকরণ, হলহেডের বইটি ছাপানোর সাত বছর আগে। তাঁর আর এক জ্যেষ্ঠ শুভার্থী, মহারাজ নন্দকুমারের বিচারকর্তা স্যর ইলাইজা ইম্পের অনায়াস দক্ষতা ছিল ফারসী ও উর্দুতে। ইংলন্ডের পাবলিক স্কুলে যারা পড়ত গ্রীক ল্যাটিন না শিখে উপায় ছিল না তাদের, বহু ভাষাবিদ্ হওয়ার প্রস্তুতি ঐ স্কুলজীবন থেকেই শুরু হত। তার বাইরে কে কোন্ ভাষা শিখছে তা অবশ্য তাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা, দূরদর্শিতা ও জীবনের বিস্তারমান ছকের উপর নির্ভর করত। যাই হোক, হলহেডের আগে কোনো ইংরেজ বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি।[১] এই পথিকৃতের গৌরবের জন্যই আমরা পৃথিবীর এই ভূভাগে তাঁকে আজ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অকসফোরডশায়ারের ওয়েস্টমিনস্টারে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে হলহেডের জন্ম। অর্থ-প্রতিপত্তি বা আভিজাত্যের বিচারে তাঁর পরিবার নগণ্য ছিল না। অলিভার ক্রমওয়েলের শাসনে ইংলন্ডের হাউস অব কমনসের স্পীকার ছিলেন যিনি, মায়ের দিক থেকে সেই লেনথালের বংশে তাঁর জন্ম। ঠাকুরদা ন্যাথানিয়েল হলহেড ছিলেন এক্সচেঞ্জ অ্যালির দালাল—এই সূত্রেই তাঁর ঐশ্বর্য। বাবা উইলিয়াম হলহেড আঠারো বছর ধরে ব্যাঙ্ক অব ইংলন্ডের ডিরেক্টরের পদে আসীন ছিলেন।[২] সুতরাং নীল রক্ত ও সুউচ্চ জীবিকা—এ দুয়েরই সম্মিলন ঘটেছিল হলহেড পরিবারে। এ ধরনের

পরিবারের পুত্রসন্তানদের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হল—হলহেডকেও এক মূল্যবান শিক্ষাপদ্ধতির হাতে সঁপে দেওয়া হল। তিনি গেলেন তাঁর অঞ্চলের নামী এবং নাকউঁচু পাবলিক স্কুল হ্যারোতে। বাবা উইলিয়াম তখন হ্যারোতেই থাকতেন।

ঐ স্কুলে তখন যিনি হেডমাস্টার, তাঁর নাম সামনার। সামনার নিজে ক্লাসিক্‌স অর্থাৎ গ্রীক-ল্যাটিনে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর বন্ধু ছিলেন প্রখ্যাত মনীষী ড. জনসন। তখনকার পাবলিক স্কুলগুলিতে শিক্ষা বলতে মুখ্যতঃ বোঝাত ক্লাসিক্‌সের, অর্থাৎ গ্রীক-ল্যাটিনের মহৎ সাহিত্য পড়তে পারার শিক্ষা। সামনারের তত্ত্বাবধানে হলহেড ও তাঁর সহপাঠীদের গ্রীক-ল্যাটিনের ভিতটি যে বিশেষ পোক্ত হবে, তাতে আর সন্দেহ কী? তাঁর এক সহপাঠী ছিলেন রিচার্ড ব্রিনসলি শেরিডান, পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইংলণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডি লেখক। প্রকৃত-পক্ষে ঐ সময়কার সবচেয়ে সমর্থ নাট্যকার। বলা বাহুল্য, তখন স্কুলে সে আমুদে ও হৈ-হৈ প্রিয় ইংরেজ বালক মাত্র। সামনারের সঙ্গে তার বাবার আলাপ ছিল। কাজেই সেদিক থেকে অসুবিধা ছিল, হেডমাস্টার তাঁর উপর একটু বিশেষ নজর রাখতেন। পড়াশোনায় একটু মন দিতে হত। বন্ধু হলহেডের সঙ্গে মিলে ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রীক লেখক আরিস্তেনেতুস-এর পত্রিকা-সাহিত্য—অর্থাৎ চিঠির আকারে গদ্যে লেখা কিছু কাহিনী কবিতায় অনুবাদ করার প্রস্তুতি শুরু করেন। আরিস্তেনেতুসের পত্রিকা বা এপিসল্‌স্‌ নামে চিঠি, আসলে গল্প, প্রাচীনদের লেখা বৃত্তান্ত থেকে নেওয়া। অনুবাদে হাত বেশী ছিল হলহেডের, কাব্যরূপদানে সম্ভবতঃ শেরিডানের। এও অনুমানমাত্র। এর বিপক্ষে বলা যায় যে, হলহেডেরও কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল, পরে শুভানুধ্যায়ী ওয়ারেন হেস্টিংসের সম্মানেও তিনি কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন,[৩] এ প্রবন্ধে তাঁর একটি কবিতাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। যাই হোক, বইটি যখন বের হয় তখন তার মুখবন্ধের নিচে স্বাক্ষর হিসাবে দুজনেরই নামের আদ্যক্ষর উৎকীর্ণ ছিল—H. S. লক্ষ্য করতে হবে যে, হলহেডেরই রচয়িতার প্রাথমিক সম্মান। আমাদের ধারণা, অনুবাদে অগ্রগণ্য বা সামগ্রিক ভূমিকার জন্যই তাঁর এই আপেক্ষিক গৌরব। বইটি যখন প্রথম ছাপা হয়ে বের হল, ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে, তখন দুজনেই অবশ্য কলেজে পড়ছেন।[৪]

নিছক ভৌগোলিক কারণেই, অর্থাৎ কাছাকাছি বলেই, হ্যারোর বেশীর ভাগ ছাত্র অকসফোরডে পড়তে আসত—আরেক উন্নাসিক পাবলিক স্কুল, ইটনের ছেলেরা যেমন যেত কেমব্রিজে। স্কুল শেষ করে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেড অকসফোরডের ক্রাইস্ট চারচ কলেজে ভর্তি হলেন এবং এখানেও তাঁর ক্লাসিক্‌স পড়ারই পূর্বানুবৃত্তি চলতে লাগল। এখানে বন্ধু, তত্ত্বোপদেশক ও পথনির্দেশক হিসাবে যাঁকে পেলেন তাঁরও নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত—মনস্বী উইলিয়াম জোনস। জোনস হলহেডের চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। একই স্কুলে—হ্যারোতে—তিনিও লেখা-পড়া শিখেছেন। জোনসের প্ররোচনায় হলহেড আরবী শিখতে শুরু করলেন এবার। জোনস নিজে আরবী শিখছিলেন মির্জা নামে সিরিয়ার এক আরবের কাছ থেকে। লণ্ডন থেকে নিজের খরচে তাঁকে তিনি অকসফোরডে নিয়ে এসেছিলেন।[৫] হলহেড কি এই মির্জারই কাছে আরবীর পাঠ নিতে লাগলেন? এইরকমই অনুমান করছি, নইলে আরবী শেখার অন্য কোনো সুযোগ অকস-ফোরডে তখন ছিল বলে মনে হয় না।

বলা বাহুল্য বন্ধু ও সহাধ্যায়ী শেরিডানও অকসফোরডে পড়ছেন। দুজনের সাহিত্যকর্মে যুগ্মভূমিকা অব্যাহত আছে। আরিস্তেনেতুসের অনুবাদটি যখন বের হল তখন কিন্তু শেরিডানের সঙ্গে হলহেডের আকৈশোর সখ্যে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। বন্ধু হয়ে উঠলেন প্রণয়প্রতিপক্ষ।

একটু পিছিয়ে ঘটনাটি অনুধাবন করা যাক। শেরিডানরা জন্মসূত্রে আইরিশ, বাবা দুনম্বর টমাস শেরিডান জন্মেছিলেন ডাবলিনে। তিনি অভিনেতা হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন, পরে জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়ায় ছেলেদের বাগ্মিতা শিখিয়ে বেশ ভালোই উপার্জন করতেন। শেরিডানের মা বিয়ের আগে যাঁর নাম ছিল ফ্রান্সেস চেম্বারলেন, তাঁরও খ্যাতি কম ছিল না। 'দ্য ডিসকভারি' নামে জনপ্রিয় কমেডি, 'মেমোঅর্স' অব মিস সিডনি বিডালফ' নামে উপন্যাস, ইত্যাদি লিখেছিলেন তিনি। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সেস মারা গেলেন, আর ১৭৭০-এর শেষ দিকে টমাস ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রিস্টলের কাছাকাছি বাথ শহরে[৬] এসে বসবাস শুরু করলেন। অকসফোরড থেকে বাথের দূরত্ব মাইল ষাটেকের মতো, দক্ষিণ পশ্চিমে। শেরিডান ছুটিতে কখনো কখনো এসে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতেন। হলহেডও হয়ত আসতেন। না এলেও বাথে বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্রে সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন।

এই বাথে লিনলি পরিবারের সঙ্গে শেরিডানদের ঘনিষ্ঠতা হল। কর্তা টমাস লিনলির সংগীতজ্ঞ রূপে বেশ খ্যাতি ছিল। শেরিডানের মাকে আগে গান শিখিয়েছিলেন তিনি। এই টমাস লিনলির মেয়ে এলিজাবেথ অ্যান লিনলি। শেরিডানরা যে-বছর বাথে আস্তানা নিলেন

সে-বছর এলিজাবেথ ষোল পূর্ণ করে সতেরো বছরে পা দিয়েছেন। যেমন অসামান্য সুন্দরী, তেমনি কিন্নরীর মতো তাঁর কণ্ঠ। এ দুয়ের সম্মিলন হলে যা হয়—তাঁর ভক্ত ও স্তাবকের সংখ্যা শহর ভর্তি, সারা শহরই যেন তাঁর প্রণয়মুগ্ধ। বাথসুন্দরীদের মধ্যে তিনি কমনীয়তমা—সেই 'টোস্ট অব বাথ' এর ভুবনমোহন সৌন্দর্যের আভাসটি শেরিডানের জীবনীকার টমাস মোর-এর কথায় ফুটেছে ভালো:

> "The young Maid of Bath appears indeed to have spread gentle conquests, to an extent almost unparalleled in the annals of beauty."[৭]

এই তির্যক সংযত উচ্ছ্বাসের মধ্যে অত্যুক্তির পরিমাণ যে কম, তার প্রমাণ পাই এক শেরিডান পরিবারেই তাঁর দু-দুটি গুণগ্রাহীকে দেখে। হলহেডের বন্ধু রিচার্ড, আর তার বড় ভাই চার্লস। রিচার্ড প্রথম প্রথম নিজের হৃদয়বাসনার কথা এলিজাবেথকে জানাননি। বন্ধু বা সহচরের মতো কাছাকাছি থেকেছেন, অন্যান্য প্রণয়প্রার্থীর ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। এলিজাবেথকে নিয়ে দুএকটি ঘটনাও ঘটে গেছে এর মধ্যে—বাগ্‌দান করার পরে একটি বিয়ে তিনি নাকচ করেছেন। এটি নিয়ে পরে নাট্যকার ও হাস্যাভিনেতা স্যামুয়েল ফুট 'দ্য মেইড অব বাথ' নামে কমেডিও লিখেছিলেন। সমস্ত ঘটনার মধ্য থেকে এলিজাবেথ অবশ্য অম্লানরূপে ও অনাহত মর্যাদা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। তখনই তিনি গান গেয়ে বছরে প্রায় হাজার পাউন্ড রোজগার করেন।

অকসফোরডে গানের আমন্ত্রণ পেয়ে গেছেন এলিজাবেথ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাপেলে 'ওরাটোরিয়ো' গান গাইছেন। নাটকীয় উত্থানপতনপূর্ণ সেই ধর্মসংগীতসভায় হলহেডও একজন শ্রোতা। গান তাঁর কানের মধ্য দিয়ে মর্মের কেন্দ্রে পেঁৗছে গেল। শেরিডান হয়ত এলিজাবেথের গুণের বিষয়ে আগেই হলহেডকে জানিয়ে থাকবেন, কিন্তু গান শুনে তাঁর সমস্ত সংবিৎ লোপ পেল যেন। যতদূর মনে হয় শেরিডান সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁর কাছে লেখা একটি চিঠিতে হলহেডকে সেই আত্মবিস্মরণকারী সুরম্য অভিজ্ঞতায় আপ্লুত বর্ণনা করতে দেখি:

এলিজাবেথ

> "I am petrified, my very faculties are annihilated with wonder; my conception could not form such a power of voice, such a melody, such a soft yet so audible a tone. Oh Dick, I wished myself hanged for not being able to commit my ideas to paper."[৮]

কিন্তু হলহেড যতই সুহৃত্তম শেরিডানের কাছে চিঠিতে উচ্ছলিত হৃদয়াবেগ ঢেলে দেন, আশ্চর্যের কথা এই যে, শেরিডান কিন্তু বন্ধুর কাছে নিজের অনুরাগের ছিটেফোঁটা আভাসও দেন না। আর এলিজাবেথকে হলহেড যে-সব চিঠি লেখেন সে সবের শান্ত সংযত সৌজন্যের জবাবই কেবল পান তিনি, কোনোরকম আশ্বাস তাঁর কাছে পেঁৗছায় না।

বছরখানেকের মধ্যেই প্রত্যাখ্যান একটি নাটকীয় ঘটনার আকার নিয়ে স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল হলহেডের কাছে। বাথের প্রণয়প্রার্থীদের তাড়নায় এলিজাবেথ অতিষ্ঠ হয়ে প্যারিসে পালালেন। সঙ্গে বিশ্বস্ত পরিচারিকা এবং হলহেডের বন্ধু শেরিডান। বিদেশে পূর্ণ সাহচর্যে এতদিনের বন্ধুত্ব সহজেই প্রেমে পরিণত হল এবং এলিজাবেথ ও শেরিডানের বিয়ে হতেও দেরী হল না।

প্রণয়পরীক্ষায় হলহেডের* (এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের) চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। নানাদিক ভেবে দেখলে এ ফলাফল অপ্রত্যাশিত নয়। অনিন্দ্যসুন্দর দেহরূপে এবং ব্যক্তিত্বে শেরিডান মানুষকে আকর্ষণ করতেন অনেক বেশী, আর আমুদে এই মানুষটির সঙ্গও অনেক বেশী সুখদায়ক ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, এলিজাবেথের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর ছিল অনেক বেশী। অকসফোর্ড থেকে চিঠি লিখে আর কালেভদ্রে বাথে বেড়াতে এসে হলহেড কী করে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবেন? এলিজাবেথ শেরিডানকেই কাছ থেকে দেখেছেন, ফলে তাঁকে যাচাই করবার অবকাশও তাঁর বেশী ছিল। কবিত্ব, হৃদয়বত্তা ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তার অতিরিক্ত আকর্ষণ তো ছিলই। মেজর ম্যাথিউজের সঙ্গে শেরিডান দুবার ডুয়েলও লড়েছিলেন এলিজাবেথ প্রসঙ্গে। নাটকীয়তার বাইরেও নিশ্চয়ই মানুষটি গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

এসবের মধ্যে, প্রণয়পর্বের এই পরিসমাপ্তির আগে, হলহেড-শেরিডানের সাহিত্য সহযোগ কিন্তু থেমে থাকেনি। দুজনে একসময় Herman's Miscellany নাম দিয়ে একটি সাহিত্য-সাময়িক বার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। নামটি নিয়ে দুই বন্ধুতে একটু তর্ক হয়েছিল, হলহেডের পছন্দ ছিল The Reformer নামটি।[১০] যাই হোক প্রথম সংখ্যাটির পাণ্ডুলিপি পুরো তৈরি হয়ে গেল, কিন্তু তারা আর ছাপাখানার মুখ দেখল না। তা ছাড়া হলহেড এ সময় 'ইখিওন' নামে একটি প্রহসন লিখেছিলেন বলে জানা যায়। শেরিডান এটিকে আদ্যোপান্ত দেখে দিলেন শুধু নয়, ঢেলেও সাজালেন।[১১] বইটির নাম বদলে রাখলেন 'জুপিটার'। শেরিডান বইটি নিয়ে তখনকার প্রসিদ্ধতম দুই অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক আর স্যামুয়েল ফুটের দরজায় বেশ কিছুদিন ঘুরলেন, কিন্তু কেউ সেটি অভিনয়ের বিষয়ে উৎসাহ দেখালেন না। হলহেডের নাট্যকার হওয়ার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। এ ছাড়াও দু বন্ধুতে কবিতা আর অনুবাদের একটি সংকলন বার করবার কথা ভাবছিলেন। আর এক খণ্ড ক্রেজি টেলস্ বার করবার কথা। প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে পড়ায় সে সব পরিকল্পনায় ছেদ পড়ল। এলিজাবেথ আর শেরিডানের ফ্রান্সে পালানোর পর হলহেডের জীবনের একটি পর্ব শেষ হল।

অনেকেই প্রণয়জনিত মনোভঙ্গের সঙ্গে হলহেডের ভারতবর্ষে চাকরি নিয়ে দেশত্যাগের সংকল্পকে কার্যকারণসূত্রে জুড়ে দিয়েছেন।[১২] আমাদের মনে হয় এ দুয়ের যোগ আপতিক মাত্র, তার বেশী নয়। প্রাচ্যদেশে চাকরি নিয়ে আসার কথা হলহেড নিশ্চয়ই বেশ আগে থেকে, অকসফোর্ডে উইলিয়াম জোনসের প্রভাবে আসার পরেই, ভাবতে শুরু করেছিলেন। নইলে অনর্থক আরবী ভাষা শিখতে যাবেন কেন? তখন প্রাচ্যদেশ বা প্রাচ্যভাষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে ইউরোপের ধারণা বেশ অস্পষ্ট ছিল, ফলে লোকে ভাবত, আরবী বা ফারসী শিখলে প্রাচ্যভূমির যে-কোনো দেশে তা ব্যবহার করা যাবে। ভারতবর্ষের অনেক আঞ্চলিক ভাষাকেও তখনকার একাধিক ইংরেজ মুর গোষ্ঠীর ভাষা বলে মনে করতেন। কাজেই হলহেড ভেবেছিলেন, আরবী ভাষা পরে কাজে লাগবে। যাই হোক, ১৭৭২-এ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সারভিসে 'রাইটার'এর বা 'মুহুরী'র চাকরি পেলেন তিনি। এ কাজে মাইনে যেমনই হোক, স্বাধীন ব্যবসা করবার সুযোগ ছিল, ফলে অনেকে ঘুষ দিয়েও এই চাকরি বাগানোর চেষ্টা করতেন—কাগজে ঘুষের প্রস্তাব নিয়ে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনও বেরুত।[১৩]

ঐ বছরের মাঝামাঝি হলহেড কলকাতায় আসার জন্য জাহাজে চড়ে বসলেন।[১৪] নভেম্বরে জাহাজ এসে বন্দরে ভিড়ল। পথের সময়টুকু তিনি নানা ভাষা চর্চা করেছেন, উইলিয়াম জোনসের একটি চিঠি থেকে এ খবর পাওয়া যাচ্ছে।[১৫] জোনসের ফারসী ভাষায় সেই ব্যাকরণটি এ সময়ে তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই অনুমিত হয় যে মুখ্যভাবে তিনি শিখছেন ফারসী। জোনসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, তিনি সম্ভবতঃ ফারসী শিখতেও হলহেডকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন—ভারতবর্ষে চাকরির সুবিধা হবে বলে।

পরিণামে দেখি, যে কাজ এখানে প্রথম জুটল তা ফারসী থেকে অনুবাদের। এ কাজের মাইনে হলহেডের যোগ্য ছিল না। অন্যদিকে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য করার যে সুযোগ ছিল তাতেও তিনি তেমন সুবিধা করতে পারেননি বলে মনে হয়। অর্থকষ্ট ও তৎপ্রসূত হতাশা চলছে। বন্ধু স্যামুয়েল পারকে চিঠিতে কলকাতা আসার ঠিক একবছর পরেই জানাচ্ছেন, প্রচুর যত্ন ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও "ইভ্‌ন এ ডিসেণ্ট সাবসিস্‌টেন্স" উপার্জনে তিনি বিফল হয়েছেন। ঐ চিঠিতেই তাঁর বিষণ্ণ স্বীকারোক্তি— "I have studied the Persian language with the utmost application in vain."[১৬]

কিছু পরে একটু সুরাহা হল। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সময় হিন্দু ও ইসলামী আইনের দুটি আকরগ্রন্থ সংকলনের সংকল্প নেন। সংস্কৃতে এ ধরনের বই নেই কাজেই এগারোজন পণ্ডিতকে দায়িত্ব দেওয়া হল,[১৭] তাঁরা নানা বাইশেক প্রাচীন গ্রন্থ থেকে হিন্দু আইনের একটি আকরগ্রন্থ প্রস্তুত করে দিলেন। তার নাম হল 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব।' সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি ইংরেজীতে অনুবাদের যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তখনও কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ছিল না; সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে সরাসরি অনুবাদ প্রথম করেন চার্লস উইলকিন্স (ভগবদ্‌গীতা, ১৭৮৫-তে মুদ্রিত)। কাজেই আইন গ্রন্থটিকে প্রথমে ফারসীতে অনুবাদ করা হল। ফারসী অনুবাদে প্রায়

দুবছর লাগল (মে ১৭৭৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৭৭৫)। তারই সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংসের 'immediate authority'তে হলহেড তার ইংরেজী অনুবাদ সমাধা করলেন। কিছু আগে থেকেই হেস্টিংস ও হলহেডের সৌহার্দ্যের সূত্রপাত। এই সময় (ডিসেম্বর, ১৭৭৪) কলকাতার 'কোর্ট অব রিকোয়েস্ট'এ কমিশনার হওয়ার জন্য হলহেডের কাছে আমন্ত্রণ আসে, কিন্তু হলহেড তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যাভূষণ এই খবর দিয়ে আরও জানিয়েছেন যে, ১৭৭৫-এর শেষে হলহেড সুপ্রীম কোর্টে দোভাষীর কাজ পান, উইলিয়াম চেম্বার্সের বদলি হিসাবে। যাই হোক, অনুবাদ কর্ম সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে হেস্টিংসে জানালেন যে তা—"executed with great Ability, Diligence and Fidelity..."[১৮] অবশ্য অনুবাদের সঙ্গে হলহেডের নিজস্ব সংযোজনও কিছু আছে। মুখবন্ধেই দেখতে পাচ্ছি তিনি বলছেন যে, ইহুদী আইন (Laws of Moses) ও হিন্দু আইনে প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন এবং ফলে তিনি "everywhere produced instances of similitude between the Mosaical and the Hindoo Dispensation."[১৯]

এটুকু তাঁর মৌলিক দান বলে স্বীকার করতেই হবে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে বইটি প্রকাশিত হল, কালক্রমে একাধিক মুদ্রণ হল এর। পরে রবিনে এর ফরাসী অনুবাদও করেছিলেন।

বাংলা হলহেড কখন থেকে শিখতে শুরু করলেন? ১৭৭৩-এর ৫ই নভেম্বর তারিখে বন্ধু পার-এর কাছে ঐ চিঠিতে যে আক্ষেপ করছেন তাতে শুধু ফারসী শেখার কথাই আছে। ধরে নেওয়া যায় তখনও তিনি বাংলা—Gentoo Laws-এ যাকে তিনি বলেছেন "the modern jargon of Bengal" পৃঃ (xxii)—তা শিখতে আরম্ভ করেননি।[২০] ডঃ কাইউম অনুমান করেছেন, ১৭৭৪ সালে হলহেডের বাংলা শেখার সূত্রপাত। এ অনুমান সংগত বলেই মনে হয়।[২১] সংস্কৃত হয়ত এর একটু আগে শেখা ধরেছেন। 'জেণ্টু লজ'-এর ভূমিকার ২৩ থেকে ৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি হিন্দু ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর অধ্যয়নের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, ২৪ আর ২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে নাগরী আর বাংলা বর্ণমালার চমৎকার প্রতিলিপি উদ্ধার করেছেন এবং প্রায়ই সংস্কৃত শ্লোক তুলে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের নানা প্রসঙ্গের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। তা ছাড়া সাত থেকে তেইশ পৃষ্ঠার মধ্যে এ বইয়ে ব্যবহৃত সংস্কৃত, ফারসী ও বাংলা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দের গ্লসারিও দিয়েছেন। বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক তথ্যাবলীর সঙ্গে তাঁর ইতস্ততঃ পরিচয়ের ইঙ্গিতও এই শব্দরাশিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তবে কাইউম যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলা শব্দগুলির প্রতিবর্ণীকরণে বেশ ত্রুটি আছে—অর্থাৎ শব্দগুলির ঠিক বাংলা উচ্চারণ তখনও হলহেডের অধিগত হয়নি।[২২] মুনশির কাছেই তিনি বাংলা শিখেছেন, তবে সম্ভবতঃ হিন্দু পণ্ডিতের কাছে পরে অন্তত তিনটি বাংলা বই যত্ন নিয়ে পড়েছিলেন। এ বই তিনটি হল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল—বিদ্যাসুন্দর। তাঁর বাংলা ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত উদ্ধৃতি এই তিনটি বই থেকে। ১৭৭৪-৭৫ থেকেই নিশ্চয়ই ব্যাকরণ রচনার কথা ভাবছিলেন হলহেড, কারণ এই সময়েই উইলিয়াম বোল্টস নামক এক ডাচ ভাগ্যান্বেষীকে লণ্ডনে বাংলা হরফ তৈরির অনুরোধ করে পাঠান। বোল্টস তাতে করুণভাবে ব্যর্থ হয়ে হলহেডের আক্ষেপের কারণ হন।

যাই হোক, ১৭৭৮-এ তাঁর 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' বেরুল। রচনার পিছনে এবং প্রকাশে হেস্টিংসে এবং কোম্পানীর উৎসাহ ও সহায়তা দুইই ছিল। এ বইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য বা ভাষা সংক্রান্ত হলহেডের যাবতীয় কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেল। এর পরে তাঁর মনোযোগের এলাকায় এল ইতিহাস, রাজনীতি এবং অস্পষ্ট ধর্মতত্ত্ব।

বইটি প্রকাশের পর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই একটিমাত্র সূত্রে হলহেডের ইংলণ্ডে ফেরার খবর পাই।[২৩] এ খবর যদি সত্য হয়, তা হলে হলহেড এরই মধ্যে বিয়ে করেছিলেন, এমনটি হওয়া সম্ভব। বিদ্বান্ এবং হেস্টিংসের প্রীতিভাজন হিসেবে তাঁর সামাজিক সম্মান যে বেশ উঁচু ছিল তা এই বিয়ে থেকে বোঝা যায়, কেননা যিনি তাঁর সহধর্মিণী হলেন সেই এলেনা লুইজা রিবো ছিলেন চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নরের মেয়ে। এলেনার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছিল না, কিন্তু স্বামীর দুর্দিনে তিনি তাঁর যোগ্য সঙ্গিনী ও নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৭৭৮ থেকে ১৭৮৪-এর মধ্যে হলহেড কি করেছেন তা আমাদের জানা নেই। তাঁর তিনটি পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল এর মধ্যে, কিন্তু কোথায় সেগুলি প্রকাশিত হয় তা জানা যায়নি। একটি খবর থেকে অনুমান হয় হলহেড ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অসুখবিসুখে ভুগছিলেন, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেন।[২৪] ১৭৮৪-তে (বা হয়তো তার একটু আগে) সস্ত্রীক ফিরলেন ভারতবর্ষে। 'ক্যালকাটা রিভিউ'র জীবনীকার লিখেছেন যে, এ যাত্রায় ভারতবর্ষে তাঁর যোগ্য পদ তিনি পাননি, ফলে হতাশ হয়ে ১৭৮৫-তেই দেশে ফিরে গেলেন। বিদ্যাভূষণ শারীরিক বিকলতাকেও কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি

নাগাদ দিনেমার জাহাজ 'দ হাসার' এ হলহেডরা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এ খবর যথার্থ[২৫], কিন্তু মনোবেদনা নিয়ে ফিরলেন কি না তা বলা মুশকিল। কেননা, হেস্টিংসের চিঠিগুলি থেকে সংবাদ পাই হলহেড তাঁর খুব কাছাকাছি আছেন, হেস্টিংসকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করছেন নিজের ও বন্ধুদের হয়ে,[২৬] বছরের শেষে ঐ গভর্নর-জেনারেল বন্ধুর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে কর্মসূত্রে ভ্রমণ করছেন।[২৭] সম্ভবত এই সময়েই এবং যতদূর অনুমান হয় হেস্টিংসেরই নির্বন্ধে, অযোধ্যার কুখ্যাত নবাব আসফ-উদ্-দৌলার (১৭৭৫-এ নবাবত্ব, মৃত্যু ১৭৯৭) বা Nabob Vizier-এর ইংলন্ডের এজেন্টের চাকরিটি তাঁর হয়। হলহেড দেশে ফিরে কী করবেন, হেস্টিংস তারও পরিকল্পনা করছেন লখনউয়ে বসে, হলহেড তাই নিয়ে ব্যস্ত। সম্ভবতঃ ইংলন্ডেও হেস্টিংস উঁচু মহলে জানিয়ে দিয়েছেন হলহেডের দেশে ফেরার সম্ভাবনার কথা, এবং তাঁর "extraordinary abilities and past services are to be rewarded by the first vacant seat on the Board of Revenue."[২৮]—এই মর্মে তদ্বির করছেন। হেস্টিংসও উচ্ছ্বসিত হয়ে স্ত্রী মেরিয়ানকে হলহেড সম্বন্ধে লিখছেন—"I wish he was there, but I hope to precede him. His talents were always of the first Rate; but they are improved far beyond what you know them, and I shall still require them in Aid of Scott's Exertions."[২৯]

দেশে ফিরে আসফ-উদ্-দৌলার এজেন্টের কাজ করছেন হলহেড, আর 'রিভিউ'র জীবনীকারের মতে সংস্কৃত ও ফারসী গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৩০] তাঁর শরীর আর তেমন সেরে ওঠেনি। ১৭৮৬ সালে বাবা উইলিয়ামের মৃত্যু হওয়ায় পারিবারিক বিষয়কর্মেও বোধ হয় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তখন ভারতবর্ষে নানা অন্যায় ও দুর্নীতির অভিযোগ বা Impeachment-এর তোড়জোড় চলছে। হলহেড বন্ধুর পক্ষে তাঁর প্রত্যুত্তর তৈরি করবার আংশিক দায়িত্বও পেয়েছেন। গ্রিয়ারের সাক্ষ্যে জানতে পারছি যে, বেনারসের রাজা চৈত সিং সংক্রান্ত অভিযোগের প্রত্যুত্তর রচনার দায়িত্ব বর্তেছিল হলহেডের উপর। এ কাজে তাঁর অবিমিশ্র সফলতা ঘটেনি।[৩১]

কিছুদিন পরে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করার ইচ্ছা হল হলহেডের, তাই ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে তিনি লিস্টার কেন্দ্র থেকে হাউস অব কমনসের নির্বাচনে দাঁড়ালেন। এখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্যামুয়েল স্মিথ। কিছুদিন চেষ্টা ও খরচপত্র করবার পর জয়ের সম্ভাবনা কম দেখে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করলেন না, নাম প্রত্যাহার করে হ্যাম্পশায়ারের লাইমিংটন থেকে ১৭৯১-এ এম. পি. নির্বাচিত হলেন। কয়েক মাস আগেই ফরাসী বিপ্লব ঘটে গেছে। হলহেড সে-বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন, ফলে তখনকার পিট (ছোট) মন্ত্রিসভার এ সম্পর্কে নীতি তাঁর অনুমোদন পায়নি।

আরেকটি কারণে হলহেড ইংলন্ডের রাজতন্ত্র এবং পার্লামেন্টের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তাঁর পার্লামেন্টারিয়ান জীবনের শেষ পর্বে। ১৭৯৫-এর জানুয়ারি নাগাদ তিনি এক গুরুর পাল্লায় পড়েছিলেন। এই গুরুর নাম রিচার্ড ব্রাদারস।[৩২] নিরামিশাষী, নীতিগত কারণে ইংলন্ডের রাজার বেতন গ্রহণ না করে সত্যাগ্রহ করেছিলেন তিনি। ১৭৯৩ নাগাদ ইনি নিজেকে 'ঈশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র' বলে ঘোষণা করলেন। হলহেড অবশ্য সেটা ব্যাখ্যা করলেন এই বলে যে রিচার্ড আসলে ঈশ্বরের ভাই ডেভিডের বংশধর। যাই হোক, জানা গেল এই মহাপুরুষ লন্ডনের ইহুদীদের কাছে তাদের প্রিন্স বলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তারপরেই তিনি নিজেকে সমগ্র পৃথিবীরই 'প্রিন্স' রূপে ঘোষণা করলেন এবং দাবি করলেন যে, রাজা তৃতীয় জর্জকে তাঁর সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে। পৃথিবীর অধিরাজ হয়ে ইনি হলহেডকে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল অথবা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব কনট্রোলের ডিরেক্টর করে দেবেন—এইরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৩৩] এই প্রতিশ্রুতিতেই হলহেড ভুলেছিলেন, না ব্রাদারসের প্রাচ্য ধরনের ভক্তিবাদ ও মরমিয়া তত্ত্ব তাঁর প্রাচ্যমুখী চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা শক্ত। তিনি পার্লামেন্টকে ধরে বসলেন, ব্রাদারসকে হাউস অব কমন্সে ডেকে এনে তাঁর অলৌকিক জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। ৩১শে মার্চ এই মর্মে ওজস্বী বক্তৃতা করলেন পার্লামেন্টে—বয়োজ্যেষ্ঠ শুভকামী স্যর ইলাইজা ইম্পের বারণ শুনলেন না। তারপরেই রাজদ্রোহের অপরাধে ব্রাদারসকে গ্রেপ্তার করা হল। ২১ এপ্রিল হলহেড আবার পার্লামেন্টে প্রস্তাব আনলেন, ব্রাদারসের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার একটি নকল তাঁকে দিতে হবে। তাঁর ৩১শে মার্চের প্রস্তাবটির ভাগ্যে যেমন ঘটেছিল এটিরও তাই ঘটল—কোনো সমর্থক জুটল না। এর কিছু পরেই হলহেড রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন।

এই সময়টা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁকে অর্ধোন্মাদ ভাবছেন। আত্মীয়রা ভাবছেন হলহেডকে ঘরে আটকে রাখতে পারলে ভাল হয়। তবে তাঁর উপরে ব্রাদারসের সম্মোহনের আয়ু

ছিল ঐ এক বছরই। এর পরেই গুরুকে (গুরু অবশ্য তাঁর চেয়ে ছ বছরের ছোট) ত্যাগ করেন। কিন্তু এই অধ্যায়টি এসে রাজনৈতিক এবং লেখক হিসাবে হলহেডের প্রতিষ্ঠার সমাপ্তি ঘটায়। আরও পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন হলহেড, কিন্তু ১৭৯৫-এ ব্রাদারসের ওকালতি করে গোটা নয়েক পুস্তিকা ছাপিয়ে সেই যে কলম ছাড়লেন, আর তা ধরলেন না।

এই সময় থেকে তাঁর অন্য ধরনের দুর্দিনও ঘনিয়ে এল। লণ্ডনের হারলি স্ট্রীটে বাস করছেন তখন। স্বভাবত অমিতব্যয়ী হলহেড একটি হঠকারী বিনিয়োগের ফলে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। ফরাসীদেশে বিপ্লবী সরকার ১৭৯৩-এ কিছু কাগজের নোট এবং ঋণপত্র বাজারে ছাড়েন। প্রতিশ্রুতি ছিল, সরকারের বাজেয়াপ্ত করা জমি বন্ধক রেখে ঐ ঋণপত্র দেওয়া হবে, অর্থাৎ ঐ জমিই ঋণপত্রের জামিন। নেকার নামে একজনের প্ররোচনায় হলহেড তিরিশ হাজার পাউন্ড খাটিয়ে এই ফরাসী ঋণপত্রের কেনাবেচার ব্যবসা ধরলেন। বিপ্লবী সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাও চুকল, ঐ বিপুল পরিমাণ অর্থের সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি ঘটল।

নিরুপায় হলহেড দীর্ঘদিনের বন্ধু ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছেই হাত পাতলেন। হেস্টিংস তাঁকে ফেরালেন না, বন্ধুদের তিনি কখনো বিমুখ করেননি। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতার দাবিও যে ছিল তা আমরা জানি। হেস্টিংসকে যখন ইংলণ্ডের পার্লামেনটে অভিযুক্ত (Impeach) করার কথা হয় তার পিছনে অন্যতম প্রধান চক্রী ছিলেন হলহেডেরই আকৈশোর বন্ধু এবং ঘটনাচক্রে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী সেই শেরিডান। অন্যভাবে হেস্টিংসের সমর্থন ছাড়াও হলহেড তাঁকে এই কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শেরিডান তাঁর কথা রাখেননি, তাঁর ব্যবহারে দীর্ঘ সখ্যের প্রাক্তন উত্তাপের কোনো চিহ্ন ছিল না, তাতে "artificial reserve and cold arrogance"[৩৪] হলহেডকে ব্যথিত করেছিল। এই সূত্রেই শেরিডানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ছেদ ঘটে—পরে তাঁদের দেখাসাক্ষাতে হৃদ্যতার ছোঁয়া তেমন একটা থাকত না বলে শোনা যায়।

আমাদের ব্যবহৃত সূত্রগুলিতে হলহেডের শেষদিকের জীবনযাত্রারও কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। বিদ্যাভূষণ বলছেন, "১৭৯৬ সাল হইতে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত তিনি সামাজিক কোন কার্যে যোগদান করেন নাই। এমন কি, বড় একটা কাহারও সঙ্গে মেশেনও নাই।" তবে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের উৎসবে স্যার ইলাইজা ইম্পের সাসেক্স-এর বাড়িতে হেস্টিংস ও হলহেডের উপস্থিত হওয়ার খবর দেখা যায়।[৩৫] সেই বোধ হয় পুরনো বন্ধুদের শেষ সামাজিক সাক্ষাৎ। হলহেডের সাংসারিক দুর্গতি আরও বেশ কয়েক বছর চলে। ক্রমবর্ধমান বধিরতার জন্য তাঁর জীবিকার অন্বেষণ বারবার বিফল হয়। বিদ্যাভূষণ জর্জ ক্যানিং-এর কাছে ১৮০৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁর চাকরির দরখাস্ত করার কথা লিখেছেন। ক্যানিং অসামর্থ্য জানিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর তার উত্তর দেন। এই সময় তাঁর স্ত্রী এলেনার সেবা ও সাহচর্য তাঁকে অনেকখানি আশ্রয় দেয়। সন্তানহীন এই দম্পতির সংসারে পারস্পরিক নির্ভরতার ঐ মূল্যটুকু কম ছিল না। হলহেড নিজেও ভেঙে পড়েননি। রিচারড ব্রাদারস-পর্বের উন্মত্ততা দীর্ঘদিন কেটে গিয়ে তাঁর মধ্যে এখন একধরনের সহিষ্ণুতা ও নির্বেদ তৈরি হয়েছিল। অন্তত এসময়ে লেখা তাঁর একটি কবিতায় এর প্রকাশ দেখি:

"I ask not life, I ask not fame,
  I ask not gold's deceitful store;
The charm of grandeur, wealth and name,
  Thank Heaven! are charms to me no more.
To do thy will, O God, I ask,
  By faith O'er life's rough sea to swim,
With patience to work out my task,
  And leave the deep result to him."

(১৮০৬, ৩ জুলাই)

অবশেষে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংসেরই সুপারিশে ইণ্ডিয়া অফিসে একটি ভালো কাজ পেলেন। পায়ের নিচে একটু শক্ত মাটি পাওয়ামাত্র হলহেড হেস্টিংসের অর্থের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করলেন।

বিদ্যাভূষণের সংগৃহীত খবর থেকে জানতে পারি যে, ব্রাদারসের সূত্রে গুরুভাই জন রাইটকে ছাড়া ১৭৯৬ থেকে ১৮০৪-এর মধ্যে তিনি চিঠিপত্রও কম লিখতেন। ১৮০৮ থেকে সামাজিক চিঠিপত্র লেখা আবার একটু আধটু শুরু করেন, মূলত হেস্টিংস ও ইম্পেকে। শেষ দিকে প্রায় সম্পূর্ণ বধির হয়ে গিয়েছিলেন। কবিতা লিখতেন অবসর মতো, তাঁর কাগজপত্রে অনেক অমুদ্রিত

কবিতা পাওয়া গেছে। স্বনামে বেনামে অনেক সংবাদপত্রে লিখতেন হলহেড, মর্নিং ক্রনিক্‌ল-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক রচনা। তাঁর ভারতীয় পুঁথির সংগ্রহও ছিল বেশ সমৃদ্ধ।

কেমন মানুষ ছিলেন হলহেড? আবেগপ্রবণ, একটু অতিবেদনাশীল হয়ত বা। বিদ্যাভূষণ জানিয়েছেন, "কোন সামান্য কারণেই তিনি মনে বড়ই ব্যথা পাইতেন। মনে হাজার কষ্ট থাকিলেও তিনি বন্ধুদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেন।" ইলাইজা ইম্পের ছেলে হলহেড সম্বন্ধে "অসাধারণ লোক" জাতীয় প্রশংসাবাক্য ব্যবহার করেছেন, আর বলেছেন (বিদ্যাভূষণ, ৭১২ পৃষ্ঠা) "এত রকম বিষয়ের আলোচনা একসঙ্গে করিতে পারেন, (হলহেড ছাড়া) এমন লোকের সঙ্গে তাঁর আর জানাশোনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী। প্রতিভা তাঁহার যেমন উজ্জ্বল ছিল, হৃদয়ও তাঁহার তেমনই মধুর ছিল।"

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সারে-র ওয়েস্ট স্কোয়ারে বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা এই সিভিল সার্ভেন্ট ভাষাবিদের মৃত্যু হয়। পিটারশ্যাম-এ তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের সমাধিক্ষেত্রেই তাঁকেও সমাধি দেওয়া হল। আর যে-ভাষার ব্যাকরণ তিনি রচনা করে ভাষাচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলেন সেই ভাষার মানুষদের কাছে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছল ঠিক সাত মাস পরে।[৩৬]

নির্দেশিকা

১ ব্যাকরণে হলহেডের লেখা ভূমিকায় "I wished to obviate the recurrence of such erroneous opinions as may have been formed by the few Europeans who have hitherto studied the Bengalese; none of them have traced its connections with Shanscrit, and therefore I conclude their systems imperfect" (xix) ইত্যাদি কথাগুলি থেকে এমন অনুমান করা সম্ভব যে, ইংরেজ না হোক, অন্ততপক্ষে ইয়োরোপীয়দের হাতে হলহেডের আগে একাধিক বাংলা ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এরকম একটিমাত্র ব্যাকরণ বা ব্যাকরণের খসড়ারই হদিস পাওয়া গেছে, যেটি পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদরি মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও-এর। ১৭৪৩ সালে বাংলা ও পর্তুগীজ শব্দকোষ ও অভিধান—*Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez*-এর প্রথম দিকে (১-৪০ পৃষ্ঠা) মানোএল বাংলা ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্র মাত্র লিপিবদ্ধ করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন অভিধান ও শব্দকোষ সহ এই অংশটুকু আস্‌সুম্পসাঁওর 'বেঙ্গলী গ্রামার' নাম দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে প্রকাশ করেন। ব্যাকরণের ঐ সূত্রগুলি মানোএলের নিজের রচনা কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।
(দ্রষ্টব্যঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, কলকাতা, ১৯৭২, ৮০-৮১ পৃষ্ঠা)।

হলহেড এই ব্যাকরণটি দেখেছিলেন কিনা, কিংবা উপরের বাক্যগুলিতে এটির কথাই বলছেন কিনা—তা নির্দিষ্ট করে জানবার উপায় নেই। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন যে, (দ্রষ্টব্য: আলোচনা, 'দেশ', ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, ৪০৭ পৃষ্ঠা) হলহেড ডাচ ভাগ্যান্বেষী বোল্‌টসের কাছে লন্ডনে মানোএলের বই দেখে থাকবেন। এই অনুমানের যথার্থতা সম্বন্ধে ডঃ নির্মল দাশ একাধিক সংগত প্রশ্ন তুলেছেন ('দেশ', ২২ মারচ, ১৯৬৯, ৮২৪ পৃষ্ঠা)। আমাদের মতে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অনুমানের ভিত্তি দুর্বল।

তা হলে কোন্‌ ইউরোপীয়দের কথা বলছেন হলহেড এখানে? তাঁদের কোন্‌ লেখা সম্বন্ধে? দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সব প্রশ্নের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো উত্তরই এখন আমাদের হাতে নেই। মানোএলের ব্যাকরণটি তিনি দেখলেও দেখে থাকতে পারেন।

ইংরেজদের মধ্যে হলহেডই প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা। তাঁর বইয়ের সাম্প্রতিক একটি ফ্যাকসিমিলি সংস্করণে [R. C. Alston (ed.), *English Linguistics 1500-1800*, No. 138, Menston. England The Scolar Press, 1969] প্রকাশকের টীকায় তাঁর এই কৃতিত্বই প্রধানভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

২ এই প্রবন্ধটি লিখে ফেলার পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাঙ্‌লার প্রথম' প্রবন্ধটির ('ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১৩২১, ৩৮ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, পৃঃ ৭০৫—৭১৯) একটি জেরক্‌স্‌

কপি আমি হাতে পাই। তাতে হলহেডের জীবনীর কিছু-কিছু অতিরিক্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, বিহিতস্থলে সেগুলির উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে হলহেডের বংশপরিচয় সংক্রান্ত কিছু তথ্য তুলে দিই। ঠাকুরদাদা ন্যাথানিয়েল সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণ লিখছেন:

"তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম, এলিজাবেথ (Elizabeth) উইলিয়াম হটনের (William Houghton, of Reading Berks) কন্যা। ইনি আটটি সন্তান রাখিয়া ৪৩ বৎসর বয়সে (১৭? ৭ খৃঃ, ৩০ মার্চ) মরেন। ন্যাথানিয়েল হালহেড দ্বিতীয়বার যাঁহাকে বিবাহ করেন, তাঁহারও নাম এলিজাবেথ। ইনি জর্জ মেসনের (George Mason of Noke! Herefordshire) কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী। ইঁহারই গর্ভে বাঙ্লা ব্যাকরণ রচয়িতা হালহেডের পিতা উইলিয়াম হালহেডের (William Halhed of the (sic) Noke, and of Great George's Street, Westminster, etc.) জন্ম হয়। এই পুত্রটি রাখিয়া এলিজাবেথ ৪৪ বৎসর বয়সে (১৭২৯ খৃী, ১৬ অক্টোবর) ইহলোক ত্যাগ করেন।" (৭১১ পৃষ্ঠা) হলহেডের পিতা সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণের অতিরিক্ত সংবাদ: "ইনিও দুই বিবাহ করেন। তিনি ফ্রান্সেস কাসওয়ালকে (Frances Caswall) বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে (১) ন্যাথানিয়েল ব্রেসী, (২) রবার্ট উইলিয়াম ও (৩) জনের জন্ম হয়। উইলিয়াম হালহেডের দ্বিতীয় পত্নীর নাম জানিতে পারি নাই।" (ঐ)

৩ দ্রষ্টব্য, Biswas, Hari Charan Some English Orientalists in *The Calcutta Review*, No. 255, January 1909, p. 72

৪ Bohn's Classical Library সিরিজে বইটির আরেকটি মুদ্রণ হয় ১৮৫৪তে।

৫ এই মির্জা কি বাঙালী ছিলেন? জনৈক বাঙালী মুনশি মির্জা ইহতিশাম উদ্দীন অকসফোরডে জোনসের সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটান বলে তাঁর আত্মজীবনী 'শিগুর্ফ-নামা'তে লিখেছেন। দ্রষ্টব্য মুহম্মদ দরবেশ আলী খান, 'প্রথম বাঙালী ইউরোপ পর্যটক...' বাঙলা একাডেমি পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭১, ১—২৭ পৃষ্ঠা। জোনস অবশ্য হ্যারোতে থাকার সময়েই স্বাধীনভাবে হিব্রু আর আরবী শিখতে শুরু করেছিলেন। আর তার আগেই ফরাসী আর ইতালিয়ানের পাটও তিনি চুকিয়ে দিয়েছেন। দ্রষ্টব্যঃ Edgerton, Franklin, Sir William Jones, 1746-1794, in *Journal of the American Oriental Society*, 66 (1946), p. 230.

৬ শেরিডানের *The Rivals* নাটকের ঘটনাস্থল এই শহর—এ তথ্য নিশ্চয়ই অনেকের জানা।

৭ Bingham, M Sheridan : *The Track of a Comet*, London, 1972, পৃঃ ৫৯ পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত

৮ Bingham, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। মোরের জীবনী থেকে উদ্ধৃত। পৃ ৬২

৯ বিদ্যাভূষণের বিবরণেঃ "একদিন কথায় কথায় শেরিডান সম্বন্ধে কথা ওঠে। কুমারী লিনলি শেরিডানের পক্ষ সমর্থন করিয়া হালহেডকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দেন। হালহেড লিনলির বিদ্রূপপূর্ণ অপমানে মর্মাহত হন।" (৭১১ পৃষ্ঠা)

১০ Gibbs, Lewis, *Sheridan*, 1947, p. 28

১১ সাম্প্রতিক জীবনীকার বিংহাম অবশ্য বলছেন নাটিকাটি দুজনে মিলে লিখেছিলেন। এর অর্থ এখানে যা বলা হয়েছে তা হতেও বাধা নেই।

১২ Stephen, Leslie & Lee, Sidney eds. *Dictionary of National Biography*, Vol. LII. London 1790, হরিচরণ বিশ্বাস এবং এঁদের অনুসরণে সবিতা চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক', কলকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় ১৯৭২, ১০৮ পৃষ্ঠা। বিদ্যাভূষণও বলেছেন, "তিনি কুমারী লিনলির আশা ছাড়িয়া নিতান্ত মনোদুঃখে ঐ কর্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন।" (ঐ)।

১৩ দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম "হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশী", সুনীল-কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভাষা-সাহিত্য পত্র', চতুর্থ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৩, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ১৪৪ পৃঃ

১৪ বিদ্যাভূষণ কিন্তু হেস্টিংসের অপ্রকাশিত চিঠির সাক্ষ্যে বলছেন ১৭৭১-এর প্রথমেই হলহেড ভারতে চলে আসেন। পূর্বোল্লেখ, ৭১২ পৃষ্ঠা

১৫ Althrop-কে লেখা ১৮. ৮. '৭২ তারিখের চিঠি। G. Cannon সম্পাদিত *The Letters of Sir William Jones*, Vol. I, 1970, P. 117 দ্রষ্টব্য। কাইউমের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত

১৬ কাইউমের প্রবন্ধে উল্লেখিত, ১৪৫ পৃষ্ঠা

১৭ এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নাম গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। পৃ. ৩২

১৮ 'জেন্টু লজের' ভূমিকা, পৃ. ১; জোনস অবশ্য এ অনুবাদ নির্ভরযোগ্য মনে করেন নি, তাই নিজে নতুন করে হিন্দু ও মুসলিম আইনের কোষগ্রন্থ তৈরির কথা ভেবেছিলেন। Canon Garland, *Oriental Jones*, 1964, p. 126.

১৯ ঐ পৃ. ৭২-৭৩

২০ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ("বাংলা কবিতার প্রাচীনতম ইংরেজী অনুবাদ", 'দেশ', ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৭৩-৭৬ এবং তার পর্যালোচনা 'দেশ' ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, পৃ. ৪০৬-৮) একটি অনুমান করে বলেছেন, হয়তো লণ্ডনেই চার্লস বোলটসের কাছে হলহেড বাংলার প্রথম পাঠ নিতে শুরু করেছিলেন। এ অনুমানের ভিত্তি যথেষ্ট সবল নয়। নির্মলকুমার দাশ বোলটসের বাংলা জ্ঞান সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন (দ্র. 'দেশ' ২২ মারচ। ১৯৬৯, ৮২২-২৪ পৃষ্ঠা), তাতে সারবত্তা বেশী আছে বলে মনে করি। বোলটসের বাংলা বিদ্যার প্রতি হলহেডের শ্রদ্ধা ছিল,—ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তও যথেষ্ট যুক্তিসহ নয়। তাহলে ব্যাকরণের মুখবন্ধে "Mr. Bolts (who is supposed to be well-versed in this language)" এই বাক্যাংশের supposed to be কথাটির প্রয়োগ হলহেড করতেন না।

২১ কাইউমের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ১৪৬ পৃষ্ঠা

২২ কাইউম ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত হলহেডের কাগজপত্রের মধ্যে তাঁর বাংলাভাষা চর্চার প্রাথমিক আয়োজন লক্ষ্য করেছেন। এই কাগজপত্রের মধ্যে আছে একটি বাংলা-ফারসী শব্দকোষ—তাতে একশ পৃষ্ঠায় দুহাজার বাংলা শব্দ। প্রায় সবই খাঁটি বাংলা অর্থাৎ তদ্ভব শব্দ—হলহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুনশির (আমার মতে নোয়াখালি অঞ্চলের) উচ্চারণে এবং হস্তাক্ষরে ধরে রাখা। একটি হিন্দুদের জাতিবর্ণবিভাগের তালিকা; বাংলা মাসের নাম; মুসলমানদের নানা শ্রেণীর নাম, আত্মীয়স্বজন-বাচক (বেশীর ভাগই মুসলিম সমাজের) শব্দাবলী, আমিন বা গোমস্তাদের প্রতি দেয় নির্দেশাবলী; দোভাষী (বাংলা-উর্দু-ফারসী মিশ্রিত) পুথির ভাষার নমুনা; চিঠি, চুক্তিনামা, বন্ধকী দলিল ইত্যাদির নমুনা। ঐ ১৪৬-৫১ পৃষ্ঠা।

২৩ ১৭৭৮-এ দেশে ফেরবার তথ্যটি হরিচরণ বিশ্বাস দিয়েছেন ক্যালকাটা রিভিউর ঐ প্রবন্ধে (৭১ পৃষ্ঠা)। এটি সত্য বলেই মনে হয়, তাহলে ব্যাকরণটি ইংলণ্ডে পৌঁছানোর পর তাতে দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্র যুক্ত করবার রহস্যটিও পরিষ্কার হয়। হলহেড নিজেই ব্যাকরণের কপি দেশে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, ওখানেই পড়ে আরেকটি শুদ্ধিপত্র রচনা করে ওখানেই ছাপিয়ে নেন এবং দেশে অবিক্রীত অংশগুলিতে সংযোজনের জন্য পাঠিয়ে দেন। ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায় 'রিভিউ'র তথ্যটি লক্ষ্য না করায় হলহেডের দেশে ফেরা এবং দুনম্বর শুদ্ধিপত্রটি জুড়ে দেওয়ার সময় নিয়ে একটু ধাঁধায় পড়েছেন ('বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক', ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা)। তবে দ্বিতীয় শুদ্ধিপত্র সহ বইটি ১৭৭৮-এর পরে প্রকাশিত হয়ে থাকলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

ডি-এন-বি-তে ১৭৭৮-এ হলহেডের দেশে ফেরার খবর নেই। 'রিভিউ'তে সে খবরে কোনো অস্পষ্টতাও নেই। বিশ্বাস বলেছেন, "Halhed returned home in 1778 and after a stay of six years, again came to India in 1784." বিশ্বাসের সংবাদের কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র আছে ধরে নিলে অনুমান করতে হয় হলহেডের বিয়েও ১৭৭৮-এর আগেই বা অন্তত ঐ বছরেই হয়েছিল। প্রণয়জনিত মনোভঙ্গের পরে অনর্থক দশ বারো বছর অপেক্ষা করবেন বিয়ের জন্য, এমন মনে হয় না।

বিদ্যাভূষণের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে পরে বিশ্বাসের অনুমানের সুনিশ্চিত সমর্থন পাই। তাঁর কথাগুলি উদ্ধারযোগ্য: "১৭৭৮ সালের জুলাই মাসে তিনি (হলহেড) বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। পূর্ব হইতেই তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দরখাস্ত করেন যে, পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহাকে দেশে যাইতেই হইবে (হেস্টিংস ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যদের কাছে এই দরখাস্তের অনুলিপিও বিদ্যাভূষণ ৭১৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তুলে দিয়েছেন)। শরীরও খারাপ। সুতরাং তিনি অনুমতি লইয়া, কার্যে ইস্তফা দিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। ফলে, তিনি ছুটির অনুমতি লইয়া ঐ বৎসরই ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তি-লাভের জন্য কয়েক বৎসর দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। বঙ্গদেশের আব-হাওয়ায় ও পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িলেও তিনি পুনরায় ১৭৮৪ সালে কার্যে যোগদান করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ভারতের জলবায়ু তাঁহার আর সহ্য হইল না।" পূর্বোক্ত, (৭১৫ পৃষ্ঠা)

বিদ্যাভূষণ হলহেডের বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধেও নতুন কথা শুনিয়েছেন:

"হালহেড প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বিবাহ করিবেন না। কিন্তু কুমারী লিনলির.. ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া যায়। তিনি সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষে ভারতেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন।...

". ভারতে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়া তিনি চুঁচুড়ার ডাচ শাসনকর্তার কন্যা কুমারী হেলেনা লুইসা রিবোকে (Miss Helena Luisa (sic) Ribaut) বিবাহ করেন। কিছুকাল ইঁহাদের বিবাহিত জীবন বোধ হয় খুব সুখের হয় নাই। হালহেড নিজের আদর্শকে এমন করিয়া দেখিতেছিলেন যে, তাঁহার পত্নীর অক্লান্ত সেবারও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতে-ছিলেন না। পত্নী কিন্তু তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ প্রীতি লইয়া পতির সেবায় জীবন পণ করিলেন।" পৃ ৭১২

২৪ "In 1784 it was announced that he was coming back with recovered health".. Sydney C. Grier- এর এই মন্তব্যটি থেকে এরকম অনুমানই করেছি। দ্রষ্টব্য: Grier, Sydney C., (ed.) *The Letters of Warren Hastings to his wife*, 1905, P. 293. বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধে এ সংবাদ সমর্থিত হয়েছে।

২৫ ঐ, হেস্টিংসের ৩১ জানুয়ারি, ১৭৮৫ তারিখের চিঠি, পৃ ৪১৭

২৬ ঐ, ১৩ আগস্ট, ১৭৮৪-র চিঠি, পৃ ২১৭

২৭ ঐ,২০ নভেম্বর, ১৭৮৪-র চিঠি

২৮ ঐ, ২৯৩ পৃষ্ঠা

২৯ ঐ, ২০ নভেম্বর, ১৭৮৪-র চিঠি। Scott's Exertions কথাটির অর্থ হল ইংলণ্ডে হেস্টিংসের নিজের 'এজেন্ট' ক্যাপ্টেন জন স্কট্ (পরে লরড থারলো)-এর ব্যস্ত কাজকর্ম। ইমপিচমেনটের প্রস্তাব আটকানোর চেষ্টাতে স্কটকে যে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

৩০ হরিচরণ বিশ্বাসের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৭১

৩১ *The Letters of Warren Hastings, etc*. (৩০ টীকা দ্রষ্টব্য), ২৯৩ পৃষ্ঠা। পরে ক্যাপ্টেন স্কট ওরফে লরড থারলো এ নিয়ে একটু মৃদু বিদ্রূপও করেছেন দেখতে পাই—এই প্রসঙ্গে হলহেড সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে, হলহেড "was a gentleman of splendid abilities, and great information, but of too high a genius to attend minutely to the strict accuracy of his facts," and certainly better calculated to explain a prophecy, if Mr. Hastings had wanted him for such a purpose, than for a laborious investigation of the Company's records." Grier- এ উদ্ধৃত, পৃ ২৯৩

৩২ 'ব্রাদারস' পদবীমাত্র, মূলগত অর্থে ভ্রাতৃবৃন্দ নয়। এটি অনুধাবন না করে ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে (পূর্বে দ্রষ্টব্য) এ'কে 'রিচার্ড ভ্রাতৃগণ' রূপে উল্লেখ করেছেন (১০৯ পৃষ্ঠা)। এ'র জীবনী এবং হলহেডের সঙ্গে এ'র সংস্পর্শের কিছু তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য DNB, Vol. II, pp. 1350-53

৩৩ DNB, ঐ, পৃ ১৩৫১।

৩৪ হরিচরণ বিশ্বাসের Calcutta Review-র পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত। পৃ ৭২

৩৫ দ্রষ্টব্য, Davies, A. Mervyn. *Warren Hastings, Maker of British India*, 1935, p 525

৩৬ সমাচার দর্পণ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃ ১০৮

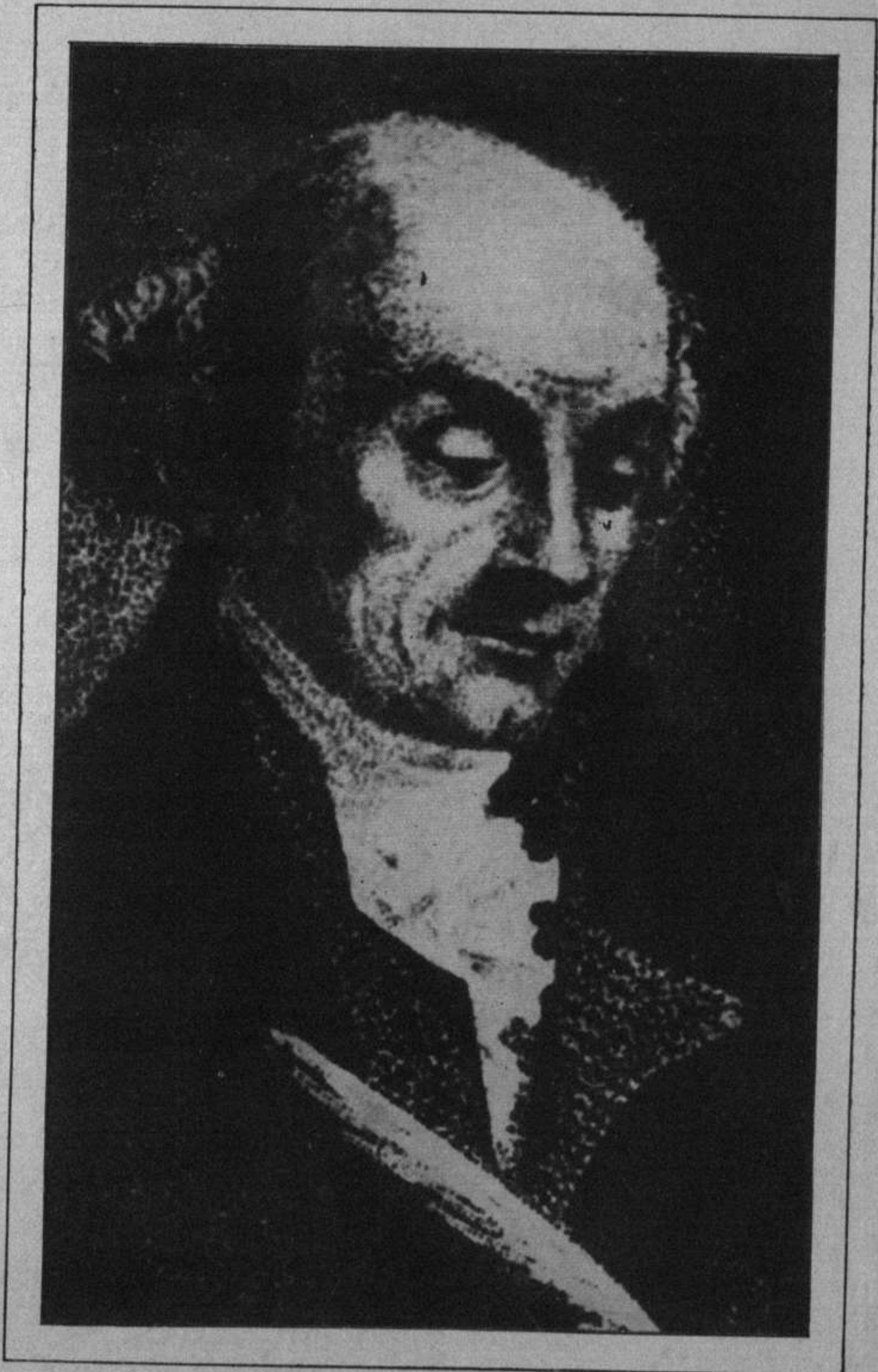

হলহেড

হলহেডের বাংলা চর্চা

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড একটি বিশিষ্ট নাম। দু'শ বছর আগে, ১৭৭৮ সালে তাঁর বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই আদি ব্যাকরণ রচনা ছাড়াও তাঁর আরও অনেক কৃতিত্ব রয়েছে, যে-কারণে তাঁকে আমরা পথিকৃতের সম্মান দিতে পারি :

ক) হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজী ভাষায় রচিত হলেও এই গ্রন্থের উদাহরণসমূহ বাংলা হরফে মুদ্রিত; তাই এ গ্রন্থ বাংলা হরফে ছাপা প্রথম পুস্তক।

খ) এই ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত ছন্দ বিষয়ক অধ্যায়টি বাংলা কবিতার ছন্দ নিয়ে লেখা প্রথম আলোচনা।

গ) স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ সালে সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সাদৃশ্য সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন, তার অনেক আগেই (১৭৭৮ খৃ) হলহেড এই তিনটি ভাষার সাদৃশ্যের কথা বলেন।

ঘ) তিনিই প্রথম একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন।

ঙ) ইংরেজ রাজত্বে হলহেডই প্রথম বাংলা ভাষা-চর্চার গুরুত্ব প্রসঙ্গে যুক্তি উত্থাপন করেন। তাঁর ব্যাকরণগ্রন্থের ভূমিকায় এ-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

হলহেডের জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি তাঁর বাংলা ব্যাকরণ। ইতিপূর্বে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানুয়েল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও সংকলিত বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ লিসবন শহর থেকে প্রকাশিত হয়। পর্তুগীজ ভাষায় রচিত এ-গ্রন্থের ভূমিকায় সংক্ষেপে বাংলা ব্যাকরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্যাকরণটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। সে কারণে বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব হলহেডেরই প্রাপ্য। বাংলা ব্যাকরণ রচনায় যে তিনি পথিকৃৎ, সে কথা হলহেড নিজেই তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—'The path which I have attempted to clear was never before trodden; it was necessary that I should make my own choice of the course to be pursued, and of the landmarks to be set up for the guidance of future travellers'. Preface p. XIX. অর্থাৎ যে পথ আমি সাফ করে যাচ্ছি তা পূর্বে আর কেউ মাড়ায়নি। আমাকে আপন নির্বাচিত পথ ধরেই চলতে হবে, যেন ভাবীকালের

পথযাত্রীদের জন্য আমি স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যেতে পারি।

পরবর্তীকালে কেরী, কীথ্, হটন প্রমুখ ইংরেজ ব্যাকরণবিদ্ বাংলা ব্যাকরণ রচনায় কমবেশী হলহেডকে অনুসরণ করেন। অন্যদিকে রামমোহন রায় ও তাঁর উত্তরসূরী বাঙালী ব্যাকরণবিদদের ব্যাকরণেও কেরী এবং কীথের ব্যাকরণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED.

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL

MDCCLXXVIII.

হলহেডের ব্যাকরণে দোষত্রুটি যেমন রয়েছে, তেমনি তাতে অনেক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতাও পরিলক্ষিত হয়। আমরা সে বিষয়ে আলোচনা না করে আপাততঃ তাঁর অন্যান্য কৃতিত্বের কথা বলছি।

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণে প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য যে ব্যাকরণটি রচিত তা ব্যাকরণের নামপত্রে মুদ্রিত 'বোধপ্রকাশং' ইত্যাদি

শ্লোকটি থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলা পড়তে সক্ষম হন, সেজন্য ব্যাকরণের প্রায় সবগুলি উদাহরণই বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়।

হলহেডের প্রথম গ্রন্থ A Code of Gentoo Laws (1776)[২]এ বাংলা বর্ণমালার একটি ব্লক মুদ্রিত হয়। ব্লকটি খোদাই করেন তাঁর সিভিলিয়ান বন্ধু চার্লস উইলকিনস। হরফগুলির এক মুদ্রাযন্ত্রে হলহেডের ব্যাকরণটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। হলহেড ও উইলকিনস দুই বন্ধু মিলে বাংলা হরফ মুদ্রণের এক অসাধ্য সাধনে ব্রতী হন। উইলকিনস একাই সে ছাপাখানার খোদাইকার (engraver), ঢালাইকার (founder) ও মুদ্রাকর (printer)। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয় প্রথম বাংলা গ্রন্থ—হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁদের এই কাজে বিশেষ উৎসাহ যোগান।[৩] তাঁরই সুপারিশক্রমে কোম্পানী এই ব্যাকরণের মুদ্রিত সমুদয় কপি কিনে নেয়। ২১৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল্য ছিল ত্রিশ টাকা এবং মোট এক হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল। হরফ তৈরির কাজে উইলকিনসের সহকারী ছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। পঞ্চানন পরবর্তীকালে কেরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর প্রেসে হরফ তৈরির দায়িত্ব পালন করেন।

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণের অষ্টম অধ্যায়ে বাংলা ছন্দ বিষয়ে একটি আলোচনা রয়েছে। আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত (পৃ ১৯৬—২০৭) হলেও বাংলা ছন্দ-চিন্তার ইতিহাসে এর গুরুত্ব কম নয়। একদিকে এটি বাংলা ছন্দের প্রথম আলোচনা, অন্যদিকে বাংলা ছন্দ বিচারে পাশ্চাত্য ছন্দ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগও এই প্রথম।

বলা হয়ে থাকে, বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ স্যার উইলিয়াম জোনস তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্গাতা। তিনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারির এক ভাষণে সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সাদৃশ্য বিচার প্রসঙ্গে এই তিনটি ভাষার মূল এক বলে উল্লেখ করেন।[৩] আমরা অনুমান করি, জোনস তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এই প্রেরণা হলহেডের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেন, 'আমি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ফারসী, আরবী এবং এমন কি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি।' ('I have been astonished to find the similitude of Shanscrit words with those of Persian and Arabic, and even of Latin and Greek…,' Preface, p. iii) তিনি এ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন শুধুমাত্র বিশেষার্থক শব্দের ক্ষেত্রেই নয়, ভাষার মূল কাঠামোর ক্ষেত্রেও। এ-প্রসঙ্গে হলহেডের আর একটি মন্তব্য হচ্ছে:

সিন্ধু অববাহিকা থেকে শুরু করে পেগু অববাহিকা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বর্তমানে বহু বিচিত্র ভাষার সন্ধান পাওয়া গেলেও সেগুলি একটি মূল ভাষা থেকে জাত।

বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য বা উৎসমূল সম্পর্কে তিনি যে ইঙ্গিত প্রদান করেন, তাঁর মতে তা ভবিষ্যৎ গবেষকদের কৌতূহল উজ্জীবিত করবে। কেরী, জোনস প্রমুখ পণ্ডিত পরবর্তীকালে এই কৌতূহলের পথ ধরেই অগ্রসর হন।

বাংলাদেশে অবস্থানকালে হলহেড বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রচুর পুথি সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম তাঁর কাছ থেকে ৯৩টি পুথি (Additional 5569—5661) কিনে নেয়। হলহেডের সংগ্রহে বাংলা পুথির সংখ্যা ১২। একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে পুথিগুলি সংগৃহীত হয়। হলহেডের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি পুথি সংগ্রহ করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মুনশিকে দিয়ে একটি পুথি-তালিকা তৈরি করান। তালিকায় সাতজন নির্বাচিত কবি ও কাব্যের নাম পাওয়া যায়:

"ইয়াদাস্ত ভাষা কবিতা বাঙ্গলা

কবির নাম	কবিতার নাম
কাসীদাস	জয়মুনি ভারত
কৃত্তিবাস	রামায়ণ
মুকুন্দ কবিকঙ্কণ	মঙ্গলচণ্ডীর গীত
ক্ষেমানন্দ	মনসার গীত
গোবিন্দ দাস	কালিকামঙ্গল
দ্বিজমাধব	কৃষ্ণমঙ্গল
ভারতচন্দ্র	অন্নদামঙ্গল।"[৪]

তালিকাভুক্ত কাব্যগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল-এর পুথি সংগৃহীত হয়। কালিকামঙ্গলের ৩টি পুথি হলহেডের সংগ্রহে পাওয়া যায়। একটির লিপিকাল ১৭৭৬ সাল।[৫] পুথিটি কালিকামঙ্গলের প্রাচীনতম তারিখযুক্ত পুথি। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই পুথির পাঠ শুধু প্রাচীনতমই নয়, বিশুদ্ধতমও।[৬]

হলহেডের প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনায় কৃতিত্বের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

এই ব্যাকরণগ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশটিও আমাদের কাছে কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তিনি যদি ব্যাকরণ না লিখে শুধু ভূমিকার বক্তব্য লিখতেন, তাহলেও আমরা তাঁকে স্মরণ করতাম। বাংলা ভাষা চর্চার সপক্ষে এই ভূমিকাটি একটি মূল্যবান সুপারিশনামা। সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা কেন শেখা দরকার এবং এ-ভাষার গুরুত্ব কতখানি, ভূমিকায় এ-সম্পর্কে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভূমিকায় তিনি প্রথমে উল্লেখ করেন যে, ইংরেজ সরকার যদি তাঁর প্রজাদের সঙ্গে বোঝা-পড়ায় আসতে চান এবং ভাব বিনিময় করতে চান, তবে তার ভাষা হবে দেশীয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষা। হলহেড এ প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের যে একটি নিজস্ব ভাষা (Native and peculiar dialect of its own) আছে, তা সে যুগে অনেকেরই অজানা ছিল। সবাই মনে করত, সমগ্র ভারতে একমাত্র হিন্দুস্থানী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার প্রচলন নেই।

হলহেড তাঁর ভূমিকার পরবর্তী অংশে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি যুক্তি পেশ করেন:

ক) 'বোর্ড অব কমার্স' ও তার অধীন বিভিন্ন কুঠির ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজ ও চিঠিপত্রের আদান প্রদান বাঙালী দোভাষীর সাহায্য ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না।

খ) আদালতের কাজে বাঙালী দোভাষী আবশ্যক। ফারসী রাষ্ট্রভাষা বিধায় সকল সরকারী বিজ্ঞপ্তি ফারসী ভাষায় প্রচারিত হলেও পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ প্রচার না করে উপায় নেই।

গ) খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে, বিচার কার্যে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনে দেশীয় ভাষার ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। 'শব্দালংকারবহুল' ফারসী ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষা অধিকতর 'সরল, যথার্থ, ও সুনিয়ন্ত্রিত', সে কারণেই সরকারী ও বেসরকারী কাজে বাংলা ভাষা বিশেষ উপযোগী '...it is much better calculated both for public and private affairs by its plainness, its precision and regularity of construction, than the flowery sentences and modulated periods of Persian.' Preface, p. xvii

ঘ) হিসাব রক্ষণের কাজে বাংলা সংখ্যা-প্রণালী বিশেষ উপযোগী।

ঙ) বাংলা বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যা অনেক এবং বানান-পদ্ধতিও কিছু জটিল; কিন্তু বাংলা ভাষা সহজেই শেখা যায়, কারণ এর ব্যাকরণ খুবই সোজা। ব্যাকরণের নিয়মগুলি সরল এবং নিয়মের ব্যতিক্রমের সংখ্যাও কম।

এ-ছাড়া হলহেড তাঁর ভূমিকার শেষ দিকে বাংলা মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্পর্কেও কিছু বলেছেন। বাংলা মুদ্রণের সপক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি হচ্ছে:

১) বাংলা মুদ্রণের প্রসার হলে ভাবের আদান-প্রদানে বিশেষ সুবিধা হবে।

২) বাংলা হরফে ছাপার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে দলিল-দস্তাবেজের জালিয়াতিও লোপ পাবে।

৩) বাংলা ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রিত হলে জনসাধারণ সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবে।

হলহেডের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ ইংরেজ রাজত্বে হলহেডই প্রথম বাংলা ভাষা-চর্চার পক্ষে দাবি তুললেন। বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সম্ভাব্য সকল যুক্তিও তুলে ধরেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় তখনও আসীন ফারসী ভাষার সঙ্গে তুলনায় বাংলা ভাষাকে অধিকতর উপযোগী বলে প্রমাণ করলেন। সে কারণেই হলহেডের এই সুপারিশনামা বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলতে হয়। হলহেড বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করলেন, বাংলা হরফে প্রথম ছাপার ব্যবস্থা করলেন, এবং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক-ল্যাটিনের তুলনার কথা জোনসের অনেক আগেই সকলের গোচরীভূত করলেন; কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ববিদ হিসাবে হলহেড কোনও স্বীকৃতি পাননি। এর প্রধান কারণ, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলা ভাষার বিশেষ কোন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইউরোপের পণ্ডিতবর্গ তখন নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রস-সন্ধানে মশগুল। সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ বা অভিধান যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা 'প্রাচ্যতত্ত্ববিদ' বা Orientalist নামে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাছাড়া সরকারী নীতিতেও বৈষম্য ছিল। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হয়। জোনাথান ডানকান ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে একটি আইন পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করে পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন মাত্র পনের হাজার টাকা। কিন্তু একই গ্রন্থ ফারসীতে অনুবাদ করে চেম্বার্স সাহেব বত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও এই বৈষম্যনীতি সক্রিয় ছিল।

'ওরিয়েন্টালিস্ট' হিসাবে হলহেড কোন স্বীকৃতি না পেলেও বাংলা ভাষা চর্চার ইতিহাসে আমরা অবশ্যই তাঁর অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব।

১ *Vocabulario Em Idioma Bengalla, e Portuguez*

২ রচনাকাল ১৭৭৪-৭৫ খৃঃ। ২৭-৩-১৭৭৫ তারিখে পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে প্রেরিত হয় এবং তা ১৭৭৬-এর ১লা জানুয়ারি বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর কাছে পৌঁছায়।

৩ "It was begun and continued by my advice and even solicitation." —*Governor General's Proceedings*, Revenue Department dated 20. 2. 1778

৪ *Asiatick Researches*, Vol. I p 422

৫ ব্রিটিশ মিউজিয়াম পুথি, Additional 5660F, পত্রাংক ১৮

৬ —ঐ Additional 5660

৭ ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্রের বারমাস্যা। বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭; পৃ ১৯-৩৫

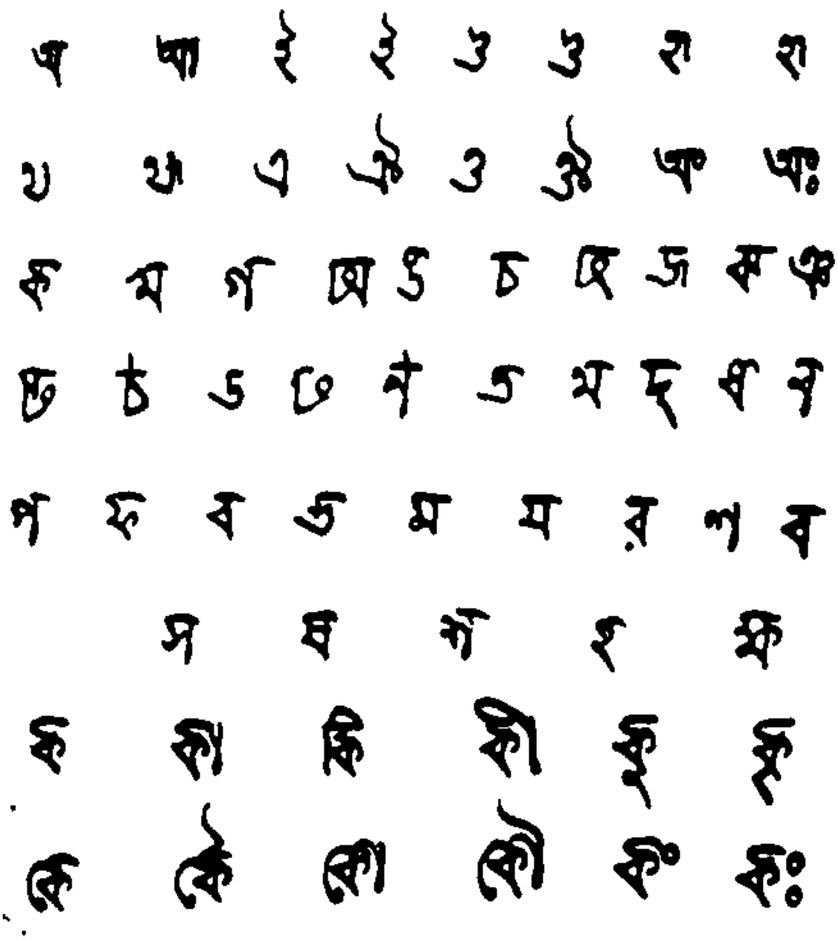

হলহেডের 'এ কোড অব জেণ্টু লজ' (১৭৭৬) ছাপা বাংলা হরফের নমুনা। ব্লক থেকে ছাপা, মুভেবল টাইপ নয়।

তিন পথিকৃৎ : উইলকিন্স-পঞ্চানন-মনোহর

নিশীথরঞ্জন রায়

অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে যখন ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানী-অধিকৃত ভারতের কর্ণধার তখন থেকে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে ভারতবর্ষ, ভারতের অধিবাসী, তাদের ধর্ম ও ভাষা, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্পর্কে দেখা গেল নতুনতর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। এদের মধ্যে একদল ভারতে এসেছিলেন নিজেদের উদ্যোগ এবং অনুসন্ধিৎসা সম্বল করে। এ'রা সংখ্যালঘু। অন্য দল এসেছিলেন অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে বেতনভুক কর্মচারীর ভূমিকা নিয়ে। কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে যাঁরা হেস্টিংসের ছত্রতলে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই সরকারী দায়-দায়িত্বের সীমানা ছাড়িয়ে নিজেদের উদ্যোগ ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেছিলেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। এ'রা অনেকেই পরবর্তী যুগে চিহ্নিত হয়েছিলেন কৃতবিদ্য পুরুষ হিসাবে। এই সংখ্যালঘু অথচ স্মরণযোগ্য গোষ্ঠীর অন্যতম চার্লস উইলকিনস। প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের ক্ষেত্রে উইলকিনসের নাম বিদ্বজ্জনমহলে আজও উচ্চারিত হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে। গভীর নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় নিয়ে ইনি শুধু সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করেননি, সমসাময়িক যুগের 'মডার্ন স্যান্স্ক্রিট' নামে পরিচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম।

উইলকিনসের জন্মকাল ১৭৪৯ সাল; জন্মস্থান সোমারসেটের অন্তঃপাতী ফ্রোম। একুশ বছর বয়সে ইংলণ্ডের তৎকালীন বহু তরুণ ও যুবার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কোম্পানীর কর্মচারী-রূপে তিনি পৌঁছেছিলেন কলকাতায়। প্রথম নিয়োগ কলকাতার সদর দপ্তরে, দু বছর পর মালদহের কুঠিতে। প্রথমে বাংলা, পরে সহকর্মী ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেডের সঙ্গে পরিচয়ের পর সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় শুরু করেন শিক্ষানবিসী। এ বিষয়ে তাঁর সাফল্য পাশ্চাত্য মহলে সৃষ্টি করেছিল সশ্রদ্ধ বিস্ময়। বিদেশাগত সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনের ক্ষেত্রে সার উইলিয়াম জোনসের মতো পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তিও উইলকিনসের কাছে অকপটে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, উইলকিনসের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা সম্ভব হত না। স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ প্রাচীন সংস্কৃত-লিপির পাঠোদ্ধার নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত করবার কৃতিত্বও উইলকিনসের প্রাপ্য। 'ভগবদ্গীতা' (১৭৮৫), 'হিতোপদেশ' (১৭৮৭), 'শকুন্তলা' আখ্যান (১৭৯৩ এবং ১৭৯৫)

অনুবাদ করা ছাড়া সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তিনি রচনা করেছিলেন কয়েকটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, যেমন: Grammatical and Lexical works : New Edition of Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary* (১৮০৬); *Grammar of the Sanskrit Language* (১৮০৮) এবং *Radicals of the Sanskrit Language from Ancient Sources* (১৮১৫)। উইলিয়ম জোনস সংগৃহীত প্রাচ্যভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপির তালিকা সংকলন (১৭৯৮) তাঁর আরও একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। 'এসিয়াটিক রিসার্চেসে' প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের মধ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকল্পে (১৭৮৪) জোনসের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে উইলকিনসের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত।

উইলকিনসের কৃতিত্ব শুধু প্রাচীন ভারতীয় তথা প্রাচ্যদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই উইলকিনস নিশ্চেষ্ট থাকেননি। সে যুগে প্রচলিত এতদ্দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। সমগ্রভাবে উইলকিনসের কর্মপ্রচেষ্টা পর্যালোচনা করে এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে প্রাচ্যের প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় জ্ঞানভাণ্ডারের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পাণ্ডুলিপির সীমিত জগৎ থেকে বৃহত্তর জনসমাজে তার উত্তরণ ঘটানো।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কেও উইলকিনস ছিলেন অকৃত্রিম আগ্রহী। ইংরেজ কোম্পানীর আদিম কর্মক্ষেত্র বলতে বোঝাত বাংলা দেশ। বণিক-বৃত্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের এই পূর্ব প্রান্তেই ঘটেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্ফুরণ। এই অবস্থায় সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই আগন্তুক সংস্কৃতিবান ইংরেজদের আগ্রহ ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে। অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্বাভাবিক পরিণতির পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। বাঙালী পাঠকের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী মানসে এতদ্দেশীয় শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল ক্রমবর্ধমান মাত্রায়। অথচ এই চাহিদা পরিতৃপ্ত করার উপাদান ছিল স্বল্প পরিমিত। হাতে লেখা পুথি এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার পক্ষে ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এর জন্য অপরিহার্য ছিল মুদ্রিত পুথির প্রচলন। এই আবশ্যিক প্রয়োজন মেটাবার তাগাদায় সে দিন যে সব কৃতবিদ্য বিদেশাগত সংস্কৃতিবান্ পুরুষ এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নাম-তালিকার শীর্ষদেশে রয়েছেন চার্লস উইলকিনস। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য মহলে আগ্রহ সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য কীর্তি; কিন্তু উইলকিনসের এই কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপকতর প্রসারকল্পে তাঁর অনলস উদ্যোগ। মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে পাণ্ডুলিপির স্বল্পায়তন ক্ষেত্র থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আবেদন তিনি প্রসারিত করেছিলেন বৃহত্তর জনমানসে।

উইলকিনসের উদ্যোগের মূলে ছিল নিছক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী গোষ্ঠী এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে এতদ্দেশীয় ভাষার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটানোই ছিল এই প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। মিশনারিরা যেমন নিজেদের ধর্ম এবং 'সুসমাচার' প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশের ভাষার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, সরকারী মহলেও তেমনই শাসনসংরক্ষণ বিষয়ের তাগাদায় এদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। উদ্দেশ্য যাই হোক এই ফলশ্রুতির গুরুত্ব ছিল সংশয়াতীত।

উইলকিনসের আগেও ইউরোপ থেকে একাধিক গ্রন্থে সে যুগের বাংলা লিপির কিছু কিছু মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া যায়।[১] এ নিদর্শনগুলির মূলে রয়েছে কাঠ থেকে খোদাই করা হাতে লেখা হরফের ব্লক। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে বাংলা লিপির সামগ্রিক কৌশল উইলকিনসের আগে আর কারও পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে উইলকিনস নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ। সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত থেকেও উইলকিনস অজানা, অচেনা ভাষা আয়ত্ত করার গুরু দায়িত্বভার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। এটি কৃতিত্বের বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে যে এ-বিষয়ে তিনি একক দৃষ্টান্ত নন। কিন্তু ভাবতে সত্যিকারের বিস্ময়বোধ হয় যে, সরকারী কাজকর্মের বাইরে অপরিচিত ভাষায় লেখা পুথিপত্র অধ্যয়ন করা ছাড়া আরও একটি দুরূহ কর্তব্য পালনের দায়িত্বও উইলকিনস গ্রহণ করেছিলেন। যে নতুন বিষয় সম্পর্কে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব তিনি বেছে নিলেন্ তার সঙ্গে পুথিগত বিদ্যার্জনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এর জন্য অপরিহার্য

ছিল প্রয়োগভিত্তিক কৌশল। ইউরোপে এতদিন ধরে ভারতীয়, বিশেষতঃ বাংলা, হরফ তৈরির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল তাতে অর্জিত হয়েছিল অত্যন্ত সীমিত সাফল্য। কাঠ খোদাই করে অ-চলনশীল ব্লকের সাহায্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য লিখন-শৈলীর ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। এই ত্রুটি দূর করার জন্য উইলকিনস পূর্ণমাত্রায় নিয়োগ করেছিলেন তাঁর ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য। শেষ পর্যন্ত ফারসী, নাগরী ও বাংলা ছাপা হরফকে মুদ্রণোচিত করার কাজে তিনি অর্জন করলেন অভূতপূর্ব সাফল্য। এর ফলে ভারতীয় মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে উন্মোচিত হল অসীম সম্ভাবনাময় এক নতুন দিগন্ত।

উইলকিনসের এই সাফল্যের প্রথম ফলশ্রুতি 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।' মুখবন্ধে উইলকিনসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে হলহেড লিখেছেন:

"The advice and even solicitation of the Governor-General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's civil service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did, and his success has exceeded every expectation. In a country so remote from all connexion with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour, with a rapidity unknown in Europe, he surmounted all obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art as well as the disadvantages of solitary experiment; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the united improvements of different projections, and the gradual polish of successive ages."

হলহেডের এই উদ্ধৃতিটির প্রতি ছত্রে বন্ধু উইলকিনসের কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুদ্রণ-শিল্পের অভিব্যক্তি সম্ভব হয়েছিল দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। সে তুলনায় বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটতে সময় লেগেছিল অপেক্ষাকৃত কম—হলহেডের এ দাবি ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত। মনে পড়ে বহুল প্রচারিত উক্তি, যা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৪শ সংস্করণের (১৯২৯) ৪৯৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে:

> "Holland has books but no documents ;
> France has documents but no books ;
> Italy has neither books nor documents ;
> Germany has both books and documtnts."

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে (১৪৫৪ খৃঃ নাগাদ) ধাতু দিয়ে তৈরি চলনশীল হরফের সাহায্যে পুঁথিপত্র মুদ্রণের কৌশল জার্মানীর আয়ত্তাধীন হলেও ফ্রান্স, ইতালী, সুইটজারল্যান্ড, হল্যান্ড, স্পেন এবং ইংলণ্ডে অনুরূপ ছাপাখানা গড়ে তুলতে লেগেছিল ১১ থেকে ২২ বছর। সে তুলনায় বাংলা ভাষার হরফগুলিকে মুদ্রণোপযোগী রূপ দিতে উইলকিনসের লেগেছিল অনেক কম সময়। ১৭৭০ থেকে ১৭৭২ কলকাতায়, তার পর মালদহ—মালদহ থেকে আবার কলকাতা-হুগলি—১৭৭৮ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই আত্মপ্রকাশ করল পরপর সাজানো ধাতু নির্মিত চলনশীল বাংলা হরফ বুকে নিয়ে হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ। এটি নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব।

বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তকটির আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার হলহেড এবং মুদ্রণ-শিল্পী উইলকিনস ছাড়া আরও একজন রাজপুরুষের নাম স্মরণযোগ্য। ইনি স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। সরকারী দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, "গভর্নর-জেনারেল নিজে উদ্যোগী হয়ে হলহেড রচিত বাংলা ব্যাকরণের একটি নমুনা বোর্ডের সভায় উপস্থিত করেছিলেন। ব্যাকরণটি ছাপার ব্যবস্থা করবেন উইলকিনস। হেস্টিংস সুপারিশ করলেন, বইটি বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভের বিশেষরূপে যোগ্য। হলহেড ও উইলকিনস অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন এবং এই নমুনাটি পেশ করবার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ তাঁদের ব্যয় করতে হয়েছে। বোর্ড এরূপ গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে একমত হলে এই অর্থ উদ্যোক্তাদের নিশ্চয়ই দিয়ে দেবেন বলে আশা করা যায়।"

এর কয়েক সপ্তাহ পর আরও একবার এই বইটির প্রকাশনের উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে গভর্নর-জেনারেল বক্তব্য রেখেছিলেন:

বর্তমান অবস্থায় কোম্পানীর পক্ষে নতুন প্রতিভার পৃষ্ঠপোষকতা করা অথবা সামাজিক মিলনের পথ প্রশস্ত করবার সহায়ক কোন শিল্প প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা তা বোর্ডের বিচার্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ধরনের কাজে উৎসাহ দেবার পক্ষপাতী। কাজটি (বাংলা ব্যাকরণের রচনা ও মুদ্রণ) আমারই পরামর্শে, এমনকি অনুরোধে, আরম্ভ করা হয়েছে এবং এখনও চলছে। অনেক ঝঞ্ঝাট ও অর্থব্যয় এ কাজের সঙ্গী। আমি সুপারিশ করছি যে, উৎসাহিত করবার জন্য ওঁদের (হলহেড ও উইলকিনস) জানিয়ে দেওয়া হোক, সরকারের অনুমোদনক্রমেই এ কাজ চলবে এবং বই ছাপা সম্পূর্ণ হলে কোম্পানী ১০০০ কপি কিনে নেবেন প্রতিটি ৩০ টাকা হিসাবে। কেউ কিনতে চাইলে ঐ দামেই কিনতে হবে।[৪]

পরবর্তী (এপ্রিল মাসের) রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উইলকিনস হলহেড-কৃত ভূমিকার চব্বিশ কপি এবং ব্যাকরণের ১০০ পৃষ্ঠা ছাপিয়ে দেবার পর নমুনাগুলি লন্ডনে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের অনুমোদনের জন্য ২৫শে এপ্রিল (১৭৭৮) পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৫]

গ্রন্থের মুখবন্ধে হলহেড বন্ধুবর উইলকিনস সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন এবং যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে সেই বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। হলহেডের উদ্ধৃতিটি মনে করিয়ে দেয় ভারতে আগন্তুক আর একজন প্রায়-সাময়িক ইংরেজ পুরুষের কথা। ইনি চিত্রশিল্পী টমাস ড্যানিয়েল। যে বছর উইলকিনস স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তার কিছুদিন আগে ড্যানিয়েল এসেছিলেন কলকাতায়। এখানে পৌঁছানোর পরেই তিনি খোদাই করতে শুরু করেন তাঁর সুবিখ্যাত রঙীন চিত্রাবলী—'টুয়েল্‌ভ ভিউস্‌ অব ক্যালকাটা'। ১৭৮৮ সালে খোদাইকরা রঙিন ছবিগুলির কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লন্ডনে শিল্পীবন্ধু ওজিয়াস হামফ্রেকে লিখলেন:

"The Lord be praised, at length I have completed my 12 views of Calcutta. The fatigue I have experienced in this undertaking has almost worn me out...you must look upon it as a *Bengalee* work. You know I was obliged to stand Painter Engraver Copper-smith Printer and Printer's Devil myself. It was a devilish undertaking but I was determined to see it through at all events."[৬]

এর পাঁচ বছর পর ১৭৯৩ সালের ২৩শে নবেম্বর কলকাতা থেকে লেখা চিঠিতে উইলিয়াম বেইলি আরও স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন:

"The native artists tho' totally incapable of taking advice themselves can copy extremely well. All Daniells' (Views of Calcutta) were stained principally by natives."[৭]

হলহেডের ভাষায় উইলকিনস যেমন একাধারে "মেটালার্জিস্ট, দ্য এনগ্রেভার, দ্য ফাউন্ডার অ্যান্ড দ্য প্রিন্টার", ড্যানিয়েলও তেমনি ছিলেন একই সঙ্গে "পেইন্টার, এনগ্রেভার, কপারস্মিথ, প্রিন্টার অ্যান্ড প্রিন্টার্স ডেভিল।"

হলহেডের লেখা আর ড্যানিয়েল-বেইলির বক্তব্যের মধ্যে একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় গুরুতর পার্থক্য। হলহেড তাঁর বিস্তৃত ভূমিকার কোথাও ভারতীয় শিল্পীদের সহযোগিতার উল্লেখ করেননি। কিন্তু ড্যানিয়েল আর বেইলি উভয়েই ভারতীয় শিল্পী অথবা কারিগরদের সহায়তার প্রতি জানিয়েছেন সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। বস্তুতঃ উইলকিনসের একক প্রচেষ্টায় ছাপার উপযোগী চেহারা নিয়ে বাংলা হরফের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত না। এ ধরনের কাজ ছিল একাধারে দুরূহ এবং দুঃসাহসী। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় হলহেড যথার্থই লিখেছেন:

"That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will readily be allowed by every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, and with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount."

এ হেন অবস্থায় খোলাখুলিভাবে ভারতীয় শিল্পী অথবা কারিগরদের সহযোগিতার উল্লেখ না থাকলেও সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যেতে পারে যে এ ধরনের অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, সময়-সাপেক্ষ, অভূতপূর্ব কর্মযজ্ঞের সাফল্যের প্রধানতম এবং অপরিহার্য শর্ত ছিল সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ প্রয়াস। বাংলা অক্ষরকে সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দেবার মাধ্যমে মুদ্রণের উপযোগী করে

সেনী দেখি সোমদত্ত ওঁচিল তখন ।
হুড়াহুড়ি মহা যুদ্ধ কৰে দুই জন ॥

তবে সেনী মহা কোপে ধৰে তার চুলে ।
দেখিয়া হইল হাস্য জত সভা জনে ॥

কেশে ধৰি চড় মাৰে বজ্রের সমানে ।
এক চড়ে দন্ত ভাঙ্গি কৰে খানে খানে ॥

তবে সভে ওঁচি দুহা নিবাৰন কৈল ।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেৰে চলিল ॥

সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান ।
তপস্যা করিতে বনে কৰিল পয়ান ॥

দ্বাদশ বৎসৰ সেই কৈল অনাহাৰে ।
এক চিত্তে সোমদত্ত সেবে মহেশ্বরে ॥

তপস্যায় বস হইল দেব দিগম্বর ।
বৃষভে চড়িয়া আইল বনের ভিতর ॥

শিব বলে বর মাগ সুনহ ৰাজন ।
এত বলি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন ॥

ধ্যান

হলহেডের 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ বিচল (মুভেবল) হরফে বাংলা ছাপার নমুনা।
চার্লস উইলকিনস এই হরফ নির্মাণ করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়।

তোলা একাধিক কারণে ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে যে সব বাংলা অক্ষরের বিচ্ছিন্ন মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়া যায়, সে সব ক্ষেত্রে কোন একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা মুদ্রণনীতি অনুসৃত হয়নি। পাণ্ডুলিপিতে যে সব হরফ ব্যবহৃত হত তাদের মধ্যেও আকৃতি বা রেখাগত কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ খুবই স্বাভাবিক—এক লেখকের হস্তাক্ষর এবং অপর লেখকের হস্তলিপির মধ্যে প্রভেদ অপরিহার্য। সুতরাং বাংলা বর্ণমালা এবং লিপিপদ্ধতির সঙ্গে যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাদের সাহায্য, কিম্বা যাদের পক্ষে কাঠ অথবা ধাতুর সাহায্যে অক্ষর নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল, তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন এক ব্যক্তি (বিশেষতঃ বাংলা ভাষা যাঁর মাতৃভাষা নয়, এবং বাংলা ভাষায় কোন পুথি রচনায় অভিজ্ঞতাও যাঁর ছিল না) মাত্র একক প্রচেষ্টায় বাংলা অক্ষরকে একটি স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ্‌ড রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন—এটা মেনে নেওয়া সহজ অথবা স্বাভাবিক নয়। এবং এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলে মনে হবে যে ড্যানিয়েলের মতো উইলকিনসও ভারতীয় শিল্পী অথবা কারিগরদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

হলহেড বা উইলকিনসের লেখায় অথবা সমসাময়িক সরকারী নথিপত্রে ভারতীয় শিল্পীদের ভূমিকার কোন উল্লেখ না থাকলেও এই প্রসঙ্গে ১৭৮৩ সালের অক্টোবর মাসে লেখা একটি চিঠিতে ভারতীয় শিল্পী মহলের সহযোগিতা অপ্রত্যক্ষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। পত্রের লেখক কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী জর্জ পেরী। লণ্ডনের মুদ্রাকর নিকলসকে একটি চিঠিতে উইলকিনসের কৃতিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে পত্রলেখক "অ্যাসিস্‌ট্যান্স অব এ পীপল হার্ডলি সিভিলাইজ্‌ড্‌" —এই কটি কথা ব্যবহার করেছেন।[৮] 'সভ্য জীবন যাপন প্রণালীর সঙ্গে প্রায়-নিঃসম্পর্কিত' এই সাহায্যকারী বলতে লেখক এখানে অত্যন্ত কৃপণভাবে ঔপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে যাঁর কথা স্মরণ করেছেন তিনি শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার।

পঞ্চানন ইতিহাসের উপেক্ষিত চরিত্র। হলহেড এবং তদীয় বন্ধু উইলকিনস উভয়েই পঞ্চানন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। তবে পরবর্তী কালের শ্রীরামপুরের পাদ্রি লেখকদের রচনায় পঞ্চানন উপেক্ষিত হননি। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক রচনায় "the very artist who has wrought with Wilkins in that work..."[৯] বর্ণনাটি উইলকিনস সহচর পঞ্চানন সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এর পর আরও কয়েক বছর এগিয়ে গেলে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জশুয়া মার্সম্যান স্বার্থহীনভাবে উইলকিনস-পঞ্চাননের যৌথ প্রয়াসকে স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন:

"A native named Panchanan, of the caste of Smiths, who had been instructed in cutting punches by Lieut. Wilkins, and had wrought at the same bench with him in cutting the Bengali fount of types."[১০]

১৮০৭ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্র-পত্রিকা এবং পুথিপত্রে ছেনিকাটা এবং ঢালাই কাজে পঞ্চাননের নৈপুণ্য লাভ করেছে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। সুতরাং হলহেড-উইলকিনস জুটির লেখায় পঞ্চাননের অনুল্লেখ তাঁর কৃতিত্বের দাবি নস্যাৎ করতে পারে না—যেহেতু সে দাবি শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাছ থেকে একাধিক ক্ষেত্রে লাভ করেছে অকপট স্বীকৃতি। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে উইলকিনস অবশ্যই বাংলা-বর্ণমালা ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ছেনিকাটা ও ঢালাই সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যাও তাঁর করায়ত্ত ছিল। কিন্তু বিভিন্নধর্মী হস্তলিপির অরণ্য থেকে বাংলা হরফগুলিকে হাতে-কলমে ছেনিকাটা ও ঢালাইয়ের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট রূপদান করার উপযোগী প্রয়োগ-বিদ্যা সফল করার কৃতিত্ব এককভাবে তিনি দাবি করতে পারেন না; নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্বের অংশীদার 'সভ্য জীবন যাপন প্রণালীর সঙ্গে প্রায় নিঃসম্পর্কিত' এতদ্দেশীয় কর্মকার পঞ্চানন। কেউ যদি উইলকিনসকে "বাঙলার ক্যাক্‌সটন"[১১] বলতে চান বলুন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ ইতিহাসের দাবি মেটাতে হলে পঞ্চাননকে বিস্মৃতি ও উপেক্ষার গর্ভ থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। 'বাঙলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' গ্রন্থের রচয়িত্রী শ্রীমতী সবিতা চট্টোপাধ্যায় এ দায়িত্ব বহুল পরিমাণে পালন করেছেন।

পঞ্চাননের পূর্বপুরুষরা হুগলি জেলার অন্তঃপাতী জিরাট-বলাগড়ের অধিবাসী ছিলেন; পরে কার্যোপলক্ষে পঞ্চানন ত্রিবেণীতে বসবাস করতে শুরু করেন। হুগলিতে তখন এণ্ড্রুজ সাহেবের ছাপাখানার কাজ চলছে। এই ছাপাখানা থেকেই উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়েছিল হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ। বইটি ছাপাতে ব্যবহৃত হয়েছিল ছেনিকাটা ঢালাইকরা চলনশীল ধাতব হরফ। এ কাজে উইলকিনসের ডান হাত পঞ্চানন। পঞ্চাননের 'মল্লিক' উপাধিধারী পূর্বপুরুষরা বৃত্তিতে ছিলেন লিপিকর। তাম্রপট কিম্বা অস্ত্রশস্ত্র অলংকরণ অথবা নামাংকন প্রভৃতি কাজে এঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরবর্তী যুগে এঁরা পরিচিত হলেন কর্মকাররূপে। ছুরি, বঁটি,

কাটারি ইত্যাদি নিয়ে ছিল তাঁদের কাজ-কারবার। কিন্তু পরিবার-ভিত্তিক এই বৃত্তির ধারা পঞ্চাননের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকেনি। ততদিনে গড়ে উঠেছে নতুন ধরনের নানা শিল্প, নতুন *নতুন শিল্পকেন্দ্র, নতুন বৃত্তি। এর ফলে জীবিকা অর্জনের নতুন সম্ভাবনা তখন উন্মোচিত হতে চলেছে।* সুতরাং পিতৃপিতামহের আচরিত বৃত্তি ত্যাগ করে পঞ্চাননের মতো অনেককেই সে যুগে শহরমুখী জীবন আর নতুন বৃত্তি বেছে নিতে দেখা গিয়েছে—এতে বিস্ময়বোধের কোন কারণ নেই। পটুয়া শিল্পী যেমন বেছে নিয়েছিলেন রাজমিস্ত্রীর বৃত্তি, কর্মকারও তেমনি দা, কাটারি, বঁটি তৈরির পরিবর্তে গ্রহণ করেছিলেন অক্ষর খোদাইকার বা ঢালাইকারের বৃত্তি। শিল্পযুগের অভ্যুত্থানের পটভূমিতে পূর্বপুরুষ আচরিত বৃত্তির পরিবর্তন নিতান্তই সাধারণ ঘটনা। যাই হোক, পঞ্চাননের এই নতুন বৃত্তি তাঁকে নিজের অজ্ঞাতসারে এনে দিয়েছিল পথিকৃতের মর্যাদা। উইলকিনসের একক প্রচেষ্টা হয়ত বা পূর্বগামী বোলটসের প্রয়াসের মতোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত যদি সহযোগী হিসাবে পঞ্চাননের সাহায্য তিনি না পেতেন। তাই উইলকিনস যদি ভারতের গুটেনবার্গ তাহলে পঞ্চানন যোহান ফুস্ট।

উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে হাতে-কলমে হরফ খোদাই এবং ঢালাইয়ের কাজে হুগলিতে পঞ্চাননের যে শিক্ষানবিসি শুরু হয় তা সম্বল করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে অদূরে ভবিষ্যতে কলকাতায় কোম্পানীর ছাপাখানার। এ ছাপাখানার সঠিক প্রতিষ্ঠা কাল জানা যায় না।[১২] ১৭৭৮ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখের সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে এই সময় উইলকিনস সরকারী দলিলপত্র, যেমন চালান, পরওয়ানা, পাট্টা, কবুলিয়ত ইত্যাদি ছাপানোর উদ্দেশ্যে কোম্পানীর উদ্যোগে একটি সরকারী ছাপাখানা স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।[১৩] এই প্রস্তাবে কোন কাজের জন্য কি ধরনের ফি ধার্য করা হবে তাও বলা হয়েছিল, যেমন: "for every quire of English impression Rs. 3/- or, if printed on both sides, Rs. 5/-. For printing in Persian or Bengali characters the charges were Rs. 5/- and Rs. 7/-."

ছাপাখানায় কর্মীদের বেতনের হার সম্পর্কে তাঁর সুপারিশ:

২	কম্পোজিটর—বাংলা ও ফারসী	মাসিক ৭৫ টাকা	হিসাবে
১	কম্পোজিটর ইংরেজী	" ১০০ টাকা	"
১	সর্টার	" ২০ টাকা	"
১	পণ্ডিত	" ৩০ টাকা	"
১	মুনশি	" ৩০ টাকা	"
৮	প্রেসম্যান	" ৭ টাকা	"
১	হ্যাণ্ড প্রেসম্যান	" ১২ টাকা	"
৪	পিওন	" ৫ টাকা	"
১	জমাদার	" ১০ টাকা	"
১	দপ্তরী	" ১৫ টাকা	"

বোর্ডের প্রথম দুটি সভায় এ প্রস্তাবের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর বোর্ড এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে একটি ছাপাখানা স্থাপন করা হোক। আপাততঃ এক বছরের জন্য এই অনুমোদন দেওয়া হল। ১৩ই নভেম্বর (১৭৭৮) কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় সম্বন্ধে যে হিসাব উইলকিনস দিয়েছেন তাও অনুমোদন করা হল। ফর্ম ইত্যাদি ছাপাবার জন্য যে মূল্য তিনি সুপারিশ করেছেন বোর্ড তা-ও অনুমোদন করলেন। উইলকিনসের মাসিক ভাতা হবে ৩৫০ টাকা; এ ছাড়া বাড়ী ভাড়া বাবদ তিনি পাবেন সমপরিমাণ অর্থ।[১৪]

এর পর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী এই ছাপাখানা যে পুরোপুরি চালু ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। পঞ্চানন এই ছাপাখানায় কাজ করতেন। উইলকিনসের সঙ্গে যোগাযোগ পঞ্চানন তথা এদেশীয় ছাপাখানার আদিপর্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রথম পর্ব রচিত হয়েছিল হুগলিতে উইলকিনস-পঞ্চানন সহযোগিতা ভিত্তি করে। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা কলকাতায়। এখানে উইলকিনস ছাড়া পঞ্চানন আরও একজন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ইনি স্বনামধন্য এইচ. টি. কোলব্রুক। উইলকিনস স্বদেশে পাড়ি দেবার পর (১৭৮৬) কোলব্রুকই ছিলেন পঞ্চাননের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক। পঞ্চানন যখন কলকাতার সরকারী ছাপাখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সময় মুদ্রণ সম্পর্কিত তাঁর নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতা উইলিয়াম কেরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পঞ্চাননের সহায়তা ছাড়া কেরীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত অর্থের বিনিময়ে বাংলা টাইপের সাহায্যে বই ছাপানো সম্ভব হত না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলের এক চিঠিতে কেরী লিখেছেন:

"We have a press and I have succeeded in procuring a sum of money

sufficient to get types cast. I have found a man who can cast them, and the person who casts for the Company's press; and I have engaged a printer in Calcutta to superintend the casting."[১৫]

পঞ্চাননের তৃতীয় ও শেষ পর্বের কর্মক্ষেত্র ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়াম কেরী ও সহচরদের আস্তানা শ্রীরামপুর। এই পর্বের মেয়াদ স্বল্পস্থায়ী হলেও এ সময়েই কেরী-পঞ্চাননের যৌথ প্রয়াসে রচিত হয়েছিল বিভিন্ন ভাষায় সর্বাধিক সংখ্যক পুথিপত্র। কেরী-পঞ্চানন পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে পঞ্চাননের মৃত্যুর সঙ্গে, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে।

পঞ্চাননের আরব্ধ কাজকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর জামাতা মনোহর (দাস) কর্মকার। পঞ্চানন ছিলেন অপুত্রক। তাঁর একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীমণির বিবাহ হয় ত্রিবেণীর বাসিন্দা মনোহরের সঙ্গে। ছেনিকাটা এবং ঢালাইয়ের কাজে পঞ্চানন যে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন বহু যত্নে এবং অধ্যবসায়ে পুত্রতুল্য জামাতা মনোহরকে তিনি সেই দুর্লভ বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। হাতে-গড়া এই শিল্পীকে নিয়েই শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সঙ্গে ছাপার কাজে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন পঞ্চানন। তাঁর নৈপুণ্যের পরিধি তখন অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। ১৭৭৮ থেকে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে সব বাংলা বই ছাপা হয়েছিল তাতে ব্যবহৃত বর্ণমালার বিভিন্নতা থেকে হরফশিল্পের ক্রমিক উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই প্রয়োগ পদ্ধতিকে উন্নততর করে তুলেছিলেন মনোহর। বাংলা ছাড়া আরও কয়েকটি দেশী ও বিদেশী ভাষা—আরবী, ফারসী, নাগরী, গুরুমুখী, মারাঠী, তেলেগু, ওড়িয়া, বর্মী, চৈনিক প্রভৃতি অন্ততঃ চৌদ্দটি বিভিন্ন ভাষার হরফ তৈরির দক্ষতা অর্জন করেছিলেন পঞ্চানন-শিষ্য মনোহর।[১৬] পঞ্চানন অনধিক চার বৎসর শ্রীরামপুর ছাপাখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পঞ্চাননের জীবদ্দশায় অর্থাৎ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মনোহর ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের ছাপাখানায় যোগদান করেন। মৃত্যুকাল (১৮৫০) পর্যন্ত এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। মিশনারিদের উদ্যোগে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে একটানা ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুরে বই ছাপানোর যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলেছিল ভারতীয়, বিশেষতঃ বাংলা গদ্য সাহিত্যের, শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে সংযোজন করেছিল এক সৃজনধর্মী মহান অধ্যায়, ভাষাচার্য এবং সাহিত্য-সাধকদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা স্মরণ করতে ভুলে যাই ছাপাখানার বিশ্বকর্মাদের অবদান, সাহিত্যসেবী ও স্রষ্টাদের স্বপ্ন ও ভাবনাকে যাঁরা চলনশীল ধাতব অক্ষরের সাহায্যে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে তুলে ধরেছিলেন মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে কাগজের বুকে কালির অর্থবহ সঙ্কেত-চিহ্ন পর পর সাজিয়ে, তাহলে ঋণভার মুক্তির আনন্দ থেকে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়ে থাকব। ইঙ্গ-ভারতীয় মহলে উইলকিনস-হলহেড যে পরিমাণ অনায়াসলব্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছেন, বাংলাভাষীদের কাছে পঞ্চানন-মনোহর তাঁদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য মর্যাদার আসনে আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি—এ কথা অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়।

নির্দেশিকা

১। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' (৩য় অধ্যায়) এবং শ্রীপান্থ রচিত 'যখন ছাপাখানা এলো' গ্রন্থে (পৃঃ ৬-৮, ৪০-৪২)।

২। "To this fount of Bengalee types, he added others in the Nagree and Persian characters; and thus completely opened the way for the ultimate diffusion of knowledge throughout India" *The Friend of India* July, 1818

৩। Extract from the *Governor-General's Proceedings in the Revenue Department* dated January 9, 1778

পূর্ণ বয়ানের জন্য পরিশিষ্ট দ্র

৪। Ibid, February 20, 1778

পরিশিষ্ট দ্র

৫। Ibid, April 28, 1778

৬। Letter to Ozias Humphrey from T. Daniell, dated November 7, 1788. Quoted by T. Sutton in *The Daniells...Artists and Travellers*, London 1954 p 21

৭। Letter from William Ballie to Ozias Humphrey, dated Calcutta November 23, 1793. Quoted by T. Sutton in *The Daniells...Artists and Travellers*, London 1954 p 21

৮। 'Mr. Wilkins is the gentleman in whose hands typography has made a rapid progress ; some years ago, when in the interior of the country, and in the midst of theckets, with no assistance but of a people hardly civilized, he made every tool necessary to forming the punches and matrices, and casting a complete fount of Bengal characters so currently united as not to leave their Junctions visible but on very minute examination; as you may see in Mr. Halhed's Bengal Grammar at Elmsley's." Letter dated 1st October 1783 from George Perry quoted in *A Biographical Dictionary of Living Authors*, 1816

৯। *Memoir Relative to the Translations*, 1807, as quoted by Geo Smith p. 181

১০। 'ক্যালকাটা খ্রীশ্চিয়ান অবজারভার', ১৮৩৪ থেকে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড, পৃ ৭৪০-এ উদ্ধৃত।

১১। *The Good Old Days of Hon'ble John Company* (প্রথম খণ্ড পৃ ২০৩) গ্রন্থে ডব্লু, এইচ, কেরী লিখেছেন: The types for the grammar (by Halhed) were prepared by the hands of Sir C. Wilkins, who by his perseverance amid many difficulties, deserves the title of Caxton of Bengal."

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে সজনীকান্ত দাস উইলকিন্স প্রসঙ্গে লিখেছেন "তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফও তৈরী করেন তাহা অনেক পরে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিনসকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।"

১২। ডঃ সুকুমার সেনের মতে "Wilkins' success encouraged the Company to start a press in Calcutta and soon Wilkins was asked to go ahead with the project. The Hon'ble Company's press was established in Calcutta but we do not know exactly when"—*Bengal Past & Present*, Vol 87. 1968, Part I.

'দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস' গ্রন্থে মার্গারিটা বার্নস জানাচ্ছেন: "A Printing Press was in operation in Madras in 1772 and in 1779 an official printing press was established at Calcutta. The latter was under the direction of Sir Charles Wilkins who became known as the father of native typography in Bengal."

১৩। Extract from G. G. Proceedings, in the Revenue Department dated 13 November, 1778

১৪। Ibid, Proceedings dated 22 December, 1778

১৫। Carey's Letter to Dr. Ryland, dated April 1, 1799 ; 'বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৯৩-এ উদ্ধৃত।

১৬। 'Panchanan's apprentice, Monohur, continued to make elegant founts of types in all Eastern languages for the mission and for sale to others *for more than forty years...*" *The Life of William Carey*, G. Smith, p. 192

মিশন প্রেসঃ শ্রীরামপুর

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামপুরে মিশনের ছাপাখানার সূচনা, বিকাশ ও সমাপ্তি,—এই তিনটি অধ্যায়ই ইতিহাসের অমোঘ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে। উপযোগিতার মানদণ্ডে শ্রীরামপুর নির্বাচিত হয়নি। পূর্ব পরিকল্পনামত কোন প্রস্তুতিও ছিল না এই শিল্প স্থাপনে। পরিস্থিতির চাপেই সেকালের ড্যানিস শহর শ্রীরামপুর বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাসে এক অসামান্য গৌরবের অধিকারী হতে পেরেছে।

বাংলা মুদ্রণের সূচনা হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে। তার বাইশ বছর পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হয় শ্রীরামপুরে মুদ্রণ শুরু। ইতিমধ্যে কলকাতায় মুদ্রণ ও হরফ ঢালাইয়ের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় প্রতিভাধর হরফ-শিল্পী পঞ্চাননের উপস্থিতি সত্ত্বেও কলকাতায় এ সময় মুদ্রণের প্রসার হয় অতি মন্থর গতিতে।[১] শ্রীরামপুরে মুদ্রণের সূচনা হয় এই বিরোধিতার মুখেই।

এখানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার পটভূমিতে আছে ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ উইলিয়াম কেরীর ভারতে আগমন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা।[২] আর্ত মানুষের দরদী বন্ধু ডঃ কেরী প্রপীড়িতদের প্রতি গভীর মমত্ববোধেই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি বাংলায় আসেন বাঙালী হয়ে বাস করতে ও খ্রীষ্টের বাণী এদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে। এই প্রচারের জন্য বাইবেলের অনুবাদ ও মুদ্রণের প্রতি আগ্রহ এদেশে আসার আগেই তাঁর মধ্যে সঞ্জাত হয়। ইংলণ্ড ত্যাগ করার কিছু আগে 'হাল এ্যাডভাইসার' পত্রিকার সম্পাদক সুদক্ষ মুদ্রণ-শিল্পী ওয়ার্ডকে বলেন, "আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ঈশ্বর যদি করুণা করেন, তবে ভবিষ্যতে তোমার মত দক্ষ মুদ্রণশিল্পীর হয়ত আমাদের প্রয়োজন হবে। আশা করি, সে সময় আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।"[৩] বাংলাভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে প্রচারিত হচ্ছে, এ স্বপ্ন কেরী তখন থেকেই দেখতে শুরু করেন। এই স্বপ্ন সঞ্চারিত হল ওয়ার্ডের অন্তরে। দরিদ্র সূত্রধরের পুত্র উইলিয়াম ওয়ার্ড ডার্বির মিঃ ড্রিউরির কাছে মুদ্রণ ও সাংবাদিকতায় পাঠ গ্রহণ করেন এবং নিজ দক্ষতায় 'ডার্বি মার্কারি' পত্রিকার সম্পাদক হন। পরে হালে এসে 'হাল এ্যাডভাইসার' পত্রিকাটির ভার নেন। সাংবাদিকতা বৃত্তির মধ্য দিয়েই তিনি সমাজসেবার অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধই তাঁকে ধর্মপ্রচারের

কাজে আকৃষ্ট করে। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটিতে যোগ দিয়ে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলায় আসেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে পদার্পণ করেই কেরীকে কঠোর জীবনসংগ্রামে ব্রতী হতে হয়। সঙ্কটের জটিলতা তাঁকে বিমূঢ় করলেও এদেশবাসীর প্রতি আন্তরিক দরদ ও খ্রীষ্টের প্রতি অবিচলিত নির্ভরতাই তাঁকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।[৫] আট নয় মাস প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরাঘুরি করবার পর উড্‌নির নীলকুঠিতে চাকরি নিয়ে কেরী সপরিবারে মালদহের নিকট মদনাবাটীতে চলে যান। এখানে তিনি পূর্ণোদ্যমে শুরু করেন বাংলা ও সংস্কৃত শেখা, বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করা, মুদ্রণের পরিকল্পনা রচনা এবং দরিদ্র ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা। অনুবাদের কাজ যত এগোয়, মুদ্রণের জন্য অধীরতাও তাঁর তত বাড়ে। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল টাকার। তাই মদনাবাটীতে আসার পর হতেই তিনি এজন্য কিছু কিছু টাকা জমাতে থাকেন। তাঁর আশা ছিল নিজের সঞ্চিত অর্থ ও ইংলণ্ডের কিছু সাহায্য দিয়ে মুদ্রণের কাজ শুরু করতে পারবেন। তিনি ৬ জানুয়ারি ১৭৯৫ বি. এম. এস.কে লেখেন: "I intend to send specimens of Bengali letters for types. A considerable part of this expence I hope to be able to bear myself."[৬]

কলকাতার টাইপ ফাউণ্ড্রির কথা সম্ভবতঃ এসময় কেরীর অজানা ছিল। সাতাশে জানুয়ারি রাইল্যাণ্ডকে তিনি জানান: "It will be requisite for the Society to send a printing press from England, and if our lives are spared, we will repay them. We can engage native printers to perform the press and the compositor's work."[৬]

এদেশীয়দের কারিগরি কুশলতা সম্বন্ধে কেরীর যে আস্থা ছিল তা এই চিঠি থেকে বোঝা যায়। লণ্ডনের সোসাইটি কিন্তু কেরীকে উৎসাহিত করেনি। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সোসাইটি জানায়: "We anticipate the pleasure of hearing that the natives of Bengal can read the scriptures in their own tongue; but though we wish you to labour in translating, we would not advise you to be too hasty in printing. As you proceed, you will perceive many errors in your early production."[৭]

কেরীর সঙ্গী জন টমাসের উৎসাহ কেরীর থেকে কম ছিল না। ১৭৯৬-এর জানুয়ারি মাসে তিনি লেখেন, "আমার সঙ্গতি থাকলে আমি দশ লক্ষ পাউণ্ড দিতাম বাংলা বাইবেলের জন্য।"[৮] সোসাইটি কেরীকে ছোট প্রচার পুস্তিকা ছাপাবার উপদেশ দিয়ে বলে, "Let us suggest to print some little abstract of scripture history and doctrine."[৯]

সোসাইটির অনুৎসাহে কেরী দমেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে তিনি হতাশ হয়ে যান। শিশুপুত্রের মৃত্যু ও স্ত্রীর মানসিক রোগ তাঁর পারিবারিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে বেদনার কালো ছায়ায়; মুনশি রামরাম বসুকে পরিত্যাগ করতে হয়; নীলচাষে হয় প্রভূত ক্ষতি; নীলকুঠিতে কাজ করায় ইংলণ্ডে হয় বিরূপ সমালোচনা,—এইসব ঘটনায় কেরীর জীবনে আসে গভীর হতাশা, যার সুর আমরা পাই ১৭৯৬-এ লেখা কেরীর একটি চিঠিতে, "বাইবেল মুদ্রণের ব্যাপারে আমাদের আশা ছিল বোধ হয় অত্যধিক। সমস্ত চেষ্টাই এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আমার মনে হয় বাইবেল মুদ্রণ ও যুবকদের শিক্ষাদানের জন্য বার্ষিক ১০০ পাউণ্ড পাঠানো উচিত। তাছাড়া আরও মিশনারি এখানে পাঠানো দরকার কেন না খুব শীঘ্রই আমরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি।"[১০] এই সময়ে লেখা আর একটি চিঠিতে কিন্তু দেখতে পাই তাঁর গভীর আগ্রহ ও আশা। তিনি লেখেন, "খুব তাড়াতাড়ি বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করা দরকার। এদেশে প্রেস, হরফ, মুদ্রক সবাই আছে।"[১১] ইতিমধ্যে কেরী উইলকিনসের সাফল্যের সংবাদ পেয়েছেন।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে জন ফাউন্টেন এলেন কেরীকে সাহায্য করতে। কেরী তাঁকে মাসিক ত্রিশ টাকা মাসোহারায় নিজের সহকারী নিযুক্ত করেন। ফাউন্টেন ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ওকহামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে আসার আগে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন।[১২] ফাউন্টেন খুব অল্প দিন বাঁচেন, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি কর্মদক্ষতা ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনে কেরীকে অভিভূত করেন। বিদ্যালয় পরিচালনা এবং বাইবেল অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথম মুদ্রিত বাইবেলের কিছু অংশ ফাউন্টেনের অনুবাদ। মুদ্রণ সম্বন্ধে কেরীর উৎসাহ বেড়ে গেলেও কাজ খুব বেশী অগ্রসর হয় না। অত্যধিক দামের জন্য তাঁকে ইংলণ্ড থেকে হরফ আনার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল। এই সময় খবর পেলেন কলকাতায় ৫০০ পাউণ্ডে প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ পাবেন।[১৩] এখন দরকার একটি প্রেস ও মুদ্রকের। কিন্তু ১৭৯৮-এর আগে প্রেস যোগাড় হল না। এই সময়ের মধ্যে অনুবাদের কাজ তিনি ফাউন্টেনের সাহায্যে

সম্পূর্ণ করেন। রাইল্যাণ্ডকে লেখা ফাউণ্টেনের একটি চিঠিতে এর বিবরণ পাওয়া যায়: "While brother Carey has been translating I sat by him and noted down the changes we have favoured or judged further to introduce in certain pages, and the observations that we made at that time."[১৩]

ফাউণ্টেনের চিঠিগুলি থেকে বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় এবং এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমতও কিছু কিছু জানা যায়। যেমন, দেশীয় নামের উচ্চারণ ও বানান তিনি দেশীয় রীতিতে করা উচিত বলে মনে করতেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, মালদা না বলে বলা উচিত মালদহ। কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন এতে দেশের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকবে।[১৪] ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এম. এস. কেরীর আবেদনে সাড়া দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন: "Carey's translation of New Testament be printed without delay Paper be sent from England for that purpose as soon as possible. Expressed gratitude to Edinburgh Mission Society for granting £200 towaıds the printing ot the New Testament in Bengali."[১৫]

এই সিদ্ধান্ত কেরীর মনের জোর বাড়িয়ে দেয় এবং লেখেন, "হরফ এখানে ঢালাই করানো যাবে এবং প্রেসের যন্ত্রপাতিও এখানে তৈরি হওয়া সম্ভব।"[১৭] ইংলন্ড হতে কোন কিছু আনার অত্যধিক খরচ এড়াবার জন্য কেরী দেশীয় জিনিসের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তা ছাড়া দেশীয় জিনিসের উৎকর্ষের উপর তাঁর আস্থা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় কেরী উড্‌নিব কাছ থেকে একটি কাঠের প্রেস উপহার পান। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটীতে এলে কেরী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। ১৭৯৯-এর গোড়ায় কলকাতায় হরফের অর্ডার দিতে গিয়ে হরফশিল্পী পঞ্চাননের পরিচয় পান এবং তাঁর কাজের নমুনা দেখে খুবই আশান্বিত হন।[১৮]

উইলিয়াম কেরী

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

উড্‌নি এ-সময় নীলের কারখানা তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে কেরী পড়েন মহাসমস্যায়। মুদ্রণের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, এ সময় পরিচিত স্থান ও নির্দিষ্ট আয় হতে বঞ্চিত হলে সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে, এই চিন্তা করে নিজের সঞ্চিত টাকায় মদনাবাটীর নিকট খিদিরপুর গ্রামে একটি ছোট নীলকুঠি কেনেন এবং ঠিক করেন উড্‌নির চাকরি শেষ হলে তিনি প্রেসসমেত খিদিরপুরে চলে যাবেন। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে টাইপ এসে পৌঁছলে দেশীয় কর্মী সংগ্রহ করে ফাউণ্টেন চেষ্টা করেন মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করতে। কেরী ব্যস্ত হন একজন সুদক্ষ মুদ্রকের সন্ধানে। এমন সময় কেরীর কাছে খবর আসে তাঁকে সাহায্য করার জন্য বি. এম. এস. আরও চারজন মিশনারি পাঠিয়েছেন। খিদিরপুরে কেরী তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করেন এবং প্রেস সমেত

স্থানান্তরণের আয়োজন করতে থাকেন। বাংলার এই অখ্যাত পল্লীতে যখন বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রণ হবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ, তখন ভাগ্যের নির্দেশে স্থান পরিবর্তন করতে হয়। ফলে প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের জন্মস্থান হবার গৌরব হতে মদনাবাটী হল বঞ্চিত এবং মুদ্রণশিল্পের আসরে শ্রীরামপুরের আবির্ভাব হল আকস্মিকভাবে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে নামতে না পেরে ওয়ার্ড, মার্শম্যান, গ্রান্ট ও ব্রান্সডনের মিশনারি দলটি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে আশ্রয় নেন। ড্যানিস গভর্নরের সাহায্যে কেরীর কাছে যাবেন, এই ছিল তাঁদের আশা। শ্রীরামপুরে এসে ওঠার কারণ কোম্পানীর রাজত্বের বাইরে শ্রীরামপুর ছাড়া আর কোন নিরাপদ স্থান ছিল না। তখন ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে ডেনমার্কের কোন যোগ না থাকায় দিনেমার জাহাজ ও শ্রীরামপুর বন্দর সব ব্যবসায়ীই নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারতেন। সে জন্য দিনেমারদের অবস্থা তখন খুব সুবিধাজনক। মিশনারিরা সেই সুযোগেই এখানে আসেন।[১৯] শ্রীরামপুরের গভর্নর কর্নেল বাই তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের আশ্বাস দেন, কিন্তু এ জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। বাই-এর পরামর্শে মিশনারিরা শ্রীরামপুরে থাকেন, কেবল ওয়ার্ড যান কেরীকে তাঁদের সংবাদ দিতে। ইংরেজ কোম্পানী তখন খুব বেশী মিশনবিরোধী এবং প্রেস সম্বন্ধেও তাদের মনোভাব ছিল কঠোর। কেরী বুঝলেন এই কোম্পানীর রাজ্যে প্রেস ও মিশন কোনটাই স্থাপন করা যাবে না, অপরপক্ষে শ্রীরামপুরের গভর্নর আশ্বাস দিয়েছেন সবরকমের আশ্বাস ও সহযোগিতার। তখন কেরী খিদিরপুর ছেড়ে শ্রীরামপুরে যাওয়াই স্থির করলেন। আঠারো শতকের বিদায়ক্ষণে তিনি প্রেস নিয়ে মদনাবাটী ত্যাগ করেন শ্রীরামপুরে মিশনারি বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

কেরী শ্রীরামপুরে পৌঁছান ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি। ঐদিনই তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ, চিকিৎসা ও অনুবাদের দায়িত্ব নেন দলনেতা কেরী, মুদ্রণের ভার ওয়ার্ডের ওপর পড়ে। মার্শম্যান নেন বিদ্যালয় পরিচালনার ভার এবং ফাউন্টেনের উপর দেওয়া হয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব। ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য ঠিক হয় সকলে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করবেন ও উপার্জন করবেন মিশনের জন্য, নিজেদের জন্য নয়। গোড়ায় সমস্যা ছিল খুব বেশী। সকলের আশ্রয়ের জন্য নিজেদের অর্থ ও ধার করে একটি বড় বাড়ী কেনা হয়। তখন কেউ আয় করেন না, অথচ ঠিক করেছেন নিজেদের খরচ নিজেরা চালাবেন। কেরী এ-ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং ওয়ার্ডকে পেয়ে তিনি মুদ্রণশিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালাবার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে মুদ্রণ মিশনের আয়ের একটি উৎস হয়। সদ্যক্রীত বাড়ীর একটি ঘরে প্রেস স্থাপন করে ওয়ার্ড তাড়াতাড়ি মুদ্রণের কাজ শুরু করে দেন। ব্রান্সডন ও কেরীর পুত্র ফেলিক্স তাঁর সহকারী হন। মুদ্রণকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু করার আর একটি কারণ হল যারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে তাদের কাজ দেবার সুযোগ সৃষ্টি করা। অভিজ্ঞতা হতে কেরী বুঝেছিলেন ধর্মান্তরিতদের জন্য উপার্জনের ব্যবস্থা না করলে ধর্মান্তরণের কাজ সফল হবে না। দেশীয় খ্রীষ্টানদের একটি কলোনী গড়ার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল।

নির্দিষ্ট ঘরে প্রেস স্থাপিত হলে কয়েকদিনের মধ্যেই হরফ সাজানোর কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। একটিমাত্র পুরানো মডেলের প্রেস থাকায় একসঙ্গে শুধু এক পাতা ছাপা হতে থাকে। তাছাড়া হরফের অপ্রতুলতাও দ্রুত কাজ করার পথে অন্তরায় ছিল। ওয়ার্ড নিজের হাতেই কম্পোজ করতেন। প্রথম ছাপেন নিজেদের একটি কার্ড, তারপর ডেক্সটার কোম্পানীর বিল আর সেই সঙ্গে সেন্ট ম্যাথুর বাংলা অনুবাদের এক পৃষ্ঠা।[২০] এগুলি ছাপা হয় মার্চের মধ্যেই। প্রেস প্রথম হতেই মিশনের আয়ের উৎস হয়। যে মাসে মার্শম্যান পরিবার বোর্ডিং স্কুল খোলায় এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দিলে মিশনের আর্থিক অসাচ্ছল্য দূর হয়। প্রেসের কাজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১লা অগাস্টের জার্নালে ওয়ার্ড লিখেছেন, "Mr. B of Calcutta has this day ordered 600 spelling books which we printed."[২১] সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট মুদ্রিত হবার পূর্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্টে মুদ্রিত কিছু অংশ প্রকাশ করে বিতরণ করা হয়।[২২] সেজন্য বাইবেলের প্রকাশ সাল বলা হয় ১৮০০। প্রেসের কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় কর্মীদের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ওয়ার্ডের জার্নাল থেকে জানা যায় ১৮০০-র অগাস্টে এই প্রেসে একজন কম্পোজিটর, পাঁচজন মুদ্রণকর্মী, একজন ফোল্ডার ও একজন বাইণ্ডার নিযুক্ত হয়। এই সময় ছাপার হার ছিল প্রতি সপ্তাহে তিনটি অর্ধ পৃষ্ঠার দু' হাজার কপি। মুদ্রণের অগ্রগতি সম্বন্ধে ওয়ার্ডের জার্নালে পাওয়া যায় (১৫ অগাস্ট ১৮০০): "Mathew, Mark and a great part of Luke are printed off and utmost diligence is employed in completing the whole New Testament. By end of May 1801, we hope to have it published. It was advisable to print

2000 copies of N. T., and also 500 additional copies of Mathew for immediate distribution. They are now distributing, together with some evangelical hymns. It was written by Ram Bashoo and contains 100 lines in Bengali verse."[২৪]

ছয় সাত মাসের মধ্যেই কেরী মুদ্রণের অভাবনীয় উন্নতি করতে পেরেছিলেন। কেরী ও ওয়ার্ডের শিল্প-সংগঠকের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা চেয়েছিলেন অল্প খরচে ভালো আর বেশী ছাপাতে। তাহলেই এই শিল্পের প্রসার দ্রুত হবে এবং বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল মুদ্রণের পরিকল্পনাও সফল হবে। মুদ্রণ ব্যয়কে সীমিত রাখার জন্য কেরী উপাদানসমূহ অর্থাৎ হরফ, কালি, কাগজ ইত্যাদি উৎপাদনেরও পরিকল্পনা করেন। সেই অনুযায়ী তিনি একটি টাইপ ফাউণ্ড্রি স্থাপনে উদ্যোগী হন। দক্ষ হরফশিল্পী পঞ্চানন কর্মকারকে তিনি নিয়ে আসেন। কেরী, ওয়ার্ড ও পঞ্চাননের ঐতিহাসিক মিলনে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় এই শ্রীরামপুরে।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তৎকালীন এসিয়ার শ্রেষ্ঠ টাইপ ফাউণ্ড্রিটি প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চাননের তত্ত্বাবধানে। এর গৌরবময় অধ্যায় রচনায় তাঁর জামাতা মনোহর, পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁদের হাতে তৈরি দেশীয় কারিগরদের দান অপরিমেয়। হরফ নির্মাণ-বিশেষজ্ঞ ট্যালবট বেইন্‌স্ বলেছেন, "The Baptist Mission at Serampore, under the leadership of William Carey, was very active in cutting types and printing books in various Indian languages in the early part of the nineteenth century. All these types were the work of the missionaries or of native craftsmen trained by them, with little or no technical help from England, the total represents a remarkable achievement in the history of type cutting."[২৫]

হরফ নির্মাণে শিক্ষাদানের সব কৃতিত্ব কিন্তু পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহরের। সেজন্য এই শিল্প গড়ে তোলার গৌরব দেশীয় শিল্পীদের। ইংলণ্ডের সাহায্য ছাড়াই এই শিল্প গড়ে ওঠে। ব্যয়ের স্বল্পতার দিক দিয়েও কেরীর প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। যে কোন দেশে প্রস্তুত সমমানের হরফের মূল্যের সঙ্গে এখানকার হরফের মূল্যের ছিল বিস্ময়কর পার্থক্য। মিশনের ইতিহাসে আছে, "In course of the first ten years of their labours the difference between the expense of their own foundry, and the sum which would have been required for the preparation of the founts in London fell little short of £2000."[২৬]

জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে শ্রীরামপুরের চেয়ে প্রায় সাতগুণ মূল্য বেশী পড়ত ইংলণ্ডের হরফে।[২৭] দক্ষ শিল্পী থাকায় বিভিন্ন ভাষার হরফ নির্মাণও দ্রুত হারে বাড়তে থাকে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণের প্রয়োজন মেটাতে। প্রথম দশ বছরের মধ্যেই বারো তেরোটি বিভিন্ন ভাষার হরফ নির্মিত হয়।

সততা, নির্ভরশীলতা, ব্যয়ের স্বল্পতা এবং সুমুদ্রণের জন্য এই শিল্প অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় ও সুপ্রসারিত হয়। বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণ হওয়ায় ভারতের সকল অঞ্চলে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্রেস বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্তন ও কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ওয়ার্ডের জার্নাল ১২. ৯. ১৮০০ থেকে জানতে পারি: "We are building an addition to our printing office, where we employ seventeen printers and five book-binders"[২৮]

শিল্পক্ষেত্রে এরূপ অনুপ্রবেশের জন্য মিশনারিদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। নানা চিঠি, জার্নাল ও বিবরণের মাধ্যমে এঁরা তাই শুধু বাইবেল মুদ্রণ ও প্রচার ছাড়া মুদ্রণ সম্পর্কে অন্য কিছুই লেখেননি। সেজন্য এই মুদ্রণ শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজ কোম্পানী ইতিমধ্যে কয়েকবার প্রেসটি বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় গভর্নরের দৃঢ়তায় এবং ব্রাউন, বুকানন প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছিল এই প্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কলেজের বহু বই এখান থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এই কলেজের দাক্ষিণ্যেই প্রেস প্রসারের সুযোগ পায়। অপরদিকে কেরী ঐ কলেজের পণ্ডিতদের সহায়তায় বাংলা গদ্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভারতে নবজাগরণের বীজ রোপণ করেন।

বিদেশী কাগজের দুর্মূল্যতার জন্য কেরী ও ওয়ার্ডকে প্রথম থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হয়েছে। ছাপা ভালো হত না বলে দেশীয় কাগজ ব্যবহারে ওয়ার্ড উৎসাহী ছিলেন না। তাই কাগজ উৎপাদনের সঙ্কল্পও কেরীর প্রথম থেকে ছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে তিনি সোসাইটিকে একজন কাগজ-শিল্পী পাঠাতে বলেন। কিন্তু কোন লোক না আসায় তিনি দেশীয়

প্রথায় কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন এবং সোসাইটিকে অনুরোধ করেন যন্ত্রপাতি পাঠাবার জন্য।[২৮] জশুয়া রো এর পরিচালনার ভার নেন। তিনি ইংলণ্ডের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং কিছুদিন তাঁর স্কুলে কাজ করে কারিগরি বিদ্যা অর্জন করেন।[২৯] রো ১৮০৯ থেকে কাগজ প্রস্তুত শুরু করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের একটি চিঠিতে রো জানালেন, শীঘ্রই তাঁরা পেস্টবোর্ড তৈরি করবেন।[৩০] উন্নত মানের মণ্ড এবং কীটনাশক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ওয়ার্ডের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল গবেষণা পরিচালিত হয়। এই গবেষণায় আর্সেনিক জাতীয় একটি ঔষধ প্রস্তুত হয়, যা কীটদংশন হতে কাগজকে রক্ষা করে। দেশীয় শিল্পোন্নয়নে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবর্তনের পথিকৃৎ এই মিশনারিরাই।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে শ্রীরামপুরের মুদ্রণশিল্পের জয়যাত্রা আরও সুপ্রসারিত হয়। কিন্তু এই অধ্যায়ের পটভূমিতে রয়েছে প্রেসের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড।[৩১] ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ দশ হাজার পাউণ্ড হলেও দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, হরফ প্রভৃতির বিরাট ক্ষতি অর্থ দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। দুশো ফুট দীর্ঘ প্রেসের মধ্যে আগুন ওয়ার্ডের বসার ঘর, অফিস ঘর, প্রুফরীডারদের ঘর এবং তৎসংলগ্ন বারান্দায় আবদ্ধ থাকে। সৌভাগ্যক্রমে প্রেসের সংলগ্ন ঢালাই কারখানা ও কাগজের কলে ছড়িয়ে পড়েনি। বহু পুস্তক, কাগজ, পাণ্ডুলিপি, হরফ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মূল্যবান সরঞ্জাম আগুনে পুড়ে বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুলিপির মধ্যে কেরীর বহু বছরের পরিশ্রমে তৈরি বহুভাষিক শব্দকোষের বেশীর ভাগ নষ্ট হয়। এ শব্দকোষ আর তৈরি সম্ভব হয়নি। আগুনের হাত থেকে বাঁচে পাঁচটি মুদ্রাযন্ত্র এবং চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার চার হাজার ইসপাতের পাঞ্চ ও কিছু হরফ। পুনরায় প্রেসটি দ্রুত গড়ে তুলতে এগুলি ছিল সহায়ক। এই অগ্নিকাণ্ডে মিশনের ক্ষতি হল অপূরণীয়, কিন্তু লাভ হল বিরাট পরিচিতি। সারা বিশ্ব শ্রীরামপুরের মিশনারিদের কর্মযজ্ঞের কথা জানতে পারে এই দুর্ঘটনার ফলেই। সহানুভূতিপূর্ণ দান আসতে থাকে চতুর্দিক থেকে। প্রেস গড়ে ওঠে নতুন করে। নতুন উদ্যমে কর্মধারা বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে হয় সুপ্রসারিত। বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবন সংগঠনে এই সময় নেতৃত্ব দিয়েছে শ্রীরামপুর মিশন। এ'দের সাফল্যে অনেকেই আকৃষ্ট হয়েছে মুদ্রণ-শিল্পের প্রতি। একে একে অনেক প্রেস স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়।

> বুঝিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছাড়া অপর যে একরার উভ
> য়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হইয়া থাকে ও হয় তাহাতে চলিবেক না।
> এবং তদর্থে তাহারদিগের উভয়তঃ বিরোধ জন্মিলে তাহার বিচার ও সমাধা দে
> ওয়ানী এলাকার আদালতসকলে হইবেক ইতি।

শ্রীরামপুরে মুদ্রিত (১৮২৮) 'আইন'। লাইনো ছাঁদের হরফের পূর্বাভাস

কাগজশিল্পকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টাও এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেওয়াল বেষ্টিত একটি খোলা জায়গায় ছিল এই কাগজের কলটি। চল্লিশ জন দেশীয় কর্মচারী পা দিয়ে একে চালাত। গ্রীষ্মের দুপুরে কাজ করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। একবার কর্মরত অবস্থায় একজন শ্রমিকের মৃত্যু হওয়ায় মিশনারিরা খুবই চিন্তিত হন। উইলিয়াম জোনস নামক একজন কয়লাখনি-বিশেষজ্ঞের পরামর্শে কাগজের কল চালাবার জন্য বারো অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটি স্টীম ইঞ্জিন আনান হয়। দেশী-বিদেশী বহুলোকের সামনে শিল্পক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রযুগের সূচনা হল ২৭ মার্চ ১৮২০। ভারতে এর আগে কোন শিল্পে স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়নি, যদিও কোম্পানীর সামরিক বিভাগ স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহারের চেষ্টা এর আগেই করে।[৩২] কাগজকলের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায় স্টীম ইঞ্জিন ব্যবহারের ফলে এবং কাগজের গুণগত উৎকর্ষও বৃদ্ধি পায়। এসময়ের কাগজ তৈরি সম্বন্ধে কেরী বলেছেন, "যন্ত্র দিয়ে এখন আমরা কাগজ তৈরি করি। এর জন্য কাগজের মণ্ডকে একটি তারের জালের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হয়, তারপর কয়েকটি নলের ওপর দিয়ে চালনা করা হয়, শেষেরটিকে উত্তপ্ত করা হয় বাষ্প দিয়ে। তরল অবস্থা হতে মণ্ডটি দু মিনিটেই শুকিয়ে যায় এবং ব্যবহারের উপযোগী কাগজ তৈরি হয়।" এই কাগজশিল্পের উন্নতি শ্রীরামপুরে মুদ্রণশিল্প প্রসারে বিশেষ সহায়ক ছিল। শ্রীরামপুরের কাগজ ব্যবহারোপযোগী হওয়ায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিলাতী কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিঁকে থাকে। শুধু ভারতে নয়, ভারতের

বাইরে বিভিন্ন দেশে এই কাগজ রপ্তানী করা হয়। এই শিল্পের উন্নতির জন্যও বিশেষ প্রচেষ্টা চলে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা মার্শম্যানের চিঠি হতে জানা যায়, ইংলণ্ড থেকে যেমন বিভিন্ন মানের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তেমনি সুদক্ষ প্রস্তুতকারকও নিযুক্ত করা হচ্ছে।[৩৩]

উদয়ের মত অস্তও শ্রীরামপুর মুদ্রণালয়ের বেশ বিস্ময়কর। কেরীর জীবদ্দশাতেই প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে এই প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এই পরিস্থিতির বীজ রোপিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, যখন অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে কয়েকজন তরুণ মিশনারি শ্রীরামপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে কলকাতায় সোসাইটির পৃথক কেন্দ্র খোলেন। কলকাতার এই কেন্দ্রটি লণ্ডন সোসাইটির প্রত্যক্ষ শাখা হিসাবে ধীরে ধীরে শ্রীরামপুরের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে। শ্রীরামপুরে সম্পত্তির অধিকারগত প্রশ্নে সোসাইটির সঙ্গে মিশনের মতপার্থক্য জটিল আকার ধারণ করে। এই বিরোধ হয়ত মিটে যেতে পারত, যদি না কলকাতায় পৃথক কেন্দ্র হত এবং কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিষয় এর সঙ্গে জড়িয়ে না যেত। মিশনের গৌরবময় যুগেই এই বিরোধ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কেরীর ঔদার্য, গভীর মানবপ্রেম ও এই দেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধ শ্রীরামপুর মিশনের কাজের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ কাজের বেশ কিছু প্রাধান্য ঘটিয়েছিল, যা সোসাইটির অনভিপ্রেত। তাছাড়া কেরী চেয়েছিলেন শ্রীরামপুর মিশনকে একটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে, লণ্ডন সোসাইটির একটি শাখারূপে নয়। মিশনে ভারতীয় ভাবের প্রাধান্যও অনেকে ভালো চোখে দেখেননি। তাই বিরোধিতা গড়ে ওঠা খুব অস্বাভাবিক নয়।

মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে কলকাতা মিশন কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পীয়ার্স ও লসনের মত দক্ষ মুদ্রণ ও হরফ নির্মাণশিল্পী কলকাতা কেন্দ্রে যোগ দেওয়ায়, শ্রীরামপুরের অনুরূপ একটি প্রেস ও হরফ ঢালাইখানা শীঘ্রই গড়ে ওঠে এবং অচিরেই শ্রীরামপুর প্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। কলকাতা মিশনের এই প্রেস শ্রীরামপুরের উত্তরসূরী হিসাবে সুদীর্ঘকাল ভারতীয় মুদ্রণশিল্পে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ব্যবসা বন্ধ করেছে।

নানা প্রতিকূলতার মুখে শ্রীরামপুর মিশনের অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও, কেরী মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডের হঠাৎ জীবনাবসান এই চিন্তাকে উদ্বেগে পরিণত করে। ভারতে মুদ্রণশিল্পের অন্যতম যুগপ্রবর্তক ওয়ার্ডের মৃত্যু মিশনের ইতিহাসকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। সোসাইটির সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা হয় সুদূরপরাহত। মুদ্রণশিল্পের প্রসারের সম্ভাবনাও আর থাকে না। আর্থিক দায়দায়িত্বের ভার ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় মিশনকে পড়তে হয় গভীর সঙ্কটে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজকে কেন্দ্র করে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। সোসাইটি এই কলেজ সম্পর্কে ছিল সবচেয়ে অনাগ্রহী। কেরী ও মার্শম্যান এই কলেজকেই তাঁদের কাজের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে মনে করতেন এবং এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী চিন্তিত হন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজার সনদ নিয়ে কলেজকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। এই সনদের বলে কলেজ পেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার, যা এসিয়ায় সর্বপ্রথম। কিন্তু এদিকে সোসাইটির সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা না হওয়ায় মিশন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হয়। শ্রীরামপুর মিশন তখন আত্মনির্ভরশীল সম্পূর্ণ স্বাধীন মিশন। পরিস্থিতির প্রতিকূলতা বেড়েই চলে। আর্থিক সঙ্কট দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিতে থাকে। বিদ্যালয়, কলেজ, বিভিন্ন স্থানে মিশনারি স্টেশন পরিচালনার জন্য অর্থের সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দেনার ভারে মিশনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে দিতে হয় বলে পারিবারিক ব্যয়ের মাত্রাও বেড়ে যায়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জশুয়া মার্শম্যান বাইরে থাকায় বোর্ডিং স্কুলের আয় কমে যায়, মুদ্রণশিল্পের আয়ও খুব সীমিত এই সময়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে অবসর নিলে আর্থিক সংকট আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। কলেজ ও মিশনকে রক্ষা করার জন্য কাগজের কল, ছাপাখানা ও বোর্ডিং স্কুল বিক্রয় করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। ঐ সময় মিশনের দেনার পরিমাণ ছিল ১,৩৫,৪৯১ টাকা, ৬ আনা, ৪ পাই; আর মিশনের সম্পত্তির মূল্য ছিল ১,২৬,৪৫৫ টাকা ১১ আনা ১০ পাই।[৩৪] জন মার্শম্যান মিশনের সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে কাগজের কল, ছাপাখানা ও বোর্ডিং স্কুল কিনে নেন। প্রেসের কাজ অব্যাহত রইল বটে, কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনের তাতে কোন অধিকার রইল না। পরবর্তীকালে (১৮৬৭) জন মার্শম্যান প্রেসটির সব যন্ত্রপাতি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসকে দিয়ে যান এবং কাগজের কলটিও উঠে যায়। এই সীমিত সময়ে (১৮০০-১৮৩২) মিশন প্রেসের কাজের পরিমাণ বিস্ময়কর। এই সময়ের মধ্যে এই প্রেস থেকে ৪০টি ভাষায় ২,১২,০০০ বই ছাপা হয়েছে।

১ শ্রীপান্থ রচিত 'যখন ছাপাখানা এলো' গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ আছে।
২ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন' গ্রন্থে বিস্তৃত পরিচয় আছে।
৩ Marshman, J C.: *Life and Times of Carey Marshman and Ward* vol. I p. 97
৪ Carey's *Letter to BMS* (Mss), 25 November 1793
৫ Carey to BMS: *Periodical Accounts* vol I 1795, p. 123
৬ Carey to Ryland: Ibid, p. 125
৭ BMS to Thomas and Carey : Ibid, 1795, p 151
৮ Thomas to Fuller : Ibid, 1795, p. 152
৯ BMS to Thomas and Carey : Ibid, 1796, p. 292
১০ Letter from Carey to Ryland 17th June, 1796
১১ Carey to M. H Obny : *Periodical Accounts* 1796, p. 232
১২ Wenger, E. S : *Missionary Biography* vol. I, (Mss) p. 68
১৩ Carey to BMS : *Periodical Accounts* vol. I, 1796
১৪ John Fountain to Ryland (Mss), 22 May, 1978
১৫ Ibid
১৬ *Periodical Accounts* vol I 1798, p. 416
১৭ Ibid, p. 422
১৮ Walker : *Wm. Carey*, p. 190
১৯ Mitra, L : *Danes in Bengal*, p. 34
২০ Ward's Journal (Mss.) 5 March 1800
২১ Ward's Journal : *Periodical Accounts*, vol II, 1 Aug. 1800, p 62
২২ Ibid, 15 Aug. 1800, p. 69
২৩ Ibid, 1 Aug. 1800, p. 62
২৪ Ibid, 15 Aug. 1800, p 69
২৫ Johnson : *History of the Old English letter* p. 20
২৬ Marshman, J. C : *History of Serampore Mission*, vol. I, p 30
২৭ Ward's Journal *Periodical Accounts*, vol. II, p 483
২৮ Carey to BMS (Mss), 25 sept. 1804
২৯ Wenger, E. S. : *Missionary Biography*, vol I (Mss), p. 152
৩০ Joshua Rowe to Sutcliff, 6 Jany., 1811
৩১ *Periodical Accounts*, No. XXIV, 1812, p 471
৩২ Potts, E. D : *British Baptist Missionaries in India*, p. 110
৩৩ J. C. Marshman to John Dyer, 5 Nov., 1824
৩৪ Carey to W. H. Pears, 4 July 1832

‘সাহেবদের ঠাকুর’

শিশিরকুমার দাশ

সতেরোশ আটানব্বই খ্রীষ্টাব্দে জর্জ উড্‌নি তাঁর বন্ধু উইলিয়াম কেরীকে একটি বিলাতী কাঠের মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। কেরী তখন থাকতেন মদনাবাটীতে। যখন সেই মুদ্রাযন্ত্রটি নিয়ে একটি নৌকা মদনাবাটী পৌঁছল তখন কেরী ও তাঁর সহকর্মীদের বিপুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে গ্রামবাসীরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। একটা যন্ত্রের এমন কি গৌরব থাকতে পারে যে মানুষ এমন বিহ্বল হয়ে যায়! গ্রামবাসীরা যন্ত্রটির নাম দিলে “সাহেবদের ঠাকুর।”[১]

এই ঘটনার দু বছর পরে শ্রীরামপুর মিশনের জন্ম এবং শ্রীরামপুরে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে শুধু গ্রামবাসী কেন, সেদিনের শিক্ষিত নগরবাসীও এই ঘটনাটির গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝতে পারেননি। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার বাইশ বছর আগে ছাপার জন্য বাংলা অক্ষর তৈরি হয়েছিল। হলহেডের ইংরেজীতে লেখা বাংলাভাষার ব্যাকরণে (১৭৭৮) তার প্রথম ব্যবহার। অবশ্য তারও আগে কিছু বইতে ব্লকের সাহায্যে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছিল। তার সব গুলিই বিদেশীদের লেখা এবং বিদেশে ছাপা।[২] হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হবারও বহু আগে ভারতবর্ষে ছাপা শুরু হয়েছে। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান হরফে পর্তুগীজ ভাষায় বই ছাপা হয়েছে। তার কুড়ি বছর পরে জন গেন্‌সাল্‌ভেস্‌ তামিল অক্ষর ছেপেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় অক্ষরে সেইটিই প্রথম ছাপা বই। তবু প্রিয়ল্‌কার লিখেছেন, বিষয়-বৈচিত্র্য পরিমাণ এবং গুণ সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতে হয় মুদ্রণশিল্পের যথার্থ আরম্ভ বাংলাদেশে, আর শ্রীরামপুর মিশনকেই বলতে হয় ভারতবর্ষে মুদ্রণের পথিকৃৎ।[৩]

আমাদের পুঁথিপাণ্ডুলিপির জগতে মুদ্রণের আবির্ভাব এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা করেছিল দুশ বছর আগে যদিও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আমাদের সময় লেগেছিল। যেদিন চার্লস উইলকিনসের নির্দেশে পঞ্চাননের ছেনি ছাপার জন্য বাংলা অক্ষর গড়ে তুলল সেদিন বহুদিনের একটি ধারার সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্কের অবসানের সূচনা, আর নতুন একটি ধারার আবির্ভাব হল সমাসম। এক ইংরেজ উইলকিনসের প্রশস্তি করে বলেছেন:[৪]

See patient Wilkins to the world unfold
Whate'er discovered Sanskrit relics hold,
But he performed a yet more noble part
He gave to Asia typographic art.

সন্দেহ হয় সেদিন কোন বাঙালী বিদ্বান এই নতুন শিল্পের শক্তি ও সম্ভাবনার কোন ধারণা করতে পেরেছিলেন কিনা। একটা কারণ অবশ্য এই যে হলহেডের ব্যাকরণে বাংলা অক্ষরের মুদ্রণ শুরু হলেও তার সঙ্গে বাঙালী সমাজের কোন যোগ ছিল না। বিদেশীদের জন্য বিদেশী ভাষায় লেখা বাংলা ব্যাকরণ, তার কথা যদি বাঙালীরা না জানেন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। ঐ বছরেই সরকার একটি ছাপাখানা স্থাপন করলেন। সেই ঘটনাও বাঙালীর মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। মুদ্রাযন্ত্রের গভীর গভীরতর প্রভাব শুরু হল শ্রীরামপুরে মিশনে ছাপাখানা স্থাপনের পর থেকে।

ইউরোপে মুদ্রণের প্রথম যুগে ছাপা বই আর পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। প্রথম যুগের মুদ্রকদের লক্ষ্য ছিল ছাপা বইকে পাণ্ডুলিপির কতটা নিকটবর্তী করা যায়।[৫] শিক্ষিত লোকের আগ্রহ ছিল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে এবং সংরক্ষণে। পাণ্ডুলিপিগুলিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করার জন্য, মনোরঞ্জক করার জন্য এক শ্রেণীর দক্ষ লিপিকর ছিলেন। পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ সহজসাধ্য ছিল না। ধনী ব্যক্তি ছাড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ কোনটাই অন্যরা করে উঠতে পারতেন না। সবই ছিল সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। পাণ্ডুলিপির সৌন্দর্য ছিল স্বতন্ত্র; তার মহিমাও ছিল স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি পাণ্ডুলিপিই কোন না কোন ভাবে অন্যটির থেকে পৃথক। পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করা এবং তার অলঙ্করণের কলাকৌশল ভারতবর্ষেও অত্যন্ত উচ্চমান অর্জন করেছিল। পূর্বভারতের বহু চিত্রিত পাণ্ডুলিপি তাদের অলঙ্করণের সৌষ্ঠবে এখনও আমাদের চোখ ভোলায়। ইউরোপে ছাপা বইকে সংগ্রাহকেরা সন্দেহ বা অবহেলার চোখে যে দেখতেন তার কারণ এইখানে। ছাপা বইতে নেই পাণ্ডুলিপির সৌন্দর্য, দক্ষশিল্পীর অলঙ্করণ। ছাপা বইতে আছে একটা সমতা, যে সমতা আভিজাত্যের বিরোধী। সকলেই যা সহজে সংগ্রহ করতে পারে, তার জন্য অভিজাত ধনীর কৌতূহল কম। পর্তুগীজরা যখন এদেশে এলেন তখন আকবর থেকে আরম্ভ করে শাহজাহান পর্যন্ত মুঘল সম্রাটেরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, জেসুইট্-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন অথচ ইউরোপের ছাপার কল সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তার কারণ কি এই যে ভারতবর্ষে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার জন্য দক্ষ শিল্পীর অভাব ছিল না, আর পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণের নৈপুণ্যেও ছিল তাঁদের অসাধারণ।[৬] জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ছাপার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়ত তখন আরো কঠিন ছিল, বিশেষতঃ মৌখিক শিক্ষার ধারা এমন প্রবল শক্তিশালী ছিল যে ছাপার দ্বারা তার পরিবর্তন করার কথাই তখন কেউ ভাবেননি। অলঙ্কৃত, সুদৃশ্য পাণ্ডুলিপি সংগ্রহই রাজারাজড়ার সম্মান ও প্রতিপত্তির যোগ্য। তার পরিবর্তে 'গণতান্ত্রিক' ছাপা বই স্বভাবতঃই সুলভ এবং নিম্নমানের। ইউরোপে মুদ্রক এবং লিপিকরদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম চলেছে, সংগ্রামটা মূলতঃ রুচির এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠার। শেষপর্যন্ত মুদ্রকেরা পাণ্ডুলিপির অনুকরণ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক ছাপাতেই মনোযোগী হলেন। ভারতবর্ষে মুদ্রক ও লিপিকরদের প্রতিযোগিতা কখনই তীব্রভাবে দেখা দেয়নি, তার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বিলম্ব এবং মুদ্রাযন্ত্র প্রথম ব্যবহৃত হল বিদেশীদের প্রয়োজনে। ছাপা বই যখন দেশের মানুষের জন্য প্রকাশিত হল তখন সামান্য বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল অনুমান করি। কিন্তু তার ইতিহাস আমাদের অজানা। তবে একথা বোধ হয় বলা চলে যে আমাদের দেশে, শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল এতই সীমাবদ্ধ যে লিপিকরের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব বেশী ছিল না। ছাপা শুরু হবার পর মুদ্রক ও লিপিকরের প্রতিযোগিতা তাই খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। প্রথম যুগে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তার সঙ্গে বাঙালীর সাহিত্যিক বা সমাজজীবনের যোগ খুব প্রত্যক্ষ ছিল না, ফলে ছাপার প্রভাব সম্বন্ধে তখনও বাঙালী সচেতন হয়ে ওঠেনি। বিদেশীরা যখন ছাপার ব্যবস্থা করলেন, তা করলেন তাঁদের প্রয়োজনে ও তাগিদে। হলহেডের বই 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং', বাঙালীর উপকারার্থে নয়। আর সরকার অন্য যে সব বই ছাপলেন তা মূলতঃ সরকারী নিয়মকানুনের অনুবাদ। জোনাথান ডান্‌কান, এডমন্‌স্টোন্‌ কিংবা হেনরি পিট্‌স্‌ ফরস্‌টার সরকারী আইনের অনুবাদ করেছিলেন। ফরস্‌টারের কিংবা আপ্‌জনের অভিধানও মূলতঃ বিদেশীদের জন্য। এই অভিধানগুলি অবশ্যই পরবর্তীকালে বাংলা অভিধান গঠনে সাহায্য করেছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঙালী এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। মুদ্রণের তাগিদ এসেছিল আর এক দিক থেকে। তা হল খ্রীষ্টীয় যাজকদের প্রয়োজন। যাজকেরা প্রধানতঃ যে বই বাংলায় প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা কোন ভারতীয় সাহিত্যগ্রন্থ বা শাস্ত্র নয়, তা হল বাইবেল। ছাপা অক্ষরে বাংলা গদ্য দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করছিল, একটি আইনকানুনের অনুবাদ, তার পেছনের তাগিদ শাসক সম্প্রদায়ের; আর একটি বাইবেলের অনুবাদ, তার তাগিদ খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের। আধুনিক বাংলা গদ্যের শুরুও হয়েছিল ঐ দুটি প্রয়োজনে। বাংলামুদ্রণও শুরু হল ঐ দুটি প্রয়োজনে। জাতীয় প্রয়োজনে, আত্মপ্রকাশের নতুন পথ আবিষ্কারের প্রেরণায় বাংলাদেশের মুদ্রণশিল্পের পত্তন হয়নি।

একই বছরে বাংলাদেশে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম। কলকাতায় তখনকার গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারী-দের ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া। ভারতীয় ভাষাজ্ঞান থাকলে শাসনের কাজে সুবিধা হবে। আর *শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হল একটি খ্রীষ্টীয় মিশন, যার প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার।* এই প্রচারের কাজে বিশেষভাবে দরকার ছিল ছাপাখানার। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন উইলিয়াম কেরী। শ্রীরামপুর মিশনে মার্শম্যানের আমন্ত্রণে উইলিয়াম কেরী এসে যোগ দিলেন। উইলিয়াম কেরী তখন বাইবেল ছাপানোর জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠার সাতবছর আগে, ১৭৯৩ সালে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। এই সাতবছরে তিনি বাংলা শিখেছেন, বাইবেল অনুবাদ শেষ করেছেন এবং তার ছাপার উদ্যোগ করছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর আরব্ধ কাজের পূর্ণতার সম্ভাবনা। মিশনের ছাপাখানার পত্তন আরো সহজ হল ওয়ার্ড সাহেবের সহযোগিতায়। তাঁরও ভারতবর্ষে আসার অন্যতম কারণ, একমাত্র কারণ বলা চলে, হিন্দুদের কাছে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করা। বাংলাদেশে আসার আগে ডার্বিতে ছাপাখানায় তিনি অনেকদিন কাজ করেছেন এবং সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। শ্রীরামপুর মিশনে কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডের মিলন তাঁদের প্রত্যেকেরই বহুদিন লালিত এবং বহু অভিলষিত ইচ্ছার পূর্ণতার সম্ভাবনা ঘোষণা করল। ছাপার কাজে ওয়ার্ডের ছিল অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা। সেই দক্ষতা এবং শ্রীরামপুর মিশনের শক্তি আরো বাড়ল যখন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এসে যোগ দিলেন পঞ্চানন। পঞ্চাননই প্রথম বাঙালী যিনি ছাপার জন্য অক্ষর তৈরি করতে শিখেছিলেন। তাঁকে পেয়ে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা পূর্ণতা পেল। আমৃত্যু তিনি জড়িত ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার সঙ্গে। বাংলা ছাপা অক্ষরের স্রষ্টা পঞ্চানন একজন সুযোগ্য শিষ্য সৃষ্টি করেছিলেন —তাঁর জামাতা মনোহর। মনোহরও যুক্ত ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার সঙ্গে।

শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার প্রস্তুতি, প্রতিষ্ঠা, কর্মনীতি সমস্তই একটি উদ্দেশ্যমুখী—খ্রীষ্টের বাণী প্রচার। শুধু বাংলাভাষায় নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায়, এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও অন্যান্য এসীয় অখ্রীষ্টান মানুষের মুক্তির জন্য নানা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ, খ্রীষ্ট-ধর্মের মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে রচিত নানা পুস্তিকার প্রকাশ। সেই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণেই পূর্ণ হয়েছিল, পাঁচবছরের মধ্যেই আরবী, ফারসী, নাগরী, বাংলা, গুরুমুখী, মারাঠী ওড়িয়া কানাড়ী, বর্মী, এমন কি চীনা ভাষাতে শ্রীরামপুর মিশনে ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল। শ্রীরামপুরে মিশনের ছাপার কাজ শুধু বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বহু ভাষা, বহু ধরনের অক্ষরের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশন আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিলেন উইলিয়াম কেরী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত, বাংলা এবং মারাঠীর পঠনের সঙ্গে কেরীর যোগ শুরু হয় কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে। বাংলা এবং মারাঠীর পড়ানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে কেরী অনুভব করলেন পাঠ্যপুস্তকের অভাব। তাঁর সহকর্মীদের অনুরোধ করলেন পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য। যে ধরনের পাঠ্যপুস্তক তিনি চাইছিলেন তার সঙ্গে তাঁর বাঙালী সহকর্মীদের কোন পরিচয় ছিল না। তাঁর নির্দেশে এবং সহযোগিতায় শুরু হল নতুন ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা, যার প্রথম নমুনা পাওয়া গেল রামরাম বসুর লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং তাঁর নিজের নামে প্রকাশিত দ্বিভাষিক গ্রন্থ 'কথোপকথনে'। পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, আর বইগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা হল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দেওয়ার ফলে কেরীর ধর্মপ্রচারক জীবনে যেমন একটি নতুন দিক খুলে গেল—তিনি পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা এবং পাঠ্যপুস্তক রচনার পরিকল্পক হিসাবে দেখা দিলেন—তেমনই শ্রীরাম-পুর মিশন প্রেসের কর্মধারায় আর একটি নতুন বিষয় যুক্ত হল, শুধু খ্রীষ্টীয় সাহিত্য নয়, অখ্রীষ্টীয় রচনার প্রকাশ। বাংলা মুদ্রণের আদি পর্বে এই দুই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক নির্ভরতার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। একদিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সাহায্য করেছিল নানাভাবে, বিশেষতঃ তার আর্থিক সংকটের প্রথমকালে, অন্যদিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে বাংলা পাঠ্যপুস্তক এবং সাধারণ মানুষের পড়ার উপযোগী মৌলিক এবং অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ বাড়ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। আর এই দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মধারার মধ্যে যোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন উইলিয়াম কেরী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে কেরী বাংলায় বই প্রস্তুত করার জন্য তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। সেই উৎসাহের উৎস শুধু তাঁর শিক্ষণের প্রয়োজনে নয়। তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অন্যান্য ভাষা বিভাগে, বিশেষতঃ ফারসী এবং উর্দু বিভাগের অধ্যাপকেরা পুরানো বইয়ের সম্পাদনা এবং নতুন বইয়ের

রচনার বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার-শাস্ত্র, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যে।[৭] এই সুবিশাল কর্মকাণ্ড উইলিয়াম কেরীকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। যদিও বাংলা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কোনদিনই খুব সম্মানিত ছিল না, তবু তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাতেও বিচিত্র গ্রন্থ রচনার ও প্রকাশের আয়োজন সম্ভব হয়েছিল। ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় যে সব গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রচিত হয়েছিল, সে সব গ্রন্থ নানা প্রেসে ছাপা হয়েছিল, অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আনুকূল্যের ফলভাগী হয়েছিল কলকাতার নানা ছাপাখানা, বিশেষ ক'রে গিলক্রাইস্টের হিন্দুস্থানী প্রেস এবং বাবুরামের সংস্কৃত প্রেস। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে সেই আনুকূল্য পেয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিচিত্র কর্মাভিমুখিতাকে যাঁরা সার্থক করে তুলেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন উইলিয়াম কেরী। এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যোগ কেরীর কর্মজীবনকে যেমন বিচিত্রমুখী করেছিল, সেইরকম ভাবেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কর্মকেও বহুমুখী হতে সাহায্য করেছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের এবং মিশন প্রেসের কর্মধারার বিস্তার অবশ্য শুধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে আশ্রয় করে নয়। বাংলাদেশের শিক্ষাবিস্তার তার সঙ্গে জড়িত। মিশনারিরা শ্রীরামপুরে একটি স্কুল খুললেন ১৮০০ সালেই। সেখানে দেশীয় ছেলেদের বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তার কয়েক বছরের মধ্যে নানা জায়গায় স্কুল খোলা হল। ১৮১৬ সালের মধ্যে মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত শতাধিক স্কুলে কয়েক হাজার ছাত্র হয়েছিল। মূলতঃ বাংলায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল ১৮১৭ সালে। বাংলা মুদ্রণে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ভূমিকা তাই খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, শিক্ষা বিস্তার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা গদ্যের বিকাশ সবকটি ব্যাপারের সঙ্গে জড়ানো, যেমন বাংলা গদ্যের বিকাশও অন্য সব ঘটনাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়ানো।

ইউরোপের ছাপাখানার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল চার্চ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চার্চেরই সন্তান। ১৪৭০-এ ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল বোলোন্যা এবং ইউট্রেখট-এ, ১৪৭৮-এ অক্সফোর্ডে এবং ১৪৮৪-এ হাইডেলবার্গে। আমেরিকার প্রথম বড় ছাপাখানা ১৬৩৮-এ ম্যাসাচুসেট্স কেম্ব্রিজে, যে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হারভার্ড কলেজকে আশ্রয় করে। আমাদের দেশেও যে মুদ্রণের বিকাশ ও সমৃদ্ধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করে হবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, তার গ্রন্থ প্রস্তুতির রীতি বাঙালীর দ্বারা নির্দেশিত নয়। মিশনারি স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের গঠন ও বিষয়ও বিদেশী মিশনারিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শুধু স্কুলবুক সোসাইটিতেই দেশীয় পণ্ডিতদের চিন্তাভাবনার স্বাধীন ক্ষেত্র কিছুটা ছিল। তবু কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিরা তাঁদের মৌলিক উদ্দেশ্যের এবং লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু গ্রন্থ প্রণয়নে এবং মুদ্রণে উদ্যোগী হয়েছিলেন যার প্রভাব বাঙালীর জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের নিজস্ব প্রকাশনগুলির মধ্যে স্পষ্ট দুটো ভাগ রয়েছে: একটি হল খ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক, অন্যটি স্বতন্ত্র একটি ধারা। সেই ধারাটির একটি দিক পুরনো রচনার প্রকাশ আর একটি মূলতঃ নতুন পাঠ্যপুস্তক। এই দুটি প্রধান ধারার বিভিন্ন শ্রেণী হল:

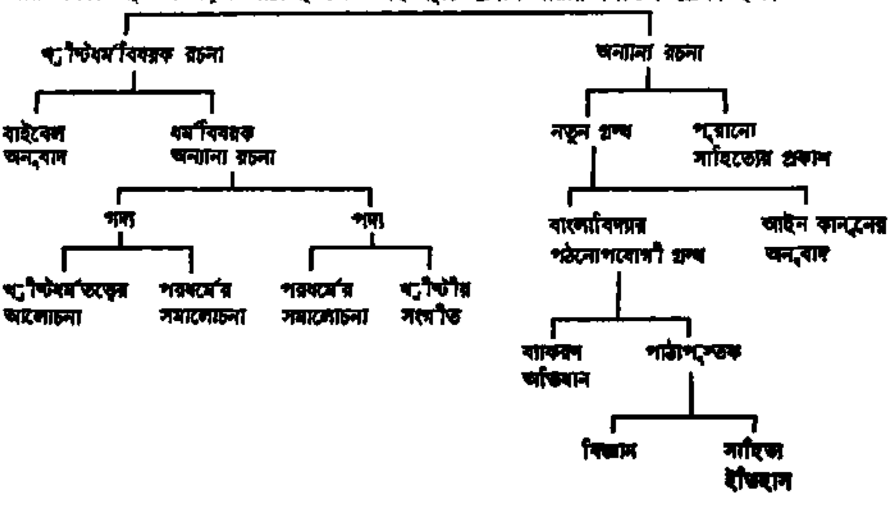

শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত গ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির শ্রেণী বিভাগের দ্বারা এই মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশনের বিভিন্নমুখিতা দেখাতে চাইছি। এই প্রকাশনগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনে কখনও পরোক্ষ, কখনও প্রত্যক্ষভাবে যে প্রভাব সঞ্চার করেছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করাই হবে আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তথা মুদ্রণের ইতিহাসে স্মরণীয় গ্রন্থ বাইবেলের বঙ্গানুবাদ। বাইবেল অনুবাদ ছিল উইলিয়াম কেরীর এবং শ্রীরামপুর মিশনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। শ্রীরামপুর মিশন নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছেন এবং মিশনের ইতিহাসে বাইবেল অনুবাদ ও প্রচার হচ্ছে কেন্দ্রীয় ঘটনা। বাইবেলের অনুবাদ, সংশোধন, পুনরায় অনুবাদ—অবিচ্ছিন্ন ধারায় ওই কর্মস্রোত শ্রীরামপুর মিশনে বয়ে চলেছে। ইউরোপে প্রথম জঙ্গম ধাতব হরফে যে বই ছাপা হয়েছিল ১৪৫৫ সালে মাইনজ-এ তা হল বাইবেল। ডেনিস্ হে গত পাঁচ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতায় মুদ্রণের প্রভাব সম্পর্কিত মূল্যবান প্রবন্ধটির শিরোনামা দিয়েছিলেন, বাইবেলের একটি উক্তি থেকে: Fiat Lux, (পৃথিবীতে) আলো হোক।[৮] গুটেনবার্গের ছাপা এই ল্যাটিন বাইবেল—এখনও রোমান ক্যাথলিক চার্চের মান্য পাঠ এই বাইবেলের পাঠ থেকে অভিন্ন—ইউরোপের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু বাংলা বাইবেল কোনদিনই বৃহত্তর বাঙালীর জীবনে বিশেষ সাড়া জাগায়নি। ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ যখন বাংলায় ছাপা হয়ে বিতরিত হতে আরম্ভ করল তখন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী কি ভাবে তাকে গ্রহণ করেছিলেন তার ইতিহাস আমরা স্পষ্ট জানি না। 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় দেখি: "পূর্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমারদিগের ধর্ম ছাপায়. ."[৯] খ্রীষ্টীয় মিশন প্রকাশিত এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের দ্বারা সুলভে এবং বিনামূল্যে বিতরিত বাইবেল সম্ভবতঃ বাঙালীর মনে সন্দেহ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় তার ইঙ্গিত আছে। মিশনারিরা বাইবেল ছাড়া আরও বহু বই প্রকাশ করেছেন যার উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, খ্রীষ্টতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম, আচার ও জীবনের সমালোচনা। হিন্দুধর্মের সমালোচনা গদ্য ও পদ্য উভয় মাধ্যমেই দেখা দিয়েছিল। সেই সব ট্র্যাক্ট আজ অধিকাংশই লুপ্ত। সেদিন যেগুলি বহুল প্রচারিত হয়েছিল সেগুলিও যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ নেই। কিন্তু অনুমান করি সেগুলি হিন্দু সমাজ ও কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজকে শঙ্কিত করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ তখন মুদ্রণের শক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন ছাপা বই কি দ্রুত গতিতে দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায় এবং তার প্রতিরোধের জন্য দরকার মুদ্রণের প্রসার। এই মনোভাব আংশিকভাবে ধর্মালোচনার ধারাকে প্রতিরোধী-ধারায় পরিবর্তিত করেছিল। প্রথম যুগের ট্র্যাক্টগুলিতে খ্রীষ্টতত্ত্বের ব্যাখ্যা ছিল নিম্নমানের। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টতত্ত্ব আলোচনাকে বাংলায় উন্নত করলেন রামমোহন রায়। প্রথমে আলোচনা শুরু হয় ইংরেজীতে, পরে বাংলায়। প্রসঙ্গতঃ রামমোহনের খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত বিতর্কের শুরু হয় শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সঙ্গে।

বাইবেল অনুবাদ, খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত ট্র্যাক্ট, খ্রীষ্টীয় সংগীত, এবং মিশনারিদের রচিত বা তাঁদের নির্দেশে বাঙালীদের রচিত হিন্দুধর্ম সমালোচনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলির গুরুত্ব এই যে হিন্দুধর্ম কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষায়, কিছু পরিমাণে আত্মসমালোচনায় উদ্যোগী হল। এ ব্যাপারে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টার পূর্বে বিশেষ কোন চিন্তা ও কর্মের ঐতিহাসিক প্রমাণ অবশ্য হাতে নেই। কিন্তু অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে হিন্দুসমাজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমান-সমাজ এ বিষয়ে চিন্তিত হয়েছিল এবং মুদ্রণশিল্পকে নিজ সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহারের চিন্তাও ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল।

বাইবেলের অনুবাদ মুদ্রিত হবার পর বাঙালী সমাজ যদি মুদ্রণের প্রতি উদাসীন থেকে থাকে তার একমাত্র কারণ, অন্ততঃ প্রধান কারণ খ্রীষ্টতত্ত্ব তখনও বাঙালীর মনে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। খ্রীষ্টীয় সংগীত বাঙালীকে কোন উন্নততর অভিজ্ঞতা দেয়নি। কিন্তু মনে করি বাঙালী-জীবনে মুদ্রণের প্রথম অভিঘাত হল শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত দুটি গ্রন্থ রামায়ণ এবং মহাভারত। বাইবেলের প্রকাশ থেকে অবশ্য বাঙালী ছাপা বই সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি করেছিল—বইয়ের বিষয়বস্তু নয়, বইয়ের আকার, মলাট, আখ্যাপত্র, লাইনের সজ্জা, অনুচ্ছেদ বিন্যাস, পরিচ্ছেদ ভাগ, বাঁধাই সব মিলিয়ে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তার যে পার্থক্য—বই বলতে যে চেহারাটা আধুনিক মানুষের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ছবিটার সঙ্গে বাঙালী পরিচিত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রকাশের ফলে বই সম্বন্ধে তার আগ্রহ এবং কৌতূহল গভীরতর হল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকাশিত হল ১৮০৩-এ

(ভিন্ন মত ১৮০২) আর কাশীরামের মহাভারতের প্রথম চার পর্ব একই সালে। রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কর্তব্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উইলিয়াম কেরীর সুপারিশে দুটি বইয়ের একশ কপি করে কিনেছিলেন। শ্রীরামপুরের রামায়ণ ও মহাভারত মোটামুটি ভাল পুথি নির্ভর করেই ছাপা হয়েছিল যদিও পরবর্তীকালে বটতলার প্রকাশকেরা সে সংস্করণ ব্যবহার করেনি।[১০] এই দুটি প্রকাশ বাঙালীর দুটি প্রিয় গ্রন্থকে বাঙালীর ঘরে পেৌছে দিল। এই প্রথম বাঙালী উপলব্ধি করতে পারল বৃহৎ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করার তুলনায় ছাপা বই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ। যে গ্রন্থগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা সহজ ছিল না—পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ —ছাপার ফলে তা হল সহজেই আয়ত্ত। ইউরোপে মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতি পুথি সংগ্রাহকদের মনোভাব আলোচনা করতে গিয়ে ফ্লাওয়ার সাহেব লিখেছেন যে মুদ্রণ সস্তা বাজারের পেছন দরজা দিয়ে পাঠককে জয় করেছিল। সস্তা বাজার বলতে তিনি শুধু সস্তা দামের বই, সস্তা সাহিত্যের কথাই বলেননি, জনপ্রিয় বইয়ের কথাই বলেছেন। রামায়ণ-মহাভারত জনপ্রিয় সাহিত্য; এই জনপ্রিয় সাহিত্যকে অবলম্বন করেই মুদ্রণ বাঙালী জীবনে প্রবেশ করল, বিনামূল্যে বিতরিত 'ধর্মপুস্তক' অবলম্বন করে নয়।

বাংলাদেশে জনপ্রিয় সাহিত্যের দুটো ধারা, ধর্মীয় সাহিত্য আর কাহিনী। রামায়ণ-মহাভারতে এই দুই ধারারই সংমিশ্রণ। ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যখন দেশীয় প্রকাশকেরা বই ছাপাতে শুরু করলেন, তখন প্রথম যে সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হল, তা পুথির আকারে ছাপা 'নরোত্তম বিলাস' (১৮১৫) আর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সচিত্র অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬)।[১১] ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (১ম খণ্ড, ১২৪ পৃ)[১২] ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের আগে কিছু ছাপা বইয়ের তালিকা দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে এই বইয়ের অনেকগুলির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি বই গড়ে চারশ কপি বিক্রি হয়েছিল। এই বইগুলি সব উন্নত শ্রেণীর নয়, কিন্তু এদের ছাপা, ব্লক, অলঙ্করণ সবই দেশীয় প্রতিভায় সম্পন্ন হয়েছে। এই বইগুলি তখনকার জনরুচিকে তৃপ্তি দিয়েছে, হয়ত কিছু পরিমাণ বিকৃতিতে সাহায্য করেছে। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া মন্তব্য করেছিলেন—

"Printed works will gradually constitute a powerful source of influence, works of real utility will be brought into the lists to combat with those vain amusement... Even in the infancy of the Indian Press, it has not been exclusively occupied with works of trifling value, two dictionaries of the Bengali language, a treatise on the law of inheritance, another on the Materia Medica of Bengal, neon music, two or three almanacs, and a treatise in Sanskrit Astronomy, which have all issued from the Press within the last ten years, are indications of improvement, not to be despised, if we consider the darkness and ignorance of the community, among whom they have found patrons."[১৩]

ছাপাখানা যে শক্তির উৎস এই বোধ বাঙালীর মনে জাগিয়ে তুলেছিল শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস। আর সেই বোধ তৈরিতে সাহায্য করেছিল ছাপা রামায়ণ ও মহাভারত। এদের মধ্যেই ছিল দুটি বিপরীত সম্ভাবনা: জনমানসের বিকাশ আর জনরুচিকে তৃপ্তি দেওয়া।

মুদ্রণ ও শিক্ষার সম্পর্ক শিব ও শক্তির মত—লিখেছিলেন রেভারেণ্ড লং। শিক্ষাবিস্তার হলে তবে মুদ্রণের বিকাশ সম্ভব আর মুদ্রণের ব্যবস্থা থাকলে তবে জনশিক্ষার ব্যাপকতা। বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিপর্বে তাই মুদ্রণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠতা এত নিবিড়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা দুইই বাঙালীর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সূচনা করল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিদেশী ছাত্ররা ছাপা বইয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখেই ছাপা বই ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছিল। আর ছাপা বই যখন দেশীয় ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হল তখন তাঁদের চিরাচরিত শিক্ষারীতির মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে গেল। এতদিন পাঠশালায় পড়ানোর চেয়ে লেখানোর ওপর জোর ছিল বেশী। পড়াবার জন্য বই সহজলভ্য নয়, যদিও পাণ্ডুলিপি-পুথি থেকেই প্রয়োজনানুসারে পড়ানো হত। বইয়ের দুর্লভতার জন্য মৌখিক শিক্ষার ওপর ছিল জোর। মৌখিক শিক্ষার ধারা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। মুদ্রণের দুটি প্রত্যক্ষ ফল দেখা দিল এই শিক্ষাব্যবস্থায়: এক, শিক্ষায় লেখা ও পড়া দুয়ের ওপর সমান জোর পড়ল; দুই, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে এল পরিবর্তন। পাঠ্যপুস্তকের গঠন প্রথম দিকে নির্দিষ্ট হচ্ছিল ইউরোপীয়দের

স্বায়া; ইউরোপীয়রা স্বভাবতঃই তাঁদের পরিচিত পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করেছিলেন। আমাদের পাঠ্যক্রমে "না ছিল ইতিহাস, ভূগোল, না ছিল ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব...ছেলে চার পাঁচ বছর পাঠশালায় কাটাইয়া কোন মতে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে, চিঠিটা পত্রটা লিখিতে দলিল দস্তাবেজ তৈয়ারি করিতে ও মহাজনী হিসাবটা রাখিতে শিখিলেই তাহার পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইত।"[১৩] মুদ্রণের পরোক্ষ ফল পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের প্রবেশ।

কেদারনাথ মজুমদার ঊনবিংশ শতকের গোড়ার শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই সময় আর একটি আপত্তি উত্থাপিত হইল। সেটি ছাপার পুঁথি পড়া। এদেশে ছাপার পুঁথির প্রচলন না থাকায়—পুঁথি যে ছাপার অক্ষরে থাকিতে পারে এ জ্ঞান সাধারণ ভদ্রলোকদিগেরও ছিল না... ছাপার পুঁথি দেখিয়া অনেকে ভয় পাইয়া গেল।"[১৫] অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের অনেক গ্রামে ছাপা বই ১৮৩৫ সালেও ব্যবহার করা হত না। বই-এর দাম অবশ্য তার একটা কারণ; কিন্তু সব কারণ নয়। মুদ্রণের ফলেই শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষারীতির মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হল। মুদ্রণের উদ্ভবের আগে ও পরে শিক্ষারীতির দুটো আলাদা যুগ। সমাজকে আধুনিক করে তোলার যন্ত্ররূপে মুদ্রণের ব্যবহার শুরু হল শ্রীরামপুরে। সাধারণ মানুষের ভয় ভাঙলেন, পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করলেন, জ্ঞানবিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে দেবার পথ সৃষ্টি করতে সাহায্য করলেন।

বাংলায় আধুনিক পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর নেতৃত্বে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকদের লেখা কতকগুলি বই পাঠ্যপুস্তকের সীমা অতিক্রম করেছিল, সাধারণ পাঠকও সে সব বই পড়তে পারতেন। কিন্তু তা মূলতঃ পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল, বিদেশী ছাত্রদের প্রয়োজনে। সে বইগুলির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব আছে সন্দেহ নেই।[১৬] কেরী কিন্তু প্রধানতঃ সে গ্রন্থগুলিকে ছাত্রদের প্রয়োজনের দিক থেকেই দেখেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন যখন খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয় এবং স্কুল বুক সোসাইটির প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ছাপতে আরম্ভ করেন তখন কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলির অনেক অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেন। এই বইগুলি তাঁরই নির্দেশে রচিত, তবু তিনি এদের বৈচিত্র্য-হীনতা ও ক্লান্তিকরতার সমালোচনা করেছিলেন।[১৭] তাঁর বক্তব্য ছিল বইগুলি "ট্রাইট অ্যান্ড আন-ইন্টারেস্টিং", এবং এদের রচনার রীতি "ইউনিফরম অ্যান্ড মনোটোনাস।" এই ত্রুটি দূর করার জন্য কেরী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাব করেছিলেন যে জন মার্শম্যান কয়েকটি বই লেখার কথা ভাবছেন, সেই বইগুলি কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ তথ্যের দুটি দিক আছে। প্রথমতঃ মার্শম্যানের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারূপে অসাধারণ কৃতিত্ব। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও মান সম্বন্ধে কেরীর অবিশ্রাম চিন্তা ও পরীক্ষা। দুজনেরই পাঠ্যপুস্তক নিয়ে চিন্তা ও পরীক্ষার ক্ষেত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, একজনের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, আর একজনের শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত স্কুল। কেরী নির্দেশিত পাঠ্যপুস্তক মূলতঃ সংস্কৃত ও ফারসী গল্পের অনুবাদ, জীবনী এবং ইতিহাস। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' বিশেষভাবে কেরীর নির্দেশেই রচিত হয়েছিল। অপরপক্ষে শ্রীরামপুর প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের বৈচিত্র্য বেশী—মার্শম্যান নিজেই লিখেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ; ফেলিক্স কেরী লিখেছেন 'বিদ্যাহারাবলী'। পীয়ারসন লিখেছেন ভূগোল এবং জ্যোতিষ বিষয়ক বই। এছাড়া ফেলিক্স কেরীর 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ' 'দ্য পিলগ্রিমস প্রগেসের' অনুবাদ—এবং মার্শম্যানের 'সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস'—(এটিও ইংরেজী থেকে অনুবাদ)—পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সীমাকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।[১৮] বিশেষভাবে জোর পড়েছিল ইতিহাস এবং বিজ্ঞানে। বাংলা গদ্যের গঠনে কেরীর দান অতি পরিচিত। ইতিহাস এবং বিজ্ঞান রচনার উপযোগী বাংলা গদ্য মূলতঃ গড়ে উঠেছিল শ্রীরামপুর মিশনে।

পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এবং শ্রীরামপুর মিশনে আধুনিক বাংলা-বিদ্যার পত্তন। আধুনিক কালে যে বাংলা-বিদ্যা গড়ে উঠেছে তার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছিল কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশনের কর্মীদের হাতে। এই বাংলা-বিদ্যা গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে মুদ্রণ ও প্রকাশনের বিপুল দান। ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপযোগী যে গদ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর মিশনে হয়েছিল এ তার থেকে স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার অন্তর্গত হল প্রাচীন সাহিত্যের পুনর্বিচার এবং ব্যাকরণ-অভিধান গঠন। প্রাচীন সাহিত্যের পুনর্বিচার বা পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা অবশ্য তখনও শুরু হয়নি, কিন্তু প্রাচীন দুটি প্রকাশনের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন প্রায় অজ্ঞাতসারেই ভাষায় স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানের কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণভাবে মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান বা মানায়নের শুরু হতে বাধ্য—সে কথা পরে আলোচনা করব। কিন্তু ভাষা-সাহিত্য চর্চার জন্য, ভাষা-সাহিত্যের নির্ভুল শিক্ষার জন্য, বানানে এবং রচনা-

শ্রেণীতে মানায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ব্যাকরণ এবং অভিধানের। ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশে আগ্রহী প্রকাশকের সংখ্যা কোন কালেই অবিরল নয়। কেরী রচিত বাংলা ব্যাকরণ হলহেডের ব্যাকরণের চেয়ে অনেক দিক থেকে উৎকৃষ্ট। তবে কেরী এই ব্যাকরণ মূলতঃ ইংরেজদের জন্যই লিখেছিলেন। বাঙালীর লেখা বাংলা ব্যাকরণের জন্য অনেককাল প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু কেরীর ব্যাকরণ হলহেডের বাংলা ব্যাকরণের মতই বাংলা বিদ্যার প্রতিষ্ঠার আদিপর্বে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আঠারো বছরের মধ্যে বইটি চারবার ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন থেকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্ররা এবং বাংলাদেশে কর্মরত খ্রীষ্টীয় মিশনারিরা এর প্রধান, সম্ভবতঃ একমাত্র পাঠক ছিলেন। বাংলা ব্যাকরণ যে শিক্ষণীয় বিষয় সে সম্বন্ধে সেযুগে হয়ত কোন ধারণা ছিল না, বর্তমানেও ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, সেজন্য তখনকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানো হত না। এদেশে ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা ও আলোচনা প্রাচীন ভাষাগুলিকে অবলম্বন করে হয়েছে, যখন তার ঢেউ বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসে পৌঁছল তখন বাঙালী ছাত্রদের উপযোগী বাংলা ব্যাকরণের কথা ভাবা হল। বাংলা তথা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির ব্যাকরণ চর্চার সূত্রপাত না হলেও প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, এবং সেই চর্চার প্রধান কর্মী ছিলেন উইলিয়াম কেরী। অভিধান প্রণয়ন এবং মুদ্রণের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশনের দান স্মরণীয়। কেরী অভিধান রচনা করেন মূলতঃ ছাত্রদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে। দীর্ঘকালের শ্রমগঠিত এই অভিধান সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল সাত বছর আগে। বিদেশী ছাত্রদের প্রয়োজনে এই অভিধান শুরু কিন্তু সেই প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল এর পরিকল্পনা এবং এর কাঠামো। দেড়হাজার পৃষ্ঠায় দু কলমে সাজানো পঁচাশি হাজার শব্দ নিয়ে এই অভিধান ছাপা হয়েছিল। এর গুরুত্ব নানান্ দিক থেকেই অসাধারণ কিন্তু যে দিক থেকে আপাততঃ এর গুরুত্ব নির্দেশ করতে চাইছি তা হল বাংলা-বিদ্যার ইতিহাসে এর স্থান। যে ভাষার অভিধান রচিত হয়নি সে ভাষার উচ্চতর চর্চার পথ তৈরি হয়নি। কেরীর প্রতিভা ও পরিশ্রম এবং এইরকম একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের নিষ্ঠা ও শ্রম এই অভিধানে পূর্ণ প্রকাশিত। শ্রীরামপুর মিশনের সেই নিষ্ঠা এবং আগ্রহের আর একটি নিদর্শন রামকমল সেন কর্তৃক জনসনের ইংরেজী অভিধানের বঙ্গানুবাদ বা বঙ্গীয় সংস্করণ।

রবার্ট বিরলি লিখেছিলেন যে ১৬৪১-এর পাঁচই জুলাই এক অর্থে আধুনিক ইংলণ্ডের জন্ম।[১৯] ঐ দিন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে একটি আইন গৃহীত হল, যে আইনে সংবাদপত্রের এবং প্রকাশনার স্বাধীনতা ঘোষিত হল। বাংলাদেশে যখন বাংলাভাষায় সাময়িক পত্র এবং শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হল তখনও বাঙালী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেনি। যদিও তখন বাংলাদেশে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্লিষ্ট। ১৮১৮-র এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হল 'দিগ্দর্শন'। 'দিগ্দর্শন' সংবাদপত্র নয়, তার লক্ষ্য পাঠ্যপুস্তকের মতই। আখ্যাপত্রে একে Indian youths' Magazine বা "যুবলোকের কারণ নানা উপদেশ" রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আমেরিকা, হিন্দুস্থানের সীমা, বাষ্পীয় নৌকা চালনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধের সংকলন। খুবই স্বাভাবিক যে পত্রিকা স্কুলবুক সোসাইটির কাছে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচারদর্পণ'। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮-র ২৩শে মে তার প্রথম প্রকাশ।[২০] এর বিষয়বস্তু অভিনব, পরিকল্পনা অভিনব। সরকারী আইন, বিচারপতি ও কালেক্টারদের নিয়োগ, দেশ ও বিদেশের সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কিত সংবাদ, নতুন গ্রন্থের বিবরণ, জন্ম-মৃত্যুর খবর, ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর ইত্যাদি নিয়ে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হত। লং লিখেছেন, "The Marquis of Hastings, instead of yielding to the imaginary fear of the enemies to a free press, or containing the previous policy of Government by withholding political knowledge from the people gave every aid to the *Darpan.*" লং আরও লিখেছেন "We must assign a very prominent position to the Native Newspapers and to the *Darpan* in particular, in having roused the adult mind from its long continued state of apathy."[২১]

পাঠ্যপুস্তক যদি হয় বালক চিত্তের উদ্বোধন, সংবাদপত্রে, লং-এর ভাষায় বলি 'বয়স্ক চিত্তের উদ্বোধন' ত্বরান্বিত হল। শুধু যে দেশ-বিদেশের জ্ঞানের পথ বহুল পরিমাণে অবারিত করে দিল সংবাদপত্র তাই নয়, সংবাদপত্র মানুষকে তার সমকালীন সমাজ ও তার সমস্যা প্রত্যক্ষতর করে তুলল, এবং হয়ত কিছু পরিমাণে দায়িত্বশীল।

মুঘল ভারতবর্ষের 'ওয়াকিয়াহনবীস'-এর সংবাদলিপির মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের ঐতিহ্য সন্ধান কৌতূহলের ব্যাপার মাত্র। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ধারা যদি খুঁজতে হয় তাহলে বরং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা বেঙ্গল গেজেট'—হিকির গেজেট নামে যা অধিক পরিচিত—, কিংবা

'ইণ্ডিয়া গেজেট' বা হরকরা থেকেই শুরু করতে হবে। 'সমাচার দর্পণ' অবশ্য হিকির পথ অনুসরণ করেনি বা বেঙ্গল হরকরার চার্লস ম্যাক্‌নিলের আদর্শ গ্রহণ করেনি। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা জার্নালের' সম্পাদক জেমস্ সিল্‌ক বাকিংহামের পথও 'সমাচার দর্পণ' নেয়নি। সরকারী নীতি সমালোচনা 'সমাচার দর্পণ' কখনও করেনি। কিন্তু 'সমাচার দর্পণের' মধ্যে সমাজের নানা সমস্যা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে লাগল এবং তার মধ্য দিয়েই শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক জগতের বিস্তার শুরু হল।

শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে সংবাদপত্র পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল মুদ্রণের বিস্তারের ফলে। আর একভাবে বলা চলে মুদ্রণশিল্প আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আর একটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করল। যখন 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হল তখন শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। একটি পরিবর্তন শিক্ষার ক্ষেত্রে, নতুন শিক্ষা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে হলেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর একটি পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে বাঙালী হিন্দুর ধর্মজীবনে। রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশের পর ধর্ম বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই রামমোহনের সতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ, ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা—প্রধানতঃ এই তিনটি ব্যাপার নিয়ে শিক্ষিত বাঙালীর মনে নানা জিজ্ঞাসা, নানা প্রশ্ন উঠেছে। তার আত্মপ্রকাশের প্রধান অস্ত্র গদ্য, তার বক্তব্য প্রচারের শক্তিশালী অস্ত্র মুদ্রণযন্ত্র। এই সময়েই সংবাদপত্রের প্রকাশ। অল্পসময়ের মধ্যেই বাঙালী সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করল আত্মপ্রকাশের এবং বক্তব্য প্রচারের তাগিদে। 'সমাচার দর্পণের' তথা শ্রীরামপুর মিশনের কৃতিত্ব এইখানে যে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য সব বিষয়েই, বিশেষ করে সাময়িক সমস্যার ব্যাপারে, মানুষের বক্তব্য, প্রচারের ইচ্ছা, সমালোচনার আকাঙ্ক্ষা, জনমত গঠনের এবং জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টার অতি শক্তিশালী একটি মাধ্যমকে বাঙালীর জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। 'সমাচার দর্পণ' এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের উদ্ভব বাংলাভাষা ও সাহিত্যের শুধু এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়—তার আরও গুরুত্ব আছে, ভাষাকে বিচিত্র ক্ষেত্রে, বিচিত্র বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রয়োগ করা, ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের জীবনের পরিচয়ের সঙ্গে সমতা রেখে প্রয়োজনীয় শব্দগঠন, পরিভাষা নির্মাণ, আর বানান ও রচনাশৈলী এবং অক্ষরের মানায়ন। 'সমাচার দর্পণে' তার সূচনা। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার ইতিহাসে তাই তাকে স্মরণ করতে হয়।

মুদ্রণের সঙ্গ সঙ্গে মানায়নের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল। মানায়নের একটি দিক সমতাসৃষ্টি আর একটি দিক হল অনুসরণযোগ্য আদর্শ সৃষ্টি। মুদ্রণের ফলে ভাষার নানা ব্যাপারে সমতা এবং আদর্শ নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তার দু-একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

হাতে লেখা হরফের একটি নির্দিষ্ট রূপ ছিল, তা না হলে পড়াই অসম্ভব। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট এবং মানায়িত রূপ সত্ত্বেও হাতের লেখায় ব্যক্তিগত শৈলী সব সময়েই ফুটে ওঠে। একই শতাব্দীর ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতেও সেই শৈলীর কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য অবশ্য পড়ার বাধা সৃষ্টি করে না, তার মূল্য কিছুটা অলংকরণে, কিছুটা ব্যক্তিগত লিখনরীতির পার্থক্যে। মুদ্রণে সেই ব্যক্তিগত ছাপটি মুছে গেল। হলহেডের বইতে বাংলা হরফের আদর্শ ছিল হুগলি অঞ্চলের কোন এক মুনশির (খুশমৎ) হাতের লেখা। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শ ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা হস্তলিপি-শিক্ষক কালীকুমার রায়ের। যে-কোন যুগের মুদ্রণশিল্পীর প্রথম লক্ষ্য স্পষ্টতা বা বোধগম্যতা। দ্বিতীয় লক্ষ্য সৌন্দর্য বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি। বাংলা হরফ গোড়ার যুগেই তার প্রথম লক্ষ্য সার্থকভাবে অর্জন করেছে। মার্শম্যান পঞ্চানন সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

"He had so fully communicated his art to a number of others that they carry forward the work of type-casting, and even of cutting the matrices with a degree of accuracy which would not disgrace European artists."[২২]

তাঁর জামাই মনোহর সম্বন্ধেও লিখেছেন, তাঁর কাছে বাংলাদেশ সুন্দর হরফের জন্য ঋণী:

"Bengal is indebted for the various beautiful founts of the Bengalee, Nagree, Persian, Arabic and other characters which have been gradually introduced into the different printing establishments."[২৩]

ছাপার অক্ষরের স্পষ্টতা, বোধগম্যতা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে বহু ক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। হরফের গঠন এবং আকার, হরফ সজ্জার শৃঙ্খলা, কালির সমানুপাতিক বিতরণ, অক্ষর এবং অক্ষরগুচ্ছের অন্তর্বর্তী ফাঁক—এককথায় একটি সামগ্রিক সজ্জা। তার মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় মুদ্রণের সৌন্দর্য এবং সুষমা। এই সামগ্রিক সজ্জাগত সৌন্দর্য কোন মুদ্রণ রীতিতেই একদিনে

তৈরি হয়নি। তার পেছনে আছে বহু দিনের সাধনা, বহু মানুষের পরীক্ষা। বাংলা মুদ্রণের সূচনা হয়েছে হলহেডের ব্যাকরণে, তার বিচিত্র পরীক্ষা শুরু হয়েছে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে এবং অন্যান্য প্রেসে। যখন আমরা বাংলা ছাপা হরফের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করতে পারব তখন দেখতে পাব কিভাবে এই পরীক্ষা চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। স্ট্যানলি মরিসন এবং কেনীথ ডে ইউরোপে গত পাঁচ শতাব্দী ধরে হরফের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার পরিচয় দিয়েছেন।[২৩] ভারতীয় মুদ্রণের ইতিহাসে হরফ গঠনের বিবর্তন, সমকালীন লিখনরীতির সঙ্গে তার যোগ ও লিখন রীতির ওপর তার প্রভাব সম্বন্ধে এখনও কোন গবেষণামূলক রচনা আমরা পাইনি।[২৪] কিন্তু তার অর্থ তো এই নয় যে হরফ গঠনের পরীক্ষা আমাদের দেশে হয়নি, অথবা মুদ্রিত হরফে মানায়নের চেষ্টা হয়নি। এই প্রবন্ধে সেই পরীক্ষা ও মানায়নের কিছু চেষ্টার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

হলহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত বাংলা হরফগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালের ছাপা হরফ, বিশেষ করে শ্রীরামপুর মিশনে ছাপা হরফের তুলনা করলে দেখা যাবে যে বাংলা মুদ্রণশিল্প ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনে কোন কোন ক্ষেত্রে হরফের গঠন স্পষ্টতা লাভ করেছে, কোথাও হরফের আকৃতিতে নতুন অংশে যুক্ত হচ্ছে, কোথাও বা আকৃতি পরিবর্তিত রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। প্রথমেই ধরা যাক অনুস্বার চিহ্নের ব্যবহার। হলহেডের ব্যাকরণে অনুস্বার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে হরফের পরে ওপরে একটি ছোট বৃত্ত—একটি supra-graph. হলহেডের ব্যকরণের আখ্যাপত্রেই তাব উদাহবণ পাওয়া যাবে 'বোধপ্রকাশং' শব্দে ব্যবহৃত অনুস্বারের রূপটি থেকে:

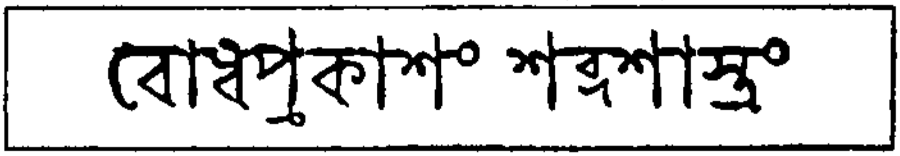
বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের ছাপায় অনেক বইতেই দেখা যাবে অনুস্বারের এই রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ছোট বৃত্তটি আর অক্ষবের লাইনের ওপরে নেই, অক্ষরের পরে, অক্ষরের সঙ্গে সম-লাইনভুক্ত। তবে বৃত্তের সঙ্গে একটি ইলেক্‌চিহ্ন দেখা দিয়েছে। সেই ইলেক্‌চিহ্নটি বর্তমান কালের ছাপাতে পাই বৃত্তের নিচে, শ্রীরামপুরের ছাপাতে দেখছি বৃত্তটির পাশে ইলেক্‌ চিহ্নটি। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা বইতে দেখছি 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা আইন গ্রন্থে, 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩) গ্রন্থে অনুস্বারের রীতি নিম্নোধৃত উদাহরণ থেকে দেখা যাবে:

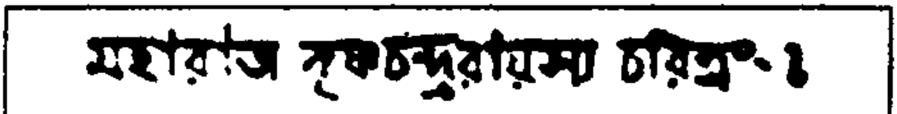
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং।

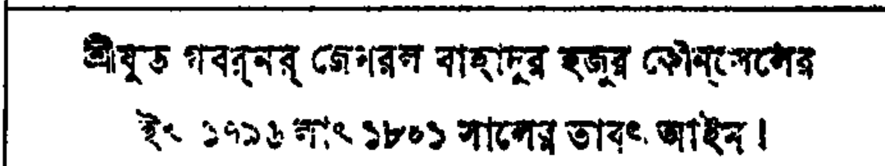
শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের
ইং ১৭৯৬ সাং ১৮০১ সালের তাবৎ আইন।

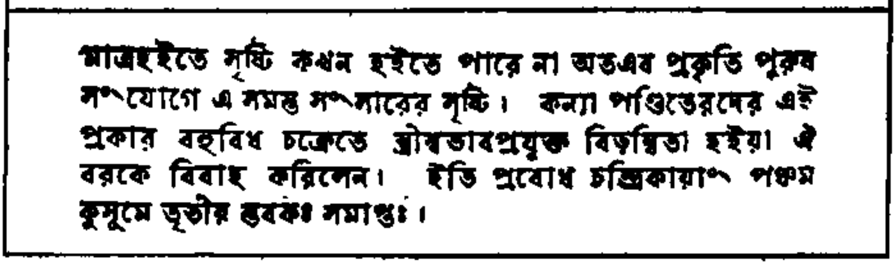
মাত্রহইতে সৃষ্টি কখন হইতে পারে না অতএব প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে এ সমস্ত সংসারের সৃষ্টি। কন্যা পণ্ডিতেরদের এই প্রকার বহুবিধ চক্রেতে স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত বিড়ম্বিতা হইয়া ঐ বরকে বিবাহ করিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং পঞ্চম কুসুমে তৃতীয় স্তবকঃ সমাপ্তঃ।

উপরে: রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'-এর প্রথম পৃষ্ঠার পরিচ্ছেদ শিরোনাম
মধ্যে: ১৮২৮ খ্রীঃ ছাপা আইন গ্রন্থের আখ্যাপত্র
নিচে: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পৃ ১৩৩

আপাত দৃষ্টিতে এই বিবর্তনের গুরুত্ব হয়ত খুব বেশী মনে না হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে লিখনরীতি তথা মুদ্রণে একটি মানায়নের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। হলহেড ব্যবহৃত অনুস্বার চিহ্নরীতি কেন বাংলায় গৃহীত হল না? আধুনিক হিন্দীতে বৃত্তের পরিবর্তে একটি বিন্দু চিহ্ন দিয়ে অনুস্বার বোঝানো হয়, যেমন 'বাংলা' বাংলা বাংলা । বাংলা লিখনরীতিতে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। অথচ হলহেডের ব্যাকরণে তা ব্যবহার করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই বাঙালী সেই চিহ্নটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে চায়নি। তাই অনুস্বারের পূর্ণরূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা চলেছিল। এক সময়ে অনুস্বার বোঝাবার জন্য হরফের পরে বৃত্তচিহ্ন বসানো হয়েছিল, হরফের লাইনের ওপরে নয়, পাশে মাঝামাঝি জায়গায়, যেমন এবং, সংস্কৃত ইত্যাদি। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। বৃত্ত ও ইলেক চিহ্ন দুটির ব্যবহারও আজকের রূপ অর্জন করতে দীর্ঘ সময় নিয়েছে।

মানায়নের আর একটি প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য করা যাক। হলহেডের ব্যাকরণে 'র' হরফটির দুটি রূপ দেখা যাবে। একটি আধুনিক কালেও যা ব্যবহৃত হচ্ছে—'র', আর একটি বর্তমান অসমীয়াতে ব্যবহৃত হয়, পুরনো বাংলা পুঁথিতে যার ব্যবহার ছিল, তা হল পেট কাটা 'ব'।

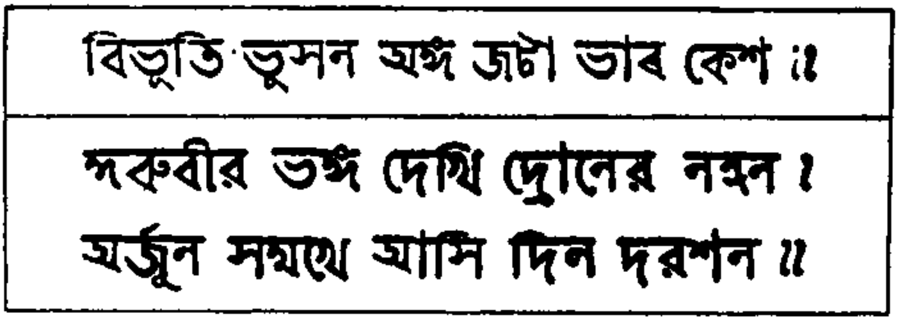

হলহেডের ব্যাকরণ থেকে: পৃ ৪১ (উপরে), পৃ ১০৯ (নিচে)

'কুরুবীর' শব্দটিতে 'র' হরফটিতে র-এর নিচে বিন্দু নেই, কিন্তু 'বীর'-এর 'র' সুচিহ্নিত। হলহেডের ব্যাকরণে 'র' সম্বন্ধে একটা আদর্শ স্থাপিত হয়নি। শ্রীরামপুরের ছাপা মহাভারতে আধুনিক 'র' সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রেও আধুনিক 'র'। হলহেডে এবং তারপরেও কিছুদিন 'র' সম্বন্ধে যে দ্বিধা ছিল—বা বলা চলে একই অক্ষরের জন্য দুটো হরফ তৈরি হয়েছিল—তার সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ১৮০১ নাগাদ। হলহেডের ব্যাকরণে যে চিঠিটি ছাপা হয়েছে (পৃ ২০৯) সেটিতে 'র' এবং 'র' কোথাও বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত নয়। সম্ভবতঃ লেখাতে বিন্দু চিহ্ন অনেক সময়ই ব্যবহার করা হত না। স্পষ্টভাবে এদের চিহ্নিত করে য এবং ব-র সঙ্গে পার্থক্য রচনা করে একটি মানায়িত রূপ সৃষ্টি হল

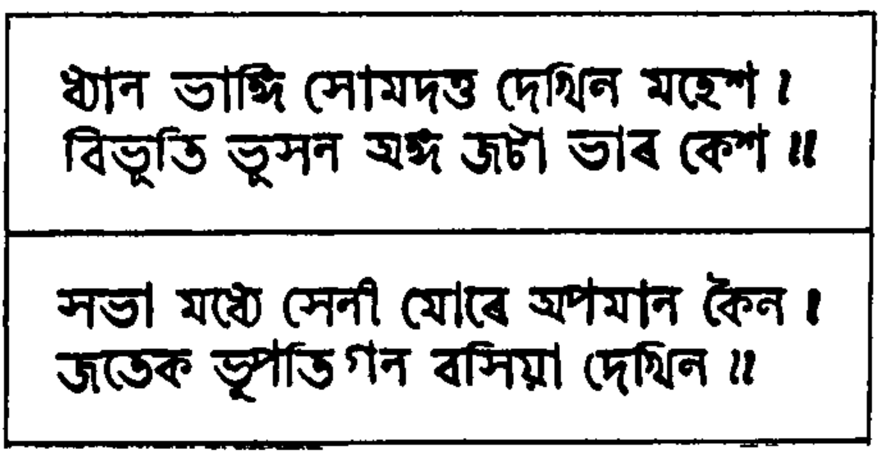

হলহেডের ব্যাকরণ; পৃ ৪১

ছাপাখানা প্রবর্তনের পর। এই প্রসঙ্গে ল ন এবং ণ-এর হরফগুলির বিবর্তনও স্মরণীয়। হলহেডে ন এবং ল-এর পার্থক্য মোটামুটি স্পষ্ট কিন্তু ন এবং ণ-এর পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। হলহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত 'ভুসন' এবং 'ধ্যান' শব্দদুটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। কেরীর 'কথোপকথন' গ্রন্থে 'চাকর ভাড়াকরণ' অধ্যায়ে দুটি হরফ ন এবং ণ কিন্তু পৃথক। 'রমজান' শব্দে 'ন'-এর মাথায় মাত্রা, 'করণ' শব্দে 'ণ'-এর মাত্রা নেই এবং ণ-এর বাঁদিকের ঝুলন্ত অংশে 'রমজানের' 'ন'-এর থেকে স্বতন্ত্র করার চেষ্টাও খুব স্পষ্ট।

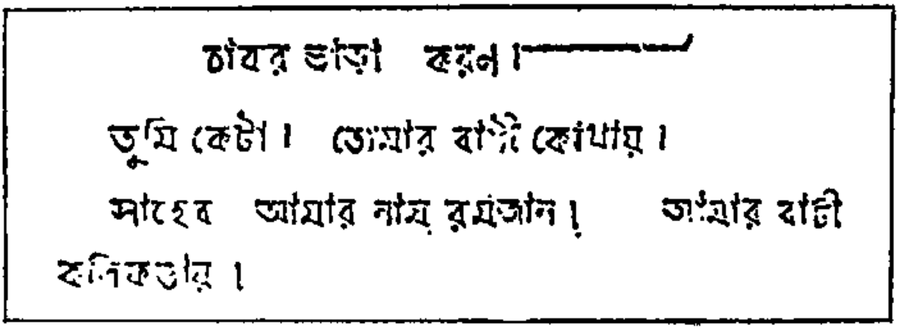
চাকর ভাড়া করণ।——

তুমি কেটা। তোমার বাটী কোথায়।

সাহেব আমার নাম রমজান। তাঁহার বাটী

কলিকাতায়।

কেরীর কথোপকথনের 'চাকর-ভাড়াকরণ' অধ্যায়

১৭৮৮তে প্রকাশিত, কোম্পানীর ছাপাখানায় মুদ্রিত মোহমুদ্গর স্তোত্রে ণ এবং ন-এর পার্থক্য রচনার চেষ্টা করা হয়েছে মূর্ধন্য ণ-এর যে আঁকশি বর্তমানে খুব নতমুখী দেখা যায় 'যাবজ্জননং তাবন্মরণং'-এর মধ্যে ণ হরফটির ঊর্ধাংশ প্রায় মাত্রার সঙ্গে লগ্ন। শ্রীরামপুরের ছাপায়

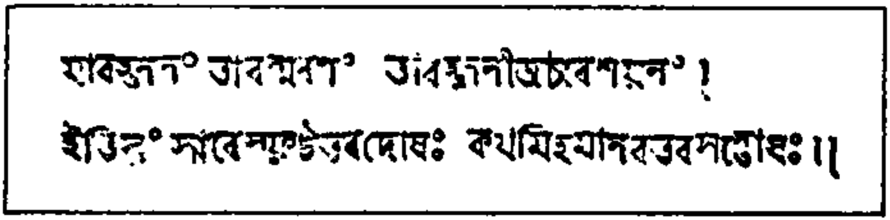
যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নং।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।

এসিয়াটিক রিসার্চেস্ ১ম খণ্ড পৃ ৩৫ থেকে

ণ সম্পূর্ণ মাত্রাহীন। শব্দের শেষে থাকলে ণ-কে প্রায় অবলম্বনহীন বলে মনে হচ্ছে, আর শব্দের মাঝখানে ণ অন্য হরফের চেয়ে সামান্য নিচুতে। ণ-এর আঁকশি বা ঝুলন্ত অংশটি শ্রীরামপুরের ছাপায় খুব স্পষ্টভাবেই নতমুখী।

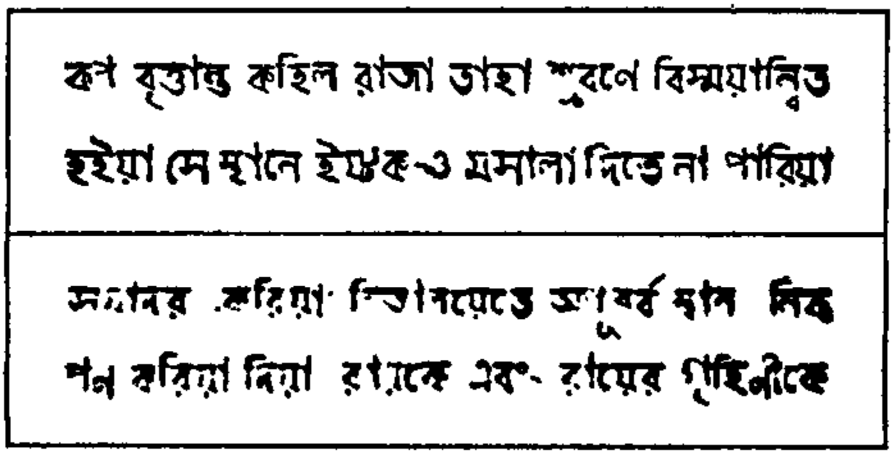
কর্ণ বৃত্তান্ত কহিল রাজা তাহা শুনে বিস্ময়ান্বিত

হইয়া সে স্থানে ইষ্টক ও মসালা দিতে না পারিয়া

সকলের করিয়া [illegible] অপূর্ব্ব স্থান নিষ্

পন্ন করিয়া দিয়া রাজাকে এবং রায়ের গৃহিণীকে

উপরে: কেরীর ইতিহাসমালা থেকে; নিচে: মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং ১ম পৃষ্ঠা

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ণ এবং ন-এর আধুনিক রূপ গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। ১৮২৮ সালে ছাপা আইন গ্রন্থে সেই রূপ দেখতে পাই। আর ১৮৩৩ সালের প্রবোধচন্দ্রিকার আরো স্পষ্ট এবং আরো সুদৃশ্য রূপ। ঠিক কবে কোন বইতে ণ এবং ন-এর হরফের ভিন্নতা স্পষ্টভাবে দেখা

কখনো যকারের লোপ করে এতাদৃশ বর্ণজ্ঞানরহিত মূর্খেরে আমাকে দেন আর রূপগুণসম্পন্না আমারে তাহাকে দেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা ৪র্থ স্তবক, ১ম কুসুম পৃ ১৩৩

দিল এবং আধুনিক রূপের জন্ম হল তা বলার মত উপাদান আমার হাতে নেই। কিন্তু যেটা আপাততঃ বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানা অক্ষরের রূপ সম্বন্ধে যে চিন্তিত ছিলেন তার প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে চাই হলহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত kernগুলি বা ঊর্ধ্বে কিংবা পার্শ্বে প্রসারিত অংশগুলি, এবং অনেক যুক্তাক্ষর হরফের আকৃতি কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে একটি আদর্শ রূপ নিয়েছে। হলহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত উ, ধ, তু, এবং যুক্তাক্ষর ন্ন, ন্দ, ন্দ এবং স্থ গুলি দেখা যাক—

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং	
ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥	
আনন্দিত	তোর স্নান ॥
অগ্নিবত	হউক
কর তুমি ॥	

উপরে: হলহেডের ব্যাকরণের আখ্যাপত্র। অন্যান্য লাইন ৪১ পৃ থেকে উদ্ধৃত

উপরে উদ্ধৃত যুক্তাক্ষরের দৃষ্টান্ত থেকে জানতে পারি যে হলহেডের ব্যাকরণের আখ্যাপত্রের 'ইন্দ্র' শব্দের 'ন্দ' এবং বইয়ের ভেতরে (৪১ পৃঃ) 'আনন্দিত' শব্দের 'ন্দ'-এর পার্থক্য লক্ষণীয়। 'ইন্দ্র' শব্দে ন এবং দ আলাদা। ন-টি ছোট, দ্র-এর আকার অন্যান্য হরফের সমান। ন এবং দ-এর মধ্যে সামান্য ফাঁকও রয়েছে। কিন্তু ৪১ পৃঃ 'আনন্দিত' শব্দের 'ন্দ' অন্য ধরনের, 'ন' ছোট, দ ন-এর নিচে কিন্তু পুরো 'দ' নয়। শ্রীরামপুরের ছাপায় দেখা যাবে আধুনিক 'ন্দ'-এর প্রবর্তনের চেষ্টা। সেই রকমই হলহেডে ব্যবহৃত 'স্থ'—প্রকৃতপক্ষে ছোট আকারের 'স'—এর নিচে ছোট 'থ' ১৭৮৫-তে ছাপা ডানকানের রেগুলেশান বইতে স্থ-এর আধুনিক রূপ ফুটে উঠেছে। বাইবেলের অনুবাদে

(১৮০০) স্থ-এর আধুনিক রূপ। হলহেডে ব্যবহৃত 'ন্দ' বা 'ন্ধ' আধুনিক রূপ ধারণ করেছে শ্রীরামপুরের ছাপায়। হলহেডের উ, ধ, তু-র রূপও বদলে গেল শ্রীরামপুরের ছাপায়—

তুমি কেটা।
সুমতিকে মন্ত্রি করিলেন। পরে এক দিন রাজা
পরে মহারাজকে আকাশে মন্দির প্রস্তুত করিয়া
শব্দাবলি ছন্দে।
ইতিমধ্যে এক উষ্ট্র শব্দ করিল তাহা শুনিয়া কন্যা বরকে জিজ্ঞাসা

১ম লাইন: কথোপকথন, 'চাকর ভাড়াকরণ' অধ্যায়
২য় ও ৩য় লাইন: ইতিহাসমালা থেকে
৪র্থ লাইন: শ্রীরামপুরে মুদ্রিত মহাভারতের (১৮০১) আখ্যাপত্র থেকে
৫ম লাইন: প্রবোধচন্দ্রিকা পৃ ১৩৩

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি অক্ষর, যুক্তাক্ষর, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হবার পর স্বরবর্ণের রূপ (অর্থাৎ আ-কার, ই-কার, উ-কার ইত্যাদি) হলহেডের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশেষ-করে লাইনোটাইপ প্রবর্তন পর্যন্ত কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবাহিক বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীরামপুর মিশনের দানের গুরুত্ব বোঝা যাবে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে শ্রীরামপুর মিশন হরফের ক্রমোন্নতি এবং আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টায় কখনও উৎসাহ হারাননি। ছাপা হরফের একটা মান এখানে সৃষ্টি হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল তা আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল।

ক্যাক্সটন সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে তিনি ইংরেজী বানানে শৃঙ্খলা আনলেন, ইংরেজী বানান মানায়িত করেছিলেন।[২৭] বাংলা বানানে আজও পুরো শৃঙ্খলা আসেনি, পূর্ণ মানায়ন আজও সম্ভব হয়নি। যেটুকু শৃঙ্খলা বা বিধি বাংলায় এসেছে তার একটি কারণ মুদ্রণের সূচনা ও বিকাশ। পুরানো পুথি উলটালে দেখা যাবে লিপিকরেরা কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেননি। হলহেডের ব্যাকরণে সেই বানান বিশৃঙ্খলার ছবি বেশ ফুটে উঠেছে। ঐ বইয়ে ৪১ পৃষ্ঠায় যদি, জতেক, জেন তিনটি শব্দ দেখছি। বাঙালীর উচ্চারণ অনুসারে যদি শেষ দুটি বানান সমর্থন করা যায়, তাহলে বলতে হয়, 'যদি' বানান লেখা ঠিক হয়নি, সেখানেও 'জ' ব্যবহার করলে সমতা থাকত। আবার ভুসন (ভূষণ), ভূপতি (ভূপতি) বানানে কোন নিয়মই দেখতে পাই না। হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ-র ব্যবহারে বিশৃঙ্খলা, মূর্ধন্য ণ এবং ষ-এর ব্যবহারেও যথেচ্ছাচারিতা। বলাই বাহুল্য হলহেড বাংলা বানান পদ্ধতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু ছাপা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বানানের বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠল। পুথিতে লিপিকররা নিজের অভ্যাসমত বা অজ্ঞানবশতঃ নানা বানানের ব্যবহার করেছেন। একই লিপিকরের লেখা ভিন্ন ভিন্ন বানান দেখতে পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে বানান ব্যবহার করতেন তার প্রভাব ব্যাপক হয়নি, শিক্ষাবিস্তারের অভাবে, শুদ্ধ পুথির সংখ্যার অভাবে। অতএব পুথিপাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বানানের ছিল বাধাহীন অরাজকতা।

কিন্তু যাঁরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেন, যাঁরা সে সব বই ছাপাবেন তাঁদের অনেক দায়িত্বের মধ্যে একটি হল একটি নির্দিষ্ট বানান অনুসরণ। বাংলাদেশে ছাপা পাঠ্যপুস্তক প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছিল বিদেশী ছাত্রদের জন্য। বিদেশী ছাত্ররা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন যে বাংলায় একাধিক বর্ণের উচ্চারণ এক (যেমন ন এবং ণ, য এবং জ, শ, স এবং ষ, অ এবং য়, ই এবং ঈ, উ এবং ঊ ইত্যাদি)। আবার একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ (যেমন 'এ' কখনও 'এ' কখনও 'অ্যা'; 'অ' কখনও 'অ' কখনও 'ও')। বাংলার উচ্চারণের ছাপ বাঙালীর লেখাতেও অনেক সময় পড়ে, বিদেশীর লেখাতে আরো বেশী পড়বে সন্দেহ নেই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র জেমস হান্টারের লেখা থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক:

কোন দেশীয় লোকেরা এ পথ মেলা রাক্ষিয়াছে;
চেষ্টা স্থকিত করিয়াছে, দেখে কিম্বা সুনে
সুম্ধাচার, স্রজন করিলেন, সন্দিধ

'রাখিয়াছে' পদে 'খ'-এর বদলে 'ক্ষ'-এর ব্যবহার, সম্ভবত কোন বাঙালী করতেন না। কিন্তু 'সুনে' বা 'সুম্ধাচার' 'সন্দিধ' বানান সে যুগের পুঁথিতে দেখতে পেলে আশ্চর্য হব না। 'স্থকিত' বা 'স্রজন' উচ্চারণের ভ্রান্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এজাতীয় ভুল—মূলতঃ অশিক্ষিত উচ্চারণের ফল—অশিক্ষিত লিপিকরের লেখাতে থাকা অসম্ভব নয়।

বানানের ব্যাপারে কেরী এবং শ্রীরামপুরের মিশনারিরা নির্ভর করেছিলেন নিজেদের সংস্কৃত জ্ঞান, এবং তার চেয়েও বেশী পণ্ডিতদের সংস্কৃত জ্ঞানের ওপর। তাঁরা বুঝেছিলেন যে ছাপার প্রয়োজনেই দরকার সমতার। সেই সমতার প্রধান উৎস হবে অভিধান। এক নিয়মে পাঠ্যপুস্তকের বানান নির্ণীত হবে, সংবাদপত্রের বানান নির্ণীত হবে। ছাপার ফলে সেই বানান বহু মানুষের কাছে প্রচারিত হবে, বহুল ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত শিক্ষিত সমাজে বানানের আদর্শ রূপটি গৃহীত হবে। বলাই বাহুল্য মুদ্রণের সুবিধে না থাকলে সমস্ত দেশে অল্প সময়ের মধ্যে বানানে সমতা আনা সহজসাধ্য নয়।

শ্রীরামপুরে ছাপা 'মহাভারত' (পৃঃ ১৮-১৯) দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছি 'কাহিনি' 'সচ্ছন্দে' 'দড়' ইত্যাদি বানান। প্রত্যেকটি বানানেই বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণের ছাপ আছে। হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ-র ভেদ বাঙালীর উচ্চারণে নেই, 'স্ব'-এর 'ব' বাঙালীর জিহ্বা পরিত্যাগ করেছে, 'দঢ়'-র ঢ় বাঙালীর মুখে 'ড়'-এ পরিণত। কেরী এবং শ্রীরামপুরের মিশনারিরা—এবং অবশ্যই তাঁদের উপদেষ্টা পণ্ডিতমণ্ডলী—বুঝেছিলেন বানানকে উচ্চারণ দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হতে দিলে নিয়মহীনতা তথা নৈরাজ্যের পথ অবারিত করে দেওয়া হবে। প্রথম সংস্করণে 'মহাভারত' সম্ভবতঃ প্রাপ্ত পুঁথির বানান কিছু পরিমাণে অনুসরণ করেছিল, কিন্তু পরে বানানে শৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত অভিধানের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। তখন থেকে মুদ্রিত গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত বানান অনুসৃত হতে আরম্ভ করল অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গে। ভিন্ন ভিন্ন লিপিকরের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও অজ্ঞানতার ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন বানান চলছিল তা মোটামুটি বন্ধ হল, বাংলা বানান অনেক পরিমাণে মানায়িত এবং সুনির্দিষ্ট হল। অন্যভাবে বলা চলে, বাংলা বানানের যে আদর্শ মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তা বৃহত্তর সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হল। মুদ্রিত গ্রন্থে 'ভুল বানান' বা 'ভিন্ন ধরনের বানান' ব্যবহৃত হত না তা বলতে চাই না, 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থে প্রথম পৃষ্ঠায় দেখছি 'সহিৎ' (সহিত), বা 'প্রবোধচন্দ্রিকার' ৪৮ সংখ্যক পৃষ্ঠায় পাচ্ছি 'ইতস্ততো' (ইতস্ততঃ)—ছাপার ভুল হতে পারে, উচ্চারণের ছাপাও থাকতে পারে। বাইবেলের অনুবাদেও দেখছি সমকালীন বানান বিশৃঙ্খলার ছাপ, যেমন নিচে (নীচে), সুস্ক (শুষ্ক), একত্তর (একত্র), অনুযায়ি (অনুযায়ী), রজনি (রজনী) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির আদর্শরূপ বা শুদ্ধরূপ সম্বন্ধে কেরী এবং মিশনারিরা সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। 'সমাচার দর্পণে' বিজ্ঞাপনে দেখি রামায়ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "...রামায়ণগ্রন্থে লিপিকরপ্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক ২ স্থান বর্ণচ্যুতি ...দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিত দ্বারা বর্ণাশুদ্ধ্যাদি বিচার পূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপারম্ভ হইয়াছে..."।[২৭] বিদেশী পণ্ডিত-মুদ্রকেরা বুঝতে পেরেছিলেন মধ্যযুগের ইংরেজী উপভাষা সমূহের বিশৃঙ্খলা দূর করে ক্যাক্সটন যে বানানের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল মূলতঃ মুদ্রণের প্রভাবে। বাংলা বানানেরও আদর্শ যথার্থভাবে স্থাপন সম্ভব মুদ্রণের সাহায্যে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'বঙ্গাভিধান' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জয়গোপাল লিখেছিলেন "...এই বঙ্গ-ভূমীর তাবৎ লোকের বোধগম্য অথবা সর্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমান যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ

বিশিষ্ট বিষয়লোকের মানসিক ক্ষোভ জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ-সকল সংকলন-পূর্বক (বঙ্গাভিধান) নামক এক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[২৮] বিশেষভাবে বানানে সমতা ও আদর্শ সৃষ্টির কথা মনে রেখে রচিত অভিধান বোধ হয় এইটিই প্রথম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের আগে পর্যন্ত যে বানান সাধারণ বাঙালীর আদর্শরূপে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রধানতঃ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রকাশনগুলির দ্বারাই বৃহত্তর জনসমাজের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জনপ্রিয় দুটি মহাকাব্য, অজস্র পাঠ্যপুস্তক এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁরা তখনকার সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালীর—জয়গোপাল যাঁর অন্যতম প্রতিনিধি—বাংলা বানানের আদর্শকে ছাত্রসমাজ ও সাধারণ বাঙালীর কাছে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আঠারশ আঠারো খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। তাঁদের একটি দল উইলিয়াম ইয়েট্‌সের নেতৃত্বে কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটি এবং ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস তার সঙ্গে মিশে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের দানও কম নয়। কিন্তু ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের যখন প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর মিশন যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল ততদিনে ছাপাখানা বাঙালীর জীবনে একটা আলোড়ন জাগাতে সমর্থ হয়েছে। বাঙালী মুদ্রক এবং প্রকাশকেরা আবির্ভূত হয়েছেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড যখন মারা গেলেন তখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামমোহন রায় সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেছেন এবং শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে ছাপা বইয়ের চাহিদা বেড়েছে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কেরীর দীর্ঘ, কর্মবহুল জীবনের অবসান তখন "ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের অপূর্বরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতা নগরে ভূরি ভূরি ঐ যন্ত্রালয় হইয়াছে।"[২৯] আর তার তিন বছর পরে যখন শ্রীরামপুর মিশনের শ্রেষ্ঠ কর্মী জশুয়া মার্শম্যানের মৃত্যু হল তখন বাঙালীর জীবনে "*vox audita perit, littera scripta manet*" প্রবাদটি সত্য অর্জন করেছে। মুখের কথা হারিয়ে যায়, লিখিত কথা থাকে। মানুষ তার মুখের কথাকে স্থায়িত্ব দেবার জন্য পাথরের ওপর খোদাই করেছে, কাগজের ওপর লিখেছে। 'সাহেবদের ঠাকুর' সেই স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষাকে দিল পূর্ণতা, সেই প্রচেষ্টাকে দিল পরিণতি।

নির্দেশিকা

১ Carey S. P.; *William Carey*, London, 1923; pp. 173-174

২ এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস ১৯৬২; চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা ছাপার হরফ', যুগান্তর, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৭; সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক, ১৯৭২, এবং শ্রীপান্থ, যখন ছাপাখানা এলো, ১৯৭৭

৩ Priolkar, A. *Printing Press in India, Bombay,* 1956, p. 70

৪ 'Extracts from Government Records', *Bengal Past and Present,* XXIX, 1925, pp. 214-15

৫ Updike, D. B. *Printing Types*, vol I Harvard, 1962, p. 6f

৬ চিত্রিত পুথি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সরসীকুমার সরস্বতী, 'পালযুগের চিত্রকলা', দেশ ৪৪ বর্ষ ৪১ সংখ্যা—৪৯ সংখ্যা ৬ অগাস্ট ১৯৭৭—১ অক্টোবর ১৯৭৭

৭ এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Sisir Kumar Das, *Sahibs and Munshis, An Account of the College of Fort William,* Delhi, 1978, pp.68-84

৮ John Carter & Percy H. Muir, ed. *Printing and the Mind of Man*. London, 1967, p. xv

৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ খণ্ড; পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৪৯; পৃ ৩৮৪

১০ সুকুমার সেন, বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ চতুর্থ সং ১৯৬৩, পৃ ১২৩ এবং উত্তরার্ধ ১৯৬৩, পৃ ১১৩

১১ তদেব, উত্তরার্ধ, পৃ ৫৫০
১২ Early Bengali Literature and Newspapers, *Calcutta Review*, 1850, xxv, xiii, p 149
১৩ তদেব, পৃ ১৫০
১৪ অনাথনাথ বসু, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ১৯৪৪; পৃ ৬-৭
১৫ কেদারনাথ মজুমদার, বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১ম খণ্ড, ১৯১৭, ৭১-৭২
১৬ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা রচনার মূল্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬২); Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, 1919, 2nd ed. 1962; Sisir Kumar Das, *Early Bengali Prose: Carey to Vidyasagar*, 1966
১৭ ক্যাপটেন রাডেলকে লেখা কেরীর চিঠি (১৬. ১১. ১৮২৪), হোম মিসলেনিয়াস ফাইল সংখ্যা ৫৬৭, জাতীয় অভিলেখাগারে সংরক্ষিত।
১৮ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত বাংলা পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য বইয়ের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, রেভারেন্ড লং এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works*, 1855

বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ, মুহম্মদ সিদ্দিক খান ঢাকা, ১৯৬২; পৃ: ৮৩-৮৬, ৯৫-১০৯, শ্রীরামপুরে মিশনের বিভিন্ন ব্যক্তিদের গ্রন্থতালিকার জন্য দ্রষ্টব্য সবিতা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত। Katharine Smith Diehl, *Early Indian Imprints*, Serampore, 1962; pp. 26-32
১৯ Birley, Robert. *Printing and Democracy*, London, 1964, p. 7
২০ ২৩ মে ১৮১৮-৩১ ডিসেম্বর ১৮৩১ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ১১ জানুয়ারি ১৮৩২-৫ নভেম্বর ১৮৩৪ দ্বি-সাপ্তাহিক এবং ৮ নভেম্বর ১৮৩৪-২৫ ডিসেম্বর ১৮৪০ পর্যন্ত আবার সাপ্তাহিক।
২১ *Calcutta Review: op. cit.* pp. 145-46
২২ Smith, George. *The Life of William Carey*, তারিখহীন, পৃ ১৮১ গ্রন্থে উদ্ধৃত
২৩ Marshman, J. *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*. London, 1864, vol. I, p 179
২৪ Morison, S. and Day, K *A Study of Fine Typography through Five Centuries* Chicago, 1963
২৫ এ বিষয়ে শ্রীপান্থ তাঁর 'যখন ছাপাখানা এলো' গ্রন্থে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পৃ ৯৮-১০৩
২৬ Steinberg, S. H. *Five Hundred Years of Printing*, London, 1959, p. 88
২৭ সমাচার দর্পণ ৩০ মে ১৮২৯; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ৫ম সং ১৯৫৬ পৃ ১৩ (সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১ম খণ্ড)
২৮ তদেব, পৃ ১৯-২০
২৯ শ্রীপান্থ, যখন ছাপাখানা এল গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৩০

কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার

প্রবীর সরকার

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের প্রয়োজনে পঞ্চানন হরফ নির্মাণের যে প্রযুক্তি-জ্ঞান অর্জন করেন তিনি তা শিখিয়েছিলেন তাঁর জামাতা মনোহরকে। পরবর্তীকালে আবার মনোহরের কাছ থেকে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। এইভাবে ক্রমান্বয়ে বংশপরম্পরা তিনপুরুষের হাতে সত্তর বছরের অধিককাল সীমাবদ্ধ ছিল হরফ রচনার কলাকৌশল। মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা এবং দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্রের দান অনস্বীকার্য।

শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই কর্মকার পরিবারের তিনপুরুষের কর্মস্থলও ছিল ওখানেই। ব্যাপটিস্ট মিশনের ডঃ উইলিয়াম কেরীর সহায়তায় এই পরিবারের প্রথম কৃতী পুরুষ পঞ্চাননের বসবাস শুরু হয় শ্রীরামপুরে।

উনিশ শতকের সূচনায় পঞ্চাননের পরলোকগমনের পর তাঁর জামাতা মনোহর পঞ্চাননের উত্তরাধিকারী রূপে শ্রীরামপুর মিশনের টাইপ ফাউণ্ড্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্মসূত্রে মনোহর শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় যুক্ত ছিলেন।[১] এই সময়ে তিনি কিঞ্চিদধিক পনেরোটি প্রাচ্যভাষার হরফ খোদাই করেন। এই ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, ওড়িয়া, নাগরী, ফারসী ও আরবী হরফও ছিল।

মনোহরের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যের ফলে শ্রীরামপুরে জটিল চীনা হরফও নির্মিত হয়। জশুয়া মার্শম্যানের চীনা ভাষার গ্রন্থাদি মুদ্রণের প্রয়োজনে মনোহর-খোদিত শ্রীরামপুরের চীনা হরফগুলি সেকালের ইংলণ্ডের অগ্রণী ফাউণ্ড্রিগুলিকেও বিস্মিত করেছিল। মনোহরের প্রযুক্তি-জ্ঞানের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'সত্যপ্রদীপ' সাপ্তাহিকে তাঁর চীনা হরফ রচনা প্রসঙ্গে লিখিত আছে (২৫ মে, ১৮৫০) :

"তাঁহার (পঞ্চানন) মরণানন্তর জামাতা মনোহর মিস্ত্রী তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া শ্বশুরের তুল্য বিজ্ঞ গুণবানপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক পঞ্চদশ ভাষার অক্ষর ক্ষোদন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সুকঠিন চত্বারিংশৎ সহস্র অক্ষর ঘটিত চীনা ভাষার অক্ষর কাষ্ঠে ক্ষোদন করেন।"[২]

মুদ্রণসম্পর্কিত প্রযুক্তির নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর মনোহর শ্রীরামপুরে 'চন্দ্রোদয়' প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন (১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। এই ছাপাখানার সাহায্যেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন বাংলা

ও ইংরেজী ভাষার নানা গ্রন্থ। সেযুগের বহুল প্রচারিত 'নূতন পঞ্জিকা'রও আত্মপ্রকাশ শুরু হয় মনোহর-প্রতিষ্ঠিত এই 'চন্দ্রোদয় প্রেস' থেকে।

১২৫৩ বঙ্গাব্দে মনোহরের পরলোকগমনের পর 'চন্দ্রোদয় প্রেস' পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনোহরের কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের হরফ রচনার হাতেখড়ি হয়। শ্রীরামপুর মিশনের কারখানায় তিনি হরফ নির্মাণের যে কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন তার গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলার মুদ্রণশিল্পে। কারণ তাঁর ফাউণ্ড্রিতে নির্মিত হরফ বাংলা দেশের প্রেস ব্যবহার করেছে দীর্ঘকাল। মাতামহ ও পিতার খোদিত নানা হরফ তাঁরই হাতে ক্রমান্বয়ে মার্জিত হয়ে হয়েছিল সুদৃশ্য, ফলে তাঁর রচিত হরফের চাহিদাও ছিল প্রচুর। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় কলকাতায় অন্তত কুড়িটি ছাপাখানায় যে হরফ ব্যবহৃত হত তার সবটাই তাঁর কারুকৃতির অবদান।

কৃষ্ণচন্দ্রের খোদাই করা ও ছাপা ছবি

মুদ্রণ সম্পর্কে কৃষ্ণচন্দ্রের যে অভিজ্ঞতা তার সাহায্যে তিনি "বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাংলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করেছিলেন।"[৩]

বলা বাহুল্য, পিতার প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রোদয় প্রেসের' মাধ্যমেই তাঁর পরিচিতি। কিন্তু গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৃষ্ণচন্দ্র গতানুগতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে যে-ভাবে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রোদয় প্রেসের' তিনি সংস্কার সাধন করেছিলেন তা মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের এক কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী।

পিতার প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানার পুরনো কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে কাজ চালানো অসুবিধাজনক ছিল। দ্রুত সুমুদ্রণের উদ্দেশ্যে অনন্যোপায় কৃষ্ণচন্দ্র সম্পন্ন করেছিলেন এক অসাধ্যসাধন। অর্থাৎ, নিম্নবিত্ত কৃষ্ণচন্দ্র নিজের হাতেই তৈরি করে নিয়েছিলেন 'চন্দ্রোদয় প্রেসের' প্রথম ইস্পাতের মুদ্রাযন্ত্রটি। তদানীন্তন শ্রীরামপুরে মিশনের এক ইস্পাতের মুদ্রাযন্ত্রের অনুকরণে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের প্রেরণায় কৃষ্ণচন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন তাঁর নিজের ছাপার মেশিন। এই মুদ্রাযন্ত্র নিয়েই শুরু হয়েছিল কর্মকার পরিবারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছাপাখানার কাজ। কম খরচে সুদৃশ্য মুদ্রণ সরবরাহ ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফলে অচিরেই 'চন্দ্রোদয় প্রেসের' শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

আর্থিক সচ্ছলতার পর অবশ্য তিনি কিনেছিলেন কিংবা তৈরি করেছিলেন আরও দুটি-একটি মুদ্রাযন্ত্র এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

শ্রীরামপুরের এই ছাপাখানায় মুদ্রণকলার জন্য তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার নানা সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রেও লিপিবদ্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে হিন্দু কলেজের এক ছাত্রের নাটক যখন আত্মপ্রকাশের পথে অপেক্ষমাণ তখন কলকাতার 'বেঙ্গল হরকরা' তা সংবাদ হিসাবে প্রচার করেছিল। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' (৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬) 'বেঙ্গল হরকরার' ঐ সংবাদটি উদ্ধৃত করে লিখেছিল :

"*The Hurkaru* states that one of the alumni of the Hindoo College is about to publish a volume of English poems, to be dedicated, of course, to the Governor-General, and that a new Dramatic work in Bengalee is about to issue from Krishno Chunder's Press, in Serampore."

কৃষ্ণচন্দ্রের খ্যাতির মূলে শুধু হরফ রচনা ও গ্রন্থমুদ্রণই নয়; উনিশ শতকের এক চিত্তাকর্ষক

পঞ্জিকা প্রকাশক হিসাবেও তিনি স্মরণীয়। তাঁর পিতার প্রবর্তিত শ্রীরামপুরের 'নূতন পঞ্জিকা' *সেযুগে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার মূলেও তিনি। 'চন্দ্রোদয় প্রেস' থেকে প্রকাশিত সে 'নূতন পঞ্জিকা'টিকেও তিনি জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।*

সুদৃশ্য হরফে মুদ্রিত ও অলংকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের 'নূতন পঞ্জিকা'র প্রচার সংখ্যা ছিল চার থেকে *পাঁচ হাজার। মুখ্যতঃ শ্রীরামপুরে নিজের কার্যালয়ে এবং ফেরিওয়ালাদের মাধ্যমে বিক্রীত* কৃষ্ণচন্দ্রের এ পঞ্জিকা কলিকাতার শাঁখারিটোলায় বিক্রয়ের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রাত্যহিক লগ্নমুহূর্ত থেকে অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, চূড়াকরণ ও বিবাহের দিন-ক্ষণ নির্ধারণের সঙ্গে পর্ব ও ছুটির দিন ও বৈষ্ণবদের পর্বদিনের উল্লেখ থাকত এ পঞ্জিকায়। সঙ্গে রাশিফল, কালবেলা ও জন্মলগ্নের শুভাশুভের বর্ণনা ও বৈষয়িক কাজের উপযোগী স্ট্যাম্প এবং ডাক-মাশুলের বিবরণও পাওয়া যেত।

"নবদ্বীপাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্তৃক" রচিত কৃষ্ণচন্দ্র-প্রকাশিত 'নূতন পঞ্জিকা'টির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটি বহু পূর্ণপৃষ্ঠা কাঠ-খোদাই চিত্রে শোভিত। মুখ্যতঃ হিন্দুর আরাধ্য দেব-দেবী এবং রাসযাত্রা, চড়ক ও রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান ছিল কাঠখোদাই চিত্রগুলির বিষয়। উল্লেখযোগ্য, 'নূতন পঞ্জিকা'য় প্রকাশিত প্রতিটি কাঠখোদাই চিত্রের নিচে সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত আছে "শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের কৃত"। অর্থাৎ, তাঁর প্রকাশিত পঞ্জিকার প্রতিটি কাঠখোদাই চিত্রের তিনিই শিল্পী।

কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন ও কর্মকাণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে তাই তাঁকে কেবল মুদ্রণশিল্পের প্রযুক্তি-বিদ্ হিসাবে দেখা যুক্তিযুক্ত হবে না। যদিও তাঁর জীবনকাহিনীর পর্যাপ্ত তথ্য সহজলভ্য নয়, তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুদ্রণশিল্পের বিবিধ জ্ঞান ছাড়াও তাঁর এমন এক অতিরিক্ত নৈপুণ্য ছিল যা থেকে তাঁকে আক্ষরিক অর্থে শিল্পীর সম্মানেও ভূষিত করা যায়।

এদেশে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে চারুকলা অনুশীলন শুরুর অনেক আগেই তিনি 'গ্র্যাফিক আর্টে' পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। গ্র্যাফিক চিত্রকলার মূল পদ্ধতি 'এনগ্রেভিং' তাঁর করায়ত্ত ছিল। নিজের মুদ্রাযন্ত্রে চিত্র মুদ্রণের উদ্দেশ্যেই তিনি তা আয়ত্ত করেন। বলা বাহুল্য, পিতা মনোহরের কাছে হরফ নির্মাণের উপযোগী যে খোদাইশিল্প আয়ত্ত করেছিলেন তার সাহায্যে এনগ্রেভিং-এর মাধ্যমে তিনি চিত্রকলার রূপারোপের কলাকৌশল অর্জন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের শিল্পিক নৈপুণ্যের এক উল্লেখ্য বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'য়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এক খ্রীষ্টান পঞ্জিকার (The Christian Almanack) প্রকাশ উপলক্ষে 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'য় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬); সেটিরই এক অংশে পঞ্জিকা প্রকাশনের আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের বাংলা পঞ্জিকার বিবরও উল্লেখ করা হয়। যদিও 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'র এ প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের নামের উল্লেখ ছিল না তথাপি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় যে তিনি এবং তাঁর 'চন্দ্রোদয় প্রেস' সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' থেকে জানা যায় তাঁর পঞ্জিকায় প্রকাশিত দেব-দেবীর চিত্রগুলি প্রকৃতই তাঁর স্বহস্তে অঙ্কিত ও খোদিত। প্রয়োজনীয় অংশটি উদ্ধৃত করা হল :

"*The Christian Almanack* ... The most popular Almanack is that published in this town by our spirited punch cutter, who has cut his own punches, cast his own types, manufactured his own iron press, and engraved with his own hand the veritable effigies of the gods and goddesses which adorn his work. He sells about 4000 copies a year at the rate of 8 annas a copy; and of this number, seven-eighths are disposed of by hawkers, who receive a commission of an anna a copy."

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কৃষ্ণচন্দ্রের শিল্পিক নৈপুণ্যের কথা তাঁর পরলোকগমনের সংবাদেও উল্লিখিত হয়। মৃত্যুর পরে সাপ্তাহিক 'সত্য প্রদীপ' পত্রেও (২৫ মে, ১৮৫০) তাঁর সম্পর্কে লেখা হয় যে, "পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প কর্ম্মেতে অতি পটু। সীসার উপর অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ তেমনও কাষ্ঠে প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম ঘটিত অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে পারগ। পঞ্জিকায় প্রকাশিত সকল প্রতিবিম্ব তাঁহার স্বহস্তে ক্ষোদিত হয়।"[৪]

কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার বহুল প্রচার দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন বিদেশী প্রকাশক 'সেণ্ডার্স অ্যাণ্ড কোন্স'। একমাত্র নামের অনুকরণের মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করাই নয়, বিদেশী প্রকাশের এই পঞ্জিকাটির সর্বাঙ্গে ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের মুদ্রণ ও অলংকরণের অবিকল অনুকরণের ছাপ।

কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার মত বহু পূর্ণপৃষ্ঠা কাঠখোদাই চিত্রে সচিত্র করা হয়েছিল এটিকে। উল্লেখযোগ্য, দ্বিতীয় পঞ্জিকাটির প্রতিটি কাঠখোদাই চিত্র এঁরা "এতদ্দেশীয়" শিল্পীদের সাহায্যেই রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের খোদিত চিত্রগুলির অনুসরণে। কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার প্রতিটি চিত্রের সঙ্গে এই পঞ্জিকাটির চিত্রগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

সেন্ডারস অ্যান্ড কোনস কোম্পানীর এই নূতন পঞ্জিকাটি যে কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার অনুকরণেই প্রকাশিত হয়েছিল তার স্বীকৃতিও লিপিবদ্ধ রয়েছে উক্ত পঞ্জিকার সূচনাপত্রেই। ১২৫৪ বঙ্গাব্দের প্রথম বর্ষে কলকাতার উক্ত পঞ্জিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার (দুআনা পৃষ্ঠায়) "বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে যে, "এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ লোকদিগের জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা এই পঞ্জিকার অনুষ্ঠান কালিন কহিয়াছিলাম যে শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাপেক্ষা অতি মনোহর রূপে মুদ্রিত করিব, ইহা মনস্থ করিয়া ছবি, বর্ডার অর্থাৎ পৃষ্ঠার চতুষ্পার্শের ফুল ও আর ২ দ্রব্যের নিমিত্ত বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া বর্তমান বৎসর এতদ্দেশীয় ছবি সকল গ্রহণ করিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য এবং বিলাতি কাগজ আসিয়াছে তাহা আগামি বৎসরের পঞ্জিকায় মুদ্রিত করা যাইবেক।"

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৮ মে শ্রীরামপুরে প্রায় তেতাল্লিশ বছর বয়সে নিঃসন্তান কৃষ্ণচন্দ্র বিসূচিকা রোগে পরলোকগমন করেন। তখন তাঁর মাতা ও পত্নী উভয়েই জীবিত ছিলেন। ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুই সহোদর ভ্রাতা রামচন্দ্র ও হরচন্দ্র। চন্দ্রোদয় প্রেস পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল এঁদের উপর। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের অভাবে চন্দ্রোদয়ের গৌরব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে পড়ল।

নির্দেশিকা

১ Krishna Chundra Kumar, *The Friend of India,* May 23, 1850; p. 325
২ সম্পাদকীয়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩০-১৮৪০), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত; ১৩৫৬, পৃ ৭৪২
৩ ঐ
৪ ঐ

পাঠপঞ্জী

নূতন পঞ্জিকা (১২৪৯ বঃ/১৮৪২-৪৩ খৃঃ) চন্দ্রোদয় যন্ত্র, শ্রীরামপুর;
নূতন পঞ্জিকা (১২৫৪ বঃ/১৮৪৭-৪৮ খৃঃ) সেন্ডারস অ্যান্ড কোনস, ৮ মিশিয়ান রো, কলিকাতা;
ভারতকোষ, ৪র্থ খণ্ড; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; কলিকাতা
The National Library. *The Carey Exhibition of Early Printing, and Fine Printing, Calcutta* 1955

বাংলা মুদ্রনের চারযুগ

বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে দু শ বছরেরও আগে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির জন এণ্ড্রুজের ছাপাখানা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড রচিত বাংলা ব্যাকরণ 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। বাংলা মুদ্রণ তথা বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে বইটি বিশেষ মর্যাদা লাভের অধিকারী; কারণ এই বইটি ছাপার জন্য সর্বপ্রথম বাংলা সঞ্চালনযোগ্য ধাতুনির্মিত মুদ্রাক্ষর (মুভেবল টাইপ) নির্মিত ও ব্যবহৃত হয় এবং এই বই প্রকাশনের মধ্য দিয়েই বাংলা মুদ্রণের জন্ম সূচিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষরের ব্যবহার শুরু হয়েছে এরও অনেক আগে। ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জার্মানীর জোহান গুটেনবার্গ মুভেবল টাইপে ছাপার রীতি প্রবর্তন করেন। ক্রমশঃ এই রীতি ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে মুদ্রণ-শিল্পের আবির্ভাব আরও অনেক পরে—১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। গোয়ায় পর্তুগীজ মিশনারিদের উদ্যোগে ছাপা হয় প্রথম বই পর্তুগীজ ভাষায়, রোমান হরফে। সত্যিকারের ভারতীয় মুদ্রণের সূত্রপাত ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর তামিল ভাষায় সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষরে প্রথম বই ছাপা হয়। আরও দু'শ বছর পরে বাংলা মুদ্রণের জন্ম—১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে।

ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের পটভূমিকায় বাংলা মুদ্রণের জন্ম এত বিলম্বিত হলেও, এর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুদ্রণের উৎকর্ষ ও প্রসারের বিচারে বাংলা অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে বহুদূরে পিছনে ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পেরেছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল ইংরেজদের আনুকূল্যে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই উপলব্ধি করেছিল, এ দেশে বাণিজ্য ও রাজত্ব কায়েম করতে হলে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ইংরেজ শাসকেরা বাংলা ভাষা চর্চায় উদ্যোগী হন এবং সেই সূত্রেই বাংলা মুদ্রণের সূচনা। সাধারণতঃ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই, এমনকি ভারতীয় মুদ্রণের আদিভূমি গোয়াতেও, ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনেই মুদ্রণের জন্ম। কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম। এখানে প্রশাসনিক স্বার্থে মুদ্রণের জন্ম ও প্রসার।

সূচনার পর থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তর পেরিয়ে, প্রথম পর্বে বিদেশীদের উদ্যোগে ও দেশীয়দের সহযোগিতায় এবং পরবর্তী পর্বে দেশীয়দের সক্রিয় ভূমিকায়, বাংলা মুদ্রণের রূপ

ও শক্তি বিবর্তনের ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। এই বিবর্তনের সঠিক মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলা মুদ্রণের জন্ম ও বিকাশের মূল সূত্রগুলিকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই কথা স্মরণ রেখে আমাদের মুদ্রণের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগ ও পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

১ *বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি যুগ: ১৬৬৭ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।*

২ প্রস্তুতির পর, বাংলা মুদ্রণের আদিযুগ: ১৭৭৮ থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

এর আবার পর্ব-বিভাগ করা চলে:

ক সূচনা পর্ব: ১৭৭৮-১৭৯৯ খ্রী.

খ বিকাশ পর্ব: ১৮০০-১৮১৬ খ্রী.

গ বিস্তার পর্ব: ১৮১৭-১৮৩৪ খ্রী.

৩ আদিযুগের পর বাংলা মুদ্রণের মধ্যযুগ বা প্রাগাধুনিক যুগ: ১৮৩৫ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৪ এর পরই বাংলা মুদ্রণের আধুনিক যুগের সূত্রপাত: ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

এই যুগ ও পর্ব বিভাগ মূলতঃ ঘটনা-কেন্দ্রিক। এ কথা স্বীকার্য, ঐতিহাসিক বিবর্তন-ধারায় কোনো একটি বিশেষ বছরকে চিহ্নিত করে এক যুগ থেকে অপর যুগের মধ্যে জলরোধক সীমারেখা টানা সব সময় সম্ভব বা সার্থক হয় না। একটির সঙ্গে অপরটির কিছু কিছু সম্পর্ক থেকেই যায়। তবে ইতিহাসের চলমান স্রোতের এক একটি সন্ধিক্ষণে মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার ফলে প্রচলিত ধারার সমাপ্তি ঘটে বা ইতিহাসের নতুন যুগের নতুন পথ-পরিক্রমা শুরু হয়। সুতরাং বহুলাংশে এই যুগ-বিভাগ ঘটনা-কেন্দ্রিক। ঐ ঘটনাগুলিকেই আমরা পর্বান্তর বা যুগান্তরের সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত করি।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে মুদ্রণেতিহাসের শুরু তার আদিযুগের সমাপ্তি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর উইলিয়াম কেরীর মৃত্যু ও তার অল্পকালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বিশিষ্ট ভূমিকার অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলা মুদ্রণের একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেরীর মৃত্যুর ঘটনাটিকে যুগাবসানের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কারণ কেরী ছিলেন ৫৭ বৎসরব্যাপী ঐ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী গতিশীল ব্যক্তিত্ব। ঐ সময়ে তাঁর মতো এমন কোনো একক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে (১৭৯৩-১৮৩৪) ঐ যুগের বাংলা মুদ্রণের বিকাশের ধারায় প্রধানতম শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। উইলিয়াম কেরীকে কেন্দ্র করেই যেন একটা যুগ গড়ে উঠেছে, একাধিক প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে, বহু শিল্পী-কর্মী-লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে একটি যুগের পরিসমাপ্তি। অনুরূপভাবে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আর এক নতুন যুগের সূচনা। ঐ বছর স্যার চার্লস মেটকাফ কর্তৃক সংবাদপত্র ও মুদ্রণের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে নতুন যুগের সূচনা তাকে বাংলা মুদ্রণের মধ্য যুগ বা প্রাগাধুনিক যুগ হিসাবে আখ্যাত করা যায়। এই সময় বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনে আধুনিকত্বের লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। বাংলা প্রকাশনার জগতে বিদ্যাসাগর ছিলেন এই যুগের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এই প্রাগাধুনিক যুগের এক শ বছর শেষ হয়েছে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে। ঘটনাটি হল বাংলায় লাইনোটাইপের প্রবর্তন। সুরেশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাংলা লাইনোটাইপের ব্যবহার শুরু হয়। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে সেদিন থেকে আর এক নতুন যুগ বা আধুনিক যুগের সূত্রপাত। ১৯৩৫ পরবর্তী আধুনিক যুগে বাংলা মুদ্রণ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

ঘটনাকেন্দ্রিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবেই আমরা বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসের সূচনা ধরেছি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে—হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

প্রস্তুতিযুগ: তবে 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।' সূচনার আগেও তাই প্রস্তুতি। বাংলা মুদ্রণের এই প্রস্তুতির যুগ ছড়িয়ে আছে ১৬৬৭ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ ১১১ বছরের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ইতিহাসে। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ আমস্টারডাম থেকে প্রকাশিত 'চায়না ইলাস্ট্রেটা' নামক গ্রন্থে বাংলা অক্ষরের প্রাচীনতম মুদ্রিত প্রতিলিপি পাওয়া যায়। এর পর থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত কিছু কিছু বইয়ে বাংলা, ভারত বা এশিয়া প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা বর্ণমালা থেকে এগুলির রূপগত পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যে সমস্ত বইয়ে বাংলা অক্ষরের মুদ্রিত প্রতিলিপির দুর্লভ নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (১) আতানাসিউস কির্খের রচিত 'চায়না ইলাস্ট্রেটা', (আমস্টার-

ডাম, ১৬৬৭); (২) চারজন জেস্যুইট ধর্মযাজক রচিত 'অবজারভেশানস' (প্যারিস, ১৬৯২); (৩) গেওর্গ যাকোব্ কের রচিত 'Aurenck Szeb' সম্বন্ধীয় বই (লাইপ্‌ৎসিক, ১৭২৫); (৪) যোহান ফ্রিদ্‌রিখ্ ফ্রিৎস রচিত 'Orientalischer Und Occidentalischer Sprachmeister' (লাইপ্‌ৎসিক, ১৭৪৮); (৫) ডেভিড মিল রচিত 'Dissertiones Selectae' (লাইডেন, ১৭৪৩); (৬) 'Encyclopedie Francoise' (১৭৭২) ও এডমন্ড ফ্রাই রচিত 'প্যান্টোগ্রাফিয়া' (লন্ডন, ১৭৯৯); (৭) ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড সংকলিত 'এ কোড অব জেন্টু লজ' (লন্ডন, ১৭৭৬)। এই মুদ্রিত প্রতিলিপির সবগুলিই ব্লকে ছাপা, বাংলা সঞ্চালনযোগ্য হরফের সূত্রপাত তখনো হয়নি। তাই এই যুগকে বাংলা ব্লক-মুদ্রণের যুগ বলেও অভিহিত করা যায়।

এই ব্লক-মুদ্রণকে বাংলা সঞ্চালনযোগ্য মুদ্রাক্ষর প্রবর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে গ্রহণ করা চলে। ঐ সময়ে অবশ্য আরও একভাবে বাংলা মুদ্রণের প্রস্তুতি চলেছিল। ভারতের বাইরে অভারতীয়দের উদ্যোগে প্রকাশিত পূর্বোক্ত বইগুলিতে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে বাংলা বর্ণমালার নমুনার সন্ধান পাওয়া গেলেও সেখানে বাংলা ভাষার কোন স্থান ছিল না। পক্ষান্তরে সমসাময়িককালে বিদেশে মুদ্রিত আরো কয়েকটি বইয়ের সন্ধান করা গেছে যেগুলির ভাষা বাংলা, কিন্তু তা রোমান হরফে ছাপা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্তুগীজ-বাংলা খ্রীষ্টান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দুটি বই: ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত পাদ্রি মানোএল্ দা আসসুম্পসাম্ রচিত 'কৃপার-শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' ও বাংলা ব্যাকরণ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। এ ছাড়া ঐ সময়ে দোম আন্তোনিও রচিত রোমান অক্ষরে লিখিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামক অপর একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়।

রোমান অক্ষরে ছাপা বাংলা বই—এও এক ধরনের প্রস্তুতি। প্রস্তুতির পর এল বাংলা মুদ্রণের জন্মলগ্ন, সূচিত হল 'আদি যুগে'র নতুন ইতিহাস।

আদি যুগ

সূচনা পর্ব: ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক লগ্নে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। সঞ্চালনযোগ্য বাংলা মুদ্রাক্ষর আবিষ্কৃত হল, তা দিয়ে ছাপা হল ইংরেজীতে লেখা হলহেডের বাংলা ব্যাকরণের বাংলা উদ্ধৃতি। উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি অধিকাংশ নেওয়া হয়েছে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের রচনা থেকে। এগুলি ছাপার জন্য বাংলা হরফ তৈরি হয়েছিল। ২৪৫ পৃষ্ঠার ঐ বইটির মোট প্রায় একচতুর্থাংশব্যাপী ঝকঝকে সুন্দর পরিষ্কার বাংলা ছাপা আজও অম্লান রয়েছে। প্রথম আবিষ্কৃত নয়নশোভন ঐ বাংলা হরফগুলি আকারে বেশ বড় ছিল, উচ্চতায় ৪·৫ মি.মি.। তবে বইয়ের শেষভাগে একমাত্র গদ্য উদ্ধৃতি হিসাবে যে চিঠিটির প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে, অপর একটি পৃষ্ঠায় তা অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে (উচ্চতা ২·৫ মি.মি.) ছাপা হয়েছে। এগুলি আলাদা করে কাটা আর এক নতুন সাটের হরফ বলে মনে হয়। বর্ষাকালে (ডিউরিং রেইনস) ছাপা এই বইয়ে দপ্তরীর উদ্দেশ্যে লেখা বাঁধাইয়ের নির্দেশ ও পূর্বোক্ত চিঠিটির তারিখ ('শন ১১৮৫ শাল ১১ শ্রাবন' বা ২৮ জুলাই ১৭৭৮) দেখে মনে হয় বইটি অগাস্ট মাসের (১৭৭৮) পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। হেস্টিংসের আনুকূল্যে প্রকাশিত এই বইয়ের জন্য প্রথম সঞ্চালনযোগ্য বাংলা হরফ তৈরি করেন চার্লস উইলকিনস। বাংলা মুদ্রণের স্রষ্টা বা বাংলার গুটেনবার্গ হিসাবে তাঁকে আখ্যাত করা যায়। শক্ত ইস্পাতের ওপর ছেনি কেটে খোদাই করা ছাঁচ ও তা থেকে ঢালাই করা ধাতুনির্মিত হরফ তৈরির কাজে উইলকিনসের প্রধান সহযোগী ছিলেন বাঙালী শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার। পরবর্তীকালে (অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদ ও শ্রীরামপুরে মিশনের প্রথম দু তিন বছর) পঞ্চাননের সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলেই বাংলা মুদ্রণের প্রসার, প্রচার ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। পঞ্চানন কর্মকারই মুদ্রণশিল্পকে বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পধারার অঙ্গীভূত করে তোলেন। তাই বলা যায় পঞ্চানন কর্মকার বাংলা মুদ্রণের প্রথম সার্থক শিল্পী। উদ্ভাবনপটু শিল্পী হিসাবে তাঁর দান অনস্বীকার্য।

হলহেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয় হুগলির জন এণ্ড্রুসের ছাপাখানায়। এইটাই ছিল বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা। হলহেডের বইটিই প্রমাণ করে এর সাজ-সরঞ্জাম ও মুদ্রণকুশলতা উন্নত মানের ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই ছাপাখানার পরবর্তী আর কোন ছাপার নিদর্শন আজও সন্ধান করা যায়নি। সম্ভবতঃ এর সরঞ্জামাদি কলকাতায় স্থাপিত কোম্পানীর প্রেসে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পুস্তক-বিক্রেতা হিসাবে এণ্ড্রুজের নাম অবশ্য কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায়, কিন্তু মুদ্রাকর ও পুস্তক-বিক্রেতা এক ব্যক্তি তা বলা যায় না।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বোলটসের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশনের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। হুগলির ছাপাখানাটিই প্রথম।

দ্বিতীয় ছাপাখানাটি ছিল কলকাতায় অবস্থিত কোম্পানীর প্রেস। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় বা তার পূর্বেই উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে এটি স্থাপিত হয়। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকির ইংরেজী সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র। কোম্পানীর প্রাক্তন মুদ্রাকর হিকির এই গেজেটের প্রথম দশটি সংখ্যা সম্ভবতঃ কোম্পানীর প্রেসে ছাপা হয়, পরে তিনি তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা গড়ে তোলেন। কোম্পানীর প্রেসে বাংলা মুদ্রণের ব্যাপক আয়োজন ছিল। সম্ভবতঃ পঞ্চাননের সহায়তায় উইলকিনসের উদ্যোগে এর নিজস্ব হরফ ঢালাইখানাও স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ছাপা প্রথম যে বাংলা বইয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় তা হল জোনাথান ডানকানের 'ইম্পে কোডের' বঙ্গানুবাদ (১৭৮৫)। অতিরিক্ত সংযোজন-সহ চারপেজী আকারের এই বইটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪৬, এর মধ্যে ১২০ পৃষ্ঠা বাংলায় ছাপা। বাংলা গদ্যরচনার সূত্রপাতও এখান থেকেই। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রবর্তন মুদ্রণযন্ত্রের অন্যতম অবদান। নতুন কাটা বাংলা হরফে আইনের এই অনুবাদটি ছাপা। এর হরফগুলি হলহেডের ব্যাকরণে ব্যবহৃত হরফের চেয়ে ক্ষুদ্রতর, উচ্চতায় ৩·৫ মি.মি.। গঠন-সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের বিচারেও এগুলি প্রশংসনীয়। এতকাল অনাবিষ্কৃত ডানকান অনূদিত আরেকটি আইনের বইয়ের সন্ধান আমি পেয়েছি। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, সাধারণতঃ পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের বঙ্গানুবাদ হিসাবে পরিচিত ১৪ পৃষ্ঠার এই বইটির সবটাই বাংলায় ছাপা এবং সম্ভবতঃ এটিও কোম্পানীর প্রেসে ছাপা। প্রকৃতপক্ষে এটিই প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের মর্যাদা পাবার অধিকারী। ঐ সময়ে কোম্পানীর প্রেস থেকে ছাপা আরও কয়েকটি আইনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। যেমন: এডমনস্টোন কর্তৃক অনূদিত দুটি আইনের বই (১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রী); ফরস্টার কর্তৃক অনূদিত কর্নওয়ালিস কোড (১৭৯৩)। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কোম্পানীর প্রেসে বাংলা ছাপার নিদর্শন যে বইটিতে পাওয়া যায় সেটি হল: 'এসেজ বাই দি স্টুডেন্টস্ অব দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম (১৮০২)'। এই সংকলনে বাংলা হরফে বাংলা নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। কোম্পানীর প্রেসের সমসাময়িক কলকাতায় ৩৭ নং লারকিন্স লেনে আরেকটি ছাপাখানার অভ্যুদয় ঘটে। ক্যালকাটা গেজেট প্রেস নামে পরিচিত আধা-সরকারী এই ছাপাখানা থেকেই ৪ মার্চ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ক্যালকাটা গেজেট নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয়। প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে মাঝে মাঝেই এতে বাংলা হরফে ছাপা বাংলা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হত। ঐ সময়কার আরও কিছু কিছু ইংরেজী পত্রিকায়ও এইরূপ বাংলা বিজ্ঞপ্তি মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল। যেমন, 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' পত্রিকা, উইলিয়াম বেইলী ও এর মুদ্রাকর-প্রকাশক এ. আপজনের প্রচেষ্টায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশন শুরু। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানা ক্রনিকল প্রেস থেকে ছাপা হত। তাঁদের নিজস্ব হরফ ঢালাইখানাও ছিল। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় (যেমন, ১৭৯২-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিভিন্ন সংখ্যায়) ছাপা বাংলা বিজ্ঞাপনের নমুনা পাওয়া যায়। এই ধরনের পত্রিকা-কেন্দ্রিক ছাপাখানা থেকে ঐ সময় কিছু কিছু বাংলা বইও প্রকাশিত হত। যেমন, ক্যালকাটা গেজেট প্রেস থেকে বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ কালিদাসের ঋতুসংহার, 'দ্য সীজন্স্' (১৭৯২); ক্রনিকল প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বাংলা হরফে ছাপা প্রথম বাংলা অভিধান আপজনের 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' (১৭৯৩)। সমসাময়িককালে প্রকাশিত ইংরেজী শিক্ষার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা বই: জন মিলার কর্তৃক সংকলিত, অনূদিত ও মুদ্রিত 'দ্য টিউটর' বা 'সিক্ষ্যাগুরু' (১৭৯৭)। এতে ছাপাখানার নামোল্লেখ নেই। তবে হরফের ধাঁচ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিচারে মনে হয় এটি কলকাতারই কোন প্রেসে ছাপা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আরেকটি বিশিষ্ট ছাপাখানার মালিক ছিল ফেরিস কোম্পানী। এর সুবৃহৎ প্রকাশনী হেনরি পিটস ফরস্টার সংকলিত *A Vocabulary, in two parts, English and Bangalee and vice versa* নামক বাংলা শব্দকোষের ৪৪১ পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রথম খণ্ড ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খণ্ড। ফেরিস কোম্পানীর ছাপাখানা মুদ্রণসৌকর্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সূচনা পর্বে পূর্বোক্ত বিক্ষিপ্ত প্রকাশনগুলি ছাড়া দেশজোড়া কোন অখণ্ড মুদ্রণ-পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে পারেনি। ঐ সময়ে বাংলা মুদ্রণের যে ধারাটি প্রচলিত ছিল, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার রূপ ছিল মোটামুটি চতুর্মুখী: ১ আইনের অনুবাদ; ২ ব্যাকরণ; ৩ অভিধান ও শব্দকোষ; এবং ৪ সমসাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত বাংলা বিজ্ঞপ্তি। এ সবই রচিত হয়েছিল মূলতঃ প্রশাসনিক তাগিদে। এই চতুর্মুখী ধারার একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ ঋতুসংহার।

এই পর্বে বাংলা ছাপার হরফেরও একটি সুস্পষ্ট বিবর্তন লক্ষ করা যায়। হস্তাক্ষরের যুগে

থেকে ছাপার অক্ষরের আদর্শ রূপে পেঁছিতে বাংলা মুদ্রাক্ষরশিল্পকে যে সব বিবর্তনের ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে তার দুটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হল, হরফের উচ্চতা বা আকার ক্রমশঃ ছোট করার প্রচেষ্টা। বড় হরফের পরিবর্তে ছোট ছোট সুন্দর হরফ কাটার প্রয়াসের মধ্যে শিল্পসাধনার লক্ষণ সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় প্রবণতাটি ছিল, পুথিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন হাতের লেখার জটিল বঙ্কিম টান পরিত্যাগ করে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত সরল নয়নশোভন ছাপার হরফের বিধিবদ্ধ আদর্শায়িত রূপ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। তবু ব্যতিক্রম ছিল। হস্তাক্ষরের অনেক জটিল রূপ ছাপার হরফে থেকে গিয়েছিল। হলহেডের ব্যাকরণ এবং পরবর্তী অনেক গ্রন্থে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হরফের এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সূচনা পর্বে বাংলা হরফের চারটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছিল। সেই অনুসারে চারটি স্বতন্ত্র সাটের বাংলা হরফও তৈরি হয়েছে।

(221)

প

পুর্ব্বপর জানিতে	to know an old ſtory
পুর্ব্বক	wearineſs
পুরি	houſe and home
পুরিতে	to fill up, to ſtuff
পুর্ন্নিত	full, filled up
পুর্ন্নমাসি	full moon
পুর্ন্নহইতে	to be filled up
পুরান জ্বর	an intermitting fever
পুরু	a bolſter
পুরুস	a man
পুরুসঅঙ্গ	the penis
পুরুসকার করিতে	to make a preſent, [beſtow upon
পুসর্ন্ন	ſufficiently
পুসর্ন্নহইতে	to be ſatisfied
পুঁজিতে	to cleanſe, wipe off

পরবর্তী পর্বে পেঁছে বাংলা হরফের একাধিক রূপ ধীরে ধীরে এক আদর্শ রূপের দিকে এগোতে থাকে।

বিকাশ পর্ব : উনবিংশ শতাব্দীর যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় যার প্রভাবে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে পর্বান্তর সূচিত হয়েছে বলা চলে। বলছি দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্মের কথা। একটি শ্রীরামপুর মিশন, অপরটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। দুটিই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং এদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের বিকাশ পর্বের সূচনা। মূলতঃ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ, প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা মুদ্রণের খাতে প্রথম জোয়ার আসে এবং পরিণামে আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিত্য নতুন ফসলে ভরে ওঠে। তবে এই পর্বে (১৮০০-১৮১৬ খ্রী) ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ভিত্তিক বিভিন্ন ছাপাখানাকে আশ্রয় করে তৃতীয় যে ধারা প্রবহমান ছিল বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথে তার দানও অনস্বীকার্য।

বিকাশ পর্বের মূল নিয়ামক ছিল শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। দুটিই বিদেশী পরিচালিত। দুটি প্রতিষ্ঠানের দুই ভিন্নমুখী উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বাংলা মুদ্রণের বিকাশ সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। একটি ধর্মের টানে, অপরটি প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা মুদ্রণের দিকে ঝুঁকেছিল। 'তমসাচ্ছন্ন নেটিভদের' কর্ণকুহরে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য বাংলা মুদ্রণের সাহায্য অপরিহার্য ছিল। অপরদিকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল বাংলায় বই ও ছাপার সরঞ্জাম। আনন্দের কথা, জন্মলগ্নের পর থেকেই মিশন ও কলেজের পারস্পরিক সহযোগিতায় ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছিল। কলেজের পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে মিশন বাংলা বই ছেপে দিয়েছিল, অপরপক্ষে কলেজ মিশনকে দিয়েছিল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। এই পারস্পরিক সহযোগিতা বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

তদানীন্তন বাংলাদেশে মিশনারি কার্যকলাপের যে তিনটি ধারা অর্থাৎ, ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাদান, খ্রীষ্টধর্ম প্রভাবিত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও মুদ্রণ—তার মধ্যে শেষোক্ত ধারাটিই, অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় মুদ্রণ-প্রচেষ্টাই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের উদ্যোগেই বাংলা মুদ্রণের বিকাশের পথ সর্বাধিক উন্মুক্ত হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশন ছিল সমকালীন বাংলা মুদ্রণের বৃহত্তম কেন্দ্র। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি একটিমাত্র কাঠের মুদ্রাযন্ত্র নিয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের যাত্রা শুরু হয়। ধর্মপ্রাণ উড্‌নি বিদেশাগত এই মুদ্রাযন্ত্রটি কলকাতায় নিলামে কিনে কেরীকে উপহার দিয়েছিলেন। কেরী সেটি ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদনাবাটীর কুঠিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করেন। ইচ্ছা ছিল বাইবেল মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করবেন। সেই জন্য টমাস ও রামরাম বসুর সহায়তায় তিনি ইতিমধ্যে, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ বা ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে, নিউ টেস্টামেণ্টের বাংলা অনুবাদের কাজ শেষ করে ফেলেছিলেন। এ ছাড়া মুদ্রণের জন্য বাংলা হরফ সংগ্রহের কাজেও অনেকটা এগিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ইংলণ্ড থেকে সরাসরি ঐ হরফ তৈরি করিয়ে আমদানির চেষ্টা করেন। কিন্তু হিসাব করে দেখেন যে তাতে খরচ পড়বে কেবল হরফের জনাই ৪,০০০ টাকা (প্রতি ছাঁচের জন্য ৫ শিলিং হারে); পরবর্তী হিসাবে দেখেন যে ঐ খরচ আরও বাড়বে, কারণ আসলে তখন প্রতিটি ছাঁচের দাম ছিল এক গিনি। সুতরাং তিনি বিলাত থেকে হরফ আমদানির অভিপ্রায় ত্যাগ করে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কলকাতায় ছাপানর হিসাব নিয়ে দেখেন যে নিউ টেস্টামেণ্ট দশ হাজার কপি বাংলায় ছাপাতে খরচ পড়বে ৪৩,৭৫০ টাকা। কিন্তু ঐ খরচও ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। তখন তিনি নিজেই ছাপার জন্য সচেষ্ট হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে অপ্রত্যাশিতভাবে খবর পান যে কলকাতায় দেশীয় ভাষায় হরফ নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। তখন থেকেই কেরী ঐ হরফ নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগে উদ্যোগী হন। পঞ্চানন কর্মকার ছিলেন ঐ হরফ নির্মাতাদের প্রধান। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়, সেপ্টেম্বরে কেরীর জন্য প্রয়োজনীয় হরফ ঢালাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এবার কেরীর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় সমগ্র বাংলা বাইবেল এক হাজার কপি ছাপতে কাগজ, হরফ, মজুরি ইত্যাদি সমেত মোট খরচ পড়বে ১৬,০০০ টাকা। এতে কেরী খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসে শ্রীরামপুরে মিশন পত্তনের। মদনাবাটী থেকে কেরী তাঁর কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামপুরে চলে আসেন। সেখানেই ছাপাখানার কাজ শুরু হয়। ছাপার কাজে কেরীর প্রধান সহযোগী হন অভিজ্ঞ দক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ড। কলকাতা থেকে সংগৃহীত বাংলা হরফ এবং কিছু পাটনাই ও কিছু বিদেশী কাগজ নিয়ে তাঁদের ছাপার কাজ আরম্ভ হয়। অচিরে পঞ্চানন কর্মকার মিশন প্রেসে যোগদান করে একটি নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা খোলেন। তাঁদের ছাপা আটশতাধিক পৃষ্ঠার প্রথম সম্পূর্ণ বই ছিল নিউ টেস্টামেণ্টের কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ 'ধর্ম্মপুস্তক'; প্রকৃতপক্ষে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি এর ছাপা শুরু হয়ে ন মাস

পরে শেষ হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি। ইতিমধ্যে অবশ্য ১০৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নাম দিয়ে এর প্রথম অধ্যায়টি ৫০০ কপি বেশী ছেপে পরিশিষ্ট সহ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে জুলাই-অগাস্ট (১৮০০) মাস নাগাদ সাধারণ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া ঐ বছর অগাস্ট-অক্টোবরের মধ্যে রামরাম বসু রচিত 'হরকরা' ও 'জ্ঞানোদয়' নামক দুটি ক্ষুদ্র বাংলা প্রচার পুস্তিকা মিশন প্রেসে ছেপে প্রচারিত হয়। এগুলিই ছিল মিশন প্রেসের প্রথম প্রকাশিত বাংলা পুস্তিকা।

ক্রমে মিশন প্রেসের কলেবর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর প্রকাশনার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। ১৮২০-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় সতেরো। সংগে ছিল পঞ্চানন কর্মকার প্রতিষ্ঠিত, ও তাঁর মৃত্যুর পর (১৮০৩/৪) তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার কর্তৃক পরিচালিত. হরফ ঢালাইখানা। তাঁদের কাটা হরফে চীনা সহ প্রায় ৪০টি ভাষায় অনূদিত বাইবেল মুদ্রিত হয়। মিশনের গণ্ডির মধ্যে কাগজ ও কালি তৈরির ব্যবস্থা করে এবং দপ্তরী ও অনুবাদ-বিভাগ স্থাপন করে শ্রীরামপুর মিশন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সুবৃহৎ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বাংলা মুদ্রণের আদিযুগে এটি একটি আশ্চর্য ঘটনা। সেখানে ছাপা বইয়ের সংখ্যাও বিস্ময়কর। জর্জ স্মিথ রচিত কেরীর জীবনী থেকে জানা যায়, কেরীর জীবদ্দশায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ৪০টি বিভিন্ন ভাষায় ২,১২,০০০ কপি বই মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কেরীর অনূদিত সমগ্র বাইবেল মোট পাঁচ খণ্ডে ছাপা হয়ে যায়। একটি হিসাবে দেখছি, ১৮১২ থেকে ১৮১৪-এর মধ্যে মিশন প্রেসে ছাপা বাংলা

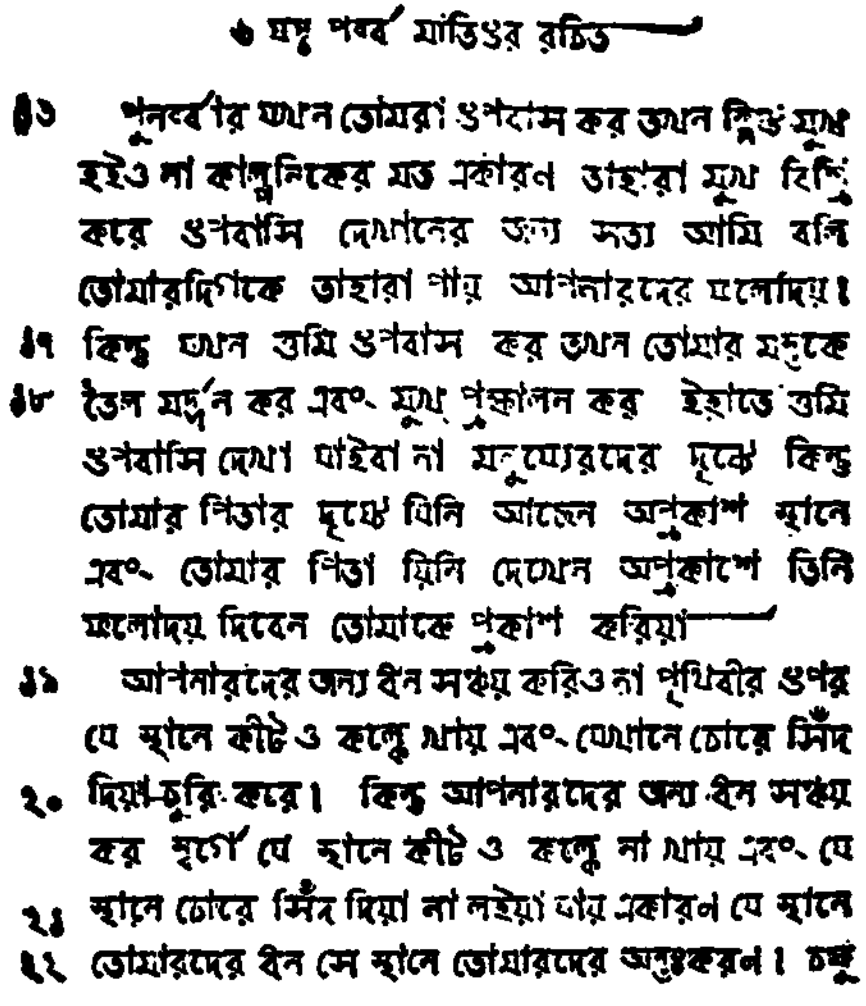
৬ ষষ্ঠ পর্ব্ব মাত্তিওর রচিত——

১৬ পুনর্ব্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন ক্লিষ্ট মুখ
হইও না কাল্পনিকের মত একারণ তাহারা মুখ বিশ্রী
করে উপবাসি দেখানের জন্য সত্য আমি বলি
তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।
১৭ কিন্তু যখন তুমি উপবাস কর তখন তোমার মস্তকে
১৮ তৈল মর্দ্দন কর এবং মুখ প্রক্ষালন কর ইহাতে তুমি
উপবাসি দেখা যাইবা না মনুষ্যেরদের দৃষ্টে কিন্তু
তোমার পিতার দৃষ্টে যিনি আছেন অপ্রকাশ স্থানে
এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন অপ্রকাশে তিনি
ফলোদয় দিবেন তোমাকে প্রকাশ করিয়া——
১৯ আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না পৃথিবীর উপর
যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক খায় এবং যেখানে চোরে সিঁদ
২০ দিয়া চুরি করে। কিন্তু আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয়
কর স্বর্গে যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক না খায় এবং যে
২১ স্থানে চোরে সিঁদ দিয়া না লইয়া যায় একারণ যে স্থানে
২২ তোমারদের ধন সে স্থানে তোমারদের অন্তঃকরণ। চক্ষু

মিশন প্রেসে ছাপা (১৮০১) বাইবেলের একটি পৃষ্ঠা

ধর্মীয় প্রচার পুস্তিকার ৩৫,২৮৩ কপি সাধারণ্যে বিতরিত হয়। এই সব ধর্মীয় পুস্তক ছাড়াও শ্রীরামপুরে মিশনে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমান্বয়ে রামায়ণ-মহাভারত ব্যতীত যে সব বাংলা গদ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২); কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১); ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২); গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২); মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮); রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫); চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫); হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫) ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' (৪ খণ্ড, ১৮০১-১৮০৩), কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' (৫ খণ্ড, ১৮০২-৩)। এই ২১টি বইয়ের মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৫,৬৪০। এ ছাড়া ছিল কেরীর বৃহৎ 'বাংলা অভিধান' (২ খণ্ড, ১৮১৫-২৫)। এই সব বই-ই বাংলা গদ্যের ভিত্তি দৃঢ় করেছিল।

মিশন প্রেসে ছাপা অধিকাংশ বাংলা বই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঐ সব বইয়ের অধিকাংশ লেখক, যেমন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। কেরীর আমন্ত্রণে তাঁরা ওখানে যোগদান করেন ও তাঁর উৎসাহে ঐ সব বই কলেজের প্রয়োজনে লিখে দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এর জন্য তাঁদের পারিশ্রমিক হিসাবে আর্থিক পুরস্কার দিয়ে ও বইয়ের অনেকগুলি করে কপি কিনে নিয়ে উৎসাহ দিতেন। মিশন প্রেস ছাড়া অন্যান্য দেশীয় ছাপাখানা ও তাদের প্রকাশিত বইয়ের প্রতিও কলেজ কর্তৃপক্ষ অনুরূপ উৎসাহ দেখাতেন। যেমন, সংস্কৃত প্রেস (১৮০৭), হিন্দুস্থানী প্রেস (১৮০২), ফারসী প্রেস (১৮০৫) প্রভৃতি কলেজের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

মিশনারি ও সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও এই সময়ে অনেক দেশীয় ছাপাখানা এবং শিল্পী বাংলা মুদ্রণের কাজে অগ্রণী হয়ে ছিলেন। দেশীয় ছাপাখানাগুলির অধিকাংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন গিলক্রিস্ট ও উইলিয়াম হান্টারের উদ্যোগে হিন্দুস্থানী প্রেস স্থাপিত হয়। পরে ডঃ লিডেন ও ডঃ উইলিয়াম স্বত্বাধিকারী হিসাবে হিন্দুস্থানী প্রেসে যোগদান করেন। রামকমল সেন এখানে একজন কম্পোজিটর হিসাবে কর্ম-জীবন শুরু করে শেষ পর্যন্ত এর প্রধানতম পরিচালক হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম "নেটিভ" গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের বাংলা-ইংরেজী শব্দকোষ (১৮১০) আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন।

সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পরিচালিত সমসাময়িক একটি ভালো ছাপাখানা সংস্কৃত যন্ত্র ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে উত্তরপ্রদেশের বাবুরাম ছিলেন এর স্বত্বাধিকারী। কলেজের পঠনপাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় হিন্দী ও সংস্কৃত বই এখানে ছাপা হত। কোলব্রুক সম্পাদিত 'অমরকোষ' (১৮০৭) এখানকার ছাপা। সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা বইয়ে বাবুরামের নিজস্ব মুদ্রণরীতি ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখা যায়। অলংকরণের প্রতি বাবুরামের ঝোঁক ছিল। যেমন, তাঁর অন্যতম প্রিয় নকশা 'তুষারকণা' (স্নো ফ্লেক্‌স্‌) এই প্রেসে মুদ্রিত অনেক বইয়ে দেখা যায়। মুদ্রণ-ব্যবসায়ে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। তাঁর পর ১৮১৪/১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হিন্দুস্থানী ভাষার শিক্ষক লল্লুলাল কবি এর স্বত্বাধিকারী হন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' (১৮১৭), রামমোহনের 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬) প্রভৃতি সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা। লল্লুলালের সহযোগে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য রামমোহনের কিছু কিছু বই ছাপেন। সংস্কৃত প্রেসের তত্ত্বাবধানে উত্তর কলকাতায় একটি বইয়ের দোকানও পরিচালিত হত (১৮১৪-১৮১৬ খ্রী)।

ঐ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রাক্তন কম্পোজিটর প্রথম উদ্যোগী বাঙালী মুদ্রণ-ব্যবসায়ী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য দীর্ঘ-কাল এর সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখান থেকে ছেপে কয়েকটি বাংলা বই তিনি প্রকাশ করেন। যেমন, রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্ত সার' (১৮১৫), 'দায়ভাগ' (১৮১৬-১৭) প্রভৃতি। গঙ্গাকিশোরের উদ্যোগে ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেসে ছাপা বিখ্যাত বই 'অন্নদা-মঙ্গল' (১৮১৬)। এটি প্রথম সচিত্র বাংলা বই। ধাতুফলকের ওপর খোদাইকরা ব্লক থেকে ছাপা ৬টি ছবি এতে আছে। এর কয়েকটি ছবি শিল্পী রামচাঁদ রায় কর্তৃক খোদাই করা। ঐ সময়ের অপর উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা বাঙ্গালি প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র। রামমোহনের 'কঠোপনিষৎ' (১৮১৭) এখানে ছাপা। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধান বিলাস' এই সময়-কার অন্যতম প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ (১৮১৪ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছাপা)।

আখ্যাপত্রহীন পুথির আকারে ছাপা বই।

রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ও এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলাসাহিত্যে যুক্তিবাদী চিন্তার চর্চা, ধর্মের সংকীর্ণ অনুশাসন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সর্বোপরি বাঙালীর বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন প্রধানতঃ রামমোহন থেকেই শুরু। সমসাময়িক কালের বাংলা মুদ্রণ ধারাও রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। রামমোহনের বইপত্র তখন দ্রুত মুদ্রিত হতে থাকে। এর প্রতিবাদস্বরূপ বিরুদ্ধবাদী রচনাও মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ফলে বাংলা সাহিত্যের আসর তখন বাদ-প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, রামমোহন প্রবর্তিত নতুন চিন্তার প্রবাহ থেকেই নতুন গদ্য রচনার জন্ম এবং সেই রচনাসমূহ দ্রুত ছাপা হতে থাকায় বাংলা মুদ্রণের গতিপ্রকৃতিও নতুন পথে মোড় নিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থ তখন থেকে বিষয়বস্তুর গৌরবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। রামমোহনের প্রথম বই 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) থেকেই বাংলাভাষায় বেদান্ত-উপনিষদ্ চর্চার সূত্রপাত। সব মিলিয়ে রামমোহনের আবির্ভাবে যুক্তিতর্কের প্রাবল্যে বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে একটি প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। ক্রমে তা একটি নতুন পর্বে বিস্তারের পথ খুঁজে নেয়।

বিস্তার পর্ব: ১৮১৭/১৮ খ্রীষ্টাব্দের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে বাংলা মুদ্রণে আবার পর্বান্তরের সূচনা হয়। ঘটনা দুটি হল ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, এবং বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্ল অব ময়রা কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোরতা হ্রাস। এই ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবে যে নতুন পর্বের সূচনা তাকে অভিহিত করা যায় বিস্তার পর্ব হিসাবে। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বে বাংলা মুদ্রণের বহুমুখী বিস্তার ঘটতে থাকে।

এই পর্বে পেঁছে বাংলা মুদ্রণের সীমানা বিস্তৃত হতে থাকে, মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিত্য নতুন সম্পদে ভরে উঠতে থাকে। বুদ্ধিজীবী বাঙালীর কাছে তখন বাংলা মুদ্রণ বৈচিত্র্য ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের নতুন স্বাদ এনে দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' লেখেন: "যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।" তদুপরি ঐ পর্বে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের সুযোগ সুবিধাও যেমন বৃদ্ধি পায়, মুদ্রণ কলাকৌশল ও উপকরণও যথেষ্ট উন্নত হয়। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মুদ্রাক্ষরের বৈচিত্র্য সাধন, অভিনব যতিচিহ্নের ব্যবহার ও বইয়ের অঙ্গসজ্জাবৃদ্ধির চেষ্টা চলতে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, মুদ্রণ-প্রকাশনের আদর্শ তখন ক্রমে ক্রমে রূপসন্ধানী হয়ে উঠতে থাকে। একই বইয়ে আখ্যাপত্র, অধ্যায়-শিরোনাম বা ভিতরের অংশ ভেদে ছোট ও বড় হরফের ব্যবহার সুষ্ঠুরূপে করবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বিস্তার পর্বে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন ধারা মূলতঃ চারটি প্রধান খাতে প্রবাহিত হয়েছিল: প্রথম ধারাটি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে, যার ফলে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় ধারার উদ্ভব ও বিকাশ হয় বাংলা সাময়িক পত্রপত্রিকা কেন্দ্র করে, যার প্রভাবে বাঙালীর সমাজ-সংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলন, সর্বোপরি বাঙালীর মানসমুক্তির আন্দোলন, ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। তৃতীয় ধারায় গতি সঞ্চার করেছিল পুনরুজ্জীবিত শ্রীরামপুর মিশন ও অন্যান্য মিশনারি প্রেস,—যার কল্যাণে বিষয়বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে বাংলা প্রকাশনার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। চতুর্থ ধারাটি গড়ে উঠেছিল কলকাতা ও তার আশেপাশের ছোট-বড়ো অসংখ্য দেশীয় মালিকানার ছাপাখানাকে কেন্দ্র করে, যার প্রভাবে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশনের আদিযুগের পরিণত রূপটি সেদিনকার এই চতুর্মুখী ধারার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ঐ সময় ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির সুসংহত প্রচেষ্টার ফলে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় যে গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। একটি হিসাবে দেখা যায় প্রথম চার বছরে (১৮১৭-২১) সোসাইটির উদ্যোগে অন্যান্য ভাষা ছাড়া কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতেই ১৯টি বইয়ের ৭৯,৭৫০টি কপি মুদ্রিত ও পরিবেশিত হয়। এ ছাড়া ঐ সময়ে আরও ১২টি বাংলা বইয়ের ২৭,০২৫টি কপি ছাপাখানার প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটির বাংলা প্রকাশনার গতি অব্যাহত ছিল। সোসাইটি অবশ্য আরও বহুকাল (১৮৭৭ পর্যন্ত) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও পরিবেশন ও পরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেবলমাত্র পরিবেশনের কাজে রত ছিল। কিন্তু তখন তা মূলতঃ ইংরেজী বইয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলা বই প্রকাশনায় এর দান কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে বিচার্য নয়, বিষয়-বৈচিত্র্য ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করবার গৌরবও সোসাইটির প্রাপ্য। সোসাইটির নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস ছিল সার্কুলার রোডে। সেখানে ছাপা বই: পীয়ার্সনের 'বাক্যাবলী', ২য় সং

(১৮২৫), ইয়েট্স্-অনূদিত 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩০), লসনের 'পশ্বাবলী' (১৮২৮), ইত্যাদি। তবে সোসাইটির বহু বই শ্রীরামপুর ও কলকাতার অন্যান্য প্রেসেও ছাপান হয়। যেমন: রাধাকান্ত দেব-তারিণীচরণ মিত্র-রামকমল সেন সঙ্কলিত 'নীতিকথা', ১ম ভাগ (১৮১৮) বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় ছাপা; পীয়ার্সন-মে-হারলে সংকলিত 'নীতিকথা', ২য় ভাগ (১৮১৮) ইউস্টেস কেরী ও ইয়েটসের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় মিশন প্রেসে ছাপা। এ ছাড়া তাঁদের অন্যান্য বইয়ের মুদ্রাকর ছিলেন: কলকাতার মিশন প্রেস: মে-র 'গণিত' (২য় সং ১৮১৯); তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯)। চুচুঁড়ার স্কুল প্রেস: হারলের 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৯); পীয়ার্সনের 'পাঠশালার বিবরণ' (১৮১৯); জেমস স্টুয়ার্টের 'এলিমেণ্টারি বেঙ্গলী টেব্‌লস' (১৮১৯)। বিশ্বনাথ দেবের প্রেস: রাধাকান্ত দেবের 'বেঙ্গলী স্পেলিং বুক' (১৮১৮)। শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস: রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' বা 'নীতিকথা', ৩য় ভাগ (১৮২০); জেমস স্টুয়ার্টের 'এলিমেণ্টারি বেঙ্গলী টেবল্‌স্' (ফোলিও সং, ১৮১৮); ফেলিক্স কেরীর 'ব্রিটিন দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮১৯-২০)। ঐ সব বইয়ের আধুনিক রীতিসম্মত দ্রুত পরিবেশনের ব্যবস্থাও সোসাইটি করেছিলেন। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী পুস্তক-ভাণ্ডার ছাড়া কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন স্থানে বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বিক্রেতাদের কমিশন দান (১৮২৪-২৫ থেকে), হিন্দু কলেজের কাছে নিজস্ব বই বিক্রয় কেন্দ্র (১৮২৭-২৮) স্থাপন, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সোসাইটি আধুনিক রীতিতে বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাংলা মুদ্রণের সংস্কার ও উন্নতিকল্পে সোসাইটির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। তাঁদের বিভিন্ন প্রয়াস তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায়: প্রথমতঃ, বাংলায় ইংরেজী প্রথানুযায়ী যতিচিহ্নের ব্যবহার। দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তাঁরা যে-সব নতুন ধরনের কপিবই ছাপাতেন তার সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে যেমন হাতের লেখা অভ্যাস করা যেত তেমনি একই সঙ্গে বইগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হত। সোসাইটির অনুরোধে ডব্লু. এইচ. পীয়ার্স ও ইউস্টেস কেরী এই নব-পর্যায় কপিবুকের যে প্রথম বই 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮১৯) প্রকাশ করেন তার প্রথম বিষয় ছিল 'এশিয়ার ভূগোল'। এর অক্ষর ও তা বিন্যাসের পদ্ধতি ছিল আধুনিক ধরনের এবং বইটিতে বাংলায় ইংরেজী যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এতে কমা, সেমিকোলন ইত্যাদির সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদে দাঁড়ির পরিবর্তে ফুলস্টপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সোসাইটির দ্বিতীয় প্রয়াস ছিল আরও অভিনব ও দুঃসাহসিক। বক্তব্যের গুরুত্বের বিভিন্নতা অনুযায়ী তাঁরা বাংলা হরফে বিভিন্ন ধাঁচ ও মাত্রা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁরা একই সঙ্গে সোজা মাত্রা ও বাঁকা বা তরঙ্গায়িত মাত্রার হরফের ব্যবহার প্রচলন করতে চান। সোজা মাত্রার হরফগুলি মূল ছাপা অংশের মধ্যে কেবলমাত্র উদ্ধৃতি, নাম বা অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছাপার কাজে ব্যবহার করবার কথা ভাবা হয়েছিল। এইভাবে বাংলায় ইংরেজীর মত ক্যাপিটাল, ইটালিকস্ প্রভৃতি ধরনের হরফের অভাব তাঁরা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। সোসাইটির অনুরোধে কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের অধ্যক্ষ ডব্লু. এইচ. পীয়ার্স বাংলা মুদ্রাক্ষরের এই সংস্কার সাধনে অগ্রণী হন। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদনটি (১৮২০) যখন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হয় তখন তার পরিশিষ্টে সংযোজিত একটি আবেদন পত্র এই প্রস্তাবিত নতুন হরফে ছাপা হয়। সোসাইটির প্রস্তাবিত হরফ সংস্কার শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রবর্তিত হতে পারেনি। তবু আজ নতুন করে ভাববার সময় এসেছে, ইংরেজী ইটালিকসের কাজ বাঁকামাত্রার বাংলা হরফে করা সম্ভব কি না।

বাংলা মুদ্রণের মানোন্নয়নকল্পে সোসাইটির তৃতীয় উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল, বাংলা মুদ্রণে তামা বা অন্য ধাতুফলকের ওপর খোদাই করা ব্লকের প্রবর্তন: বাংলা গ্রন্থে ছবি, নকশা, মানচিত্র ও বাংলা আদর্শ লিপি মুদ্রণ। সোসাইটির উদ্যোগে চিত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে বাংলা বই প্রকাশিত হতে থাকে। কাশীনাথ মিস্ত্রি নামক জনৈক দেশীয় শিল্পী এই ধাতুখোদাই ব্লক তৈরির কাজে নাম করেছিলেন। সোসাইটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালী খোশনবিশ কালীকুমার রায়ের হস্তাক্ষর ছটি তাম্রফলকে খোদাই করে আদর্শ বাংলা হস্তলিপির নমুনা ছেপেছিলেন (১৮১৮-১৯)। তাঁদের এই অভিনব প্রয়াস বাঙালী ছাত্রমহলে অভিনন্দিত হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির উদ্যোগে জনৈক বাঙালী শিল্পীর তৈরি ধাতুখোদাই ব্লক থেকে বাংলায় পৃথিবীর মানচিত্র ছাপা। বাংলায় মুদ্রিত মানচিত্রের প্রকাশ এই প্রথম। পীয়ার্সের ও পীয়ার্সনের ভূগোলে এই মানচিত্র সংযোজিত হয়। সোসাইটির উদ্যোগে বাংলা প্রকাশনা বিষয় বৈচিত্র্য ও মুদ্রণ সৌষ্ঠবে আভিজাত্য লাভ করতে থাকে। উগ্র ধর্মীয় প্রচার পুস্তিকা ও আদিরসাত্মক রচনার ভিড় কাটিয়ে তখন বাংলায় বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। দেশবিদেশের ইতিহাস, মানচিত্রসহ ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পশুপক্ষীদের ইতিহাস, দেশবিদেশের নীতিকথা, পদার্থবিদ্যা, শারীর তত্ত্ব, ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, স্ত্রীশিক্ষা, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের

বিদ্যালয় পাঠ্য বাংলা বই প্রকাশ করে সোসাইটি বাঙালী শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞানরাজ্যের বাতায়ন উন্মুক্ত করে দেন। বাংলা মুদ্রণের বিস্তার পর্বের এটি এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অপর বৈশিষ্ট্য হল বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের সূত্রপাত। দ্রুততালে সংবাদপত্র সম্পাদন-মুদ্রণ-প্রকাশন ও পরিবেশনের তাগিদে সমগ্র মুদ্রণব্যবস্থায় যে অভিনব গতিবেগ সঞ্চারিত হয় তারই ফলে আসে বাংলা মুদ্রণের যথার্থ বিস্তার। সঙ্গে সঙ্গে আসে বাঙালীর মানস-মুক্তির সুযোগ। চিন্তার মুক্তি, চিত্তের মুক্তি। এই সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে দেখা দিয়েছিল বাংলা সাময়িকপত্র।

বাংলা সাময়িকপত্র প্রসারের আরও একটি বড় দান বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ছাপাখানার বিস্তার। এক একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন ছাপাখানা গড়ে উঠেছিল। যেমন, বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস (চোরবাগান), চন্দ্রিকা যন্ত্র (কলুটোলা), সম্বাদ তিমির-নাশক ছাপাখানা (মির্জাপুর স্ট্রীট), বঙ্গদূত প্রেস (সিমলা), সংবাদ প্রভাকর প্রেস (সিমলা), সম্বাদ সুধাকরের প্রেস (জোড়াবাগান), রত্নাবলী প্রেস (বাঁশতলা গলি), ইত্যাদি। এ ছাড়া ঐ সব পত্রিকা-কেন্দ্রিক ছাপাখানাকে আশ্রয় করে অনেক বাংলা বইও তখন প্রকাশিত হত। এইভাবে এক একটি প্রকাশন সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই পত্রিকা-কেন্দ্রিক প্রকাশন সংস্থার ধারা বাংলাদেশে এখনও অব্যাহত আছে।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সাময়িক ভাঁটার টান এসেছিল; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের মধ্য দিয়ে মিশন প্রেস পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য নিয়মিত বই ছাপার তাগিদ এই পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছিল। এই নতুন অধ্যায়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জন ম্যাক প্রভৃতি নবীন মিশনারি গোষ্ঠী। তাঁদের ঐ সময়কার বিচিত্র বিষয়ক প্রকাশনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮২০), 'যাত্রিরদের অগ্রেসরণ বিবরণ', ১ম/২য় (১৮২১/২২), জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ২ খণ্ড (১৮৩১), 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (১৮১৯), 'সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' (১৮২৯), জন ম্যাকের 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (১৮৩৪), ইত্যাদি। এই সময়ে শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণের মান খুব উন্নত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ 'আইন' (১৮২৮) নামক বইটির কথা উল্লেখ করা যায়। বইটি পরিস্কার সুন্দর হরফে (উচ্চতায় ২·৫ মি.মি.) ছাপা, দেখে মনে হয় যেন লাইনোটাইপের পূর্বাভাস।

ঐ সময়ে শ্রীরামপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নবীন মিশনারিদের এক গোষ্ঠী ইউস্টেস কেরী, উইলিয়াম পীয়ার্স, ইয়েটস প্রভৃতি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সার্কুলার রোডে যে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস গড়ে তোলেন, সেখানেও বাংলা মুদ্রণের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলে। স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগে তাঁরা যেমন অনেক বাংলা বই ছেপেছিলেন, তেমনি বাংলা মুদ্রণের উন্নতির জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছিলেন।

সরকারী ও মিশনারি প্রচেষ্টা ছাড়াও সমসাময়িক কালের মুদ্রণ-ব্যবসায়ে উৎসাহী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছিলেন।

ঐ সময়ের অপর উল্লেখযোগ্য মিশনারি প্রেস ছিল: আমহার্স্ট স্ট্রীটের চার্চ মিশন প্রেস এবং শিবপুরের বিশপস কলেজ প্রেস। প্রথমোক্ত প্রেসে ছাপা উল্লেখযোগ্য বাংলা বই: 'ইংলণ্ডে ও ঐর্লণ্ডে সংস্থাপিত মণ্ডলীর সাধারণ প্রার্থনা' (১৮২২)। বিভিন্ন আকারের হরফে সুন্দর ছাপা। এতে ফুলস্টপ সমেত বিভিন্ন ইংরেজী যতি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এর মুদ্রাকর ছিলেন রোজারিও। বিশপস কলেজ প্রেসে ছাপা উল্লেখযোগ্য বই: মর্টনের বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮২৮)।

সরকারী ও মিশনারি প্রচেষ্টা ছাড়াও সমসাময়িক কালের মুদ্রণ-ব্যবসায়ে উৎসাহী বহু বাঙালীর উদ্যোগে কলকাতা ও তার আশেপাশে বেশ কিছু ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল। সেগুলি থেকে বহু বিচিত্র বাংলা বই ও পত্রপত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাংলা মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতির পথ এর ফলে প্রশস্ত হয়।

এই পর্বের মুদ্রণ-প্রকাশন ধারাকে বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে তা হল: প্রথমতঃ, 'কলিকাতা মহানগরে ছাপাযন্ত্রের বাহুল্য' বা 'কলিকাতা নগরে ভূরি ২ ঐ যন্ত্রালয়' প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রণ কলাকৌশলের উৎকর্ষ সাধন, অর্থাৎ 'কে কত উত্তমরূপে অথচ অল্প-মূল্যে গ্রন্থাদি ছাপাইতে পারেন' তার প্রতিযোগিতা; তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসাধন, অর্থাৎ 'নানা বিদ্যাবিষয়ক' ও 'নানা দেশ বিবরণ পুস্তক' প্রকাশ।

ঐ সময়কার দেশীয় ছাপাখানাগুলির মধ্যে, ১৮২০ সালের মধ্যে উল্লেখ পাই: পটলডাঙ্গার লল্লুলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্র, আড়পুলি লেনে হরচন্দ্র রায়ের ছাপাখানা, শোভাবাজারে বিশ্বনাথ

দেবের প্রেস ও লালবাজারস্থ হিন্দুস্থানী ছাপাখানা। শেষোক্ত প্রেসটির বিদেশী মালিকানা সত্ত্বেও রামকমল সেন এর মুখ্য পরিচালক হওয়ায় এটিও দেশী ছাপাখানা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। রামকমল সেনের 'ঔষধসার সংগ্রহ' (১৮১৯) এখানে ছাপা। এ ছাড়া ছিল বাঙ্গালি প্রেস, সেখান থেকে ছাপা হয় রামমোহনের 'কঠোপনিষৎ' (১৮১৭), রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১৮১৮)। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ চোরবাগানের বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস উঠে যায়। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাঁর প্রেস 'বাঙ্গালা যন্ত্র' নিজ গ্রাম বহড়ায় নিয়ে যান। সেখানে ছাপা: 'শ্রীভগবদ্‌গীতা' (২য় সং, ১৮২৪), 'দ্রব্যগুণ' (১৮২৪), ইত্যাদি। অপরদিকে গঙ্গাকিশোরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর হরচন্দ্র রায় ৯ নং আড়পুলি লেনে প্রেস স্থাপন করেন। সেখানে ছাপা কয়েকটি বই: রামমোহন রায়ের 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০); পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ' ও 'উদ্ধবদূত' (১৮২১); শ্রীমন্ত রায় কর্তৃক মুদ্রিত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চাননের 'ভগবতী গীতা' (১৮২৪)—এর গোড়ায় নারদ ও শিবের একটি ধাতুখোদাই চিত্র আছে; বারাণসী আচার্যের 'কালীর সহস্র নাম,' 'বিষ্ণুর সহস্র নাম' (১৮২৪) ইত্যাদি। সংস্কৃত যন্ত্র ১৮১৫ থেকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। মদন পাল এখানকার মুদ্রাকর ছিলেন। রামমোহনের কিছু বই ছাড়াও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' (১৮১৭), গঙ্গাধর ভট্টাচার্য অনূদিত 'মহিম্নঃ স্তব' (১৮২৩) ইত্যাদি এখানে ছাপা। সমসাময়িককালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। এখানে ছাপা বই: রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত কবিকঙ্কণ 'চন্ডী' (১৮২৪, ৫টি চিত্র শোভিত); রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ', ১৮২১; দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১৮২৪, বিশ্বম্ভর আচার্য খোদিত 'ভগীরথ গঙ্গা' নামক চিত্র সম্বলিত); রাধামোহন সেনের সচিত্র 'বিম্বমোদ তরঙ্গিণী' (১৮২৬), ইত্যাদি। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী'-র অপর একটি সংস্করণ (১৮২৮) সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত পাওয়া যায়। শিয়ালদহের সিন্ধুযন্ত্রে ছাপা একটি উল্লেখযোগ্য বই: রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার অনূদিত (গোপীনাথ চক্রবর্তী রচিত মূল সংস্কৃত নাটক) 'কৌতুক সর্ব্বস্ব নাটক' (১৮২৮)। মনে হয় এটি প্রথম মুদ্রিত বাংলা অনুবাদ নাটক। ঐ সময়কার আরও যে সব ছাপাখানার সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য; বউবাজারের লেবেন্ডর সাহেবের ছাপাখানা, শাঁখারিটোলার মহেন্দ্রলাল 'প্রেস', বদন পালিতের প্রেস, মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়, মির্জাপুরের মুনশি, হেদাতুল্লার ছাপাখানা, চোরবাগানের মথুরনাথ মিত্রের যন্ত্রালয়, রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়, ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল শ্রীরামপুরে নীলমণি হালদারের ছাপাখানা (১৮২৫) ও রত্নাকর যন্ত্রালয় (১৮২৬), এবং অগ্রদ্বীপে দেশীয় ছাপাখানা, যার নিযুক্ত ভ্রাম্যমাণ পুস্তকবিক্রেতার কথা শোনা যায়।

বিস্তার পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বাংলা মুদ্রণে 'পাষাণযন্ত্র' বা 'লিথোগ্রাফিক ছাপার' প্রবর্তন। এই নতুন প্রথায় নানাধরণের ছবি, নকশা, মানচিত্র প্রভৃতি ছাপা আরম্ভ হয়। বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্পে এক অভিনব সংযোজন। এই পদ্ধতিতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতের ও কলকাতার বাংলা নকশা ছাপা হয়। পাথরিয়া ছাপাখানায় গঙ্গা নদীর নকশাও (১৮২৫) ছাপা হয়েছিল। ১৮২৮ সালে ছাপা হয়েছিল ১২১টি প্লেট সম্বলিত ভারতের তাবৎ রাস্তার বিবরণ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'শুড়া পাতুরিয়া প্রেষ' নানা বই, প্রতিমূর্তি, ক্যালেন্ডার, ছবি ছাপতে আরম্ভ করে। দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ সংকলিত প্রথম সচিত্র 'পঞ্জিকা' (১৮১৮) সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত।

সচিত্র বাংলা বইয়ের প্রাচুর্য থেকে প্রকাশনায় শোভনতাবুদ্ধির ঝোঁক প্রমাণিত হয়। পূর্বোল্লিখিত সচিত্র বইগুলি ছাড়া 'ভগবতী গীতা' (আড়পুলি ছাপাখানা, ১৮২৪), 'দূতী-বিলাস' (সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়, ১৮২৫), 'হরিহর মঙ্গল সঙ্গীত' (১৮৩১) প্রভৃতি বইয়েও ধাতুখোদাই ছবি পাওয়া যায়। সে যুগের ধাতুখোদাই শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন: হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ মিস্ত্রি, রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, রামসাগর চক্রবর্তী ও বীরচন্দ্র দত্ত।

মধ্য বা প্রাগাধুনিক যুগ

বাংলা মুদ্রণের এই বিচিত্রমুখী বিস্তার ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সীমানা পেরিয়ে এক নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আগেই বলেছি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর মৃত্যুর ঘটনাকেই আমি যুগাবসানের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছি। ইতিমধ্যে পট পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। আদিযুগের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বাংলা মুদ্রণ সাবালকত্ব অর্জনে সাফল্য লাভ করবার পথে এগিয়েছে, এবং তার ফলে কেরী-উত্তরপর্বে যে নতুন যুগ আরম্ভ হল মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যের বিচারে তা পুরোপুরি আধুনিক পর্যায়ভুক্ত না হলেও, আধুনিকতার লক্ষণগুলি তখন ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। বাংলা মুদ্রণের এই যুগকে তাই আখ্যা দেওয়া যায় মধ্য বা প্রাগাধুনিক যুগ। ১৮৩৫

খ্রীষ্টাব্দে এর শুরু। আদিযুগের হরফগুলি তখন লুপ্ত হয়েছে, ছাপাখানার প্রয়োজনে বাংলা মুদ্রাক্ষর ও অলংকরণের জন্য নানাবিধ নকশা ব্লকের স্বতন্ত্র বাজার তখন গড়ে উঠেছে, মুষ্টিমেয় মুদ্রাযন্ত্রের সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালী গ্রন্থকার তখন স্বাধীনভাবে নিজ প্রয়োজন বা সামর্থ্য অনুযায়ী ছাপাখানা নির্বাচন করে নিতে পারছেন। অর্থাৎ বাংলা মুদ্রণ প্রকাশনের সুযোগ তখন লেখক-প্রকাশকের কাছে সহজলভ্য হয়ে এসেছে, বাংলা মুদ্রণের ব্যয় কমেছে, সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে; অর্থাৎ, মুদ্রণের গতি বেড়েছে, বাংলা মুদ্রণের কলাকৌশল উন্নত হয়েছে, অ-পেশাদারি অপটুত্বের পর্ব অতিক্রম করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন শিল্প তখন দৃঢ়মূলে স্থিতিলাভ করেছে ও সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগের চিন্তাভাবনার স্পর্শে বাংলা মুদ্রিতগ্রন্থের বিষয়-বস্তুর পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। সাময়িক পত্র, বিশেষ করে দৈনিক সংবাদপত্র প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ ক্রমে মুদ্রণজগতের অনেক কাছাকাছি এসেছে। তা ছাড়া মুদ্রিত সাহিত্যে মানবতাবোধের জয়ধ্বনিও ক্রমশঃ সোচ্চার হতে আরম্ভ করেছে। এই বিচিত্র লক্ষণ-সমন্বিত যুগকে বাংলা মুদ্রণের মধ্য বা প্রাগাধুনিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেটকাফ কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে এর আরম্ভ এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এর সমাপ্তি।

প্রাগাধুনিক যুগের সূচনায় বাংলা মুদ্রণে যে জোয়ার আসে তার অনুকূলে শক্ত কাণ্ডারী হিসাবে হাল ধরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাঙালীর সমাজ-শিক্ষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে তিনি যেমন স্মরণীয়, বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসেও তাঁর দান অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে, বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ছিলেন ঐ যুগের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বাংলাভাষা ও মুদ্রণের উন্নতিকল্পে একজন সচেতন শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন বাংলা বর্ণমালার সংস্কারে উদ্যোগী হন, তেমনই তিনি নিজেই বাংলা মুদ্রণ-প্রকাশন-ছাপাখানা পরিচালন ও বইয়ের ব্যবসায়ের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর এই দুটি পরিচয় সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সচেতন নই। বাংলা মুদ্রণ ও সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরের সমস্যা তাঁকে বিশেষ ভাবিত করেছিল। বাংলাভাষা শিক্ষার প্রসার ও মুদ্রণের কাজকে সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য তিনি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সংস্কার করেন এবং তাদের একটি আদর্শ রূপ প্রস্তাব করে 'বর্ণপরিচয়', প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ও ১৪ জুন প্রকাশ করেন। 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশ বাংলা ভাষা-সাহিত্য তথা মুদ্রণের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে বাঙালীর ভাষা যেমন একটি নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছিল, বাংলা হরফও তেমনি একটি প্রমিত বা স্ট্যান্ডার্ড রূপ লাভ করতে পেরেছিল। বর্ণপরিচয়ে তিনি মোট ৫২টি বর্ণ প্রস্তাব করেন: স্বরবর্ণ ১২টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি। তাঁর আগে বহুকাল প্রচলিত ছিল মোট ৫০টি বর্ণ, স্বরবর্ণ ১৬টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪টি। বাংলাভাষায় দীর্ঘ-ঋকার ও দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ না থাকায় বিদ্যাসাগর ঐ দুই বর্ণ পরিত্যাগ করেন। তা ছাড়া সবিশেষ বিচার বিবেচনায় দেখা যায় অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। সেজন্য ঐ দুই বর্ণকে তিনি স্বরবর্ণ থেকে সরিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণ তালিকায় স্থানান্তরিত করেন। আর চন্দ্রবিন্দুকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে তিনি গণনা করেন। ড ঢ য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকলে, ড় ঢ় য় হয়; এগুলি অভিন্ন বর্ণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন ঐগুলিকে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে উল্লেখ করাই উচিত। এই যুক্তিতে বিদ্যাসাগর ঐ তিনটি বর্ণকেও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলে নির্দিষ্ট করেন। 'ক' ও 'ষ' মিলে 'ক্ষ' হয়, সুতরাং এটি সংযুক্ত বর্ণ। তাই পূর্বে প্রচলিত 'ক্ষ' অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হয়। বাংলা ভাষায় তকারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ রূপ প্রচলিত আছে; দ্বিতীয় রূপটিকে বলা হয় 'খণ্ড-তকার'। ঈষৎ, জগৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লেখার সময় খণ্ড-তকার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এটিকেও বিদ্যাসাগর ব্যঞ্জনবর্ণ তালিকায় যুক্ত করেন।

বিদ্যাসাগর নতুনভাবে নতুন ছাঁচে অক্ষর তৈরি করান। তাঁর বর্ণমালার ভিত্তিতে যে বাংলা মুদ্রাক্ষর তৈরি হয়েছিল তা বিদ্যাসাগর সাট নামে পরিচিতি লাভ করে। অবশ্য লক্ষণীয়, বাংলা অক্ষরের সংখ্যাধিক্যের যে সমস্যা তা এতে মেটেনি। বিদ্যাসাগরের সংস্কারে বাংলা অক্ষরের মোট সংখ্যা বরং বেড়েছিল।

প্রসঙ্গতঃ বাংলা ভাষা শিক্ষা ও বাংলা মুদ্রণ সহজতর করার জন্য ক্রিশ্চিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশান সোসাইটির এজেন্ট পাদ্রি জন মার্ডকের ভাবনা ও প্রস্তাবের কথা এখানে উল্লেখ্য। স্কুল-পাঠ্য বই প্রকাশনায় দীর্ঘকাল যুক্ত থেকে তিনি বাংলাভাষায় প্রয়োগশৈলীগত যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হন তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি খোলা চিঠিতে বাংলা অক্ষর সংস্কারের কয়েকটি প্রস্তাব করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, স্বর-সংযোজনের সমতা (গু-গু , শু-শু প্রভৃতির একটি রূপ গ্রহণীয়); ব্যঞ্জনের অন্তর্নিহিত

স্বরধ্বনিলোপ হসন্ত-চিহ্ন (মারডক যাকে 'বিরাম' বলে উল্লেখ করেছেন) দ্বারা নির্দেশ (যেমন, বর্, তত) এবং সর্বোপরি, যুক্তাক্ষর বর্জন অর্থাৎ হসন্ত (মারডকের ভাষায় 'বিরাম') চিহ্নের সাহায্যে যুক্ত-ব্যঞ্জন ভেঙে সরলীকরণ। শেষোক্ত প্রস্তাবের উদাহরণ হিসাবে তিনি জানান: 'চিক্কণ' হতে পারে 'চিক্‌কণ', তেমনই চিন্তা—চিন্‌তা, বন্ধু—বন্‌ধু, উল্কা—উল্‌কা, রুক্মিণী—রুক্‌মিনী। তিনি অবশ্য য-ফলা, র-ফলা প্রভৃতি কয়েকটি চিহ্ন বা কিছু কিছু যুক্তবর্ণ (যেমন, 'ক্ষ') রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। মারডক বলতে চেয়েছিলেন, প্রস্তাবিত সংস্কারের দ্বারা বাংলা ভাষা শেখা, লেখা, পড়া ও ছাপা সহজ হবে, স্বল্প ব্যয়ে বাংলা হরফের ক্ষুদ্রায়তন সাট তৈরি সম্ভব হবে। তাঁর প্রস্তাবের উত্তরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য কি ছিল জানা যায়নি । সেদিন তাঁর সংস্কার প্রস্তাবও কার্যকর হয়নি। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা আজ নতুন করে স্বীকৃত হতে চলেছে। শতাধিক বছর আগে ঐ চিঠিতে মারডক সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন: "Though the proposal may now be treated with ridicule, its adoption is a mere question of time."

বর্ণসংস্কার প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয়ে প্রতি বর্ণের নিচে ছবিও ছেপেছিলেন: অ-এর সঙ্গে অজগর, আ-এর সঙ্গে আনারস কেবল যে শিশুমনেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তা নয়, সেদিন তা বাংলা ভাষা শিক্ষা ও প্রকাশনের জগতে তুমুল আলোড়ন এনেছিল।

এ ছাড়া বিদ্যাসাগরের আরেকটি যে বড় পরিচয় তা হল তিনি ছিলেন একাধারে প্রকাশক, পুস্তক-বিক্রেতা ও ছাপাখানার মালিক বা মুদ্রণ-ব্যবসায়ী। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথভাবে পটলডাঙ্গায় ৬২ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেস (বা যন্ত্র) নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬০০ টাকা ধার করে একটি পুরনো কাঠের প্রেস ও হরফ কিনে এই ছাপাখানার কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রেসে ছাপা প্রথম বই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' (১৮৪৭) কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুঁথি অবলম্বনে ছাপা। এর আগে বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা প্রথম বই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) তৎকালের প্রসিদ্ধ রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়। তাঁর পরবর্তী বই 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) ছাপতে গিয়েই নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপনে তিনি উদ্যোগী হন। পরবর্তীকালে (১৮৫৬) বিদ্যাসাগর এই সংস্কৃত প্রেসের সম্পূর্ণ মালিক হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এর দুই-তৃতীয়াংশ আট হাজার টাকায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীচরণ ঘোষকে বিক্রি করে দেন। এই প্রেস থেকে তাঁর নিজের ও অপরের বহুসংখ্যক বই এবং তাদের বিভিন্ন সংস্করণের হাজার হাজার কপি ছাপা হয়েছে। 'বর্ণপরিচয়' বছরে ৫০ হাজার কপি কাট্‌তি হয়। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত পুস্তক ছাপতে আরম্ভ করেন।

প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি (১৮৪৭) স্থাপন করেন। সেখানে সংস্কৃত প্রেসে ছাপা সকল বই বিক্রির জন্য মজুদ থাকত। এ ছাড়া অন্যের প্রকাশনও কমিশনে বিক্রির জন্য সেখানে মজুদ হত। ফলে তাঁর বইয়ের ব্যবসা রীতিমত জমে ওঠে। শুধু স্কুলপাঠ্য বই মুদ্রণ-প্রকাশন-বিক্রয়ে তাঁর মাসিক গড় আয় দাঁড়িয়েছিল তিন চার হাজার টাকা। এইভাবে তখনকার কালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশন সংস্থার মালিক হন বিদ্যাসাগর। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বাজারে বিদ্যা-সাগরের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হওয়ায় স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় আধুনিক বইয়ের দোকানেরও পথপ্রদর্শক হন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুকূলে তাঁর ডিপজিটরির স্বত্ব ত্যাগ করেন। পরে ডিপজিটরি থেকে সকল বই তুলে নিয়ে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বৃদ্ধবয়সে তিনি ২৫ নং সুকিয়া স্ট্রীটে 'কলিকাতা পুস্তকালয়' নামে একটি নতুন বইয়ের দোকান খোলেন। তখন থেকে বিদ্যাসাগরের নিজের ও কপিরাইটের বইগুলি এই দোকান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি মাত্র দুখানি বই এস. কে. লাহিড়ী কোম্পানীকে দিয়েছিলেন।

প্রাগাধুনিক বাংলা মুদ্রণপর্বে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাই বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে স্মরণীয়। তিনি তাঁর শিক্ষার আদর্শ কার্যকর করার জন্য নিজেই কাজে অগ্রসর হয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য ধাপে ধাপে নানা বই রচনা করেছেন, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে নিজেই তা' ছেপেছেন, আবার তা বিক্রির জন্য বইয়ের দোকানও স্থাপন করেছেন। শিক্ষার প্রচার ছাড়াও ব্যবসায়িক সাফল্য লাভও যে এতে সম্ভব তাও তিনি দেখিয়েছেন। এইভাবে তিনি ভবিষ্যৎ বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপন করে যান।

প্রকাশক বিদ্যাসাগরের কাজ আরম্ভ হবার আগে থেকেই আরেকটি প্রকাশনধারা চলছিল, যা প্রধানতঃ বটতলার সাহিত্য হিসাবে পরিচিত। চিৎপুর, শোভাবাজার, কুমারটুলি, আহিরীটোলা, দর্জিপাড়া, গড়ানহাটা, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো, সিমলা, মির্জাপুর, শিয়ালদহ, বউবাজার, শাঁখারিটোলা, চাঁপাতলা ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বটতলা প্রকাশনার কাজ চলত। সস্তার বিচিত্র

বিষয়ের বাংলা বই ছাপাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মোটামুটি ১৮৪০-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রকাশনধারা সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিল। শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার (১৮১৮-২০) সময় থেকেই অবশ্য এর সূত্রপাত। অশ্লীল কথিকা থেকে ধর্মকথা, লঘু রচনা থেকে গুরু প্রবন্ধ সবই এর উপজীব্য ছিল। আর এই সব বই ছেপে বেরোত অসংখ্য ছোটখাটো ছাপাখানা থেকে। সস্তা কাগজে, নড়বড়ে মেশিনে, ভাঙা হরফে তার বেশীর ভাগ ছাপা হত। তবে সংখ্যাধিক্য ও চাহিদার প্রাবল্যে তা বাংলা মুদ্রণের একটি বিশিষ্ট ধারা গড়ে তুলেছিল। নৃত্যলাল শীল এই ধারার অন্যতম বিশিষ্ট মুদ্রাকর-প্রকাশক ছিলেন। ঐ সময়ে বাংলা বইয়ের দাম কমানোর একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

ওদিকে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস ও পঞ্চানন কর্মকারের ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত ছিল। মনোহর কর্মকারের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের ছাপাখানা চন্দ্রোদয় যন্ত্র সেকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে ছাপা 'গুলেবকাউলির' বাংলা অনুবাদ (১৮৪৩), 'কালকৌতুক নাটক' (১৮৫৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রেসে ছাপা হত মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞানারুণোদয়' (১৮৫২)। এখান থেকে নিয়মিত পঞ্জিকাও ছাপা হত। পঞ্চাননের বংশের অধর কর্মকার সুন্দর হরফ নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। তাঁর নিজস্ব হরফ ঢালাইখানা অধর টাইপ ফাউণ্ড্রি প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমান শতকের প্রথম পাদেও এই ফাউণ্ড্রি ছাপাখানার চাহিদা মেটাত কলকাতার কেশব সেন স্ট্রীটের কারখানা থেকে।

এদিকে মুদ্রণ কলাকৌশলের উন্নতির জন্যও প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। হাফটোন প্রথায় ব্লক প্রস্তুত ও তা থেকে উৎকৃষ্ট ছবি ছাপার প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায়. এণ্ড সন্স ছিল বহু প্রেসেস-শিল্পীর শিক্ষাকেন্দ্র।

আধুনিক যুগ

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা লাইনোটাইপ প্রবর্তনের ফলে বাংলা মুদ্রণশিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে সেদিন থেকে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে নব যুগের সূত্রপাত। দ্রুতগতি সম্পন্ন মুদ্রণযন্ত্র রোটারী মেশিনের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে লাইনোটাইপ মেশিনে দ্রুত বাংলা কম্পোজের প্রয়োজন দেখা দেয়। গতিই ছিল সেদিন আধুনিকতার মূলমন্ত্র। বিশেষ করে দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। সেই প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখেই বহুদিনের প্রচেষ্টার পর সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রথম এ কাজে সফল হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম বাংলা লাইনোটাইপে ১২২টি শব্দ ছাপা হয়। এর দু'দিন আগে লাইনোটাইপ কোম্পানীর শো-রুমে বাংলা লাইনোটাইপ মেশিনের উদ্বোধন হয়। লাইনোটাইপ উদ্ভাবনে সুরেশচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন রাজশেখর বসু। তাছাড়া সেদিন মূলে বাংলা অক্ষরগুলির আকৃতি অঙ্কন করেছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের তত্ত্বাবধানে সুশীলকুমার ভট্টাচার্য।

লাইনোটাইপ প্রবর্তনের জন্য বাংলা বর্ণমালার বেশ কিছু সংস্কার করতে হয়। যার মূল কথা ছিল, অক্ষরের সংখ্যা হ্রাস ও যুক্তাক্ষরের জটিলতা বর্জন। তাছাড়া হরফগুলিকে এমন ছাঁদে সংস্কার করতে হয় যাতে হরফ যোজনা সহজ হয় এবং সেগুলিকে পাশাপাশি সাজালেই চলে, একটির মাথা অন্যটির মাথায় বা নিচে না বসে। যুক্তাক্ষরের হিসাব ধরে বাংলা ছাপার কাজের জন্য ৫০০/৫৫০ হরফ প্রয়োজন। এ ছাড়া তার জটিল বিন্যাস তো ছিলই। ফলে মুদ্রণের কাজ ছিল সময়সাপেক্ষ। অথচ ইংরেজী বর্ণমালায় মোট ২৬টি বর্ণ। এই ২৬টি বর্ণ বা অক্ষরের যোগাযোগেই সমস্ত ইংরেজী শব্দ গঠিত ও তার ছাপার কাজ সম্পন্ন হয়। অবশ্য আপার কেস ও লোয়ার কেস থাকায় ঐ সংখ্যা বড় জোর দ্বিগুণ হয়। তবু ইংরেজীর তুলনায় বাংলায় ছাপার সমস্যা অনেক বেশী। তাই বাংলায় লাইনোটাইপ প্রবর্তনের জন্য যে সংস্কার করা হয় তার ফলে হরফের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। বাংলা অক্ষরের যে সব সংস্কার করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: লাইনোর 'আ' একটি পৃথক অক্ষর না হয়ে 'অ' এর সঙ্গে 'া' যোগ করে প্রস্তুত হয়। স্বরচিহ্নগুলিকে পৃথক করে প্রয়োজন মত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে জুড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। যেমন, কা, খি, চু, গু, ইত্যাদি। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য অর্ধাক্ষর সৃষ্টি করা হয়। পূর্ব সংযোগ ক্ষেত্রে কিছু কিছু অক্ষর ছোট ও পৃথক করা হয়। যেমন, 'উত্থার', 'শঙ্কর', 'সঞ্চারিত' ইত্যাদি। মিশ্র ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে কতকগুলি যুক্তাক্ষর রাখা হয়, আবার কতকগুলি যোগ করে তৈরি করা হয়। হাতে কম্পোজের তুলনায় লাইনোতে কম্পোজ করতে সময় ছয় ভাগের এক ভাগে এসে দাঁড়ায়। এইভাবে বাংলায় লাইনোটাইপের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মুদ্রাক্ষরের জটিলতা হ্রাস ও মুদ্রণের গতি বৃদ্ধির সূত্রপাত। এই থেকেই আধুনিক যুগের আরম্ভ।

লাইনোতেই সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি। বাংলা মনোটাইপের প্রবর্তন হল; এসেছে ইণ্টার টাইপ। যান্ত্রিক অক্ষর-বিন্যাস রীতিতে হরফের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, ইণ্টারটাইপে হরফের সংখ্যা

দুশরও নিচে। বোধ হয় অক্ষর-বিন্যাস দৃষ্টিশোভন নয় বলে ইন্টারটাইপ এখনও জনপ্রিয় হতে পারেনি।

> যদি এমন ভাবে বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে হইলে অপরাপর ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষাও শিখিতে হয়, এবং না শিখিলে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় চিরকালের মত অজ্ঞাত থাকিয়া যায় ও অন্য শত ভাষা শিক্ষা করিয়াও পূরা মানুষ হওয়া না যায়, তবেই বঙ্গভাষা জগতে চিরস্থায়িনী হইবে; বাঙ্গলার ভাষা জগতের অন্যান্য প্রধানতম ভাষার শ্রেণীতে সমুন্নীত হইবে। অন্যথা বঙ্গের তথা বঙ্গভাষার গৌরব বাড়িল কৈ? বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট্ সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে। কিছুই অসম্ভব নহে। চেষ্টা ও একাগ্রতা থাকিলে এই সংসারে স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করা যায়। কাল অনন্ত এবং পৃথিবী বিপুল, সুতরাং ব্যস্ততার কারণ নাই। ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপপূর্ব্বক আমার জননী বঙ্গভাষাকে অনন্তকাল-রূপী অক্ষয়বটের ছায়াশীতল তলদেশে লইয়া যাইয়া বঙ্গের পূজনীয় ভাষাকে জগতের পূজনীয় করিতে হইবে।

প্রথম লাইনোতে ছাপার নমুনা। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই আশ্বিন ১৩৪২

যান্ত্রিক অক্ষর-বিন্যাসের এই সব নতুন পদ্ধতি হাতে কম্পোজের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে। সে প্রভাব প্রধানতঃ হরফ সংখ্যা কমানোতেই সীমাবদ্ধ। যান্ত্রিক অক্ষর-বিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন বাংলা মুদ্রণে যুগান্তরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। কিন্তু তা এখনও পুরোপুরি সার্থক হয়নি। লাইনো প্রবর্তনের তেতাল্লিশ বছর পরেও অধিকাংশ বাংলা বই হাতে কম্পোজ করা হয়। কারণ বাংলা বইয়ের চাহিদা কম, অল্প সংখ্যক কপি ছাপা হয়। বেশী কপি একসঙ্গে না ছাপলে যান্ত্রিক কম্পোজে ব্যয় বেশী পড়ে। তাছাড়া চড়া দামে বিদেশী যন্ত্র কেনার সামর্থ্যই বা কটি ছাপাখানার আছে?

শুধু যান্ত্রিক কলা-কৌশল উদ্ভাবনের দ্বারাই বাংলা মুদ্রণের উন্নতি হবে না। উন্নতির প্রধান শর্ত হল জীবনের সকল স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, মুদ্রণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং দেশে সস্তায় উন্নতমানের মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর-বিন্যাসের যন্ত্র নির্মাণ।

পাঠপঞ্জী

নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ), যখন ছাপাখানা এলো; কলিকাতা, ১৩৮৪
বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগ: ১৬৬৭-১৮৩৪; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত অপ্রকাশিত থিসিস; ১৯৭৫
মুহম্মদ সিদ্দিক খান, বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা; ঢাকা, ১৩৭১
Priolkar, Anant Kakba, *The Printing Press in India*; Bombay, 1958

বাংলা হরফের তিন দশা

সুবীর রায়চৌধুরী

১

> "বাঙ্গালা অক্ষরের নানা দশা গিয়াছে, নানা দশা আসিবে, পরিণতির শেষ নাই, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে পরিণতির প্রভেদ হয়, তখন কালে আদর্শও পরিবর্তিত হয়। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে।"[১]

যোগেশচন্দ্র রায় কথিত বাংলা হরফের নানা দশাকে আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রধান তিনটি পর্বে ভাগ করব: বিবর্তন, পরিবর্তন এবং পরিবর্জন। পরিবর্তনের পেছনে থাকে সচেতন আন্দোলন। কিন্তু বিবর্তন কালের নিয়মে হয়। আমরা প্রথমে আলোচনা করব বাংলা মুদ্রিত অক্ষরের বিবর্তন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে বাংলা অক্ষরের বিবর্তন পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল, ছাপাখানা এসে তাকে প্রমিত (স্টান্ডার্ডাইজ) করল। ছাপাখানা যেহেতু যন্ত্র, লিপিকরের মতো ব্যক্তি নয়, সেজন্য অক্ষরের চেহারা মোটামুটি এক রয়ে গেল। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিচল হরফের (মুভেব্‌ল্‌ টাইপ)* যুগে এসে বাংলা অক্ষরের আদল অবিচল রইল। রাখালদাসের মতে:

> "সতেরো এবং আঠারো শতকের আগেই বাংলা লিপি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। এই দুই শতকে তার একেবারেই বদল ঘটেনি। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে দেশীয় এবং ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যগুলি নতুন প্রেরণা পেল, কিন্তু বর্ণমালার পরিবর্তন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ছাপাখানার সূচনার ফলে লিপিগুলির আকার নির্দিষ্ট (স্টিরিওটাইপ্‌ড্‌) হল এবং ভবিষ্যতে আর প্রতি শতক অন্তর এর বদলের কোনো সম্ভাবনা নেই।"[২]

আপাতভাবে কথাটি যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও বাস্তব ঘটনা তা নয়। তার একাধিক কারণ রয়েছে।

---

*মুভেব্‌ল্‌ টাইপ অর্থে কেউ চলনশীল হরফ, কেউ আলগা হরফ ব্যবহার করেছেন। বিচল হরফ পরিভাষাটি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রথমতঃ, সতেরো-আঠারো শতকেও অঞ্চলভেদে পাণ্ডুলিপিতে বাংলা অক্ষরের রূপভেদ ছিল। তার প্রতিফলন মুদ্রিত হরফেও লক্ষ্য করি। ছাপাখানার অক্ষরশিল্পীরা সব সময়ে একই আদর্শকে গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, ছাপাখানা চালু হবার পরও অনেক অক্ষরের চেহারার বদল ঘটেছে। তাছাড়া একই অক্ষরের বিকল্পরূপ পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। হলহেডের ব্যাকরণ থেকে একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৮২), শ্রীপান্থের 'যখন ছাপাখানা এলো' (১৩৮৪) বইতে মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে উ-র চৈতনের বদলে পাই অর্ধচন্দ্রাকৃতি জটা। কিন্তু পরবর্তীকালে চৈতনযুক্ত উ-ই স্থায়ী হয়েছে। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে দেখতে পাই:

স্থ-এর রূপ স্থ ; জ্ঞ-এর জ্ঞ ; তু-এর তু

এখানে আরও কয়েকটি স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনের চেহারা লক্ষ করবার মতো, যেমন 'কু'।

কীকে ছাড়িয়া এবং কৃষ্ণ বলাৎকারে তুরঙ্গমীকে ছাড়াইয়া
অবশ্য লইবে এবম্প্রকার উৎকট সম্ভাবনাতে ঘোটকীর উপরে
চড়িয়া স্বয়ং যুদ্ধস্থান প্রস্থানে অশক্ত হইয়া অন্তঃপুরের অন্ত

প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) তৃতীয় স্তবক, দ্বিতীয় কুসুম

হলহেডের বইতে অনুস্বার দণ্ডহীন এবং মাথার ওপরে বসে। পরের যুগে অনুস্বার ক্রমশঃ দণ্ডযুক্ত হল, প্রথমে বাঁকাভাবে কোনাকুনি, শেষে বর্তমান রীতি অনুযায়ী। আদিতে উ-র জটা বা চৈতন কোনোটাই ছিল না। সজনীকান্ত দাসের পূর্বোক্ত গ্রন্থে ১৭৪৩ খৃীষ্টাব্দে ছাপা ডেভিড মিলের গ্রন্থভুক্ত কেটেলের যে ব্রাহ্মণীয় বর্ণমালার প্রতিলিপি দেখি, তাতে ই, ঈ-র চৈতন থাকলেও উ-র নেই। ফলে উ-র চেহারা ড-র সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। কেবল ড (উ)-র বাঁ দিকের মাত্রাটি ড-র তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

> "পঞ্চাকার এবং চর্যার পুথির 'উ' এক। অক্ষরটি দেখতে আধুনিক বাংলার 'ড'-এর মতো—মাথায় চৈতন নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'উ'-র মাথায়ও চৈতন নেই, সেখানেও অক্ষরটির আকার আধুনিক বাংলা 'ড'-এর মতো। এইরকম চৈতনহীন 'উ' অষ্টাদশ শতকে লেখা পুথিতেও পাওয়া যায় (যদিও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চৈতনহীন 'উ'-কে পুথির প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন); সুতরাং বলতে হবে দীর্ঘকাল যাবৎ এই অক্ষরটির আকারের কোনো পরিবর্তন হয়নি।"[৩]

প্রথম মুদ্রিত বাংলা হরফে অবশ্য চৈতনহীন উ পাই না, তবে মনে হয় হলহেড অর্ধচন্দ্রাকার জটাযুক্ত উ গ্রহণ করলেও সেযুগে চৈতনযুক্ত উ-রও প্রচলন ছিল। ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে' (আনুমানিক রচনাকাল ১৮০৭-১১ খৃী) পাণ্ডুলিপির যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে তাতে উ-র চৈতন এবং জটা দুই-ই দেখা যায়। ডেভিড মিলের গ্রন্থে হ-র নিচের রেখাটি বিচ্ছিন্ন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' হ-র আকৃতি এরকম ছিল। অনুমান করা যায় কেটেলের আঠারো শতকের কোনো পাণ্ডুলিপির আদর্শে বর্ণমালার অনুলিপি তৈরি করেছিলেন। সুতরাং আঠারো শতকেও পূর্বোক্ত হ-এর অস্তিত্ব ছিল।

মিলের বইতে 'ক্ষ' পরিচিত রূপেই আছে। 'ক্ষ' বাংলা বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা এ নিয়ে বৈয়াকরণদের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু এর চেহারা সম্পর্কে বিতর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ 'সহজপাঠে' ক্ষ-র যে উচ্চারণ দিয়েছেন, সেই পরিচিত ও প্রচলিত উচ্চারণে এর স্বাতন্ত্র্য রক্ষণীয় কিনা সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। এমন কি লাইনো ছাপার প্রবর্তক সুরেশচন্দ্র মজুমদারও 'ক্ষ' অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।[৪] অথচ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,[৫] সজনীকান্ত দাস ১৭৮৪ খৃীষ্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বরের 'ক্যালকাটা গেজেট' থেকে বাংলা বিজ্ঞাপনের যে প্রতিলিপি ছেপেছেন তাতে ক-এ

মূর্ধন্য ষ-র জন্য ক্ষ-র বদলে পাই ক-এর নিচে মূর্ধন্য ষ। ক্ষ-তে যেমন দুটি ব্যঞ্জনেরই চেহারা পরিবর্তিত, এখানে তেমন নয়। আমরা জানি বাংলায় ক্ষ-র উচ্চারণ বদলে গেলেও এর আকার অপরিবর্তিত আছে। বস্তুতঃ ষত্ববিধানে অসিদ্ধ হবার দরুন ক্স যুক্তব্যঞ্জনটি বহুদিন পর্যন্ত ছাপাখানায় গৃহীত হয়নি। সেজন্য আমরা সেক্ষপীর, মোক্ষমূলের ইত্যাদি বানানে বহুদিন পর্যন্ত অভ্যস্ত ছিলাম। তবে এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, অনেকের ধারণা ক-এ দন্ত্য স বিশ শতকীয় বানান-সংস্কার। কিন্তু আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র ১৭৭৫ শকাব্দে মুদ্রিত কোন এক সংখ্যায় 'সেক্সপিয়র' বানান দেখেছি। বস্তুতঃ 'ক্স' কোনো বিবর্তিত হরফ হতে পারে না, তা সচেতনভাবে গৃহীত। কিন্তু 'ক্ষ'-র বদলে ক-এ মূর্ধন্য ষ অপরিবর্তিত রাখা কি কোনো অক্ষরশিল্পীর অভিনবত্বের প্রয়াস, নাকি বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে পৃথককরণের চেষ্টা? নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল।

আরো কিছু অক্ষরের প্রাচীনতর রূপ পাই হলহেডের ব্যাকরণে। যেমন:

কু-এর বদলে কু; মু-এর স্থানে মু;
যেমন,

কুবীর ভঙ্গ দেখি দ্রোণের নন্দন।
অর্জুন সম্মুখে আসি দিল দরশন॥

চর্যা থেকে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' পর্যন্ত কু-র শেষোক্ত রূপটি দেখা যায়। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় লক্ষ করি কু-র আধুনিক রূপই গৃহীত। মু-র প্রাচীনতর রূপ বিষয়েও একই কথা বলা চলে।

প্রকৃত বিচারে এগুলি ঠিক বিবর্তন নয়, কেননা বিকল্প রূপগুলি পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। শুধু কোনো-কোনো হরফ অপ্রচলিত হয়ে গেল। 'র' এবং পেট কাটা 'ব'-এর রূপটি ছাপাখানায় আগে থেকেই ব্যবহৃত হত। মুদ্রাযন্ত্র শুধু 'র'-কে নিয়মিত করল। যদিও পেট কাটা 'ব'-এর বদলে 'র' বাংলায় গৃহীত হবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত 'রু' এবং 'রূ'-র ক্ষেত্রে পেট কাটা 'ব' রূপটির প্রচলন ছিল। শ্রীপুলিনবিহারী সেন 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী প্রথম খণ্ডে' (১৩৮০) 'জ্ঞানাঙ্কুর' (অগ্রহায়ণ ১২৮২) পত্রিকা থেকে 'বন-ফুল' কাব্যগ্রন্থের যে পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন, তাতেও 'রু'-এর পেট কাটা রূপ পাই। সুতরাং ১৮৭৫ খৃীষ্টাব্দেও এর চল ছিল। আমাকে একজন বৈয়াকরণ বলেছেন যে তাঁদের শৈশবে ও যৌবনে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে র-এ হ্রস্ব উ এবং ঊ-র ক্ষেত্রে পেটকাটা ব-এর ব্যাপক প্রচলন ছিল হাতের লেখায়।

র-এর পেটকাটা 'ব'-রূপ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পাওয়া যায়। চর্যায় 'র'-এর পেট সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত। 'র'-এর বিবর্তন বিষয়ে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

> ষোড়শ শতকের অনেক পুথিতে (যেমন ধর্মরত্ন, মিতাক্ষরা) এবং তার পরবর্তীকালের বহু পুথিতে 'র' 'ব'-র কোনো আকারগত পার্থক্য নেই। ষোড়শ শতকের কোনো কোনো পুথিতে র-র পেট চিরে 'ব' থেকে পৃথক করা হয়েছে।"[৬]

তারপর পাদটীকায় তিনি যোগ করেছেন:

> "পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে (১৪৯৬ খৃী) নকল করা একখানি পুথিতে [বর্ধমান রচিত 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক', বৃটিশ মিউজিয়মের পুথি, সংখ্যা Or 8567 a.] স্বিবাকিয়ুক্ত 'ণ' এবং পেট-কাটা 'র' একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই পুথির লিপিকাল যদি ঠিক হয় (লিপিকালের জন্য দ্রষ্টব্য Kielhorn, JASB, 1898, পৃ ২৩২) তা হলে পেট কাটা 'র'-এর নিম্নসীমা পাওয়া যাচ্ছে ১৪৯৬। এর আগেও পেটকাটা 'র'-এর প্রচলন ছিল কিনা তা আমার

জানা নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পেট-কাটা 'ৰ' আছে বটে, কিন্তু একবাক্যযুক্ত 'ণ'।"[৬ক]

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায় হলহেডে আধুনিক বাঙ্গালা 'র' ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন।[৭] হলহেডের 'এ কোড অব জেণ্টু লজ' (১৭৭৬)-এ প্রদর্শিত বাংলা বর্ণমালায় 'র' থাকলেও, তাঁর ব্যাকরণে দুটি রূপই পাওয়া যায়। ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গতঃ মন্তব্য করেছেন:

> "প্রাচীন খোদাইকরগণ যে হস্তলিপি দেখিয়া ছেনি কাটিতেন সেই হস্তলিপির অনুকরণ করিতে গিয়া ব্যক্তিবিশেষের লেখার ছাঁচকেই অবিকল নকল করিতেন, বর্ণমালার সার্বজনীন রূপকে নহে।"[৮]

প্রশ্ন ওঠে, 'বর্ণমালার সার্বজনীন রূপ' তা হলে কোথায় পাওয়া যাবে? পাণ্ডুলিপিতে? কিন্তু সেখানেও তো লিপিকরভেদে ছাঁদের পার্থক্য হতে পারে? আসলে প্রমিতকরণ বা স্ট্যাণ্ডার্ডাই-জেশান না হলে এরকম ভিন্নতা থাকবেই। কিন্তু লিপিকরের হাতের লেখায় যতই বৈশিষ্ট্য বা মুদ্রাদোষ থাকুক না কেন, লিপিতে দেশ-কালের প্রভাব একেবারে দূর হওয়া সম্ভব নয়। লিপি-তত্ত্ববিশারদেরা যাকে বলেন 'লিপিকলা', তার মধ্যে স্টাইলের সঙ্গে ফর্মও যুক্ত।

হলহেডের ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণমালা এবং যুক্তাক্ষর পরিচয়ে ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ। বিদেশীদের সুবিধার্থে তিনি বিকল্প রূপগুলির বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। সেজন্য 'র'-এর দুটি রূপ দিয়ে তিনি ১৩ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন:

> ৰ র *ro*, is diftinguifhed from ব *bo* either by a ftroke acrofs or dot beneath it; as ৰাখন raak,hon to place.

অনুরূপভাবে তিনি 'ল' এবং তার প্রাচীনতর রূপ দুটো নিয়েও আলোচনা করেছেন:

> ল ল *lo*, two forms of *l*, as বল *bol* ftrength. This letter in the common corrupted writing of modern Bengalefe is ufually confounded with ন *no* in fhape; and not unfrequently in found: an example of which may be feen in the explanation of the next letter.

'ড' এবং 'ড়' দুয়েরই অস্তিত্ব তিনি জানতেন। তাঁর মতে, লেখবার সময় তাড়াহুড়োতে অনেক সময়ে 'ড়'-এর ফুটকি পড়ে যেত। বহু যুক্তব্যঞ্জনের চেহারা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি যখন বিবিধ উদাহরণ দিয়ে লেখেন, যেমন, আঁকড়িযুক্ত ব্র হচ্ছে 'ক্র'-র রূপ, তখন আমরা লাইনো হরফের সূচনার ইঙ্গিত পাই।

কিন্তু হলহেড নিজে কোনো সাম্মিতি আনবার চেষ্টা করেননি। এই কারণে কেউ কেউ মনে করেন তাঁর বইয়ের অক্ষরশিল্পী একাধিক ব্যক্তি। একাধিক ব্যক্তির স্বপক্ষে অনুমানের কারণ যদি এই হয় যে বহু হরফের বিকল্পরূপ আছে, তবে তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কেননা হলহেড তা জেনে-শুনেই করেছিলেন, প্রমিতকরণ তাঁর লক্ষ ছিল না। কেননা তিনি নিজে সেযুগে বাংলা হস্তাক্ষরের মধ্যে কোনো সাম্মিতি খুঁজে পাননি। তাঁর মতে একেই তো বাংলায় অক্ষরবাহুল্য এবং যুক্তাক্ষরের জটিলতা আছে, তার ওপর লোকেদের অনবধানতা ও অজ্ঞতার দরুন হাতের লেখা আরো জটিল হয়ে ওঠে। তারা অক্ষরের মূল চেহারাকে আরো বিকৃত করে ফেলে। ফলে একজন আরেকজনের লেখা সহজে বা স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে না। তাছাড়া হস্তলিপিতে বিকৃত অনেক অক্ষর বাংলায় স্থায়ী হয়ে গেছে। সেজন্য তিনি তাঁর ব্যাকরণের পরিশিষ্টে হস্তাক্ষরের নমুনা দিয়েছেন।

ছাপাখানা নিজের তাগিদেই কিছু কিছু সঙ্গতি এনেছিল। যেমন ত+উ=তু, আবার ত+ত=ত্ত। অর্থাৎ, 'বাতুল'-এর 'তু' হবে 'ত্ত', আবার 'ত'-এর দ্বিত্ব (যেমন, 'মত্ত') বোঝাতেও 'ত্ত'। ছাপাখানায় ক্রমশঃ 'তু'-রূপেই স্থায়ী হয়, যদিও হাতে-সাজানো হরফে যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এখনও দেখতে পাওয়া যায় 'কিন্তু', 'স্তুতি' প্রভৃতি শব্দের পুরনো রূপ।

বাংলা হরফের আরেকটি বিকল্প রূপ বিষয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। হলহেডের ব্যাকরণে 'জ্ব'-র চেহারা 'হ্ন'-এর মতো:

হ্ন *joo,* ſtands for জু

হরফটি বর্তমান হ-এ দন্ত্য ন অর্থাৎ 'হ্ন'-র সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু 'হ্ন'-এর আরেকটি বিকল্প রূপ বিরল হলেও এককালে প্রচলন ছিল। সেটা হল হ-এ মূর্ধন্য ণ-এর মতো নিচে বসানো (উনিশ শতকে এর ব্যবহারের জন্য):

জাহ্নবীর পূর্ব্ব তটে সুবিখ্যাত গ্রাম। চূড়ামণি সমাজ কু-
মারহট্ট নাম॥ সেই স্থানে বসতি কায়স্থ বংশে জাত। উ-

উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত 'গোলেবকাঅলি ইতিহাস' (১৮৪৩) থেকে

যোগেশচন্দ্র রায়ও 'হ্ণ' ('হ্ন'-র বদলে) হরফটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ 'হ্ণ' এবং 'হ্ন'-এর পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ চোখে সবসময়ে ধরা পড়ে না। 'হ্ণ' বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ[৯] রবীন্দ্রনাথ হ-এর নিচে দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ণ, উভয়ই লিখতেন। 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডের (১৯৬৫) সম্পাদক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের 'সায়াহ্ণে' বানান বিষয়ে এই টীকা দিয়েছেন:

> "২-৪ সায়াহ্ণে। সায়াহ্নে হওয়া উচিত। কিন্তু 'হ্ন' স্থানে 'হ্ণ' আছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই হ্ন এবং হ্ণ এই দুইটি যুক্তাক্ষর সাধারণতঃ ব্যবহার করতেন না। 'হ্ণ' এই অক্ষর দিয়ে হ্‌+ণ এবং হ্‌+ন এই দুইয়ের কাজ চালাতেন।
>
> পরিণত বয়সের পাণ্ডুলিপিতে হ্ন স্থানে হ্ণ ব্যবহারের নিদর্শন বিরল নয়। একবার এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি বর্তমান সম্পাদককে বলেছিলেন, "আমি দুটি অক্ষরে একই চিহ্ন ব্যবহার করি তোমরা প্রুফে যা করার কোরো।"

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে একথা স্পষ্ট যে হরফ দুটির ব্যাপারে তাঁর কোন বর্ণবিভ্রম ছিল না, তিনি সচেতনভাবেই নিজস্ব নির্বাচিত রূপটি ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' (১৩২০) অভিধানেও হ-এর নিচে দন্ত্য ন দেখতে পাই।

অক্ষর প্রমিতকরণের এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে হরফ-বৈচিত্র্য আনবার উদ্যোগও চলছিল। অক্ষরের চেহারা না পালটেও ছাপাখানা নানা বৈচিত্র্য আনতে পারে—ছোট-বড় হরফ, বাঁকা হরফ, মোটা হরফ, যতিচিহ্ন, ইত্যাদি। বাংলা অক্ষরের জটিলতার জন্য মুদ্রণে বৈচিত্র্য আনা কঠিন। এই সৌন্দর্যের প্রশ্ন ছাড়াও বাংলা টাইপ কেসের একটি অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীদীপঙ্কর সেন।[১০] সুন্দর ছাপার পরেই আমাদের প্রত্যাশা দ্রুত ছাপা। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সূচনা থেকেই বাংলা টাইপ কেসের একটি সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। হাতে-সাজানো হরফের কেসগুলি ভাগ করা হয় বিশেষ-বিশেষ বর্ণের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের আনুপাতিক হিসাবে। অর্থাৎ, যে হরফটি বেশী ব্যবহৃত হয়, সেটি হাতের কাছে থাকবে। কিন্তু বাংলার টাইপ-কেসটি ইংরেজী নিচের কেসের অনুকরণে তৈরি। ফলে এ-র জায়গায় অ, বি-র জায়গায় ব ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার জন্য দ্রুত ছাপার পক্ষে অনেক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। একেই তো ইংরেজীর তুলনায় বাংলা হরফের জটিলতা

অনেক বেশী, তার ওপর এই অসামঞ্জস্যে কাজ আরো ব্যাহত হয়। সুতরাং ব্যাকরণের প্রয়োজন ছাড়াও ছাপাখানার দিক দিয়েও বাংলা বর্ণমালার বিন্যাসকে যুক্তিসঙ্গত (র‍্যাশনালাইজ) করার তাগিদ রয়েছে। এই পরীক্ষা-সমীক্ষার তিনটি প্রবণতা দেখা যায়:

১ মুদ্রাকরের উপযোগিতার দিক দিয়ে সংস্কার প্রচেষ্টা।

২ গৃহীত বা আগন্তুক শব্দাবলির ধ্বনিসংবাদী বানান অথবা বিদেশী শব্দাবলির লিপ্যন্তরের জন্য নতুন বর্ণ বা ধ্বনি-চিহ্নের সংযোজন।

৩ বাংলা যুক্তব্যঞ্জন এবং অন্যান্য হরফের ক্ষেত্রে সম্মিতি।

এ কাজ অবশ্য মুদ্রাকর এবং বৈয়াকরণদের যৌথ উদ্যোগে বহুদিন পর্যন্ত হয়নি। বিদ্যাসাগর ছিলেন একই সঙ্গে মুদ্রণবিশারদ এবং বৈয়াকরণ। তিনি তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে লাইনো-ছাপার সূচনা-পর্বে (১৯৩৫) মুদ্রণবিশেষজ্ঞ এবং ভাষা-তাত্ত্বিকদের একত্র করে সমবেত আন্দোলনের চেষ্টা হয়েছিল। এটা আকস্মিক ঘটনা নয় যে বাংলায় লাইনো ছাপা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠা একই বছরে। আমার বক্তব্য এই নয় যে এসব উদ্যোগে কোনো বাধা বা প্রতিরোধ ছিল না। লাইনো হরফের অক্ষরবিন্যাস এবং যুক্তব্যঞ্জন নিয়ে বাদানুবাদ এখনও চলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানাননীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এখনও শেষ হয়নি। এ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের নিম্নলিখিত উক্তিতে:

> "মুদ্রাযন্ত্রওয়ালোরা ত ইতিমধ্যেই বানান-কমিটিকৃত বর্ণবিপ্লবে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। তাহারা ঠিক করিয়া লইয়াছে যে অতঃপর বই ছাপা হইবে দুই প্রকার—এক প্রকার বই ভদ্রলোকের পড়িবার জন্য, আর এক প্রকার বই গোলামখানার ছাপ পাইবার জন্য।"[১১]

এরপর আমরা বাংলা হরফের পরিবর্তন-পরিবর্জন নীতি বিষয়ে আলোচনা করব।

২

"ইংরেজীর দোষ আবশ্যক অক্ষরের অভাব;
বাংলার দোষ অনাবশ্যক অক্ষরের সদ্‌ভাব।"[১২]

বাংলায় অক্ষরবাহুল্যের অভিযোগ মুদ্রণবিশারদেরাও করেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানার আদিযুগে বিদেশী কর্মকর্তাদের সাধ্য এ-বিষয়ে স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া অক্ষর-সংস্কার যৌথ প্রচেষ্টার ব্যাপার। এই কারণে ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক জন মারডক বাংলা হরফ-সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরকে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি চিঠি লেখেন।[১৩] তাতে তিনি স্লোগান তোলেন, 'আন্দোলন করো, আন্দোলন করো।' তাঁর ধারণা, বাংলার শিশুরা যদি শোনে যে যুক্তাক্ষরগুলি বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, তা হলে মুটের মাথায় ঝুড়ি-ভর্তি মিষ্টি দেখার মতোই তারা পুলকিত হয়ে উঠবে। তিনি যেভাবে যুক্তাক্ষর ভেঙে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাতে লাইনো হরফ পরিকল্পনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়:

বর্তমান রূপ	প্রস্তাবিত রূপ	বর্তমান রূপ	প্রস্তাবিত রূপ
চিক্কণ	চিক্‌কণ	অঙ্গার	অঙ্‌গার
শৃঙ্খলা	শৃঙ্‌খলা	মন্থন	মন্‌থন্‌
যাচঞা	যাচ্‌ঞা	কুণ্ঠিত	কুণ্‌ঠিত
চিন্তা	চিন্‌তা	বন্ধু	বন্‌ধু

মারডকের অভিযোগ বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ ছাড়াও তাঁকে একশ কুড়িটিরও বেশী যুক্তব্যঞ্জন শিখতে হয়েছে। এবং বহু যুক্তবর্ণের চেহারার এমন বিকৃতি ঘটেছে যে তাদের চেনাই যায় না। তার ওপর কোনোটা বসে ওপরে, কোনোটা নিচে, কোনোটা বা পাশে* তাছাড়া 'ইন্ট্রোডাকশন, টু দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর লেখক ড. য়েট্‌স্‌-এর সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন যে সব ফাউন্টের যুক্ত ব্যঞ্জনের চেহারাও এক নয়। সব মিলিয়ে তাঁর মনে হয়েছে গ্রীক হরফ দুশ বছর আগে যেরকম ছিল, বাংলা হরফও সেই যুগেই আছে। আগেকার যুগের গ্রীকের মতোই বাংলাতেও শব্দের মধ্যে ফাঁক থাকত না, যতিচিহ্নের ব্যবহার ছিল না, যুক্তব্যঞ্জনের বাহুল্য ছিল। পরে শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন হয়, যতিচিহ্নের প্রচলন হয়—কিন্তু গ্রীক যুক্তাক্ষর বর্জন করলেও বাংলা করেনি। এই জটিলতার

---

*এই বিস্তর বাংলা হরফ বিষয়ে ছাপাখানার অভিযোগ দীর্ঘকালের। বস্তুতঃ একই কারণে বাংলার টাইপের ছড়াছড়ি। বাংলায় নির্ভুল ছাপা যে দুরূহ ব্যাপার, তার অন্যতম কারণ এটি।

দরুন বাংলা হরফের আকারে বৈচিত্র্য আনা যায় না। তাঁর মতে, ব্যাপটিস্ট মিশনের বর্জাইস টাইপ স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন হলেও বর্তমান (তৎকালীন) পরিস্থিতিতে পার্ল জাতীয় হরফ সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি আরেকটি প্রস্তাব করেছিলেন, সিংহলি এবং তামিলের অনুকরণে বিরাম (হস্ ?) চিহ্নের ব্যবহার। কেননা বর্ণপরিচয় হবার পর তিনি ব্যঞ্জনগুলি স্বরান্ত এই নিয়মে 'বর'-কে বর(অ) পড়েছিলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে ওটা 'বর্' হবে। সেই সাদৃশ্যে তিনি যখন 'তত'-কে 'তৎ' পড়লেন, তখন জানলেন তা ভুল।

মারডকের চিঠির উত্তর বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে সম্ভবতঃ মারডকের সমালোচনার প্রভাবে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ষষ্টিতম সংস্করণে (১৮৭৫)[১৩] বিদ্যাসাগর যোগ করেন: 'বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যেসকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্তে উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল।' পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী মুদ্রণবিভাগও শব্দের আদিতে 'অ্যা' উচ্চারণ নির্দেশের জন্য মাঝের এ-কার চিহ্ন ব্যবহার করতেন। লাইনো ছাপায় অবশ্য তা সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব বসু 'সহ্য' এবং 'হ্যামলেট'-এর পার্থক্য বোঝাবার জন্য প্রথম ক্ষেত্রে 'হ্য' যুক্তব্যঞ্জন এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে 'হ্‌' এবং 'য'-ফলা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এর কোনোটাই রীতি হয়ে দাঁড়ায়নি।

বাংলা যতিচিহ্নে কয়েকটি দৈন্য এখনও চোখে পড়ে। আজও বহু প্রেসে কোলনের বদলে বিসর্গ দিয়ে কাজ চালানো হয়। মারডকের বহু আগে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সুপারিনটেন্ডেন্ট পীয়ার্স কিছু কিছু সংস্কার প্রস্তাব করেন। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি তাঁদের তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে (১৮১৯-২০) লক্ষ করেন যে বাংলায় নামবাচক বিশেষ্য, অথবা বাক্যের অংশবিশেষের ওপর গুরুত্ব দেবার কোনো উপায় নেই। তাঁদেরই অনুরোধে পীয়ার্স একটি নমুনা প্রকাশ করেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছাপার হরফ'[১৪] প্রবন্ধে তার প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে। পীয়ার্স-এর প্রস্তাব ছিল ক্যাপিটাল হরফের ক্ষেত্রে বাংলায় সোজা মাত্রা এবং অন্যত্র বাঁকা মাত্রা ব্যবহৃত হবে।

বাংলা হরফের এমনিতেই এত জটিলতা যে তার মধ্যে সোজা এবং বাঁকা মাত্রার সূক্ষ্ম তারতম্য চোখে পড়ত কিনা সন্দেহ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ত্রি-স্তরের বাংলা হরফ নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো মুশকিল। তার ওপর, আগে বলা হয়েছে লিপ্যন্তর এবং ধ্বনি-সংবাদী বানানের প্রয়োজনে আরো অনেক বর্ণ ও ধ্বনিচিহ্নের প্রয়োজন হল। তার দৃষ্টান্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (২য় সংস্করণ ১৯৩৭) থেকে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বাংলা স্বরের ধ্বনিও নির্দিষ্ট নয়। যেমন অ-স্বর স্থান বিশেষে অ, কখনো ও; এ কখনো এ, কখনো অ্যা। রফিকুল ইসলাম-এর ভাষায় 'এ কারণেই তো বাঙলা লিখন প্রণালী খাঁটি Alphabetic হতে পারল না অনেকাংশে Syllabic রইল।'[১৫]

প্রত্যেক লিপির দুটো দিক আছে: চোখের এবং কানের। অনেক সময়েই লিপিগুলির সঙ্গে দেখা এবং শোনার সংগতি হয় না। বলা বাহুল্য পুরোপুরি ধ্বনিভিত্তিক লিপিমালা সব ভাষাতেই বিরল। আমাদের বৈয়াকরণেরা বিদ্যাসাগরের আমল থেকেই প্রধানতঃ যে চেষ্টা করছিলেন তা হল বর্ণমালার বিন্যাসকে যুক্তিযুক্ত করা। সেজন্য দেখা যায় বাংলা অক্ষর পরিচয়ের খুব কম বইয়ের একটির সঙ্গে আরেকটির পুরো মিল আছে। বিদ্যাসাগর ব্যঞ্জনবর্ণে 'ক্ষ' বর্জন করলেও রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন। কিন্তু এর দ্বারা ছাপাখানার কিছু এসে যায় না, কেননা 'ক্ষ' হরফটি কেউই বাদ দিচ্ছেন না। এঁরা কেউই বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের দৃশ্যরূপ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু তিনি বানান-সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন, বর্ণ-সংস্কারে নয়। এ-জাতীয় পরীক্ষা-সমীক্ষায় যোগেশচন্দ্র রায় খুবই বৈপ্লবিক ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে লাইনো-হরফ পরিকল্পনায় তাঁরও ভূমিকা ছিল। মারডক বিদেশী শিক্ষার্থী হিসাবে বাংলা বর্ণমালার যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন, যোগেশচন্দ্রের লেখাতে তার সমর্থন পাই:

> ১ এই (বাংলা) ভাষায় পঞ্চাশৎ মূলধ্বনি অর্থাৎ বর্ণ আছে। কিন্তু পঞ্চাশৎ আকৃতি অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা সকল শব্দ লিখিতে পারা যায় না। লিখিতে বহু সংখ্যক যুক্তাক্ষর আবশ্যক হয়। প্রত্যেক যুক্তাক্ষরই একটি নূতন অক্ষর।
>
> ২ অক্ষর-যোজনার দোষও আছে। সংযুক্ত স্বরাক্ষর যোগে স্বাভাবিক ক্রম রক্ষিত হয় নাই। ক + া = কা; কিন্তু ক + ি = কি। ক + ী = কী, কিন্তু ক + ে = কে। আমরা বলি, ক্‌এ = কে; কিন্তু লিখি এ (ে) ক-কে। এই অনিয়ম হেতু সংযুক্ত স্বরাক্ষর ভাঙ্গিয়া লিখিতে পারা যায় না। 'বন্দ' শব্দ 'বন্‌দ' লিখিতে পারি, দোষ হয় না। কিন্তু 'বন্দে' শব্দ যদি 'বনে্‌দ'

লিখি, প্রথমে ন্দ পড়িয়া পরে 'ে' যোগ করিতে হয় অর্থাৎ শেষাক্ষর পড়িবার পর বামে দৃষ্টি করিতে হয়।[১৭]

যোগেশচন্দ্র রায় বাংলা হরফের ত্রিস্তর তুলে দেবার পক্ষপাতী। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ু, ূ, ৃ ইত্যাদি নিচে বসবে না অথবা রেফ ইত্যাদি ওপরে বসবে না—সবার স্থান পাশাপাশি। দ্বিতীয়তঃ, ি-কার যেহেতু পরে উচ্চারিত হয়, সেজন্য তার স্থান হবে পরে। যুক্তাক্ষরের বাহুল্যও কমে যাবে। তাঁর মতে:

> 'নবলিপি প্রবর্তিত হইলে ছাপাখানার অভূতপূর্ব উন্নতি হইতে পারিবে। ছাপাখানায় ৬৩টি অক্ষর ও ৫টি চিহ্নের (শৃঙ্গ, পাতী, উৎকলা, বিন্দু, হস্ চিহ্ন) জন্য মোট ৬৮টি টাইপ রাখিলেই লৈখিক ও মৌখিক ভাষায় যাবতীয় শব্দ ছাপিতে পারা যাইবে। শুনিলাম বর্তমানে ছোট প্রেসেও ১৬৮ অক্ষরের টাইপ রাখিতে হয়।"[১৮]

এছাড়া তিনি বাংলা র-এর বদলে নাগরী 'র' চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন কলম না তুলে যে হরফ লেখা যায় সেটাই বৈজ্ঞানিক। তাঁর লিপি-সংস্কারের নমুনা:

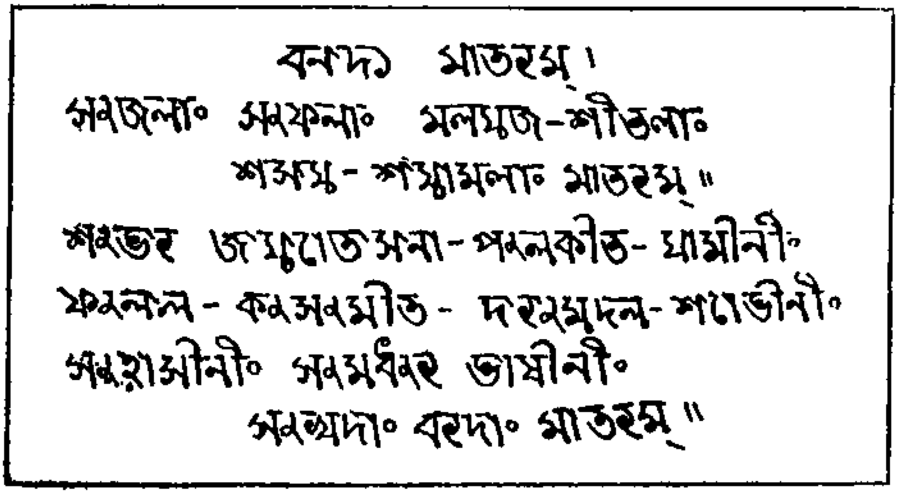

যোগেশচন্দ্রের নবলিপি বাংলায় গৃহীত হয়নি। কিন্তু অনেকটা এই পথেই পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) 'সহজ বাঙলা'-র আন্দোলন হয়েছিল। এ-কারের ব্যাপারে দেখতে পাই সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর মতের মিল আছে।[১৯]

৩

> "বঙ্গদেশের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সর্বজন-সমাদৃত লেখক—একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক ও আভিধানিক এবং রস-রচয়িতা—তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার হাতে কামাল পাশার মত ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আইন করিয়া দেশে বাঙ্গালা ভাষায় তিনি রোমান অক্ষর প্রচলন করাইতেন।"[২০]

আমাদের প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শুধু বাংলার ক্ষেত্রে নয়, সব ভারতীয় ভাষার বেলাতেই রোমান হরফের পক্ষপাতী ছিলেন। ওপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজশেখর বসুও এ-ব্যাপারে কম উৎসাহী ছিলেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রধান যুক্তি ছিল এই:

১ "এখন বাঙ্গালা ছাপিতে গেলে প্রায় ৬০০ বিভিন্ন টাইপের দরকার হয়। ... আমি যে-ভাবে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমান অক্ষর ব্যবহার করিতে বলি ... তাহাতে অনধিক চল্লিশটা অক্ষরেই সব কাজ চলিবে।"

২ "'ক', 'খ', 'ঠ'—এইরূপ আকারের অক্ষরের বিশেষ কোনও মাহাত্ম্য নাই; ইহাদের সঙ্গে কেবল ৮/৯ শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের যোগ আছে

> এইটুকু মাত্র। যদি প্রাচীনত্ব ধরিতে হয়, তাহা হইলে দেবনাগরী বা বাঙ্গালা 'ক, খ, চ' প্রভৃতি বর্জন করিয়া ব্রাহ্মীকেই গ্রহণ করিতে হয়।"[২১]

বস্তুতঃ বাংলা বর্ণমালার বদলে রোমান হরফের প্রবর্তনের প্রচেষ্টা গত শতক থেকেই চলছে। এযুগেও বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা এর সমর্থক ছিলেন। শ্রীসুকুমার সেন রোমান বর্ণমালার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করলেও তাঁর 'অ্যান ইটিমলজিকাল ডিক্‌স-নারি ইন বেঙ্গালি' (১৯৭১) রোমান হরফে মুদ্রিত। উক্ত অভিধানের টীকা-টিপ্পনী অবশ্য ইংরেজী ভাষায়। সেদিক দিয়ে-বিচার করলে প্রথম বাংলা বই যে রোমান অক্ষরে ছাপা ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ', ১৭৪৩ খৃী), সেটা অবৌক্তিক বলা যায় না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগেও রোমান হরফ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮০৩ খৃীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রাইস্ট-এর তত্ত্বাবধানে ঈশপের গল্পের ছটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বইটি রোমান হরফে মুদ্রিত। গিলক্রাইস্ট অবশ্য ভূমিকায় জানিয়েছিলেন যে তারিণীচরণ মিত্র অনূদিত বাংলা অংশটি স্বতন্ত্রভাবে আবার বাংলা হরফে মুদ্রিত হবে। কিন্তু বাংলা হরফে মুদ্রিত সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। 'রোমা-নৈজিং' অর্থাৎ রোমান হরফে বাংলা মুদ্রণের আরো কিছু খবর পাওয়া যাবে শ্রীপান্থর পূর্বোক্ত গ্রন্থে। ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফ প্রচলনের বিশেষ বিরোধী ছিলেন হোরেস হেম্যান উইলসন। দেওয়ান রামকমল সেনকে লেখা একটি চিঠিতে (২০ অগাস্ট ১৮৩৪ খৃী) তিনি মন্তব্য করেন:

> "শ্রীযুক্ত সিডন্‌স দেবনাগরীর বদলে রোমান হরফ প্রচলনের একটি চমৎকার পরিকল্পনা আমাকে পাঠিয়েছেন—উৎকৃষ্ট ধ্বনিমালার বদলে নিকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা। এই [রোমান] বর্ণমালা ভারতীয় ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে বেমানান। এসব উদ্ভট পরিকল্পনার একটাই বড়ো সান্ত্বনা হল এর অসম্ভাব্যতা। যা কোনোদিনই হবে না, তার প্রতিবাদ করাতেও শুধু সময় নষ্ট—আর এ ধারণা মৌলিকও নয়। গিলক্রাইস্টের শকুন্তলা, পলিগ্লট ফেব্‌ল্‌স ইত্যাদির অবস্থা দেখুন না! সেগুলো কে উল্টে-পাল্টে দেখে? ট্রেভেলিয়ান হচ্ছেন আরেকজন গিলক্রাইস্ট, হয়ত একটু বেশী শিক্ষিত, কিন্তু উদ্ভটত্বে সমান।"[২২]

কিন্তু উইলসন রোমান হরফ প্রচলনকে যতই উদ্ভট বলে মনে করুন, এ-আন্দোলন বিচ্ছিন্ন-ভাবে নানা সময়ে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই ১৮৮০ খৃীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একটি রোমান হরফে মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলায় উর্দু হরফ প্রচলনেরও উদ্যোগ হয়েছিল একবার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য আনার জন্য বাংলা লিপির বদলে উর্দু হরফ চালাবার চেষ্টা করেন তৎকালীন পাকিস্তানী সরকার।[২৩] কিন্তু ওখানকার বাংলাভাষীদের সমবেত আন্দোলনে তা ব্যর্থ হয়। তবে ১৯৪৯ খৃীষ্টাব্দে গঠিত 'পূর্ববঙ্গ সরকারী ভাষা কমিটি' (যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুণীর চৌধুরী, আবদুল হাই প্রমুখ) তার সুপারিশে যে 'সহজ বাংলা'র কথা বলেন, তাতে বাংলা লিপি বজায় রেখেও নানা সংস্কারের প্রস্তাব ছিল এতে কিছু-কিছু যুক্তাক্ষর রেখে দেবার প্রস্তাব হলেও ধ্বনিসংবাদী বানানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন জ্ঞ, ক্ষ থাকলেও বাহ্য, সহ্য লেখা হবে এইভাবে: বাজ্‌ঝ, সজ্‌ঝ। ভাষা কমিটি প্রস্তাব করেন বাংলায় স্বরবর্ণ হবে ছ'টি (অ আ ই উ এ ও) এবং প্রয়োজন হলে আরেকটি যোগ করা যেতে পারে অ্যা। ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা হবে একত্রিশ:

ক	খ	গ	ঘ	প	ফ	ব	ভ
চ	ছ	জ	ঝ	ন	ম	শ	ছ
ট	ঠ	ড	ঢ	র	ড়	য়	ল
ত	থ	দ	ধ	হ	ং	˙	

প্রস্তাবিত বর্ণমালায় দুটি 'ছ' আছে, সম্ভবতঃ একটি স-এর কাজ করবে। কেননা ওপারের বাংলা একাডেমির লিপি-সংস্কার সমিতির প্রস্তাব ছিল দন্ত্য স ইংরেজী 'এস' এবং আরবী সম-ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হবে।[২৩]

স্বরচিহ্নগুলির পরিবর্তনের মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায়ের মতো ডান দিকে হ্রস্ব ই-কার দেবার কথা বলা হয়েছে। এ-কার চিহ্নও ডান দিকে যাবে। ও-কার চিহ্নের বাঁ দিকের ে থাকবে না, শুধু ো-চিহ্নের ডান দিকের অংশটি থাকবে, যেমন কোন অর্থে কান।

এই প্রস্তাবিত সংস্কার নিয়ে বাংলাদেশের ভাষাতাত্ত্বিক এবং বিশেষজ্ঞ মহলে অনেক তর্ক-

বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আসলে এ-জাতীয় লিপি-সংস্কার মূলতঃ ভাষা-সংস্কার। 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে' (বর্তমান নাম বাংলাদেশ...) ঈ, ঊ, ঋ, ৎ, ঃ, ণ, ষ প্রভৃতি বর্ণ বর্জিত হয়েছিল।

লিপি নিয়ে এই বিবাদ-বিতর্ক সত্ত্বেও হ্যান্ডসেট ছাপার ক্ষেত্রে অন্ততঃ বাংলা হরফ শিল্প পঞ্চানন-মনোহর-কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ থেকে খুব বেশী এগোয়নি। এখনও অনেকে আছেন যাঁদের পক্ষপাতিত্ব সেকালের ছাপার প্রতি। তার ওপর আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। হ্যান্ডসেট এবং লাইনো ছাপার পাশাপাশি অস্তিত্ব আরো অনেকদিন থাকবে। এই দুই মুদ্রণরীতিতে লিপি-বৈষম্য সংগতি আনাটাও জরুরী। এসব সমস্যার জন্য আবার নতুন করে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশানের প্রশ্ন উঠেছে। আমরাও শেষ করছি সুকুমার রায়ের বিশ্বকর্মার উক্তি স্মরণ করে:

'শব্দ যজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি শব্দকল্পদ্রুম।'

নির্দেশিকা

১ যোগেশচন্দ্র রায়। বাঙ্গালা অক্ষর, 'বাঙ্গালা ভাষা প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)'। কলিকাতা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ২৫৭। এর পর থেকে বা. ভ. বলে নির্দেশিত।

২ Banerji, R. D *The Origin of the Bengali Script*. *Calcutta*, 1919, 2nd reprint, 1974. মূল উদ্ধৃতিটি হল: "The completely developed alphabet has not changed at all during the 17th and 18th centuries A D. In the 19th century the vernacular and classical literature received a fresh impetus, as the result of the contact with the West, but the alphabet ceased to change. Its forms were stereotyped by the introduction of the printing press, and it is not likely that in future it will change its forms in each century." p. 4

৩ 'চর্যাগীতি', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ: ১৩১, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ ৭১। এর পর থেকে চ. গ. বলে নির্দেশিত।

৪ সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাঙ্গালা লাইনোটাইপ ও অক্ষর সংস্কার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা।' ১৩৪৩

৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ছাপার হরফের জন্মকথা, 'ভারতবর্ষ' পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৪

৬ ও ৬ক চ. গ. পৃ ৯১-২

৭ সবিতা চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। কলিকাতা, ১৯৭২। পৃ ২১

৮ ঐ। পৃ ২০-১

৯ মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। বর্ণ-বিভ্রান্তি, *Bulletin of the West Bengal Headmaster's Association*, vol. XIX, No. 7, July 1970.

১০ দীপঙ্কর সেন। বাঙালীর মনন ও দু'শ বছরের মুদ্রণ। অমৃত, ১৭ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৪ পৌষ, ১৩৮৪

১১ দেবপ্রসাদ ঘোষ। বাঙ্গালা ভাষা ও বানান। কলিকাতা, ১৩৪৬। পৃ ১৩৬

১২ বা. ভ. পৃ ২৪৯

১৩ জন মারডকের চিঠি শ্রীবিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'-এর ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণে (১৯৭৩) প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রিত পত্রটির কপি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে।

১৪ বিদ্যাসাগর যে এই পরিবর্তনটি ষষ্টিতম সংস্করণে করেন, তা জানতে পেরেছি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ থেকে দ্রঃ "শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়" 'বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ', আজহারউদ্দীন খান, উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। মেদিনীপুর, আশ্বিন ১৩৮১। তবে এটাও লক্ষণীয় যে মারডকের চিঠি এবং

বিদ্যাসাগরের এই সংস্কারের মধ্যে ব্যবধান দশ বছরের।

১৫ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। "বাংলা ছাপার হরফ", শারদীয় যুগান্তর, ১৩৭৭

১৬ দ্র. রফিকুল ইসলাম। "বাঙলা বানান বনাম বাঙলা একাডেমী", মুণীর চৌধুরী 'বাঙলা গদ্যরীতি', ২য় মুদ্রণ। ঢাকা, ১৩৮৩। পৃ. ১৪৪। এই প্রসংগে একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মুহম্মদ হাই-এর "বাঙলা লিপি ও বানান-সমস্যা" দ্র.। এরপর থেকে বইটি বা. গ. বলে নির্দেশিত।

১৭ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বাঙ্গালা নবলিপি, 'কি লিখি?' কলকাতা, ১৩৬৩।

১৮ ঐ

১৯ দীপঙ্কর সেন। সুকুমার রায়ের মুদ্রণ চর্চা। 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার'. ১২ চৈত্র ১৩৮৪।

২০ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। "ভারত-রোমক বর্ণমালা", 'ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা'। কলকাতা, ১৩৫১।

২১ ঐ

২২ Mittra, Pyarichand. *Life of Dewan Ram Comul Sen,* Calcutta, 1880. pp. 17-18

২৩ বদরুদ্দীন উমর। 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি', প্রথম খণ্ড। ঢাকা, ১৯৭০। ভারতীয় সং ১৩৭৮।

২৪ দ্র. বা. গ.

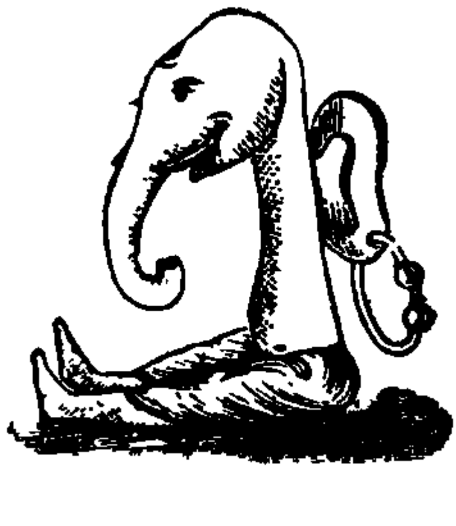

বর্ণমালা ও বানান সমস্যা

শুভেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায়

হলহেডের ব্যাকরণ দিয়ে বাংলা মুদ্রণের যাত্রা শুরু হয় দুশ বছর আগে। সেই প্রথম বইটি প্রকাশের পর বাংলা মুদ্রণের প্রসারে বহুগুণে বেড়েছে। উন্নতির হিসাবে এই দুশে বছরের ইতিহাসে উইলকিনস ও পঞ্চানন কর্মকারের বাংলা হরফ ঢালাই ও প্রায় দেড়শ বছর পরে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা লাইনো প্রবর্তন, বাংলা মনোটাইপ, ইণ্টারটাইপ ও লাডলো অক্ষর প্রভৃতির প্রবর্তন ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সত্ত্বেও প্রধান সমস্যাগুলি দুশ বছর আগে যেখানে ছিল, এখনও সেইখানেই রয়ে গিয়েছে। সংস্কার বা সমাধানের যথেষ্ট চেষ্টা হয়নি। সব চেয়ে দুঃখের কথা, সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন পর্যন্ত নই।

স্বল্প পরিসরে সংক্ষেপে কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই বলে রাখি, মুদ্রাকর ও লেখকের ব্যবধান আমরা স্বীকার করি এবং সাহিত্যক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অনুপ্রবেশ আমাদের আদৌ লক্ষ্য নয়।

আমাদের দেশে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তুলনায় ইংরেজী বইয়ের সংখ্যা কম নয়। বেশীর ভাগ ছাপাখানায় ইংরেজী ও বাংলা দুই-ই ছাপা হয়। কাজেই সমস্যাটিকে ইংরেজীর সঙ্গে তুলনা করলে সমস্যাগুলি স্পষ্টতর হতে পারে। ইংরেজী বর্ণমালায় ২৬টি অক্ষর, বাংলায় ৫২টি। বর্ণ ৫২টি হলেও বাংলায় ছাপার হরফের সংখ্যা হাতে কম্পোজের ক্ষেত্রে ৪৮৪ থেকে ৫৫০; সহায়ক হরফ নিয়ে মনোটাইপে ৩১৯ থেকে ৩৫০ আর লাইনোটাইপে ২৯২। এই বৃহদায়তন অক্ষরমালার জন্য যন্ত্রের সাহায্যে (লাইনো ও মনো) অক্ষরযোজনা বা কম্পোজিং করলেও বাংলায় গতিবেগ ইংরেজীর তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশী নয়। হাতে কম্পোজের ক্ষেত্রেও ইংরেজী একই গতিতে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ, যে সময়ে ইংরেজী তিন পাতা কম্পোজ করা যায়, তাতে বাংলায় মাত্র দু পাতা কম্পোজ হবে। বাংলায় দু পাতা কম্পোজের ব্যয় ইংরেজী তিন পাতার সমান। ইংরেজীতে হাতে কম্পোজের অক্ষরডালা (যাতে বিভিন্ন অক্ষর রাখা হয়) দুটি—আপার ও লোয়ার, বা উপরের ও নিচের। এই দুটি অক্ষরডালার অক্ষর রাখার বিভিন্ন খোপের মোট সংখ্যা ১৫৩। বাংলায় অক্ষর-ডালার সংখ্যা চার আর মোট খোপের সংখ্যা ৪৫৫। বাংলা কম্পোজিটরকে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে ও নিচে এই চারটি ডালার ৪৫৫টি খোপ হাতড়াতে হয়। বাংলায় এই বিপুল অক্ষরসংখ্যার জন্য

দায়ী যুক্তাক্ষর। ফাউণ্ড্রিভেদে মোট অক্ষরের সংখ্যা ৪৮৪ থেকে ৫৫৩। এর মধ্যে যুক্তাক্ষরের সংখ্যাই ৩৯৩ থেকে ৪৩১। আবার, উকারান্ত যুক্তাক্ষরের সংখ্যা ৭০, যদিও মূলবর্ণ ৫২টি। *এই ৭০টি উকারান্ত যুক্তাক্ষরের মধ্যে বিশেষ রূপযুক্ত উকারান্ত অক্ষর ১৪টি, যথা:*

গু শু দু হু রু স্তু ন্তু

ত্রু দ্রু ব্রু শ্রু প্রু ভ্রু ক্রু

স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই উকারান্ত যুক্তাক্ষরের বিশেষ রূপ প্রায় অদৃশ্য হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক অনেকেই আর বিশেষরূপ না লিখে মূল বর্ণের পাশে বা নিচে উকার যোগ করেন। এই বিশেষরূপগুলি তুলে দেওয়ার জন্য কোন ফতোয়ার প্রয়োজন হয়নি। বোধ হয়, অল্প সময়ে বেশী শেখানোর তাগিদেই এই বিশেষরূপগুলি সরে গেছে অলক্ষ্যে এবং বিনা প্রতিবাদে। ভালই হয়েছে। অতীতে, ঘোড়ার-পাতা পর্যন্ত পৌঁছতেই আমাদের পা ভেঙে যেত, ইংরেজী শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটত প্যারীমোহন সরকারের 'ফার্স্ট বুকে' এই ঘোড়ার পাতাতেই। মুদ্রণের ক্ষেত্রে এই উকারান্ত যুক্তাক্ষরকে বিমুক্তভাবে লেখার রীতি প্রভূত উপকারের সম্ভাবনাময়। উকারান্ত ও ফলাযুক্ত অক্ষরের বিশেষ রূপ লেখায় ও ছাপায় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যা যুক্তিযুক্ত তাই ঘটছে অলক্ষ্যে, এবং বাকি সমস্ত যুক্তবর্ণের বিশেষ রূপের বিলোপসাধনে কোন অসুবিধা হওয়া বা অমত থাকার কথা নয়। লাইনো হরফের বিশেষ রূপযুক্ত যুক্তাক্ষরের সংস্কার সাধনে সহায়তা করেছে। যেমন, লাইনোর স্থ, হু, ক্ল, ক্ত নিজেদের পুরনো বিশেষ রূপগুলিকে ক্রমশঃ হটিয়ে দিচ্ছে। এখন প্রয়োজন যুক্তাক্ষরে বিশেষ রূপ বর্জন করার নীতিকে দ্রুত কার্যে রূপান্তরিত করা। লেখা বা ছাপার মধ্যে যুক্তাক্ষরের রূপকে যেন কুণ্ঠিতভাবে আসতে না হয়, স্বীয় মর্যাদায় আসুক, এইটুকু কাম্য।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, ছাপার অক্ষরের মোট সংখ্যা ৪৮৪-র মধ্যে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা ৩৯৩। বাকি ৯১টির মধ্যে আছে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনচিহ্ন, সংখ্যা ও যতি-বাচক হরফ। এই ৩৯৩টি যুক্তাক্ষরের মধ্যে উকারান্তের সংখ্যা ৭০, উকারান্ত ৩৫, ই-কারযুক্ত ৮, ঈ-কারযুক্ত ১৭, ঋ, র ও য-ফলা যুক্তের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭, ২৭ ও ৫। মোট ১৭৯। বাংলা কম্পোজ করতে যে চারটি কেসের বা ডালার প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে দুটি কেসের মোট খোপের সংখ্যা ২৫৬। অর্থাৎ, শুধুমাত্র এই উকারান্তাদি ১৭৯টি হরফকে বাদ দিলে কেসের সংখ্যা চার থেকে দুই-এ কমিয়ে আনাতে খুব অসুবিধা হবে না, এবং এর ফল হবে বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, গতিবেগ বৃদ্ধি, ফলে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রগতি।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাংলা লাইনোটাইপের প্রবর্তন করে বাংলা মুদ্রণের প্রভূত উন্নতি করে গেছেন। দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষে লাইনোটাইপ বা ইণ্টারটাইপ ইত্যাদি অক্ষর-যোজনার যন্ত্র অপরিহার্য। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যকীর্তি লাইনো বা ইণ্টারটাইপে ছাপা হয়ে পাঠকের মনোরঞ্জন করছে। লাইনোটাইপে কিন্তু উকারান্ত ৭০টি যুক্তাক্ষরের মধ্যে মাত্র ১৮টিকে স্থান দেওয়া হয়েছে, ইণ্টারটাইপে আদৌ নেই। রু-এর বিশেষরূপও বাদ গেছে। কোন নীতিতে এই ১৮টি উকারান্ত যুক্তাক্ষরকে বাদ দিতে পারা যায়নি তার কারণ আমার জানা নেই। কিন্তু এইটুকু বলা যায়, বাংলা ভাষায় অক্ষরের মধ্যে যে উকারান্ত যুক্তাক্ষর বেশী ব্যবহার হয়, অর্থাৎ পৌনঃপুনিকতা (frequency) গণনায় যেগুলি সর্বাধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত, সেগুলি বাদ গেছে। যেগুলি রাখা হয়েছে তার কতকগুলির উদাহরণ ও পাশে শতকরা পৌনঃপুনিকতা সংখ্যা দেওয়া হল। যেমন ত্থু—·০৮, ক্ষু—·০৬৮, ন্তু—·০২০, চু—·০১৮, ফু—·০০৪, ষু—·০০৬, ঠু—·০০৪, ঢু—·০০৬, টু—·০২৮, ইত্যাদি। যে উকারান্ত যুক্তাক্ষরগুলি লাইনোতে বাদ গেছে তার মধ্যে আছে, মু—·১৯১, রু—·১৭৪, নু—·১৩৪, সু—·১৬৪, পু—·১৩৮, গু—·১৩৪, শু—·১২২। এইসব ক্ষেত্রে উ-কার মূল বর্ণের পাশে রয়েছে, সুতরাং যুক্তাক্ষর নয়। অর্থাৎ, এক হাজার অক্ষর রয়েছে এমন বাংলা লেখার মধ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে উকারান্ত সেই যুক্তাক্ষরগুলি যার পৌনঃপুনিকতা গণনা এক বা দুই-এর কাছাকাছি, আর যেগুলি রাখা হয়েছে তার পৌনঃপুনিকতা প্রতি দশ হাজারে আট থেকে প্রতি লক্ষে চারের মধ্যে। উকারান্ত ৭০টি যুক্তাক্ষরের মধ্যে লাইনোতে পাই ১৮টি, বাকি ৫২-টির ক্ষেত্রে উকার মূল বর্ণের পাশে লাগাতে হয়, নিচে থাকে না। কাজেই, সমস্ত উকারান্ত যুক্তাক্ষরে যদি উ-কার নিচে না দিয়ে পাশে দেওয়া হয়, তাহলে আপত্তি যুক্তিসহ হয় না। বেশী ব্যবহৃত ৫২-টিকে উ-কার পাশে, বসালে যদি সহ্য হয়, তাহলে ১৮-টিকে বর্জন করে উ-কার নিচে না দিয়ে পাশে বসালে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বাংলা ইণ্টারটাইপে সমস্ত উকারান্ত যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া হয়েছে। কথা উঠতে পারে, ছাপার অক্ষরের ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের বিশেষরূপ বর্জন করে যে সুবিধা পাওয়া যাবে, তা আবার অন্যভাবে নস্যাৎ হবে কিনা। অর্থাৎ,

উ-কার পাশে বসালে, বেশী জায়গা লাগবে, কাগজের অপচয় ঘটবে ও ছাপার খরচ বাড়বে কিনা। কিন্তু দেখা গেছে যে, উ-কারের পৌনঃপুনিকতা শতকরা ২·২১৮ বা প্রতি হাজার অক্ষর ২২টি। বর্ণের পাশে উ-কার রাখলে পাইকা ২৪-এম প্রতি ২৬ লাইনের পাতায়, প্রতি পাতা ১২-এম বা আধ লাইন মতো বাড়বে। আর, উ-কারাদি চিহ্ন পাশে বসালে, অন্যভাবে আরও বেশী জায়গার সাশ্রয় হয়। এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

উকারান্ত ছাড়া, ঊকার, ঋ, র, বা য-ফলা ও থ ধ ইত্যাদি যুক্তবর্ণের যে বিশেষ রূপগুলি চলে আসছিল, তার ব্যবহার ইতিমধ্যে লোপ পেয়েছে। যেমন, হু, ন্থ, ন্ধ, ন্ব প্রভৃতি বর্ণের পুরনো রূপগুলি লোপ পেতে বসেছে। একই নীতিতে ত্+র-এর বিশেষ রূপ বর্জন করা যায়। অর্থাৎ এ-র উপরে মাত্রা দিয়ে না লিখে ত্র লিখলে ক্ষতি কি? আমরা মাত্রাযুক্ত ও-র ডান পাশে আঁকড়ি-যুক্ত বর্ণটি বাদ দিয়ে ক্ত লিখছি, ন্তু লিখতে ন-এর নিচে ও যোগ করা উঠে গেছে—এগুলি যদি শুদ্ধ হয় তাহলে ত-এর দ্বিত্বের ক্ষেত্রে ছোট ত-র পাশে মূল ত-তে দোষ কি?

এছাড়া, উ-কার, ই-কার, ঈ-কার ইত্যাদি ও ঋ, র, য, ব, ন, ণ, ম, ল-ফলা ও রেফ, হসন্ত যোগে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা কম নয়। ফাউণ্ড্রি ও লাইনো অক্ষরের (উকারাদি যুক্ত) সংখ্যা দেওয়া হল। উ-কার যোগে ফাউণ্ড্রিতে ৩৬, লাইনোতে ২। বেশী ব্যবহৃত পু-(শতকরা) ·১১৮, মু—·০৪, দু—·০২২ নাই, আছে কু, ক্রু-র পুরনো রূপ ইত্যাদি যার ব্যবহার খুবই কম। ঋ-ফলা যুক্ত ১৮টির মধ্যে লাইনোতে আছে ৫টি। এইভাবে দেখা যায়, ফাউণ্ড্রি ও লাইনোটাইপে যুক্তাক্ষর ঋ-কারযোগে যথাক্রমে ৩৫ ও ১২, ব-যোগে ১৫ ও ৩, ন-যোগে ১২ ও ৩, ল-যোগে ১০ ও ২। কাজেই এই সমস্ত যুক্তাক্ষর বর্জন করে, স্বর বা ব্যঞ্জনচিহ্ন পাশে দিয়ে যাবতীয় যুক্তাক্ষর গঠন করলে টাইপ কেস, লাইনো ও মনো কী-বোর্ডের বৃহদায়তন কমানো যায় এবং ফলে বাংলা মুদ্রণের ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস করা যেতে পারে।

উকারাদি ছাড়া অন্য যুক্তাক্ষরের সংখ্যা ১১২। লাইনোটাইপে ব্যঞ্জনবর্ণের হাফ বডি বা অর্ধ-বর্ণ ব্যবহার করে এই সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। সুরেশচন্দ্র মজুমদার এই হাফ-বডি অক্ষর উদ্ভাবন মুদ্রণসংস্কারে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মাত্র ২৪টি হাফ-বডি ব্যবহার করে ১১২টি যুক্তাক্ষরকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়।

আমাদের একটি মৌলিক সমস্যা হল বাংলা বর্ণের গঠন। বাংলা অক্ষর ত্রি-স্তর। প্রথম স্তর হল ি, ী, ই, ঈ, উ, ঊ, ঐ, ঔ, ট, ঠ, ণ ইত্যাদি অক্ষরের মাত্রার উপরের অংশ। দ্বিতীয় স্তরে মূল বর্ণ, অর্থাৎ অ, ঋ, এ, ও, ক, খ ইত্যাদি। আর তৃতীয় স্তরে ু, ূ-কার বা ্র, ্য-ফলা ইত্যাদি যে-সব স্বর বা ব্যঞ্জনচিহ্ন যুক্ত হয়ে মূল বর্ণের নিচে বসে। এই তিনটি স্তর থাকার জন্য বাংলা অক্ষর সলিড বা ঠাসা কম্পোজ করা যায় না। প্রতি লাইনের পর লেড বা ফাঁক রাখতে হয় হাতে কম্পোজ করা ম্যাটারের মধ্যে। দুই লাইনের মধ্যে লেড বা জায়গা না রাখলে উপরের লাইনের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ উকারাদি স্বর বা ব্যঞ্জনচিহ্ন পরবর্তী লাইনের প্রথম স্তর অর্থাৎ ইকারাদি স্বর বা ব্যঞ্জনচিহ্নের মাত্রার উপরের অংশ জুড়ে গিয়ে ছাপার সময় অনর্থ সৃষ্টি করে। দুই লাইনের মধ্যে প্রতি লাইনের সিকি বা অর্ধেক আয়তন মত লেড বা জায়গা দিতে হয়। পাইকা বা ১২-পয়েণ্টে কম্পোজ করলে ইংরেজীতে যেখানে ১ ইঞ্চিতে ৬ লাইন ধরে বাংলায় সেখানে ৪ বা ৫ লাইনের বেশী হবে না। কাজেই, ইংরেজী ১০০ লাইনের ম্যাটার বাংলায় অতিরিক্ত লেড ইত্যাদির জন্য ১৫০ লাইনে দাঁড়ায়। যে বই একশ পাতায় শেষ হতে পারে, তা হবে প্রায় দেড়শ পাতায়। ফলে, আমরা ইংরেজী মুদ্রণের তুলনায় মাত্র ত্রি-স্তর অক্ষরের জন্যই অনেক বেশী খরচ করি। ছাপার খরচের সঙ্গে কাগজের খরচ, বাঁধাই ও আনুষঙ্গিক খরচ বাড়ে। কাগজের অপচয় হয়। ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে হয়, মূল্য অনেকের সাধ্যের বাইরে চলে যায় শুধুমাত্র ত্রিস্তর অক্ষরের জন্য।

ইংরেজীর তুলনায় একই আয়তনের অক্ষর বাংলায় উচ্চতায় ছোট। অর্থাৎ, ১২ পয়েণ্ট বা পাইকা ইংরেজী অক্ষরের তুলনায় বাংলা পাইকা অক্ষরের উচ্চতা সাড়ে এগার পয়েণ্ট বা আরও কম। এর উপরে ত্রিস্তর থাকার জন্য বাংলায় দু লাইনের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আধ লাইনের মত ফাঁকা জায়গা বা লেড দিতে হয়। ফলে, দুই পংক্তির মধ্যে সাদা জায়গা রাখা প্রয়োজন। এই সাদা জায়গা অবশ্য প্রয়োজনীয়। দুটি শব্দের মধ্যে যেমন ফাঁক থাকা প্রয়োজন, দুটি লাইনের মধ্যেও ফাঁক প্রয়োজন। না থাকলে ছাপা দুষ্পাঠ্য হবে। মঞ্চে পাদপ্রদীপের প্রয়োজনীয়তা পাত্র-পাত্রীদের আলোকিত করতে, আবার বেশী আলোতে চোখ ঝলসে যায়, আলোর উদ্দেশ্য বিফল হয়, ছাপার ক্ষেত্রেও শব্দের বা লাইনের মধ্যবর্তী সাদা জায়গা কালো অক্ষরের পাত্রপাত্রীদের উদ্ভাসিত করে, আবার বেশী হলে আলোর বন্যায় তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ইংরেজী অক্ষর এক-স্তর হলেও অক্ষরের নিচে ও উপরে জায়গা থাকে তাই দুলাইনের মধ্যে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাংলার ক্ষেত্রে ত্রি-স্তরের জন্য যেমন জায়গা প্রয়োজন, আবার এই সাদা জায়গার

আধিক্যই (অর্থাৎ, লেড দিলে) মুদ্রিত অক্ষরের সহজ-পাঠ্যতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয়। উকারাদি চিহ্ন নিচে না দিয়ে পাশে রাখলে তৃতীয় স্তর বাদ দেওয়া যেতে পারে এবং বাংলা অক্ষর দ্বি-স্তরে রাখতে পারলে দু-লাইনের মধ্যে লেড কমানো যাবে। ফলে, মুদ্রণের ব্যয় হ্রাস পাবে।

আমাদের আরেকটি বড় সমস্যা হল বাংলা টাইপ কেস বা অক্ষরডালার সংখ্যা ও লে-আউট বা অক্ষরবিন্যাস। রোমান হরফ রাখার ডালার সংখ্যা দুই, আপার ও লোয়ার। এই দুটি ডালায় যথাক্রমে ৯৮ ও ৫৫টি মোট ১৫৩টি অক্ষর রাখার খোপ আছে। বাংলায় কম্পোজ করতে আপার, লোয়ার, রাইট ও লেফট এই চারটি ডালার মোট ৪৫৫টি খোপ থেকে অক্ষর তুলতে হয়। বলা বাহুল্য, ডালা ও খোপের এই সংখ্যাধিক্যের জন্য বাংলা কম্পোজিং-এর গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ। অথচ, অক্ষরডালা ও খোপের এই সংখ্যা কমানো মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু এও বাহ্য। সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হল আমাদের বাংলা লোয়ার কেসের বিভিন্ন অক্ষরের লে-আউট বা বিন্যাস। এই অক্ষর বিন্যাস আমরা হুবহু ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণে করেছি। এটা চলে আসছে কেরী সাহেবের আমল থেকে। আর একটু বুঝিয়ে বলি। ইংরেজী লোয়ার কেসের যে খোপে টি থাকে, বাংলায় অনুরূপ স্থানে রাখা হয়েছে ত, এইভাবে এল স্থানে ল, বি-স্থানে ব, এম-স্থানে ম, সি-স্থানে ক, এন-স্থানে ন, ডি-স্থানে দ, এ-স্থানে অ, আর-স্থানে র, জি-স্থানে গ, জে-স্থানে জ ইত্যাদি। মনে হয়, কেরী বা ভারপ্রাপ্ত অন্য কেউ বাংলা মুদ্রণ প্রবর্তনের সময় ইংরেজীনবিসকে দিয়েই বাংলা কম্পোজ করাতে চেয়েছিলেন। যাতে বাংলা অক্ষরডালার বিন্যাস মনে রাখা সহজ হয় সেজন্য খোপে অক্ষর বিন্যাস করতে গিয়ে একেবারে ইংরেজীর অনুকরণ করেছিলেন। আজও এই বিন্যাসপদ্ধতি বিদ্যাসাগরী বা বটতলা সাট এই উভয় নামেই প্রচলিত। এই দুশ বছরেও কোন পরিবর্তন হয়নি। বাংলা অক্ষরবিন্যাসের এই পদ্ধতি এখনও সব ছাপাখানায় প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং আগে ইংরেজী কম্পোজ করতে শিখলে বাংলা কম্পোজ শিখতে দেরি হবে না, এটা আপাতত একটা লাভ মনে হতে পারে। যদিও বাংলা লোয়ার কেসের ৭১টি খোপের অক্ষর-বিন্যাস মনে রাখা খুব সময়সাপেক্ষ বলে মনে হয় না।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, যে-কোন কী-বোর্ডের লে-আউট বা অক্ষরবিন্যাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে হবে। এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল সেই ভাষায় অক্ষর ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা। অর্থাৎ, যে অক্ষরটি সবচেয়ে বেশী বা বারবার প্রয়োজন হয় তাকে অক্ষরডালায় সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে রাখতে হবে। তাই ইংরেজী টাইপরাইটার বা মনোটাইপ কী-বোর্ড বর্ণানুক্রমিক বা এ-বি-সি-ডি এই ক্রমে না হয়ে কিউ-ডবলু-ই-আর-টি এই ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। ইংরেজী লোয়ার কেসের অক্ষরবিন্যাস তাই বর্ণানুক্রমিক না করে পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। অথচ, বাংলার ক্ষেত্রে এর কোন চেষ্টাই করা হয়নি। আজ পর্যন্ত কেরীর পর এই সুদীর্ঘ দুশ বছরের মধ্যেও। ইংরেজী 'টি' আর বাংলা ত-র পৌনঃপুনিকতা বা 'এল' ও ল-র, 'বি' ও ব-র, 'এ' ও অ-র, 'ডি' ও দ-র, 'এম' ও ম-র পৌনঃপুনিকতা যে এক হতে পারে না, এটা বুঝতে গেলে কোন গবেষণার প্রয়োজন হয় না। বাংলা কম্পোজিটরের উপর অযথা ভার চাপানো হয়েছে এই অবৈজ্ঞানিক অক্ষরডালা হাতড়ানোর জন্য। যে অক্ষরের বেশী প্রয়োজন তাকে রাখা হয়েছে দূরে। এই লে-আউটের আশু সংস্কার প্রয়োজন। পৌনঃপুনিকতাক্রমে অক্ষরবিন্যাস করলে বাংলা কম্পোজিং-এর গতিবেগ ইংরেজীর তুলনায় কম হবে না। মনো কী-বোর্ড বা টাইপ কেসের অক্ষরবিন্যাস সম্বন্ধে লনডন স্কুল অফ প্রিন্টিং-এর প্রিন্সিপাল মিঃ এলিস থারকেটলের কাছ থেকে ১৯৫০ সালে যে মতামত সংগ্রহ করেছিলাম তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি ১৭ মার্চ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আমাকে লিখেছিলেন:

"...Thus your problem will not be simply to translate the roman alphabets into Bengali and put corresponding letters into corresponding places; but first to make a study of the Bengali code of signs and a range of reading matter; from this to determine the relative degree of frequency of each letter; and then finally to give to each letter its most suitable place in the keyboard having in mind ease of fingering and the use of both hands, just as was done in the case of roman alphabets."

নিচে অক্ষরডালায় ইংরেজী অক্ষরের যে স্থানে বাংলা অক্ষর রাখা হয়েছে, সেই অক্ষরের পৌনঃপুনিকতার শতকরা হার এবং ডালায় কেন্দ্রস্থান থেকে আপেক্ষিক দূরত্ব দেখিয়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হল:

ডালার খোপে যে ইংরেজী অক্ষর থাকে	অনুরূপ খোপে যে বাংলা অক্ষর রাখা হয়েছে	বাংলা অক্ষরের পৌনঃপুনিকতার শতকরা হার	ডালার কেন্দ্র থেকে বাংলা অক্ষরের দূরত্ব-ইঞ্চিতে
ই	া	১১·১৯০	৯
আই	ে	৭·৬৪৯	১০·৫
আর	র	৭·০৪৪	৯
এন	ন	৪·৫১১	৬·৭৫
টি	ত	৪·১৮০	৪·৫
সি	ক	৪·১২০	১৩·৫
বি	ব	৩·৬৭৪	১৫
এল	ল	২·৮৩২	১৩·৫
এম	ম	২·৫৭০	১০·৫
এইচ	স	২·২২৯	৪·৫
এ	অ	২·০১৮	৪·৫
ডি	দ	১·৮১১	১০·৫

মনে না হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন কম্পোজিটরকে ঘণ্টায় হাজার থেকে বারশ অক্ষর তুলতে হয়। ডালায় অক্ষর বিন্যাসের কোন ভুল থাকলে, সে-ভুল প্রতি ঘণ্টায় সহস্রাধিক গুণে প্রতিফলিত হবে কম্পোজিটরের গতিবেগের মন্দতায়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বিলেতে অবস্থানকালে মনোটাইপ বাংলা কী-বোর্ডের অবৈজ্ঞানিকতা বিষয়ে মনোটাইপ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। মনো বাংলা চাবি-পাটাতনের জন্ম ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। প্রায় এক দশকেরও পরে সর্বপ্রথম একজন বাঙ্গালী চাবি-পাটাতনের অরাজক অবস্থা নিয়ে অকাট্য প্রশ্ন তুলেছেন দেখে মনোটাইপ কর্তৃপক্ষ বিস্ময় প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় অজ্ঞতার জন্য তাঁরা এতকাল জানতেই পারেননি যে, তাঁরা যে বাংলা কী-বোর্ড প্রবর্তন করেছেন তা বর্ণানুক্রমিক, পৌনঃপুনিকতাভিত্তিক নয়।

পরবর্তীকালে (১৯৫০) মনোটাইপ করপোরেসনের অধিকর্তা মিঃ ই. সিলকক স্বীকার করেন—বাংলা মনো কী-বোর্ডের লে-আউট বাংলা ভাষা মুদ্রণের কোন বিশেষজ্ঞ করে দেননি, কী-বোর্ডের মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন কোম্পানীর কলকাতা শাখা। মিঃ সিলকক আমাকে পত্রযোগে জানান,

"when we first manufactured Bengali matrices in 1937* we were provided with a keyboard layout by our Calcutta office."

বাংলা মুদ্রণের কি অবস্থা! আমাদের এমনই অপদার্থতা, এমনই হীনম্মন্যতা যে, বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উচিত মূল্য নিয়ে যে কম্পোজিং যন্ত্র প্রস্তুত করেছেন, আমরা তাই বিনা প্রতিবাদে, সাগ্রহে গ্রহণ করেছি। প্রথম বাংলা টাইপরাইটারের কী-বোর্ডও ছিল বর্ণানুক্রমিক। সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা লাইনোর কী-বোর্ড বর্ণানুক্রমিক করেননি। কিন্তু গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ই বা কি? দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, ছাপাখানার মালিকরা কী-বোর্ডের বা সেই সঙ্গে অক্ষরডালার বিন্যাসের ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন ছিলেন। তা ছাড়া, এ দেশে ত কম্পোজিং যন্ত্র তৈরি করার স্বপ্ন দেখা দূরে থাক, বাংলা ম্যাট্রিক্স তৈরির কথাও কল্পনা করতে পারি না। তাই যথেষ্ট আ-কার না থাকায় এবং বিদেশী মুদ্রার অলভ্যতা জন্য লাইনো বন্ধ রাখতে হয়, কিংবা (দৈনিক সংবাদপত্রে) ছোট অক্ষরের (১০ পয়েন্টের) ম্যাটারে বড় অক্ষরের আ-কার (১২ পয়েন্ট) অবাধে ব্যবহার করতে হয়।

পরে মনোটাইপ করপোরেসন কী-বোর্ডের কিছুটা উন্নতি করেছেন। কিন্তু অক্ষরের পৌনঃপুনিকতার ভিত্তিতে সংস্কার করা হয়নি বলে কম্পোজিংএর গতি আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। প্রসূন দত্ত ও দীপংকর সেন যৌথভাবে কী-বোর্ডের যে নতুন নকশা করেছেন তা প্রভূত উন্নত। কর্তৃপক্ষ এখনও এই নকশা গ্রহণ করেননি। বাংলা লাইনো কী-বোর্ড বিন্যাসে এখনও উন্নতির অবকাশ আছে। বর্তমানকালের কী-বোর্ডের বিন্যাস পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

*মনোটাইপ করপোরেসনের কলিকাতা শাখার মতে, বাংলা মনো দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি প্রবর্তিত হয়েছিল, দৈনিক বসুমতীর চাহিদা মত। ("Monotype Bengali was originally designed during the mid-twenties for the newspaper Dainik Basumati")

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি মোটামুটি এই:

১ উকার ইত্যাদি ফলাযুক্ত সমস্ত যুক্তাক্ষরের বিশেষ রূপ বর্জন করা হোক;

২ উকারাদি চিহ্ন বর্ণের নিচে না রেখে পাশে রাখা হোক;

৩ ত্রি-স্তর অক্ষরের নিচের স্তর বিলোপ করে দ্বি-স্তর করা সুবিধাজনক;

৪ হাফ বডি বা অর্ধ-অক্ষর যোগে সমস্ত যুক্তবর্ণ গঠন করা;

৫ বাংলা টাইপ কেসের সংখ্যা চার থেকে কমিয়ে দুইয়ে আনা;

৬ বাংলা লাইনো ও মনো কী-বোর্ড এবং টাইপ কেসের পুনর্বিন্যাস পৌনঃপুনিকতাক্রমে করা;

বক্তব্যের দৈর্ঘ্য ক্লান্তিকর হতে পারে একথা মনে রেখেও আরও দু-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা না করে পারছি না। প্রথমতঃ, বাংলা হরফ বা টাইপ ফেসের দারিদ্র্য। বাংলায় আমাদের টাইপ ফেস একটিই। ইংরেজীতে বিষয়বস্তুর প্রভেদে, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক, দ্রুতপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, ধ্রুপদ বা আধুনিক সাহিত্য ইত্যাদি ভেদে, মুদ্রণ-পদ্ধতির বিভিন্নতায়, অর্থাৎ লেটার প্রেস, অফসেট বা ফটোগ্রাভিওরে ছাপার জন্য বিশেষ এবং উপযোগী টাইপ ফেসের ব্যবস্থা আছে। বাংলায় কিন্তু আমাদের সবে ধন নীলমণি। আমরা যে টাইপে পঞ্জিকা ছাপি, রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সেই একই টাইপে ছাপা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এণ্টিক, আর্ট বা নিউজপ্রিণ্ট যে কাগজেই ছাপি না কেন, বাংলা টাইপ ফেস আমাদের একমেব। সহস্রাধিক ইংরেজী টাইপ ফেস প্রবর্তনে সংবাদপত্র তথা টাইপ ফাউণ্ড্রির অবদান প্রভূত। বাংলা লাইনোতে টাইপ ফেস মাত্র একটি—এবং মাত্র দুটি সাইজের, ১০ ও ১২ পয়েণ্ট। অভিধানে ব্যবহারের উপযোগী কোন ছোট সাইজের বাংলা অক্ষর নেই। আবার হেডিং ইত্যাদির জন্য লাইনো বা মনো অক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হেডিং টাইপও নেই। লাইনো অক্ষরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হেডিংএর বড় অক্ষরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয় লাডলো মেসিনে বাংলা অক্ষরের প্রবর্তন করে। পরে দৈনিক সংবাদপত্রও এই লাডলো অক্ষর ব্যবহার করে। অক্ষর যোজনার যন্ত্র বা তার উপযোগী অক্ষরের ছাঁচ আমাদের দেশে তৈরি হয় না। বাণিজ্যিক কারণে, বিদেশী কোম্পানী বাংলায় বিভিন্ন টাইপ ফেস তৈরি করতে চায় না, কারণ চাহিদা নেই। নতুন টাইপ ডিজাইনে মূলধন নিয়োগ করতে তাই তাদের উৎসাহ নেই।

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান মূলতঃ মুদ্রণব্যবসায়ী। সাংবাদিকতার আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হলেও মুদ্রণের প্রতি তাঁদের একটু অনুরাগ, একটু ভালবাসা একটু শ্রদ্ধা আছে আশা করা অযৌক্তিক নয়। সংবাদপত্রের কাছ থেকে নতুন টাইপ ফেস প্রবর্তনের উৎসাহ আশা করা যায়। এ বিষয়ে টাইপ-ফাউণ্ড্রিরও কর্তব্য আছে। যাঁরা বাংলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বা প্রতিষ্ঠাকামী, বাংলা সাংবাদিকতা যাঁদের উপজীব্য তাঁদের কাছেও বাংলা মুদ্রণ একটু মনোযোগ আশা করে। বিভিন্ন শিল্পকে উৎসাহ দেবার জন্য নানা আকাদেমি ও প্রতিষ্ঠান এদেশে আছে, সাহিত্য আকাদেমি, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি। বিভিন্ন শিল্পের জন্য উন্নয়ন তহবিল আছে। বাংলা মুদ্রণে বিভিন্ন টাইপ ফেস নির্মাণের জন্য যে অর্থবিনিয়োগ প্রয়োজন তার জন্য কোন আকাদেমি, সরকারী ও বেসরকারী, অর্থভাণ্ডার কি গঠিত হতে পারে না? বাংলা মুদ্রণের জন্য কোন সক্রিয় বা আন্তরিক চেষ্টা না করে শুধু 'আ মরি বাংলা ভাষা' বলে চেঁচিয়ে আকাশ বাতাস কম্পিত করলেও বা ভাষার জন্য শহীদ হলেও কর্তব্য শেষ হয় না, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

বাংলা বানানে নৈরাজ্য চলেছে। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, বিশেষ করে ও-কার ব্যবহারের প্রবণতায় স্বেচ্ছাচারিতা চলে আসছে। কর, করো, কোরো, কোরে, করেছিল, কোরেছিল, বড়, বড়ো, ছোট, ছোটো—এর কোনটা চলবে? অর্থনৈতিক আর্থনীতিক বা অর্থনীতিক, সর্বজনীন না সার্বজনীন—এর কোনটা বিহিত? এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পূর্বে চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। সেইমত রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখক এবং শিক্ষাবিদদের নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বানান সমিতি গঠন করেন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। জানি না, বানান সমিতি কোন মুদ্রাকরের মতামত গ্রহণ করেছিলেন কি না। অবশ্য, বানান সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন পুস্তিকার ভূমিকায় বলেছেন:

"এই সমিতি বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকগণের নিকট একটি প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন।...কতকগুলি বিষয়ে প্রায় সকল উত্তরদাতাই একমত। কোন কোন স্থলে বহু প্রচলিত বানান কিঞ্চিৎ বদলাইয়া সরল করিতে কাহারও আপত্তি নাই। আবার কতকগুলি বিষয়ে প্রবল মতভেদ দেখা যায়।...বানান যথাসম্ভব সরল ও উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন

উচিত নয়। অতিরিক্ত অক্ষর বা চিহ্ন চালাইলে লাভ যত হইবে তাহা অপেক্ষা লেখক, পাঠক ও মুদ্রাকরের অসুবিধা অধিক হইবে।...প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ লোকে অর্থ হইতেই বুঝিয়া লয়। ...প্রদেশভেদে উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ভেদ হইলেও ক্ষতি হয় না।"

বানান সমিতি বানানের নিয়ম সংকলনে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। বলেছেন, "সমস্ত বাংলা শব্দের বানান এককালে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নয়। নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" সমিতির এই আশা পূর্ণ হয়নি। ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ হওয়া দূরে থাক, বানানে শিথিলতা আরও বেড়েছে। মুদ্রাকর ভাষাবিদ নয়, লেখকও নয়। কিন্তু, বিভিন্ন ভাষা তাকে ছাপার অক্ষরে আনতে হয়। সবিনয়ে জানাই, ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে মুদ্রাকরকে বিকল্প বা উচ্চারণসূচক বানানের অসুবিধায় বড় একটা পড়তে হয় না। কোন কোন লেখক বানানের মধ্যে নিজস্ব স্টাইল প্রয়োগ করেন। এইভাবে, স্‌টেশন, স্‌কুল ইত্যাদি বানান শুরু হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটি নতুন অক্ষরের যোগ হয়ে গেল, যেমন স্ট, স্ট + ই, স্ট + ঈ, স্‌ + ট + র + ই, স্‌ + ট + র + ঈ, স্‌ + ট + ঈ, আমাদের বিপুলায়তন অক্ষরডালাতে। আগে ষ্ট দিয়েই সব কাজ চলত। বিদেশী শব্দের ণত্ব, ষত্ব বিধি-মানার প্রয়োজন নেই, এই অজুহাতে একটি নতুন অক্ষরগোষ্ঠী ন্‌ + ট-এর সঙ্গে চলে এল। বাংলা অক্ষরডালাতে স্থান প্রচুর, প্রয়োজন হলে এক খোপে সহাবস্থানও চলে। কণ্টক শব্দে ব্যবহারের জন্য যে ণ্ট (ণ্‌ + ট) আমাদের ছিল, তাই দিয়েই আমরা গভর্নমেণ্টও চালাতাম। ন্‌ + ট-এর প্রয়োগ ছিল না। বানান সমিতি অবশ্য বলেছিলেন, "বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে।"

বানান সমিতি আবার একই সঙ্গে বিধান দিলেন "নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্তবর্ণ স্ট বিধেয়।" আগেই বলেছি সমিতি বোধহয় মুদ্রাকরের অভিমত জানতে চাননি।

উচ্চারণভিত্তিক বানান করলে তার শেষ কোথায়? বাঁকুড়া, মেদিনীপুর বা বীরভূমের, পূর্ব-বঙ্গাগত বাঙালীর বা শান্তিপুরবাসীর উচ্চারণ এক নয়। "রোমনীর মন" বা "রমণীর মোন", দুরকম বানানই শুদ্ধ বলে ধরতে হয়। আর, উচ্চারণে বানানের মিল রাখতে স্বীকার করলে তো 'সহ্য' না লিখে 'সজ্ঝ' লিখতে হয়! হয়ত না লিখে কি হয়তো লিখতে হবে? পড়বার সময় বানান করে যেমন কেউ পড়ে না, তেমনই মুদ্রাকরও কম্পোজ বা ডিস্ট্রিবিউট করার সময় বানান করে কাজ করে না, শব্দটির সমগ্র রূপ দেখেই বানান বুঝে নেয় এবং কম্পোজ ও ডিস্ট্রিবিউট করে। একই শব্দের উচ্চারণগত বিভিন্ন বানান থাকলে কম্পোজ ও ডিস্ট্রিবিউশানের সময় অজস্র ভুল হবে, দেরি হবে।

মুদ্রাকরের বক্তব্য, বানান সরল ও অবিকল্প হোক। উচ্চরণের সুবিধার জন্য বানানের পরিবর্তনেব প্রয়োজন নেই। বানান সমিতি দ্বিত্বপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছেন। বলেছেন, "দ্বিত্ব না করলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।" এতে ছাপা সহজ হয়েছে নিশ্চয়। য-ফলার প্রয়োগও কমেছে।

আমরা কজন শ, ষ, স ইত্যাদি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করি? ন ও ণ-এর উচ্চারণেই বা প্রভেদ কোথায়?

এই বানান সংস্কারের উদ্যোগ হয়েছিল, আজ থেকে ৪৩ বছর পূর্বে। তার পরে, লাইনো, মনো ও ইণ্টারটাইপ বাংলা মুদ্রণে যে যান্ত্রিক রূপান্তর এনেছে তা বাংলা বানানকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। সুতরাং বানান সংস্কার নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আবার সামগ্রিক আলোচনা করবার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার অবতারণা করি। প্রায় কুড়ি বছর আগে লেখক বর্ণমালার বিপুলতার উৎস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য সাহিত্য পরিষদে যায়। প্রবেশদ্বারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কর্তা-স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ায় এবং প্রবেশের অনুমতি চাওয়ায় সাহিত্যিক মুদ্রাকরকে অত্যন্ত নিরুৎসাহ করেন। অন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েও নিরাশ হয়। তাঁদের বক্তব্য, মুদ্রাকরকে যেমনটি দেব, তেমনই ছাপতে হবে। কারণ, ছাপার জন্য পয়সা দিই। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, বানান সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ও অবিকল্প নিয়ম না থাকায় লেখকের বানানের স্টাইল মত কম্পোজ করতে মুদ্রাকরকে প্রতি পদে হোঁচট খেতে হয়, গতি স্তব্ধ হয়, মজুরি বেশী পড়ে। কিন্তু, অতিরিক্ত মজুরি পাওয়াটাই বড় কথা নয়, ক্রমাগত হোঁচট খেতে খেতে বাংলা মুদ্রাকর পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এ ক্ষতি কার? পাঠকের, ক্রেতার না মুদ্রাকরের? লেখক যা ইচ্ছা লিখুন, নায়কনায়িকার সম্বন্ধ মিলনে বা বিচ্ছেদে শেষ হোক, লেখকের স্বাধীনতায় আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই। মিনতি শুধু, রোহিণীকে রোহিনী করবেন না, দ্বিত্ব বর্জন করে কার্ত্তিককে মাতৃহারা করবেন না, কার্ত্তিক যে কৃত্তিকার অপত্য।

সরকারী মুদ্রনালয়

প্রসূন দত্ত

ব্রিটিশ আমলের বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস অর্থাৎ পরবর্তীকালের বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট প্রেস তথা বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের জন্ম, বলা যায়, ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই তথ্যের সপক্ষে প্রমাণ নেই। 'এ পীপ্ ইনটু দি বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট প্রেস' পুস্তিকায় (১৯৩৬) এই দাবি করে বলা হয়েছে, 'সূচনাকালে এই প্রেস ছিল ভারত সরকারেরই ছাপাখানা। তদানীন্তন ইংরেজ-সরকারের অনুমতি নিয়ে কিছু লোক সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র ও ফরমাদি মুদ্রণের ভার নেন আর সেই থেকেই সরকারী প্রেসের সূত্রপাত।'

বিলাতী সংবাদপত্রের অনুসরণে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। উক্ত গেজেটে প্রকাশিত মন্তব্য সরকারী মহলকে ক্ষুব্ধ ও বিরূপ করে তোলে। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর কাউন্সিল হিকিকে জব্দ করবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনকে একটি ছাপাখানা স্থাপনের জন্য উৎসাহ দেন। 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' গ্রন্থে মুহম্মদ সিদ্দিক খান লিখেছেন: "গ্ল্যাডউইন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Calcutta Gazette Press স্থাপন করেন। এই প্রেস থেকেই সরকারী গেজেট প্রকাশিত হত এবং কোম্পানীর অধিকাংশ মুদ্রণকার্য নিষ্পন্ন হত। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক চার্লস উইলকিনসের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সরকার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রেসটি প্রথমে অনারেব্‌ল্ কোম্পানীর প্রেস ও পরবর্তী কালে গভর্নমেণ্ট প্রেস নামে পরিচিত হয়।" (পৃ. ২১)

উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলিকে সত্য বলে ধরে নিলে স্বীকার করতে হয়, সরকারী ছাপাখানার বর্তমান বয়স দুশ বছর। কিন্তু মনে হয়, জন্ম-তারিখের কথাটি ঠিক নয় এবং উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্যক্ তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা সমর্থিত নয়।

সরকারী নথিপত্র পর্যালোচনা করলে জানা যায়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতাবৎকাল ভারত সরকারের আদেশাদি, অ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি ক্যালকাটা গেজেট প্রেসে ছাপা হচ্ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ থেকে নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত হয়, 'গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া।' 'অ্যান্ হিস্টোরিক্যাল স্কেচ্ অব্ দ্য গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সেণ্ট্রাল প্রিণ্টিং অফিস' প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়, "ভারতসরকার ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'মিলিটারী অরফ্যান প্রেস' অধিগ্রহণ করেন।" ভারত সরকারের নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপিত হবার পর বাংলা সরকারও নিজেদের

ছাপাখানা স্থাপনে আগ্রহী হন। এতকাল ছিল আধা-সরকারী বা যৌথ প্রচেষ্টা, এবার প্রতিষ্ঠিত হল নিজেদের প্রতিষ্ঠান।

রাজ্যসরকারের 'রুলস্ ফর ম্যানেজমেন্ট অব্ দ্য প্রিণ্টিং ডিপার্টমেন্ট' গ্রন্থটি পাঠে জানা যায়, বাংলা সরকারের প্রেস স্থাপিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে, বাংলা সরকারের নিজস্ব প্রেস ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় আর ছাপাখানার অধীক্ষকের পদ মঞ্জুর হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ তারিখে।

অবশ্য একথা সত্য যে সরকারী 'মুদ্রণ বিভাগের' জন্ম ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল কিন্তু তখনকার দিনে ছাপার কাজ হত ব্যক্তিগত মালিকানার ছাপাখানায় নতুবা আধা-সরকারী প্রেসে সরকারী তত্ত্বাবধানে ছাপার কাজ করিয়ে নেওয়া হত।

সে যাই হোক, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এডুইন মরিস লুইস ক্যালকাটা গেজেটের মুদ্রক ও প্রকাশক নিযুক্ত হন। তখন ক্যালকাটা গেজেট ২৮ চৌরঙ্গী রোডে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য সরকারের ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লুইস সাহেব বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসের অধীক্ষক হন, অর্থাৎ লুইস সাহেবই সরকারী ছাপাখানার প্রথম প্রেস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস চৌরঙ্গী থেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব হেতু প্রেসের একটি শাখা শিয়ালদহের ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের কার্যালয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর গোপাল নগর রোডের 'প্রাসাদোপম ঐতিহাসিক সুরম্য অট্টালিকায়' রাজ্য সরকারের ছাপাখানাটি স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন পরিবেশে 'সহস্র কর্মীর প্রেসের' নাম হল, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস।

সরকারী মুদ্রণালয়ের আধুনিকীকরণের কাজ মূলতঃ শুরু হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর গোড়ার দিকে এ. জে. নর্টন ছাপাখানার অধীক্ষক নিযুক্ত হন। নর্টন লিখেছেন, তখন ছাপাখানাটির দারুণ দুর্দিন চলছিল। পরিচালন ব্যবস্থায় ছিল পর্বতপ্রমাণ গলদ আর কর্মীরা ছিল বিদ্রোহী। ফলে কাজের মান অত্যন্ত নিচে নেমে গিয়েছিল। সুতরাং প্রেসের উন্নতিকল্পে নর্টনকে নানা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বি. জি. প্রেস নর্টনের আমলেই সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করেছিল। নর্টন বুঝেছিলেন, ছাপাখানার জগতে হরফঢালাই বিভাগের গুরুত্ব অনেকখানি। মুদ্রণকে যদি যুগোপযোগী করে তুলতে হয় এবং ঝকঝকে ছাপা যদি কাম্য হয় তবে টাইপকাস্টিং বিভাগের নবীকরণই প্রাথমিক কর্তব্য। হাতে ঢালাই হরফ দিয়ে মুদ্রণে দ্রুততা আসে না। নর্টনের সুপারিশক্রমে বি. জি. প্রেসে চালু হল স্বয়ংক্রিয় টাইপকাস্টিং যন্ত্র। যেহেতু সরকারের অধিকাংশ কাজই অধিক সংখ্যায় ছাপা হয় না সেহেতু হাতে অক্ষরযোজনার উপর গুরুত্ব আরোপিত হল সর্বাধিক।

নর্টনের এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞজনোচিত হয়েছিল একথা নিশ্চয়ই বলা চলে এবং সেই অসংশয় সিদ্ধান্তের সারবত্তা একালেও মিথ্যা হয়ে যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র 'প্রিন্টার্স ভয়েস' পত্রিকায় ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা যায়, সমগ্র দেশে ছাপার জন্য যতগুলি যন্ত্র আছে তাদের গড়পড়তা কাজের পরিমাণ দৈনিক দু পাতা মাত্র। অর্থাৎ, দ্রুত উৎপাদনক্ষম আধুনিক যন্ত্রের জন্য যে পরিমাণ কাজ চাই সে-পরিমাণ কাজ অদ্যাপি এদেশে দুর্লভ।

সে যাই হোক, হাতে অক্ষরযোজনার গুরুত্ব দিলেও দ্রুতগতি যান্ত্রিক অক্ষরযোজন যন্ত্রের প্রতিও নর্টনের আগ্রহ ছিল সমধিক। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'টাইম বাউন্ড জব' সে-সব ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির সাহায্য নিতে হবে বৈকি! বি. জি. প্রেসে লাইনো অক্ষরযোজন যন্ত্র এবং মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপন নর্টনের অন্যতম কীর্তি। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ছাপাখানায় লাইনো আসে আর জটিল টেবুলার কাজের প্রয়োজনে মনোটাইপ আসে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে।

বি. জি. প্রেসে যে কর্মযজ্ঞ চলছিল তার উদ্দেশ্য ছিল রাজকীয় প্রয়োজনে ইংরেজী ভাষায় দ্রুত সুন্দর মুদ্রণ। বাংলা হল তৎকালীন ভার্নাকুলার বা নেটিভদের ভাষা। বাংলাভাষার জন্য বিদেশী প্রভুদের সপ্রশ্রয় মনোভাব থাকার কথা নয়। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষায় তৎকালে যেটুকু মুদ্রণ হয়েছে তার মূলে ছিল প্রভুদের প্রয়োজনের তাগিদ। শুধু বাংলা মুদ্রণের কথাই বা কেন, গবেষণামূলক কাজে বাঙালীর কোন উদ্ভাবন সে যুগে স্বীকৃতি পায়নি। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, গত মহাযুদ্ধের সময় এদেশে রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হয়। রেশন কার্ডগুলি ছ মাস অন্তর নতুন করে ছেপে ইস্যু করা হত। বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নামে জনৈক সুপারভাইজার রেশনকার্ড বাতিল না করে প্রতি ছাব্বিশ সপ্তাহ অন্তর কার্ডের উপর নবীকরণপত্র (Revalidation Slip) আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেবার প্রস্তাব পেশ করেন। সেটা ছিল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বীরেনবাবু দেখালেন, এই পদ্ধতিতে পুরোনো কার্ড বাতিল না করেও মুদ্রণ ও কাগজের অকারণ সময় ও অর্থের অপচয় রোধ

করা যাবে। আর্নট নামে জনৈক ডেপুটি এই পরিকল্পনায় সুযোগ নিলেন। আর্নটেরও আগ্রহে অবশ্য স্লিপ-প্রথা চালু হয় এবং প্রতি বছর টন টন কাগজের অপচয় বন্ধ হয়। এই উদ্ভাবনের কৃতিত্বের জন্য বীরেনবাবু পুরস্কৃত হননি কিন্তু ডেপুটি আর্নটের পদোন্নতি ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, রেশনকার্ডে রিভ্যালিডেশান স্লিপের ব্যবহার বর্তমানেও চলছে।

মুদ্রণের উৎকর্ষ ও মূল্যবান গ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশনের জন্য ব্রিটিশ আমলে সরকারী ছাপাখানার খুবই সম্মান ছিল। এই প্রেসে বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র মুদ্রিত হয়েছে ইংরেজীতে। গবেষকদের কাজে অমূল্য দু-চারটি পুস্তকের উল্লেখ করছি:

শরৎচন্দ্র দাস প্রণীত 'টিবেটান-ইংলিশ ডিকশনারি' একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিধান। প্রথম মুদ্রণ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। বিশাল এই গ্রন্থখানির প্রতিটি পাতা আলোকচিত্রের সাহায্যে ব্লক করে পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অথচ পঁচাত্তর বছর আগে হাতে কম্পোজ করেই গ্রন্থখানির সুমুদ্রণ সম্ভব হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য আর একটি বই L. A. Waddel প্রণীত *Report On the Excavations at Pataliputra,* ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেসে তথ্যবহুল এই গ্রন্থের মুদ্রণ হয়। খননকার্যের উদ্যোক্তা ছিলেন লেখক নিজে এবং সে কাজের তদারকের দায়িত্ব ছিল বাঁকিপুর জেলা বোর্ডের সার্ভেয়ার আমেদ হোসেন খান সাহেবের উপর।

সবুজ রেক্সিনে মোড়া বোর্ড বাঁধাই ঝকঝকে মুদ্রণ, চমৎকার বই। সোনালী রঙে এমবস্ করা নকশা আর ছবিতে সাজানো মলাট। শিলালিপি ও ভাস্কর্যের আলোকচিত্র সমন্বিত অনেকগুলি আর্টপ্লেট সুনিপুণভাবে মুদ্রিত। মুদ্রণে এতটা উৎকর্ষ সেযুগেও যে এদেশে সম্ভব হয়েছিল এটি তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

Twenty years' statistics for the District of Hazaribagh তথ্যবহুল বিশাল গ্রন্থ; ছাপা হয়েছে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। বেঙ্গল গেজেটিয়ারগুলিও সেকালের সুমুদ্রণের সাক্ষ্য দেয়। যেমন, 'বাঁকুড়া' গ্রন্থটি। ঐ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ, ইতিহাস জনস্বাস্থ্য, কৃষিব্যবস্থা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শিক্ষা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন ও'ম্যালি। বইটি ছাপা হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ছাপা হয়েছে এমনি আরও কত বই যা এখন দুষ্প্রাপ্য যেমন, *Collection of Papers Relating to the Hooghly Imambarah.* ফুলস্ক্যাপ ফোলিও সাইজে মুদ্রিত সুবিশাল গ্রন্থ। দুষ্প্রাপ্য ছবি ও তথ্যসংবলিত ঐতিহাসিক দলিল। ছাপা হয়েছে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাছাড়া এম. আবিদআলি খানের গবেষণামূলক গ্রন্থ, *Memoirs of Gour and Pandua* ছাপা হয়েছে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের একটি সরকারী প্রতিবেদনে জানা যায়, ইংরেজ আমলে বি. জি. প্রেসে যা-কিছু ছাপা হয় তার প্রায় সবই হয় ইংরেজীতে। কলকাতা গেজেটে বাংলায় ছাপা হয়েছে রাজকীয় বিজ্ঞাপন বা নোটিস। অবশ্য আলতাফ হোসেন সম্পাদিত 'বাংলার কথা' সাময়িকপত্রটি ছাপা হত বাংলা ভাষায়। বাংলায় এছাড়া আর যা ছাপা হয়েছে তা সংখ্যায় নগণ্য। রাজকীয় অনুগ্রহ ছাড়া রাজকার্যের গরজে কখনও কখনও বাংলা মুদ্রণ সেকালে হয়েছিল। তবে সাধারণভাবে বাংলা মুদ্রণের প্রতি সরকারের ছিল অবজ্ঞা।

অতীতের দিকে তাকালে চিত্রটি একটু স্বচ্ছ হবে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় দেখা যায়, ইংরেজী ছাড়া ওড়িয়া, সংস্কৃত, কাইথি, উর্দু আর বাংলায় যৎসামান্য কাজ সেকালে এই প্রেসে হত। বাংলা টাইপ কেস সম্বন্ধে শ্লেষাত্মক ভাষায় ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কীভাবে চারটি অক্ষরডালায় কয়েক শত খোপে বাংলা টাইপ রাখা হয়েছে সেটা একটা কৌতুকপ্রদ ব্যাপার। কম্পোজিটরের পক্ষে মাটিতে বসে কাজ করাই সুবিধে। অগুন্তি অক্ষর নিয়ে বেচারাকে হিমশিম খেতে হয়। কিন্তু কম্পোজিটরের স্বাস্থ্যের প্রতি সরকার কড়া নজর রেখেছেন আর সেই জন্যেই তাদের বসার জন্যে রয়েছে টুলের ব্যবস্থা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অপর একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে, সরকারী মুদ্রণের প্রায় সব কাজই হয় ইংরেজীতে তবে বাংলায় কাজ করার প্রয়োজন মাঝে মাঝে অনুভূত হয় বৈ কি! গত ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচনের সময় মফস্বল অঞ্চলের ভোটার তালিকা বাংলায় ছাপতে হয়েছিল এবং সেজন্য বি. জি. প্রেসে ছয়টি বাংলা লাইনো অক্ষরযোজন যন্ত্র বসানো হয়েছিল। ইলেকশনের কাজে ভারতীয় ভাষায় লাইনোর ব্যবহার এই প্রথম বলে ঐ গ্রন্থে ফলাও করে দাবি করা হয়েছে।

স্বাধীনোত্তর যুগে, অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে, বাংলা মুদ্রণের উপর কিছুটা গুরুত্ব আরোপিত হয়। ফলে গত তিরিশ বছরের মধ্যে কিছু ভাল কাজও হয়েছে বাংলায়।

'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষার' প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিটি ইংরেজী শব্দের বাংলা ও হিন্দী প্রতিশব্দ এতে দেওয়া আছে। সর্বমোট পাঁচ খণ্ডে

সমাপ্ত। পরিভাষা কমিটির সদস্য ছিলেন রাজশেখর বসু, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশ্বজন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' ছাপা হয়েছে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই 'চিত্রে ভারতের ইতিহাস'। প্রথমপর্ব, আদি যুগ থেকে মুঘল রাজত্বের অবসানকাল পর্যন্ত। পাতাজোড়া ছবির এলবাম। ছবির সংখ্যা বাষট্টি। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নির্দেশানুযায়ী ছবিগুলি এঁকেছেন বিমল রায়। জনশিক্ষামূলক পুস্তকটির ভূমিকায় বলা হয়েছে—"হাজারটি শব্দ অপেক্ষাও একটি ছবির দাম অনেক বেশী।—এ কথার সত্যতা শিক্ষকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।. জনশিক্ষাকেন্দ্রে ইতিহাস পড়ানো হয়। কিন্তু ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। শিক্ষকমহাশয় গল্পচ্ছলে কাহিনীগুলি বলিয়া যান। গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি ছবি দেখাইবার ব্যবস্থাও করা হয় তবে গল্পের বিষয়টি তাহার পক্ষে বুঝা ও মনে রাখা সহজ।"

আর্ট পেপারের উপর লেটারপ্রেসে ছাপা অনবদ্য পুস্তকটি মুদ্রণসৌকর্যের জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত হয়।

স্কুলপাঠ্য 'কিশলয়' ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ছাপাখানাতেই মুদ্রিত হয়েছে।

'মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য' (বঙ্গানুবাদ) গ্রন্থখানি চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। "মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্য একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ"—বলেছেন অনুবাদক ভূতনাথ সপ্ততীর্থ মহাশয়। সুমুদ্রিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সদানন্দ ভাদুড়ী। ছাপা হয়েছে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।

শিশু ও সদ্যসাক্ষরদের জন্য প্রকাশিত জনশিক্ষামূলক স্বল্পমূল্যের পুস্তকাদিতে মুদ্রণ-সৌকর্যের রুচিশীল স্বাক্ষর বিদ্যমান। নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন ছাপা ও উন্নতমানের বিষয়বস্তুর গুণে বইগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এইগুলি ছাপা হয়েছে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:

যানবাহনের কাহিনী বলেছেন বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চলার পথে' পুস্তিকায়। শিশুদের জন্য ফ্যানটাসী লিখেছেন মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত (গল্প বলি), নাটক লিখেছেন অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ (আয় ঘুম আয়), ছড়া ও ছবির বই লিখেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছুটির দিনের কবিতা), দীপ্তি সেনগুপ্ত (গুঞ্জন), দেশের ইতিহাস লিখেছেন সতীকুমার নাগ (ভারত আমার), সৃষ্টির বিবর্তন ধারার কথা বলেছেন নীলিমা সেন (জয়যাত্রা), আর দেশের ও বিদেশের স্মরণীয় বিজ্ঞানীদের জীবনচরিত লিখেছেন হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত (যারা দেখালো নতুন আলো)। অর্থনীতির কথা সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী করে লিখেছেন শ্যামাপ্রসাদ আচার্য (তেল-নুন-কড়ি)। সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় হরেন ঘোষের 'হিমালয়ে ঘুমের দেশে' পুস্তকখানির কথা। মুদ্রণের বিচারে বইখানির একটি তাৎপর্য রয়েছে। শিশুপাঠ্য বই বড় বড় হরফে ছাপাই রীতি। বড় বড় টাইপের কাজ এতাবৎকাল হাতেই করতে হত। এ বইটি কিন্তু ১৮ পয়েন্ট লাডলো টাইপে ছাপা। বড় টাইপে যান্ত্রিক অক্ষরযোজনায় মুদ্রিত এটি প্রথম বই। শুধু বাংলা ভাষায় নয়, সকল ভারতীয় ভাষার মধ্যেও প্রথম। এই ধরনের কত বই ছাপা হয়েছে সরকারী মুদ্রণালয়ে। ঝকঝকে ছাপা ও রুচিশীল প্রচ্ছদ পুস্তকগুলিকে আরও সার্থক করে তুলেছে।

'বাংলার উৎসব' গ্রন্থে বারো মাসে তেরো পার্বণের উদ্ভব ও বিবর্তনের কথা, ইতিহাস ও গল্প, বলেছেন তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী। বইটি ছাপা হয় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। নৃতাত্ত্বিক মণি বর্ধনের 'বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য' ছাপা হয়েছে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। কিশোরপাঠ্য 'দেশবিদেশের উপকথা', 'নারদস্মৃতির বঙ্গানুবাদ' ইত্যাদি কত সুন্দর সুন্দর বই এখানে ছাপা হয়েছে। 'কথাবার্তা', 'স্বাস্থ্যশ্রী', জনশিক্ষা', 'বসুধরা' প্রভৃতি বাংলা সাময়িকপত্রে মুদ্রণসৌষ্ঠব বিদ্যমান। ছাপা হয়েছে সাঁওতালী পত্রিকা 'পাল মারাও' আর হিন্দী ও নেপালী পত্র-পত্রিকা।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ হরগোপাল বিশ্বাসের 'জাতি-গঠনে খাদ্য' ছাপা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা লিখিত ১৯টি প্রবন্ধের সংকলন 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' মুদ্রিত হয়েছে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলা মুদ্রণের কিছুটা উন্নতি ঘটলেও এই ত্রিশ বছরে ইংরেজীর প্রাধান্য কিছুমাত্র কমেনি। এমনকি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত দু-এক খানি ইংরেজী বইও ছাপা হয়েছে স্বাধীনতার পরে। যেমন, 'ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট ম্যানুয়েল' এবং 'প্ল্যাণ্টস অব দার্জিলিং অ্যাণ্ড সিকিম হিমালয়াজ' গ্রন্থ দুটি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি লিখেছেন ডঃ কালিপদ বিশ্বাস (১৯৬৬)। হিমালয় ও তরাই অঞ্চলের উদ্ভিদের জীবনধারা, কথায় আর ছবিতে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় মুদ্রণসৌষ্ঠবে অভিনব হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থখানির বেশ চাহিদা আছে।

দেশ স্বাধীন হবার পর রাজ্য সরকারের ছাপাখানায় বাংলা মুদ্রণের উন্নয়নকল্পে প্রভূত গবেষণা হয়েছে কিন্তু সেগুলি কার্যকর করতে সরকার তৎপরতা দেখাননি। ব্রিটিশ আমলের সেই ট্র্যাডিশনে ছেদ পড়েছে বলে এখনও দাবি করা চলে না। ফলে পরবর্তীকালে যে কাজগুলি হয়েছে সেগুলি হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তারকনাথ চক্রবর্তীর কথা। ইনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংলা হাউস স্টাইলে'র একটি ছোট্ট অভিধান প্রণয়ন করেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পান্ডু-লিপিটি প্রকাশনযোগ্য বিবেচিত হয় এবং সরকার এর মুদ্রণ ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। বইটির মুদ্রণকার্য যথারীতি শুরু হয়। লাইনোতে কম্পোজ হয়, গ্যালি কারেকশন হয়, মেক-আপ হয়—কিন্তু অজ্ঞাত কারণে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় অকস্মাৎ গ্রন্থটির মুদ্রণ-প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়।

যতদূর জানি, বাংলায় মুদ্রণের হাউস স্টাইল বা মুদ্রকের ঘরানা বলে কিছু নেই। ফলে একই প্রেসে ছাপা বিভিন্ন গ্রন্থে একই বানানের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়; বহু লেখকের একই সংকলনে একই শব্দের বানানে বিভিন্নতা আবার একই লেখকের গ্রন্থে একটি শব্দেরই বানান-বৈচিত্র্য' তারকবাবুর বইটি প্রকাশিত হলে এই সমস্যাগুলি সহজেই সমাধান করতে পারত।

অথচ বইটির উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন প্রচেষ্টাই তারকবাবু করেননি। ফলে সরকার কর্তৃক বর্জিত হবার পর এই প্রচেষ্টার অস্তিত্বটাই লোপ পেতে বসেছে।

মুদ্রণে সমতা, চারুতা ও দ্রুততার জন্য বিধিবদ্ধ হাউস স্টাইল যে কোন সভ্যদেশে উন্নতমানের মুদ্রণের ভিত্তি বলেই বিবেচিত হয়। বিজ্ঞান-সম্মত এই পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে শ্রমিকের যোগ্যতা, মুদ্রকের সাশ্রয়, পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য আর লেখকের স্বস্তি। 'মুদ্রণপারিপাট্যে টাচিংআপের গুরুত্ব ও প্রভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৯৭৩) ভূপেশ দাস বলেছেন, "বাংলা ভাষায় বানানের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটা অরাজক অবস্থা বিদ্যমান। এর কারণ হল একই শব্দের বানানে বিভিন্নতা —একই শব্দকে আমরা বিভিন্নভাবে বানান করি। যেমন—হ'ল, হোল, হোলো, হ'লো; সৌখিন, সৌখীন, শৌখিন, শৌখীন, ইত্যাদি।...বানানের বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে একই পান্ডুলিপিতে একই শব্দের একাধিক বানান দেখা যায়। মুদ্রককে তখন ভাবতে হয়—কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা রাখি।

"বাংলা বানানের আরেকটা দিক হচ্ছে দুটি শব্দ আলাদা আলাদা থাকবে, নাকি হাইফেন-যুক্ত হয়ে একই শব্দের রূপ নেবে কিংবা হাইফেন বাদেই সমাসবদ্ধ পদ হিসাবে একই শব্দে পরিণত হবে। যেমন, আদব কায়দা, আদব-কায়দা, আদবকায়দা; রাজ্য-সরকার, রাজ্যসরকার, রাজ্য সরকার; যে সমস্ত, যেসমস্ত, যে-সমস্ত; সব রকম ভাবে, সবরকম ভাবে, সবরকম-ভাবে।...হাউস স্টাইল চালু থাকলে এই বানানসমস্যা থাকে না। বানানের একটি রূপই তখন গ্রহণীয় ও গ্রাহ্য হয়।" (রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ)

ইংরেজীতে হাউস স্টাইল পদ্ধতির প্রবর্তন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। সেখানে বিকল্পের বিরোধ কমিয়ে আনা হয়েছে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের নির্দিষ্ট হাউস স্টাইল বিকল্পের সংখ্যা বিশেষরূপে হ্রাস করতে সফল হয়েছে এবং দেশ-বিদেশের লেখক ও অধ্যাপকরা তা মেনে নিয়েছেন। এই মেনে নেওয়ার মূলে আছে পাঠকের স্বার্থ রক্ষায় মুদ্রকের নিরলস প্রচেষ্টা, অথচ ইংরেজী বানানের পবিত্রতা এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাংলা বানানের বেলা বিকল্পের ব্যবহার লোপ করা যাবে না কেন? এই ধরনের যুক্তি ও তথ্য তারকবাবুর পুস্তিকার ভূমিকায় সন্নিবেশিত হলে তাঁর রচনার সারবত্তা সহজেই প্রমাণিত হত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সে পথে যাননি।

দ্বিতীয় উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লাডলো টাইপে বাংলা শিরোনামাক্ষর সংযোজনের ব্যবস্থার সময়। তদানীন্তন অধীক্ষক শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই কাজে সহযোগিতা করেন অজিত রায়, মনোতোষ মজুমদার প্রমুখ কর্মিবৃন্দ। অজিতবাবু ও মনোতোষবাবু লাডলোর জন্য বাংলা ম্যাট্রিক্স তৈরি করিয়েছিলেন একজন কর্মকারের সাহায্যে কিন্তু সেই ম্যাট্রিক্স কোন কাজে লাগেনি। ঐ ম্যাট্রিক্সে লাইন কাস্ট করে দেখা গেল হরফের উচ্চতা কম হয়েছে এবং বর্ণের মাত্রায় সমতা আদৌ রক্ষিত হয়নি। ম্যাট্রিক্স যিনি খোদাই করেছেন তিনি নেহাতই আন্দাজের উপর কাজ করেছেন। তাছাড়া হরফ তৈরির ফর্মুলা তাঁর জানা ছিল না। নিয়ম হল, মোল্ডের উচ্চতা এবং ম্যাট্রিক্সের গভীরতার যোগফল হবে হরফের উচ্চতা বা ০·৯১৮ ইঞ্চির সমান। তা যখন হল না তখন বোঝা গেল লাডলো টাইপের জন্য বাংলা ম্যাট্রিক্স তৈরি আপাততঃ এদেশে সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত শরণ নিতে হল লাইনোটাইপ কোম্পানীর আর লাইনোর ব্যবহৃত হরফ-চিত্র সহযোগে অক্লেশে বাংলা লাডলো শিরোনামাক্ষর ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এল। লাইনোর বাংলা

কেস লাডলোয় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে কারণ বাংলা পুস্তকাদি বা পত্র-পত্রিকার লাইনো-টাইপেরই প্রাধান্য। বিষয়বস্তুর চরিত্রের অনুসারী শিরোনামাক্ষরের চরিত্র নির্ধারণকে যদি নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তবে কাজটি অত্যন্ত সুচারু হয়েছে, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকে না। অবশ্য সরকারী মঞ্জুরী আদায় করতে সেদিন অত্যান্ত অসুবিধে হয়েছিল।

বাংলা লাডলো চালু হল ১৯৫৭ খৃীষ্টাব্দে। এরপর অনেক ছাপাখানায় বাংলা লাডলো এসেছে, সেগুলিতে শুধু রোমান অক্ষর। কিন্তু রাজ্য সরকারের ছাপাখানার লাডলোয় বাংলা ইটালিক হরফের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রেস ছাড়া অন্য কোথাও বাংলা ইটালিকে লাডলো অক্ষরযোজনা করছেন কিনা এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। এই ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারী মুদ্রণালয় প্রথম।

লাডলো টাইপে বাংলা হরফের ব্যবহার, প্রচলিত বাংলা অক্ষরডালার অবৈজ্ঞানিকতা নিরূপণ এবং ইনটারটাইপ অক্ষরযোজন-যন্ত্রের চাবিপাটাতনের সংস্কার এমনি সব কাজ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় করেছেন। শেষোক্ত দুটি গবেষণা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। হাতে কম্পোজের বাংলা টাইপ কেস 'বিদ্যাসাগরী সাট' প্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর বক্তব্য, বাংলা লোয়ার কেসের সবটাই ইংরেজীর অবিকল নকল অর্থাৎ ইংরেজীর ছকে ফেলে বাংলা হরফগুলির অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে। বাংলাভাষার প্রথম মুদ্রক ইংরেজদের কাছে এই স্থান নির্ণয় কোন সমস্যা বলেই মনে হয়নি। ফলে বাংলা বর্ণমালার পৌনঃপুনিকতা, প্রাচুর্য ও পারম্পর্যের বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি নির্মমভাবে অগ্রাহ্য করা হল। এ ভাবে কেসে হরফ সাজানোর ফলে ক্ষতি কি হয়েছে তা হয়ত উপলব্ধি করা যাবে না। এই বিন্যাস আমাদের ভাষার বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কতকগুলি ধ্বনি রয়েছে। যার ফলে এক ভাষার কয়েকটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ভাষার কয়েকটি ধ্বনির আপাত মিল থাকলেও তাদের পারস্পরিক ধ্বনি-প্রকৃতির মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইংরেজী যুগ্ম-অক্ষরডালা তৈরি হয় ১৬৮৩ খৃীষ্টাব্দে। ইংরেজী ভাষার হরফগুলির জন্য নির্দিষ্ট বিন্যাসই বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজটি অবিবেচনার পরিচায়ক, কারণ বর্ণের ধ্বনির আপাত মিল খুঁজে ইংরেজীর নকলে বাংলা কেস সাজানো সর্বাংশে ভুল। যে সব ইংরেজ বিলাতের ছাপাখানায় কাজ শিখেছেন তাঁরা সকল ভাষার ক্ষেত্রেই নিজেদের সুবিধা মত টাইপ কেস সাজিয়েছেন। সাউথওয়ার্ডের 'মডার্ন প্রিন্টিং' গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণে বলা হয়েছে, জার্মান ভাষার জন্য হাতে কম্পোজের আলাদা অক্ষরডালার বিন্যাস একটি মাত্র কেসে করা হয় কিন্তু ইংরেজ মুদ্রকের পক্ষে জার্মান হরফগুলি ইংরেজী বিন্যাসের নকলে যুগ্ম-অক্ষরডালায় সাজানোই সুবিধা।

তাহলে বোঝা গেল, ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে অপরাপর ভাষার টাইপ কেস নিজেদের মত করেই সাজিয়ে নেন। জার্মান ভাষার ক্ষেত্রে যেমন হিব্রু, গ্রীক, বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া তাবৎ ভাষার জন্য একই ব্যবস্থা, একই কায়দা। এই ভ্রান্ত প্রথার অবসান নিশ্চয়ই কাম্য। কেননা ইংরেজদের পক্ষে এটা মুদ্রণ-মুদ্রণ খেলা হলেও আমাদের পক্ষে সেটা মারাত্মক।

এবার বাংলা ইনটারটাইপ প্রসঙ্গে আসা যাক। এই অক্ষরযোজন-যন্ত্রের চাবিপাটাতনের সংস্কার করা হয় ১৯৬৭-৬৮ খৃীষ্টাব্দে। এর আগে ১৯৩৫ খৃীষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও রাজশেখর বসু, যতীন্দ্রকুমার সেন ও সুশীলকুমার ভট্টাচার্য—এই হরফচিত্রশিল্পীদ্বয়ের সহায়তায় লাইনো অক্ষরযোজনযন্ত্রে বাংলা চাবিপাটাতন প্রবর্তিত হয়। আদিকালে অযৌক্তিকভাবে বাংলায় যেসব যুক্তবর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল সুরেশচন্দ্র প্রমুখের অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলা বর্ণের রূপ পরিশীলিত ও বাস্তবানুগ হতে পেরেছে। এই সংস্কার করতে গিয়ে তাঁদের মনে সংশয় ছিল, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রতিবাদে ঝড় যে উঠতে পারে সে আশংকাও তাঁরা করেছিলেন। এই জন্যেই বোধ হয় হরফমালার চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে তাঁরা যথাযথ কঠোর হতে পারেননি। প্রচলিত ৫০৭টি বাংলা ক্যারেকটারকে তাঁরা ২৯২টি হরফে সীমায়িত করেছিলেন মাত্র। অর্থাৎ, পাঠক গ্রহণ করবে কিনা এই সংশয়ে অনেকগুলি বিকল্প ক্যারেকটারকে জিইয়ে রাখতে হয়েছিল। বিকল্প হরফ-চরিত্রের অনাবশ্যক প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁদের প্রবর্তিত কী-বোর্ডে উপকরণ লেগেছে বেশী এবং তার ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হতে পারছে না। সে যাই হোক, বাংলা লাইনো যা করেছে তাতে বাংলা মুদ্রণ অন্ততঃ একশ বছর এগিয়ে গিয়েছে একথা স্বীকার করতেই হয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে পরবর্তীকালের মুদ্রক, লেখক ও পাঠকের মন বহুল পরিমাণে সংস্কারমুক্ত হয়েছে এবং উৎপাদনের গতিবেগ আশানুরূপ না হলেও লাইনো বাংলা হরফ বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পূরণ করেছে একথা নিশ্চিধায় বলা যায়। লাইনো বাংলা আর ইনটারটাইপ বাংলার তুলনামূলক বিচার করলে ব্যাপারটি সহজেই বোঝা যাবে:

১ লাইনোয় হরফ ২৯২ আর ইনটারটাইপে ১৮০টি মাত্র। ২ লাইনোতে সামনের বোর্ডে ৯০টি, পাশের বোর্ডে ২৯টি চাবি ছাড়া হাতেও বেশ কিছু ম্যাট্রিক্স লাগাতে হয়, অপরপক্ষে ইনটারটাইপে

চাবির সংখ্যা ৯০টি মাত্র এবং সেগুলি সামনের বোর্ডেই সন্নিবদ্ধ। ৩ লাইনোয় ঘণ্টায় গড়পড়তা ৫০০ শব্দ কম্পোজ করা যায় কিন্তু ইনটারটাইপে ঘণ্টা প্রতি শব্দযোজনার গড় ৭০০-র কাছাকাছি। ৪ লাইনোতে অন্তত দুটি ম্যাট্রিক্স ম্যাগাজিন দরকার কিন্তু ইনটারটাইপে ম্যাগাজিন মাত্র একটি। ৫ লাইনোতে কী-বোর্ড স্পীডে শিরোনাম সংযোজন সম্ভব নয় কিন্তু ইনটারটাইপে তা সম্ভব হতে পারে।

এত সব উৎকর্ষ সত্ত্বেও ইনটারটাইপ বাঙালীর চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়েছে। মনে হয়, ইনটারটাইপে শুধু বাংলা বর্ণমালার বিশালত্ব কমানোর ব্যাপারটাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং প্রাধান্য পেয়েছে গতিবেগ বৃদ্ধির চিন্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হরফের গঠনসৌকর্যের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়নি।

গল্প শুনেছি, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর নাম সই করতেন, চারু বন্দ্যোঃ। জনৈক ভাষাবিদ্ এই 'বন্দ্যোঃ'-করণের হেতু জানতে চাইলে চারুবাবু বলতেন, পদবীর বিশালত্বের জন্যই এই ব্যবস্থা। উক্ত ভাষাবিদ্ তদুত্তরে বলেছিলেন, ৪-এর সঙ্গে উ-কার স্বরচিহ্নটি জুড়ে দিয়ে '৪ু বন্দ্যোঃ' লিখলে বিশালত্ব আরও আয়ত্তে আসবে। ইনটারটাইপের হরফ কমানোর ব্যাপারে এই গল্পটি মনে পড়ে যায়। বর্ণমালার আয়তন হ্রাস নিশ্চয়ই জরুরী কিন্তু তা হরফের বৈকল্যের বিনিময়ে হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লাইনোয় যেখানে উক্তি, বক্তব্য, অনুচ্চ, ইচ্ছা, যাচ্ছে, ঠাট্টা, ছোট্ট, নিশ্চিত, পশ্চিম প্রভৃতি শব্দ যথাযথ মুদ্রিত হচ্ছে ইনটারটাইপ সেখানে ব্যর্থ। ঐ শব্দগুলির ইনটারটাইপীয় চেহারা যথার্থই বিসদৃশ। যথা—উক্‌তি, বক্‌তব্য, অনুচ্‌চ, ইচ্‌ছা, যাচ্‌ছে, ঠাট্‌টা, ছোট্‌ট, নিশ্‌চিত, পশ্‌চিম প্রভৃতি। হস্‌চিহ্ন ব্যবহার (যদিও পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সুমুদ্রণের পক্ষে অসমীচীন) না করলে ব্যাপারটি আরও হাস্যকর দাঁড়াবে। তবে ইনটারটাইপের গতির দিকটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। হরফের রূপ কিছু সংশোধন করে একে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের তদানীন্তন অধীক্ষক ইনটারটাইপের হরফমালা পরিকল্পনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগারের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্মারকগ্রন্থে অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুদ্রণবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের অনেকগুলিই লিখেছিলেন সরকারী মুদ্রণালয়ের কর্মীরা। এই সব প্রবন্ধে তাঁরা মুদ্রণশিল্পের উন্নতির জন্য অনেক সুচিন্তিত প্রস্তাব দিয়েছেন।

উপসংহারে বলা যায়, সরকারী কাজের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহীত হলে সরকারী ছাপাখানায় বাংলা মুদ্রণের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ত্রিশ বছর চেষ্টা করেও বাংলায় 'ক্যালকাটা গেজেট' মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে মূল ছাপাখানাটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি খোলা হয়েছে অফসেট বিভাগ। স্বাধীনোত্তর যুগে কোচবিহার স্টেট প্রেস বি. জি. প্রেসের অঙ্গীভূত হয়েছে। ডালহৌসীর শাখা প্রেসে কাজ চলছে, পূর্ব-কলকাতার কাদাপাড়ায় আর দার্জিলিং শহরে নতুন শাখা প্রেস স্থাপিত হয়েছে। টালিগঞ্জ গ্রাহাম রোডে কৃষিবিভাগের ছাপাখানাও আছে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল প্রেস (১৮৫৭) বেঙ্গল ফরম ছেপে চলেছে। পুলিস বিভাগেরও আলাদা প্রেস রয়েছে। এতসব কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরে। মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যই বাংলা মুদ্রণের প্রসার ও উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

পাঠপঞ্জী

A Brief Description of the Bengal Govt. Press, 1928
An Historical Sketch of the Govt. of India Printing Office, 1889
A Peep into the Bengal Govt. Press, 1936
Dasgupta, A. C. *The Story of the Calcutta Gazette*, 1957
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয় গ্রন্থাগার। রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৩
মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, ঢাকা ১৩৭১
শ্রীপান্থ। যখন ছাপাখানা এলো, কলিকাতা ১৩৮৪
সজনীকান্ত দাস। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা নতুন সংস্করণ ১৩৮২

তলোয়ার বনাম কলমঃ প্রথম শতবর্ষে

শ্রীপান্থ

"Before he will bow, cringe or fawn to any of his oppressors...he would compose ballads and sell them through the streets of Calcutta" কথাগুলো ভারতের প্রথম সাংবাদিক জেমস অগাস্টাস হিকির। সম্ভবতঃ কলকাতার প্রথম মুদ্রাকরও তিনি। হলহেডের 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' নিশ্চয়ই ভারতের এই এলাকায় যথার্থই প্রথম মুদ্রিত বই। ছাপা বইয়ের পাতায় সেই প্রথম বাংলালিপির মুখদর্শন। বাঙালীর কাছে এ-বইয়ের গুরুত্ব অবশ্যই ঐতিহাসিক। কিন্তু আধুনিক গবেষকরা বলছেন সহজে অদল-বদল করা যায় ধাতু দিয়ে গড়া এমন বাংলা হরফের প্রবর্তন যুগান্তরের বার্তাবহ হলেও হলহেডের ব্যাকরণ বাংলায় মুদ্রণের প্রথম নমুনা নাও হতে পারে। সম্প্রতি লণ্ডনে খুঁজে পাওয়া গেছে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এমন একটি পঞ্জিকা মুদ্রণ-স্থান হিসাবে যার পাতায় উল্লেখিত কলকাতার নাম। সদ্য আবিষ্কৃত এই স্মারকটির শিরোনাম— *Calendar For the Year of our Lord MDCCLXXVIII.* ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার যখন তখন কি সেটি নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই ছাপা হয়নি? আর সেক্ষেত্রে তার মুদ্রাকর নিশ্চয় চার্লস উইলকিনস নন, জেমস অগাস্টাস হিকি। কেন না, হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হওয়ার আগে কলকাতায় কোনও কিছু ছাপাবার সামর্থ্য ছিল একমাত্র তাঁরই। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এ দেশের প্রথম সংবাদপত্র হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট অর দি অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার প্রকাশের আগে, ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে দিয়ে কাউন্সিলের কার্যবিবরণী এবং সেনাবাহিনীর জন্য কিছু নিয়মাবলী ছাপিয়েছিলেন। উইলিয়াম হিকি নামে সমসাময়িক একজন লিখেছেন—জেমস অগাস্টাস নাকি নিজের ছাপাখানার জন্য কিছু হরফও তৈরি করেছিলেন কলকাতায়। সে-সব সরকারী কাজ হাতে পাওয়ার আগেকার ব্যাপার। কোম্পানীর কাজ বাবদে তাঁর প্রাপ্য দাঁড়িয়েছিল ৩৫০১২ সিক্কা টাকা। আর চূড়ান্ত হয়রানির শেষে দীর্ঘ ষোল বছর পরে তিনি পেয়েছিলেন মাত্র ৬৭১১ সিক্কা টাকা। অথচ ওই সময়ে আদি প্রাপ্যের সুদই হওয়ার কথা ৮৪২২ টাকা ১ আনা ৮ পাই!

কলকাতার প্রথম মুদ্রাকর এবং ভারতের প্রথম সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য পাননি। কারণ, সরকার বাহাদুরের চোখে তিনি ছিলেন অবাঞ্ছিত মানুষ,—শত্রু পক্ষ। অনেক মূল্য গুণে দিতে হয়েছে তাঁকে তাঁর ওই ছাপাখানাটির জন্য। হিকি স্বদেশে পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না। মুদ্রাকর হিসাবেও তাঁর যে খুব অভিজ্ঞতা ছিল এমন নয়। তবু কলকাতায় কাগজ বের করেছিলেন তিনি তাঁর 'মন এবং আত্মার স্বাধীনতার' জন্য। তাঁর কাগজ ছিল—'রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক।' প্রতিশ্রুতি ছিল—'সমস্ত দলের জন্য খোলা এর পাতা, কিন্তু প্রভাবিত নয় কারও দ্বারা।' প্রথম থেকেই 'বেঙ্গল গেজেট' সরকারী কর্তাব্যক্তিদের সমালোচনায় মুখর। হিকির দুঃসাহসী কলমের সামনে উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ নেই। হেস্টিংস, ইম্পে—কেউ নন সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এমন কি, যাজক কিয়েরনেন্ডারকে পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। ফলে অচিরেই শুরু হল সরকারের তরফে প্রত্যাঘাত। ডাকঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল 'বেঙ্গল গেজেট'-এর সামনে। আদালতে রুজু হল একের পর এক মানহানির মামলা। শেরিফ আর তাঁর সোটাবরদারের দল সশস্ত্র হামলা চালালেন তাঁর ছাপাখানার ওপর। হিকি নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে। বেপরোয়ার মতো সেখানে বসেই তিনি ছাপিয়ে চললেন তাঁর কাগজ। কিন্তু বেশী দিন তা সম্ভব হল না। হিকি ঘোষণা করেছিলেন—পাঠক, আমার হারাবার জিনিস আছে মাত্র তিনটি। প্রথম—আমার কাগজ, আমার সম্মান; দ্বিতীয়—আমার স্বাধীনতা, এবং তৃতীয়—আমার জীবন। শেষের দুটিকে আমি হেলায় বিসর্জন দিতে পারি প্রথমটির জন্য। শেষ দুটিকে সত্যই বিসর্জন দিয়েছিলেন হিকি। জেল, জরিমানা এবং নানা যন্ত্রণায় জর্জরিত তাঁর জীবন। তবু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চেই বন্ধ হয়ে যায় হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ফাইলটিতে নাকি একটি চিরকুটে লেখা রয়েছে—'সরকারী নির্দেশে হরফ বাজেয়াপ্ত হয় এই তারিখে।' আর সেই ছাপাখানার শেষ সংবাদ পাই আমরা আরও কিছুদিন পরে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাঙালীটোলায় চিকিৎসক হিকির মৃত্যুর পর। দেনার দায়ে সেদিন নিলামে তোলা হয়েছিল (মে, ১৮০৩) তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। অস্থাবর সম্পত্তির তালিকায় ছিল ৫৪০ পাউন্ড টাইপ, আর একটি ভাঙ্গা ছাপাখানা!

কলকাতার প্রথম মুদ্রাকর এবং ভারতবর্ষের প্রথম সম্পাদকের এই পরিণতি তাৎপর্যপূর্ণ। রাজশক্তি সবই করেছিলেন সুরুচির দোহাই দিয়ে। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না এ-লড়াই ছিল মূলতঃ তলোয়ার বনাম কলমের লড়াই। ছাপাখানার আবির্ভাবের আগে এবং পরে কলম এক নয়। শব্দ তখন সর্বার্থেই ব্রহ্মের আসনে, মুহূর্তে তা সর্বগোচর, চরাচর জুড়ে তার ব্যাপ্তি। ছাপাখানাকে ইংরেজীতে বলে 'প্রেস'। ইংরেজীতেই 'প্রেস' অর্থ আবার খবরের কাগজ। ছাপাখানার কাছে লুকোচুরি চলে না, ছাপা মানেই রটিয়ে দেওয়া, ঢাক পিটিয়ে খবর করা। 'প্রেস' আর খবরের কাগজ তা-ই বুঝি-বা সমার্থক। বাংলায়, বলা হয় 'ছাপা' এসেছে 'চাপা' থেকে। 'চাপ' দিয়ে ছাপ তোলা থেকেই ছাপা। ছাপাখানায় এভাবে ছাপা মানে লুকো-ছাপা নয়, চতুর্দিক ছাপিয়ে কূল-কিনারা ভাসিয়ে আলোর বন্যা বইয়ে দেওয়া। স্বভাবতঃই ওঁরা চেয়েছিলেন সেই বানকে ঠেকাতে। যে ওয়ারেন হেস্টিংস ছাপাখানার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন এই মুলুকে, কলসির ঢাকনা খুলে দিয়ে তিনিই বিমূঢ়, দুর্ভাবনার কালো ধোঁয়া আচ্ছন্ন করতে চাইছে তাঁকেই! গলগল করে বেরিয়ে আসছে স্বাধীন মতামত। শব্দ নয় তো, যেন কামান গর্জন। সুতরাং, বন্ধ করার চেষ্টা। সে-লড়াই চলেছে সর্বদেশে। সম্ভবতঃ সর্বকালে। একদল চান ছাপতে, অন্যদল চাপতে। কলকাতাই বা ব্যতিক্রম হবে কেন? হিকি জানিয়ে গেলেন নিয়তি কোন্ দিকে।

অচিরেই জানা গেল প্রথম যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয়। সামনেই আবার রণক্ষেত্র। বলা হয় হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হতে না-হতে উইলকিনসের প্রস্তাব-মতো কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম সরকারী ছাপাখানা। এবং উইলকিনসেরই পরিচালনাধীনে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতেই দেখি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের জর্জ হজসন (Geo. Hodgson) নানা সরকারী দপ্তরকে জানিয়ে দিচ্ছেন কোন্ ভাষায় কী ছাপতে খরচ পড়বে কত। অথচ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই দেখা গেল লর্ড ওয়েলেসলি সরকারের একটি নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা দেখিয়ে এক বিশদ পরিকল্পনা রচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য: এদেশে ছাপাখানার সংখ্যা বাড়ছে। সেটা বিপজ্জনক। রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে সরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা খুবই যৌক্তিকতাপূর্ণ। সরকারের খরচ বাঁচবে, অন্য ছাপাখানার পরিচালকরাও কিছুটা সংযত হতে বাধ্য হবে। তিনি তাঁর বিবরণে ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যেসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে তারও উল্লেখ করেছেন। হতে পারে, 'প্রেস' বলতে ওয়েলেসলি শুধু সরকারী ছাপাখানা নয়, একটি সরকারী কাগজ চালু করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কলকাতার খবরের কাগজের প্রথম আত্মপ্রকাশের দিন থেকে সেটাও ছিল সরকারের আর এক রণকৌশল, এক কাগজের বিরুদ্ধে আর এক কাগজকে লেলিয়ে দেওয়া। এক কাগজকে মোকাবিলা করতে অন্য কাগজের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করা। সে-জায়গায়

নিজস্ব কাগজ হলে তো আরও ভাল। ওয়েলেসলির অতএব তা-ও চাই। হিকির গেজেট প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে লবণের গোলাদার পিটার রীড আর থিয়েটারওয়ালা বি, মেসিঙ্কের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার দ্বিতীয় কাগজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট।' তার পৃষ্ঠপোষক সরকার বাহাদুর স্বয়ং। চার বছর পরে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় সরকারী কাগজ 'ক্যালকাটা গেজেট।' তার পর দেখতে দেখতে আরও। কথায় বলে আইডিয়ার পাখা আছে। কলকাতার কাগজের নেশা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল অন্য এলাকায়ও। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তিনখানা কাগজ: 'বেঙ্গল জার্নাল', 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন' এবং 'মাদ্রাজ ক্যুরিয়ার'। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আসরে আবির্ভূত হল 'ক্যালকাটা ক্রনিকল'। ওদিকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রকাশিত হল 'বোম্বে ক্যুরিয়ার', ১৭৯১-এ 'বোম্বে গেজেট'। হিকির গেজেটের ক'বছরের মধ্যে দেশে অনেক কাগজ! এগুলোর মধ্যে কয়েকখানা আবার সরকারের বশংবদ। তবু ওয়েলেসলি নিছক 'গেজেট' নয়, সরকারী পরিচালনায় পুরোপুরি খবরের কাগজ চান, কারণ নয়তো অন্যদের সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। শতক শেষ হওয়ার মুখে তিনি সভয়ে দেখলেন প্রশাসনকে ঘিরে চতুর্দিকে প্রহরীর মতো মোতায়েন খবরের কাগজ।

এক সরকারী গেজেটের সাধ্য কী এতগুলি কলমের মোকাবিলা করে। সুতরাং, ওয়েলেসলি কলকাতায় এসে নামবার অনেক আগেই মোটামুটি ভাবে স্থির হয়ে যায় সরকারী রণনীতি। ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত হন 'বেঙ্গল জার্নাল'-এর সম্পাদক উইলিয়াম দুনে (William Dune)। তাঁর অপরাধ তিনি খবরের নামে লর্ড কর্নওয়ালিস সম্পর্কে গুজব ছাপিয়েছিলেন। তখন মারাঠা যুদ্ধ চলছে। কর্নওয়ালিস গেছেন যুদ্ধ পরিচালনা করতে। 'বেঙ্গল জার্নাল' এক ফরাসী সূত্রের উল্লেখ করে লিখল, তিনি মারা গেছেন। কর্নওয়ালিসের হুকুমে সম্পাদককে পাকড়াও করে জাহাজে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ফরাসীদের অনুরোধে সেবারকার মতো রেহাই দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু তিন বছর পরে আবার বিপত্তি। আদালতের লোকেরা লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে তাঁর বাড়ি। তারপর সম্পাদকের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে হাজির করে তাঁকে কাঠগড়ায়। অপরাধ দুনে নাকি দেনা করে তা শোধ করেননি। দুনে কাগজে লিখলেন, এসব বাজে কথা। আসলে ওই আদালতের চালচলনের সমালোচনা করেছিলেন তিনি, তাই এই নিগ্রহ। তিনি কাগজে লড়াই চালিয়ে গেলেন। কর্নওয়ালিসের জায়গায় ইতিমধ্যে গদিয়ান হয়েছেন সার জন শোর। দুনে স্থির করলেন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সব খোলাখুলি বলবেন। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার আগেই তাঁর অফিসের লোকেরা আটক করল তাঁকে। বন্দী-সম্পাদককে প্রথমে রাখা হল কেল্লায়। তারপর তুলে দেওয়া হল জাহাজে। সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারকরা মাথা চুলকে রায় দিলেন—দণ্ড আইন-সম্মত। সরকারের অধিকার আছে অবাধ্য সম্পাদককে জোর করে জাহাজে তুলে দেওয়ার। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তখন নিজেদের ছায়া দেখে নিজেরাই আঁতকে উঠছেন। খবরের কাগজে অপছন্দের কিছু বের হলে আর রক্ষা নেই। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'টেলিগ্রাফ'-এ ছদ্মনামে চিঠি লেখার অপরাধে চাকরি খোয়াতে হয় একজন সরকারী কর্মচারীকে। গাজিপুরের এক ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে কাগজে লেখালেখির অপরাধে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশ থেকে বিতাড়িত হন চার্লস ম্যাকলিনস নামে আর একজন। সে-বছরেই তোপ-ধ্বনির মধ্যে কলকাতায় নামলেন ওয়েলেসলি।

পরের বছরই বিখ্যাত সংবাদপত্র শাসন 'আয়িন'। এতদিন পর্যন্ত সংবাদপত্র শাসনে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ছিল সম্পাদকদের দেশান্তরী করা। তবে অন্য কৌশলও ছিল। কথায় কথায় ধমক, রক্ত চক্ষু প্রদর্শন। তা ছাড়া নানাভাবে চাপসৃষ্টি করা হত। অপছন্দের কাগজকে সরকারী নোটিশ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি সরবরাহ করা হত না। ভ্রূকুটির সাহায্যে গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের নিরস্ত করা হত। ডাকে কাগজ পাঠাবার বিশেষ সুযোগ সুবিধা কেড়ে নেওয়া হত। কখনও বা কাগজের সম্পাদকের নামে পাঠানো চিঠিপত্র ডাকঘরে আটক করা হত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে এক ধরনের সেনসারশিপ চালু হয়, ফতোয়া জারি করা হয় কাগজ ছাপবার আগে মিলিটারি সেক্রে-টারিকে সব দেখিয়ে নিতে হবে। তবে অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় সরকারের হাতে মোক্ষম অস্ত্র ছিল 'লাইবেল' বা মানহানির অভিযোগে সম্পাদককে টেনে এনে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তারপর দরকার হয়, জাহাজে তুলে দাও। সম্পাদকরাও স্বভাবতই তখন বেপরোয়া। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হামফ্রে নামে এক সম্পাদক পালিয়ে যান জাহাজ থেকে।

ওয়েলেসলি তাঁর আইন জারি করেন শতাব্দীর শেষ প্রহরে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। এই আইনের পিছনে সামনে সমূহ উপলক্ষ ছিল 'এসিয়াটিক মিরারের' সম্পাদক ব্রুস সাহেবের একটি প্রবন্ধ। তিনি এদেশে ইংরেজ ফৌজ আর 'নেটিভ' জনশক্তির একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন। ওয়েলেসলি তখন মহীশূরের ব্যাঘ্র টিপুর সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নেমেছেন।

ওদিকে নেপোলিয়ানের ছায়া বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। তিনি ক্ষেপে গেলেন। কমান্ডার-ইন-চীফকে গভর্নর জেনারেল এক চিঠিতে জানালেন: ভাবনা নেই। আমি এদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করছি। যতক্ষণ না তা করা হচ্ছে ততক্ষণ বলপ্রয়োগ করেই এইসব কাগজকে দমন কর, সম্পাদকদের ধরে দেশে চালান দাও!

দেশময় কড়াকড়ি আইন চালু হল। ওয়েলেসলির জীবনীকার পিয়ার্স সাহেবের মতে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের স্টার চেম্বারের কঠিন কঠোর বিধানের মতই ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার কানুন। কোম্পানীর ডাইরেক্টাররা এই আইন অনুমোদন করলেন বটে, কিন্তু সে-সম্মতির কথা বোর্ড অব কনট্রোলের সামনে পেশ করতে সাহসী হলেন না। কেননা, ব্রিটেনে তখন সম্পাদকরা কার্যতঃ স্বাধীন। টেমস আর গঙ্গাতীরে সম্পাদকদের বিধিলিপির হেরফের দৃষ্টিকটু বটে! ওয়েলেসলি নিজেও নাকি পরবর্তী কালে ভুলতে চেয়েছিলেন এই আইনের কথা। তাঁর সরকারী চিঠিপত্র প্রকাশের সময় সম্পাদককে নাকি অনুরোধ করেছিলেন তিনি খবরের কাগজ সংক্রান্ত তাঁর 'মিনিট' বা 'নোটগুলো' বাদ দিয়ে দিতে।

ওয়েলেসলির আইনে সম্পাদকদের জন্য ছিল পাঁচ দফা নির্দেশ, সেনসারের জন্য আট দফা। সম্পাদকদের জানিয়ে দেওয়া হল: ১ এবার থেকে কাগজে মুদ্রাকর এবং প্রকাশকদের নাম দিতে হবে। ২ প্রত্যেক সম্পাদক এবং কাগজের মালিককে নাম ঠিকানা ছাড়াও তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সরকারকে সরবরাহ করতে হবে। ৩ রবিবার 'প্রভুর দিন' সেদিন ধর্মকর্ম বন্ধ রেখে কাগজ ছাপা চলবে না। ৪ কোনও কাগজই ছাপা চলবে না যদি না আগে থেকে সেনসারকে দিয়ে সব অনুমোদন করিয়ে নেওয়া না হয়। ৫ যদি কেউ এসব আদেশ-নির্দেশ পালনে শৈথিল্য দেখান তবে অবধারিত শাস্তি—দেশান্তর। সেনসার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হল কোনও কাগজে যেন এসব খবর ছাপা না হয়: ১ সরকারী ধন-ভাণ্ডার সম্পর্কিত কোনও খবর। ২ সৈন্য-বাহিনী বা তাদের রসদ বিষয়ক কোনও সংবাদ। ৩ কোন্ জাহাজ কোথায় আছে, কবে কোথায় থাকবে, কোন্ দিকে যাত্রা করবে সে-সব তথ্য। ৪ সামরিক বা অসামরিক কোনও বিভাগের কোনও কর্মীর কোনও কাজের বা আচরণের সমালোচনা। ৫ ব্যক্তিগত কেচ্ছা কেলেংকারি। ৬ কোম্পানী এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বা শান্তির সম্ভাবনা নিয়ে কোনও আলোচনা। ৭ এমন কোনও সংবাদ যা শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে পারে কিংবা কোম্পানীর অধীন প্রজাবর্গের মনে অসন্তোষ জাগাতে বা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। ৮ ইউরোপের সংবাদপত্র থেকে এমন কোনও উদ্ধৃতি, যা শাসন কর্তৃপক্ষের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। খবরের কাগজে এসব থাকা চলবে না। আর তা বাদ দিয়ে যদি কাগজ হয় তবে ওয়েলেসলির তাতে আপত্তি নেই! এ-সময়েই শ্রীরামপুরে মিশনারিদের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। স্বভাবতঃই কলকাতায় মিশনারিদের ছাপাখানা বসাবার অনুমতি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জে. সি. মার্শম্যান লিখেছেন, কলকাতায় সংবাদপত্রের অনেক কলম তখন তারকা-খচিত হয়ে বের হত। সেনসার যেখানে তার নির্মম কলম চালাত সেই শূন্যস্থানগুলো আর পূরণ করা সম্ভব হত না।

শতকের যা অভিজ্ঞতা ছাপাখানার আবির্ভাবের পর প্রথম শতবর্ষের অভিজ্ঞতাও মোটামুটি তাই। রাজশক্তি সতত কঠোর, কখনও বা ঈষৎ কোমল—এই যা। প্রথম একশ বছরে যেসব আইনানুগ নির্দেশ সংবাদপত্রের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: ১ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ওয়েলেসলির আইন: সেনসারশিপ-এর প্রবর্তন। ২ সেনসারশিপের বদলে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংসের নয়া নির্দেশ। সম্পাদকদের জন্য আচরণ বিধির প্রবর্তন। ৩ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নতুন কড়াকড়ি আইন। এ-আইন চালু করেছিলেন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডাম। ৪ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মেটকাফের উদ্যোগে সংবাদপত্রের শৃংখল মোচন। ৫ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং-এর নির্দেশে এক বছরের জন্য আবার সংবাদপত্র শাসনের ব্যবস্থা। ৬ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' বা দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের জন্য নূতন শাসন বিধান। হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের একশ বছরের মধ্যে ছাপাখানা নিয়ে কত কাণ্ড!

লক্ষণীয়, এক আমলে যদি সরকার সর্বক্ষণ রক্তচক্ষু, অন্য আমলে হয়ত আবার কিছুটা উদার। এমন কি, সংবাদপত্রের জন্য পূর্ণস্বাধীনতার কথাও ভাবতে পারছেন একজন। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তৎকালের সরকারী চিন্তায় স্পষ্টতঃ দুটি ধারা। এই দ্বি-মুখী স্রোতের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে সমসাময়িক ইউরোপের চিন্তায়, ইংলণ্ডের তৎকালের রাজনৈতিক আবহাওয়ায়। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সরাসরি ভারতীয় প্রেক্ষাপটের দিকেই তাকানো যাক। রাজপুরুষদের প্রধান অংশের বক্তব্য তখন—'ফ্রী প্রেস' আর পরাধীনতা একসঙ্গে চলতে পারে না। অ্যাডাম বলেছিলেন—এদেশে আমাদের সরকারের চরিত্র গণতান্ত্রিক নয়। ডেসপটিক: এখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা অবান্তর। বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন মেজাজে কিছুটা উদার ছিলেন। তাঁরও

কথা ছিল যে দেশের কাঁধে পরদেশের জোয়াল, তার সঙ্গে স্বাধীন সংবাদপত্রের সমন্বয় ঘটানো কেমন করে সম্ভব! তাঁকে দেখা গেছে সংবাদপত্রের সম্পাদককে জাহাজে তুলে দিতে। কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি তো খোলাখুলিই বলে দিয়েছিলেন: আগে স্বাধীন সংবিধান, তারপর স্বাধীন সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বাধীন সংবিধানের আগে আশা করা ঠিক নয়।

মেটকাফের জীবনীকার জে. ডব্লিউ কেয়ি (J. W. Kaye) লিখেছেন: জ্ঞানের বিকিরণ দেখে রাজপুরুষরা তখন ভীত সন্ত্রস্ত। ছাপাখানা আর বাইবেল তৎকালের শাসকদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। তাদের মনোগত বাসনা যতক্ষণ পারা যায় ভারতীয়দের অন্ধকারে ফেলে রাখা ('to keep Indian in the profoundest possible state of barbarism and darkness'.)

অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থীদের ধারণা ছিল—ছাপাখানা উপকারী যন্ত্র। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইংরেজ শাসনের পক্ষে যত বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে ঠিক তত বিপজ্জনক নয়। এলফিনস্টোন লিখেছিলেন, হতে পারে ছাপাখানা একদিন এদেশের মানুষকে কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করবে। অবশ্যই তার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তার আগে ছাপাখানা ধ্বংস করবে গলিত আচার-বিচার আর কুসংস্কারকে। সেটা কি কাম্য নয়? তাঁর আমলে দাবি উঠেছিল 'নেটিভদের' মধ্যে স্বল্প দামে ছাপার হরফ বিলি করবার জন্য। বেণ্টিঙ্ক খবরের কাগজকে নিয়ে কোনও দুঃস্বপ্নে পীড়িত ছিলেন না। এমনকি, লর্ড নর্থব্রুকও চেয়েছিলেন ছাপাখানাকে জনহিতের কাজে লাগাতে। আর মেটকাফ? স্বাধীনতার আনন্দে উল্লসিত কলকাতার মানুষের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, '...যদ্যপি তাঁহারা (সংবাদপত্রের সমালোচকরা) কহেন যে, এমত বিদ্যা প্রদান হইলে পরিশেষে ভারতবর্ষে ইংগলণ্ডীয়েরদের রাজ্য লুপ্ত হইবে তবে তদ্বিষয়ে লিখি যে ইহাতে যাহা ঘটে ঘটুক কিন্তু বিদ্যারত্ন লোকেরদিগকে দান করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কৰ্ম্মই। যদি লোকেরদিগকে অজ্ঞানে মগ্ন না রাখিলে ভারতবর্ষে ইংগলণ্ডীয়েরদের রাজ্য থাকনের সম্ভাবনা না-থাকে তবে আমারদের রাজশাসনেই দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট হয় অতএব তাহা যত শীঘ্র লুপ্ত হয় ততই ভাল!'

হাওয়া কখনও অনুকূল, কখনও প্রতিকূল। তারই মধ্যে অতি সন্তর্পণে চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে তৎকালের সম্পাদক এবং সংবাদপত্র-পরিচালকদের। ওয়েলেসলি সম্পাদকদের হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে বিদায় নিলেন। তাঁর পর দ্বিতীয়বারের মতো এলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই দেহরক্ষা করলেন। অস্থায়ীভাবে গভর্নর জেনারেলের আসনে বসলেন জর্জ বার্লো। তারপর ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এলেন লর্ড মিণ্টো। ইতিমধ্যে ভাগীরথী তীরে নানা কাণ্ড ঘটে গেছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলির উদ্যোগেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। শ্রীরামপুরে মিশনারিদের ছাপাখানায় দ্রুত তালে বই ছাপা হচ্ছে। কলকাতায় তেমনই ছাপা হচ্ছে খবরের কাগজ। ছাপাখানার শব্দে ঘুম ভাঙার লক্ষণ স্থানীয় জনসাধারণের। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হুকুম জারি হল সরকারের অনুমতি ছাড়া শহরে কোনও জন সমাবেশ চলবে না। সভা ডাকবার অধিকারী একমাত্র শেরিফ। তাঁকে আগে থেকে জানিয়ে দিতে হবে সভায় কে কে বক্তৃতা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়ই বা কী। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন ফতোয়া—যে কোনও মুদ্রিত কাগজের সূচনায় বা শেষে মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা দিতে হবে। তা বই পত্র, ইস্তাহার, বা পুস্তিকা যাই হোক না কেন? বোঝা যায়, ছাপাখানা তখন শুধু বই আর খবরের কাগজ ছেপেই শান্ত নয়, নামে বেনামে প্রকাশিত হচ্ছে নানা ইস্তাহার আর পুস্তিকা। এসব মিণ্টোর আমলের ঘটনা। তিনিই শ্রীরামপুরের মিশনারিদের হুকুম দিয়েছিলেন ছাপাখানা কলকাতায় তুলে নিয়ে আসতে। কেন না, তাতে সরকারের পক্ষে নজর রাখার সুবিধা। মিশনারিরা কেঁদে কেটে পড়লেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিলেন সরকারকে না দেখিয়ে কিছু প্রকাশ করা হবে না। কোনও মতে বাঁচা গেল।

এই মিণ্টোর আমলেই নিজামকে ছাপাখানা উপহার দেওয়া নিয়ে সরকারী মহলে প্রবল উত্তেজনা আর উদ্বেগ। ক্যাপ্টেন সিডেনহাম তখন হায়দরাবাদের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট। নিজামকে তিনি পশ্চিমী বিজ্ঞানের দান সম্পর্কে অবহিত করার বাসনায় একটি বায়ু নিষ্কাশণ যন্ত্র, একটি যুদ্ধ জাহাজের নমুনা আর একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দেন। তাই শুনে সরকারের চীফ সেক্রেটারির সে কী রাগারাগি! তিনি 'মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় একটি ভয়ানক বিপত্তিজনক অস্ত্র একজন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া রেসিডেণ্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন।' রেসিডেণ্ট অবশ্য তাঁকে আশ্বাস দেন, সে-আশঙ্কা অমূলক, নিজাম অবহেলাভরে ছাপাখানাটি ফেলে রেখেছেন তাঁর তোষাখানায়! এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় ছাপাখানার দিকে তখন কোন্ নজরে তাকাচ্ছেন সরকার। ছাপাখানা, বিশেষতঃ এ-দেশের মানুষের হাতে ছাপাখানা, যেন এক ভয়াবহ অস্ত্র।

মিণ্টোর পরে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এলেন লর্ড ময়রা বা হেস্টিংস। তিনি দৃষ্টিতে উদারপন্থী। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্টে তিনি ওয়েলেসলির সেনসার-অফিস উঠিয়ে দিলেন। পরিবর্তে

সম্পাদকদের জন্য রচনা করলেন নতুন এক আচরণ বিধি। সেনসার উঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কিছুটা বিপাকে পড়ে। তখন 'মর্নিং পোস্ট'-এর সম্পাদক ছিলেন হিটলি নামে এক সাহেব। সেনসারকে অমান্য করে তিনি একটি খবর ছেপেছিলেন তাঁর কাগজে। কৈফিয়ত তলব করলে তিনি জবাব দেন, বাবা পশ্চিমের মানুষ হলেও আমার মা এদেশের মেয়ে। সুতরাং, সরকার আমাকে জাহাজে তুলে দেবেন কেমন করে? আমি এদেশের মানুষ। লর্ড হেস্টিংস স্থির করলেন তার চেয়ে সেনসার নামক ওই ঝঞ্ঝাট এবার বিদায় করাই শ্রেয়। বদলি ব্যবস্থা হিসাবে তিনি চালু করলেন আচরণবিধি। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এই নির্দেশে সম্পাদকদের জন্য চারটি পালনীয় 'নো' ছিল: ১ সরকারী কাজ-কর্মের বিবরণ, ভারত সরকারের নীতি সম্পর্কিত আলোচনা, কিংবা কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, কলকাতার লর্ড বিশপের আচার-আচরণ বিষয়ে কোনও সংবাদ বা মন্তব্য ছাপা। ২ 'নেটিভ'দের মনে সংশয় সন্দেহ বা বিরূপভাব জাগতে পারে এমন কোনও আলোচনা বা পর্যা-লোচনা। ৩ ভারতে ইংরেজ রাজত্বের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বিদেশী কোনও কাগজ থেকে সে-ধরনের কোনও সংবাদের পুনঃপ্রকাশ। এবং ৪ ব্যক্তিগত কুৎসা। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্য কারও উক্তি প্রকাশ।

যদিও ওয়েলেসলির বিধানের চেয়ে অনেক ভদ্র এবং নম্র এই আচরণবিধি তবু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তফাত শুধু ভঙ্গিতে, দুইয়ের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। তবু এই ব্যবস্থাপত্রটিকেই সেদিনের মানুষ গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতার সনদ বলে। অশ্বত্থামার মতো সম্পাদকরাও পিটুলি গোলা জলকে ধরে নিলেন দুধ। মাদ্রাজে সভা বসল গভর্নর জেনারেলকে অভিনন্দন জানাতে। পাঁচশ বিশিষ্ট নাগরিক সমবেত হলেন সেখানে। তাঁদের স্বাক্ষরিত একটি অভিনন্দন পত্র নিয়ে একজন প্রতিনিধি চলে এলেন কলকাতায়। গভর্নর জেনারেলের হাতে তুলে দেওয়া হল সেই কাগজ। 'আমি মনে করি জরুরী অবস্থায় বা বিশেষ বিশেষ সময়ে ছাড়া নিজ নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রজাদের জন্মগত অধিকার',—উত্তর দিয়েছিলেন লর্ড হেস্টিংস। তাঁর কথা—প্রজ্ঞার বিস্তার ঐশ্বরিক করুণার মতো। ('It is godlike bounty to bestow expansion of intellect, to infuse Promethean spark into the statue and waken it into a man.') অথচ এই হেস্টিংসকেই দেখতে হয়েছে সংবাদপত্র সম্পাদক আর তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ,—সংঘর্ষ।

সে-কাহিনী পরে। তার আগে কলকাতার ভাবলোকে ইতিমধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার কথা উল্লেখ করা দরকার। এতকাল ছাপাখানা ছিল বলতে গেলে পুরোপুরি সাহেবপাড়ার ব্যাপার। বাঙালী বা এদেশের মানুষের ভূমিকা সেখানে প্রায় উহ্য। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় সাকুল্যে ছাপাখানা ছিল সতেরটি। সব কটিরই মালিক অথবা পরিচালক বিদেশীরা। ওই সব ছাপাখানা থেকে শতাব্দীর সীমানার মধ্যে বই ছাপা হয়েছে কমপক্ষে তিনশ। তার মধ্যে খান ষোল বাংলা বইও ছিল। কিন্তু সে সব বইয়ের মুদ্রাকর প্রকাশকও পরদেশী। ওই সময়ের মধ্যে কলকাতার নানা ছাপাখানা থেকে সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র ছাপা হয়েছে আঠারোখানা। সবই ইংরেজী ভাষায়। অন্যভাবে বললে সে সব কাগজ ছিল সাহেবদের জন্য সাহেবদের দ্বারা মুদ্রিত ও সম্পাদিত সাহেবি কাগজ। সরকারের সঙ্গে লড়াই বা আপস সবই ইংরেজীটোলার ঘরোয়া ব্যাপার। তলোয়ারধারী যেমন সাহেব, কলমধারীও তেমনই সাহেব। বাঙালীরা তখন ওইসব কাগজের পাঠকও নন, বড়জোর কৌতূহলী দর্শক মাত্র। কেন না, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেও দেখা যায় 'বেঙ্গল হরকরা' নামক কাগজটির দৈনিক প্রচার সংখ্যা যদি ১৫৫ কপি তবে তার গ্রাহকদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালী। তাঁর ঠিকানা ছিল—শান্তিপুরে। আর একটি ইংরেজী দৈনিক 'জন বুল'-এর প্রচার সংখ্যা ছিল গড়ে ২০৪ কপি। তারও এতদ্দেশীয় পাঠক ছিলেন মাত্র একজন। তিনি জঙ্গীপুরে নিবাসী জনৈক বঙ্গসন্তান। 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে সাপ্তাহিক কাগজটির প্রচার সংখ্যা তখন ৫৬১ কপি। গ্রাহকদের মধ্যে একজন ছিলেন বোম্বাইয়ের এক পার্শী ভদ্রলোক। 'গভর্নমেন্ট গেজেট'-এর প্রচার সংখ্যা তখন প্রতি সপ্তাহে ৫৯৫ কপি। তার গ্রাহকদের মধ্যে অবশ্য জনা সাতেক ভারতীয় ছিলেন। হতে পারে গ্রাহকদের চেয়ে পাঠকদের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল। কিন্তু এদেশের পাঠক যে তখন আঙ্গুলে গোনা যায় তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। খবরের কাগজ নিয়ে যত হল্লা সবই অতএব রাজকীয় ব্যাপার। এক দলে যদি রাজপুরুষেরা, তবে অন্য দলে যাঁরা তাঁরাও রাজার জাত।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মার্কুইস অব হেস্টিংস যখন সম্পাদকদের জন্য আত্মশাসনের নির্দেশ জারি করছেন তখন কিন্তু বিস্তর পরিবর্তন ঘটে গেছে এই প্রেক্ষাপটে। এতকাল কলকাতায় বিদ্বৎসভা বলতে ছিল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীটোলায় প্রতিষ্ঠিত হল রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে হিন্দু কলেজ। সে বছরই ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। পরের বছর ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। ক্রমে আরও নানা সভা সমিতি। জাগরণের লক্ষণ স্পষ্ট। বোঝা যায়,

সাহেব পাড়ার ঘাত-সংঘাতের ঢেউ পৌঁছাচ্ছে ব্ল্যাক টাউন বা কলকাতার সেই সব মহল্লায়, সাহেবদের দৃষ্টিতে যা 'কৃষ্ণনগর'। ছাপাখানা এ-পাড়ায় আর 'সাহেবদের ঠাকুর' নয়, অপ্রতিরোধ্য এক 'যন্ত্র'। হেস্টিংসের নির্দেশনামা প্রকাশিত হওয়ার আগেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বের করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গাল গেজেটি'। সে-বছরই (১৮১৮) শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বের করেন একে একে 'দিগদর্শন' আর 'সমাচার দর্পণ'। ১৮২১-এ শিবপ্রসাদ শর্মার বকলমে রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। তারপর ক্রমে আসরে আবির্ভূত হল কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিলিত উদ্যোগে 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১)। পরের বছর 'সমাচার চন্দ্রিকা'। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রথম ফারসী, উর্দু, হিন্দী কাগজের আবির্ভাবও এই কলকাতায়। হিন্দীর প্রথম প্রকাশ অবশ্য কিছু পরে। 'উদন্ত মার্তণ্ড' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে। কিন্তু হরিহর দত্তের উর্দু 'জাম-ই-জাহান-নুমা' প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার প্রথম ফারসী কাগজ রামমোহন রায়ের 'মিরাৎ-উল্-আখ্বার'-এর প্রকাশও একই বছরে। সন্দেহ কী, ছাপাখানা ততদিনে পেয়ে বসেছে এদেশের মানুষকেও। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দেই শুনি কলকাতার অন্তত চারটি ছাপাখানার মালিক ভারতীয়রা। তাদের মধ্যে স্বভাবতঃই বই পত্রেরও কদর বাড়ছে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্তত ১৫ হাজার বাংলা পুথিপত্র বিক্রি হয়েছে কলকাতার ছাপাখানাগুলো থেকে। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি 'দিগদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা কিনেছিলেন এক হাজার কপি। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাগজটির অন্তত ৬১,২৫০ কপি কেনেন তাঁরা। 'সমাচার দর্পণ'কে শিক্ষিত বাঙালীরা নাকি বলতেন 'বয়স্ক স্কুল শিক্ষক',—'অ্যান অ্যাডালট স্কুল মাস্টার।' ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রচার সংখ্যা সপ্তাহে ৪০০ কপি। একই বছরে দেখা যাচ্ছে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র গ্রাহক ৪০০-এর চেয়ে কিছু কম। ইংরেজদের প্রচারিত কাগজ-গুলোর তুলনায় বাংলা কাগজের প্রচার সংখ্যা কিছুটা কম হলেও সংখ্যাগুলো তুচ্ছ নয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায় শহরের চারটে ইংরেজী দৈনিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় যেটি, তার প্রচার সংখ্যা ৭২৬ কপি। আর সাপ্তাহিকগুলোর বিক্রি ১০০ থেকে ৪০০ কপির মধ্যে। সুতরাং, জনসংখ্যার অনুপাতে না-হোক, সাক্ষরের তুলনায় বাংলা সংবাদপত্র তখন প্রচারের দিক থেকে নিশ্চয়ই অবহেলাযোগ্য নয়। অথচ লর্ড হেস্টিংসের আমল পর্যন্ত খবরের কাগজ নিয়ে যত বিরোধ আর বিতর্ক তার উপলক্ষ কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্র।

সম্পাদকদের জন্য আচরণ-বিধি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ঈশান কোণে মেঘ জমছে। সে-বছরই কলকাতার মাটিতে পা রেখেছেন জেমস সিল্ক ব্যাকিংহাম। তিনি বিক্ষুব্ধ বর্ধিষ্ণুমান আদর্শ-বাদী মানুষ। কলকাতায় এসেছিলেন তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে। কিন্তু সে জাহাজটিকে মাদাগাস্কার থেকে দাস বোঝাই করে পশ্চিমের গোলামের হাটে পাড়ি জমাতে হবে জেনে তিনি কলকাতায় থেকে গেলেন, ওই ঘৃণ্য ব্যবসায়ে বিন্দুমাত্র রুচি নেই তাঁর। তারপর কলকাতার কিছু ইংরেজ সওদাগরকে সংগঠিত করে বাকিংহাম প্রকাশ করলেন সেকালের কলকাতার সেরা সংবাদপত্র 'ক্যালকাটা জার্নাল' (অক্টোবর, ১৮১৮)। আট পৃষ্ঠার অর্ধসাপ্তাহিক। দাম প্রতি সংখ্যা এক সিক্কা টাকা। কিছুদিনের মধ্যেই (১৮১৯) 'ক্যালকাটা জার্নাল' পরিণত হয় দৈনিকে। তার শিরোলিপিতে লেখা থাকত 'পেপার অব দি পাবলিক।' বিরাট বাড়ী, বিরাট অফিস, নতুন ছাপাখানা, টাইপ। 'ক্যালকাটা জার্নাল' কাগজের মতো কাগজ; চল্লিশ হাজার পাউণ্ড তার মূলধন। জনপ্রিয়তায়ও অন্য কোনও কাগজের সঙ্গে তুলনা হয় না তার, প্রচার সংখ্যা দৈনিক হাজার কপি!

প্রথম সংখ্যাতেই বাকিংহাম ঘোষণা করেছিলেন, তিনি অন্য ধরনের কাগজ বের করতে চান। যদিও শহরে তখন নয়টি সংবাদপত্র, তবু তাঁর মতে সত্যকারের কাগজ নেই বললেই চলে। তিনি মনে করেন কেউ জনসাধারণের কথা বলে না। 'আমি ব্যতিক্রম হতে চাই',—এই ছিল তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা! কথা রেখেছিলেন বাকিংহাম। 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর পাতায় দেশ বিদেশের খবর ছাড়াও থাকত ইউরোপীয় সৎসাহিত্যের নমুনা, স্থানীয় জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। কলকাতার অগ্রসর বাঙালীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর, রামমোহন রায় ছিলেন তাঁর বন্ধু। আমাদের নানা সামাজিক আন্দোলনে তাই সহযোগী সহযাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল 'ক্যালকাটা জার্নাল।' 'স্পিরিট অব দি প্রেস' শিরোনামার নিচে তার পাতায় ছাপা হত বাংলা কাগজের সংবাদ-সার। পাতা উল্টালেই বোঝা যায় বাকিংহামের কাগজ তাজা কাগজ এবং বাকিংহাম তেজী সম্পাদক।

সুতরাং কর্তৃপক্ষ বিচলিত। বিচলিত শহরের বশংবদ সম্পাদকরাও। তাঁরা একযোগে আক্রমণ চালালেন 'ক্যালকাটা জার্নাল' ও তার সম্পাদকের ওপর। স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার কি সঙ্গত? প্রশ্ন তুললেন তাঁরা। 'আমি মনে করি গভর্নরদের তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া, কর্তব্যে ত্রুটি ঘটলে তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে নির্ভয়ে সত্য কথা বলা সম্পাদক হিসাবে আমার পবিত্র কর্তব্য',—উত্তর দিলেন বাকিংহাম। কলম বনাম কলমের লড়াই অচিরে

পরিণত হল কলম বনাম তলোয়ারের লড়াইয়ে। 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর এক একটি সংবাদ আর সম্পাদকীয় মন্তব্য ক্ষিপ্ত করে তুলল কাউন্সিলের সদস্যদের। তাঁরা প্রথমে বাকিংহামকে সতর্ক করে দিলেন, তারপর একদিন টেনে আনলেন আদালতে। প্রথম মামলায় বাকিংহাম জিতলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আর এক অভিযোগ উঠল রবিনসন নামে এক পত্রলেখক আর বাকিংহামের নামে। রবিনসন ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক। তিনি পদচ্যুত হলেন। কাউন্সিল রায় দিলেন, বাকিংহামকে জাহাজে তুলে দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু বাদ সাধলেন লর্ড হেস্টিংস। তিনি বললেন, লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাচ্ছে না কি?

বাকিংহাম তখনকার মতো রেহাই পেলেন। অ্যাডাম এবং কাউন্সিলের অন্য সদস্যরা পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। হঠাৎ দেশে ফিরে গেলেন লর্ড হেস্টিংস। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল মনোনীত হয়েছেন উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। তিনি এসে না-পেঁছানো অবধি অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন কাউন্সিলের সিনিয়ার মেম্বার জন অ্যাডাম। তিনি তাকে তাকে রইলেন। নতুন করে সুযোগও এসে গেল। এবার উপলক্ষ সরকারপন্থী কাগজ 'জন বুল'-এর সম্পাদক রেঃ জেমস ব্রাইসের নতুন পদপ্রাপ্তি। অ্যাডাম পুরস্কৃত করেছিলেন তাঁকে একটি সরকারী কাজ দিয়ে। বাকিংহামের কলমে বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গ। ক্ষিপ্ত অ্যাডাম কাউন্সিল ডাকলেন। রায় এবার পাকা; দুমাসের মধ্যে দেশ ছেড়ে যেতে হবে তাঁকে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লড়াই করতে করতেই জাহাজে চড়লেন সেদিনের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক জেমস সিল্ক বাকিংহাম। স্মরণীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য তাঁর বিরামহীন লড়াই। সে-লড়াই শুধু কাগজের পাতায় নয়, চালাতে হয়েছে মাঠেও। ইজ্জতের নামে পিস্তল পর্যন্ত ধরতে হয়েছে তাঁকে। ডঃ জেমসন আর জেমস সিল্ক বাকিংহামের সে-দ্বৈরথের সংবাদ ছাপা হয়েছিল 'সমাচার দর্পণে'...'ধারামত দ্বাদশ পদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন।...'

তার পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। বাকিংহাম চলে যাওয়ার পরে সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল যেন-তেন প্রকারেণ 'ক্যালকাটা জার্নাল' নামক আলোকের মশালটিকে নিবিয়ে দেওয়া। অ্যাডাম সেখানেই ক্ষান্ত হননি। তাঁর আমলেই ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের কুখ্যাত প্রেস-বিধান, নতুন করে খবরের কাগজকে শিকলে বাঁধবার হীন উদ্যোগ। নতুন আইনে জানিয়ে দেওয়া হল '১৪ দিবস মেয়াদের পরে কোন ব্যক্তির এমন ক্ষমতা থাকিবে না যে স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যের দ্বারা শহরের মধ্যে কোন সমাচার পত্র কিম্বা অন্য কোন কাগজ অথবা কেতাব..শ্রীশ্রীযুতের হজুর কৌসলের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে ছাপা করে কিম্বা প্রকাশ করে।' প্রথমে সম্পাদক প্রকাশককে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ নিতে হবে। তার জন্য অবশ্য পয়সা লাগবে না, 'রসুম রূপে কিছু না লইয়া দস্তুর মত' হলফ করাতে হবে এই ছিল সরকারী নির্দেশ। তারপর সেই হলফনামা জমা দিতে হবে চীফ সেক্রেটারির কাছে, তবেই অনুমতিপত্র মিলবে। কাগজে কী ছাপা চলবে, কী চলবে না তারও একটি ফর্দ তুলে দেওয়া হল সম্পাদকদের হাতে। তার বাইরে কিছু করলে বিপদ। প্রথমতঃ লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। তা ছাড়া জরিমানাও সম্ভব। 'উক্ত-প্রকার সকলের কোনপ্রকার করণের জন্য (যাঁরা) অপরাধী হইবেক এবং ঐ সমস্ত অপরাধের প্রত্যেক অপরাধের প্রতিফলে চারিশত টাকা করিয়া জরীমানা তাহারে স্থানে লওয়া যাইবেক।'

নতুন আইনে প্রথমেই লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেল 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর। বাকিংহামের উত্তরসূরীদের একজন 'জার্নাল'-এর অন্যতম সম্পাদক স্যান্ডফোর্ড আর্নট দেশান্তরী হলেন। অন্যরা প্রমাদ গুনলেন। রামমোহন রায় এবং আরও পাঁচজন মিলে সুপ্রীম কোর্টে পেশ করলেন তাঁদের ঐতিহাসিক আবেদনপত্র। ঐতিহাসিকরা ওই দলিলটিকে বলেন, 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা অব ইণ্ডিয়ান প্রেস।' কিন্তু মাননীয় বিচারপতির যুক্তি নিশ্ছিদ্র। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন নিজেদের স্বাধীন সংবিধান যাঁদের নেই তাঁদের পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার চিন্তা অবান্তর। অন্য কথায় ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়লে চলবে কেন? রামমোহন প্রিভি কাউন্সিলে পর্যন্ত দরবার করলেন। কিন্তু রাজশক্তির কানে তুলো। তিনি অতএব প্রতিবাদে মৌন থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। 'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ হয়ে গেল। শেষ সংখ্যায় রামমোহন যা লিখেছিলেন তার মর্ম: যে সম্মান হৃদয়ের শত বিন্দু রক্তের বিনিময়ে ক্রীত, কোনও অনুগ্রহের আশায় দ্বারবানের কাছে তা বিক্রি করো না। হাফিজকে স্মরণ করেছিলেন তিনি: হাফিজ, তুমি এক কোণে পড়ে থাকা ভিখারি মাত্র; চুপ থাক। নিজেদের রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন!

আগেই বলা হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সরকারের সামনে নতুন শমন,—দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র। এতদিন বিরোধ ছিল ইংরেজদের নানা স্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে। সম্পাদকদের মধ্যেও ছিল দুটি দল। এক দলে ছিলেন গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরা, কোম্পানীর অনুগৃহীতের দল। তাঁরা সরকারের বশংবদ। সরকারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকের। অন্য দলে ছিলেন উদারপন্থী হুইগ র‍্যাডিক্যালরা। তাঁদের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল বাধাবন্ধহীন স্বাধীন বাণিজ্য।

তাঁরা কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরোধী ছিলেন। স্বভাবতঃই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল তাঁদের লড়াইয়ের পক্ষে জরুরী। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের আধিকারের অবসান ঘটলেও স্বাধীন শ্রেষ্ঠীদের আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। বরং ফর্দ ক্রমে আরও দীর্ঘ হচ্ছিল। কলোনাইজেশন, ইত্যাদি অগণিত প্রশ্ন তখন তাঁদের সামনে। ক্রমে দেখা গেল তাঁদের সঙ্গে দাবিপত্র হাতে যোগ দিচ্ছেন রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ এ দেশের অগ্রপথিকরাও। মুক্ত বাণিজ্যের বিদেশী প্রবক্তাদের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের স্বার্থের ঐক্য খুঁজে পেয়েছিলেন নির্ভুল ভাবে। তাই ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আইনের সপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বেইলি যখন ইংরেজী সংবাদপত্রের মতো দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলোকেও চিহ্নিত করেন 'বিপজ্জনক' বলে তখন বিস্ময়ের কিছু নেই। বস্তুত তিরিশের দশকে দেখা গেছে বাঙালীরা ইংরেজী খবরের কাগজ পরিচালনায়ও হাত লাগিয়েছেন। ১৮৩১-এ চারটি ইংরেজী কাগজের মালিক এবং সম্পাদক বাঙালী। রক্ষণশীল কাগজ 'জনবুল' যখন উদারপন্থী সম্পাদক জে. এইচ. স্টকুইলার-এর হাতে আসে তখন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন দ্বারকানাথ। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই 'জনবুল'ই নাম নেয় 'ইংলিশম্যান।' এই সময় 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর মালিকানাও চলে যায় দ্বারকানাথের হাতে। ১৮৩৫-এ কাগজটি 'বেঙ্গল হরকরা'র সঙ্গে মিলে যায়। 'হরকরা'র প্রকাশক ছিল যদিও একটি ইংরেজ-সওদাগরী সংস্থা তবু দ্বারকানাথের শেয়ার ছিল তাতে। তার আগে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টগোমারি মার্টিন যখন 'বেঙ্গল হেরাল্ড' শুরু করেন তখনও দেখা যায় রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার তাঁর সহযোগীর ভূমিকায়। সরকারের সঙ্গে বিরোধের ফলে মার্টিনকে অবশ্য কাগজটি ছেড়ে দিতে হয়। তখন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নীলরত্ন হালদার নামে একজন বাঙালী।

খবরের কাগজের দিকে বাঙালী সমাজপতি এবং বুদ্ধিজীবীদের এই আকর্ষণের হেতু কী, তা বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই। ইংরেজের সংসর্গে এবং পশ্চিমী ভাবধারার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কলকাতার বাঙালী সমাজে সেদিন নানা বিপরীত ভাবের তরঙ্গ। রামমোহন ডিরোজিও, রাধাকান্ত দেব। ধর্ম আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, নানা সামাজিক আন্দোলন। কাগজ ছাড়া কারও পক্ষে নিজেদের মতামত পাঁচজনের গোচরে আনা সম্ভব নয়। নতুন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক পটভূমিতে প্রত্যেকের চাই নিজস্ব কাগজ। বস্তুতঃ সেদিনের সামাজিক আন্দোলন আলোড়ন কাগজ ছাড়া ভাবাই যায় না। সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কেউ কেউ এমনকি হাতে তুলে নিয়েছেন ইংরেজী কাগজও। কাগজ, বিশেষতঃ, এদেশীয়দের পরিচালিত কাগজ যত না লাভজনক ব্যবসা, তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতামতের বাহন হিসাবে তার ভূমিকা। অন্যের বক্তব্যের জবাব দিতে হলেও চাই কাগজ। তাছাড়া কাগজের বহুমুখী শক্তি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন কেউ কেউ। দ্বারকানাথের বিরুদ্ধে নিমকের খালাড়িদের আন্দোলনের কথা সমসাময়িক কোনও কাগজে ছাপা হয়নি কেন, তার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় 'শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিশম্যান কাগজের প্রোপ্রাইটার, হিরালড্ নামক কাগজের সর্জনকর্ত্তা তিনি এইক্ষণে বঙ্গাল হরকরা মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়া গেজেট নামক পত্র এবং সে অফিস ঠাকুরবাবু ক্রয় করিয়া হরকরার সামিল করিয়া দিয়াছেন,' তাছাড়া 'বঙ্গদূত শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর সুধাকর ঠাকুর বাবুদের অধীন।' সুতরাং—। শত্রুপক্ষকেও নিরস্ত করতে চাই কাগজ। আরও কাগজ।

যাহোক, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত বলবত ছিল অ্যাডামের আট আইন। তবে ১৮২৮ থেকে '৩৫ পর্যন্ত মোটামুটি নিরুপদ্রব কেটেছে এদেশের সম্পাদকদের জীবন। কেন না, বেণ্টিঙ্ক ছিলেন খবরের কাগজ সম্পর্কে উদারপন্থী। তাঁর সেই নীরব নিষ্ক্রিয় উদারতাকেই ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর স্পর্শগ্রাহ্য করলেন চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন করে। তাঁর বক্তব্য আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। কলকাতা তথা সমগ্র ভারতে সেদিন আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। 'টৌন হলে' মহতী সভা, 'মুদ্রাযন্ত্র মুক্ত হওনের উপকার স্মরণার্থ বৈঠক।' অভিনন্দন। গভর্নর জেনারেলের প্রতিউত্তর। মেটকাফের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য 'পুস্তকের এক অট্টালিকা নির্মাণ,' 'রাত্রিতে কলিকাতা নগরের মধ্যে উত্তম রোশনাই করণের প্রস্তাব,' ইত্যাদি ইত্যাদি। মেটকাফ সাংবাদিকদের চোখে 'মুক্তিদাতা।'

এরপর শৃঙ্খল ঝংকার শোনা যায় বেশ কয়েক বছর পর, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময়। '৫৭-র জুন থেকে '৫৮-র জুন, মাত্র এক বছর ছিল তার মেয়াদ। ক্যানিংয়ের সেই ১৫ আইনে তবু কারও কারও নাভিশ্বাস। 'রসরাজ'-এর হয়রানির কাহিনী সকলের জানা। কাগজের ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ৫০০ টাকা জরিমানা এবং তিন মাস 'মিয়াদ' হয়, ধর্মদাসের 'মিয়াদ' হয় এক মাস। হুতোমের ভাষায়—"গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নুপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণবাড়ি ঢুকলেন।' নতুন আইনে রাজদ্রোহীর জন্য দণ্ড নির্দিষ্ট হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুই বছরের অনধিক কারাবাস। এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল কাশীপ্রসাদ ঘোষের

'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' আর দূরে মফস্বলের কাগজ 'রঙ্গপুর বার্তাবহ।' 'সংবাদপ্রভাকর' "যে-প্রকার সাবধান এবং বিহিত বিবেচনাপূর্বক সহকারে মানে ২ সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা গুণগ্রাহক পাঠক মহাশয়রা বিশেষরূপে অবগত আছেন।"

মেটকাফ

বাকিংহাম

তারপরে ছাপাখানার আবির্ভাবের পর প্রথম শতবর্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' বা দেশীয় সংবাদপত্র শাসনেব জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি আইন। হলহেডের ব্যাকরণের প্রকাশ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। আর এই আইন জারি হয় তার ঠিক একশ বছর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। শতবর্ষে যেন ছাপাখানা একটি বৃত্তকে সম্পূর্ণ করল। সেই আইনের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেগুলিও আমাদের ছাপাখানা সম্পর্কিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জারি হয় প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুকস অ্যাক্ট। এর লক্ষ্য কোথায় কী ছাপা হচ্ছে তার হিসাব রাখা। সেই সঙ্গে ছাপাখানাগুলোকে নজরে রাখা। দেশীয় ভাষার কাগজপত্র থেকে সংবাদ-সার অনুবাদ করে জমা করা হত ভাইসরয়ের অফিসে। বছরের শেষে বের হত একটি সংকলন। ১৮৭০-এ রাজদ্রোহমূলক লেখালেখির জন্য পেনাল কোডে বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা হয়। তার আগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অশ্লীল পুঁথিপত্র দমনের জন্য চালু হয় এক আইন। ব্রিটেনের আইন তার পরের বছব। বলা হয় বিশ্বে সাহিত্য শাসনের সেই নাকি প্রথম উদ্যোগ। এই ধরনের একটি আইনের জন্য অবশ্য কেউ কেউ দাবি জানিয়ে আসছিলেন অনেকদিন ধরে। পরবর্তীকালে এই আইনও দণ্ডবিধির অঙ্গ হয়ে যায়। তারপর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন। জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরে প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসন, ইত্যাদি। কিন্তু আইনের লক্ষ্য যে ছিল আরও ব্যাপক তৎকালের নিষিদ্ধ নাটকের তালিকার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। 'কুৎসামূলক' তো বটেই 'অপমানসূচক, রাজদ্রোহী, অশ্লীল, জনস্বার্থবিরোধী' সব নাটকের অভিনয়ের ওপরই নেমে আসে কালো যবনিকা। লেখক, প্রকাশকও দণ্ডযোগ্য সে-আইনে।

অবশেষে নেমে এল 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' নামক সেই নির্মম তীক্ষ্ণ খড়্গ। মাত্র ক বছর আগে রিচার্ড টেমপল লিখেছিলেন বাঙালীর মতো অনুগত প্রজা আর হয় না। কিন্তু বাংলার গভর্নর জর্জ ক্যাম্বেল সেই তত্ত্ব মানতে রাজী নন। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকও কড়াকড়ি বা বাড়াবাড়ির পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু ছোটলাট তবু দেশীয়ভাষার সংবাদপত্রগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। প্রথমে তিনি তাঁর পরুষ হাত বাড়ালেন 'হালিশহর পত্রিকা'র দিকে। সম্পাদক সরকারের শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু পেনালকোডে তাঁকে সঠিক শাসন করা গেল না। কেন না, সম্পাদকের বয়স মাত্র কুড়ি বছর! তিনি অতঃপর পড়লেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে নিয়ে। ওঁরা বরোদার গাইকোয়াড়ের প্রতি সরকারের আচরণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন।

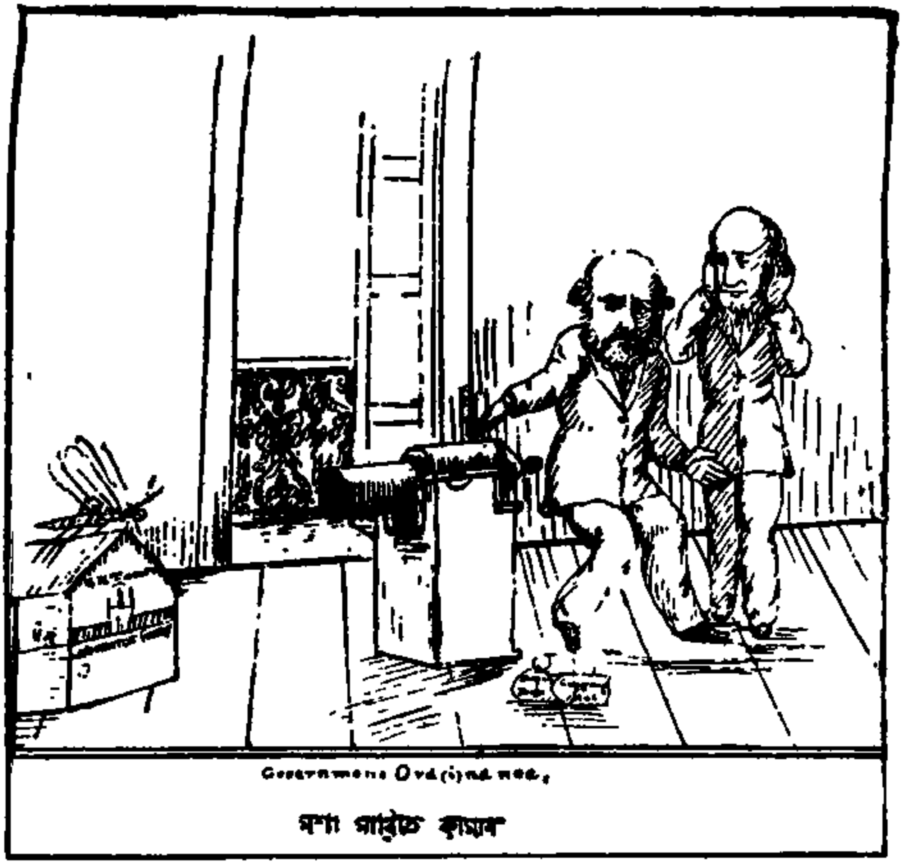

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন; 'বসন্তকে'র ব্যঙ্গচিত্র

দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার'-এর শিরোনামে তখন লেখা থাকত—'পরাধীন কালকূটে মরি হায় ২। করেছ কি আর্যসুতে চেনা নাহি যায়॥' গাইকোয়াড় উপলক্ষে রীতিমত বিষাক্ত সম্পাদকের কলম। সরকার বক্রদৃষ্টি হলেন। গাইকোয়াড় প্রসঙ্গ ছাড়াও উত্তেজনার নানা উপলক্ষ তখন: ইনকাম ট্যাক্স (১৮৭২-৭৩), ১৮৭৫-এর বাণিজ্য শুল্কনীতি এবং রুশ-তুর্কীর যুদ্ধ। রাশিয়া ইংরেজকে টিট করবে, এ-ধরনের আশা নাকি ব্যক্ত হয় কোনও কোনও দেশীয় কাগজে। নর্থব্রুক তবু শান্ত। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটনের মেজাজ কড়া। তিনি স্থির করলেন এই বিপজ্জনক দৈত্যকে এক ঘায়ে শেষ করাই সঙ্গত। ('To behead the hydra at one sudden stroke instead of hacking at each of its head in succession') তাঁর মতে এভাবে আঘাত হানলে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠবে বটে, কিন্তু দিনের পর দিন ক্রমাগত হল্লা শুনতে হবে না। সুতরাং, জারি হয়ে গেল নতুন কানুন। লিটন বললেন, দেশীয়-ভাষায় কাগজ বের করে হতাশ ভূতপূর্ব সরকারী কর্মচারী, ভগ্নহৃদয় উকিল, সরকারী চাকরির বিফল উমেদার আর ভূতপূর্ব কেরানীর দল। পরবর্তীকালে কার্জন যাঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন—'বাবু কুইল ড্রাইভারস!' এঁরা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলছেন, অলীক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, জাতিবিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন, দেশীয় নরপতি এবং সম্পন্ন লোকেদের ব্ল্যাকমেল করছেন। ইংরেজী কাগজ নিয়ে দুর্ভাবনা নেই, কারণ ইংরেজী কাগজ পড়েন অতি অল্প পাঠক। দেশীয় ভাষার কাগজের অনেক পাঠক। তাঁদের অধিকাংশই স্বল্প-শিক্ষিত এবং তাঁরা বাছবিচার করতে জানেন না। সুতরাং, শাসনে আনা দরকার বই কি!

কড়াকড়ি আইন। নতুন আইনে সরকার যে-কোনও কাগজের কাছে জামানত চাইতে পারে। যে-কোনও কাগজকে বলতে পারে—প্রুফ দেখাও। কাগজের ওপর খবরদারির দায়িত্ব পেলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ কমিশনাররা। বাংলার গভর্নর তখন অ্যাসলি ইডেন। তিনি তক্ষুনি কাজে নেমে পড়লেন। 'সহচর', 'সাধারণী', 'সুলভ সমাচার', 'ভারত মিহির', 'ঢাকা প্রকাশ'—ইত্যাদি বেশ

কয়টি কাগজের কাছে জামানত চাওয়া হল। সকলের জন্য টাকার অঙ্ক ধার্য হল পাঁচশ, 'সুলভ সমাচার'-এর জন্য হাজার টাকা। একমাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল 'সোমপ্রকাশ', 'ভারত মিহির', 'সহচর'। অন্যদেরও শ্বাসকষ্ট। 'সোমপ্রকাশ' শহীদের গৌরব পেল। এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইংরেজীতে আত্মপ্রকাশ করে বিদ্রূপ কুড়ালো। দর্শকদের চোখে এই চেহারা-বদল যত না চমকপ্রদ, তার চেয়ে বেশী লজ্জাকর। কেন না, এতে চালাকি স্পষ্ট।

লিটন বলেছিলেন: আঘাতের পর একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাবে, তার চেয়ে বেশী কিছু হবে না। গভর্নর জেনারেলের অনুমান পুরোপুরি সত্য হল না। সুরাটে হাঙ্গামা থামাতে সৈন্য-বাহিনী তলব করতে হল। কলকাতায় চার হাজার মানুষ জমায়েত হলেন টাউন হলে। সভার উদ্যোক্তা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তার তালিকায় ছিলেন —বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বসু, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা প্রতিবাদে মুখর। ঢাকায় দাহ করা হল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কুশপুত্তলিকা। তাঁর অপরাধ বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় সদস্য। অথচ তিনি কোনও আপত্তি জানাননি। স্বাধীনতাব নামে ঢাকার মানুষ তাই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ।

হলহেডের ব্যাকরণের একশ বছরের মধ্যে আরও নানা নাটকীয় ঘটনা। শাসন, পীড়ন। গণচেতনার জাগরণ, জনমতের বিস্ফোরণ। সবই কিন্তু অঘটন পটিয়সী ওই ছাপাখানার কাণ্ড।

পাঠপঞ্জী

Ahmed, A F. Salahuddin. *Social Ideas and Social change in India (1818-1835)*, 1976

Barns, Margarita. *The Indian Press,* 1940

Bose, Nemaisadhan. *The Vernacular Press Act (1818) and the Indian Nationalism, Bengal Past and Present,* vol. XCVII, Part, II No. 185, 1978

Chakraborti, Smarajit. *The Bengali Press (1818-1868)*, 1976

Dasgupta, Uma. *Rise of An Indian Public, Impact of official Policy, 1870-1880*, 1977

Natarajan, J., *History of Indian Journalism*, 1955

Priolkar, A. K. *The Printing Press in India*, 1958

Sanial, S. C. *History of the Press in India—XI, Bengal, The Calcutta Review,* vol 132, 1911

—*More echos from old Calcutta,* Counterpoint vol. I, 1877

Sinha, Dr Chittaranjan. *The Digs of the Babu Quill-drivers at the British Raj after the repeal of Vernacular Press Act* in 1881, *Journal of the Asiatic Society,* vol. XV, No. 1-4, 1973

চণ্ডীচরণ সেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৮৮৭

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অশ্লীলতা নিবারক আইন', সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার, ১৩৭০

বিনয় ঘোষ। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪ খণ্ড

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাময়িক পত্র (২ খণ্ড), ১৩৪২

—সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২ খণ্ড, ১৩৪০

রজনীকান্ত গুপ্ত। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, ১২৮৬

শিশির বসু। একশ বছরের বাংলা থিয়েটার ১ম খণ্ড, ১৯৭৩

শ্রীপান্থ। 'দু'শ বছর; হাজার প্রশ্ন', আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৬

'সেকালের একজন সাংবাদিক', শ্রীপান্থের কলকাতা, ১৯৬১

সুবীর রায়চৌধুরী, সম্পাদিত। বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার, ১৯৬২

মুদ্রণ ও সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

মুদ্রণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হল জ্ঞাপনের অর্থাৎ কমিউনিকেশনের এবং জ্ঞাপন হল ক্ষুধা-নিবৃত্তির মতো মানুষের অন্যতম আদিম সমস্যা। জীবজগতে পশুপক্ষীর মধ্যেও জ্ঞাপনের ব্যাপার আছে এবং তার চমকপ্রদ প্রণালীর বর্ণনা করেছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা। আদিমতম মানুষের মধ্যে জ্ঞাপনের প্রণালী পশুপক্ষীর মতো হাবভাবভঙ্গিও ধ্বনিপ্রধান ছিল, একথাও ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন। বোবা মানুষের জ্ঞাপনের রীতি দেখে তার রূপ খানিকটা অনুমান করা যায়। এই আদিম হাবভাবভঙ্গিধ্বনি থেকে ক্রমে যখন ভাষার উদ্ভব হল তখন নিঃসন্দেহে প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষ জ্ঞাপনের চড়াই উতরাইয়ের পথে অনেক ধাপ এগিয়ে গেল অন্যান্য জীব-জন্তুর তুলনায়। কারণ ভাষা হল হাবভাবভঙ্গি অথবা অস্পষ্ট ধ্বনির চাইতে জ্ঞাপনের অনেক-বেশী সুস্পষ্ট উন্নত মিডিয়াম। শব্দধ্বনিগ্রামের তরঙ্গভঙ্গ থেকে মৌখিক ভাষার উৎপত্তি হল বটে, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র মানবজাতির মধ্যে একপ্রকারের ভাষার বিকাশ হল না। সমগ্র মানব-জাতি বহুভাষাভাষী বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল। অতঃপর যখন লৈখিক ভাষার বর্ণমালার বিকাশ হল তখন তার রূপবিন্যাস একরকম হল না, নানারকমের হল। যেমন মৌখিক ভাষার বৈচিত্র্য, তেমনি লৈখিক বর্ণমালার বৈচিত্র্য। ক্যানভাসে বিভিন্ন বর্ণমালা রূপায়িত করে সাজিয়ে রাখলে তা যে কোনো চিত্রপ্রদর্শনীর তুলনায় কম আকর্ষণীয় হবে না। তেমনি বিভিন্ন মৌখিক ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য টেপরেকর্ড করলে শ্রুতিপথে তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ক্যাকোফনির মতো মনে হবে। বর্ণমালার নিকটসাদৃশ্যের মধ্যে ভাষার বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করার মতো। সম্পত্তি ধনদৌলতের শ্রেণীগত ভেদবৈষম্যের মতো মানবজাতির মধ্যে এই ভাষাগত বৈষম্যের সামাজিক গুরুত্ব কম নয়।

বর্ণমালাহীন অর্থাৎ লেখ্যভাষাহীন মৌখিক ভাষা আজও পৃথিবীর অনেক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আছে এবং বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক-সামাজিক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে, বহু উন্নত সমাজ-সংস্কৃতির নিবিড় সংস্পর্শ এবং তরঙ্গাঘাতের মধ্যে তারা বর্তমান বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নকাল পর্যন্ত তাদের নিজেদের সমাজবিন্যাস, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য কেবল মৌখিক ভাষার মাধ্যমেই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। যদিও মৌখিক ভাষার জ্ঞাপনের প্রসারক্ষেত্র একটি বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তথাপি যে কোনো লোকভাষা হোক, তার মূল যে জন-

মানসের কোন্ অদৃশ্য অতল গভীর পর্যন্ত প্রসৃত, তা এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশে প্রতিবেশী সাঁওতালজাতির সাঁওতালী ভাষার কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। সাঁওতালী লেখ্যভাষা নেই, সাঁওতালী বর্ণমালা নেই, সম্প্রতি তার জন্য আন্দোলনও হচ্ছে, কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে সাঁওতালী সমাজের বিশিষ্ট গঠনবিন্যাস রীতিনীতি ধর্মকর্ম সংস্কৃতি কোনকিছুই তার জন্য বিবর্ণ বা বিকৃত হয়নি, যেমন তাদের বর্ণাঢ্যতা সুদূর অতীতে ছিল, তেমনি আজও আছে। সাঁওতালরা অনেকে ইংরেজী বাংলা হিন্দী ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা জানেন, শিখেছেন, ভিন্নসমাজের লোকজনের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশাও করেন, অথচ তার জন্য কোনো প্রভাব তাঁদের ভাষার ব্যূহ ভেদ করে সমাজসংস্কৃতিকে স্পর্শ করতে পারেনি। যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়ে স্বজনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাঁদের কথা আলাদা। অনেক বাঙালী যাঁরা কৃত্রিম সাহেব হয়েছেন এবং সাহেবী ভাষা চিবিয়ে উচ্চারণ করেন, তাঁরা যেমন বঙ্গ-জনসংস্কৃতির প্রতিভূ নন, ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। অতএব মৌখিক ভাষার জ্ঞাপনগণ্ডি যতই সংকীর্ণ হোক, সমাজসংস্কৃতির লৌহবর্ম হিসাবে তার দৃঢ়তা লেখ্যভাষা অথবা মুদ্রিতভাষার চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়।

তাই যদি হয় তাহলে মৌখিক ভাষা থেকে অক্ষরবিন্যস্ত লেখ্যভাষা এবং হাতেলেখা লেখ্যভাষা থেকে ছাঁচেঢালাই অক্ষরে মুদ্রিত ভাষা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কমিউনিকেশনের মিডিয়াম হিসাবে ক্রমিক উন্নতি, না ক্রমিক অবনতির সূচক, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। যদি উন্নতি হয় তাহলে সেই উন্নতি-বিচারের মানদণ্ডগুলি কি তা জানা দরকার এবং যদি অবনতি হয়ে থাকে তাহলেও তার স্বরূপ জানা আবশ্যক। প্রথমেই যে কথা মনে হয় সেটা হল এই যে 'মৌখিক ভাষা' সর্বলোকবোধ্য ভাষা, এমনকি শিশুরও বোধ্য বর্ণমালা বা হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি সকলের বোধগম্য নয়, কারণ তা বুঝতে হলে অক্ষর-পরিচয় থাকা প্রয়োজন এবং তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। ছাঁচে-ঢালা মুদ্রিত ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। অতএব পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রণের প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রতিক্রিয়া হল সর্বজনস্তর থেকে ভাষাকে জ্ঞাপনের বাহন হিসাবে অক্ষরশিক্ষিতের সংকীর্ণ স্তরে সীমিত করা। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে মৌখিক ভাষার 'মোবিলিটি' লেখ্য বা মুদ্রিত ভাষার তুলনায় অনেক কম। যেমন আমরা আজ বাংলা মুদ্রণের দুশ বছর পূর্তি স্মরণ করে গর্ববোধ করছি। গর্ববোধ করতে বাধা নেই, কারণ মুদ্রণের অগ্রগতির ফলাফল বিচার করে গর্ব করার মতো বস্তু নিশ্চয় কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেডের ব্যাকরণের আমল থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের অফসেট মুদ্রণের স্তর পর্যন্ত এগিয়ে, লক্ষাধিক মুদ্রিত বাংলা বইপত্রের সম্ভার নিয়ে, আজও যখন আমরা দেখতে পাই যে বাংলাভাষী অর্ধেকের বেশী মানুষ নিরক্ষর, পাণ্ডুলিপি তো দূরের কথা, তথাকথিত 'পপুলার' মুদ্রিত বইয়ের চেহারা পর্যন্ত তারা দেখেনি, দেখার আগ্রহও নেই, এবং যখন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত শহুরে বাবুরা নিরক্ষরতা দূর করার পুণ্যকর্মে ব্রতী হয়েছেন আর ব্রত যত উদ্‌যাপিত হচ্ছে তত দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে, তখন মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে আলোচনা করতে বাস্তবিকই সংকোচ হয়। যদি বাংলার কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাপলে সমগ্র বাঙালীজনের ব্যাসার্ধ একশ হয়, তাহলে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক ব্যাসার্ধ কত হবে? খুব বেশী হলে কুড়ি-পঁচিশের বেশী নয়, সাক্ষরতা ও শিক্ষাদীক্ষার হিসাবে। জীবনযাত্রা ও আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে বিচার করলে 'পাঁচ' হবে কি না সন্দেহ। এই প্রসঙ্গ পরে আমরা উত্থাপন করব।

ইদানীং মার্শাল ম্যাকলুহান জ্ঞাপনের মিডিয়াম সম্বন্ধে নানাদিক থেকে আলোচনা করে বুদ্ধিমান পাঠকমহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর একাধিক গ্রন্থে, ১৯৬০-এর দশক থেকে, তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এখনও করছেন।[১] আধুনিক যান্ত্রিক মুদ্রণের অন্যতম প্রবর্তক জার্মান কারুশিল্পী গুটেনবার্গের নামে তিনি মুদ্রণযুগের মানুষকে বলেছেন 'গুটেনবার্গ ম্যান'। ম্যাকলুহানের প্রধান বক্তব্য হল, এই গুটেনবার্গ-মানুষ মুদ্রিত পাঠ্যবিষয়ের সত্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, অনেকটা অজ্ঞাতসারে, যান্ত্রিক জীবনের মানবিক বিকৃতিকে মেনে নিয়েছে। ম্যাকলুহান বলতে চেয়েছেন[২]:

> the visual uniformity of print constitutes a primitive model of industrial technology, and he asserts that by immersing ourselves in information which has been processed in this way we have inadvertently conditioned ourselves to accept, without knowing that we have done so, the dehumanising tyranny of mechanical life. The man who lives in and through print submits without complaint to timetables, lists of weights and measures, formal instruction, and to all the other rationalised fiats of modern life. Gutenberg Man is

punctual, productive and expedient; and since moreover he now receives so much of his knowledge without ever having to face the individual human source, his sense of spiritual community has dwindled even as his technical mastery has flourished.

ম্যাকলুহানের বক্তব্যের মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে, সত্যও আছে, কিন্তু যতটুকু সত্য আছে তা অতিরঞ্জিত। ছাপার হরফে নিজের নাম, নিজের বক্তব্য বা লেখা দেখলে কার না আনন্দ হয়। সংবাদপত্রে নাম ছাপা হলে, নিজের রচনা মুদ্রিত বইতে দেখলে সকলেই খুশি হয়। মুদ্রিত অক্ষরের সুসংযত পংক্তিবদ্ধ ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য সত্যিই মন হরণ করে, এমন কি আচ্ছন্ন করে ফেলে এতদূর যে তার ভিতর থেকে সত্যমিথ্যা বাছাই-যাচাই করার কথা আমরা ভুলে যাই। সারিবদ্ধ সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের দিকে যেমন আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, তেমনি পংক্তিবদ্ধ মুদ্রিত অক্ষরের উপরেও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়, মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছাপা হরফের নিঃশব্দ কুচকাওয়াজে আমরা অভিভূত হই। সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত মানুষকেও বলতে শোনা যায় 'সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে,' 'বইতে লেখা আছে' (ছাপার হরফে), অতএব সত্য। মুদ্রণের মোহজাল ছিন্ন করা সত্যিই কঠিন।

গুটেনবার্গ-মানুষের বিরুদ্ধে ম্যাকলুহানের অভিযোগ তাই একেবারে মিথ্যা নয়, কেবল সত্যটুকু অতিকথিত। মুদ্রণযুগের গুটেনবার্গ-মানুষ কিছুটা যে যন্ত্রের দাস হয়নি তা নয়, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশী মুক্ত মানুষ হয়েছে সে, মুদ্রণের দৌলতে। পাণ্ডুলিপির অতিসংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানবিদ্যা আজ মুদ্রণের মুক্তডানায় ভর দিয়ে বিশাল মানবসমাজের আকাশে বিচরণ করছে। তাতে মানুষের মঙ্গল হয়েছে এবং ব্যক্তিমুক্তি ও সমষ্টিমুক্তির সম্ভাবনাও যে বেড়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। তার জন্য ম্যাকলুহানের লাডাইটসুলভ যন্ত্রবিরোধী অগ্নিমূর্তি অভিনন্দন দাবি করতে পারে না, কারণ যন্ত্র সকল অনর্থের মূল নয়। যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষকে অঙ্গবদ্ধ মেহনতের গোলামি থেকে মুক্ত করার জন্য, নতুন করে যন্ত্রের গোলাম করার জন্য নয়। যন্ত্র যদি বিকৃত হয়ে থাকে, যন্ত্র যদি মানুষকে যান্ত্রিক করে থাকে, তার জন্য যন্ত্র দায়ী নয়, যন্ত্রের মালিক-পরিচালক দায়ী। কোনো রোটারী বা অফসেট মুদ্রণযন্ত্রের গায়ে লেখা নেই যে তাকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ কপি সংবাদপত্র বা বই ছেপে মিথ্যা অথবা কোনো বিষাক্ত অকল্যাণকর ভাবধারা প্রচার করতে হবে। যদি তা করা হয় তাহলে যন্ত্রের পরিচালক তা করেন, যন্ত্র করে না। মুদ্রণযন্ত্রে মুদ্রিত বই বা পত্রিকা যদি কোনো দেশের অর্ধেকের বেশী মানুষ নিরক্ষর বলে পড়তে না পারে, তাহলে তার জন্য কি মুদ্রণযন্ত্র দায়ী, না তার মালিক অথবা সমাজের কর্ণধাররা দায়ী, গুটেনবার্গ-মানুষের বিরুদ্ধে ম্যাকলুহানের বিষোদ্গার তাই যুক্তিহীন।

ম্যাকলুহানের একথা ঠিক যে আদিম সমাজের মৌখিক ভাষার ভাবভঙ্গিধ্বনির আকর্ষণ লেখা বা মুদ্রিত ভাষার চেয়ে অনেক বেশী। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞাপনের সম্পর্ক মৌখিক ভাষার মাধ্যমে অনেক বেশী রূপরসবর্ণময় হয়ে ওঠে, যা মুদ্রিত ভাষার যান্ত্রিক পংক্তিবদ্ধতায় হয় না। ম্যাকলুহান প্রসঙ্গে জোনাথান মিলার বলেছেন[৭]:

> Primitive man who relies almost entirely on oral exchanges, lives therefore in condition of rich imaginative enchantment, his mentality galvanised throughout the length and breadth of its sensory repertoire. According to McLuhan, the invention of writing violated this sacred manifold and forced men to attend to vision at the expense of all the other sensory channels...the message transmitted by manuscript is like a symphonic melody picked out on the violin, while the same idea expressed in spoken words projects the condition of the full orchestral score.

মুদ্রণযুগের মধ্যগগনে পেঁছেও শ্রোতাদের মধ্যে সোজাসুজি বক্তৃতার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আজও বোঝা যায়, মৌখিক ভাষার প্রতিক্রিয়া কত গভীর এবং তার সঙ্গে আঙ্গিক ভাবভঙ্গি শব্দধ্বনি ইত্যাদির সম্পর্ক কত প্রত্যক্ষ। তা বুঝবার জন্য আদিজনসমাজের স্তর পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন হয় না। কথার উল্লম্ব গভীরতা যাই হোক, তার অনুভূমিক সংঘাত খুবই সীমাবদ্ধ এবং মুদ্রিত বইয়ের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হয় না। মুদ্রিত বইয়ের প্রসার-সম্ভাবনা মানবসমাজের দূরদিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই দিগন্ত যদি সুপরিমিত সামাজিক বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার দায় দায়িত্ব বহন করতে হয় সমাজতরীর কাণ্ডারীদের, গুটেনবার্গ অথবা অন্য কোনো মুদ্রককে নয়। সাঁওতালী ভাষা-সংস্কৃতির কথা আগে বলেছি। সম্প্রতি সাঁওতালরা তাঁদের নিজেদের বর্ণমালা উদ্ভাবন করেছেন। এই বর্ণমালা ছাঁচে ঢালাই হয়ে মুদ্রিত সাঁওতালী বই যথেষ্ট সংখ্যক যদি

প্রকাশিত হয়, তাহলে সাঁওতালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারক্ষেত্র নিঃসন্দেহে অনেক বিস্তৃত হবে, যাঁরা সাঁওতাল নন তাঁরা জানতে পারবেন, এবং সাঁওতালী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ও তাঁদের হবে। অগ্রগতি হিসাবে সেটা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু যদি সাঁওতালী বর্ণমালা ও মুদ্রিত ভাষা প্রচলনের পরেও দেখা যায় যে সাঁওতালদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর, তাহলে তার জন্য বর্ণমালা অথবা মুদ্রণ দায়ী হবে না, সাঁওতালী সমাজের প্রধান পরিচালকরাই দায়ী হবেন এবং তাতে অগ্রগতি হবে না, অধোগতিই হবে।

এরকম যুক্তির মধ্যে কোনো হেতুদোষ বা ফ্যালাসি নেই। সরল প্রাঞ্জল যুক্তি। কিন্তু আশ্চর্য হল, ম্যাকলুহান বহুরকমের বিচিত্র সব যুক্তির অবতারণা করেও এই সহজ যুক্তির পথ এড়িয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ যন্ত্রের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেছেন, যে সামাজিক পরিবেশে যন্ত্র উদ্‌ভাবিত হয়ে বিকৃত হচ্ছে তার দিকে ফিরে চাননি। মনে হয় তিনি জ্ঞানপাপী। তা না হলে রেডিওতে কণ্ঠস্বর শুনে এবং টেলিভিশানে চেহারা ভাবভঙ্গির সঙ্গে কণ্ঠস্বর শুনে অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে তিনি ভাবতেন না যে সেই আদিম ট্রাইবাল যুগের জ্ঞাপনের বর্ণাঢ্যতা ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমাবেশ আবার ইলেকট্রনিকযুগে সম্ভব হয়ে উঠছে, মুদ্রণযুগের বিচ্ছিন্ন মানুষ আবার অবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী-বন্ধতার উত্তাপ অনুভব করছে। মামফোর্ড মনে হয় একটু বিদ্রূপ করেই ম্যাকলুহানকে ইলেকট্রনিক যুগের 'পয়গম্বর' বলেছেন। বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হলেও অযৌক্তিক নয়, কারণ মামফোর্ড যন্ত্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী দুই-ই, ম্যাকলুহান কোনটাই নন। মুদ্রণের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্বন্ধে মামফোর্ড বলেছেন[৫]:

> No one worthy of respect seriously doubts the social advantages of multifolding the printed word, for this invention broke down the class monopoly of written knowledge and opened the world in time as decisively as the new explorations that were contemporary with it opened the world of space

ম্যাকলুহানের 'বিশ্বজোড়া গ্রাম' সম্বন্ধে মামফোর্ড বলেছেন[৬]:

> Audo-visual tribalism (McLuhan's 'global village') is a humbug. Real communication, whether oral or written, ephemeral or permanent, is possible only between people who share a common culture —and speak the same language; and though this area can and should be enlarged by personally acquiring more languages and extending one's cultural horizon through travel and active personal intercourse, the notion that it is possible to throw off all these limits is an electronic illusion.

ম্যাকলুহানের ইলেকট্রনিক বিভ্রম নিয়ে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাঁর চক্ষুকর্ণ-ইন্দ্রিয়নির্ভর বিশ্ব-গ্রামের ইলেকট্রনিক স্বপ্ন যেদিন বাস্তব সত্যে পরিণত হবে সেদিন 'বিশ্ব' অথবা 'গ্রাম' কোনটারই অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ।

ছাঁচেঢালা সচল অক্ষরের মুদ্রণকাল জার্মান স্বর্ণকার গুটেনবার্গের সময় থেকে পাঁচশো বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আধুনিক মুদ্রণরীতির এই কৃতিত্ব জার্মানির গুটেনবার্গের প্রাপ্য কি না তা নিয়েও মুদ্রণবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কাঠের ব্লক থেকে ছাপা, হাতে তৈরি কাগজ থেকে যন্ত্রে তৈরি কাগজ, চীনদেশেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। ব্লকপ্রিন্টিং-এর মতো সচল টাইপপ্রিন্টিংও চীনে একাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয় এবং পি শেঙ নামে একজন কারুশিল্পী ছাঁচেঢালা অক্ষরে মুদ্রণের প্রথা আবিষ্কার করেন। কিভাবে অক্ষর ছাঁচেঢালাই করে ছাপার জন্য ব্যবহার করতে হবে, সেকথাও তিনি লিপিবদ্ধ করে যান এবং বৈজ্ঞানিক শেন কুয়া (১০৩২-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) তার বিবরণ দেন তাঁর 'মেঙ চি পি তান' নামে বইতে।[৭] এক্ষেত্রে আমাদের ভারতের দানও কম নয়। বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও টেকনোলজির প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস কতটা ভারত ও চীনের মতো এসিয়ার প্রাপ্য এবং কতটা ইউরোপের প্রাপ্য, তার বিজ্ঞানসম্মত বিচার আজও হয়নি। তা সত্ত্বেও আধুনিক মুদ্রণের আদিপর্বের ইতিহাসে গুটেনবার্গ, নিউমিস্টার, মেনটেলিন, জন ও ওয়েনডেলিন (ভেনিস), জ্যঁ দুপ্রে ও আঁতোয়া ভেরাদ (ফ্রান্স) প্রমুখ প্রিন্টারদের দান স্মরণীয়। প্রথমদিকে মুদ্রক-প্রকাশকদের অনেক রকমের বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির লিপিকররা (কপিস্ট) বাধা দিয়েছেন, যেমন অনেক ক্ষেত্রে কারুশিল্পীরা নতুন উৎপাদনযন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন। মধ্যযুগের শাসকশ্রেণী ও অভিজাতশ্রেণী মুদ্রণের ব্যাপারটাকে আদৌ সুনজরে দেখেননি। তাঁদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারকে তাঁরা সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের নিদর্শন বলে মনে করতেন এবং লিপিকরদের হাতেলেখা পুঁথি-পাণ্ডুলিপির সংগ্রহকে তাঁরা মণি-

মনুক্তার অলঙ্কারসম্ভার ভাবতেন। কার সংগ্রহে কত দুষ্প্রাপ্য এবং সংখ্যায় কত বেশী পুঁথি-পাণ্ডুলিপি আছে তাই দিয়ে মর্যাদার বিচার করা হত। পেটের অন্নের দায়ে লিপিকররা শুধু ছাপাখানার বিরোধিতা করেননি, ধনিক অভিজাতরাও সামাজিক মর্যাদালোপের আশংকায় মুদ্রকদের কাজকর্মে ও প্রভাববিস্তারে বাধা দিয়েছেন। ডিউক ফেডেরিগোর মতো অনেক লর্ড ডিউক মনে করতেন[৭]:

> In his splendid library all books were superlatively good and written with the pen; had there been one printed book, it would have been ashamed in such company.

মুদ্রণের প্রতি অভিজাতদের বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা অপসারণ করতে অনেকটা সাহায্য করেছেন জেল্‌দগররা (বাইন্ডার)। অনেক মুদ্রিত বই খুব চমৎকার করে বাঁধিয়ে তাঁরা ধনিকদের গ্রন্থাগারে পাঠিয়েছেন। সুদৃশ্য মহার্ঘ্য বাঁধাইয়ের পরে কুশ্রী অপাঠ্য আদিপর্বের ছাপা বই অভিজাতদের গ্রন্থাগারে পুঁথি-পাণ্ডুলিপির পাশে স্থান পেয়েছে।[৮]

> It was the binders rather than the printers who overcame the reluctance of highbrow connoisseurs in admitting printed books to their stately shelves; and down to the present the sumptuousness of choice bindings frequently contrasts oddly with the shoddiness of printing and the worthlessnes of contents thus bound.

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের অগ্রগতির পথে অনেক বাধা এসেছে দেখা যায়। সেইসব বাধা অতিক্রম করে ছাপা বাংলা বই ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে যে রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাংলা মুদ্রণের বিকাশ হয়েছে, তার সঙ্গে ইউরোপীয় পরিবেশের পার্থক্য অনেক। প্রধান পার্থক্য হল, আমাদের দেশে আধুনিক মুদ্রণের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ পরাধীন ঔপনিবেশিক পরিবেশের মধ্যে হয়েছে, যেটা কোনদিক থেকেই তার অগ্রগতির অনুকূল নয়।

প্রথম ছেনিকাটা ছাঁচেঢালা বাংলা অক্ষর হলহেডের ব্যাকরণে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত হলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা দেশে বেশ কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপিত হয় এবং তাতে শুধু বই নয়, সংবাদপত্রও মুদ্রিত হতে থাকে। বাংলা অক্ষরমুদ্রণের দুশ বছর ১৯৭৮-এ পূর্ণ হলেও এর দুবছর পরে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রের দুশ বছর পূর্ণ হল; কারণ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাস্টাস হিকি যখন এদেশের **প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট'** ইংরেজীতে প্রকাশ করেন তখন তার প্রসপেকটাসে তিনি লেখেন[৯]:

> This paper is set on foot with that design and to bring into one *Focus*, or immediate point of view, the numerous notices, advertisements etc. now handed about by Harcarrahs in Manuscript—

ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জেমস হিকি বেশ একটু মাথাপাগলা লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং সাংবাদিকের সেটা বড় গুণ। দেনার দায়ে হিকি প্রায় লালবাজারে জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকতেন এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে অ্যাটর্নি হিকির প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে জেলখানায় জেমস হিকি প্রিন্টিং সম্বন্ধে একখানি বই হাতে পান এবং সেই বই পড়ে তাঁর প্রিন্টার হবার বাসনা হয়। অনেকদিন ধৈর্য ধরে পরিশ্রম করে হিকি এক সেট ছাপার হরফও তৈরি করেন এবং তাই দিয়ে ছাপাখানার ব্যবসাও করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকা জমিয়ে বিলেত থেকে তিনি ছাপাখানার যন্ত্রপাতি টাইপ ইত্যাদি অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে কিছু বিলাতি ওষুধও আমদানি করেন ডাক্তারী করবেন বলে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাংবাদিক হবার ইচ্ছা হয় এবং একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। সংবাদপত্রের নাম হল:

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertifer.
A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None,

বাঁকাহরফে মুদ্রিত কথাগুলি (হিকির নিজস্ব), সকলেই জানেন, গুরুত্বের জন্য বাঁকানো। সকল দলের জন্য এবং কারও শ্বারা প্রভাবিত নয় এমন একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হিকি। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার শেষে প্রিন্টার্স লাইনে লেখা থাকত:

CALCUTTA, Printed by J. A. HICKY, *first* and late PRINTER, To the HON. COMPANY

এখানেও 'ফার্স্ট' কথাটির উপর গুরুত্ব লক্ষণীয়। প্রেসের ঠিকানা নেই, মনে হয় লালবাজার অঞ্চলে কোথাও হিকির প্রেস ছিল। প্রিন্টার এডিটার ফিজিসিয়ান হিকির নাট্যশালা প্রতিষ্ঠারও বাসনা হয়েছিল। নাট্যকারও তিনি ছিলেন। তাঁর পত্রিকার একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় তিনি লিখেছেন[১০]:

> MR. HICKY, begs leave to inform his friends and the Public in Gen'l that he will speedily (at the solicitation of several Ladies and Gentlemen of Distinction) open a subscription for erecting a NEW THEATRE in Calcutta, and as he is well versed in the Sock and Buskin, having practiced when at School, and tho' many years has elapsed since that time, yet he hopes by their friendly Indulgence, he will soon be able to render some entertainment.
>
> He is now writing out a Comic, Tragic Play call'd the Medly of Mortals, wherein during the space of two Acts Tyranny Triumphs over the Virtue. At Length the plot is discovered and Virtue Triumphs and the captive Mortals are brought to Public view loaded with chains, and disgrace.

নাটকের বিষয়বস্তুর বিবরণ থেকে মনে হয়, হিকি নাটকটি লিখেছিলেন। তাঁর প্রতিপাদ্য হল ধর্মের জয়, ন্যায়ের জয়, অধর্ম ও অন্যায়ের পরাজয়। নাটকের অভিনয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এই নাট্যশালা ও নাটকের বিজ্ঞপ্তির মধ্যেও হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' পত্রিকার আদর্শের কথা জানাতে ভোলেননি। তিনি লিখেছেন:

> As the original Bengal Gazette, will in future abound with lively and entertaining matter, and that the most secret and oppressive transactions if properly authenticated and supported shall be inserted without any regard being paid to the oppressors, or the rank they may bear.

হিকির সাংবাদিক শালীনতার স্তর উচ্চাঙ্গের ছিল না, তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রায় তার শোভন সীমা লঙ্ঘন করে যেত। কিন্তু তাঁর কালের কথা মনে রেখে এই ত্রুটি ক্ষমা করা যেতে পারে। মুদ্রণের কয়েকটি যুগবৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার জন্য তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। মুদ্রণের ফলেই আমাদের দেশে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের আবির্ভাব সম্ভব হল, পুথি-পাণ্ডুলিপি থেকে বই প্রকাশ ও প্রচার করাতেও কোনো বাধা রইল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তো বটেই, রাজনীতির সংবাদ, শাসকদের কার্যকলাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সংবাদ, দেশের নানাবিধ ঘটনা, যা মুদ্রণপূর্ব যুগে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জানার অথবা জানাবার উপায় ছিল না, তা জানা ও জানানো মুদ্রিত সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রচারের ফলেই সম্ভব হল। প্রথমদিকে এই প্রচারক্ষেত্রের সীমানা খুবই সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মুদ্রণের দান সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচলতার কথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন ১৭৮০ সালে হিকির ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা কজন কিনতেন বা পড়তেন, অর্থাৎ তার প্রচারসংখ্যা কত ছিল? কয়েকশ মাত্র, খুব বেশী হলে চার-পাঁচশর বেশী নয়। কারা পড়তেন? কলকাতা শহরের সাহেবরাই বেশী, কয়েকজন ধনিক অভিজাত বাঙালী ও ভারতীয়, যাঁরা কয়েক ডজন ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করে তৎকালে ইংরেজী বিদ্যায় 'পণ্ডিত' বলে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মোগল আমলের হাতেলেখা সংবাদলিপির আমলে, যা হরকরারা বহন করে নিয়ে যেত, সংবাদের এই সামান্য সচলতাও সম্ভব ছিল না। হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি-সংবাদলিপির আমলের সামাজিক অচলতাকে মুদ্রণযন্ত্র ভেঙে দেয় এবং জ্ঞাপনের পথ প্রশস্ত করে। মুদ্রণের ফলে জ্ঞাপনের স্বাধীনতাও সমাজে স্বীকৃত হয়, যা তার আগে, মানুষের কাছে কল্পনাতীত ছিল। হিকির পত্রিকার আদর্শ ঘোষণার মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্যই প্রকাশ পেয়েছে এবং এই জ্ঞাপনের স্বাধীনতাই মুদ্রণযুগের সবচেয়ে বড় দান।

বাংলা বই ও পত্রিকা নিয়মিতভাবে ছাপা যখন আরম্ভ হল উনিশ শতক থেকে, তখন বাংলার সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল উন্নয়ন ও সংস্কারসাধনে যাঁরা অগ্রসর হলেন—রামমোহন,

ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর ও তাঁর উত্তরসূরীরা—তাঁদের সংগ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকা, জনসভায় বক্তৃতা নয়, কারণ এরকম বক্তৃতার রেওয়াজ তখন ছিল না।[১১] রামমোহন, ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠী, বিদ্যাসাগর, সকলেই মুদ্রণযন্ত্রের পোষক ছিলেন। এমনকি নিজেরা কেউ কেউ মুদ্রণ-প্রকাশন বাণিজ্যে উদ্‌যোগীও হয়েছেন, যেমন বিদ্যাসাগর।[১২] কাজেই মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রিত বাংলা বই-পত্রিকার সাহায্যে তাঁরা যে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ব্যসার্ধ কিছুটা অন্তত বিস্তৃত করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তার জন্য বাংলার ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রগতিও সাধারণভাবে খানিকটা সম্ভব হয়েছে, জীবনের গতি জনসমাজমুখী হয়েছে। কিন্তু জনসমাজমুখী কতদূর হয়েছে, তার পথের অন্তরায়গুলিই বা কতখানি অপসারিত করা সম্ভব হয়েছে, সেটাও বিচার্য বিষয়।

অন্তরায় অনেক ছিল এবং ইউরোপের চাইতে বেশী, কারণ ইউরোপীয় সমাজের গড়ন আর আমাদের সমাজের গড়নের পার্থক্য অনেক। আমাদের দেশেও পুথি-পাণ্ডুলিপির লিপিকররা মুদ্রণের আবির্ভাবকে সুনজরে দেখেননি, পুথিপাটার চিত্রকররা শংকিত হয়েছেন। তাঁদের পৃষ্ঠ-পোষক রাজামহারাজারা, জমিদাররা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা মুদ্রিত বইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, বিশেষ করে শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ মুদ্রণ অশাস্ত্রীয় ধর্মবিরোধী ব্যাপার বলে প্রতিবাদও করেছেন। তৎসত্ত্বেও রামমোহন বিদ্যাসাগর কেউ মুদ্রণ বর্জন করেননি এবং ক্রমেই তার প্রচলনের পথ প্রশস্ত করেছেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকার মূল্য ছিল অত্যধিক এবং বইয়ের দোকানও বিশেষ ছিল না। প্রকাশকের বাড়ি থেকে অথবা ছাপাখানা থেকে বই কিনে নিয়ে আসতে হত। এই কারণে বাংলা বই ছাপা হলেও তার প্রসার বা প্রচার তেমন হত না এবং তার ফলে তার জনসমাজমুখী গতি খুবই মন্থর ছিল। উনিশ শতকের প্রথমপর্বের মুদ্রিত বাংলা বই সম্পর্কে যে কয়েকটি নির্বাচিত সংবাদ এখানে আমরা উল্লেখ করছি, তা থেকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা খানিকটা পরিষ্কার হবে।[১৩] সংবাদগুলি প্রাচীন পত্রিকা থেকে সংকলিত হলেও আধুনিক ভাষায় সংক্ষেপিত।

জুলাই ১৮১৮। পীতাম্বর শর্মা জানাচ্ছেন যে অমর সিংহকৃত অভিধান অকারাদিক্রমে ছাপা হয়েছে। ৪৯২ পৃষ্ঠার বই। মূল্য ছয় টাকা। যাঁর নেবার ইচ্ছা তিনি উত্তরপাড়ায় দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অথবা রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভায় চেষ্টা করলে পাবেন।

অক্টোবর ১৮১৮। ইংরেজী বিদ্যা সহজে শেখা যেতে পারে এরকম বই ছাপা হয়েছে বাংলায়। 'চামড়া বন্ধ জেলদ করা'—মূল্য 'ফি কেতাব ৩ টাকা।' যাঁর কেনার বাসনা তিনি কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের আফিসে অথবা শ্রীরামপুরে কাছারীবাড়ির কাছে 'শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের' বাড়ীতে খোঁজ করবেন।

অক্টোবর ১৮১৯। উইলসন সাহেবের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান ছাপা হয়েছে, ৯১১৬ পৃষ্ঠার বই। মূল্য ইংলিশ কাগজে ছাপা ১০০ টাকা, পাটনাই কাগজে ছাপা ৮০ টাকা।

ফেব্রুয়ারি ১৮২২। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা বইয়ের দাম এই:

সংস্কৃত

ইংরেজীসহ রামায়ণ, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ	: প্রতি খণ্ড ৩০ টাকা
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	: ৪ টাকা
সাংখ্যসার	: ৬ টাকা

বাংলা

কেরী সাহেবের ইংরেজীসহ ব্যাকরণ	: ৪ টাকা
বত্রিশ সিংহাসন	: ৫ টাকা
রাজাবলী	: ৫ টাকা

জানুয়ারি ১৮২৫। আড়পুলির ছাপাখানায় বারাণসী আচার্যের ছাপা

কালীর সহস্র নাম	: ১ টাকা
বিষ্ণুর সহস্র নাম	: ১ টাকা
রাধিকার সহস্র নাম	: ১ টাকা

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃতসহ উত্তম কাগজে ছেপেছেন। পত্রসংখ্যা ৫০৫, মূল্য ১৬ টাকা। মনুসংহিতারও বাংলা অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। 'গ্রাহকের অভাবে মনু ছাপা না হয় এ বড় খেদের বিষয়। যদি মনু জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন।'

আগস্ট ১৮২৭। চন্দ্রিকাযন্ত্রের মালিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত মুদ্রণের পরিকল্পনা করে জানাচ্ছেন: শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ 'তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারা মত

পুস্তকের পাত' করে 'ব্রাহ্মণস্বারা মুদ্রাঙ্কিত' করা হবে। মূল্য গ্রাহকদের জন্য ৩২ টাকা, সাধারণের জন্য ৫০ টাকা।

জানুয়ারি ১৮৩০। গত বছরে (১৮২৯) প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বিবরণপ্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা লিখছেন যে, এদেশে কেবল ১৬ বছর হল বাংলা বই ছাপা আরম্ভ হয়েছে। গত বছর বাংলা ভাষায় ৩৭ খানা বই ছাপা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি ছোট পুস্তিকা আছে। ছাপা বাংলা বইয়ের 'অধিকাংশই হিন্দুদের ধর্মসংক্রান্ত।'

১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের যুগের প্রায় শেষ এবং ইয়ং বেঙ্গল-যুগের সূচনা বলা যেতে পারে। এই সময়টাকে বাংলা মুদ্রণের আদিপর্ব বলা যায়। দেড়শ বছর আগেকার কথা। তখন বেশীর ভাগ ধর্মসংক্রান্ত বই ছাপা হত, বইয়ের দাম বেশী ছিল, গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়েও অনেক বই ছাপা হত, বই বিক্রির ভাল ব্যবস্থা ছিল না, প্রচারও তেমন হত না, পুথির আকারে ব্রাহ্মণ মুদ্রক দিয়েও ধর্মগ্রন্থ ছাপা হত। যখন একজন লোকের পেটভরে একমাস খেতে খরচ হত তিনটাকা থেকে পাঁচটাকা, তখন ৫০ টাকা মূল্য দিয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবত কিনে পাঠ করা অথবা ৫ টাকা দিয়ে 'বত্রিশ সিংহাসন' কেনা এমনকি ১ টাকা দিয়ে কালী বা বিষ্ণু বা রাধিকার সহস্রনাম জানার আগ্রহ সমাজের কজনের থাকতে পারে তা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। কলকাতার বাইরের গ্রামাঞ্চলের কথা না বলাই ভাল। কলকাতা শহরের মধ্যেও সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের খুবই ক্ষুদ্রাংশ বাংলা বই কিনে পড়তে আগ্রহী হতেন। কিন্তু মুদ্রিত বইয়ের জন্য 'সাধারণ গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, যা পুথি-পাণ্ডুলিপির যুগে সম্ভব ছিল না। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ফলে বইয়ের পাঠকসংখ্যা বাড়ে, যাঁরা বই কিনতে পারেন না তাঁরা গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে বই পড়তে পারেন। কলকাতায় 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' ১৮৩৫ সালেই স্থাপিত হয় এবং এই গ্রন্থাগার পরিচালনার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকরা খানিকটা পাঠকদের পাঠাভ্যাসে ও পাঠরুচি পরিবর্তন করতে পারেন। গুরুবিষয়ের বই কিনে, লঘু বিষয়ের উপর গুরুত্ব না দিয়ে, তাঁরা পাঠকদের পাঠ্যবিষয়ে রুচি কিছুটা বদলাতে পারেন।[১৫] উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন নগরে ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, এবং তার ফলে বাংলা বইয়ের সাংস্কৃতিক প্রভাবের ক্রমবিস্তার সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু তা সম্ভব হলেও একথা অনস্বীকার্য যে তার ব্যাসার্ধ খুব বেশী বাড়েনি। তার প্রধান কারণ, সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসার হয়নি, এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাব।[১৬] মুদ্রণের স্বাধীনতা অপব্যবহার করে অনেক মুনাফালোভী প্রকাশক রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রভৃতি যৌন-বিষয়ের সচিত্র বই ছেপে স্বল্পশিক্ষিত পাঠকদের রুচিবিকৃতিতে সাহায্য করেছেন। রেভারেন্ড লং তাঁর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা বইয়ের হিসাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে অশ্লীল যৌনবিষয়ের একটি বই, ২০ খানা চিত্রসহ, এক বছরে তিরিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই সমস্যা ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কি আরও বেশী ভয়াবহরূপে প্রকট নয়? এই একই সমস্যা বর্তমানে অনেক বেশী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা তো বটেই, বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণী মুদ্রণের স্বাধীনতা ও প্রসারক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণের পাঠ্যবিষয় ও রুচি যে কতদূর পর্যন্ত বিকৃত বা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলতেই হয় যে ম্যাকলুহানের 'গুটেনবার্গ মানব' বাস্তবিকই মুদ্রণযুগে দানবের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার সমাধান ম্যাকলুহানের ইলেকট্রনিক যুগের রেডিও-টেলিভিশানের 'গ্লোবাল গ্রামের' পুনরাবির্ভাবে সম্ভব নয়। সম্ভব শুধু শ্রেণীস্বার্থপূর্ণ মুনাফালোভ-মুক্ত জনকল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। তাহলে মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণযন্ত্রীদের স্বপ্ন সার্থক হবে এবং তার সাংস্কৃতিক প্রভাব সমাজের সর্বজনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হবে।

নির্দেশিকা

১ McLuhan, Marshall · *Explorations in Communications*, with E. S Carpenter. Boston 1960
· McLuhan. *The Gutenberg Galaxy*: *The Making of Typogra-*

phic Man. London 1962

McLuhan : *Understanding Media : The Extensions of Man*. London 1964

McLuhan : *The Medium is the Massage : An Inventory of Effects*. With Quentin Fiore. London 1967

২ Miller, Jonathan. *McLuhan*. Fontana Modern Masters London 1971. Introduction, p. 10

৩ Ibid. pp. 9-10

৪ Mumford, Lewis. *The Myth of the Machine* New York 1970, p 140

৫ Ibid. p. 267

Mumford. *Technics and civilisation*. London 1934, pp 135-36

৬ Liu Kuo-Chun. *Story of the Chinese Book*. Peking 1958

৭ Steinberg, S. H. *Five Hundred Years of Printing* Penguin 1974, p. 44

৮ Ibid. pp. 44-45

৯ হিকির সংবাদপত্রের পরিকল্পনা *'Proposals'* নামে ছাপা হয়। লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে গৃহীত

১০ *Bengal Gazette*, December 2, 1780 । লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ

১১ বিনয় ঘোষ: জনসভার সাহিত্য নতুন সংস্করণ ১৯৭৮ দ্রষ্টব্য

১২ বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড

১৪ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার। কলিকাতা ১৩৭০। তৃতীয় অধ্যায়

১৫ Burns Tom and Elizabeth, ed *Sociology of Literature and Drama*, London 1973

এই গ্রন্থের 'Readers and Audiences' বিভাগ দ্রষ্টব্য

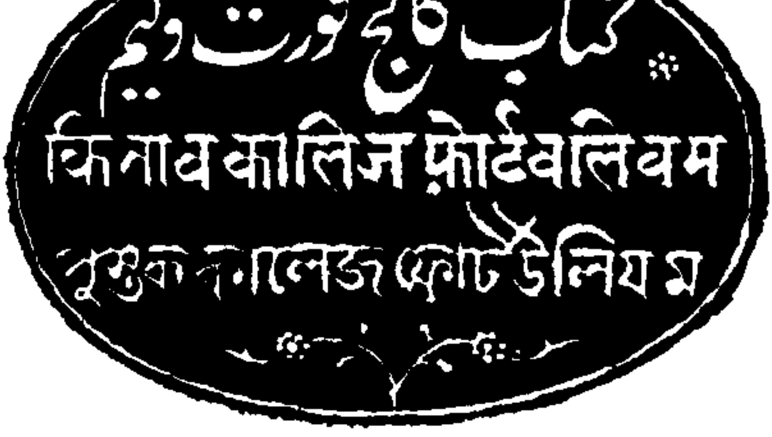

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি ।

এতদ্দেশি বিষয়ি লোকেরা স্বকীয় ভাষার শুদ্ধরূপে লিখনে ও শব্দার্থবোধে ও নানা দেশীয় বিবরণ জ্ঞানে প্রায় অনেকে অপটু ছিলেন। তাহার কারণ এই যে সংস্কৃতে অসংস্কৃত লোকের দিগের শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ দুর্ঘট এবং বালক কালাবধি ধং শিক্ষকের নিকট শুদ্ধ লিখন পঠনাদি হইলে ও তৎসংস্কার বশতঃ লোকেরা শুদ্ধ লিখনাদি ক্ষম হইতে পারেন পূর্বে তাহা ও অত্যল্প ছিল এবং বঙ্গ ভাষাতে দেশ বিভাগ বিবরণার্থে কোন পুস্তক ও রচিত ছিল না সুতরাং এতদ্দেশীয়েরা শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ ও অন্য দেশবৃত্তান্ত জ্ঞানে অপটু প্রায় এবং অন্ধান্ধ সদৃশ হইয়া অর্থকরী কিঞ্চিদ্বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কাল ক্ষেপ করিতেন।

এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক শুদ্ধীকৃত মুদ্রিত পুস্তক ও প্রচলিত ছিল না যে তত্তমুদ্রিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাঁহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে ক্ষমাতাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রবৃত্ত হইয়া কামসংবর্দ্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকের-

এই নতুন হরফের পরিকল্পনা করেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের পিয়ার্স সাহেব ১৮২০ খ্রীঃ নাগাদ

প্রকাশনী

অনুবাদ-সাহিত্যঃ একটি সমীক্ষার খসড়া

অরবিন্দ পোদ্দার

"দূরের সঙ্গে নিকটের, অনুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অনুভবশক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি, মানুষ ততখানি বড়ো।"[১]—লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মন-চলাচলের জন্য যে সামাজিক মনোভূমির কর্ষণ প্রয়োজন, তার সূত্রপাত হয়েছিল ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে বাহির বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। বিশেষতঃ, এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন ও বিস্তারের পথেই ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর, এবং গুণগত দিক থেকে সম্পূর্ণ অভিনব এক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল। যেসব কারণে সমাজ-মানস গতিশীলতা অর্জন করেছিল, রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কের রূপান্তর ছাড়াও, তাদের অন্যতম ছিল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন, ও পরাভূত জাতির পক্ষ থেকে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে অন্বিত থাকার প্রয়োজন,—এই উভয়বিধ গরজেই ভাষা ও সাহিত্যগত আদানপ্রদানের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি রাষ্ট্র জয়ের উল্লাস ও ঔদ্ধত্যের মধ্যেও ঐ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ওয়ারেন হেস্টিংসকে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট লিখতে দেখি: সর্বপ্রকার জ্ঞানসঞ্চয়, বিশেষ করে যুদ্ধজয়ের অধিকার বলে যাদের উপর আমরা আধিপত্যের কর্তৃত্ব করে থাকি, তাদের সঙ্গে সামাজিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান রাষ্ট্রের নিকট আশু প্রয়োজনীয়; সমগ্র মানবজাতিরই এতে লাভ; আর আমি যে বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি, সেক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত অনুরাগকে আকর্ষণ ও বশীভূত করে; যে পরবশ্যতার শৃঙ্খলে আমরা এ-দেশীয়দের শাসন করি, সে ভার তা লাঘব করবে; আর আমাদের স্বদেশীয়দের মনে মহানুভবতার বোধ ও দায়িত্ব উদ্বুদ্ধ করবে।[২]

সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন মহানুভবতার ভাষাকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়েছে সত্য কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলশ্রুতিকে বোধ করি কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে বুদ্ধিগত বিচারে আমাদের জন্মান্তর ঘটেছিল; অনুভবে, উপলব্ধিতে, ভাবাদর্শের অনুশীলনে, এবং সাহিত্যকর্মে আমরা বিস্তৃততর, সমৃদ্ধতর, এবং সংবেদনায় অধিকতর মানবিক হতে

শিখেছিলাম। আর, রবীন্দ্রনাথ যে দেশের অনুভবশক্তিকে ব্যাপ্ত করার কথা বলেছিলেন, নানাভাবে তার সূত্রপাত হয়ে থাকলেও এর অন্যতম বাহন ছিল অচেনা ভাষা থেকে রক্তে-চেনা ভাষায় ভাষান্তর বা অনুবাদ। অনুবাদকে যদি আমরা শুধুই প্রতিধ্বনি বলে গণ্য করি এবং যদি একথাও অনায়াসেই মেনে নিই যে, ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনির যে পার্থক্য তা অনুবাদে থেকেই যাচ্ছে, তাহলেও কত বিচিত্রভাবে যে অনুবাদ আমাদের মনের ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে নতুন সাম্রাজ্য পত্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে, এবং দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নাদর্শী সমাজ-সংস্কৃতির সংঘাতের লগ্নে।

যে পরিবেশে বাংলা অনুবাদগ্রন্থের ঐতিহাসিক আবির্ভাব, তাতে দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই এর বিকাশ ঘটেছিল বলে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়: ১ উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ প্রয়োজনসিদ্ধি, এবং ২ বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টিশীল মানসবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় সংঘটন, ও সেই পথে বোধ-বুদ্ধি-মনন-কল্পনার বিস্তারে সহায়তা। প্রথমোক্ত পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবীরূপেই আসে রাষ্ট্রশাসনের পক্ষে অপরিহার্য আইনকানুন, রীতিনীতি, নির্দেশনামা ইত্যাদির অনুবাদ। সম্ভবতঃ, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অনূদিত গ্রন্থগুলোকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করতে পারি; কেন না, ধর্মান্তরের উপস্থিত গরজেই তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে কাব্য-কাহিনী-উপাখ্যান জাতীয় রসসমৃদ্ধ ও ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি মননসর্বস্ব সাহিত্যের অনুবাদ, যা পাঠককে বৃহৎ মনের সংস্পর্শে আনে, তার হৃদয়ে আনে অভূতপূর্ব রসাস্বাদনের আনন্দ আর চিন্তামননে ঘটায় রূপান্তর। উনবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই এই জাতীয় গ্রন্থ বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে, এবং বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়।

প্রসঙ্গতঃ অনুবাদের সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটুকু স্মরণীয়। বিভিন্ন ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষা থেকে ভাষান্তরিত হয়ে বাংলায় যে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছিল তা থেকে এটা নিশ্চিত প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে শিক্ষিতের সংখ্যা অথবা হার যাই থাক না কেন, বাংলার সমাজমানস তার আত্মনিমগ্ন তন্ময়তা থেকে মুক্তি লাভ করছে; অনুবাদ তাকে ভৌগোলিক দূরত্ব জয় করে বিশ্বমানসের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার অবকাশ এনে দিচ্ছে, তার বিচরণক্ষেত্র হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। অনুবাদ সম্পর্কে এটাই বোধ করি চরম কথা, বহু দূরবস্থিত পৃথিবীকে তা মনের অনুভবের নিকট সম্পর্কে বাঁধে, মানব-অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য দিয়ে হৃদয়কে প্রসন্নতর করে, এবং অনুচ্চারিত এ তত্ত্বটুকু সে বলে যায় যে, মানব-বিশ্ব এক এবং অবিভাজ্য। সভ্যতার বিকাশে ও মানবিক সম্পর্কের বিচারে এই তার নিশ্চিত অবদান। কোন দেশ যতদিন আপন সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং সে জন্য সমাজমানসের বিচরণভূমি হয় সংকীর্ণ, ততদিন সে দেশে অনুবাদ-সাহিত্যের কোন অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন প্রাচীন গ্রীস অথবা ভারত। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগের পথেই সাংস্কৃতিক যোগবিয়োগ অতএব অনুবাদের আবির্ভাব।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হল। স্বভাবতঃই, পূর্ণতার দাবি এর নেই; এমন কি, বিশিষ্ট অনুবাদক ও অনূদিত গ্রন্থ অনুল্লেখিত থাকাও বিচিত্র নয়। লেখকের সবিনয় নিবেদন, তেমন কিছু ঘটে থাকলে তার কারণ শুধুই অনবধানতা।

২

গদ্য-সাহিত্যের বিবর্তনে যেমন, অনুবাদেও ইংরেজ লেখকবৃন্দ অগ্রচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, এর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ছিল রাষ্ট্রশাসনের উপস্থিত গরজ। তাই, বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থটিও একটি সরকারী আইনের বিশদ অনুবাদ, যা 'ইম্পে কোড' নামে পরিচিত। পাঁচ-ছয়টি ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী জোনাথান ডানকান, পরবর্তীকালে বোম্বাই-এর গভর্নর, এটি অনুবাদ করেন। বাংলায় গ্রন্থটির পরিচিতি ছিল এইরূপ: "মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম।" সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত, প্রকাশকাল ১৭৮৫।[৩] দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ দুটিও সরকারী আইনের অনুবাদ, অনুবাদক এন. বি. এডমনস্টোন; প্রথমোক্তটি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ফৌজদারী আদালতে কার্যকর ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত ফৌজদারী আইনের ভাষান্তর, প্রকাশকাল ১৭৯১। আর, পরেরটি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব বিভাগের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রচারিত জেলাশাসকদের প্রতি নির্দেশাবলী। প্রকাশকাল ১৭৯২।[৪] এর পরের গ্রন্থটিও একটি আকর আইন গ্রন্থের অনুবাদ, নাম 'কর্নওয়ালিশ কোড'; অনুবাদক এইচ. পি. ফরস্টার, যিনি ছিলেন কোম্পানীর অধীনস্থ একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু যিনি বাংলা-ইংরেজী, ইংরেজী-বাংলা অভিধান সংকলন করে যশস্বী হয়েছিলেন। আলোচ্য আইনগ্রন্থটির আখ্যাপত্রে লিখিত হয়েছিল: "শ্রীযুক্ত নবাব গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কৌন্‌সেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গবর্নর

জেনারেল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাতে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৭৯৩।" এই গ্রন্থটি ছিল একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ, বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় বাংলা ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় ইংরেজী ধারাগুলো মুদ্রিত হয়েছিল।

এর পরেই আমরা প্রবেশ করি কেরী যুগে, এবং গদ্যসাহিত্যের তীর্থস্থান শ্রীরামপুরে। শ্রীরামপুরে আমরা যে কর্মোদ্যোগ প্রত্যক্ষ করি, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি চিত্তাকর্ষক; কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। প্রতিনিধিস্থানীয় দু' চার জনের নিরলস প্রচেষ্টার উল্লেখ করেই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা করব। প্রথমেই উচ্চারণ করতে হয় সেই বিচিত্র মনীষার অধিকারী উইলিয়াম কেরীর কথা। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেই তিনি বাংলা ভাষার কমনীয়তা ও মনোহারিত্বে আকৃষ্ট হন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তা শুধু আয়ত্তই করেননি, ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি পর্ব বাদে সমগ্র বাইবেল গ্রন্থটি অনুবাদও করে ফেলেন। দশ হাজার সংখ্যক বই ছাপানোর বিপুল ব্যয়ভার সম্বন্ধে বিচলিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুর কাছ থেকে কাঠে-তৈরি একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার পেয়ে কেরী উৎসাহিত হন। মুদ্রাযন্ত্রটি প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় মদনাবাটীতে, সেখান থেকে পাকাপাকিভাবে কেরী সব নিয়ে চলে আসেন শ্রীরামপুরে। এখানে সহকর্মীদের সহায়তায় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয়; ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০২ থেকে ১৮০৯-এর মধ্যে। কেরীর আগে জন টমাস অংশতঃ বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং জন এফ. এলারটনও নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেছিলেন; কিন্তু টমাস কেরীর কাছ থেকে অনুবাদকর্মে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন, এবং এলারটনের গ্রন্থ ১৮১৯-এর পূর্বে মুদ্রিত হয়নি বলে ডঃ দে উল্লেখ করেছেন।[৫] সে বিচারে কেরীর ভূমিকাই অগ্রচারীর। তাঁর অনুবাদের নমুনা: "প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তি অন্ধকার বিভিন্ন করিলেন। ঈশ্বর ও দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি। সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে হইল প্রথম দিবস।"

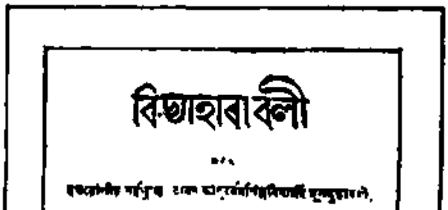
বিদ্যাহারাবলী
BENGALEE ENCYCLOPÆDIA.
COMPARATIVE ANATOMY
SERAMPORE

ফেলিক্স কেরী কর্তৃক সংকলিত; ১৮২০

তাঁর পুত্র ফেলিক্স কেরীর দানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বাংলায় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মত একটি কোষগ্রন্থ রচনার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছিল তাঁর, এবং ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি পূর্বোক্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার অংশবিশেষ (ব্যবচ্ছেদবিদ্যা) অনুবাদ আরম্ভ করেন। বাংলা গদ্যের সেই অসহায় শৈশবাবস্থায় তিনি দু' একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও পিতার সহায়তায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার দুরূহ ভাবার্থবাহী পরিভাষা সৃষ্টি করে ঐ কাজ সম্পন্ন করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের অকটোবর থেকে আরম্ভ করে প্রতি মাসে এক খণ্ড করে মোট চৌদ্দ মাসে ঐ অনুবাদ 'বিদ্যাহারাবলী' নামে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৮। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্র ছিল এইরূপ: "ব্যবচ্ছেদবিদ্যা।/ফিলিক্স কেরিকর্তৃক/পঞ্চমবারছাপাকৃত এনসক্লোপেদিয়াব্রিটানিকাম-গ্রন্থাবলী হইতে বাংলাভাষায় কৃত/গরিষ্ঠ উলিয়াম কেরিকর্তৃক তর্জমাবিবেচিত/শ্রীকান্তবিদ্যালঙ্কারকর্তৃক ভাষাবিবেচিত এবং শ্রীকবিচন্দ্র/তর্কশিরোমণিকর্তৃক সাহায্যীকৃত।/শ্রীরামপুরে মিশিয়ন্ ছাপাখানাতে ছাপা কৃত।/সন ১৮২০।"[৬] তাঁর অপর উল্লেখনীয় অনুবাদগ্রন্থ হল বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেসের' বাংলা অনুবাদ। এটি 'যাত্রীদের অগ্রেসরণ বিবরণ' নামে দুই খণ্ডে ১৮২১ ও ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির হয়ে অন্য দুটি গ্রন্থও ভাষান্তর করেছিলেন; একটি গোল্ডস্মিথের 'হিস্ট্রী অব ইংল্যান্ড', এবং অন্যটি মিলের

'হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'। বিচিত্র চরিত্র ফেলিক্সের নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঋণ স্বীকার্য এ কারণেই যে, বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় তিনিই পথিকৃৎ।

জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র এবং পরবর্তীকালে 'সমাচার দর্পণ', 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া', 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানও তাঁর দিগন্তবিস্তারী কাজকর্মের অনবসরের মধ্যে অনুবাদে ও গদ্যরচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বাংলা তর্জমার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল দুখণ্ড 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ', প্রকাশকাল ১৮৩১ ও ১৮৩৬। রেভাঃ লং-এর মতে রয়েল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি দু'হাজার টাকার বিনিময়ে মার্শম্যানকে দিয়ে এই অনুবাদগ্রন্থটি প্রস্তুত করান। এই পুথিটির বিষয়বস্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সম্পর্কিত তথ্য ও নির্দেশনামা। দ্বিতীয় উল্লেখ্য গ্রন্থ জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল বিষয়ক একটি গ্রন্থের অনুবাদ, 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়'। (এস্ট্রোনমির বাংলা তর্জমায় জ্যোতিষ লেখাটা নিশ্চয়ই ঠিক হয়নি)। তাছাড়া, তিনি মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস, 'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস', সবকারী আইন সংকলন, ইত্যাদি কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন।

উইলিয়াম ইয়েটসও কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদক। তন্মধ্যে জেমস ফার্গুসন-কৃত 'অ্যান ইজি ইনট্রোডাকশন টু এস্ট্রোনমি' (ডেভিড ব্রুস্টার কর্তৃক পরিমার্জিত) গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।[৫] অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত গ্রন্থের অনুবাদ। প্রসঙ্গতঃ, শ্রীরামপুরের মিশনারিদের মধ্যে রেঃ জন ম্যাকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কারণ, তিনি রসায়নবিদ্যার একটি পুথি বাংলায় তর্জমা করেন। নাম—'কিমিয়া বিদ্যার সার। শ্রীযুত জন মাক সাহেবের কর্তৃক রচিত হইয়া গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল।' প্রকাশকাল ১৮৩৪। ম্যাকের গদ্যের নিদর্শন: "অনেক প্রকার বস্তুর কিমিয়ালয় উৎপন্ন হইলে আলোক নির্গত হয়। অতএব যে সময়ে দহন হয় সে সময় সকলেই জানে যে আলোক নির্গত হয় কিন্তু যে বস্তুতে কখন দহনোৎপত্তি হয় না সে বস্তুর লয়েতেও আলোক নির্গত হয়।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করেও বাংলা গদ্যের এবং স্বভাবতঃই অনুবাদের চর্চা চলে। লং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা পুথির যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, জে. সার্জেণ্ট নামে কলেজের জনৈক ছাত্র ভার্জিলের 'ঈনিড' অনুবাদ করেন, মঙ্কটন করেন সেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট'। গোলকনাথ শর্মা অনুদিত 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' পরের বৎসর। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তারিণীচরণ মিত্র অনুদিত 'ঈসপের গল্প'; এই গ্রন্থটি জে. গিলক্রিস্টের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে রচিত ও রোমান হরফে ছাপা হয়। সুশীলকুমার দে তারিণীচরণের অনুবাদ এবং তাঁর সহজ সাবলীল গদ্যভঙ্গির প্রশংসা করেছেন, এবং মন্তব্য করেছেন যে যদি তিনি মৌলিক রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর সমকালীন বাংলা লেখকদের চেয়ে অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন।[৬] তাঁর গদ্যরীতির স্বাক্ষর: খেঁকশিয়ালী "কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার সুন্দর মূর্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার চক্ষের জ্যোতি, যদি নম্রতাক্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার স্বর তোমার আর আর গুণের সমান বটে।"

ফারসী থেকে অনুদিত চণ্ডীচরণ মুনশির 'তোতা ইতিহাস' প্রকাশিত হয় ১৮০৫-এ, আর রামকিশোর তর্কালঙ্কার ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উভয়ের পৃথকভাবে অনুদিত 'হিতোপদেশ' প্রকাশিত হয় ১৮০৮ সনে। সংস্কৃত থেকে অনুদিত হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ পরীক্ষা' প্রকাশিত হয় ১৮১৫-এ। লং-এর তালিকায় দেখা যায়, শ্রীরামপুর কলেজের দু'জন ছাত্র বেচারাম রায় ও বিশ্বম্ভর দত্ত মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সর্গ অনুবাদ করেছিলেন, যদিও রচনার তারিখের উল্লেখ নেই। আরও জানা যায়, গিরিশচন্দ্র বসু দুঃসাহসিক আত্মবিশ্বাসে হোমারের 'ইলিয়াডে'র প্রথম পর্ব অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। কেরী যুগের কয়েকটি সুখ্যাত এবং দু'চারটি দুঃসাহসিক তর্জমার উল্লেখ করা হল। এতে দেখা যাচ্ছে, শুধু যে ইংরেজী থেকেই গ্রন্থাদি অনুদিত হয়েছিল তা নয়, সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী থেকেও সমান আগ্রহে ও ঐকান্তিকতায় গ্রন্থাদি তর্জমা করা হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এ ছিল একটি নিশ্চিত এবং অনুমোদিত কার্যক্রম। এই পর্বে রামমোহন রায় সংস্কৃত শাস্ত্রাদি বাংলা তর্জমার প্রকাশ করে যে ভাব-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন। তা অতিশয় সুবিদিত বলেই বর্তমান প্রসঙ্গে তার কোন উল্লেখ করা হল না।

৩

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক কাঠামোর রূপান্তর, গ্রামীণ স্বয়ংনির্ভরতার অবসান, ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার, ইত্যাদির ফলে সমাজমানসে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ভাবাবর্তে যাঁরা অবগাহন করেছেন, তাঁদের

মধ্যে ছিল বিপুল এক উদ্দীপনার স্বাক্ষর, যা মন-চলাচলের বুদ্ধিগত জমি প্রস্তুত করার জন্য অধীর। সেজন্য, ইংরেজী ভাষা আশ্রয় করে বিশ্বের যে জ্ঞানভাণ্ডার অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরের কোণে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্রগামী করার আগ্রহ দেখা দেয়; আবার, অন্য দিকে ইংরেজী সাহিত্য যে হৃদয়রসের সন্ধান দিয়েছে তাকে ছড়িয়ে দেবার, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে মিলিত করার, আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল। বিদ্যাচর্চা বা জ্ঞানানুশীলনের জন্য সেকালে কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে নানাবিধ সমাজ বা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তার আলোচনায় তাদের অবদান যেমন স্মরণীয়, তেমনি কোন কোন সমাজ বাংলা অনুবাদের মধ্য দিয়ে পূর্বকথিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাস্তব কর্মপন্থাও গ্রহণ করেছিল। ঐরূপ একটি সমাজ ছিল 'গৌড়ীয় সমাজ'। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল, "দেশ-বাসীদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার"; "এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করাইয়া সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।" এই কাজে সমাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ না পাওয়া গেলেও অনুবাদ সম্পর্কে এই আত্যন্তিক আগ্রহ ব্যক্তিক জীবনে ও মননে নিশ্চয়ই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল।* এর প্রমাণ আমরা তৎকালে অনূদিত গ্রন্থাদির মধ্যেই পাই। যেমন, রাজা কালীকৃষ্ণ ডঃ জনসনের 'রাসেলাস' গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন ১৮৩৩-এ, গে'র উপকথা ১৮৩৬-এ; নীলমণি বসাক 'পারস্য ইতিহাস' অনুবাদ করেছিলেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, তর্জমা করেছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন'; হরিমোহন সেন অনূদিত 'আরব্য রজনী' প্রকাশিত হয় ১৮৩৯-এ; অজ্ঞাত অনুবাদকেব 'বেতাল পঞ্চবিংশতির' প্রকাশ কাল ১৮৭৮। হানা মুরের 'শেফার্ড অব সেলিসবেরি প্লেন' গ্রন্থের অনুবাদ 'মেষপালক বিবরণ' (অনুস্বরূপ) প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। লং-এর তালিকা থেকে জানা যায়, লে রিচমণ্ডের 'নিগ্রো সার্ভেণ্ট' শীর্ষক পুস্তিকার বাংলা অনুবাদ 'কাফ্রি দাস' ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু তিনি অনুবাদকের নামোল্লেখ করেননি। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে অনুবাদেব বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যাবে। আরও স্মরণীয়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভাও ঋগ্বেদ ও ঔপনিষদিক গ্রন্থাবলীর বাংলা তর্জমা প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবং পরে পুস্তকাকারে নিয়মিত প্রকাশ করেছিলেন।

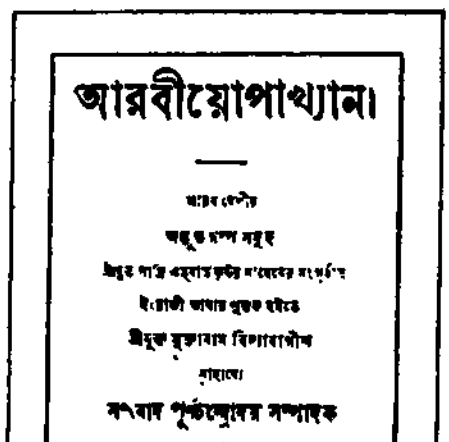
আরবীয়োপাখ্যান।

আরব দেশীয়

অদ্ভুত গল্প সমূহ

ইংরাজী ভাষার পুস্তক হইতে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

সাহায্যে

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক

কর্তৃক

গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা।

সমাজ হিসাবে কালজয়ী সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (ভার্নাকুলার ট্রান্সলেশন সোসাইটি)। মুখ্যতঃ উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ১৮৫০ সনে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরেজদের মধ্যে বেথুন, রেঃ কে. হজসন প্রাট, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, সিটন-কার এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত হরচন্দ্র দত্ত, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিভিন্ন স্তরে এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সমাজ অবশ্য ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যায়। সমাজ এইসব ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন: রবিন্সন ক্রুসো; বেকন সাহেবের প্রবন্ধ; আবরক্রাম্বি সাহেবের রচিত মনোগুণ; চেম্বর্স ও নাইট সাহেবের ও পেনি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নানাবিধ বিদ্যা বিবরণাদি সংগৃহীত এক পুস্তক; মহাপীটরের আয়ুর বিবরণ; কলম্বসের আয়ুর বিবরণ; ক্লাইভ সাহেব ও ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের বিষয়ে মাকলি সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য।[১০] পরিকল্পনামত রেঃ জে. রবিন্সন 'রবিন্সন ক্রুশো', ডঃ রোয়ার 'ল্যামস্ টেলস ফ্রম সেক্সপীয়র', হরচন্দ্র দত্ত মেকলের 'লাইফ অব ক্লাইভ' তর্জমা করেন, এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সেগুলো প্রকাশিত হয়। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ বেথুন সমাজ প্রকাশিত পত্রিকা ও পুঁথির জন্য ইংলণ্ডের নাইট কোম্পানীর নিকট থেকে অল্প খরচে প্রচুর ব্লক আনিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৫৬

খ্রীষ্টাব্দে সমাজ যেসব বিষয়ে মৌলিক অথবা অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাতে এইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়: ১ "প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র। ২ দেশ-প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোলের বৃত্তান্ত; ৩ বাণিজ্য ও লোকবার্তা বিবরণ; ৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান-শাস্ত্র; ৫ শিল্পবিদ্যা; ৬ শিক্ষাবিধান; ৭ জীবনচরিত এবং নীতিগর্ভ গল্প।"[১১] সমাজ লেখকদের সম্মান দক্ষিণা (দশ টাকা এককালীন) দেবারও ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং সব ক'টি বিষয়ে না হোক কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে যে সফল হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।

আরব্য উপন্যাসের বেশ কয়েকটি অনুবাদ ১৮৬০-এর পূর্বেই হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম অনুবাদ 'আরবীয়োপাখ্যান', মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ ও সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত।

এই সময়কার একটি বিশিষ্ট কীর্তি রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস' নামক কোষ-গ্রন্থের আবির্ভাব। বাংলায় এর নামকরণ হয়েছিল 'বিদ্যা-কল্পদ্রুম'; এটি তৎকালীন বাংলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে মোট ১৩ খণ্ডে ১৮৪৬-১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই কোষগ্রন্থটি ছিল দ্বিভাষিক, ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে সুলিখিত প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। এতে সন্নিবিষ্ট অনূদিত নিবন্ধাবলীর মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী পাঠক পাশ্চাত্যের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে তথ্য ও জ্ঞানলাভ করেন।

সমাজের অস্তিত্ব-সীমার মধ্যেই আমরা পাচ্ছি উর্দু থেকে উমাচরণ মিত্রের অনুবাদ 'চাহার দরবেশ' (১৮৫৪), এবং ফারসী থেকে 'গোলে বকাওলি' (১৮৫৫)। বর্ধমানের মহারাজার আনুকূল্যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সংস্কৃত থেকে তর্জমা করেন 'পাকরাজেশ্বর' (১৮৫৪)। রলিন ও এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সারানুবাদ করেন 'ঈজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত' (১৮৫৭)।

এই সময়সীমার মধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদও লক্ষণীয়। সাহিত্যের ইতিহাস-কারদের রচনা থেকে জানা যায়, বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ করেছিলেন ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে, যদিচ সেটি মুদ্রিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। অনুরূপ এক অনুপ্রাণনায় উদ্দীপ্ত হয়েই হরচন্দ্র ঘোষ 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'ভানুমতী চিত্ত-বিলাস' (১৮৫৩) এবং আরও পরে অনুবাদ করেন 'রোমিও জুলিয়েট'। বাংলা নামকরণ হল 'চারুমুখচিত্তহরা নাটক' (১৮৬৪)। কিন্তু স্বাভাবিক সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না বলে সেক্সপীয়র থেকে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ সমাদৃত হয়নি। অপেক্ষাকৃত সরস হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত 'সিমবেলিনে'র অনুবাদ, 'সুশীলা-বীরসিংহ' (১৮৬৮) পরবর্তীকালে তিনি 'মেঘ-দূতে'র পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। রামনারায়ণ তর্করত্ন অথবা 'নাটুকে' রাম-নারায়ণ এই সময়ে সংস্কৃত নাটক রত্নাবলী' (১৮৫৮) এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) অনুবাদ করেন।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ফরাসী ঔপন্যাসিক বার্নারিদ'দ্য সাঁত-পিয়েরে রচিত 'পল এত্ ভার্জিনী' গ্রন্থটি মূল ফরাসী থেকে বাংলায় তর্জমা করে অনুবাদ-সাহিত্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ নিয়ে আসেন। এটি 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র, ১২৭৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১২] কী এক যাদুময় রসে ঐ অনুবাদ মানুষের হৃদয় ভরে দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর জীবনস্মৃতিতে এর উল্লেখ করে লিখেছেন, "এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল!"[১৩]

আর বিদ্যাসাগরের যে সাহিত্যকীর্তি, বলা চলে তা মূলতঃ অনুবাদ-নির্ভর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পঠনপাঠনের সুবিধার জন্য তিনি হিন্দী 'বৈতালপচীসী' নামক গ্রন্থ অবলম্বন করে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগেই অবশ্য তাঁর অনুবাদ-দক্ষতা প্রমাণিত হয় জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' অবলম্বনে রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' (১৮৪৮)। কিন্তু অনুবাদ যে সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্ম তার উজ্জ্বল প্রমাণ তিনি রেখেছেন 'শকুন্তলা'য় (১৮৫৪-৫৫)। এই গ্রন্থটি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-এর অনুবাদ নয়, হতেও পারে না; কারণ, কালিদাসের দৃশ্যকাব্য রূপান্তরিত হয়েছে উপাখ্যানে। আর, এই রূপান্তরের পথে অনুবাদ সম্পর্কে একটি মৌল সত্যও উদ্ঘাটিত হয়েছে। তা হল, মূল গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশের কালে তার পাঠকমণ্ডলীর চিত্তে যে রসের সঞ্চার করেছিল, অনুবাদের কালেও নতুন যুগের পাঠকচিত্তে অনুরূপ রসের সঞ্চার করবে—সেইখানেই অনুবাদের কালজয়ী সার্থকতা। বিদ্যাসাগরের উপাখ্যানে সেই রসমাধুর্যের প্রতিফলন, যা আধুনিক

রুচি ও মনোভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম, এবং সেজন্য তাঁর 'শকুন্তলা' এক ললিতমধুর অনবদ্য সৃষ্টি। ভবভূতির 'উত্তরচরিত' অবলম্বন করে রচিত 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) গ্রন্থেও ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে আধুনিক পাঠককে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সৌন্দর্যসীমায় পৌঁছে দেয়। সেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এররস্' নাটকটি অবলম্বন করে তিনি তেমনি একটি অতিশয় উপাদেয় ও সরস উপাখ্যান রচনা করেন, 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। তাছাড়া, মহাভারতের উপক্রমণিকা অংশও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, শক্তি ও দ্যোতনার উদ্ভাসে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ সত্য সত্যই নতুন সৃষ্টি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরও দুটি অনুবাদগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সাহিত্য-পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাদের একটি চণ্ডীচরণ সেন অনূদিত 'টম কাকার কুটির' (আঙ্কল্ টমস্ কেবিন), ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; অপরটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত 'ম্যাকবেথ'। আরও কয়েকজন ম্যাকবেথ অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র সেক্সপীয়রের মর্মবাণী যে ঐকান্তিকতায় আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তেমনটি আর কারও পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। সেজন্য তাঁর অনুবাদ আজ পর্যন্তও দ্বিতীয়রহিত বলে স্বীকৃত। সে আমলে বায়রনের কাব্য খুবই সমাদৃত হত, বিশেষতঃ 'আইলস্ অব গ্রীস' কবিতাটি। একাধিক কবি এই কবিতা অনুবাদ করে কাব্যপুস্তিকা প্রকাশ করেন।

৪

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরে বাংলা অনুবাদসাহিত্য বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে দেখা যায়। সাহিত্যপাঠের আনন্দে ও রসে শুধুই বিমোহিত হওয়া, বিশ্বমানুষের মনোজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করার আগ্রহ, শুধু জ্ঞানের বিষয়ে নয়, রসের বিষয়ে তন্ময় হওয়ার বাসনা ইতিমধ্যে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সর্বাগ্রগণ্য। এই অসামান্য প্রতিভাধর মানুষটি শুধু যে ইংরেজী থেকেই অনুবাদ করেছেন তা নয়, মূল ফরাসী, মারাঠী এবং সংস্কৃত থেকে অসংখ্য নাটক, গল্প, উপন্যাস, জীবনী, প্রবন্ধ অনুবাদ করে বাংলাসাহিত্যের আনুভূতিক সীমা বিস্তৃত করেছেন। তাঁর অনুবাদের মধ্যে উল্লেখনীয়, মূল ফরাসী থেকে মলিয়ের-এর দুটি প্রহসন, গতিয়ের থেকে অন্তত দুটি উপন্যাস, অসংখ্য ফরাসী গল্প, পিয়ের লোতির 'ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষ', ভিক্তর কুজাঁর গ্রন্থ থেকে 'সত্য, মঙ্গল, সুন্দর'; মারাঠী থেকে 'ঝাঁসির রাণী', ইংরেজী থেকে 'মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা', 'এপিকটিটাসের উপদেশ' এবং সংস্কৃত থেকে 'মালতীমাধব', 'মৃচ্ছকটিক', 'বিক্রমোর্বশী'। 'উত্তরচরিত', 'রত্নাবলী' প্রমুখ দশ-বারোটি বা ততোধিক নাটক। মারাঠী থেকে তিনি তিলকের 'গীতারহস্যও' অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদসাহিত্যে তাঁর দান সত্যই তুলনারহিত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও অনুবাদে বিশেষ দক্ষতা ছিল। কবিতা ছাড়াও তিনি ইংরেজী থেকে 'জন্মদুঃখী' (১৯১২) নামে একটি উপন্যাস তর্জমা করেছিলেন, যদিও মূল গ্রন্থটি নরওয়ের ঔপন্যাসিক জোনাস লী-র রচনা। এটি সে আমলে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ 'রঙ্গমল্লী' (১৯১৩) গ্রন্থে কয়েকটি নাটকও অনুবাদ করেছিলেন; এতে আছে একটি চীনা, একটি জাপানী এবং মেটারলিঙ্ক ও স্টিফেন ফিলিপসের একটি করে নাটক।

এই শতকের গোড়ার দিকে দীনেন্দ্রকুমার রায় এ্যাবটের 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট', এবং বরদাকান্ত মিত্র টডের 'রাজস্থান' অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া, 'রহস্য-লহরী সিরিজ'-এ দীনেন্দ্রকুমারের অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতাধিক। বাংলায় যামিনীকান্ত সোমই বোধ করি ইবসেনের 'ডলস্ হাউস' নাটকের প্রথম অনুবাদক; ভাষান্তরে এর নামকরণ হয়েছিল 'খেলাঘর'। পরে ১৯২৭-২৮ সনে তিনি মেটারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড' নাটকটি অনুবাদ করেন 'নীল-পাখী' নামে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী থেকে অনুবাদ প্রকাশ করতেন 'সবুজপত্রে'; তাঁর মার্জিত বাচনভঙ্গি ক্লাসিক পর্যায়ভুক্ত হবার দাবি রাখে। ঐ গোষ্ঠীভুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ কৃত 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে একটি চিরায়ত আসন অধিকার করে রয়েছে।

তারপর 'কল্লোল' যুগের সাহিত্যিকবৃন্দ বিশ্বসাহিত্যের খ্যাতনাম সাহিত্যস্রষ্টাদের গল্প-উপন্যাস-কবিতা অনুবাদ করেন, এবং এই সূত্রে বাংলা সাহিত্যের পাঠক পরিচিত হন গোর্কি, ন্যুট হামসুন, জোহান বয়ার, বার্নাড শ, লরেন্স, টলস্টয়, মম্ প্রমুখ লেখকদের মানসবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। তাঁদের শব্দচয়ন, তির্যক বাচনভঙ্গি, গদ্যের শিল্পময় বৈশিষ্ট্য অনুবাদ নবসৃষ্টির বিশিষ্টতা লাভ করে। এই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে গোকুল নাগের 'পরীস্থান' (মেটারলিঙ্কের ব্লুবার্ড অবলম্বনে উপাখ্যান), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কৃত হামসুনের 'প্যান'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত হামসুনের 'বুভুক্ষা' (হাঙ্গার), আঁদ্রে মরোয়া অবলম্বনে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শেলি', বুদ্ধদেব বসু অনূদিত অস্কার ওয়াইল্ডের 'হাউই' এবং আলডুস্ হাক্সলির 'ক্রোম ইয়েলো' অবলম্বনে রচিত 'রোডোডেনড্রন গুচ্ছ' একদা সাহিত্য পাঠকের মনোহরণ করেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কৃত আনাতোল ফ্রাঁসের একটি উপন্যাসের অনুবাদ 'স্বৈরিণী' এই আমলের আরেকটি বিশিষ্ট সংযোজন। আরও কিছুকাল পরে কাজী আব্দুল ওদুদ রচিত 'কবিগুরু গ্যেটে'-তে পাই সেই মহাকবির বহু রচনাংশের প্রাঞ্জল অনুবাদ। ডক্টর কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ফাউস্ত'র সুন্দর অনুবাদ করেছেন। দুটি সংস্করণ এই অনুবাদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

বিশ্বের বরণীয় লেখকদের বিভিন্ন স্বাদের ও আবেদনের সাহিত্যের সঙ্গে এই পরিচিতি বাঙালী পাঠকের রুচি ও হৃদয়-সংবেদনা পরিশীলিত হয়ে ক্রমেই পূর্ণতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। বিশেষতঃ গল্প-উপন্যাসের বিশ্বজনীন মানদণ্ড সম্পর্কে বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টাগণ যেমন, পাঠকরাও তেমনি সচেতন হয়ে উঠছিলেন। অনুবাদ ছিল সেই সচেতনতার বাহন।

৫

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য আরও বেশী বিস্তার ও ব্যাপকতা অর্জন করেছে; সংখ্যার বিচারে যদি না-ও হয়, অন্তত বিষয়বৈচিত্র্যে, নব নব দেশের ও বিষয়বস্তুর সাযুজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়। ইউনেস্‌কোর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দেশের অনুবাদ-সাহিত্য সংক্রান্ত যে তথ্যপঞ্জী প্রকাশিত হয়, তার সাক্ষ্য থেকে তাই প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, ১৯৪৭-১৯৫৮ এই বার বৎসরে বাংলায় অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪২৯।[১৪] অবশ্য, এই হিসাব নির্ভুল না হওয়ারই সম্ভাবনা; কারণ, জাতীয় পাঠাগারে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তা প্রস্তুত করা হয়েছে। আর, এও সত্য যে সব অনূদিত পুঁথিই জাতীয় পাঠাগারে পৌঁছায় না। যাই হোক, পূর্বোক্ত ৪২৯ খানা গ্রন্থের মধ্যে কোন্ কোন্ সাহিত্য থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তার হিসাব এইরূপ: আরবী ১; চীনা ১১; চেক ১; ডেনিশ ২; ইংরেজী ১৭৪; ফরাসী ৫২; জর্জিয়ান ১; জার্মান ২১; গ্রীক ৫; হিব্রু ২; হিন্দী ৪; ইতালিয়ান ৩; কোবীয় ১; লাতিন ১; মারাঠী ১; নরুই-জিয়ান ১; পালি ১; পাঞ্জাবী ১; ফারসী ১; পোলিশ ৪; রাশিয়ান ১১৯; সংস্কৃত ১৪; স্পেনিশ ১; সুইডিশ ২; তামিল ১; তেলুগু ১; উর্দু ৩।[১৫] উল্লেখিত মূল ভাষাগুলো থেকেই যে গ্রন্থাদি অনুবাদ করা হয়েছে, এমন না-ও হতে পারে। সম্ভবতঃ বেশীর ভাগ গ্রন্থই ইংরেজী থেকে অনূদিত। সর্বসাকুল্যে শতাধিক প্রকাশন সংস্থা ঐ গ্রন্থসমূহের প্রকাশক; আর ক্ষেত্রবিশেষে লেখক স্বয়ং অথবা তাঁর পক্ষে ব্যক্তিবিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আবার এ-ও লক্ষ্য করা গেছে, ঐসব প্রকাশন সংস্থার মধ্যে কিছু সংখ্যক ইদানীং অস্তিত্বহীন।

যাঁদের লেখা অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন: ঔপন্যাসিক—বালজাক, স্তাঁদাল, দুমা, হুগো, জিদ্, জোলা মরিয়াক, বারবুস, রোলাঁ, ফ্রাঁস, দদে, হেসে, মপাসাঁ, লিও টলস্টয়, আলেক্সি টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়ভস্কি, চেকভ, সলোকভ, গোর্কি, গোগল, সিন্‌কিউইচ, হামসুন, টমাস মান, দেলেদ্দা, লাগেরকভিস্ট, হেমিংওয়ে, সিনক্লেয়ার, সেলমা লেগারলফ্, কুপরিন, ভলতেয়ার, লরেন্স, রেমার্ক, হাওয়ার্ড ফাস্ট, পার্ল বাক, লু সুন, লাও চাঅ, স্তেফান ৎস্‌ভাইগ, মেরি ওলস্টনক্র্যাফ্ট, ওডহাউস, কোয়েসলার, কৃষাণচন্দ্র, মুল্‌করাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য, আলডুস হাক্সলি প্রমুখ। কবিদের মধ্যে আছেন: হোমার, সেক্সপীয়ার, র‍্যাবোঁ, হুইটম্যান, ল্যাংস্টন হিউজেস, আরাগঁ প্রমুখ। দার্শনিক ও মননশীল চিন্তাবিদদের মধ্যে আছেন: প্লেটো, রাস্কিন, রাসেল, টমাস পেইন, কৌটিল্য, জেমস্ জীনস, শ্রীঅরবিন্দ, অভেদানন্দ, রাধাকৃষ্ণন, রাজাগোপালাচারি, রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রমুখ। রাজনৈতিক নায়কদের মধ্যে আছেন: মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, মাও, লিউ শাও চি, ক্রুপস্‌কায়া প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন, হোরেস, এইচ. জি. ওয়েলস, আনা লুই স্ট্রং, আরভিং স্টোন, চেস্টার বোলস, নেহরু, টলার, হেভলক এলিস, মারি স্টোপস্, হ্যানিমান, জিম করবেট, ব্র্যাডম্যান, আনা সেগারস্, রোজেনবার্গ, কাঁরো, ফুচিক, প্রমুখ। নাট্যকার-দের মধ্যে আছেন; ঈসকাইলাস, অস্কার ওয়াইল্‌ড্, বার্নাড শ,' প্রমুখ। আরও অসংখ্য নাম বাদ দেওয়া হল, তালিকা ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায়। বাংলায় সেক্সপীয়র অনুবাদের মোট সংখ্যা ১২৮। এই তালিকা থেকে অনুমান করা যাবে, বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য কত বিচিত্রগামী ও সমৃদ্ধ; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বর্তমান স্তরে মূল্যমান নির্ণয়ে ও সৃজনশীল সাহিত্যের শিল্পবোধ নিয়ন্ত্রণে অনুবাদ যে অপরিহার্য, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা অনুবাদকর্ম যে বর্তমান কালেও অব্যাহত, বিগত কয়েক বৎসরের পরিসংখ্যান থেকে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। নিচে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত বাংলায় অনূদিত গ্রন্থসমূহের একটি সারণী উপস্থাপিত হল।[১৬] এই বিবরণ যে সম্পূর্ণ, তা মনে করার কোন হেতু নেই। এ সারণী শুধু জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য তথ্যের উপর নির্মিত; আর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, সমস্ত বই ঐ গ্রন্থাগারে সময়মত জমা পড়ে না। প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে রচিত পরিসংখ্যান যে বিভিন্নরূপ হয় তার আরও একটি প্রমাণ—সারণীতে উল্লেখিত ১৯৭৩ সনের অনূদিত গ্রন্থসংখ্যা ৫৪, কিন্তু ইউনেসকো ঐ বৎসরের জন্য অনূদিত বাংলা গ্রন্থের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ঐ বছরে মোট ৪৬টি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল।[১৭] বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই সংখ্যাগত

ব্যবধান হয়ত আরও প্রকট।*

১৯৭১—১৯৭৮ মোট আট বছরের বাংলা অনুবাদের বিষয়ানুক্রম

	সাধারণ	দর্শন	ধর্ম	সমাজবিদ্যা	বিজ্ঞান	প্রযুক্তি-বিদ্যা	ললিতকলা ও খেলাধুলো	ভাষা ও সাহিত্য	ভূগোল ইতিহাস জীবনী	মোট
১৯৭১	২	২	১৪	১৫	৭	৩	২	৪৫	১৪	১০৪
১৯৭২	—	৭	১০	৫	৪	২	—	২৩	৬	৫৭
১৯৭৩	২	১	৯	—	২	১	৩	৩২	৪	৫৪
১৯৭৪	—	—	১৫	২	১	—	১	৪১	১৫	৭৫
১৯৭৫	৪	৬	২৩	১৯	৩	২	১	৬১	১৬	১৩৫
১৯৭৬	—	৪	১৪	৮	—	১	৩	৫১	১৩	৯৪
১৯৭৭	১	৮	১৭	৬	—	১	২	৪৭	১৪	৯৬
১৯৭৮	—	—	১২	১৩	১	—	—	৫৪	১৪	৯৪

এই সারণী থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, সৃজনধর্মী সাহিত্য অনুবাদের আকর্ষণ বরাবরই প্রবল কিন্তু ধর্ম-সমাজবিদ্যা-জীবনীগ্রন্থ ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ একান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

৬

বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। সমকালের সামগ্রিক বিচারে শিশুসাহিত্যের স্রষ্টা অগণিত; তাঁদের সকলেই অনুবাদে হাত লাগিয়েছেন, একথা বলা যায় না। তবে, তাঁদের মধ্যে স্বল্প-সংখ্যক লেখক দেশবিদেশের সাহিত্যের তর্জমা করে শিশুমনকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন হয় রূপকথার জাদুতে, বা ভয়ঙ্করের অভিযানে, বা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রলোভনে। সে দিক থেকে অনূদিত শিশু-সাহিত্যও কম ঐশ্বর্য-মণ্ডিত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনায় অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নিয়ে কিশোরদের জন্য রচিত অনুবাদ সাহিত্যের আবির্ভাব ঐ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বোধ করি প্রথম বাংলায় শিশুসাহিত্যের অনুবাদক। তিনি হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেন-এর রূপকথা অবলম্বনে তিনটি ক্ষুদ্রকায় বই রচনা করেন: 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ' (দি আগলি ডাকলিং), ১৮৫৭; 'মরমেত—অর্থাৎ মৎস্যনারীর উপাখ্যান' (দি লিট্‌ল্‌ মারমেড), ১৮৫৭, এবং 'হংসরূপি রাজপুত্র' (দি ওয়াইল্‌ড্‌ সোয়ানস্‌), ১৮৫৯ (২য় মুদ্রণ)। তিনটি পুস্তিকারই প্রকাশক ছিলেন ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। সেই থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় অনুবাদ-সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে আসছে।

এ প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় নাম কুলদারঞ্জন রায়। তাঁর অনূদিত 'রবিনহুড' (১৯১৪) হাজার হাজার কিশোরের স্বপ্নকল্পনায় দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ জাগিয়েছে বছরের পর বছর ধরে। ক্রমে ক্রমে তিনি রচনা করেছেন হোমার অবলম্বনে 'ওডীসিয়ুস' (১৯১৫), 'ইলিয়াড' (১৯২১, ২য় সং), স্কট অবলম্বনে 'ট্যালিসম্যান' (১৯২৮), জুল ভার্ন অবলম্বনে 'আশ্চর্য-দ্বীপ', ১ম-২য় গল্প (মিস্টিরিয়াস আয়ল্যাণ্ড), ১৯৩০, ইত্যাদি এবং অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী। তাঁর প্রতিটি রচনায় ছিল সৃজনশীল প্রতিভার নিশ্চিত স্বাক্ষর।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বইকে অন্তত অনুবাদের পর্যায়ে ফেলা চলে। সেটি 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), সেলমা লেগারলফের 'এ্যাডভেঞ্চার্স অব নিল্‌স' অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ভাষা নিয়ে তাঁর যে বিস্ময়কর খেলা, তাতে এটি মৌলিক রচনার অপূর্ব স্বকীয়তা লাভ করেছে। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূল ইংরেজী গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'চিত্রগ্রীব' (গে-নেক), ১৯৩১ এবং 'যূথপতি' (করী, দি এলিফেণ্ট), ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তৎকালে এ দুটি গ্রন্থ ছিল শিশুসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিমল সেনকৃত আলেকজান্দার দুমার 'কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিস্টো' গ্রন্থের অনুবাদ 'শোধবোধ' (১৯৩০) সে সময় অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যামিনীকান্ত সোম অনূদিত মেটারলিঙ্কের নাটক 'নীল পাখির' কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; তিনি সারভেনটিসের 'ডন কুইকজোট' অবলম্বনে রচনা করেন 'ডন্‌ কুস্তি' (১৯৩৩)। এরিক মারিয়া রেমার্কের কাহিনীর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কৃত বাংলা অনুবাদ 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট' (১৯৩৩) একটি অনবদ্য রসোত্তীর্ণ রচনা; আজও এর

*সংখ্যার এই বৈষম্যের কারণ এই যে, ইউনেসকো তার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কিছু শর্ত আরোপ করে। সেই শর্ত স্বীকার করতে গিয়ে কিছু সংখ্যক বই তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়—স.

আবেদন অক্ষুণ্ণ। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কিং কঙ' (১৯৩৪), ওয়েলসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'অদৃশ্য মানুষ' (১৯৩৫, দি ইনভিজিবল্ ম্যান), মেরি ওলস্টনক্র্যাফ্‌ট শেলির ভয়ঙ্কর কাহিনী 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' অবলম্বনে 'মানুষের গড়া দৈত্য,' ইত্যাদি গ্রন্থ একদা কিশোর বয়সের নিত্য সঙ্গী ছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মেটারলিঙ্ক অবলম্বনে রচিত গল্প 'নীল পাখি' (১৯২৫) এবং হ্যুগোর উপন্যাসের সংক্ষেপিত অনুবাদ 'ছোটদের লে মিজেরাব্‌ল' (১৯৩৬) ছিল অতিশয় সরস ও উপাদেয় গ্রন্থ। তেমনি অপরূপ ও অনাস্বাদিতপূর্ব ছিল এন্ডারসেনের 'ফেয়ারী টেলস্'এর বুদ্ধদেব বসুকৃত অনুবাদ দুখণ্ডে 'অপরূপ রূপকথা' (১৯৩৭); ভাষার আশ্চর্য মুনশিয়ানায় ও ব্যঞ্জনায় বুদ্ধদেবের অনুবাদ সত্যই অনবদ্য সৃষ্টি।

অনুবাদে শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের দক্ষতাও সুবিদিত। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' (১৯৪০), লিউ ওয়ালেসের 'বেনহুর' (১৯৪১), 'টলস্টয়ের ছোটদের গল্প' (১৯৪০), ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ', ইত্যাদি একদা সমাদর লাভ করেছিল। সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরিণত বয়সে শিশুদের জন্য বিদেশী সাহিত্য অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। উভয়ের রচনায় ব্যস্ততার ছাপ স্পষ্ট; এর মধ্যেও নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণের গোর্কির 'মা', ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট', দুমার 'থ্রী মাস্কেটীয়ার্স' (১৯৪১) উপভোগ্য হয়েছিল। আর সৌরীন্দ্রমোহনের ভাল রচনার মধ্যে ছিল হাগার্ড থেকে অনূদিত 'কিং সলো-মনস্ মাইনস্', এবং কিংসলি থেকে 'জলপরী' (ওয়াটার বেবিজ)।

বিগত পঁচিশ বছরে যেসব শিশুসাহিত্যিক অনুবাদকর্মে হাত পাকিয়েছেন, তাঁরা স্বাধীনতা-পূর্ব আমলের সাহিত্যিকদের তুলনায় সংখ্যায় ভারি। এই অসংখ্যের ভিড়ে অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট-তার আসনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন রচনার প্রসাদগুণের জন্য। তাঁদের মধ্যে মণীন্দ্র দত্ত গ্রন্থনির্বাচনে রুচি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থাদির মধ্যে আছে হ্যুগোর 'রক্তরাঙা দিনে' (১৯৪৬, 'নাইনটি থ্রি'), 'দি লাফিংম্যান (১৯৫৫), ডিকেন্সের 'অনেক আশা' (১৯৫৫, 'গ্রেট এক্সপেকটেশনস্'), 'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' (১৯৫৭), স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড' (১৯৫৯), ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনুবাদ করেছেন হ্যুগোর 'হাঞ্চব্যাক অব নোৎরডম' (১৯৫০), কিংসলির 'ওয়েস্টওয়ার্ড হো', ব্যালানটাইনের 'কোরাল আইল্যান্ড', 'আঙ্গাভা' (১৯৫৮), ডিকেন্সের 'নিকোলাস নিকল্‌বি' (১৯৬১), ইত্যাদি। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দুমার 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ' (১৯৫৪, ২য় সং), এবং হোমার থেকে 'দি অডিসি' (১৯৫৪) ও 'দি ইলিয়াড' (১৯৫৩) অনুবাদে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অশোক গুহ সেক্সপীয়রের প্রায় সব নাটকই গল্পের মত পরিবেশন করেছেন কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্য, ভাষার প্রাঞ্জলতার দরুণ সেগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জুল ভার্নের অনেকগুলি বই অনুবাদ করেছেন। তিনি 'এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেস', 'জার্নি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ'। 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন', 'মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড', 'অকূলপাথার' (এড্রিফ্‌ট ইন দি প্যাসিফিক), ইত্যাদি অনুবাদ করেছেন পঞ্চাশের দশকে; তাছাড়াও আছে জেমস ফ্যানিমোর কুপারের 'দি লাস্ট অব দি মোহি-কান্স', ব্যালানটাইনের 'মার্টিন র‍্যাটলার', ইত্যাদি।[১৮] শিশু-কবিতা অনুবাদকের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

৭

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে বর্তমান কাল অবধি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের একটি রূপরেখা বর্ণিত হল। মনোযোগী পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে, রূপরেখাটি অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতার মধ্যেও অনুবাদ-সাহিত্যের আন্তর-সম্পদ বিশ্লেষণ করলে একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে যা কালের অন্তর্নিহিত গরজের সঙ্গে ঐক্য-সম্পর্কে বাঁধা। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল নতুন সংস্কৃতির আবির্ভাব, বিকাশ ও সংহতির কাল; সুতরাং, ঐ সংস্কৃতির যাঁরা নির্মাতা তাঁদের লক্ষ্য ছিল মানুষের ধ্যানধারণা জীবনসাধনায় এমন কিছু নব-রূপায়ণ যা ঐ সংস্কৃতিকে করবে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত। অনুবাদ-সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন অনায়াসলক্ষ্য। যা কিছু জ্ঞানের বিষয় অথবা যা মনকে করবে পরিশীলিত, উচ্চভাবনায় উন্নীত, অনুবাদের মধ্য দিয়ে তা দেশে ব্যাপ্ত করার বাসনা ঐ কালে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আরও দেখেছি, যা মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত বা রসে উজ্জীবিত, তাতে স্নাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল প্রবল; কেন না, এও নির্মীয়মান সংস্কৃতির আত্মোপলব্ধিরই একটি দিক। যা জ্ঞানের বিষয় বা ধর্মাচরণের অঙ্গ, প্রথম যুগে তার অবিসম্বাদী প্রাধান্য। কিন্তু শতাব্দীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাধান্য ক্ষয় হয়ে রসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়; যা আনন্দ দান করে, মনের সঙ্গে মনকে মেলায়, অথবা মানবিক ভুবনের বিশাল বৈচিত্র্য সম্পর্কে মনকে অভিভূত করে, শতাব্দীর শেষদিকে অনুবাদ-সাহিত্যে তারই নিঃসংশয় প্রাধান্য। আরও স্মরণীয়, ঐ সাহিত্য মানুষকে বৃহত্তের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা বিগত শতকের ঐ আন্তর প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছিল। তখন যা

ছিল সৃজমান, তা এখন অবক্ষয়ের পথে। ব্যাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা তখন প্রায় অস্তমিত। তাই, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যা আত্মনিমগ্ন থাকার প্রেরণা যোগায়, অথবা যা অবসন্ন বা ঈষৎ ক্লেদ-পূর্ণ, কল্লোলের আমলে তার প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। ইউরোপীয় সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সংকট অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের মনকেও স্পর্শ করেছিল, অথচ এর জন্য আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। অবশ্য পাশাপাশি আমরা এমন রচনারও সাক্ষাৎ পাই যা উজ্জ্বল জীবনের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিল।

আমাদের সমকালীন অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে অন্য একটি লক্ষণ বিচার্য। এ ক্ষেত্রে অনুবাদ-কের চাইতে অনুবাদ প্রকাশকের ভূমিকাটা সম্ভবতঃ বড়। কারণ, যিনি অর্থ লগ্নী করছেন, তাঁর উপস্থিত লাভের বিচারটাই প্রধান, সংস্কৃতি বাঁচল কি মরল সেটা তেমন কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এখনকার সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত অনূদিত সাহিত্যের বিজ্ঞাপনে সেজন্যই যৌনতার অতিশয়তায় উচ্ছল বা অপরাধপ্রবণ বা রহস্যভীষণতায় মুখর বিদেশী গ্রন্থের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যেখানে প্রকাশক শুধু আর্থিক লাভের আশায় অনুবাদককে দিয়ে ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়ে নিয়েছেন। অতীতে লেখক-প্রকাশকের যৌথ দায়িত্ব ছিল সংস্কৃতির প্রতি, এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা একান্তই অনুপস্থিত। অবক্ষয়ী সমাজে এই প্রবণতা মুখ্য হলেও এটাই অবশ্য একমাত্র যুগলক্ষণ নয়। একালেও এমন সব সাহিত্যস্রষ্টা আছেন, অতীতেও ছিলেন, যাঁরা দেশ বিদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য, যাতে আছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ, মানুষের প্রতি ভালবাসা, ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস, এক কথায় যা প্রগতিবাদী সাহিত্য,—অনুবাদের মাধ্যমে বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন, দিচ্ছেন। নতুবা, বাংলায় নিগ্রো কবিতা, চীন-ভিয়েৎনামের সংগ্রামী কবিতা, অথবা ব্রেশ্‌টের নাটক কখনও অনূদিত হত না। স্বল্পসংখ্যক হলেও এই শ্রেণীর কবিতা-উপন্যাস-নাটকের অনুবাদক ও প্রকাশক যৌথভাবে সংস্কৃতির প্রতি দায়িত্বের বোধে সংযুক্ত, সাহিত্যের প্রতি ভালবাসায় অটল।

শুধু সাংস্কৃতিক কর্ম অথবা সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যম রূপে নয়, ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবেও অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা প্রকাশন শিল্পকে প্রভাবান্বিত করেছে। শিশু সাহিত্যের প্রকাশক এমন দু-একটি সংস্থা আছে যাদের প্রকাশিত পুস্তকতালিকার অধিকাংশই অনুবাদ। আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনুবাদসাহিত্যের প্রতি এই সমাদর অপ্রত্যাশিত নয়। এই মনোভঙ্গি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মুদ্রণশিল্পকে উৎসাহিত বা প্রভাবিত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তো কথাই নেই; শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বা সংস্কৃত প্রেসের ব্যবসায়িক বিস্তার মুখ্যতঃ অনুবাদনির্ভরই ছিল। এখনকার মুদ্রণসংস্থাগুলো সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা যায় না, তবে অনুবাদক-প্রকাশক সংযুক্ত প্রয়াস কোন না কোন ভাবে মুদ্রণশিল্পকে প্রভাবিত করেই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রেঃ লং বাংলা সরকারের নিকট প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে, বাংলা পুস্তক বা ইস্তাহার ছাপায় এমন ছাপাখানার সংখ্যা ৪৬, আজ এই সংখ্যা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃতিকর্ম হিসাবে অনুবাদ-সাহিত্যের অবদান সেই দিক থেকে স্বীকার্য। আর সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সর্বদা স্মরণীয়, মানবিক বিশ্বের অভিন্নতার চেতনার উদ্‌বোধন ও বিকাশে অনুবাদ-সাহিত্য এক অপরিহার্য যোগসূত্র। আশার কথা, কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনু-বাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ সাহিত্য আকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এঁদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষা থেকে ইতিমধ্যেই নানাবিষয়ক অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

নির্দেশিকা

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'লোকহিত' কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২৪ খণ্ড, পৃ ২৬৭

২ ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন, "Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with

people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state: it is the gain of humanity: in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence." বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস। চিরায়ত সংস্করণ, ১৯৭৫; পৃ. ৫০-৫১

৩ De, S. K. *Bengali Literature in the Nineteenth Century.* Calcutta, 1919, p. 88.

সবিতা চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক; কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৫০-১৫১

৪ *Catalogue of Bengali Books in the British Museum,* (Blumhardt) থেকে এস. কে. দে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, পৃ. ৮৮-৮৯

৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০৮

৬ সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৭ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেলিক্স কেরী অংশ, পৃ. ৩৬। সজনীকান্ত দাস—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২২৪

৭ এস. কে. দে গ্রন্থটির প্রকাশ কাল দিয়েছেন ১৮৩৮, সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই গ্রন্থটি ১৮৩০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সবিতা চট্টোপাধ্যায় জোরের সঙ্গে বলেছেন, উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারে তিনি যে বইটি দেখেছেন, তাতে প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ১৮৩৩; পৃ. ৩০৯

৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৭

৯ যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার নব্যসংস্কৃতি; ১৯৫৮, পৃ. ৪-৭

১০ ঐ; পৃ. ৪৩। বাংলার নব্যসংস্কৃতি গ্রন্থের ৪১-৪৯ পৃষ্ঠায় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

১১ ঐ; পৃ. ৪৬

১২ সাহিত্যসাধক চরিতমালায় পৌষ-চৈত্র ১২৭৫, এবং পৌষ-চৈত্র ১২৭৬, দুই তারিখেরই উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ড। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অংশ, পৃ. ২২

১৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ; ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৫

১৪ National Library, *Index Translationum Indicarum*; 1963, pp. 7-55

১৫ পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট সারণী থেকে

১৬ এই সারণী জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিজয়ানন্দ সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৭ UNESCO, *Index Translationum* No. 26 (Entries for the year 1963) pp. 438-451

১৮ এই অধ্যায়ে পরিবেশিত যাবতীয় তথ্যই বাণী বসু সঙ্কলিত 'বাংলা শিশুসাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী' পুস্তক থেকে সংগৃহীত। প্রকাশ করেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৭২ সালে।

আদিযুগের পাঠ্যপুস্তক

নিখিল সরকার

"গড্ ঈশ্বর, লাড্ ঈশ্বর,—কাম মানে এস,/ফাদার বাপ, মাদার মা,—সিট মানে বস।..." কলকাতা আর সুতানটি-গোবিন্দপুরের ছেলেরা যখন ছড়া কেটে ইংরেজী শিখছে এ শহরের বাল্যলীলা তখন সাঙ্গ হয়ে গেছে। এসব অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রহরের ঘটনা। কিংবা উনিশ শতকের প্রথম দিককার। ততক্ষণে কলির শহর কলকাতার এ পাড়ায় ও পাড়ায় জাঁকিয়ে বসেছে বেশ কিছু ইংরেজী স্কুল। পরিচালক হয় ইংরেজ, নয়তো ইউরেশিয়ান, বাঙালীটোলায় যাদের বলা হয় ফিরিঙ্গী। ধর্মতলায় বসেছে ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল, চিৎপুরে শেরবোর্নের স্কুল, বৈঠকখানায় হ্যাটম্যানের স্কুল, আমড়াতলায় মার্টিন বউলের স্কুল, মধ্যকলিকাতায় আর্চুন পিট্রুসের স্কুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগ, এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগ। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। রাজনৈতিক হাওয়ার গতি স্পষ্টতঃই পশ্চিমের দিকে। এমন সময়ে বাঙালী অতএব ইংরেজী শেখার দিকে ঝুঁকবে বই কি! ড্রামণ্ডের স্কুলের ছাত্র যদি ডিরোজিও, শেরবোর্নের স্কুলের ছাত্র তবে দ্বারকানাথ ঠাকুর। আমড়াতলার সাহেবের স্কুলে তেমনই তালিম নিয়েছেন মতিলাল শীল।

কী বই পড়েছেন ওঁরা আমরা সঠিক জানি না। শুধু এটুকুই জানি, এ-মুলুকে তখনও ছাপা পাঠ্য বইয়ের যুগ শুরু হয়নি। বই থাকলেও তা থাকত গুরুমশাইদের হাতে। এবং অনিবার্যভাবেই সেসব ছিল আমদানি করা বই। শহরে রীতিমত স্কুল বসে যাওয়ার আগে বাঙালীকে ইংরেজী শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আদালতের মুহুরি আর সাহেবকুঠির মুৎসুদ্দি-কেরানীরা। তখন "ইয়েস সার, নো সার, ভেরী গুড সার"-এর যুগ। তারপর আবির্ভূত হলেন পেশাদার মাস্টারমশাইরা। তাঁরা খেরো-বাঁধানো খাতায় ইংরেজী শব্দ স্টক করতেন। যাঁর মজুত ভাণ্ডার যত বেশী তার তত খ্যাতি। সাহেবদের দেখাদেখি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি আবার স্কুলও বসিয়েছিলেন। রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) কয়েকজনের নাম স্মরণ করেছেন—রামরাম মিত্র, আনন্দীরাম দাস, রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত। এ'রা যাকে বলে "কমপ্লিট ইংলিশ স্কলার"। রীতিমত ইংরেজীবাগীশ। কেন না, 'স্পেলিং বুক', 'ওয়ার্ড বুক' পড়ে তবেই স্কুল খুলেছেন। ওঁদের স্কুলে মাইনে চার টাকা থেকে ষোল টাকা। ছাত্ররা সুর করে পড়ে—"ফিলজফার বিজ্ঞ লোক, প্লাউম্যান চাষা/প্লাউমিন লাউকুমড়ো, কুকুম্বার শসা!"

লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) জানাচ্ছেন তৎকালে ইংরেজীর গুরুমশাইদের বিদ্যার উৎস ছিল টমাস ডিচির 'স্পেলিং বুক', আর 'স্কুল মাস্টার' নামে একখানা বই। ক্রমে তার সঙ্গে যোগ হয় 'টেলস অব প্যারট', 'এলিমেণ্টস অব ইংলিশ গ্রামার' আর 'অ্যারাবিয়ান নাইটস এনটার-টেনমেণ্টস্।' শেষের বইটি পড়ে যাঁরা বুঝতে পারতেন সাধারণের চোখে তাঁরা ছিলেন—বিদ্যার জাহাজ!

এবার একনজর তাকানো যাক বাংলা পাঠশালাগুলোর দিকে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে শহরে যখন উঁকি দিচ্ছে ইংরেজী স্কুল, তখনও কিন্তু পাশাপাশি বেঁচে আছে সনাতন পাঠশালা আর টোল। সনাতন, কারণ, চণ্ডীমঙ্গলের আমলে যেমন সেগুলো ছিল তেমনই ছিল চৈতন্যের কালেও। তার আগেকার ইতিবৃত্ত না-হয় বাদই দেওয়া গেল। চণ্ডীমঙ্গলে (১৫৯৪-১৬০৬) পড়ুয়ার বিবরণ—"পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার ফলা/ক খ আক্ষ আস্ক বানান।/গুরু বাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ/পড়িল শুনিল সুলক্ষণ।..." কিংবা শংকরদাসের 'গুরু দক্ষিণা'র সেই বর্ণনা—"অক্ষর চিনিঞা [হরি] পড়ে অভিধান।/সর্ব্ব শাস্ত্র পড়ি হরি হইলা বুদ্ধিমান॥... কাব্য অলংকার পড়ে নাট[ক] নাটিকা।/পুরাণ ভারথ পড়ে আখড়াই মল্লটীকা।..." যে যাই পড়ুন, বলা বাহুল্য, বই বলতে তখন হাতে লেখা পুঁথি। উনিশ শতকের প্রথম প্রহরে কলকাতার পাঠশালা বা টোলগুলোও ব্যতিক্রম নয়। কত পাঠশালা ছিল তখন? ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ লং লিখেছেন--চল্লিশ হাজার পাঠশালায় দেড়শ' বছর ধরে বাঙালী ছেলেরা শুভংকরের আর্যা পড়ছে। এ-হিসাবটি হয়ত কিছুটা ফাঁপানো মনে হতে পারে। তবে অনেক গ্রামেই যে পাঠশালা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার স্কুল সোসাইটি অনুসন্ধান করে জানিয়েছিলেন এ শহরে পাঠশালা রয়েছে ১৯০টি। মোট ছাত্রসংখ্যা ৪১৮০ জন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাডাম তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, কলকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালার সংখ্যা ২১১টি, মোট পড়ুয়া ৪৯০৮ জন। ওয়ার্ড সাহেবের মতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় টোলের সংখ্যা ২৮, ছাত্রের সংখ্যা ১৭৩ জন। স্কুল সোসাইটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কোনও পাঠশালায় মুদ্রিত কোনও বই পড়ানো হয় না। কোনও মতে বর্ণমালা, সংখ্যাপাঠ ও মোটামুটি অংক শাস্ত্র শিখিয়ে দেওয়া হয়। সর্দার পড়ুয়া হাঁক দেয়, অন্যরা হল্লা করে তা-ই আওড়ায়। রামায়ণ মহা-ভারতের যেসব পুঁথি পড়ানো হয় সেগুলি ভুলে বোঝাই।

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২-১৯১০) তাঁর বাল্যশিক্ষার বিবরণে সেকালের পাঠধারার কিছু আভাস দিয়েছেন। তিনি পড়তেন জনৈক বিশ্বনাথ আচার্যের পাঠশালায়। সে পাঠশালার ছাত্রদের বেতন ছিল দু' আনা আর চার আনা। তাছাড়া গুরুমশাই কোষ্ঠী পঞ্জিকাও বিচার করতেন। তাতেও কিছু আয় হত। পড়ুয়াদের জন্য বইপত্র কিছু ছিল না। প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়ে তারপর তালপাতায় অক্ষর মক্‌শ করতে হত। মুখে মুখে মুখস্থ করানো হত চাণক্য শ্লোক।

পাঠ্যপুস্তকের যুগ শুরু হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগেও অবশ্য নবীন পড়ুয়াদের জন্য বই ছাপানো হয়েছে বাংলায়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাংক-স্কোয়ারে মাথা চাড়া দেয় লর্ড ওয়েলেসলির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। তার জন্য শ্রীরামপুর থেকে বেশ কিছু বই ছাপানো হয়েছে যেগুলো মূলতঃ পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু সেসব বই আমাদের পাঠশালার ছেলেমেয়েদের জন্য মুদ্রিত হয়নি, তার লক্ষ্য ছিল কলেজের সাহেব পড়ুয়ারা। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে যেমন আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সূচনা, অন্যদিকে তেমনি সে বছরই সূচিত হয় বাঙালী পড়ুয়ার জন্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশের ব্যাপক উদ্যোগ। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা, আর সে বছরই মে মাসে স্কুল বুক সোসাইটির আবির্ভাব। তারপর এক বছরের মধ্যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইয়ে কলকাতা স্কুল সোসাইটি। পাঠ্য বই প্রকাশনে এই দুই সংগঠনের ভূমিকা ঐতিহাসিক।

স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়—পাঠ্যবই লেখানো এবং সেগুলি ছাপিয়ে সস্তায় কিংবা নিখরচায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া। স্কুল সোসাইটির লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ: ১ শহরের পাঠশালাগুলোর উন্নতি সাধন; ২ আদর্শ ইংরেজী ও বাংলা পাঠশালা খোলা এবং ৩ পাঠশালার পড়ুয়াদের মধ্যে যে সব মেধাবী ছাত্র আছে তাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। ভাল বইপত্র না থাকলে স্কুলে কী পড়ানো হবে সে যেমন এক বৃহৎ প্রশ্ন, তেমনই যথেষ্ট স্কুল না থাকলে ছাপা-বইয়ের চাহিদা কোথায় হবে সেও এক প্রশ্ন। এই দুই সোসাইটি একসঙ্গে সেসব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। একে অন্যের পরিপূরক মাত্র। সত্য বলতে কী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মতোই ঐতিহাসিক ঘটনা এই বে-সরকারী উদ্যোগ। সংস্থা দুটি ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মিলিত প্রয়াসেরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সরকারী অনুদান মিলেছে পরে। সোসাইটি কাজ শুরু করেন প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

স্কুল বুক সোসাইটি অসংখ্য বই ছেপেছেন। নানা ধরনের বই। ১৮১৭ থেকে ১৮২৫

খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশী বই বিক্রি অথবা বিলি করেছেন ওঁরা কলকাতা এবং মফঃস্বলের স্কুলগুলোতে। পাঠ্য বইয়ের বাজার তখন বলতে গেলে প্রায় পুরোপুরি স্কুল বুক সোসাইটির দখলে। অ্যাংগলো-বেংগলী বা ইংরেজী-বাংলা স্কুলগুলোতে তো বটেই, বিশুদ্ধ বাংলা পাঠশালায়ও তাঁদের বইয়ের চাহিদা। ওঁরা পরিকল্পনা করে উচ্চমানের বই লেখাতেন, যত্ন করে ছাপাতেন। বইয়ের দামও রীতিমত সস্তা। অনেক ক্ষেত্রে ওঁরা বাইরে থেকেও পান্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ত সুপারিশ করে কারও বইয়ের পান্ডুলিপি পাঠালেন, অনেক সময় সোসাইটি বিচার বিবেচনা করে সেটি গ্রহণও করতেন। অনেক সময় পাঠ্য বই লেখার জন্য পুরস্কারও দেওয়া হত। তাছাড়া সোসাইটি নগদ অর্থের বিনিময়ে 'কপি রাইট' কিনতেন। কখনও হয়ত অন্যের প্রকাশিত কোনও উচ্চমানের বই বেশ কিছু কপি কিনে নিলেন। এক কথায়, যেভাবে পারা যায় ভাল পাঠ্য বই প্রকাশ এবং বিতরণেই সেদিন উৎসর্গীকৃত সোসাইটির প্রাণ-মন।

১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নানা কারণে স্কুল বুক সোসাইটির বই প্রকাশনা কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে নতুন বইয়ের বদলে তাঁরা মনোযোগী হন পুরানো বইয়ের পুনঃপ্রকাশে। স্বভাবতঃই পাঠ্য বইয়ের বাজার ক্রমে তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবু দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল এই প্রকাশন সংস্থা। অবশ্য ততদিনে পাঠ্য বইয়ের জগতে আবির্ভূত হয়েছেন অন্যরা। বিশেষতঃ, উনিশ শতকের পাঁচের দশকে স্কুল বুক সোসাইটির চেয়ে বেশী নাম ডাক সংস্কৃত প্রেসের। একটি বিবরণে দেখছিলাম ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মহাবিদ্রোহের বছরে সংস্কৃত প্রেস বই প্রকাশ করে ৮৪২০০ খন্ড, অথচ সরকারী অনুদান সত্ত্বেও স্কুল বুক সোসাইটি সে বছর বই ছাপতে পেরেছিলেন মাত্র ৩২০০০ খন্ড!

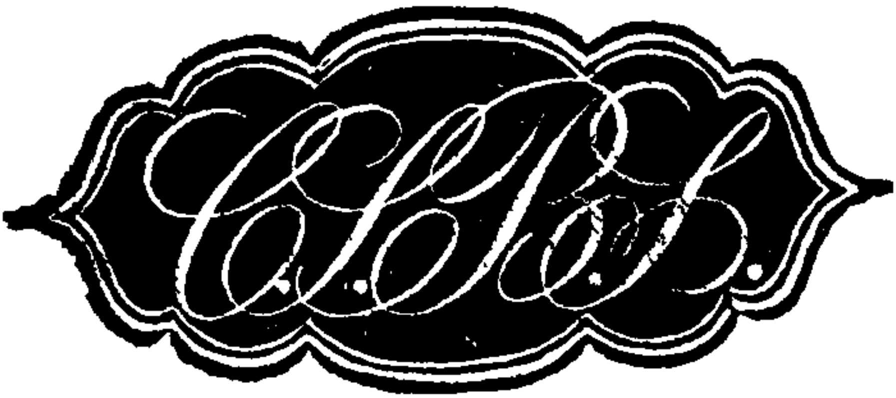

স্কুল বুক সোসাইটির ছাপ

স্কুল-বুক সোসাইটি প্রথম দুই দশকে বিস্তর বই ছেপেছেন। কোনও কোনও বই বছরের পর বছর হাজার হাজার কপি করে প্রচারিত হয়েছে। সোসাইটির সীলমোহর সেদিন ঘরে ঘরে সুপরিচিত। কী কী বই ছেপেছেন ওঁরা হয়ত তার একটি প্রায় নির্ভুল তালিকাও তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। আমরা নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত কিছু বইয়ের নামোল্লেখ করছি মাত্র।

মে'র 'পাটিগণিত', পিয়ার্সনের 'লেসন্‌স বা পাঠমালা', স্টুয়ার্টসের 'লেসন্‌স বা পাঠমালা' (বইগুলোর অন্য বাংলা নাম থাকাও সম্ভব)। 'নীতিকথা' ৩ ভাগ; প্রথম ভাগের লেখক রাধাকান্ত দেব। দ্বিতীয় ভাগের পিয়ার্সন, তৃতীয় ভাগের রামকমল সেন। গোল্ড স্মিথের 'হিস্টরি অব ইংলন্ড' অবলম্বনে ফেলিক্স কেরী লেখেন 'ব্রিটিনদেশীয় বিবরণ সঞ্চয়'। ফার্গুসনের 'ইনট্রোডাকশান টু অ্যাসট্রনমি', অনুবাদক—ইয়েটস। রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ', 'ধারাপাত'। তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জন ইতিহাস'। পিয়ার্সনের 'পাঠশালার বিবরণ'। লসনের 'পশ্বাবলি'। পিয়ার্সনের 'পত্র কৌমুদী' এবং 'ভূগোল বিবরণ'। রামমোহন রায়ের—ভূগোল। কীথের 'বাংলা ব্যাকরণ' (২য় সংস্করণ)। স্টুয়ার্টের 'উপদেশকথা', 'বাংলা লিপিমালা' (বেঙ্গলী আলফাবেট)। প্রথম পাঠ (ফার্স্ট লেসন বুক)। বিশ্বের মানচিত্র (ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস)। ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রীসের ইতিহাস', ব্রজকিশোর গুপ্তের 'বঙ্গভাষা ব্যাকরণ', বিষ্ণুশর্মার 'হিতোপদেশ', উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'গণিত সার', যদুনাথ ভট্টাচার্যের 'বীজগণিত', গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের 'জীবতত্ত্ব' দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের 'প্রকৃত বিবেক' (পদার্থবিদ্যা)।

এছাড়া ছিল ইয়েট্‌সের 'পদার্থবিদ্যাসার' (দ্বিভাষিক), পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলী'। 'অভিধান',

('বালক বালিকাদের শিক্ষার্থে অকারাদি বর্ণক্রমানুসারে অর্থের সহিত বঙ্গভাষার বহু শব্দ সংগৃহীত হইল')। লং-এর 'ধাতুমালা'। 'ভূমি পরিমাণ বিদ্যা' ('অর্থাৎ ক্ষেত্রাদির মাপ এবং চিত্র করণের প্রাথমিক শিক্ষাপযোগি গ্রন্থ')। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ক্ষেত্র তত্ত্ব'। রামকমল বিদ্যালংকারের 'ধাতু বিবেক'। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'ব্যাকরণ প্রবেশ'। লং-এর 'প্রবাদমালা' (২য় খণ্ড সংকলন করেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।) 'বিভিন্ন মানচিত্র' প্রভৃতি।

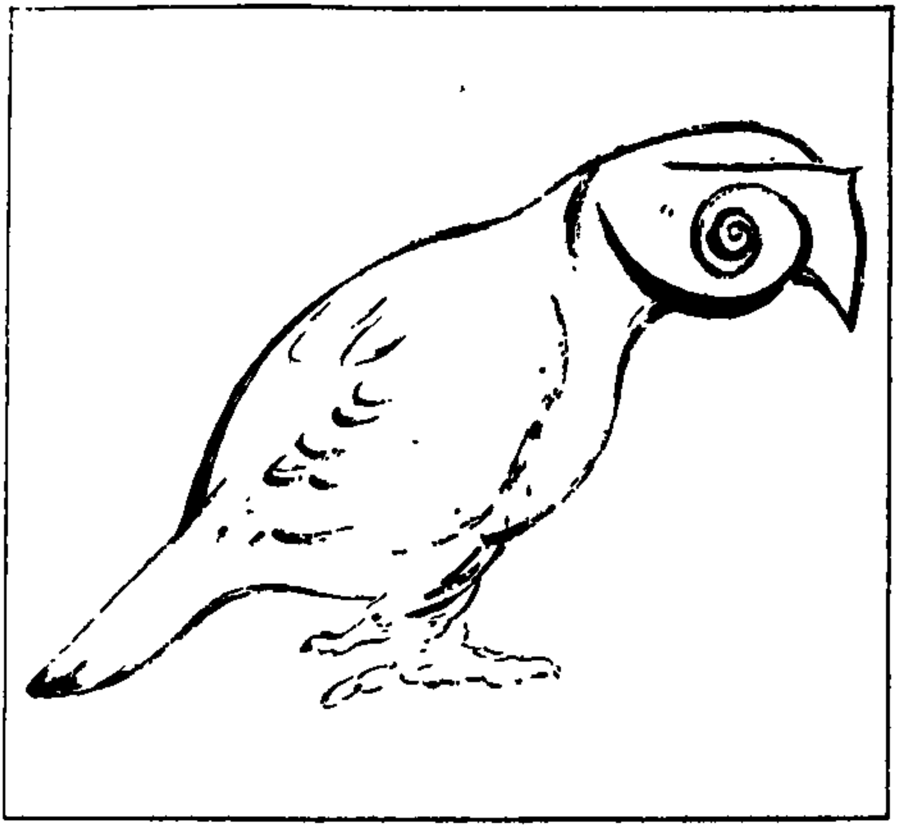

অবনীন্দ্রনাথের 'চিত্রাক্ষর' থেকে

আগেই বলেছি স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত বইয়ের দাম খুব সস্তা ছিল। তার কিছু ইঙ্গিত মেলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে।

"সত্য ইতিহাস সার—৷৵০, অভিধান—৷৵০, সার সংগ্রহ—৷৵০, পশ্বাবলি—৷৷৵০ ,ভূমি পরিমাণ বিদ্যা—৷৵৵০, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ—।৶০, বঙ্গদেশের ইতিহাস—৷৵০, কীথ সাহেবের ব্যাকরণ—৶০, রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ—।০, ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ—।৵০, গণিত সার—।৵০...মে সাহেবের অঙ্ক পুস্তক—৶০। বঙ্গভাষা বর্ণমালা—/০, বর্ণমালা, প্রথম ভাগ—/০, ঐ দ্বিতীয় ভাগ—/১০, জ্ঞান দীপিকা—৶০, নীতিকথা—১, ২, ৩,—/০, /০, /৫, মনোরঞ্জন ইতিহাস—/১০, পত্রকৌমুদী—৶০, অদ্ভুত ইতিহাস, জঙ্গসথার বৃত্তান্ত—/১০, সিকন্দর শাহার দিগ্বিজয়—/১০, তৈমুর লং বৃত্তান্ত —৶১০, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক—৶০..." ইত্যাদি।

উনিশ শতকে স্বভাবতঃই বাঙালীর বিশেষ ঝোঁক ইংরেজী শিক্ষার দিকে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলের 'মিনিট', প্রাচ্য আর পশ্চিমী শিক্ষাধারার বিতর্কের অবসান। ১৮৩৭-এ স্থির হয় আদালতের ভাষা ফারসী নয়, ইংরেজী। যাঁরা কষ্ট করে ফারসী শিখেছিলেন এই ঘোষণা সেদিন তাঁদের মনে কী নৈরাশ্য সৃষ্টি করেছিল তার ইঙ্গিত মেলে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের জবানবন্দীতে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নূতন সরকারী নির্দেশে রাজকার্যে তাঁরাই অধিকতর সুযোগ পাবেন যাঁরা ইংরেজীনবিস। স্বভাবতঃই চতুর্দিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার লেখাপড়াও কিন্তু সমান গুরুত্ব লাভ করে। এমন কি খ্রীষ্টান পাদ্রিরা যেসব পাঠশালা পরিচালনা করতেন সেখানেও শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। চুঁচুড়ার রবার্ট মে,

বর্ধমানের জেম্‌স স্টুয়ার্ট, কিংবা শ্রীরামপুরের পাদ্রিরা উনিশ শতকের প্রথম দিকে যেসব পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানেও বাংলা ভাষা ছিল অন্যতম পাঠ্য। সেদিন বাংলা পাঠ্য বইয়ের চাহিদা তাই সব মহলেই। স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরে অনেক স্কুলে তাঁদের প্রকাশিত বই-ই পড়ানো হত। পল্লীগ্রামে কিছু পাঠশালায় অবশ্য চলত অন্যদের প্রকাশিত নিম্নমানের বই। উঁচুদরের বাংলা বইয়ের চাহিদা আরও বেড়ে যায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ

হিন্দু কলেজের সীল

পাঠশালা বা বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পর। এই পাঠশালার জন্যও বিশেষভাবে কিছু বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লিখলেন বর্ণপরিচয়। অন্যরা কেউ লিখলেন ভূগোল, কেউ গণিত, কেউ ইতিহাস, কেউ বিজ্ঞান। প্রকাশিত বইগুলোর জন্য একটি সাধারণ নাম ধার্য হল—শিশু সেবধি। আমরা এই সিরিজের কয়েকটি বই দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। নামপত্র লেখা হত এই ভাবে—শিশু সেবধি/বর্ণমালা/১ম সংখ্যা/দ্বিতীয় খণ্ড/পাঠশালার ব্যবহারার্থ/কলিকাতা/জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত/শকাব্দ ১৭৭৭।...কিংবা শিশু সেবধি/নীতিদর্শক/হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে পাঠশালার ব্যবহারার্থ/হিন্দু কালেজ/সন ১২৪৭। . অথবা শিশু সেবধি/ভূগোল বৃত্তান্ত/১ম ভাগ/আসিয়া খণ্ড/ইংলণ্ডীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত/হিন্দু কালেজ/১২৪৬। ১৮৪০-এ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। 'হিন্দু কলেজ পাঠশালার ন্যায় এই পাঠশালাটিরও পাঠ্যপুস্তক রচনায় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এবং শিক্ষক অক্ষয়কুমার নিজেরাই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে মন দিলেন। অক্ষয়কুমার ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক লিখিলেন।'

ঠিক পাঠশালার উপযোগী না হলেও ওই সময়ে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজও (প্রতিষ্ঠা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এমন কিছু কিছু বই প্রকাশ করেন যার কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। যথা: 'রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত', বারখানি চিত্রযুক্ত, ৩২৬ পৃঃ, দাম—।৵০; 'পাল ও বর্জিনিয়ার কাহিনী', দুইখানি চিত্রযুক্ত, ২৫৫ পৃঃ, দাম—।৵০; 'সংবাদ সার', চারিখানি চিত্রযুক্ত, ১৯৮ পৃঃ, দাম—।০; 'লর্ড ক্লাইব চরিত', চারিখানি চিত্রযুক্ত, ৭৫ পৃঃ, দাম—৶০; 'সেক্সপিয়ার-কৃত গল্প' ২১২ পৃঃ, দাম—৶০; 'মনোরম্য পাঠ্য', ১১৪ পৃঃ, দাম—৶০; 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত', ৬৩ পৃঃ, দাম—৵০; 'হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিষয়', এক চিত্রযুক্ত, ৪৪ পৃঃ, দাম—/১০; 'পুত্রশোকাতুর দুঃখিনী মাতা', এক চিত্রযুক্ত, ৫৪ পৃঃ, দাম—/১০ ইত্যাদি ইত্যাদি। এ তালিকা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের।

অন্যদিকে বিদেশীদের উদ্যোগেও আরও কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা খ্রীশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি। তাঁরাও পরবর্তী-কালে, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতকের পাঁচের দশকে বেশ কিছু বই প্রকাশ করেন। যথা: 'পাঠ্যসংগ্রহ', 'অরুণোদয়', 'কথামঞ্জরী', 'প্রাচীন কাহিনী', 'নবীন তপস্বী' (মার্টিন লুথার), রঙিন ছবির বই—ইত্যাদি। খ্রীশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি ১৮৫২ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নবীন পড়ুয়াদের মধ্যে বই বিক্রি করেন ৫১৩৬৮৫ কপি। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিক্রি করা হয় আরও ৩০৪১৪১ কপি। ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের পরে আরও একটি খ্রীষ্টীয় সংগঠন আবির্ভূত হয় এদেশে। তার নাম খ্রীশ্চিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি। এই সোসাইটি বেঁচে ছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তেরো বছরে তাঁরাও অন্তত খান দশেক শিশু-পাঠ্য বই প্রকাশ করেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সত্য প্রদীপ' নামে কাগজটি।

মিশনারিদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের লেখা পাঠ্যবই সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন, —খ্রীষ্টানদের পরিচালিত স্কুলগুলোতে ওইসব বই পড়ানো কি সঙ্গত? বিশেষ করে ওঁদের বই যেখানে 'ধর্ম নিরপেক্ষ', 'কিংবা 'ব্রাহ্মপন্থী', সে আপত্তি অবশ্য কেউ মানেননি। তবে পাদ্রিদের বইতে অনেক সময়ই দেখা গেছে ধর্মশিক্ষার নামে বাড়াবাড়ি। 'বঙ্গাক্ষর' নামে নামপত্রহীন একটি শিশুপাঠ্য বইয়ে দেখা যায় পাতায় পাতায় 'পাপ' আর 'পাপ'। যথা—"আমি অতি দীনদীন পাপী। এই নারীও দীনহীন প্যাপিনী।...আমরা অতি দোষী। তিনি আম্যাদিগকে কোপেতে মারিলেন।... যেন অন্যায় বাক্য বলিয়া পাপ না করে সেই জন্য ভাল লোকেরা বাক্য কহিবার আগে ভাব্যভাবনা করে।..." ইত্যাদি।

প্রথম যুগের পাঠ্যপুস্তকে অনুবাদের বিশেষ ভূমিকা আছে। শুধু অনুবাদ নয়, বইয়ের পরিকল্পনাও প্রায়শঃ ধার করা। বিদেশী নমুনা সামনে রেখে রচিত হয়েছে স্বদেশী বই। কিছু কিছু দ্বি-ভাষিক বইও বের হয়েছিল। সে-ধারার সূচনা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর 'কথোপকথনে'। সে-সব বই প্রধানতঃ সাহেবদের কথা মনে রেখে লেখা। লেখকদের মধ্যে ইংরেজও রয়েছেন। যেমন ডানকান ফরবেস। তাঁর 'বেঙ্গলী রীডার' প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন থেকে। কে. এস. ম্যাক-ডোনাল্ডের 'ইংলিশ-বেঙ্গলী রিডিংবুক' অবশ্য ছাপা হয়েছিল কলকাতায় (১৮৭৬)। কিছু কিছু বাঙালী লেখকও এ-ধরনের বই লিখেছেন। যেমন, তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'মিলিত বাক্য', 'ডায়ালগস অ্যান্ড ভোকাবুলারিজ ইন বেঙ্গলী অ্যান্ড ইংলিশ' (১৮৭৭), চন্দ্র-মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'ইডিওমেটিক এক্সারসাইজেস' (১৮৭৬), আনন্দমোহন দত্ত লিখলেন 'হেলপ টু স্টুডেন্টস' (১৮৭৬)। তবে সকলেই জানেন, বাঙালীকে ইংরেজী শেখাবার উদ্যোগে সবচেয়ে স্মরণীয় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বই প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্স্ট বুক অব রিডিং'। (প্রথম প্রকাশ—১৮৫০)। তাঁর ওই পর্যায়ের বইগুলো শুধু এই রাজ্যে নয়, যুগের পর যুগ লক্ষ লক্ষ ভারতীয় ছেলেমেয়েকে ইংরেজীতে দীক্ষিত করেছে।

দ্বি-ভাষিক বইয়ের মতো কিছু কিছু বহু-ভাষিক বইও ছিল। পলিগ্লট ঈসপের কথা সকলের জানা। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইয়ের বাংলা অংশের অনুবাদ করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। (বইটির নাম 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'; সম্পাদক—জন গিলক্রাইস্ট।) ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'পলিগ্লট গ্রামার অ্যান্ড এক্সারসাইজেস' নামে আর একটি চমকপ্রদ বই। লেখক মুনশি দেবপ্রসাদ রায়। সহযোগিতায় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুনশি হরিমোহন দত্ত এবং মাদ্রাসার মৌলবী জোয়াদ আলি। বইটির বাংলা শোনার মতো। যথা: 'হু ইজ দ্যাট ইউরোপীয়ান'র বাংলা করা হয়েছে, 'ও গোরা কে?' অনুবাদের আরও কিছু নমুনা: ডু নট ফরগেট—পাসুরিও না, 'অ্যাওয়েক মি ভেরি আর্লি'—অতি প্রাতে আমাকে জিগাইও, ইন দিস হাউস দেয়ার ইজ এ হল অ্যান্ড থ্রী রুমস—এই ঘরে এক দালান ও তিন কুঠরী। এ-বইয়ে ইংক—সিয়াহি, কটন—রুই।

আগেই বলা হয়েছে স্কুল বুক সোসাইটির পরে বাংলা পাঠ্যবই প্রকাশের ইতিবৃত্তে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল নাম—সংস্কৃত প্রেস। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত— দীর্ঘকাল পাঠ্যবই রচনায় এই তিন প্রধান ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতো। তাঁদের বইগুলো সম্পর্কে আলোচনার আগে সাধারণভাবে উনিশ শতকের পাঠ্যবইয়ের জগতের দিকে একবার তাকানো যাক। পুরানো দিনের তালিকাগুলোর ওপর চোখ বোলালে আজ অনেক কিছুই চমকপ্রদ ঠেকে। প্রথম দ্রষ্টব্য—সেদিন দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা এগিয়ে এসেছিলেন শিশুপাঠ্য বই রচনায়। পাঠ্যবইয়ের দুনিয়ায় দেশী বিদেশী নানা গুণীজনের ভিড়। বিদেশীদের মধ্যে যেমন রয়েছেন—কেরী, ফেলিক্স কেরী, কীথ, গিলক্রাইস্ট, ইয়েটস, ওয়েঙ্গার, পিয়ার্সন, লং, ম্যাক, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট বাংলা-নবিসরা, তেমনই স্বদেশী লেখকদের মধ্যে রয়েছেন—রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি স্বনামধন্য বাঙালী বুদ্ধি-জীবীরা। দ্বিতীয় দর্শনীয়, বইয়ের বিষয় এবং রূপ-বৈচিত্র্য। ছবির বই, চার্ট, কাঠের টুকরোয় রঙিন হরফ—কী না ছিল সেদিন! তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রকাশন শিল্পের ব্যাপ্তি। সন্দেহ নেই সেদিনও পাঠ্যবই মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। কিন্তু এখনকার মতো একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। হুগলি, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া তো বটেই, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, বেনারস, এমনকি হালিশহর, কাঁঠালপাড়া, উত্তরপাড়া থেকেও ছোটদের জন্য বই ছাপা হয়েছে সেদিন। মফস্বল থেকে প্রকাশিত কোনও কোনও বই বেশ জনপ্রিয়ও ছিল।

পুরানো পাঠ্যবইয়ের গুণাগুণ বিচারের পথে প্রধান সমস্যা এই যে, পাঠ্যবই সুদুর্লভ বস্তু। শৈশবের মতো পাঠ্যবইও দেখতে না দেখতে হারিয়ে যায়। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পড়ার বই সাধারণতঃ কেউ সযত্নে রক্ষা করেন না। এমনকি অধিকাংশ গ্রন্থাগারেও তারা অবাঞ্ছিত। কারণ সাধারণ গ্রন্থাগারে কেউ শিশুপাঠ্য বই পড়তে যান না, কেউ তাই আলমারি বোঝাই করার তাগিদ অনুভব

করেন না। তবু যে দেশে বিদেশে বড় বড় গ্রন্থাগারে কিছু পাঠ্যবই এখনও টিঁকে আছে তার কারণ বই মাত্রেই সেদিন দুর্লভ। ফলে পাঠ্যবইও দুর্লভ বস্তু বলে গণ্য হত। তাছাড়া, কারা কেমন বই প্রকাশ করছেন সেদিকেও সংগ্রহকারীদের কিছুটা কৌতূহল ছিল। ফলে, সব বই না হলেও কিছু কিছু বই এখনও রয়ে গেছে। হয়ত সব সময় প্রথম সংস্করণের বই নয়, তবু পাতা ওলটালে পুরানো দিনের কিছু সৌরভ পাওয়া যায়।

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারে কিছু পাঠ্যবই রয়েছে। সেসব বই ঘাঁটাঘাঁটি করলে উপরি পাওনা লেখক সম্পর্কেও নানা টুকরো খবর। যেমন 'শিশুপদেশ' নামক একটি ছোট্ট বইয়ের (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬২, দাম—/৫) লেখক হরচন্দ্র সেন জানাচ্ছেন তিনি 'ঢাকা জেলার অন্তর্গত পারডোনা নিবাসি।' 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (শকাব্দ ১৭৭৭) সম্পর্কে বলা হচ্ছে—'বারাসাতস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংকলিত'। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'বিচার' (১৮৫৮) নামক বইটির বিষয়বস্তু কিছুটা চমকপ্রদ, নামপত্রে বলা হচ্ছে 'বিচার—অর্থাৎ বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের দোষ পরীক্ষা।' কাঙ্গালীচরণ সিংহ তাঁর সচিত্র 'সুশিক্ষাবলী' ওরফে বর্ণবোধ (অব্দ ১২৭০) ছাপিয়ে বলছেন 'মিশনারি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ইহা গ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।' আবার 'হিতোপদেশে'র একটি সংস্করণে রয়েছে তার প্রকাশন-ইতিবৃত্ত—"এই পুস্তকে যে যে হিতোপদেশ সংগ্রহ হইল তাহা প্রথম শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক সংগৃহীত। ইহার পূর্ব্বে তিনি ঔষধসার সংগ্রহ নামে পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের উপকার ও আপন সুখ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছেন, তিনি হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়া মোং কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, পরে ঐ সম্পাদক শ্রীরামপুরের পাঠশালার নিবন্ধকর্ত্তারদের নিকটে সেই হিতোপদেশ অর্পণ করিয়া কহিলেন যে, শ্রীরামকমল সেন সংগৃহীত হিতোপদেশ মিলাইয়া পুস্তক ভারী করিয়া ছাপা কর; পরে সেই মত করা গেল।...এই পুস্তক ছয় হাজার আদর্শ ছাপা গিয়াছে, ইহাতে পাঁচ হাজার কলিকাতার কারণ অবশিষ্ট এক হাজার শ্রীরামপুরান্তঃপাতি পাঠশালার নিমিত্ত।" ইত্যাদি।

হারানো দিনের সব শিশুপাঠ্য বই হয়ত এখনও হারিয়ে যায়নি। কিছু কিছু বই এখনও হয়ত লুকিয়ে আছে নানা গ্রন্থাগারে সত্যকারের গবেষকের অপেক্ষায়। এ-রচনা পল্লবগ্রাহীর। আমাদের প্রধান ভরসা ছিল কিছু গ্রন্থতালিকা। সে-সব থেকে হয়ত সেদিনের শিশুর ভূমণ্ডলের একটা রূপরেখা পাওয়া যায়, কিন্তু শিশুশিক্ষা ঘিরে যেসব তাত্ত্বিক বিতর্ক, কিংবা শিশুপাঠ্যের বিবর্তনের কাহিনী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলি লং লিখেছেন, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লিপিধারা বইটিতে বাংলা লিপি ছিল ৭৬০টি। পরবর্তীকালে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার কেমন করে কমল, কতখানি কমানো সম্ভব হল সেটাও কিন্তু একটা অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে।

আমাদের হাতে সবচেয়ে পুরানো যে গ্রন্থতালিকাটি রয়েছে সেটি লং সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকা। শ্রীরামপুরে সেটি মুদ্রিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তালিকাটি সংক্ষিপ্ত। সব বইয়ের লেখকের নামোল্লেখ নেই। প্রথম প্রকাশের তারিখও অনুল্লেখিত। তার তিন বছর পরে (১৮৫৫) প্রকাশিত হয় লং সাহেবের চৌদ্দশ বাংলা পুস্তক-পুস্তিকার সেই বিখ্যাত এবং বিস্তৃত তালিকাটি। তাছাড়া বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ (১৮৬৭) এবং অন্যান্য তালিকাও রয়েছে। রয়েছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত বাংলা বইয়ের তালিকার শিশুপাঠ্য অধ্যায়ের বইগুলিতেও চোখে পড়ার মতো অনেক খবর।

লং সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকাটিতে (১৮৫২) ইয়েটস এবং অক্ষয়কুমারের 'পদার্থ বিদ্যা', কিংবা উইলসন এবং কৃষ্ণমোহনের 'উপদেশ কথা, বা 'ইতিহাস সমুচ্চয়' ও 'ইতিহাসমালার' মতো পরিচিত বই ছাড়াও আছে 'বালকের প্রথম পড়িবার বই', 'বর্ণমালা লিপি', 'ছবি পুস্তক', 'শিশুচিত্র পুস্তক', ইত্যাদি হরেক প্রাথমিক বইয়ের নাম। বস্তুতঃ ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কত বই যে প্রকাশিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সব উদ্যোগী অবশ্য সফল হননি। কোনও কোনও বই দিনের আলো দেখার পরেই তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। অ-আ-ক-খ'র বই হিসাবে কয়টি বইয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন লং। যথা: তত্ত্ববোধিনী সভা প্রকাশিত প্রথম 'পড়িবার বই' (১৮৩৫), স্কুল বুক সোসাইটির 'বর্ণমালা' (৭ম সংস্করণ, ১৮৫৩), ইয়ুলের 'শিশুবোধোদয়', এবং রাধাকান্ত দেবের 'স্পেলিং বুক' (১৮২০)। লং সাহেবের মতে প্রকাশিত সব বানান শিক্ষার বইয়ের মধ্যে এটাই সেরা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—মেয়েদের জন্য অনেক সময় প্রকাশিত হয়েছে স্বতন্ত্র প্রথম পাঠ। যথা: 'বালাবোধ' (ঢাকা, ১৮৭৪), কামিনীসুন্দরী দেবীর 'বালাবোধিকা' (১৮৬৮), প্রফুল্লকুমারী দাসীর 'বালিকাবোধ' (১৮৭৬), ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, এগুলো ছাড়াও অনেক, অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে তৎকালে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকা থেকে আমরা তার মধ্যে এমন কয়েকটির উল্লেখ করছি যেগুলি কিছুটা জন-

প্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে সাতকড়ি দত্তের 'প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঠ'। প্রথম পাঠের দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, বিংশ সংস্করণ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, চতুর্দশ সংস্করণ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। সাতকড়ি 'তৃতীয় পাঠ'ও প্রকাশ করেছিলেন। কামাখ্যাচরণ ঘোষের 'রত্নসার' (অষ্টম সংস্করণ, হরিনাভি, ১৮৭৮), কাশীনাথ ভট্টাচার্যের 'সরল পাঠ' (দ্বিতীয় সংস্করণ, হুগলি ১৮৬৯, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৭৫), হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণপরীক্ষা' (১৮৬৯-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়), নবকুমার নাথের 'বর্ণপরীক্ষা'ও (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৫) বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বর্ণশিক্ষা' (১৮৬৮), দ্বারকানাথ দত্তের 'বিবিধ পাঠ' (১৮৭৩), শ্রীনাথ চন্দের 'ভাষাবোধ' (ময়মনসিংহ ১৮৭৭), রামগতি ন্যায়রত্নের 'শিশুপাঠ' (হুগলি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬৮, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৮৭৫), রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' (প্রথম সংস্করণ ১৮৭৭, ঢাকা), ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'নব শিশুবোধ' (প্রথম সংস্করণ ১৮৭৩) এবং বিখ্যাত 'শিশুবোধক'। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যে বইগুলো আছে তার মধ্যে প্রাচীনতমটির প্রকাশ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। সেটি প্রথম সংস্করণ কিনা তালিকায় তার উল্লেখ নেই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওঁরা ৩০টি সংস্করণের বই সংগ্রহ করেছেন। সব কয়টির পৃষ্ঠা সংখ্যা এক নয়, প্রথম সংস্করণে (?) ছিল ৫৬ পৃষ্ঠা, তারপর ৪৮, ৮২, ১০০, ১০৮, ১০১, ৯৬, ১১৪, ১২০, —নানা মাপের 'শিশুবোধক'ই রয়েছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণটিকে বলা হয়েছে —নৃত্যলাল দত্ত কর্তৃক সংশোধিত! শিশুপাঠ্য বইয়ের তালিকায় আর একটি জনপ্রিয় নাম 'বর্ণবোধ'। একই নামের বই, কিন্তু লেখক একাধিক। কাঁঠালপাড়া থেকে প্রকাশিত (১৮৭৫) 'বর্ণবোধ'-এর লেখকের নাম নেই। ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৮৭৭) 'বর্ণবোধ'-এর লেখক রামনাথ রায়। হুগলি থেকে প্রকাশিত 'বর্ণবোধ'-এর (১৮৭৪-৭৫) লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতার 'বর্ণবোধ'-এর (১৮৭৩-৭৫) লেখক শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সেকালে কয়েকটি গদ্য এবং পদ্য সংকলনও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গদ্য সংকলনগুলোর মধ্যে কৃষ্ণমোহনের 'বিবিধপাঠ' (১৮৪৬), লং-এর 'পাঠাবলী' (১৮৫৪) এবং ইয়েটসের সংকলনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদ্য সংকলনের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল যাদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্যপাঠ' (৬ খণ্ড) এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'কুসুমাবলী'। প্রথমটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেখতে দেখতে সাত আটটি সংস্করণ। 'কুসুমাবলী'র প্রথম প্রকাশ ১২৫৮ সালে বা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম ভাগে প্রধানতঃ স্থান পেয়েছেন ভারতচন্দ্র। কয়েক পৃষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর জন্য। দ্বিতীয় ভাগে কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর), বাসবদত্তা, অদ্ভুত রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি। নবীন পড়ুয়াদের জন্য সংকলিত বই। স্বভাবতঃই বলা নিষ্প্রয়োজন বিদ্যাসুন্দর সতর্কতার সঙ্গে উদ্ধৃত এবং সম্পাদিত।

শত শত বইয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল একদিকে 'শিশুবোধক' আর 'বাল্যশিক্ষা', অন্যদিকে মদনমোহন, বিদ্যাসাগর আর অক্ষয়কুমারের বইগুলো। 'শিশুবোধকে'র জনপ্রিয়তার কথা আগেই বলা হয়েছে। তাতে বাংলা ইংরেজী বর্ণমালা, বাংলা বানান, পত্র, আর্যা, নামতা, অঙ্ক, গঙ্গার বন্দনা, গুরু দক্ষিণা, দাতা কর্ণ, কলঙ্ক ভঞ্জন, চাণক্য শ্লোক, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, প্রহ্লাদচরিত—অনেক কিছুই রয়েছে। মনে হয় এক বইতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের জ্ঞাতব্য সব কিছুর একটা ধারণা করিয়ে দেওয়াই ছিল সচিত্র এই বইটির উদ্দেশ্য। এক সংস্করণের সঙ্গে আর এক সংস্করণের বিষয়সূচীর হয়ত কিছু হেরফের ঘটেছে পরবর্তীকালে, কিন্তু 'শিশুবোধকে'র ছকটি আদিম, এ বই সাধারণের পক্ষে সর্বার্থসাধক। লং লিখেছেন—"দিস বুক হ্যাজ বিন ফর সেনচুরিজ দি কী টু বেঙ্গলী রিডিং।" বিচিত্র এই বইটি কিন্তু এখনও পুরোপুরি লুপ্ত নয়। নতুন করে ছাপা হয় কি না জানি না, কিন্তু একালে ছাপা নানা সংস্করণের বই প্রায়শঃ এখানে ওখানে দেখা যায়। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দুশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে (১৯৭৯) যে-বইটি ছিল তার প্রকাশক ছিলেন বিজলী প্রেস (আহিরীটোলা), প্রকাশকাল—১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

'বাল্যশিক্ষা'ও বেঁচে ছিল অনেককাল। বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে। জানি না সেখানে এই বইটির এখনও চল আছে কি না। ঢাকা থেকে রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা'র প্রথম প্রকাশ মনে হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন দাম ছিল—/০। পরের বছরই তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ খুললে বোঝা যায় বইটি কত জনপ্রিয় ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বইটি বিক্রি হয় ১০ হাজার কপি, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ হাজার কপি, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ হাজার কপি, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৫০ হাজার কপি, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ হাজার কপি। এক বছর (১৮৮৭) বইটির ১ লক্ষ কপিও প্রচারিত হয়েছিল!

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'র (১৮৪৯) একটি পৃষ্ঠা।
প্রায় একশ বছর আগেকার একটি কাঠের ব্লক থেকে ছাপা

তবে উনিশ শতকের বাংলায় শিশুপাঠ্য রচনায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন যে ত্রয়ী তাঁরা মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর অক্ষয়কুমার দত্ত। মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগের প্রথম প্রকাশ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগও একই বছরে। তৃতীয় ভাগ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থ ভাগ রচনা করেন বিদ্যাসাগর। সে বই 'বোধোদয়'। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম ভাগও প্রকাশিত হয়েছিল। তার লেখক ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

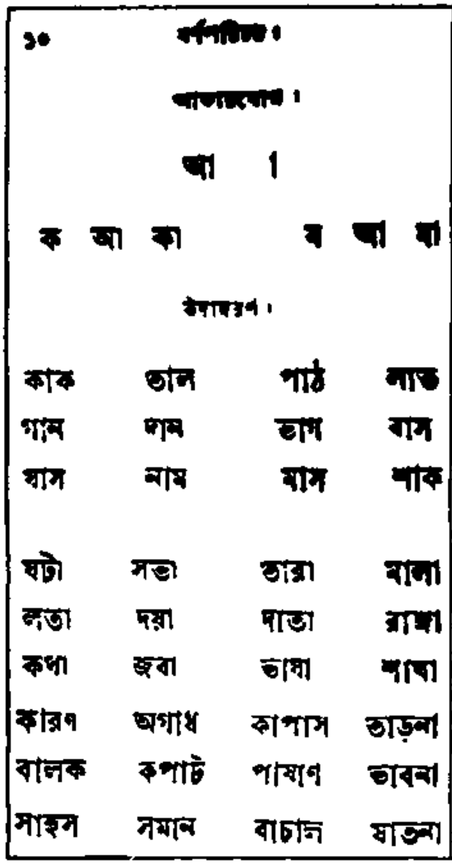
১০ বর্ণপরিচয়।

আকারযোগ।

আ া

ক আ কা   খ আ খা

উদাহরণ।

কাক	তাল	পাঠ	লাভ
গান	দাম	ভাগ	বাস
খাস	নাম	মাস	শাক
ঘটা	সভা	তারা	মালা
লতা	দয়া	দাতা	রাজা
কথা	জবা	ভাষা	শাখা
কারণ	অগাধ	কাপাস	তাড়না
বালক	কপাট	পাষাণ	ভাবনা
সাহস	সমান	বাতাস	যাতনা

প্রথমভাগের একটি পৃষ্ঠা

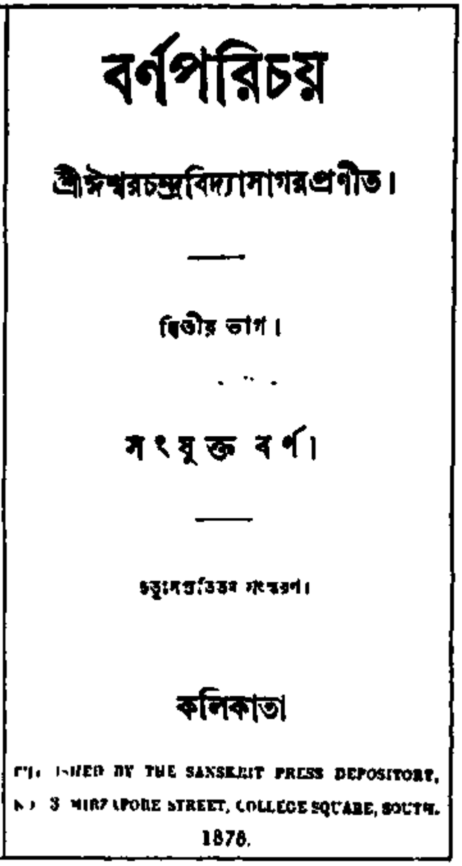
বর্ণপরিচয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরপ্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্ত বর্ণ।

চতুর্দশাধিকশততম সংস্করণ।

কলিকাতা

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
No. 3 MIRZAPORE STREET, COLLEGE SQUARE, SOUTH.
1878.

দ্বিতীয়ভাগের নামপত্র

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগের প্রকাশ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় ভাগও একই বছরে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগের ১৪৯টি সংস্করণ হয়। (প্রথমে বইটির দাম ছিল /৬ পাই, পরে কমিয়ে /০ আনা করা হয়।) ১৮৮৯ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের সংস্করণ হয় ৮৪টি। (এরও দাম ছিল প্রথমে /৬ পাই, পরে /০ আনা।) ১৮৯০ পর্যন্ত 'শিশুশিক্ষা'র তৃতীয় ভাগের সংস্করণ হয় ১০১টি। দাম—/৬ পাই। অন্যদিকে প্রথম প্রকাশের পর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের সংস্করণ হয় ১৫২টি। (১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৯টি সংস্করণে ৫৩ হাজার কপি বই প্রচারিত হয়েছিল।) প্রকাশের সময় প্রথম ভাগের দাম ছিল ৯ পাই, পরে বাড়িয়ে /০ আনা করা হয়। ১৮৯০ পর্যন্ত 'বর্ণপরিচয়ে'র দ্বিতীয় ভাগের সংস্করণ হয় ১৪০টি। দ্বিতীয় ভাগের দাম ছিল প্রথমে ৯ পাই, পরে বাড়িয়ে /৩ পাই করা হয়। 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ বা 'বোধোদয়ে'র জনপ্রিয়তাও দেখবার মতো। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯০-এর মধ্যে ছাপা হয় ১০৬টি সংস্করণ। 'বোধোদয়ে'র দাম ছিল —৵০ বিদ্যাসাগরের আর একটি বই 'কথামালা'র প্রথম প্রকাশ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯০-এ তার সংস্করণ হয় ৫১টি।

'শিশুশিক্ষা' বা 'বর্ণপরিচয়' শুধু বিশিষ্টজনের রচনা বলেই নয়, এই বই দুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালী শিশুকে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার ঐতিহাসিক উদ্যোগের কাহিনী। 'শিশুবোধক', 'শিশুশিক্ষা' ও 'বর্ণপরিচয়' নিয়ে একটি দীর্ঘ এবং মনোজ্ঞ আলোচনা

করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। বিশেষতঃ 'শিশুশিক্ষা' এবং 'বর্ণপরিচয়ে'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে হলে এই আলোচনাটি অবশ্য পাঠ্য। মদনমোহনের কৃতিত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— "প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি। মদনমোহন প্রথমেই গণিত প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষা থেকে ভাষা শিক্ষাকে, স্বাতন্ত্র্য দান করলেন এবং জ্ঞাতব্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাষাশিক্ষাকে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করলেন, ঠিক যেন শিশুর হাত ধরে তাকে একটি সিঁড়ি পার করে ভাষা-মন্দিরের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিলেন।..." 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথমভাগের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন—"বহুকাল অবধি বর্ণমালা, ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে, ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে।...ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়; সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।" প্রবোধবাবু মন্তব্য করেছেন—"এই কয়টি পঙক্তির মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণকারের মননস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। বাংলা বর্ণমালার এই সংস্কারসাধন ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য হবার যোগ্য। এই বর্ণমালা থেকেই 'শিশুশিক্ষা' থেকে 'বর্ণ পরিচয়'-এর পার্থক্য শুরু হয়।"

বর্ণমালা সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর কিন্তু উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলা ছাপাখানা সংস্কারেও। শোনা যায় পাঠ্য বইয়ের হরফে এবং যুক্তাক্ষরের লিপিচিত্রে সমতা আনার জন্য তিনি শ্রীরামপুরের অধর টাইপ ফাউণ্ড্রি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন!

তাৎপর্যে 'বর্ণপরিচয়ে'র মতো যুগান্তকারী না হলেও অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ'ও সেকালের একটি বিশিষ্ট পাঠ্যপুস্তক। 'চারুপাঠ'-এর তিনটি খণ্ড ছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৪। তৃতীয় খণ্ড ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৫ অবধি 'চারুপাঠ'-এর প্রথম ভাগের সংস্করণ হয়েছিল ৩৯টি, ১৮৭৮ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগের সংস্করণ হয় ২১টি এবং ১৮৮৮ পর্যন্ত তৃতীয় ভাগের সংস্করণ হয় ৩১টি। বিষয়ের বিশিষ্টতায়, রচনার গুণে, এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য চারুপাঠ সেদিনের পাঠ্যবইয়ের দুনিয়ায় এক উজ্জ্বল গ্রন্থমালা।

উপসংহারে অর্থ-পুস্তক বা নোটবই সম্পর্কে দু'একটি কথা। লালবিহারী দে তাঁর স্মৃতি-কথায় লিখেছেন তাঁদের ছাত্রজীবনে নোট বইয়ের কোনও বালাই ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের দুয়ের দশক থেকে দেখা যায় কলকাতার বিদ্যার হাটে নোট-বইয়ের বান ডেকেছে। বিশেষতঃ ইংরেজী বইয়ের অর্থ-পুস্তকের। অপেক্ষাকৃত উঁচু ক্লাসের ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের 'মানে বই' তো বটেই, বাজারে তখন (১৮৬৯) এমনকি 'বেঙ্গলী মিনিংস অব দি ওয়ার্ডস অব দি ফার্স্ট বুক অব রিডিং'-ও লভ্য। এদিকে একাধিক লেখক বসে গেছেন 'বোধোদয়ে'র অর্থপুস্তক রচনায় (১৮৭৩-৭৪), এবং দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে তাদের এক একটি সংস্করণ। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারে চোখে পড়েছিল এমনকি 'কথামালা'র একটি অর্থপুস্তক (১৮৫৯)। নাম—'কথামালার্থ'। একালের শিক্ষাজগতে অর্থ-পুস্তক ঘিরে যে-অনর্থ তারও অতএব আদি আছে!

পাঠপঞ্জী

De, Amalendu. *Publication of Text-Books in Bengali, a Movement for Child Education in Nineteenth Century Bengal.* David Hare Bi-Centenary Volume. Ed. Rakhal Bhattacharya, 1975-76

India Office Library. *Catalogue of Bengali, Oriya and Assamese Books,* comp. by J. F. Blumhardt. London, 1905—

Long, J. *A Descriptive Catalogue of Bengali Works,* 1855

— —Early Bengali Literature and Newspapers, *The Calcutta Review,* vol. 13, No. 25, 1850. *See also,* Popular Literature of Bengal, *The Calcutta Review,* the same number.

Sinha, Pradip. *Nineteenth Century Bengal, Aspects of Social History.*

Calcutta, 1965
The Calcutta School Book Society, Friend of India, Sept. 8, 1836
গ্রন্থাবলী। অর্থাৎ লং সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত বঙ্গভাষার পুস্তক সকলের নাম। শ্রীরামপুর ১৮৫২
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদিত। দু'শ বছরের বাংলা বই; স্মারকপত্র। কলিকাতা ১৯৭৯
প্রবোধচন্দ্র সেন। 'শিশুবোধক শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়', বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ; আজহার-উদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; ১৯৭৪
বাণী বসু। বাংলা শিশুসাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী। কলিকাতা, ১৩৭২
মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 'সেকালের পাঠ্যপুস্তক', বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর। কলিকাতা, ১৯৬৩
যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার জনশিক্ষা। কলিকাতা, ১৩৫৬

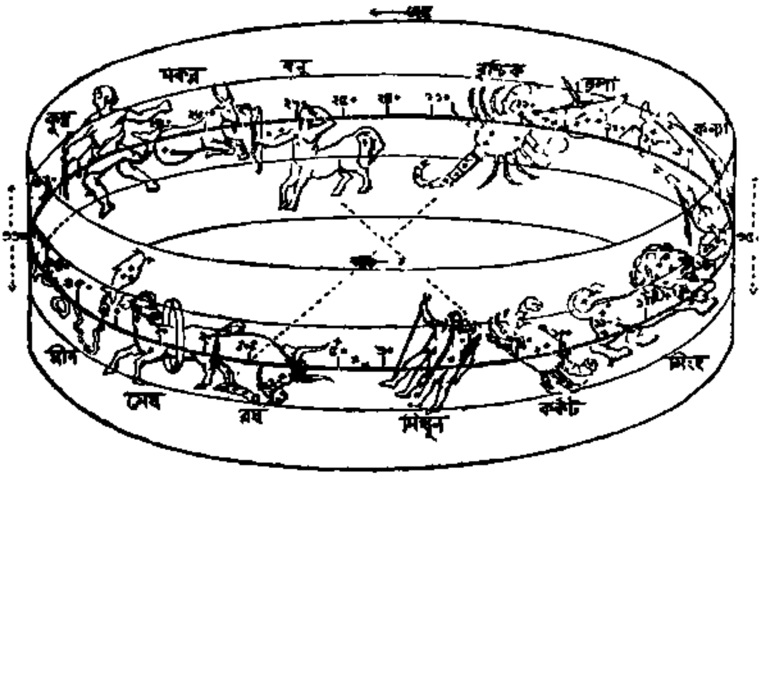

মুদ্রণ ও বাংলা কবিতার জন্মান্তর

অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলা কাব্যের মধ্যযুগের শেষ,—ধরা যাক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু,—আর আধুনিক যুগের সূত্রপাত, এই মধ্যবর্তী সময়কে রামগতি ন্যায়রত্ন 'গানের যুগ' বলেছেন; যেহেতু "এই সময়ের মধ্যে অনেকানেক মহাত্মা নানা বিষয়ের গীত রচনা করিয়াছিলেন।"[১] যে কালান্তর-কাল অনেকের মতে 'dead-season'[২], বাস্তবিকই সেই সময় অনেক গীতিরচয়িতার আবির্ভাব হয়েছিল। বেশীর ভাগ তার মধ্যে কবিওয়ালা—হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু। একই সময়ে আরো জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনাম গীতিকার রচনা করেছেন তর্জা, ঢপ, কীর্তন, সারি, জারি, মালসী, বাউল ইত্যাদি নানা ধরনের গান। এদেরই পরবর্তী পুরুষ রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক এবং দাশরথি রায়। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর টপ্পা 'little song of a light nature'[৩], আর দাশরথি রায়ের প্রবর্তিত নূতন ধরনের পাঁচালী 'কথা-প্রধান সঙ্গীত'[৪]। এই সব গীতিকারেরাই এই যুগসন্ধির সময়, বাংলাকাব্যের ধারাকে নাব্য রেখেছিলেন। এই প্রদোষ-সন্ধ্যায় কবিতা সুরের আশ্রয়ে বেঁচে ছিল।

কিন্তু শুধু এই যুগসন্ধ্যায় কেন, মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত আবহমান বাংলা কবিতাই তো সুরাশ্রিত। প্রাচীন মধ্যযুগের কবিতা মানেই কাব্যগীতি। চর্যাপদগীতি বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদগুলি কোন্ সুরে গাওয়া হবে তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে চিরকাল সুরের মাত্রা। নরোত্তমদাস যেদিন খেতরীর মহোৎসবে প্রণালীবদ্ধভাবে লীলাকীর্তন বা রসকীর্তনের প্রবর্তন করেন, তারও আগে থেকে—জয়দেবের গীতগোবিন্দের সময় থেকে। মঙ্গলকাব্যগুলি, চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি, এবং কৃত্তিবাসী-কাশীরামদাসী রামায়ণ-মহাভারত সবই যে পাঁচালীর মতো সুর করে 'sing-song'[৫] ধরনে কথকেরা পড়তেন এ সবই অত্যন্ত পরিচিত পুরনো কথা। সেই আবহমান ঐতিহ্যই রামপ্রসাদ থেকে দাশরথি পর্যন্ত প্রবাহিত। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল থেকে পরবর্তী ষাট-সত্তর বছর সময়ের কবিতার ইতিহাসকে গানের যুগ বলার তাৎপর্য কি, "একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে মঙ্গলকাব্য, প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যে গীত থাকিলেও কবি, টপ্পা, আখড়াই, নূতন পদ্ধতির পাঁচালী প্রভৃতির মধ্যে গানের যতোখানি গুরুত্ব ও প্রাধান্য আছে, উহাতে ততো ছিল না।"[৬] অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য তত বেশী সুরাশ্রিত ছিল না, যতটা সুরাশ্রিত ছিল এই যুগসন্ধিকালের রচনাবলী। কথাটা পুরো সত্য নয়, অন্তত বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে;

আর সত্য হলেও পার্থক্যটা নিতান্ত পরিমাণগত।

এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। "Hastings's need to reproduce official documents in Oriental script promoted the rise of printing and publishing in Calcutta."[৭] হেস্টিংসের উৎসাহে চার্লস উইলকিন্স, 'Caxton of Bengal',[৮] পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় মুদ্রণোপযোগী ধাতুনির্মিত হরফ নির্মাণ করলেন। সেটা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই বাংলা হরফ দিয়েই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হল বাংলা উদাহরণ-সম্বলিত ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেডের 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার প্রতিষ্ঠায়-বাঙালী কারিগর পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহরের অবদানের কথা মার্শম্যান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বলেছেন, "they carry forward the work of type-casting and even of cutting the matrices, with a degree of accuracy which would not disgrace European artists."[৯] উইলকিনসের প্রেসের প্রতিষ্ঠার পর কোম্পানীর প্রেস, ১৭৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা গেজেট প্রেস ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন জনৈক বাবুরাম, তারপর আমরা নাম পাচ্ছি গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের। তারপর থেকে আমরা কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বহুসংখ্যক মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার খবর পাই। এই মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটে গেল; এই পরিবর্তন শুধু পরিমাণগত নয়, মূলতঃ গুণগত এবং মৌলিকও। প্রাচীন-মধ্যযুগের কবিতা রচয়িতার তরফে ছিল গেয়, উপভোক্তার তরফে ছিল শ্রব্য; মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর কবিতা কবির তরফে হল লেখ্য, আর উপভোক্তার পক্ষে হল পাঠ্য। অনাথকৃষ্ণ দেব লিখেছিলেন, "আধুনিক যুগের প্রথমাংশ বিলকুল গান। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতার সময় হইতে বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে 'অগেয়' কবিতার আরম্ভ দেখা যাইতেছে।"[১০]

অবশ্য ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই যে গেয়-কবিতা পাঠ্য-কবিতা হয়ে গেল তা নয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবিওয়ালারা তাঁদের সুরাশ্রিত কবিতাযুদ্ধে কলকাতাস্থ স্থূলরুচি হঠাৎ-বড়লোক অর্ধশিক্ষিত বাবুদের উৎসব-আসর জমিয়ে রেখেছিলেন। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, দাশরথি রায় সুরাশ্রিত কাব্যগীতির ধারারই কবি। অর্থাৎ মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছিল সেই ঘটনার প্রভাব কবিতায় পড়তে, অর্থাৎ কবিতার সুরের আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হতে। এবং মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার বেশ কিছু আগে থেকেও বাংলা কবিতা যে সুরনির্ভরতা ত্যাগ করতে চাইছিল এটাও ঐতিহাসিক সত্য। ভারতচন্দ্রেই আসছিল বাংলার উচ্চারণ-প্রকৃতি ও বাচনভঙ্গি রক্ষার দায়ে সুরবর্জিত হওয়ার প্রয়াস।

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥[১১]

অথবা

নাড়ি ধরি স্থানে-স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥[১২]

অথবা

দাসু বলে বাসু ভাই   পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরি পাব   বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে॥[১৩]

স্তবক পয়ারই হোক আর ত্রিপদীই হোক, ভারতচন্দ্র প্রমাণ করেছিলেন সজীব চলিত ভাষা কবিতায় কেমন ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বরী পাটনী যখন অন্নদাকে বলছে, 'শীঘ্র আসি নায়ে চড়, কিবা দিবা বল', তখন 'কিবা দিবা বল' এই বাক্যাংশের মধ্যে মোহিতলাল দেখতে পেয়েছেন ভাষার 'অতিস্বাভাবিক ভঙ্গি'।[১৪] তিনি আরও লিখেছেন, "ছন্দের তলে তলে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমা পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিতেছে।...সুর এখনো আছে, কিন্তু তাহা ছন্দকে একটু দোল দেওয়ার মতো...। ভারতচন্দ্রের ভাষায় ইহার অধিক সুরের অবকাশ নাই।"[১৫] সমর্থন পাচ্ছি অন্য একজন সমালোচকের কথায়, "ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষায় বচনভঙ্গি ও ছন্দকে সহজ এবং স্বাভাবিক হতে দেখে মনে হয় তখন থেকেই বাংলা কাব্যে সুরের আধিপত্য কমতে আরম্ভ হয়েছে।"[১৬] আবেগময় ভাষায় শঙ্করীপ্রসাদ জানাচ্ছেন, "পুরাতন ধারায় কবি তিনি (ভারতচন্দ্র)—কিন্তু নূতন মানুষ। দূর বন্যার জলকল্লোল তাঁর চেতনায় এসে গেছে, কিন্তু বাঁধন ভাঙার আঘাত এখনো এসে আছড়ায় নি।...একই চাঞ্চল্য ছিল ছন্দেও। তিনি প্রকাশিত হতে চাইছেন, কিন্তু প্রকাশের নূতন ভাষা নেই, নূতন ছন্দ নেই।"[১৭] অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের কবিতায় সুরবর্জিত ভাষার স্বাভাবিকতা প্রায় এসে গেছে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে নয়; পুরাতন সুরেলা ঐতিহ্যের শেষ পর্যায়ে যতদূর সম্ভব এনে ফেলেছেন

সজীব বাক্‌স্পন্দ-যুক্ত ছন্দ। কিন্তু পুরোপুরি সার্থক হননি। কারণ তখনো কবিতা গেয় এবং শ্রব্য, লেখ্য এবং পাঠ্য নয়। অথচ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ভারতচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ভাবশিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন লিখলেন:

পিতা দেয় গলে সুত্র, পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পুজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে॥[১৭]

তখন এতকাল বাংলা কবিতার আশ্রয় যে সুর তার থেকে তাঁর কবিতা একেবারেই মুক্ত। সুরের আধিপত্য থেকে "ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দ যত মুক্ত এমন আর কারও নয়। তাঁর ছন্দ কথ্য-ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ, একেবারে সাধারণ গদ্যভাষার মতো প্রস্বরপূর্ণ।'[১৮] এই কথ্যভঙ্গি কবিতায় ব্যবহারের ঔচিত্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই হয়ত সংবাদপ্রভাকরের ১৮৫৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত কবিতা বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন, "এবে, করয়ে, ছেনু, গেনু ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীন পরিহার করিতে পারিলে আরো ভাল হয়।"[১৯] অথচ ঈশ্বর গুপ্তকে কোনো হিসাবেই ভারতচন্দ্রের চেয়ে বেশী প্রতিভা-শালী কবি বলা যাবে না। আসলে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৌলতে কবিতা গেয় থেকে পাঠ্য হয়ে উঠল বলেই ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে সহজে সুরাশ্রয় থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিপরীত দিকটা বিবেচনা করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন, "রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক-একটি গীতি এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই।"[২০] এই তুলনাত্মক উক্তির মধ্যে নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভারতচন্দ্র-বিরোধী মনো-ভাবের প্রকাশ পেয়েছে মনে করলে ভুল হবে, কারণ শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায় কবিওয়ালাদের রচনা-কেও মনে করতেন অশ্লীল, মনে করতেন সভ্যজনের উপভোগের অনুপযোগী। আসলে রাম বসু প্রভৃতির গীতিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর মনে হয়েছে অনেকটাই সুরের পরাক্রমে। এই সময়ের কাব্যগীতি রচয়িতাদের মধ্যে সব চেয়ে যিনি ছিলেন প্রতিভাবান সেই নিধুবাবুর একটা গানের উদাহরণ দিই:

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখতে বড় ভালবাসি
তাই তোমাকে দেখতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥[২১]

যিনিই প্রয়াত গায়ক কালিপদ পাঠকের গাওয়া রেকর্ডে[২২] গানটি শুনেছেন, তিনি বুঝবেন এই গানের সৌন্দর্য মূলতঃ সুরের সৌন্দর্য। ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত অনেকদিন আগেই লিখেছিলেন, "তাঁহার (অর্থাৎ নিধুবাবুর) কোনো কোনো কবিতা সুর করিয়া গাহিলে মানুষের মনকে যে ভাবে আর্দ্র করে মুখে পাঠ করিলে সে প্রকার চিত্তসুখকর হয় না।"[২৩] রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিলেন সে কথা এখানেও বলা যায়, "ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"[২৪] ছাপাখানার দৌলতে কবিতা এখন থেকে মুদ্রিত হতে থাকায়, যে-কাব্যগীতি ছিল সুরনির্ভর, তা হয়ে পড়ল নিরাশ্রয় এবং অনেকাংশে শ্রীহীন। অন্য দিকে জন্ম নিল এমন এক কবিতা যার কথা সুরের উপর নির্ভরশীল নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ সুরাশ্রিত কবিতার কথার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশের যে দায় ছিল সুরের উপর, এখন থেকে কথার সেই ব্যঞ্জনাকে বাজিয়ে তোলার দায়িত্ব হল কবিতার কথারই। "গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।"[২৫]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২

কবিতা মুদ্রণালয়ের দাক্ষিণ্যে পাঠ্যরূপ লাভ করায় প্রথমেই খুলে গেল ছন্দোমুক্তির পথ। লৌকিক গ্রাম্য ছড়া বাদ দিলে চর্যাপদের যুগ থেকে বাংলা কবিতা মূলতঃ মিশ্রকলাবৃত্ত বা অক্ষর-বৃত্ত ছন্দে লেখা হয়ে এসেছে। সেই ছন্দ দুই রকম স্তবকের রূপ নিয়েছে—পয়ার এবং ত্রিপদী। ফলে প্রাচীন মধ্যযুগের কাব্যে বিষয়ের বৈচিত্র্যহীনতার সঙ্গে এসে গিয়েছিল 'limitation of poetry in its form'.[২৬] ছন্দের সীমাবদ্ধতা ছিল দুই দিকে, প্রথমতঃ সুনিয়মিত স্থানে যতিপাতের বাধ্যতা; দ্বিতীয়তঃ 'chanted'[২৭] বা গীত হওয়ার ফলে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের বিকৃতি। পাঠ্য-কবিতা দাবি করল বাক্‌স্পন্দকে আয়ত্ত করতে; এবং সেইজন্যে কবিতায় স্বাভাবিক উচ্চারণের দাবিতে ও বাক্‌ভঙ্গিমার স্বাভাবিক প্রবহমানতার দরুণ ছন্দ চাইল মুক্তি। পয়ার-ত্রিপদীর সীমাবদ্ধতার মধ্যে বাক্‌স্পন্দ ভারতচন্দ্র অনেক দূর পর্যন্ত এনেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যযুগীয় ছন্দের সীমানার মধ্যে আরো বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন এই পথে। যেহেতু, আগেই বলেছি, "ঈশ্বর গুপ্তের যুগটা ছিল ছাপাখানার যুগ। সে যুগে কবির রচনা ও পাঠকের কানের মধ্যে কণ্ঠস্বরের ঘটকালি করবার সুযোগ ছিল না।"[২৮] যে কথা মোহিতলাল ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন সেই কথা ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে আরো বেশী খাটে—"ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বর-ভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের পূর্বাবস্থা।"[২৯] শুধু গেয়-কাব্য পাঠ্য হওয়া প্রধান কারণ নিশ্চয়ই নয়; পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে যে প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল বিশেষতঃ ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে সেটাই প্রধানতম কারণ; তবু কবিতা পাঠ্য হওয়ার ফলেও বাক্‌স্পন্দের অন্তর্গূঢ় তাড়নায় দরকার হল পয়ারের সুনিয়মিত যতিপাতের বাধ্যবাধকতা ভেঙে ফেলা। সেই কাজ করলেন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করে। "মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূতঝাড়ানো মন্ত্র।...কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ যতির উর্মিলতা।"[৩০] মাইকেলের লক্ষ্য ছিল ছন্দে বাক্‌রীতিকে প্রাধান্য দিয়ে সেই অনুসারে যতিস্থাপন। 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনাকালে মধুসূদন নতুন পাঠকদের নিজেই জানিয়ে-ছেন তারা যাতে 'guide their voices by the pause'[৩১] করে; এবং এই ছন্দ 'if well recited, sounds as much like prose'.[৩২] 'মেঘনাদবধকাব্যে' তৎসমশব্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্যে, মিলটনীয় ওজস্বিতায় অনেক সময় কানে ধরা পড়ে না বটে, তবু বাক্যের স্পন্দই যে অমিত্রাক্ষরে মধুসূদনের অন্বিষ্ট এতে কোনো সন্দেহ নেই। ধরা যাক নিচের নিদর্শন:

যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল,
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।[৩৩]

যতই তিনি ক্রমাগত ছন্দোস্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করছেন ততই অমিত্রাক্ষরে চলে আসছে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরভঙ্গি—আসছে, কারণ এই কবিতা একেবারেই গেয় নয়, পুরোমাত্রায় পাঠ্য। তাই 'বীরাঙ্গনা'য় পাচ্ছি আমরা এই রকম চরণ:

কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে! তারানাথ তুমি;
জুড়াও তারার জ্বালা![৩৪]

শব্দাড়ম্বরের কৃত্রিমতা থেকে স্বাভাবিকের দিকে মধুসূদনের এই প্রগতি সম্ভবতঃ সুধীন্দ্র-নাথ ধরতে পারেননি বলেই অভিযোগ করেছেন, "মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর করেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্য রচনা অসম্ভব।"[৩৫]

অমিত্রাক্ষরের পরবর্তী অগ্রগতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, 'রাজা ও রানী'তে, 'বিসর্জন'এ, 'চিত্রাঙ্গদা'য়। পরে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের প্রবহমানতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যুক্ত করেছিলেন অন্ত্যানুপ্রাস, এবং তাকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন অনেক আখ্যানধর্মী এবং নাট্যধর্মী কবিতায়। এই পর্যন্ত ১৪ মাত্রার চরণের যে বাধ্যবাধকতা ছিল তাও রবীন্দ্রনাথ ভেঙে দিলেন 'বলাকা'য়। সমিল প্রবহমান পয়ার মুক্তি পেল 'অবশেষে বলাকা-র অসমপংক্তিক বেগবর্তিতায়'।[৩৬] মধ্যবর্তী একটা স্তর অবশ্য 'কথা-বলার যোগ্য গৈরিশ ছন্দ'।[৩৭] শঙ্খ ঘোষ যদিও দেখিয়েছেন [..] 'বলাকার' মুক্তির পূর্বাভাস ছিল মধুসূদনের একটি নীতিগর্ভ কবিতায়, তবু মধুসূদনে সেই একাগ্র বেগ নেই যা বলাকা ছন্দের বৈশিষ্ট্য। পরের পর্যায়ে কিন্তু সে ভেঙে দিয়েছিলেন মিশ্রবৃত্ত বলাকা ছন্দের মাত্রাসমাবেশের চলিত অভ্যাস। ইতিমধ্যে ৮ মাত্রার পর্বের যে ভিত্তি পয়ারের উত্তরাধিকার হিসাবে রয়ে গিয়েছিল বলাকা ছন্দে, তাকেও রবীন্দ্রনাথ ভাঙলেন গদ্যছন্দের উদ্ভাবনায়। একে তিনি বললেন 'ভাবের ছন্দ',[৩৯] 'সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে'।[৪০] ছন্দের এই মুক্তির পিছনেও রবীন্দ্রনাথ অনুবর্তীভাবে লক্ষ্য করেছেন মুদ্রণযন্ত্রের প্রভাবকে—"এখন বই পড়াটা অনেক স্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হতে পারে। এই

সুযোগেই আজকাল কাব্যশ্রেণীর রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাব-ছন্দের মুক্তি দাবি করছে।"[৫০] গদ্যছন্দের ভাষা হয়ে গেল গৃহস্থপাড়ার ভাষা, ফর্ম থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে ফর্ম-ই গেল ভেঙে। অথচ শিল্পে বিশুদ্ধ মুক্তি বলে কিছু নেই। ফর্ম বিনা গদ্যছন্দ হয়ে যেতে পারে পাউন্ডের ভাষায় prolix, verbose, stale এবং hackneyed.[৫১] সেই শৈথিল্যের ভয়েই রবীন্দ্রনাথ হয়ত শেষ পর্বে অনেকটাই পরিহার করেছেন গদ্যছন্দের চর্চা। পরবর্তীদের মধ্যে গদ্যছন্দে অসামান্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন সমর সেন। অন্য দিকে আধুনিকরা কেউ-কেউ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন ছন্দের সেই সংকীর্ণ বারান্দা যা পদ্য ও গদ্যের যোজক হতে পারে—এমন এক মুক্ত ছন্দ যার মধ্যে আছে ছন্দশাসন ও ছন্দোমুক্তির সমন্বয়। যেমন সমর সেনেরই রচনায়:

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা
কী করে আসবে বাটে,
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে
বেতারে শুনে পরাণ ফাটে।[৫২]

অথচ শঙ্খ ঘোষের রচনায়:

লোকে তো কোথাও যাবে, তাই আসি, এমন কিছু নয়
নিহিত পাতালছায়া ভরে ছিল আকাশপরিধি।[৫৩]

ছন্দোগত মুক্তির নিরন্তর এই সন্ধানের মধ্য দিয়ে অথচ আবহমানের অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত হয়ে উঠল আশ্চর্য নম্যতাগুণযুক্ত। ক্রমান্বয় পরীক্ষায়[৫৪] এসে গেছে তার মধ্যে এমন এক স্থিতি-স্থাপকতা যার ফলে সব কিছু তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। লেখা যায়:

নেই কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া।
সূর্য পরিক্রমারত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে শুধু
ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময়ী; তোমার প্রতিভা
স্বাভাবিকতায় নীল; নর্তকীর অঙ্গসঞ্চালন
ক্লান্তিকর নয় বলে নৃত্য হয় যেমন তেমনি।[৫৫]

লেখা যায়:

বহু রকমের চাবি-বন্দী হয়ে আছে এই ঘর
দেরাজ, আলমারি, বাক্স, বস্তুর সমস্ত স্পর্ধা
দমন করেছে এই
কটিমাত্র পিতলের চাবি
মাঝে মাঝে ভাবি আমি, চাবিরও কি প্রাণ আছে নাকি?[৫৬]

লেখা যায়:

ফেনাময় নোনাজলে চরণ ডুবিয়ে তুমি বসে আছো স্থির
ধাতুর মূর্তির মতো—এমন ঝল্‌মল্‌
বিবিজান, তোমার শরীর।[৫৭]

যতদিন কবিতা সুরাশ্রিত এবং গেয় ছিল ততদিন যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনির উচ্চারণগত সময়-ভেদ সুরের সংকোচন-প্রসারণশক্তিতে বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু মুদ্রণালয় থেকে ছেপে বেরিয়ে এল যখন কবিতা, কবিতা যখন হল পাঠ্য, তখনও পূর্ব অভ্যাসবশতঃ যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনিকে দেওয়া হতে থাকল সমান মাত্রার মূল্য। অথচ স্বাভাবিক উচ্চারণে পড়তে গেলেই দুইয়ের মধ্যে উচ্চারণগত সময়ের তারতম্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না:

দেখ না কি চেয়ে জগত উজ্জ্বল
এই সে ভারত হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে?[৫৮]

অক্ষর গুণে ছন্দোবিচারের এই অস্বস্তিজনক অভ্যাস চলে এসেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত। একটি উদাহরণ:

বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।[৫৯]

কবিতা যখন আর গেয় নয়, পাঠ্য, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্য প্রসঙ্গের প্রশ্ন এই প্রসঙ্গেও উঠতে পারে, "অসংগত বিকৃত উচ্চারণে কেন আমরা কবিতা পড়তে বাধ্য হবো...?"[৬০]

অস্বস্তি প্রথম দেখা দিয়েছিল বিহারীলালে। সমস্যার সমাধানের পথ না পেয়ে যতদূর

সম্ভব সমস্যা এড়িয়ে গেছেন বিহারীলাল, বিশেষতঃ, 'বঙ্গসুন্দরী'তে যথাসাধ্য যুক্ত-অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।"[৩১] এই অস্বস্তির জন্যই হয়ত বিহারীলাল 'সারদামঙ্গলে' কখনো-কখনো যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখেন:

(ক) মুখখানি ঢলঢল/আলুথালু 'কুন্তল'
(খ) আদরে 'পরস্পরে' গলায় পরায়
(গ) কাছে কাছে স্থানে স্থানে/নীচ-মুখ 'উচ'-কানে[৩২]

এই সমস্যাকে না এড়িয়ে, যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছন্দোমুক্তির নতুন পথ খুলে দিলেন, সৃষ্টি হল মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দ। ফলে কবিতাপাঠের সময় বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতা বজায় থাকল। "১৯২৪ সালের বৈশাখ মাসে রচিত 'ভুল ভাঙা' নামক কবিতাটিই প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম কবিতা। এই 'ভুলভাঙা' কবিতাটিতেই সর্বপ্রথম অক্ষর গুণে ছন্দরচনার ভুল ভেঙেছে।"[৩৩]

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

কিন্তু ইতিহাস-বিচারে রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম নন, তা প্রবোধচন্দ্র নিজেই পরে দেখিয়েছেন।[৩৪] ঈশ্বর গুপ্তের 'বোধেন্দুবিকাস' থেকে উদ্ধৃত করেছেন এই সব স্মরণীয় চরণ:

দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥
কে রে করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস।

বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' এই চরণগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের অনুমান[৩৪] সেই বিখ্যাত প্রবন্ধে ব্যবহৃত এই উদাহরণ রবীন্দ্রনাথকে সাহস যোগায়। কিন্তু যেখানেই পূর্বাভাস থাক, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' থেকেই মহোল্লাসে মাত্রাবৃত্ত-কলাবৃত্ত ছন্দের জয়যাত্রা শুরু হল। এই ছন্দই হয়ে উঠল বাংলা গীতিকবিতার প্রায় সার্বভৌম ছন্দ:

(ক) এসেছিনু দ্বারে ঘনবর্ষণ রাতে,
প্রদীপ নিবালে কেন অঞ্চলঘাতে।[৫]
(খ) দে'তো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক,
অস্য অর্থটি—
যাঁহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক, তাতে অপরের কি?[৩৬]
(গ) অতএব হোক আহ্লাদে আটখানা
বুদাপেস্তের ধ্বংসে হিসাবী চেক্:
কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা
ভার্শাও প্রেস্‌দেনের পূর্বলেখ।[৩৭]
(ঘ) ভালোবেসেছিলে গতজনমের ঘাট
তৈরি ছিল না সিঁড়ি
আজ সেই জলরেখা ছোঁয় চৌকাঠ
আভ্যুদয়িক পিঁড়ি...।[৩৮]

স্বাভাবিক সুরবর্জিত উচ্চারণে 'যুক্তাক্ষরকে দুই অক্ষররূপে গণনা করাই স্বাভাবিক'[৩৯] এই সচেতনতা থেকে জন্মাল মাত্রাবৃত্ত-কলাবৃত্ত ছন্দ। আর পাঠ্যকবিতায় বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিকতার সন্ধানেই ছড়ার ছন্দ পরিশীলিত হয়ে চলে এল ভদ্র কবিতায়। অনেক আগে, রবীন্দ্রনাথ যখন বছর তেইশের যুবক তখন লিখেছিলেন, "যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।"[৪০] বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ হসন্তের ছাঁচে ঢালা এই উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছিল এই সচেতনতা। আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে-ভোলাবার ও ঘুম-পাড়াবার ছড়ায়, ব্রত-কথায় এই ছন্দের অস্তিত্ব সর্বব্যাপী সুরের সংক্রামে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ প্রবন্ধেই রামপ্রসাদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ:

মন্ বেচারির্ কি দোষ্ আছে,
তারে যেমন্ নাচাও তেম্‌নি নাচে।

কিন্তু ছন্দোগত এই স্বাভাবিকতার চরিত্রও ঢাকা পড়ে যেত রামপ্রসাদী গানের সুরমাহিমায়। ছাপাখানার যুগের কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় সেই চারিত্র্য পরিষ্কার ধরা পড়ল:

এরা   ঘরে ঘরে দিচ্ছে পেটে,
আস্ত ভগবতীর ছানা!
ওমা   সকল গরু ফুরিয়ে গেলে
দুধ খেতে আর পাব না আর পাব না॥[৬১]

তবে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন,[৬২] হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় সকলেই এই ছন্দকে ব্যবহার করেছেন লঘু অভিপ্রায়ে[৬২]:

(ক) হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম দেছে ছেড়ে।
হায় কি হলো—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে!
হায় কি হলো—ভূদেব গেলো ছেড়ে গুরুগিরী!
হায় কি হলো—হেম, নবীনের নাইকো জারিজুরি॥[৬৩]

(খ) খেটে খেটে খেটে
পারিবারিক ব্যাপার ফেলে হৃদয় থেকে ছেঁটে;
ভৃত্য রামকান্ত কর্ত্তৃক তামাক হলে সাজা,
দিলাম দুতিন টান ও তখন ভাবলাম আমি রাজা।[৬৪]

(গ) আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা।[৬৫]

'ক্ষণিকা'য় ছিল হাল্‌কায় মেশানো গভীর কথা; কিন্তু বলবৃত্ত-দলবৃত্তের স্বাভাবিকতা বজায় রেখে তার মধ্যে ভাবতন্ময় কী জন্মান্তর ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ 'খেয়া' কাব্যে:

বজ্র ডাকে শূন্য তলে,
বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখ রাতের রাজা।[৬৬]

এক সিঁড়ি পেরিয়ে দলবৃত্ত প্রবহমান হল 'পলাতকা'য়:

বাপ বললে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।
ওরা আছে সমাজের সব তলায়
বামুন কি হয় পৈতে দিলেই গলায়?"[৬৭]

উত্তরকালের কবিরা এই স্বাভাবিক ছন্দকে নিয়ে নানান ভাবে খেলিয়েছেন। তারই কিছু নিদর্শন নিচে:

(ক) তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি।[৬৮]

(খ) ভ্রমর, ওরে ভ্রমর, তুই একটু চুপ কর,
বুকের মধ্যে শুনছি আমার আর-একজনের স্বর,
তোরি মতন দুপুর ভরে করতো যে গুনগুন।[৬৮ক]

(গ) আর   তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে   খোল-নলিচা
যাবে   খোল-নলিচা পালটে...[৬৯]

(ঘ) শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি!
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎপিপাসা...[৭০]

৩

সুরাশ্রিত কবিতা ছাপাখানার দৌলতে পাঠ্য হল। চলে গেল তার বহিরঙ্গ সুরের নির্ভরতা। কিন্তু খাঁটি কবিতাকে হতেই হবে সঙ্গীতময়; স্বাভাবিক উচ্চারিত শব্দের মধ্যেই তাকে এনে

ফেলতে হয় সাঙ্গীতিক মূর্ছনা। তাই কবিতা যেই পাঠ্য হল অমনি বহিরঙ্গ সুরের পরিবর্তে তার মধ্যে এসে গেল অন্তর্লীন সঙ্গীত—শব্দের সঙ্গীত। মধ্যযুগের কোনো-কোনো কলাবন্ত কবির কবিতায় নিশ্চয়ই ছিল শব্দের সঙ্গীত; ছিল বিদ্যাপতির বা গোবিন্দদাসের পদাবলীতে। কিন্তু সেই উদাহরণ প্রথমতঃ ব্যতিক্রম, দ্বিতীয়তঃ বহিরঙ্গ সুরের প্রবণতার অন্তরালে সেখানে ঢাকা পড়ে যেত শব্দের বা বাক্‌বন্ধের নিজস্ব সঙ্গীত। কবিতা যেই পাঠ্য হল, কবিতার শব্দ যেই হল স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর, অমনি কবিতা সচেতনভাবে শব্দের অন্তর্লীন সঙ্গীতকে বাজিয়ে দিতে চাইলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সময় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা মধুসূদনের একটি বিখ্যাত চিঠি আছে যেখানে 'আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি/শর্বরী; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ'এর পরিবর্তন করে মধুসূদন 'আইলা সুচারু তারা, শশীসহ হাসি/শর্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে' লেখার প্রস্তাব করছেন। প্রস্তাবের কারণ, "you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা।"[৭১] অন্যত্র তিনি আশা করছেন, 'মেঘনাদবধে'র ছন্দ হয়ে উঠবে 'more melodious'।[৭২] "মাইকেলের ছন্দ ঢাকের বাদ্যির মতো, তাতে জোর আওয়াজ, কিন্তু রেশ নেই"[৭৩]—বুদ্ধদেব বসুর এই অভিযোগ অনেকটাই অতিশয়োক্তি। প্রথমতঃ, বাংলাভাষার তৎকালিক দুরবস্থা বিবেচনা না করে শুধু মধুসূদনকে দোষ দিলে, অনৈতিহাসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, শব্দসঙ্গীতগত সচেতনতা যে মধুসূদনের পুরোমাত্রায় ছিল তার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর জীবিতকালে 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র বারবার সংস্কার সাধন করে। আগের রূপ আর পরিমার্জিত রূপ পাশাপাশি সাজিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কবিতার অন্তর্লীন সঙ্গীতের কান তাঁর কত সজাগ ছিল।

(ক) কাকলী লহরী, আহা, মনোহর যথা (আদি রূপ)
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর যথা (পরিবর্তিত রূপ)
(খ) বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি কুলবধূ (আদি রূপ)
বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা (পরিবর্তিত রূপ)
(গ) জাহ্নবী কলতরঙ্গা, শারদ নিশাতে (আদি রূপ)
জাহ্নবীর ফেন-লেখা শারদ নিশাতে (পরিবর্তিত রূপ)[৭৩]

মুদ্রিত কবিতা পাঠ্য বলেই তার মধ্যে বাজিয়ে তুলতে হয় সূক্ষ্ম বিচিত্রমুখী শব্দের সঙ্গীত; শব্দসঙ্গীত সম্বন্ধে সংবেদনশীলতা থাকলে তবেই তাতে সার্থক হওয়া যায়। সেই সংবেদনশীলতা, সেই অন্তরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয় মধুসূদনের ছিল।

বিহারীলালের কবিজীবনের ইতিহাস কাব্যগীতি থেকে গীতিকবিতায় যাত্রার ইতিহাস। সঙ্গীতপ্রিয় কবি আসরে গান শুনে এসে সেগুলো গাইতে চেষ্টা করতেন। কোনো গানের কথা ভুলে গেলে সেই সমস্ত গানের পাদপূরণ নিজেই করে নিতেন। অন্যের গানের ভুলে-যাওয়া শব্দ পূরণ করার মধ্য দিয়েই বিহারীলালের কাব্যচর্চার সূত্রপাত। তাঁর প্রথম নিজস্ব রচনা 'সঙ্গীতশতক'—সুরাশ্রিত গানের সংকলন। 'বঙ্গসুন্দরী'তে তিনি বহিরঙ্গ সুর বর্জন করে সেই সুরকে করে নিলেন শব্দের অঙ্গ:

একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে;
অপরূপ এক কুমারী-রতন,
খেলা করে নীল-নলিনী-দলে।[৭৪]

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন,[৭৫] যুক্তাক্ষরবর্জিত বলে এই শব্দসঙ্গীত বৈচিত্র্যরহিত। 'সারদা-মঙ্গলে' বিহারীলাল দেখালেন পাঠ্যকবিতা হয়ে উঠতে পারে কী আশ্চর্য শব্দসঙ্গীতে অনুরণিত:

আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে দেবী জন্মের মতন!
পূর্ণিমা, প্রমোদ-আলো,
নয়নে লেগেছে ভালো;
মাঝেতে উথলে নদী, দু পারে দু জন—
চক্রবাক চক্রবাকী দু পারে দু জন![৭৭]

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কবিতার শব্দসঙ্গীত যেন এক সহস্র যন্ত্রবিশিষ্ট অর্কেস্ট্রার মতো বেজে উঠল। মিটার ছাড়িয়ে, কবিতার শব্দের সঙ্গীত আশ্রয় করল রীদমকে, ক্যাডেন্‌সকে, বিশ্লেষণবহির্ভূত এক অন্তর্লীন মর্মরিত ধ্বনিপ্রবাহকে। কখনো তাতে মৃদু গুঞ্জন:

এবার বসন্তে কি রে যূথীগুলি জাগে নি রে?
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান?[৭৮]

কখনো তার মধ্যে অশবক্ষুরধ্বনি:

অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে
মত্ত হাসি টুটে।[৭৯]

কখনো বহুধ্বনির তরঙ্গিত মিশ্র জটিলতা:

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।[৮০]

সমস্ত রবীন্দ্রকবিতা শব্দসংগীতের এক শেষহীন বিপুল ভান্ডার। কবিতা এখন থেকে পাঠ্য, বাইরে থেকে সুর আর তাকে সাহায্য করবে না, এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে রবীন্দ্র-উত্তরাধীকারীরা সেই সীমাকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন অন্তর্গত সংগীতের ব্যঞ্জনায়। শুধু সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা! ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা!'[৮১] ধরনের লঘু চপলতায় নয়, বা বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কা, কঙ্কা, কঙ্কাবতী'র[৮২] নর্তকীনিক্বণে নয়; অর্থধ্বনির মহিমায়, স্বরব্যঞ্জনের রহস্যময় বহুলাঙ্গ সুষমায়:

(ক) সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।[৮৩]

(খ) দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।[৮৪]

(গ) আমার মন্দিরে তবে পশ্চিমি গির্জার দেখাদেখি
কাচের ঝরোখা গড়ি, স্টেইন্‌ড গ্লাস, নক্‌শার উল্লেখে
এঁকে তুলি দাগী দস্যু, পুণ্যলতা, কুরূপা সুরেখী,—
এঁকে তুলি বৈরাগী আভোগী পাপী অথবা নিজেকে.. [৮৫]

মিলের বিচিত্র বিন্যাস, স্বরব্যঞ্জনের আলপনা, যুগ্মধ্বনির অভিঘাত, সূক্ষ্ম অনুপ্রাসের প্রচ্ছন্নতা, অর্থ ও বিরামচিহ্নের নির্দেশে চলা ও থামা, এই সব মিলে এই শব্দসংগীত অনুরণিত হয়। সুরবর্জিত পাঠ্য-কবিতায় এই শব্দসংগীতের মধ্যেই ধরা পড়ে কবির শ্রব্য কল্পনা।

সংগীতের শর্তের দিকে কবিতার এই এগিয়ে যাওয়া হতে পারে অন্যভাবে। যে ভাবে গিয়েছেন বিষ্ণু দে। তাঁর বিখ্যাত 'জন্মাষ্টমী' কবিতায়, 'অন্বিষ্ট' কাব্যের নামকবিতায়, 'শত মুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়ে' তিনি আনতে চেয়েছেন কবিতায় সংগীতের প্রতিরূপ—সেই প্রতিরূপ বেশীর ভাগ সমালোচকের মতে পশ্চিমীসংগীতের, দু-একজনের মতে ভারতীয় রাগসংগীতের।[৮৬] সে তর্ক থাক, কিন্তু সন্দেহ নেই এই সব ক্ষেত্রে তাঁর অন্বিষ্ট সংগীতের বহুলাঙ্গ বৈচিত্র্যময় সৌষম্য—'শত শত বর্ণাভাসে এ যেন-বা অর্কেস্ট্রা বিরাট।'[৮৭] "অভিন্ন সুরের গীতল প্রবাহ নয় তার পরিবর্তে বিষ্ণু দে চান যে এইভাবে তৈরি হোক এক বিচিত্র স্বরের সংগতি। হারমনি বা স্বরসংগতি, পশ্চিমীসংগীতের এই ঐশ্বর্যের দিকে তাঁর কবিতাকে এগিয়ে নিতে চান তিনি, ক্রমশঃ তাঁর কবিতা পেয়ে যায় একটা সিম্ফনির গড়ন।"[৮৮] এই সিম্ফনির গড়নই সুধীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিখ্যাত 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায়। এখানেও তিনি শব্দরচিত কবিতায় আনতে চেয়েছিলেন ধ্বনিসমবায়ে রচিত সংগীতের প্রতিরূপ। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তাঁর অভিপ্রায় তিনি স্পষ্ট করতে পারেননি বাংলাভাষায় ততটা, যতটা পেরেছেন অন্যত্র, ইংরেজীতে। কবিতাটি হচ্ছে, "an attempt to imitate through the media of various verse forms symphonic music as produced by many instruments."[৮৯] কথাটা এই, কবিতা যদি সুরাশ্রয় থেকে মুক্ত না হত, তাহলে কবিতা হয়ে উঠতে পারত না শব্দের অন্তর্নিহিত সংগীতসম্পদে এতটা গরীয়সী।

৪

"ইংরেজীতে যাহাকে 'স্ট্যাঞ্জা' বলে, বাংলায় তাহার কোনো প্রতিশব্দ নাই; ইহার কারণ দুটি —প্রথম, বাংলা কবিতায় ঠিক ঐরূপ বস্তু ছিল না...।"[৯০] ছিল না তার কারণ বোধহয় প্রাচীন-মধ্যযুগের কবিতা ছিল গেয়। মুদ্রণের যুগে কবিতা মুদ্রিত হওয়ায়, আমার বিশ্বাস, কবিতার যেই একটা দৃশ্যরূপ দেখা দিল, কবিতা যেই হয়ে উঠল ভিস্যুয়াল সামগ্রী অনেক পরিমাণে,[৯১] তখনই স্তবক বা পদবন্ধবৈচিত্র্য সৃষ্টির এক উদ্দীপনা জেগে উঠল। শব্দসংগীত সৃষ্টির প্রয়োজনে মিলের বিন্যাসের বৈচিত্র্য একটা কারণ, কিন্তু সংগে সংগে মুদ্রিত কবিতার দৃশ্যরূপও নিশ্চয়ই একটা বড় প্রেরণা। মোহিতলাল ঠিকই বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বাংলা পদবন্ধের প্রথম সজ্ঞান ও নিপুণ শিল্পী...।"[৯২] বুদ্ধদেব বসু 'মানসী' কাব্য বিষয়ে লিখেছেন, "বিস্ময় এলো

মিলের বিন্যাসেও, আর এলো অন্য এক নতুন ও আধুনিক বস্তু, যার স্পষ্ট চেহারা, পূর্বযুগের কবিতায় তো দূরের কথা, রবীন্দ্র-কাব্যেও এর আগে পাওয়া যাবে না। এই বস্তুটির নাম স্তবক এবং বাংলা কবিতার জন্মান্তরক্রিয়ায় এর অবদান অপরিমেয়।"[১২] এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই নিশ্চয়ই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তবু ইতিহাস-বিচারে তিনিই প্রথম নন। সেই সম্মান 'ব্রজাঙ্গনা'র মধুসূদনের প্রাপ্য:

আয়, পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে;
নবীন নীরদে প্রাণ, তুই করেছিস দান—
সে কি তোর হবে?
আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে![১৩]

বিহারীলাল চক্রবর্তী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

"সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী; কিন্তু কবি তাহা 'সঙ্গীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন।"[১৫] নতুন সঙ্গীত যে এল তার উৎস অনেকটা নিহিত আছে নতুনভাবে স্তবক সাজানোর প্রণালীতে। পুরনো কবিতার ধরনে:

কোন সুখ নাই মনে, সব গেছে তার সনে;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার!
বল কোন পদ্মবনে লুকায়েছ সঙ্গোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার!

না সাজিয়ে, বিহারীলাল তাকে নতুন স্তবকে বিন্যস্ত করলেন:

কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার!
বল কোন পদ্মবনে
লুকায়েছ সঙ্গোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার![১৬]

শঙ্খ ঘোষের কথা তাই মানতেই হয়—"পঠনীয় কবিতার জগতে চাক্ষুষ এই অভ্যাসের মূল্য খুব কম নয়। চোখ যে এখানে কানকে কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রিত করে না, এটা ভাবলে ভুল হবে।"[১৭] রবীন্দ্রনাথের আগে দ্বিজেন্দ্রনাথও 'স্বপ্নপ্রয়াণে' পদবন্ধ বা স্তবক নির্মাণে আশ্চর্য কুশলতার

পরিচয় দিয়েছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের মতো কবিও:

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলেদুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।[৯৮]

তবে স্তবকশিল্পে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতাই ক্লান্তিহীন। এই অক্লান্ত লীলাময় সৃজনশীলতার পিছনে খোঁজা যেতে পারে ইংরেজী রোমাণ্টিক কাব্যের প্রভাব।[৯৯] প্রভাব থাক বা না থাক, পরিণামের অজস্রতায় সন্দেহ নেই। 'সোনার তরী'র নামকবিতা, 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'উর্বশী' 'দুঃসময়', 'পূরবী'র অন্তর্গত 'আবির্ভাব', 'তপোভঙ্গ', 'ভাঙা মন্দির', 'পূর্ণতা' সেই অবিশ্রান্ত ও অনর্গল সৃজনশীলতার সামান্য প্রমাণ। আরো কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে স্তবকের নির্মিতি কী বিচিত্র দৃশ্যরূপ নেয় তার পরিচয় দিচ্ছি—ফুটে উঠছে অলঙ্করণের লীলা, ডিজাইনের সৌন্দর্য:

(ক) নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ
হরণ করি।[১০০]

(খ) আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণখেলা
নিশীথবেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া খেলা
রাত্রি বেলা।[১০১]

(গ) আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুলবন,
যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই সে তপস্বিনী।[১০২]

রবীন্দ্রসমসাময়িক এবং রবীন্দ্র-অনুগামী কবিদের রচনাতেও স্তবকের বিচিত্র পরীক্ষার অনেক প্রমাণ পাই। যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেনের:

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকাভাষ্য;—তোর এই চক্ষুদীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায়।
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?[১০৩]

এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের লীলা-উল্লাস সব চেয়ে চপল এবং চমকপ্রদ:

(ক) নিরঞ্জন
নিদ্‌পুরে—
নিকেতন
মৃত্যুর;
বায়ু, হায়
মূরছায়,
ঢেউ নাই
সিন্ধুরে।[১০৪]

(খ) হায়!
বসন্ত ফুরায়!
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গুসম লুপ্ত আমি মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্মাল্য-শেষ; চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে!
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বাসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্ছিত দশদিক!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়![১০৫]

অমিয় চক্রবর্তীর কোনো-কোনো কবিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ই. ই. কামিংসের কবিতার অক্ষরসজ্জা বা আপোলিনেয়ারের 'calligrammes-এর কথা, যাকে বলা হয়েছে সাহিত্যিক কিউ-বিজম্‌—যার মধ্যে লুকিয়ে আছে হাল-আমলের কংক্রিট পোয়েট্রির পূর্বাভাস।[১০৬]

শ্যামলরক্তিম ঘণ্টাধ্বনি
শুনেছো কি?
চিহ্ন
নিরন্ত—
বসন্ত—
প্রতীকী
হে ধরণী?
দিকে-দিকে
উদ্ভিদ
বাজে অঙ্কুরে
অন্তিকে
বাজে দূরে
কঠোর অভিজ্ঞানে
বীজমন্ত্রের কল্যাণে
মৃত্যুধ্যানে
প্রাণের ব্যথায়
অসহ ব্যথায়
চিত্তনূপুর শোনা যায়।[১০৭]

কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী এখানে হরফের আলপনার সঙ্গে কবিতার ভাববস্তুর তেমন সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেননি, যেমন আপোলিনেয়ার পেরেছেন Its' Raining'[১০৮] কবিতার অক্ষরবিন্যাসে। ভাবকে হরফসজ্জার মধ্যে দিয়ে ভাবচ্ছবি দেবার চেষ্টা দেখি অন্য কারো-কারো কবিতায়, যেমন শঙ্খ ঘোষের 'পতঙ্গ':

কিছু পতঙ্গ উড়ে এসেছিল আমার মাথায়
ভিতরে সে ছিল
খোড়ো পতঙ্গ উড়ো পতঙ্গ
বীজাণুর চেয়ে গুঁড়ো পতঙ্গ
খুঁড়ে খুঁড়ে এই ধূলি খুলেছিল দ্রুপ দ্রুপ দ্রুপ কুরে খেয়েছিল
আমার ভিতরে যা-কিছু-যা-ছিল সহসা সাহসে

ভর করে এসে
সব খুঁড়েছিল দলে দলে যত হীন পতঙ্গ গুঁড়ো পতঙ্গ
উড়ে এসেছিল আমার মাথার
ভিতরে সটান কিছু পতঙ্গ
উড়ো।[১০৯]

অক্ষরের মধ্যে ফাঁকগুলো থাকায় মনে হয় সারা পৃষ্ঠা জুড়ে গুঁড়ো, উড়ো, হীন পতঙ্গগুলো যেন ছড়িয়ে রয়েছে। ভাবকে মুদ্রণের মধ্য দিয়ে ভাবচ্ছবি দেবার আর একটা নিদর্শন আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়'[১১০] কবিতায়। ভাঙা-ভাঙা চরণ, এলোমেলো অক্ষরসজ্জার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল' মাতালের 'মধ্যরাতে/বাড়ি ফেরার সময়'।

নজরুল ইসলাম

জীবনানন্দ দাশ

মিলের বিচিত্র বিন্যাস থেকে স্তবকবৈচিত্র্য, বা অলংকরণের লীলাময় উল্লাস থেকে, অথবা ভাবচ্ছবি মূর্ত করার তাগিদে কবিতার হতে পারে অক্ষরের মুদ্রণগত বিন্যাস; তারও বাইরে পঠনীয় কবিতার আস্বাদনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে কবিতার মুদ্রণ। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অন্তর্ভুক্ত একটিমাত্র কবিতা আছে যার মার্জিন প্রচলিতভাবে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে বিপরীতভাবে।

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছে যে সুর—
ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি—আমার মতন
আর নাই কেউ![১১১]

'আমার মতন/আর নাই কেউ' কবিতার এই কথাটা অক্ষরসজ্জাতেও স্পষ্ট করে দেবার জন্যেই বিপরীতপন্থী মার্জিন ব্যবহার করা হয়েছে একজন পাঠকের একথা যদি মনে হয় তাহলে অন্যায় হবে না।

বুনো হাঁস পাখা মেলে—সাঁই-সাঁই শব্দ শুনি তার;
এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—[১১২]

এখানে ড্যাসগুলির মধ্যে সাকার হয়ে উঠেছে যেন গণনা-চেষ্টায় ব্যর্থ গণনাতীত অসংখ্যতার

কথা। অন্য ধরনের একটা উদাহরণ দিচ্ছি জীবনানন্দ থেকেই:

মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।[১১৩]

'নেই' এই একটিমাত্র নিঃসঙ্গ শব্দকে স্বতন্ত্র চরণের মর্যাদা দেওয়ায় কবিতাধৃত শূন্যতার চেহারাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চরণ-মধ্যবর্তী বা স্তবক-মধ্যবর্তী ফাঁক, শব্দের মাঝখানের শূন্যতা, হরফের স্থূলতা-সূক্ষ্মতার তারতম্য, ছাপানো পৃষ্ঠায় সাকার করে তুলতে পারে কবিতার নিহিত ব্যঞ্জনাকে। সেই কারণে স্থান সংকুলানের জন্যে বা অন্য কোনো অজুহাতে কবির অভিপ্রেত বিন্যাস ভেঙে অন্য ভাবে কবিতা মুদ্রিত করা উচিত নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'নীলকণ্ঠ' কবিতায় 'হে-ইডি, হাইডি, হা-ই...' অংশটি মূল-কবিতার হরফের চেয়ে ছোট হরফে সাজানো হয়েছে 'সম্রাট' বইতে। ছোট হরফের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে ঐ তিনটি স্তবক কবির কথা নয়, 'রাত্রি নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার/ রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ'—অর্থাৎ বন্য শিকারীদের গান। ভারবি-প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শ্রেষ্ঠ কবিতায়' এই হরফগত তারতম্য বজায় না রাখায়, মনে হয়, কবির অভিপ্রায়কে মূল্য না দিয়ে কবিতাটির ক্ষতি করা হয়েছে। বাংলা হরফে যদি ইটালিকস্ চালানো যেত তাহলে এই সব ক্ষেত্রে হরফের ছোট-বড় তারতম্যের পরিবর্তে ইটালিকস্ ব্যবহার করা যেত—বিদেশী কবিতার বইতে যেমন আকচার হয়।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ বাদ দিলে বাংলাগদ্যের লিখিত রূপ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, প্রায় মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার সমকালে। শাসনের প্রয়োজনে সরকারী দলিলপত্র, আইন ইত্যাদির দেশীয় ভাষায় তর্জমা করার দরকার হল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনে পাঠ্য-পুস্তক লিখতে হল, নানা রাজনৈতিক-সামাজিক কারণের পরিণাম হিসাবে বহু সংবাদপত্র ও প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ হতে থাকল। কিন্তু এসব হতে পারল মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলেই। গানের সুরের সহযোগে, ছন্দের দোলায় পদ্য অলিখিত হয়েও প্রচারিত হতে পারে, হতে পারে স্মৃতিতে বিধৃত, যেমন হয়েছিল বাংলাকাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে। কিন্তু গদ্য তেমনভাবে প্রচারসৌভাগ্য পায় না। মুদ্রণের মধ্য দিয়ে প্রচার ব্যতিরেকে গদ্যের বিকাশ ও পুষ্টি অসম্ভব। কেরী সাহেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী-প্রসন্ন সিংহ ইত্যাদির চর্চার মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলা গদ্য একটা উন্নত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথম পঞ্চাশ বছরে মূলতঃ গদ্যের আধিপত্য; মধুসূদন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় পঞ্চাশ বছরে কবিতার প্রাধান্য। মুদ্রণযন্ত্রের দাক্ষিণ্যে যে গদ্যের সূত্রপাত হল, প্রথম পঞ্চাশ বছরে তার অবিরত চর্চার ফলে, দ্বিতীয় পঞ্চাশ বছরে বাংলা কবিতার দুটো মূল্যবান লাভ হল। প্রথমতঃ বাংলা ভাষার বাক্‌স্পন্দন সহজে কবিতায় চলে আসতে পারল। দ্বিতীয় লাভ হয়ত আরও গুরুতর। গদ্য দাঁড়িয়ে যাওয়ায়, যা-কিছু কবিতা নয় তার হাত থেকে কবিতা রেহাই পেল; কবিতা হয়ে উঠল 'মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা'[১১৪], অন্য ভাষায় 'true voice of feeling'.[১১৫] অর্থাৎ এবার থেকে কবিতার অগ্রগতি হল শুদ্ধতার দিকে।

হয়ত দুর্বোধ্যতা-কূটত্বের দিকেও। গেয়-কবিতার মর্ম গ্রহণ করার সুযোগ পাওয়া যেত আসরে বসে একবার। চরণ-বিশ্লেষণ করে তলিয়ে দেখার সুযোগ ছিল না বলে এক উদ্যমেই যাতে শ্রোতা বুঝে নিতে পারে নিহিতার্থ সেইজন্যে সরলতা ছিল তার অনিবার্য লক্ষণ। বাক্যগঠনগত জটিলতা, বৈয়াকরণিক বিপর্যয়, অপ্রচলিত উল্লেখ-অনুষঙ্গের কূটতা—কবিতার এই সব আধুনিক বিশিষ্টতা স্বভাবতঃই গেয়-কাব্যে প্রশ্রয় পায়নি। কিন্তু মুদ্রিত কবিতা যেহেতু বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়া যায়, একবারে মর্ম গ্রহণের বাধ্যতা যেহেতু সেখানে নেই, তাই সেই কবিতার বিন্যাস জটিল তির্যক বা বক্র হতে পারে। এখন কবিতা পড়তে পড়তে খুঁজে নেওয়া চলে বিষ্ণু দে-র 'এপ্রিল' কবিতার 'হাস্যলঘু নেরাড্' কী বা জেনে নেওয়া যায় অমিয় চক্রবর্তীর 'সন্দ্বীপ' কবিতার 'লালমোহন' মানুষটিই বা কে? গেয়-কবিতার আসর এমন অবসর দেয় না। পুনঃ পুনঃ নিভৃতে পড়ার সুযোগ আছে বলেই মুদ্রিত পাঠ্যকবিতায় আসে তির্যক বাক্‌ভঙ্গি, বৈয়াকরণিক বিপর্যয়। রচিত হতে পারে জীবনানন্দের কবিতায় এই সব চরণ:

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো:
পুরুষ তাদের: কৃতকর্ম নবীন;

খোঁপার ভিতরে চুলে নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভাঁজার নিচে হঙকঙের তৃণ।[১১৬]

প্রাচীন-মধ্যযুগে পদ্যই ছিল সর্বংবহ মাধ্যম। ধর্মকথা ও ধর্মতত্ত্ব, উপাখ্যান, যোগীসিদ্ধের কথা, সদুপদেশ-নীতিকথা সব কিছুরই বাহন ছিল পদ্য, এমন কি জ্যোতিষ, ইতিহাস মোহান্ত-জীবনী সবই লেখা হয়েছে পদ্যে। বৈষ্ণবপদাবলীতে, শাক্তপদাবলীতে, বাউলগানে বিশুদ্ধ কবিতার কিছু পরিচয় মেলে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর পিছনে ছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্য, বাউলগানের রূপকের অন্তরালে ছিল লৌকিক দার্শনিকতা। কিন্তু মুদ্রণের যুগের পর গদ্যই নিয়ে নিল যা কিছু কবিতা নয় তাকে বহনের দায়িত্ব—শিক্ষাপ্রচার, ধর্মীয় বিতর্ক, দার্শনিক আলোচনা, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক মতপ্রকাশের দায়িত্ব। পদ্য থেকে সরে যেতে থাকল ক্রমশঃ সেই সব বোঝা—পদ্যের অগ্রগতি হল কবিতার দিকে। ঈশ্বর গুপ্তে সাংবাদিকতা ছিল, পরমার্থিক-নৈতিক গতানুগতিকতা ছিল, মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনায় আখ্যান ছিল, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রে স্বদেশপ্রেমের বাগ্মিতায় ভরা উত্তেজনা ছিল। ক্রমে-ক্রমে সেই সব অ-কবিতার উপাদান মুছে গেল—কবিতারচনাই হয়ে উঠল কবিতা রচনার উদ্দেশ্য। নীতি উপদেশ নয়, দেশহিতৈষা নয়—তাই বিহারীলাল বললেন, আমি কোনো উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।[১১৭] বিহারীলাল থেকেই শুরু হল শুদ্ধ কবিতার জয়যাত্রা। সেটা সম্ভব হল গদ্যের শ্রীবৃদ্ধির ফলে, যার পিছনে কারণ হিসাবে রয়েছে মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

বিহারীলালের পর অ-কবিতা কবিতায় একেবারেই প্রশ্রয় পায়নি, তা নয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'সবিতা-সুদর্শন' লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও কি লুপ্ত পৃথ্বীরাজ পরাজয়' দিয়ে যাত্রা-রম্ভ করেননি? পরেও কি লেখেননি 'কণিকা'? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনেক কবিতায় আছে ছোটগল্পের খসড়া। তাছাড়া একেবারে শুদ্ধতম কবিতা বোধহয় এক অনায়ত্ত আদর্শ। ভালেরি যেমন বলেছিলেন, I have always held, and I still hold, that this aim is impossible to reach and that poetry is always a striving after this purely ideal state "[১১৮] বিহারীলাল যে কাজ শুরু করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথই সেই কাজকে চরিতার্থ-তায় নিয়ে গেলেন। আর গীতিকবিতাই যেহেতু শুদ্ধতম কবিতা, তাই ক্রমশঃ গীতিকবিতাই হয়ে উঠল একমাত্র কবিতা।

গীতিকবিতাই যে হয়ে উঠল একমাত্র কবিতা তার পিছনে অন্য এক দিক থেকেও মুদ্রণ-শিল্পের পরোক্ষ ভূমিকা আছে। মুদ্রিত কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হওয়ার আগে কাব্যের উপভোগ ছিল গোষ্ঠীগত। মঙ্গলকাব্যের আসরই হোক, পদাবলীকীর্তন বা শ্যামাসঙ্গীতের আসরই হোক, কিংবা বাউলগানের মেলা—সব ক্ষেত্রেই সুবাশ্রিত কাব্যের উপভোগ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। এমন কি কবিগান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী এবং নিধুবাবুর গানের আস্বাদন বিষয়েও এই কথা সত্য। কিন্তু মুদ্রণের ফলে ভেঙে গেল সেই গোষ্ঠীগত উপভোগের যূথবদ্ধতা। মুদ্রণের যুগে কবিতার পাঠক হলেন একলা পাঠক, কবির উদ্দিষ্ট হলেন কোনো ব্যক্তি-পাঠক, কোনো জনসভায় জমায়েত শ্রোতৃমণ্ডলী নয়। তাই কবিতা হয়ে গেল এক হার্দ্য ব্যক্তিগত উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এখন কবি ও পাঠকের হয় 'মুখোমুখি, চাহাচাহি, কোলাকুলি'।[১১৯] কবিতা যেই হল একজন কবির সঙ্গে একজন পাঠকের সংলাপ, তখনই কবিতার ধরন হল স্বগতোক্তির ধরন। 'নির্জন, নিভৃতে'[১২০] পড়ার জন্য কবিতা হল 'কবির নিজের কথা'[১২০] 'কবির মনের কথা'[১২০], বিহারীলালের কবিতাই শুধু স্বগতোক্তি হল না—মুদ্রিত কবিতাই ধীরে ধীরে পেয়ে গেল স্বগতোক্তির ধরন, হয়ে গেল গীতিকবিতা, এলিয়ট যাকে বলেছেন 'poetry of the first voice'[১২১] এই কবিতা এমন যে পাঠককে 'কান পাতিয়া'[১২০] শুনতে হয়। কবি ও পাঠকের এমন নিভৃত ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে যে কবিতা রচিত হয় তাকে মনে হয় 'মনুষ্যহৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন'।[১২২] কবিতার ভাষাও উদ্দীপনাময় বাগ্মিতা বা বের্টরিকের বদলে হয়ে ওঠে নম্র, আত্মগত, মৃদুতাময়, বন্ধুর মতো ব্যক্তিগত—'বুকে-মুখে এক হওয়ার মতো'।[১২৩]

(ক) ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিইনি আসন বসিবার।[১২৪]

(খ) আমারে তুমি ভালোবাসো না ব'লে,
দুঃখ আমি অবশ্যই পাই,
কিন্তু তাতে বিপদই শুধু আছে,
তাছাড়া কোনো যাতনা, জ্বালা নাই॥[১২৫]

(গ) আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়,

এখন আমার নতুন প্রয়াস নতুন প্রণয়।
ভাঙা গড়া চলছে এখন জীবন জুড়ে।[১২৬]

একথা মানি, মুদ্রণের যুগের আগেও কবিব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশের ঈষৎ আভাস মিলছিল। "রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক গানে যে আর্তি শুনতে পাই, কে বলতে পারে, সেটা ব্যক্তিগত নয়, প্রথাগত?.. নিধুবাবুর গানে এ-সুর আরো ব্যক্তিগত হয়ে উঠল।"[১২৭] 'গীতরত্নের' অন্তর্গত অনেক গানের জোরে নিধুবাবু সম্বন্ধে নিশ্চয় বলা যায়, "The poet looks into his own heart and writes...".[১২৮] সেই দেখা সুস্পষ্ট হল যখন মুদ্রণের যুগে বিহারীলাল নিজেকেই পরামর্শ দিলেন, 'অন্তরেতে দৃষ্টি রাখ'। [১২৯] সেই পরামর্শ মধুসূদনও তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তাই "তিনি নিজেকে ক্রমশঃ বস্তু-বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিগত অস্মিতার দিকে বহন করছিলেন।"[১৩০] তারপরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বিহারীলালের হাতে গীতিকবিতা, ব্যক্তির কবিতা। আমি জানি, মুদ্রণের ফলেই এই ব্যক্তিগত কবিতার উন্মেষ হল বললে একদেশ-দর্শিতা হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যমানবতাবাদ এবং তৎসঞ্জাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা বিনা সম্ভব হত না গীতিকবিতার আবির্ভাব। কে জানে, "বিহারীলালের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এতই তীব্র ছিল"[১৩১] বলেই হয়ত তিনি লিখতে পারলেন গীতিকবিতা। "সমগ্র জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বকীয় কল্পনার অধীন করিয়া, আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে আশ্বস্ত হওয়ার যে গীতি-প্রেরণা, তাহারই নাম কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বিহারীলালের কল্পনায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-প্রত্যয়ের আনন্দ, বাংলাকাব্যে সর্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[১৩২] তবু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণশিল্পের উদ্ভব কবিতায় আত্মময়তার প্রবণতাকে আনুকূল্য দিয়েছিল নিশ্চিতভাবে।

একথা ঠিক 'মেঘনাদবধকাব্যের' মতো ছদ্ম-এপিক কাব্যেও রোমান্টিক কাব্যধর্ম নিহিত থাকতে পারে; তবু রোমান্টিক কবিতা বিশেষভাবেই গীতিকবিতা। কারণ গীতিকবিতা ব্যক্তির জন্যে ব্যক্তির কবিতা; আর রোমান্টিকরা "বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন, জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত।"[১৩৩] আত্মময়তা থেকেই জন্মেছিল কাব্যে রোমান্টিকতা; ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশই রোমান্টিকতার অন্তঃসার। রোমান্টিক যুগের কাব্যের সঙ্গে আধুনিক কাব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে একবার অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।"[১৩৪] কিন্তু এখনো বাংলা কবিতায় গীতিকবিতা তথা রোমান্টিক কবিতার সার্বভৌম রাজত্ব—বিষয়ীর আত্মতা এখনো বজায় আছে। কারণ আত্ম-সচেতনতার আতিশয্যই আধুনিকতার উৎস, এ-ও আজ স্বীকৃত সত্য। আধুনিক কাব্যেও সামাজিক মানুষের উপর ব্যক্তিসমাজের প্রতিষ্ঠা, "প্রতীকী আন্দোলন রোমান্টিসিজম্-—এরই পুনরা-বর্তন"[১৩৫], এমন কি সুররিয়ালিজম্, রীড সাহেব দেখিয়েছেন, 're-affirmation of the romantic principle'.[১৩৬] কেউ সুধীন্দ্রনাথের মত প্রচ্ছন্ন রোমান্টিক, কেউ বুদ্ধদেব বসুর মত অকপট রোমান্টিক। এখনও ব্যক্তিচেতনার রঙে রঙিন হয়ে যায় কবির বিশ্ববীক্ষা:

এখনো কোনোদিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় আকাশ
আমার জন্য প্রতীক্ষা করে
নদীর কিনারায় মাটি প্রতীক্ষা করে আছে
আমার পদস্পর্শের
ঘাসফুলটি হাওয়ায় দুলছে প্রতীক্ষায়
আমি তাকে ছিঁড়ে নেবো...।[১৩৭]

এইভাবে, কাব্যগীতি থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নিল গীতিকবিতা, এই বাংলাভাষায়। অন্যতম ধাত্রী ছিল মুদ্রণশিল্প, তাতে সন্দেহ নেই।

নির্দেশিকা

১ বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সং, পৃ ১৯২
২ De, S. K., *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (1757-1857); 1962, p. 3
৩ *Ibid.* p. 35

৪ চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহানুভব দাশরথি রায়ের জীবনচরিত; হরিপদ চক্রবর্তী, দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী, ১৩৬৭, পৃ ৭৪-এ উদ্ধৃত
৫ De, S. K., *Ibid.* p. 39
৬ হরিপদ চক্রবর্তী, তদেব, পৃ ৪৬
৭ Kopf David. *British Orientalism and the Bengal Renaissance,* Calcutta, 1969, p. 20
৮ De, S K., *Ibia.* p. 73
৯ *Memoir Relative to the Translation of the Sacred Scriptures into the Languages of the East,* quoted in S K. De's book p. 99
১০ রমাকান্ত চক্রবর্তী। বিস্মৃতদর্পণ, ১৩৭৮, পৃ ৫২-তে উদ্ধৃত
১১ ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। সাহিত্যপরিষৎ, ১৩৬৯, পৃ ১৫৮
১২ তদেব, পৃ ২৬১
১৩ তদেব, পৃ ৩০৯
১৪ বাংলা কবিতার ছন্দ; ১৩৫৫, পৃ ৯৬-৯৭
১৫ ভবতোষ দত্ত, সং, বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, ১৯৬৮, পৃ ২০৯
১৬ শঙ্করীপ্রসাদ বসু। কবি ভারতচন্দ্র, ১৩৮১, পৃ ৪০৯
১৭ আচারভ্রংশ
১৮ ভবতোষ দত্ত। তদেব, পৃ ২৩৯
১৯ তদেব, পৃ ১৮০-তে উদ্ধৃত। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী', ১৯৪৩-এর পিছনের অনুশাসনগুলির কথা, পরিমার্জিত 'দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা', ১৯৬৩-তে এই অনুশাসনগুলি অবশ্য বর্জিত হয়েছে
২০ বঙ্কিমচন্দ্র। মানস-বিকাশ, 'বঙ্কিমরচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যসংসদ, ১৩৬১, পৃ ৮৮৫
২১ 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' ইত্যাদি অসামান্য পদের দাবিদার বিদ্যাপতি এবং কবিবল্লভ। এই বিখ্যাত গানেরও দাবিদার দুজন—নিধুবাবু এবং শ্রীধর কথক। আমরা রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতানুযায়ী এটিকে নিধুবাবুর বলেই চিহ্নিত করছি। বাংলার গীতিকার, ১৩৬৩, পৃ ১৩ দ্রষ্টব্য
২২ EMI-HMV record No. 7EPE 1041
২৩ ভবতোষ দত্ত, সং। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, ১৯৫৮, পৃ ১১৫-১৬
২৪ পরিশিষ্ট ২, গীতবিতান (অখণ্ড), ১৩৫৭, পৃ ৯২৫
২৫ বঙ্কিমচন্দ্র। গীতিকাব্য, 'বঙ্কিমরচনাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮৭
২৬ De, S. K., *Ibid.* p. 39
২৭ Chatterji, S. K., *The Origin and Development of the Bengali Language,* Part I, 1970, p 285
২৮ প্রবোধচন্দ্র সেন। ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩
২৯ মোহিতলাল মজুমদার। বাংলা কবিতার ছন্দ, ১৩৫৫, পৃ ৯৭
৩০ বুদ্ধদেব বসু। মাইকেল, 'সাহিত্যচর্চা', ১৩৬১, পৃ ৪১
৩১ রাজনারায়ণ বসুকে ১লা জুলাই ১৮৬০ তারিখে চিঠি, মধুসূদন গ্রন্থাবলী, সাহিত্যপরিষৎ
৩২ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠি, তদেব
৩৩ মেঘনাদবধকাব্য, প্রথম সর্গ
৩৪ সোমের প্রতি তারা
৩৫ কুলায় ও কালপুরুষ, ১৩৬৪, পৃ ৪১
৩৬ বুদ্ধদেব বসু। সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬৩, পৃ ১৮২
৩৭ শঙ্খ ঘোষ। ছন্দের বারান্দা, দ্বিতীয় সং, পৃ ৫
৩৮ তদেব পৃ ৫-৬। এই আবিষ্কারের পুনরুক্তি আছে, তারাপদ ভট্টাচার্য, ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন, ১৯৭১, পৃ ৪০৯
৩৯ রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ; প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত তৃতীয় সং, পৃ ২১২
৪০ তদেব, পৃ ২১৪

৪১ Eliot, T. S. ed. *Literary Essays of Ezra Pound.* Faberpaper, 1960, p. 3
৪২ *পঞ্চমবাহিনী, সমর সেনের কবিতা*
৪৩ সুন্দর, নিহিত পাতালছায়া
৪৪ বিশেষতঃ স্মরণযোগ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিকের' পরীক্ষা। তাঁর কৃতিত্বের বিস্তৃত আলোচনার জন্য বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ ৮৫-৮৮ দ্রষ্টব্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষার পূর্বাভাস পেলাম বিহারীলালের 'নিসর্গসন্দর্শন' প্রথম সর্গের অন্তর্গত 'ছিন্নের ছিন্নেমো করে স্বভাব তাহার'
৪৫ বিনয় মজুমদার, ফিরে এসো চাকা
৪৬ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, চাবি, দাঁড়াও সুন্দর
৪৭ সুব্রত চক্রবর্তী, বিবিজান, বালক জানে না
৪৮ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতকামিনী, 'কবিতাবলী'
৪৯ আহ্বানগীত, 'কড়ি ও কোমল'
৫০ শঙ্খ ঘোষ। তদেব, পৃ ১৪
৫১ রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশত-বার্ষিক সং, পৃ ৯০৬
৫২ (ক) উদ্ধৃতিটি প্রথম সর্গ, (খ) উদ্ধৃতিটি তৃতীয় সর্গ এবং (গ) উদ্ধৃতিটি চতুর্থ সর্গ থেকে নেওয়া
৫৩ প্রবোধচন্দ্র সেন। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান, 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা', ১৯৭৪, পৃ ১৩৫। 'ভুলভাঙ্গা' 'মানসী' কাব্যের অন্তর্গত। তারো আগে এই ভুল ভেঙেছে বলে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন, 'কড়ি ও কোমলের' 'বিরহ' কবিতায়, দ্রষ্টব্য বাংলা ছন্দ, সাহিত্য-চর্চা, তদেব, পৃ ৮৭ পাদটীকা। প্রবোধচন্দ্রও পরে এই কথা মেনে নিয়েছেন, দ্রষ্টব্য হরপ্রসাদ মিত্র (সং) রবীন্দ্রচর্চা, ১৯৬১, সংকলনের অন্তর্গত, ছন্দশিল্পী রবীন্দ্র-নাথ প্রবন্ধের পৃ ৮৫। কিন্তু মনে হয় প্রথমে ঘটনাটি ঘটেছে 'কড়ি ও কোমলে'র 'খেলা' কবিতায় (কবিতাটির পর্ব অবশ্য ষট্‌কল নয়, পঞ্চকল)—

দুটি একটি পথিক চলে
'গল্প' করে, হাসে।
'লজ্জাবতী' বধূটি গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।

৫৪ ছন্দশিল্পী রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, তদেব। বুদ্ধদেব বসু মধুসূদনের রচনায় পেয়ে-ছিলেন এই ছন্দের পূর্বাভাস; মাইকেল, 'সাহিত্যচর্চা', তদেব, পৃ ৪৫-এর পাদটীকার প্রথম উদ্ধৃতি
৫৫ রবীন্দ্রনাথ। কৃপণা, 'সানাই'
৫৬ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ঘুমের ঘোরে, 'মরীচিকা'
৫৭ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯৪৫, 'সংবর্ত'
৫৮ শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অমরাবতীর আলো, 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো'
৫৯ রবীন্দ্রনাথ। ছন্দ, তৃতীয় সং, পৃ ৬
৬০ তদেব, পৃ ৫
৬১ সাহেব ও গরু
৬২ 'একেই কি বলে সভ্যতা'র গান; দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, পৃ ৪৫-এর পাদটীকার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি
৬৩ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হায় কি হলো, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য-পরিষৎ, পৃ ৪৯
৬৪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কেরানী, 'আষাঢ়ে'
৬৫ সুকুমার রায়। ছায়াবাজি, 'আবোলতাবোল'
৬৬ আগমন
৬৭ নিষ্কৃতি
৬৮ নজরুল ইসলাম। কবি-রাণী, 'সঞ্চিতা'
৬৮ক বুদ্ধদেব বসু, বিরহ, 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা'
৬৯ শঙ্খ ঘোষ। বাবুমশাই, মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়
৭০ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তোমার কাছেই, 'মন ভালো নেই'

৭১ মেঘনাদবধকাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য; মধুসূদন গ্রন্থাবলী, সাহিত্যপরিষৎ
৭২ তদেব
৭৩ মাইকেল, 'সাহিত্যচর্চা', তদেব, পৃ ৪৩
৭৪ এই পাঠপরিবর্তনগুলি আমি নিয়েছি বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১০৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রণয়কুমার কুণ্ডুর মেঘনাদবধকাব্যের পাঠান্তর প্রবন্ধ থেকে
৭৫ প্রথম স্তবক, তৃতীয় সর্গ
৭৬ রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্য', তদেব, পৃ ৯০৫
৭৭ প্রথম স্তবক, তৃতীয় সর্গ
৭৮ বসন্ত অবসান, 'কড়ি ও কোমল'
৭৯ দুরন্ত আশা, 'মানসী'
৮০ রাত্রি, 'কল্পনা'
৮১ ঝর্ণা, 'কাব্যসঞ্চয়ন'
৮২ কঙ্কাবতী, 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা'
৮৩ বুদ্ধদেব বসু, দময়ন্তী, 'দময়ন্তী'
৮৪ জীবনানন্দ দাশ, রাত্রি, 'সাতটি তারার তিমির'
৮৫ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রক্তাক্ত ঝরোখা, 'রক্তাক্ত ঝরোখা'
৮৬ অরুণ সেন, বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতার সাঙ্গীতিক গড়ন, সারস্বত, বৈশাখ-আষাঢ় ১০৮১
৮৭ বিষ্ণু দে, হেমন্ত, 'আলেখ্য'
৮৮ শঙ্খ ঘোষ, তদেব, পৃ ১১২; এই প্রসঙ্গে আরো দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের বিষ্ণু দে-র অন্বেষণ, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, ১০৮১, ২২১-২২
৮৯ কবি-কথিত ভূমিকা, EMI-HMV, record No. 7EPE 1137
৯০ মোহিতলাল, তদেব, পৃ ১৪৯
৯১ প্রবন্ধের এই অংশের কিছু কথা বর্তমান লেখকের অন্য একটি প্রবন্ধে আছে; কবিতার শরীর, হীনযান, দ্বিতীয় বছর, তৃতীয় সংকলন
৯২ মোহিতলাল, তদেব, পৃ ১৫৮
৯৩ বাংলাকবিতার স্বপ্নভঙ্গ: মানসী, 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' তদেব, পৃ ১৮৮
৯৪ ময়ূরী, 'রঙ্গাঙ্গনা'
৯৫ রবীন্দ্রনাথ। বিহারীলাল, 'আধুনিক সাহিত্য', তদেব, পৃ ৯০৬
৯৬ দশম স্তবক, দ্বিতীয় সর্গ
৯৭ ছন্দের বারান্দা, তদেব, পৃ ৬৪
৯৮ পদ্মের মৃণাল, 'কবিতাবলী'
৯৯ বুদ্ধদেব বসু অবশ্য সঙ্গতভাবে প্রশ্ন তোলেন, "স্তবকের বৈচিত্র্য কোথায় বেশি,— একা রবীন্দ্রনাথে, না স্কট থেকে কীটস পর্যন্ত সমগ্র ইংরেজি রোমান্টিক আন্দোলনে।" বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ। মানসী, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১৯০ পাদটীকা
১০০ ধ্যান, 'মানসী'
১০১ ঝুলন, 'সোনার তরী'
১০২ প্রতিজ্ঞা, 'ক্ষণিকা'
১০৩ যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায়, 'অশোকগুচ্ছ'
১০৪ জিন, 'তীর্থরেণু'
১০৫ গ্রীষ্মের সুর, 'কুহু ও কেকা'
১০৬ এই প্রসঙ্গে John Hollander-এর *Vision and Resonance*, 1975, গ্রন্থের The Poem in the Eye প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য
১০৭ অভিজ্ঞান, 'অভিজ্ঞানবসন্ত'
১০৮ Bernard, Oliver, tr. *Selected Poems*, Penguin, p. 74
১০৯ মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়
১১০ সোনার মাছি খুন করেছি
১১১ কয়েকটি লাইন, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'
১১২ বুনো হাঁস, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
১১৩ এই সব দিনরাত্রি, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'
১১৪ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'কুলায় ও কালপুরুষ', ১৩৬৪, পৃ ৩২

১১৫ জে. এইচ. রেনল্‌ড্‌স্‌কে লেখা কীটসের চিঠি, তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯
১১৬ *গোধূলি সন্ধির নৃত্য, 'সাতটি তারার তিমির'*
১১৭ *বিহারীলাল, সাহিত্যসাধক চরিতমালা দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩০*
১১৮ Pure Poetry. *The Art of Poetry,* 1958, p. 185
১১৯ সাহিত্যের উদ্দেশ্য, 'সাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃ ৮২৭
১২০ এই বাক্যাংশগুলি রবীন্দ্রনাথের বিহারীলাল প্রবন্ধ থেকে নেওয়া
১২১ On Poetry and Poets in *The Three Voices of Poetry,* 1957, p. 89
১২২ কবিকাহিনী বিষয়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ; বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসাগর-সঙ্গমে', ১৩৬৯, পৃ ২
১২৩ মোহিতলাল মজুমদার। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৭৩, পৃ ৪২
১২৪ রবীন্দ্রনাথ, আসা-যাওয়া, 'সানাই'
১২৫ সুধীন্দ্রনাথ, নিরুক্তি, 'উত্তরফাল্গুনী'
১২৬ সুনীলচন্দ্র সরকার, আমার পক্ষে, 'সাত মহাল'
১২৭ ভবতোষ দত্ত। বামবসুর বিরহ, 'বাঙালির সাহিত্য', ১৯৭৭, পৃ ১১৩
১২৮ De, S. K , *Ibid.* 352
১২৯ সঙ্গীত শতকের শেষ গান
১৩০ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মধুসূদন ও আধুনিক মন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মধুসূদন ও উত্তরকাল', ১৯৬২, পৃ ৮২
১৩১ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি, বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', চৈত্র ১৩৭৩, পৃ ৯৫
১৩২ মোহিতলাল মজুমদার। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', পৃ ১৬
১৩৩ রবীন্দ্রনাথ। আধুনিক কাব্য, 'সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্ররচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, পৃ ৩৪২
১৩৪ তদেব, পৃ ৩৪৫
১৩৫ আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভূমিকা, 'আধুনিক বাংলা কবিতা', ১৯৪০
১৩৬ *The Philosophy of Modern Art,* Meridian, 1955, p 115
১৩৭ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। স্থির সত্য, 'জাগরণ হেমবর্ণ'

আ

বাংলা নাটকের দু'শ বছর

অজিতকুমার ঘোষ

দু'শ বছর আগে মঞ্চে অভিনেয় বাংলা নাটকের জন্ম হয়নি, কিন্তু কলকাতা শহরে ও গ্রামাঞ্চলে তখন অভিনয়ধারার প্রচলন ছিল। এই অভিনয়ধারার দুটি বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। কলকাতা ছাড়া সর্বত্র যাত্রা, বিশেষ করে 'কালীয়দমন' যাত্রার, অভিনয় হত আর কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাটক মঞ্চস্থ হত। কালীয়দমন লোকযাত্রা বলেই তার কোনো লিখিত রূপ ছিল না, তার রচনারূপ অধিকারীদের স্মৃতিতেই প্রধানতঃ বর্তমান ছিল এবং সেজন্যই তা সুনির্দিষ্ট কোনো ভাষা ও রচনাসীমায় আবদ্ধ থাকত না, শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদা এবং আসরের প্রয়োজনে তার গান ও কথার মধ্যে নিত্য নতুন নতুন সংযোজন হত। কালীয়দমনের উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ওই যাত্রা ও যাত্রাওয়ালাদের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[১] যে ক'জন একত্রিত হয়ে এই যাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন তাঁদের সমষ্টির নাম ছিল দল বা সম্প্রদায় এবং ওই সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন অধিকারী। খোল করতাল, বেহালাদি যন্ত্র এবং কতকগুলি সাজগোজ[২] এই যাত্রার উপকরণ ছিল। কৃষ্ণযাত্রায় মুনিগোসাঁই (নারদ), বাসদেব (ব্যাসদেব) ও দূতীর ভূমিকাই প্রধান ছিল। যাত্রার অধিকারী এই ভূমিকাগুলির একটি গ্রহণ করতেন। তিনি বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও গানের সাহায্যে বক্তব্যবস্তু শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতেন। প্রথমে গৌরচন্দ্রী অথবা গৌরচন্দ্রিকা গান হত, তারপর ব্যাসদেব আসরে প্রবেশ করে কিছু কৌতুকরস পরিবেশন করতেন, পরে বয়ড়ের দল এসে নৃত্যগীত শুরু করে দিত, অবশেষে আসল পালা আরম্ভ হত এবং বৃন্দাদূতী অথবা মুনিগোসাঁইএর ভূমিকায় স্বয়ং অধিকারী প্রবেশ করতেন এবং ক্রমে ক্রমে অন্যান্য চরিত্রের গান, নাচ ও কিছু সুরেলা সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। দান, মান, মাথুর, অক্রূর-সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ, সুবল-সংবাদ প্রভৃতি পালাই কালীয়দমন যাত্রার প্রধান ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কালীয়দমন যাত্রায় অধিকারীদের মধ্যে শিশুরামের নামই সকলের আগে উল্লেখ করতে হয়। অনেকের মতে শিশুরামই কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্তক।[৩] তিনি বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুরামের পর তাঁর শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী কালীয়দমন যাত্রাভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরমানন্দ দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন।[৪] মানের পালায় তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। 'বঙ্গদর্শনে' একজন লেখক লিখেছিলেন, 'মান বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র drama, এবং বোধ হয় মান বাঙ্গালা প্রথম drama.'[৫] পরমানন্দের যাত্রায় গীত ও কথা দুই-ই থাকত। গীত পরার

ছন্দে রচিত এবং সুরে গাওয়া হত। শেষ ছত্রটি গাওয়া হত কীর্তনের সুরে। এই প্রণালীকে বলা হত তুক্কো। পরমানন্দ পয়ার ছন্দে পাঁচালী আবৃত্তির মত কিছু 'ঘটকালি' আবৃত্তি করতেন। এই ঘটকালি, তুক্কো ও ঝুমুর নিয়ে তাঁর পালা গড়ে উঠত। তাঁর পালার রস সমগ্রভাবে আস্বাদন না করলে পুরো রস আস্বাদন করা যেত না। সেজন্য মনে হয় তিনি পালার মধ্যে যথেষ্ট নাট্যরস সঞ্চার করতে সক্ষম ছিলেন।

শ্রীদাম-সুবল ছিলেন দুই যমজ ভাই। তাঁরা পরমানন্দের আগে না পরে যাত্রার আসরে এসেছিলেন সে-সম্পর্কে মতভেদ আছে।[৬] শ্রীদাম-সুবল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যাত্রাজগতে বর্তমান ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখের 'সমাচার দর্পণে' সর্বপ্রথম শ্রীদাম-সুবল নামে দুজন কালীয়দমন যাত্রা-ওয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায়: 'কালীয়দমনযাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভাই দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল, তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহর সময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে'।[৭] ছাপার অক্ষরে এই প্রথম দুজন যাত্রাওয়ালার সন্ধান পাওয়া গেল। পরমানন্দের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী প্রেমচাঁদ অধিকারী নামে আর একজন যাত্রাওয়ালার কথা জানা যায়। প্রেমচাঁদ তুক্কোর জায়গায় চৌপদী ব্যবহার করতেন। তিনি মহাজনী কীর্তনের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। তবে সেই কীর্তন একটু হালকা করে প্রচলিত ভাব ও ব্যাখ্যা মিশিয়ে শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুললেন। শ্রীদাম-সুবলের সমসাময়িক লোচন অধিকারী নামে আর একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন। লোচন অক্রূর-সংবাদ এবং সন্ন্যাসখণ্ড এই দুই পালায় অদ্বিতীয় ছিলেন। কালীয়দমন যাত্রার পুরাতন রীতির শেষ অধিকারী সম্ভবতঃ বদন। ভাগীরথী-তীরে শালিখা গ্রামে এঁর বাস ছিল। কিন্তু আদি নিবাস ছিল জিরেট গ্রামে। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন, সেজন্য তাঁর গানে শ্রোতারা বিশেষ প্রীত হত। দান, মান ও মাথুর এই তিন পালায় তাঁর খ্যাতি ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কবছর পর্যন্ত যে লোকনাট্য কালীয়দমন প্রচলিত ছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। মুদ্রণযন্ত্রের মধ্য দিয়ে এর কোনো নিদর্শন রক্ষিত হয়নি, সেজন্য এর সাহিত্যিক দিকটি ছিল নিতান্তই গৌণ, গীত ও অভিনয়ের দিকটিই ছিল প্রধান। যাত্রাওয়ালারা আসরের মেজাজ ও প্রয়োজন বুঝে তাঁদের পালার পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করতেন। বিশেষ করে অধিকারী ও অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের সংলাপে এই পরিবর্তন বেশী ঘটত। কোনো স্থায়ী লিখিত রূপ ছিল না বলে এ-ধরনের পরিবর্তনে কোনো বাধা ছিল না। কালীয়দমন যাত্রায় কথা অপেক্ষা গীতের ভাগই ছিল প্রধান, কিন্তু নাট্যরস সৃষ্টি করতে হ'লে কথা দরকার, এমনকি সংগীতকেও বিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশন না করে নাট্যঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে কথোপকথনের রীতিতে প্রয়োগ করা দরকার। যাত্রাওয়ালারা তাই করতেন। সংগীত কোনো ভাব বা তত্ত্ব প্রকাশ করে কিন্তু কথার মধ্য দিয়ে লৌকিক রস পরিস্ফুট হয়। যাত্রাওয়ালারা সংগীতের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের কাছে উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব ও অলৌকিক ভাবাদর্শ পরিবেশন করতেন, কিন্তু কথার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের প্রীতিকর নানা লৌকিক প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন। এমনিভাবে তাঁরা ভক্তিরসের সঙ্গে কৌতুকরস সৃষ্টি করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন। শ্রোতারা যেমন ভক্তিরসে সঞ্জীবিত হতে চাইত, তেমনি একটু মজা, একটু আমোদ পাবার ইচ্ছাও তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কৌতুকরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁরা ঘটনাবহির্ভূত কোনো কোনো চরিত্র আমদানী করতেন। ব্যাসদেব, নারদ, বৃন্দা প্রভৃতি চরিত্র যথেষ্ট কৌতুকরস পরিবেশন করে শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। দেবচরিত্র কিংবা মহিমান্বিত চরিত্রকে সাধারণ মানুষের মত আচরণ করতে দেখে শ্রোতারা অসঙ্গতি-জনিত কৌতুকবোধ করত। অনেক সময় যাত্রাওয়ালারা কৌতুকের হাল্কা ও ছদ্ম বাক্যের মধ্য দিয়ে হয়ত কোনো গভীর তত্ত্বের আভাস দিতেন। শ্রোতারা হাসতে হাসতে তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়ে বিশেষ প্রীতি লাভ করত। যে গীতগুলি যাত্রাওয়ালারা পরিবেশন করতেন সেগুলির মধ্যে গভীর কোনো আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থাকলেও ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে যাত্রাওয়ালারা সেগুলি সাধারণ শ্রোতাদের উপযোগী করে তুলতেন। অনেক সময় গানের সঙ্গে ব্যাখ্যা জুড়ে তাঁরা তাঁদের গান শ্রোতাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতেন। কালীয়দমন যাত্রার প্রাণ-পুরুষ ছিলেন অধিকারী। তিনি ছিলেন যাত্রার সূত্রধার অথবা পরিচালক, অন্যতম অভিনেতা আবার দর্শকদেরও একজন। তিনি কখনো অভিনয়ের ভিতরে থাকতেন আবার কখনো বা থাকতেন বাইরে, কখনো শ্রোতাদের কাছে কথা বলতেন, কখনো শ্রোতাদের হয়ে কথা বলতেন এবং কখনো বা সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে কথা বলতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মণ্ডনাটকের আলোচনার আগে ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডীনাটক'টির কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। মৃত্যুর পূর্বে ভারতচন্দ্র এই অসম্পূর্ণ নাটকটি রচনা শুরু করেছিলেন। চণ্ডী ও মহিষাসুরের যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে তিনি এই নাটকটির বিষয়বস্তু পরিকল্পনা করে-

ছিলেন। সংস্কৃত নাট্যরীতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন। সেজন্য প্রস্তাবনায় তিনি সূত্রধার ও নটীর কথোপকথন উপস্থাপিত করেছেন। সূত্রধারের উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভাষা-শ্লোককবিত্বগীতিমিলিতং খণ্ডেন সম্বর্ণিতং।' অর্থাৎ, ভাষা শ্লোক কবিত্ব ও গীতের মিলনে তিনি নাটকটি রচনা করেছেন। ভাষার অর্থ বাংলা ও হিন্দী ভাষা। সংস্কৃত নাটকে যে সব চরিত্র প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করে সেই ধরনের চরিত্র অর্থাৎ, নারী ও ইতরজাতীয় চরিত্রের মুখে কবি বাংলা ও হিন্দীমিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। সেজন্য এই মিশ্রভাষা দিয়েছেন নটী ও মাহিধাসুরের মুখে, কিন্তু সূত্রধারের ভাষা সংস্কৃত। ভারতচন্দ্রের আমলে নাটকের অভিনয় উপযোগী মঞ্চ ছিল না। সেজন্য মনে হয়, নিছক সাহিত্যিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন, নাট্য প্রয়োগের কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।

ভারতচন্দ্রের তিরোধানের আগেই এদেশে বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা হয়। বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার ফলেই যাত্রাভিনয়ের পাশে নাট্যাভিনয়ের ধারা প্রবর্তিত হল। প্রাথমিক নাট্যাভিনয়ের ভাষা ইংরেজী হলেও অদূর ভবিষ্যতে মঞ্চের প্রয়োজনে বাংলা নাটক রচনার সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সব মঞ্চে মুদ্রিত ইংরেজী নাটকের অভিনয় হত, ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয় প্রকার নাটকই ছিল। এই সব নাটকের অভিনয় ইংরেজ দর্শকদের সঙ্গে অভিজাত বাঙালী দর্শকরাও কিছু কিছু দেখতেন। মঞ্চনির্মাণপদ্ধতি ও নাট্যপ্রয়োগরীতি সম্বন্ধে যেমন তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা হল তেমনি মঞ্চে অভিনেয় নাটক সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সংস্কার গড়ে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে মঞ্চ ও অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ও কৌতূহল গড়ে ওঠার কারণ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় মঞ্চ ও অভিনয় সংক্রান্ত সংবাদপ্রকাশ। হিকির গেজেট ও ক্যালকাটা গেজেটের মত কাগজে মঞ্চ, অভিনয় ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রকাশিত হত। শুধু কেবল সংবাদ নয়, সমালোচনাও প্রকাশিত হত। ওই সব সমালোচনার ফলে নাট্যপরিচালক ও অভিনেতারা যেমন অভিনয়ের মান উন্নত করতে সতর্ক ও সচেষ্ট হতেন, তেমনি জনসাধারণও অভিনীত নাটক সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখতে পারত এবং নাটকের গুণাগুণ বিচার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবার সুযোগ পেত।

ওল্ড প্লে হাউস, ক্যালকাটা থিয়েটার ও মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার—এইগুলি ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বিদেশী রঙ্গালয়। এই রঙ্গালয়গুলিতে যখন ইংরেজী নাটকের অভিনয় বেশ জমে উঠেছে তখন একজন ভাগ্যান্বেষী রুশ এসে প্রথম বাংলা নাট্যশালা প্রবর্তন করলেন। লেবেডেফ যে নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করলেন তার নাম 'Bengallie Theatre,' এবং তিনিই সর্ব-প্রথম এই থিয়েটারে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করেন। লেবেডেফের আগে যাঁরা এদেশে নাট্যশালা স্থাপন করেন এবং নাটক মঞ্চস্থ করেন তাঁরা কেউ বাঙালী ও বাংলা নাটকের কথা চিন্তা করেননি, কিন্তু লেবেডেফ করলেন, এর কারণ কি? এর কারণ হল এই যে, এ-দেশে আগত সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইংরেজদের মনে ইংরেজ সমাজ ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বভাবতঃই অহংকারবোধ ছিল এবং বাঙালী সমাজ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের মনে কিছুটা অবজ্ঞার ভাবই ছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় এবং সেই রঙ্গালয়ের অভিনয়ের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ এ-দেশের ইংরেজ সমাজ। যে সব বাঙালী দর্শকরূপে আসতেন তাঁরা ছিলেন অভিজাতশ্রেণীভুক্ত ও ইংরেজীনবিস। কিন্তু লেবেডেফ ছিলেন একজন রুশ, ইংরেজী ভাষার প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। তিনি সাধারণ জনসমাজভুক্ত ছিলেন এবং সেজন্য তিনি সাধারণ দর্শকদের কথাই শুধু ভেবেছিলেন, যাদের কাছে পৌঁছতে গেলে তাদের নিজেদের ভাষাতেই নাটক পরিবেশন করা দরকার। লেবেডেফই হলেন বাংলা নাট্যজগতের প্রথম ব্যক্তি যিনি নাটকের ভাষা, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন, উপস্থাপনারীতি সবদিক দিয়ে সাধারণ দর্শকসমাজের সঙ্গে নাট্যশালার যোগস্থাপন করেছিলেন। লেবেডেফ *The Disguise* & *Love Is the Best Doctor* নামে দুখানি নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি তাঁর অনুবাদ কয়েকজন বিজ্ঞ পণ্ডিতকে পড়তে দেন। তাঁরা কয়েকবার ওই অনুবাদ পড়ে প্রশংসা করেন এবং তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাস তাঁকে এ-দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী জোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। উৎসাহিত হয়ে লেবেডেফ তাঁর নিজস্ব নাট্যশালা Bengallie Theatre নির্মাণ করেন এবং ২৭-১১-১৭৯৫ তারিখে 'দি ডিসগাইস্' নাটকটির তিনটি দৃশ্যসম্বলিত একাঙ্ক অনুবাদরূপে মঞ্চস্থ করেন এবং পুনরায় ২১-৩-১৭৯৬ তারিখে ওই নাটকের অনূদিত পূর্ণাঙ্গরূপটি অভিনীত হয়। লেবেডেফ নিজে একজন বেহালাবাদক ছিলেন, সেজন্য নাটকের অভিনয়ে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত প্রয়োগে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতও যুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের কিছু কবিতাংশও তিনি সংগীতে প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ নাটকে দ্বিতীয় ক্রিয়ার (অঙ্ক) দ্বিতীয় ব্যস্ততায় (দৃশ্য) লেবেডেফ কানেদের গানবাজনা উপস্থাপিত করেছেন। সংগীতব্যবসায়ী শ্রেণীবিশেষকে বলা হত কান (কিন্নর), যেমন মধুসূদন কান। এই কানেদের গানবাজনায় সম্ভবতঃ লেবেডেফ কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতগুলির ভাষা কি ছিল তা নাটক থেকে জানার উপায় নাই। নাটকের গোড়াতেই নানান বাজিয়্যার বাজনার অবতারণা হয়েছে। প্রথম ক্রিয়ার দ্বিতীয় ব্যক্ততায় ছদ্মবেশিনী সুখময়ের হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখানো হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় ব্যক্ততায় পুনরায় গাউয়্যা, বাজিয়্যা, ন্যাচয়্যার গান-বাজনা-নাচের অবতারণা করা হয়েছে। বার বার গান-বাজনা ও নাচের অবতারণা করে পরিচালক লেবেডেফ সাধারণ দর্শকদেরই মনোরঞ্জন করতে চেয়েছিলেন। তিনি অভিনয়ের চরিত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পোশাক পরিচ্ছদের দিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন। প্রথম দৃশ্যের বাজিয়্যারা নানা ধরনের পোশাক ও মুখোশ ধারণ করেছিল। ছদ্মবেশ ধারণের কৌতুকক্রিয়ার উপরে তো সমগ্র নাটকটির রহস্যজনক ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। ভোলানাথবাবুর ভ্রমণোপযোগী বেশ, সুখময়ের মনোরম পোশাক, রামসন্তোষের তোগা, পাখনা দেওয়া টুপি ইত্যাদি। মূল নাটককে অনুসরণ করে অনুবাদক প্রতিটি দৃশ্যের গোড়ায় ও দৃশ্যের ভিতরে দৃশ্যসজ্জা ও পাত্রপাত্রীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নানা নির্দেশ দিয়েছেন।

লেবেডেফ দুখানি নাটক অনুবাদ করেছিলেন, এ-তথ্যমাত্র এতদিন জানা ছিল। সেই অনুবাদ সম্পর্কে চাক্ষুষ কোনো পরিচয় বাঙালীর ছিল না। অবশ্য 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' নাটকটির অনুবাদ পাওয়া যায়নি, তাতে খুব ক্ষতিও হয়নি, কারণ ওই নাটকটি লেবেডেফ মঞ্চস্থ করেননি। তিনি 'দি ডিসগাইস' নাটকের যে অনুবাদ করেছিলেন কিছুকাল আগে ডঃ মদনমোহন গোস্বামীর চেষ্টায় তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।[৮] ডঃ গোস্বামী সযত্নে সোভিয়েট রাশিয়ার সেণ্ট্রাল স্টেট আর্কাইভ অব লিটারেচার অ্যাণ্ড আর্টের সৌজন্যে ওই নাটকের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দুটির মাইক্রোফিলম নকল করে এনে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন, এ-জন্য তিনি নাট্যামোদী প্রত্যেক বাঙালীর ধন্যবাদার্হ। তিনি অতি যত্নের সঙ্গে মূল ইংরেজী নাটকের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দুটি পর পর স্থাপন করেছেন এবং লেবেডেফ-কৃত অনুবাদ দুটিও পর পর সন্নিবেশিত করেছেন। সম্পাদকের একটি মূল্যবান ভূমিকা ও উচ্চারণানুগ শব্দসূচী ও শব্দাবলীর বিশুদ্ধ রূপ লিপিবদ্ধ করেছেন। লেবেডেফ মূল ইংরেজী রচনার পাশে রুশ অনুবাদ ও বাংলা অনুবাদ সন্নিবেশিত করেছেন। ডঃ গোস্বামী রুশ অনুবাদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূল ইংরেজী নাটক দুখানি ও লেবেডেফ-কৃত বাংলা অনুবাদ পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। মূল ইংরেজী নাটকটি এম. জোডরেল রচিত। অনুবাদক 'দি ডিসগাইসে'র বাংলা করেছেন 'কাল্পনিক সংবদল' বা সাজবদল। তিন দৃশ্যবিশিষ্ট একাঙ্ক নাটকটি পূর্ণাঙ্গ নাটকটির সংক্ষিপ্ত রূপ। 'কমেডি'র অনুবাদ হয়েছে খেলা (সম্ভবতঃ 'প্লে' শব্দের অনুবাদ করতে গিয়েই নাট্যকার খেলা নামটি দিয়েছেন)। 'অ্যাক্টে'র অনুবাদ হয়েছে ক্রিয়া এবং 'সীনে'র অনুবাদ হয়েছে ব্যক্ততা। অঙ্ক ও দৃশ্য নাম তখনো বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তিত হয়নি। অনুবাদে ইংরেজী বাক্যবিন্যাসপ্রণালী অনেক স্থানে অনুসৃত হয়েছে, খাঁটি বাংলা বাক্যবিন্যাসরীতি তখনো আয়ত্ত হয়নি। 'আমি বুঝী, আমি হই বড় সুন্দর দেখিতে এবং বিশেষরূপে জখন পাইয়াছী সওগাত এমন সুন্দরির ঠাঁই'—এ-ধরনের আড়ষ্ট ও অ-বাংলা বাক্যরীতি অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায়। 'ভাগ্যবতি প্রবেস হয়', 'দেখিলেন পত্র', 'নিয়া গেল তাহারদিগকে একদিকে', 'আমি এমন চমৎকার হইয়াছী এই সুনিয়া যে'—এই ধরনের অশুদ্ধ ও অ-বাংলা বাক্যবিন্যাসরীতি অনুবাদে প্রচুর দেখা যায়। লেবেডেফ বাংলা ভাষার কোনো লিখিতরূপ দেখেননি, লোকের মুখের ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, সেজন্য তাঁর ভাষায় এত বর্ণাশুদ্ধি দেখা যায়। ই, ঈ, উ, ঊ, ন, ণ, শ, ষ, স প্রভৃতি বর্ণের এত বিপর্যয় চোখে পড়ে। তবে খাঁটি বাংলা বাগ্বিধির ব্যবহারও অনুবাদের মধ্যে যথেষ্ট চোখে পড়ে। যথা, 'চুলয় জাউক', 'সোনামনিটি', 'ও, ছুঁচ!', 'ও আমার প্রাণধোন', 'বাছাধন', 'আইমা', 'আমার মিছরির ছুরি' ইত্যাদি। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে সাধু ক্রিয়াপদেরই ব্যবহার বেশী।

যে মূল নাটকটি লেবেডেফ অনুবাদ করেছিলেন সেটি নিতান্ত সাধারণ স্তরের নাটক। মলিয়েরের কমেডির আদর্শে নাটকটি রচিত। প্রণয়ের সংশয়, পরীক্ষা, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি ও অবশেষে সব কিছুর মধুরান্তক সমাধান—কমেডির এই রীতি নাটকে অনুসৃত। প্রকৃত পরিচয় গোপন করবার ফলে জটিলতা এবং শেষে আসল পরিচয় উদ্ঘাটনের ফলে সকল রহস্যের প্রীতিকর সমাধান—কমেডির এই বিশিষ্ট পদ্ধতিও নাটকে অবলম্বন করা হয়েছে। তবে নাটকে কোনো ঘটনাজটিলতার রহস্যঘন উপস্থাপনা নেই, দর্শকদের কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা কোথাও তীব্র হয়ে ওঠেনি। লেবেডেফ মূল নাটকের চরিত্রগুলির এ-দেশীয় নাম দিয়েছেন, বিদেশী স্থানের নাম পরিবর্তন করে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি নাম উল্লেখ করেছেন। এ-দেশের কবিতা, গান এবং সংলাপে ইংরেজী বাক্যবিন্যাসরীতির কৃত্রিমতা সত্ত্বেও বাংলা বাগ্ভঙ্গি, খাঁটি বাংলা অব্যয় ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এজন্য লেবেডেফের অনুবাদ মৌলিক নাটকের অনুরূপ হয়ে উঠেছে। তাঁর কৃতিত্ব এখানে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়ের পাশে লৌকিক যাত্রাভিনয়ের ধারাও

প্রবহমান ছিল। কালীয়দমন যাত্রার দুজন বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। গোবিন্দ অধিকারী কালীয়দমন যাত্রার সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাওয়ালা ছিলেন। তিনি মানভঞ্জন, নৌকাবিলাস, অক্রুরসংবাদ, দানলীলা প্রভৃতি পালা রচনা করেছিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাপালাগুলি মুদ্রিত হয়েছে বলেই পরবর্তীকালে এই পালাগুলি এত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[৯] গোবিন্দর যাত্রায় সমসাময়িক সাংসারিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করেছে। আগেকার কালীয়দমন যাত্রার চেয়ে তাঁর যাত্রায় সংলাপের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুগঠনও আগেকার চেয়ে বেশী সংহত হয়েছে। তৎকালীন গান ও কবিতায় যে যমক-অনুপ্রাস-শ্লেষের বাহুল্য লক্ষণীয় তা গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাতেও পরিস্ফুট। গোবিন্দ অধিকারীর মতোই আর একজন যাত্রাওয়ালা পূর্ববঙ্গে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি হলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্নবিলাস', 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্রবিলাস', 'নিমাই সন্ন্যাস' ভক্তিরসের প্লাবনে শ্রোতাদের চিত্ত আপ্লুত করে তুলেছিল। কৃষ্ণকমলের যাত্রায় প্রাচীনতর যাত্রার সংগীতপ্রাধান্য, কীর্তনের অনুগামিতা ও ভক্তি-মার্জিত বিশুদ্ধ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কালীয়দমন যাত্রার শেষ যাত্রাওয়ালা বলা যায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর যাত্রাগান অবশ্য উনিশ শতকের শেষভাগেই রচিত হয়েছিল (জন্ম ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ)। তিনি গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য ছিলেন, সেজন্য তাঁর যাত্রাপালায় গোবিন্দ অধিকারীর প্রভাব স্পষ্ট। গোবিন্দ অধিকারীর চেয়েও বোধ হয় তাঁর পালায় সংলাপ বেশী গুরুত্ব পেল।[১০] তাঁর 'চণ্ডালিনী উদ্ধার', 'প্রভাসযজ্ঞ' ও 'কংসবধ' পালাগুলিকে কৃষ্ণযাত্রা বলা চলে, কারণ কৃষ্ণের মহিমা এই পালাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট, কিন্তু কৃষ্ণ এই পালাগুলিতে 'রসো বৈ সঃ' নন, ভক্তিমন্দাকিনী ধারাও এদের মধ্যে প্রবাহিত হয়নি। কিন্তু তাঁর 'মান', 'মাথুর' ও 'কলঙ্কভঞ্জন' পালাগুলি বৃন্দাবনলীলা অবলম্বনে রচিত।

ভক্তিরসাত্মক কালীয়দমনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের গোড়া থেকে নানা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে যাত্রাপালা রচিত হতে থাকে। তখনকার মুদ্রিত সাময়িকপত্র থেকে এ-সব যাত্রাভিনয়ের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রবর্তনের কথা জানা যায়।[১১] বিদ্যাসুন্দর যাত্রার মধ্যে খেমটা নাচ প্রবর্তিত হল। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর চরিত্রগুলির সঙ্গে রাধা, কৃষ্ণ , রাম, সীতা প্রভৃতি নানা ধরনের চরিত্র এই যাত্রায় স্থান পায়। বিদ্যাসুন্দর যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ে ও তাব শিষ্য কৈলাসচন্দ্র বারুই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী তখন লোকের এতই মনোরঞ্জক হয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরেও মঞ্চে নবীনচন্দ্র বসু এবং পরবর্তীকালে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ছাড়া কলিরাজার সং, নলদময়ন্তী যাত্রা[১২], বিক্রমাদিত্য যাত্রা ইত্যাদি যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে যে বিভিন্ন যাত্রার নাম দেওয়া হল সেগুলি সম্ভবতঃ বিভিন্ন রীতির যাত্রা নয়, বিষয়বস্তু অবলম্বনেই এই সব যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বেশধারণকে তখন সং বলত। যাত্রার অভিনেতারা চরিত্র অনুযায়ী বেশভূষা ধারণ করত বোঝা যাচ্ছে। নৃত্যগীত ও কিছু সংলাপ সম্বলিত লোকাভিনয়কেই তখন যাত্রা বলা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার পূর্ণ পরিণতি দেখা গেল উনিশ শতকের প্রথম ভাগে, বিদেশী রঙ্গালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ও জাঁকজমকপূর্ণ রঙ্গালয় ছিল চৌরঙ্গী থিয়েটার ও সাঁসুসি থিয়েটার। এই সব রঙ্গালয়ের সঙ্গে উচ্চপদস্থ ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই এবং অভিজাত বাঙালী সমাজেব মধ্যে কেউ কেউ যুক্ত ছিলেন। এ-সব রঙ্গালয়ের শিল্পীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজ (অবশ্য বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের মতো দু একজন বাঙালী অভিনেতা হয়ত ছিলেন)। যে-সব নাটক অভিনীত হত সেগুলিও ইংরেজী। কিন্তু তবুও সন্দেহ নেই যে, এই সব বিদেশী রঙ্গালয়ই দেশী রঙ্গালয়গুলির উদ্ভবে প্রেরণা ও প্রভাব জুগিয়েছিল। বিদেশী রঙ্গালয়গুলির দর্শকদের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অনেক বাঙালী দর্শকও ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের রুচি ও রসবোধেরও পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁরা গ্রাম্য ও স্থূল হাবভাবযুক্ত পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাভিনয়ের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের গৃহপ্রাঙ্গণে বিদেশী রঙ্গমঞ্চের অনুরূপ মঞ্চ নির্মাণ করে, দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চআঙ্গিকের দিক দিয়ে বিদেশী নাট্যাভিনয়ের অনুসরণে নাট্যাভিনয় প্রবর্তন করলেন। এমনিভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার থেকে অপেশাদার দেশী থিয়েটারের প্রবর্তন হল। বিদেশী রঙ্গালয়ের দেখাদেখি দেশী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে প্রথম দিকে দেশী রঙ্গালয়েও ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয়েছিল। কিন্তু দেশী রঙ্গালয়ে ইংরেজী নাটকের অভিনয় মুষ্টিমেয় লোকের কাছেই বোধ্য ছিল, সেজন্য ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ হতে শুরু হল। কিন্তু ইংরেজী নাটকের বিদেশী

পরিবেশ ও বিদেশী চরিত্র দেশীয় দর্শকদের কাছে রুচিকর হবে না ভেবেই অনেক ইংরেজী নাটক দেশীয় পরিবেশে রূপান্তরিত হল (হরচন্দ্র ঘোষের কয়েকটি নাটক এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। দেশীয় নাটকের সন্ধান করতে গিয়েই কোনো কোনো মঞ্চমালিক সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু তখন নানা অগ্নিগর্ভ সামাজিক আন্দোলনে উত্তেজিত দর্শকরা অতীত জীবনের রাজরাজড়ার কাহিনীর মধ্যে কোনো আকর্ষণ বোধ করলেন না। তাঁরা সমসাময়িক কালের সমস্যাবিক্ষুব্ধ বাঙালী সমাজের চিত্রই দেখতে চাইলেন। তাঁদের চাহিদা পূর্ণ করবার স্বাভাবিক তাগিদেই মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব হল।

উনিশ শতকের গোড়ায় কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল, যথা, 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২), 'হাস্যার্ণব' নামক প্রহসনের অনুবাদ (১৮২২), 'কৌতুকসর্বস্ব' নামক আর একটি প্রহসনের অনুবাদ (১৮২৮) ইত্যাদি। এইসব অকিঞ্চিৎকর অনুবাদগুলি কোথাও অভিনীত হয়নি। লেবেডেফের বাংলা নাটকের অভিনয়ের পর নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় দ্বিতীয় বাংলা নাটকের অভিনয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কয়েকজন পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তি পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে বাংলা মৌলিক নাটক লেখা শুরু করলেন। অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তাঁরা নাটক লেখেননি, পাঠ্যগ্রন্থ-রূপেই তাঁরা নাটক লিখেছিলেন। তারাচরণ শীকদার তাঁর 'ভদ্রার্জুন' নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' লিখে-ছিলেন, '...এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বরূপ হইতে পারে।' তারাচরণ এখানে পাঠকের কথাই উল্লেখ করেছেন। জি. সি. গুপ্ত তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, '...যাত্রার গীত ও পয়ার রচকেরা অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তি সুতরাং সমস্ত বিরস হইয়া উঠে। যদি সাধারণের উৎসাহে পণ্ডিত লোকেরা সমস্ত রচনা করে তবে যাত্রার উৎকৃষ্টতা জম্মে তাহার কি সন্দেহ।' এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে নাট্যকার যাত্রার রচনার অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উৎকৃষ্ট নাট্যরচনার আদর্শ সম্মুখে রেখেই নাটক লিখেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সেক্সপীয়রের 'মারচেণ্ট অব ভেনিস' নাটকের হরচন্দ্র ঘোষ-কৃত স্বাধীন অনুবাদ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'ও পাঠ্যগ্রন্থরূপেই রচিত হয়েছিল। হরচন্দ্র ঘোষের অন্য নাটকগুলিও অভিনীত হয়নি। এই সব নাটক অভিনীত না হলেও পূর্ণায়তন বাংলা নাটকের প্রাথমিক নিদর্শন-রূপেই বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। দর্শকদের আশু মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিল না বলেই তাঁরা নাটকের কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন প্রাচীন পুরাণ, লৌকিক রূপকথা ও বিদেশী গ্রন্থ থেকে।

তারাচরণ শীকদার সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাটকের রীতি অনুসরণ করেছিলেন, 'অতএব এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।' তাঁর নাটকটি চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ১৭৭৪ শকাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল। নাট্যরীতি ও নাট্যভাষা প্রয়োগে তারাচরণ তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের চেয়ে সংস্কৃত প্রভাব থেকে বেশী মুক্ত হয়েছেন। নাট্যক্রিয়ার সুশৃঙ্খল বিকাশ ও পরিণতিসাধনেও তিনি অন্যান্য নাট্যকারদের চেয়ে অধিকতর সফল। কিন্তু 'কীর্তিবিলাস' নাটকটি সংস্কৃত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। 'কীর্তিবিলাসে'র নাট্যকার পাশ্চাত্য নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতির সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন, যদিও তাঁর নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক হলেও তা ট্র্যাজিক রসাত্মক হয়নি। পাশ্চাত্য নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগ এবং অঙ্কের অন্তর্গত দৃশ্যবিভাগও (দৃশ্যের স্থলে তিনি অভিনয় নামটি ব্যবহার করেছেন) তাঁর নাটকে দেখা যায়। এ পর্যন্ত হল পাশ্চাত্য প্রভাব। কিন্তু প্রস্তাবনা দৃশ্যের অবতারণা এবং সংস্কৃত-শব্দবহুল আড়ষ্ট অলঙ্কৃত সংলাপের ব্যবহারে সংস্কৃত প্রভাব সুস্পষ্ট। হরচন্দ্র ঘোষের নাটক-গুলিতেও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রতি সচেতন আনুগত্য সত্ত্বেও প্রস্তাবনা দৃশ্য ও সংস্কৃত ভারগ্রস্ত সংলাপ সেগুলির মধ্যে লক্ষণীয়। 'কৌরব বিয়োগ' নাটক সম্পর্কে তিনি বলেছেন, '...ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া কৌরব বিয়োগ নাটক এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম।' কিন্তু নাট্যকারের ঘোষণা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা ও আড়ষ্ট আবেগে নাটকটি অত্যন্ত শ্লথ ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়ের পর প্রথম যে বাংলা নাটকটি অভিনীত হয় তা হল নন্দকুমার রায় অনূদিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকটি। নাটকের আখ্যা পত্রে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে নাটকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নিচে মুদ্রিত হয়েছে— কলকাতা/নূতন আর্যযন্ত্রে মুদ্রিত/শকাব্দা ১৭৭৭। দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে নাট্যকার লিখেছেন, '১২৬২ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাষা নাটক রচয়িতা-দের পক্ষেও আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্বপ্রথমে কলিকাতা-নিবাসি 'আশুতোষবাবুর বাটীতে তৎপরে জনাইনিবাসি জমিদার মুখোপাধ্যায়দিগের ভবনে অভিনীত হয়।' নাট্যকারের বক্তব্যে জানা যায়, তিনি পাঠ্য নাটকরূপেই এটি প্রথমে রচনা করে

ছিলেন এবং তারপর এটি আশুতোষ দেবের বাড়ীতে অভিনীত হয়। বলা যায়, এই অভিনয়ের (১৮৫৭) পরেই বাংলা নাটকের অভিনয়ধারা নাট্যশালায় সর্বত্র প্রচলিত হল। নন্দকুমার রায়ের অনুবাদ মূলের প্রতি বিশ্বস্ত, অথচ সংস্কৃত ভাষার আড়ম্বর তাঁর নাটকে নেই। নাট্যকার সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষার স্থলে বাংলা সাধু ভাষা এবং প্রাকৃত ভাষার স্থলে বাংলা চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। চলিত ভাষা এত সরল ও স্বাভাবিক যে একেবারে আধুনিক ভাষা বলে মনে হয়। অবশ্য নাট্যকারের সাধু ভাষাতেও একটা ভাবহীন স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বেশ কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হয়েছিল। অনুবাদকদের মধ্যে রাম-নারায়ণ তর্করত্ন ও কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি অনূদিত নাটক মঞ্চস্থও হয়েছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলনের সংঘাত ও উত্তাপে সমাজচিত্ত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বাংলা নাটক যখন থেকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের চিত্তে পৌঁছতে চেষ্টা করছিল তখন থেকে সমাজের সমসাময়িক বাস্তব সমস্যাই নাটকের মধ্যে স্থান পেল। সেদিক দিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নকেই প্রথম সমাজসমস্যাসচেতন বাস্তবনিষ্ঠ নাট্যকার বলা যেতে পারে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটককে শুধু মাত্র প্রথম সামাজিক নাটক বললে যথেষ্ট বলা হয় না, এই নাটকটির মধ্যে বাংলা নাটকের সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্যাগুলি নিয়ে তখন সমাজচিত্ত উত্তাল হয়ে উঠেছিল, যথা বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদি সেগুলি তখনকার বাংলা নাটকে প্রতিফলিত হয়েছিল। সমস্যাগুলি সমাজের মধ্যে তীব্র বিতর্ক ও পরস্পরবিরোধী দল ও মতাবাদের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তৎকালীন নাটকগুলির মধ্যে প্রগতিমূলক সমাজ-সংস্কারকামী মতবাদ ও আন্দোলনই সমর্থিত হয়েছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

দীনবন্ধু মিত্র

তবে ১৮৫২ থেকে ১৮৬০ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে যে-সব সামাজিক নাটক লেখা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য এত প্রবল ছিল যে সেগুলি প্রচারমূলক নকশা জাতীয় নাটিকাতেই পরিণত হয়েছিল, পূর্ণাঙ্গ শিল্পসার্থক নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। নাটিকাগুলি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যসমষ্টি মাত্র ছিল, বস্তুগঠনের কোন জটিলতা ও চরিত্রচিত্রণের কোনো গভীরতা তাদের মধ্যে ছিল না। রামনারায়ণ তর্করত্নের মত যাঁরা বিশেষ কোনো নাট্যাদর্শ সামনে রেখে নাটক লিখেছিলেন তাঁরা সংস্কৃত নাটকের রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'নবনাটক', 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক ছাড়া অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ের উপযোগী ছিল না। নাট্যকার-গণ করুণ রস উদ্রেক করে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে দর্শকদের উত্তেজিত ও সহানু-ভূতিশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অত্যধিক সংস্কৃত আনুগত্য এবং উচ্ছ্বাসের আতিশয্য

ও রসের অপরিমিতির ফলে তাঁদের করুণরসসৃষ্টির প্রচেষ্টা বহু জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে। অথচ কৌতুকরস সৃষ্টিতে তাঁরা প্রচলিত মৌখিক ভাষা ও বাগ্বিধি প্রয়োগ করেছিলেন বলে তাঁদের কৌতুকরস অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

মাইকেল মধুসূদনের আগে কিছু কিছু ইংরেজী নাটকের অনুবাদ হলেও এবং পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাসে'র ন্যায় দু'একখানি মৌলিক নাটক রচিত হলেও মোটামুটি সংস্কৃত নাটকের প্রভাবেই অধিকাংশ নাটক লেখা হয়েছিল। মধুসূদনই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ সম্মুখে রেখে সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাট্যরীতিসম্মত পূর্ণাঙ্গ ও অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করেন। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটককে পরবর্তী বাংলা নাট্যধারার প্রথম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। অবশ্য মধুসূদন যে সংস্কৃত প্রভাব একেবারে বর্জন করতে পেরেছেন তা নয়, এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সংস্কৃত নাটকের কাহিনী ও চরিত্রগ্রহণে এবং সংলাপে অলংকৃত, উচ্ছ্বাসময় ও সংস্কৃতশব্দবহুল বাক্য প্রয়োগে। কিন্তু জটিল অথচ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত বৃত্তগঠন, সুশৃংখলিত অংক ও দৃশ্যপ্রয়োগে, অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রচিত্রণে এবং ট্র্যাজিক রসসৃষ্টিতে তিনি পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শকে বাংলা নাটকের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। অবশ্য পাশ্চাত্য নাটক অর্থে সেক্সপীরীয় নাটকের কথাই বুঝতে হবে। সেক্সপীরীয় নাটকের পঠন-পাঠন ও অভিনয়-দর্শনের মধ্য দিয়ে ওই নাটকের আদর্শই নাট্যকার ও দর্শকদের চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। শুধু কেবল নাটক নয়, প্রহসনের ক্ষেত্রেও মধুসূদনকে আদি প্রবর্তক বলা যেতে পারে। মধু-সূদনের আগে সংস্কৃত প্রহসনের কয়েকটি অনুবাদ হয়েছিল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য প্রহসনের অনুরূপ সুসংবদ্ধ শিল্পসার্থক প্রহসন তিনিই প্রথম রচনা করেন। দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদনের সমসাময়িক নাট্যকার ছিলেন। মধুসূদনের প্রতিভা পুরাণ ও ইতিহাসের বিস্তৃত ও গম্ভীর জগতে বিচরণ করতে চাইত আর দীনবন্ধুর প্রতিভা বাস্তব সমাজের রঙ্গপরিহাসের আঙিনায় মেতে থাকতে ভাল-বাসত। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে আলোড়ন-সৃষ্টি-করা নাটক। কিন্তু করুণ রসের অশ্রুসিক্ত পথে প্রথম চলা শুরু করলেও তিনি অচিরেই হাস্যের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাঁর ভবিষ্যৎ পথ আলোকিত করে তুললেন। হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁর প্রতিভা অসামান্য, পরিস্থিতি রচনায় তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি বিস্ময়কর, বাস্তব সংলাপ প্রয়োগে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং দেখা চরিত্রকে চিরন্তন রূপরেখায় অমর করে তুলতে তিনি অসাধারণভাবে সফল। দীনবন্ধুর নাটক নিয়ে সাধারণ নাট্যশালার শুভ সূচনা হল, তাঁর নাটকগুলিই প্রাথমিক স্তরে নাট্যশালাগুলিকে পরিস্ফুট রেখেছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা নাটক শুধু কেবল অভিনয়ের স্তর থেকে পাঠ্য সাহিত্য-রূপে পরিগণিত হল, তার কারণ মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে এক এক নাটকের বহু কপি মুদ্রিত হয়ে দূর দূরান্তরে পাঠকদের মধ্যে প্রচারিত হল। যারা অভিনয় দেখবার সুযোগ পেল না, তারাও নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে নাটকের রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হল না। অবশ্য তখনও মুদ্রণ পারিপাট্য আসেনি, ছোট আকারের গ্রন্থ বড় বড় টাইপে মুদ্রিত হত। প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় প্রায়ই কোনো সংস্কৃত অথবা ইংরেজী উদ্ধৃতি থাকত। শকাব্দ কিংবা সম্বৎ-এর ব্যবহারই বেশী দেখা যেত। প্রধানতঃ কলকাতায় স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রেই নাটকগুলি মুদ্রিত হত। কিন্তু কলকাতার বাইরেও যে অনেক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং সে-সব জায়গায় নাটকাদি মুদ্রিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'নীলদর্পণ' নাটকটি শকাব্দা ১৭৮২-তে (১৮৬০) শ্রীরাম-চন্দ্র ভৌমিক কর্তৃক ঢাকার বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল। প্রথম দিককার অনেকগুলি নাটক মুদ্রিত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বসুর বহুবাজারস্থ স্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে।[১০] নাটক ও নাট্যাভিনয়ের প্রচারে ও যথার্থ মূল্যনিরূপণে মুদ্রিত সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দান অপরিসীম। সমাচারদর্পণ, সংবাদ-প্রভাকর, সমাচারচন্দ্রিকা, সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রে নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হত। অনেক দর্শক অভিনয় দেখে সমালোচনা করে পত্র লিখতেন, সম্পাদকীয়তেও অনেক মতামত প্রকাশ করা হত। এই সব সংবাদ ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে একটি জনআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নাট্যকার ও পরিচালকরা এই জনসচেতনতার দিকে লক্ষ্য রেখেই নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করে নাটকরচনা ও মঞ্চে উপস্থাপনায় সতর্ক ও যত্নবান হতেন।

ঐতিহাসিক নাটক ও ট্র্যাজেডির ধারা প্রবর্তন করলেন মধুসূদন, সামাজিক ও পরিবারকেন্দ্রিক নাটক ও হাস্যরসাত্মক নাটকের ধারা সূচিত হল দীনবন্ধু থেকে। আবার ভক্তিরসাত্মক গীতাভি-নয়ের সত্রপাত করলেন মনোমোহন বসু। গীতাভিনয় যাত্রার আসরে অভিনীত হত, আবার থিয়েটারী মঞ্চেও উপস্থাপিত হত। গীতাভিনয়ে যাত্রার ভক্তিরস ও গানের প্রাধান্য এবং নাটকের সংগঠিত বৃত্ত ও সংলাপের গুরুত্ব—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাই পরিলক্ষিত হত। মঞ্চে অভিনয় অনেক নাটকও বহু সঙ্গীতসম্বলিত হয়ে গীতাভিনয়রূপে অভিনীত হত। মনোমোহনের পরে রাজকৃষ্ণ রায়, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতি গীতাভিনয় রচয়িতারূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে কয়েক বছর ধরে রোমান্টিক দেশাত্মবোধক নাটকের প্রভূত জনপ্রিয়তা দেখা গিয়েছিল। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিস্তার এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের ফলে যে সর্বাত্মক জাতীয় ভাবোদ্দীপনা জনসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তারই রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল তখনকার নাটক ও নাট্যশালায়। প্রধানতঃ রাজপুতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং বাঙালীর প্রাচীন গৌরবজনক ইতিহাস থেকে নাট্যকারগণ উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। একমাত্র উপেন্দ্রনাথ দাস সমসাময়িক সামাজিক পটভূমি অবলম্বনে প্রবল ইংরেজবিদ্বেষের নাটক লিখেছিলেন। নাটকগুলিতে জাতীয় ভাবোদ্দীপনার সঙ্গে মিশেছিল অশিক্ষিত প্রণয়ের রোমান্টিক ভাবাবেগ। এই যুগের সেরা নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল আরো দুই ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রহসন ও অনুবাদ নাটকে। তাঁর প্রহসনে কৌতুকরসের উদ্দাম প্রাবল্যের জায়গায় নিয়ে এল সংযত হাস্যরসের সর্বত্রসঞ্চারী দীপ্তি, গ্রাম্য বাস্তবতার স্থলে রুচিশীলিত নাগরিকতা।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ফলে রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় শুধুমাত্র আর শখ ও খেয়ালের বস্তু হয়ে রইল না, তা হয়ে উঠল ব্যবসার ক্ষেত্র আর জীবিকার উপায়। সেজন্য দর্শকসমাজের রুচি ও চাহিদার উপরে তাকে বেশী নির্ভর করতে হল। দর্শকরা দর্শনী দিয়ে নাটক দেখবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করতেন, সেজন্য তাঁদের সোচ্চার মতামত প্রকাশ করবার দাবী তাঁরা ছাড়তেন না। কখনো করতালি কিংবা প্রশংসাসূচক ভাব ব্যক্ত করে যেমন তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করতেন, তেমনি আবার ধিক্কারবাক্য ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য দ্বারা তাঁরা তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। এই দর্শনীদাতা দর্শকদের পুরস্কার ও তিরস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখেই অভিনেতারা অভিনয় করতেন এবং নাট্যকাররা নাটক রচনা করতেন। স্বভাবতঃই তখনকার নাটক যেমন একদিকে সমসাময়িক সমাজসচেতন হয়ে উঠেছিল, তেমনি আবার অন্যদিকে দর্শকদের মনোরঞ্জনের তাগিদে শিল্পের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় অনেক অকারণ ঘটনা ও চরিত্রের আমদানী করতেন, অনেক অবান্তর গান ও নাচ ঢুকিয়ে দিতেন, অতিনাটকীয় ও চমকপ্রদ অনেক দৃশ্যের অবতারণা করতেন। অনেক সময় বড় বড় অভিনেতাদের চেহারা ও রুচি অনুযায়ী নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করা হত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গিরিশচন্দ্র অভিনেতা ও মঞ্চাধ্যক্ষরূপে নাট্যজগতে প্রবেশ করেন এবং তারপর অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটক রচনা শুরু করেন। তখন ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের যুগ, সেজন্য তিনি পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে সকলের চিত্তজয় করেছিলেন। তিনি পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে পৌরাণিক নাটক রচনা করেছিলেন এবং ধর্মজগতের প্রচারক ও মহাপুরুষদের জীবনী

অবলম্বনে ভক্তিরসাত্মক নাটক রচনা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র উনিশ শতকের শেষ দশকে সামাজিক নাটক এবং বর্তমান শতকের প্রথম দশকে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভক্তিমূলক নাটকে, যেখানে গৈরিশী ছন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব ভক্তিচেতনা নাটকের ভক্তিরসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে এবং যেখানে তিনি ধর্মীয় চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্মুখীন দ্বন্দ্বে পৌঁছতে পেরেছেন। গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক নাট্যকারবৃন্দ তাঁরই মত সনাতন আদর্শনিষ্ঠ দৃষ্টি ও ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে নাট্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অমৃতলালের দৃষ্টি বিচরণ করেছিল রঙ্গব্যঙ্গমিশ্রিত লঘু জীবন আবর্তে। রাজকৃষ্ণ রায়, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায়—এঁরা সকলেই ছিলেন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত, দর্শকদের ধর্মীয় আবেগ চরিতার্থ করবার জন্য এঁরা নাটক লিখেছিলেন। যে-নাটকগুলির কিছু কিছু অভিনয় সফল হলেও স্থায়ী নাট্যগুণের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নয়।

গিরিশযুগের পরে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণময় যুগের সূচনা হল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রবল স্বদেশী আন্দোলন দেশের মধ্যে শুরু হল তার তরঙ্গাঘাত এসে পড়ল নাট্যশালায়। সর্বব্যাপী জাতীয় আবেগ প্রতিফলিত হল জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকে। এই ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবল জাতীয় ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ আদর্শ তাঁর নাটকে তুলে ধরলেন। গিরিশযুগের দৈবনির্ভরশীল অধ্যাত্মমুখীনতা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মানবিকতার সর্বজয়ী গৌরব প্রতিষ্ঠিত করলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেক্সপীরীয় নাট্যরীতি অনুসরণ করলেন, ইবসেনীয় নাট্যআঙ্গিকের কিছু কিছু প্রভাবও তাঁর নাটকে লক্ষিত হয়। তাঁর নাটকে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ লক্ষ্য করা যায়, দৃশ্য পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, কম্পোজিশন, অভিনয়নির্দেশ প্রভৃতিও তাঁর নাটকে লক্ষণীয়। সুসংহত বৃত্তগঠন, নাটকীয় পরিস্থিতিরচনা কৌশল, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রচিত্রণ এবং অপূর্ব কবিত্বসমৃদ্ধ ও নাট্যগুণসম্পন্ন সংলাপরচনানৈপুণ্যে তাঁর নাটক যেমন মঞ্চসফল তেমনি পাঠরচনা হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার এবং তিনিও গীতিনাট্য, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের নাটক লিখেছিলেন। তাঁর নাটকে দ্বিজেন্দ্রনাটকের সুসংহতি ও প্রচণ্ড নাট্যবেগ নেই, কিন্তু নৃত্যগীতসম্বলিত কৌতুকরসাত্মক নাট্যরচনায় তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের জনপ্রিয়তা শুধু মাত্র রঙ্গমঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, পাঠ্যসাহিত্য হিসাবে মুদ্রিত হওয়ার ফলে তাঁদের নাটকগুলি কালজয়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁদের নাটকগুলি সাহিত্যগুণে ক্লাসিক মর্যাদালাভ করেছে এবং আগ্রহী পাঠক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেক প্রকাশক নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনায় এককালে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। বড়তলার বহু প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সনস, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রভৃতি নাট্যসাহিত্যের প্রচারে অশেষ কাজ করেছেন। বসুমতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলী কাগজ ও মুদ্রণপারিপাট্যের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু অকল্পনীয় সুলভ মূল্যে তাঁরা গ্রন্থাবলী বিক্রি করেছেন বলে সেই গ্রন্থাবলীর মারফত নাটকের এত ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর নাট্যরচনা করে গেছেন। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, হাস্যরসাত্মক কমেডি। সাঙ্কেতিক নাটক, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি নানা রূপ ও রীতির নাটক নিয়ে তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। জোড়াসাঁকোতে থাকবার সময় রচিত তাঁর প্রথম দিককার নাটকগুলিতে প্রচলিত নাট্যরীতি তিনি মোটামুটি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি নাটকের রীতি ও আঙ্গিকে অনেক নূতনত্ব আনলেন। মঞ্চের বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে, নাটককে নিয়ে এলেন স্বভাবের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে। মঞ্চমায়ার আকর্ষণ বর্জন করে দর্শকদের নিজস্ব ভাবনা ও রসবোধেরও উপরেই নির্ভর করলেন। স্থূল ভাবাবেগের স্থলে মননশীল তাত্ত্বিকতাই তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেল। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে তাঁর নাট্যচিন্তা ও নাট্যকর্ম লোকের কাছে তেমন মূল্য পায়নি, কিন্তু আধুনিক নাট্যভাবনা ও নাট্যপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমবর্ধমানরূপে পরিস্ফুট হচ্ছে।

রবীন্দ্রপরবর্তী নাটক কিছুকাল ধরে পুরানো নাট্যধারা অনুসরণ করে চলেছিল। অর্থাৎ, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক মোটামুটি এই তিনধারারই অনুবর্তন চলছিল। পৌরাণিক নাটকে পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে যুগোপযোগী চিন্তা ও আন্দোলন অনেক নাটকেই আভাসিত হয়েছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্বে পর্যন্ত ঐতিহাসিক নাটক জাতীয় ভাবাবেগ অবলম্বন করেছিল। সামাজিক নাটকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় ও প্রতিবাদ, শ্রেণীসচেতনতা ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল। তখনো সেক্সপীরীয় পঞ্চাঙ্করীতি বিলুপ্ত হয়নি, তবে দৃশ্যরহিত অঙ্কসর্বস্ব ইবসেনীয় রীতিও তখন কিছু কিছু নাটকে অনুসৃত হয়েছিল। ঘূর্ণায়মান

মঞ্চরীতির দিকে লক্ষ্য রেখেও কিছু কিছু নাট্যরীতির প্রয়োগ হয়েছিল। তখনও বিশেষ বিশেষ অভিনেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী কোনো কোনো নাটকে ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করা হত। প্রয়োগকর্তার ভূমিকা ধীরে ধীরে প্রধান হয়ে উঠেছিল নাট্যকারকে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগকর্তার প্রয়োজন ও নির্দেশ অনুযায়ী নাটক লিখতে হত। নাট্যকার মন্মথ রায় একাঙ্ক নাট্যধারা প্রবর্তন করে ভবিষ্যৎ নাটকের পথ দেখিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হল। মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, উদ্বাস্তু সমস্যা—একটির পর একটি আঘাতে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত। সেই দুর্যোগের অন্ধকার থেকে জন্ম নিল নবনাট্য-আন্দোলন। পেশাদারী থিয়েটারের সকল চোখ-ধাঁধানো ও মনভোলানো সাজসজ্জা, উপকরণ ও আঙ্গিকবিলাস বর্জন করে নাটকের অভিনয় নিয়ে আসা হল উন্মুক্ত পথে ও প্রান্তরে—বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে। ব্যক্তি অভিনয়ের জায়গায় প্রাধান্য পেল সমষ্টিগত অভিনয়, কম্পোজিশনে ছোটখাট উপকরণ এবং জ্যামিতিক নিয়মে চলাফেরার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হল। স্মারকের উপর নির্ভরশীলতা চলে গেল, অভিনয়ে এল অত্যধিক গতিবেগ। বক্তব্য জোরালো ভাবে বলবার প্রবণতা এল বলে অভিনয় হয়ে উঠল সোচ্চার। ইঙ্গিতধর্মী দৃশ্যের অবতারণা হল, আলো ও শব্দকে ব্যবহার করা হল চরিত্রের মেজাজ, গূঢ় ভাবনা ও পরিবেশের বর্ণ সুর প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলার জন্য। নাটকের কাহিনী ক্রমে ক্রমে পারিবারিক জগৎ থেকে সম্প্রসারিত হল কলকারখানায় হাটেবাজারে ও মাঠে ময়দানে। শ্রেণীসংঘাত ও সমাজতন্ত্রবাদী ভাবনাই নাটকের কাহিনীতে মুখ্য হয়ে উঠল। প্রথম দিককার নাটকগুলিতে বাস্তবধর্মী নাট্য-রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নাটকের রীতি ও আঙ্গিক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। বক্তব্য একই, কিন্তু সোজাভাবে না বলে নানা মিশ্র আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে সেই বক্তব্য তুলে ধরা। বিশ্বব্যাপী অ্যাবসার্ড নাট্যআন্দোলনও আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছে। তাই আজকের নাটকে সুগঠিত নাটকের বিধি ও বাঁধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে।

নবনাট্য আন্দালনের সূচনা থেকে অভিনয় ও প্রয়োগকর্মের যতখানি অগ্রগতি দেখেছি নাটকের ততখানি অগ্রগতি দেখিনি। নাট্যকার এখন প্রয়োগকর্তার অধীন, তাই নাট্যকার এখন আর সাহিত্যিক আবেগে ততখানি উদ্বুদ্ধ হন না, যতখানি নিয়ন্ত্রিত হন অভিনয়ের প্রয়োজনে। বর্তমানে নাটক হয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত, নাটকের সংলাপ আকারে ছোট, সেজন্য নাটকে সাহিত্যগুণ ফুটে উঠতে পারে না। আগে যাঁরা জাতসাহিত্যিক ছিলেন তাঁরাই নাটক রচনা করতেন, এখন নাটক লেখেন মঞ্চমালিক, পরিচালক কিংবা কোনো রাজনৈতিক প্রবক্তা। সেজন্য নাটক এখন শুধু অভিনেয়, পাঠ্য নয়। এ-কারণে নাটক যত অভিনীত হয় তার সামান্য অংশই মুদ্রিত হয়। যদিও বা কিছু কিছু মুদ্রিত হয়, কিন্তু সে-মুদ্রণে না আছে কোনো শোভনতা, না আছে কোনো পারিপাট্য। কাগজ, বাঁধাই, ছাপা সব কিছুই নিম্নস্তরের। গল্প-উপন্যাস মুদ্রণে যে সুরুচি ও সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, নাটকে তা পাওয়া যায় না কেন? প্রকাশক বলবেন, নাটক বিক্রি হয় না, কেনেন শুধু অভিনেতারা ও পরিচালকরা। বই সাজিয়ে রাখা যাঁদের অভ্যাস তাঁরা নাটক কেনেন না, কারণ এখনকার মুদ্রিত নাটকগুলি সাজিয়ে রাখবার মত নয়। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বুদ্ধদেব বসুর কয়েকখানি কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল, সুন্দর কাগজে সুমুদ্রিত নাটকগুলি মন প্রসন্ন করে তোলে। প্রতিষ্ঠাবান প্রকাশকরা এভাবে নাটক প্রকাশ করেন না কেন? প্রকাশকরা বলবেন, ক্রেতার অভাব। ক্রেতা চাই। কিন্তু ক্রেতা আকর্ষণ করতে হলে নাটককে সুপাঠ্য হতে হবে। সেজন্য আসল প্রয়োজন নাট্যকারের, ভালো নাট্যকারের, যিনি মঞ্চসচেতন, কিন্তু যিনি খাঁটি সাহিত্যিক।

নির্দেশিকা

১ 'বাঙ্গালা দেশান্তর্গত নবদ্বীপাবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বা তাঁর তিরোভাবের পরে যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। কারণ ঐ যাত্রার আরম্ভকালে প্রথমে বন্দনাস্বরূপ শ্রীচৈতন্য গৌরচন্দ্রের স্তুতিবাদ ও লীলা বর্ণনা হইয়া থাকে, উহাকে গৌরচন্দ্রী কহে। গৌরচন্দ্রী কালিয়দমন যাত্রার নমস্কার সূত্রস্বরূপ।' বান্ধব-ভারতী, মাঘ, ১২৮৮

কালীয়দমন যাত্রার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল, সে-সম্পর্কে ১২৮৯ সনের ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনে একজন লেখক আলোচনা করেছিলেন, 'চৈতন্যদেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জাঁকিয়া উঠিল তখন কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা অনেকের হয়। এই সময় একজন বৈষ্ণব এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক এক পুষ্করিণীর উপর কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করে। পুষ্করিণী বড় সুন্দর সাজান হইয়াছিল। তাহার নাম কালীয় হ্রদ দেওয়া হইয়াছিল।'

২ 'সাজের মধ্যে কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া এবং যশোমতী, বৃন্দাদিসখী ও গোপবালকগণের পরিধেয় একটি রঙ্গিন কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকটা চোগার মত) তাহার সম্মুখের দুই পার্শ্বে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসান থাকিত,'—বিশ্বকোষ

৩ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

৪ 'পরমানন্দ দূতী সাজিত, প্রায় একাই যাত্রা করিত, কৃষ্ণ, রাধা এবং আর সকলে উপলক্ষ মাত্র থাকিত। কিন্তু যে নিজে কবি, সে একা হইলেও সহস্র। যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮৯

৫ যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৯

৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও যাত্রার ইতিবৃত্তের লেখক (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৯) শ্রীদাম-সুবলকে পরমানন্দের পূর্ববর্তী বলেছিলেন, কিন্তু ১২৮৮ সালের মাঘ সংখ্যার ভারতী পত্রিকায় 'যাত্রা' প্রবন্ধের লেখক, দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীদাম-সুবলকে পরমানন্দের পরবর্তী বলেছেন।

৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৪০

৮ মদনমোহন গোস্বামী। কাল্পনিক সংবদল
সংবদল অর্থ পরিচ্ছদ বদল। শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ সমাঙ্গ থেকে (সমাঙ্গ > সবঙ্গ > সঙ বা সং)। ছদ্মবেশ অর্থে সঙ বা সং শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ-প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত উল্লেখযোগ্য, 'একখানির ইংরেজী নাম The Disguise, বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদ করা হয় সঙ-বদল, অর্থাৎ পরিচ্ছদের পরিবর্তন—যাত্রা নাটকে যে বিভিন্ন পরিচ্ছদ অভিনেতৃবর্গ পরিয়া থাকেন তাহারই পরিবর্তন—অর্থাৎ, Disguise, এখনকার বাঙ্গালায় আমরা বলিব ছদ্মবেশ।' বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৯ পাঁচকড়ি দে ১৩৩৭-৩৯ বঙ্গাব্দে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাপালাগুলি সম্পাদনা করে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেন

১০ ডঃ গোপেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থে বলেছেন, "নীলকণ্ঠের পালায় গান এবং গদ্যসংলাপ প্রায় আধাআধি। কোনো কোনো স্থলে সঙ্গীতের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং তাঁর গানগুলিকে এক কথায় বলা চলে গীতিনাট্য।"

১১ 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা—ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যা-সুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণে ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।' ১৬ জুন ১৮২১; সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড

১২ নলদময়ন্তী যাত্রার অভিনয়রীতি সম্বন্ধে তখনকার সাময়িক পত্রে জানা যায়, "......ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানা প্রকার রাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্যনৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন ও অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন...।" ১৩ জুলাই, ১৮২২; সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড

১৩ স্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ের নাম কোথাও ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয় (কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের ক্ষেত্রে)। বহুবাজারস্থ ভবনের নম্বর কোথাও ১৮২, কোথাও ১৮৫, কোথাও বা ১৭২

বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে

অমলেন্দু বসু

১

পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই অন্যতম তরুণ সাহিত্যশাখা উপন্যাস।[1] কাব্য তো প্রত্যেক ভাষারই শুরু থেকে চলে আসছে। নাটক (বিশেষতঃ কাব্যনাট্য এবং নৃত্যগীতি-সম্বলিত নাটক) কাব্যেরই প্রায় সমকালীন। কিন্তু যে উপন্যাস আজ পৃথিবীর জনপ্রিয়তম পাঠবস্তু সেই উপন্যাসের ইউরোপে আবির্ভাব হয়েছে মাত্র সেদিন। ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের চর্চা শুরু হয়েছিল আঠারো শতকের মাঝামাঝি, বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব আরও একশ বছর পরে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি। ঠিক কবে কোন সালে কোন তারিখে (যতটা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব) উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছিল, প্রথম উপন্যাস কাকে বলব, কেন বলব,—'নববাবুবিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' না, 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'? এই বিসংবাদে আমাদের সাহিত্য-সম্বোধির তেমন কোনো প্রকাশ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে উপন্যাস বাংলা ভাষার নিঃসংশয় সাহিত্য শাখা হিসাবে পরিগণিত হল, যেমন কি না ইংরেজী ভাষায়ও রিচার্ডসন ও ফীল্ডিংয়ের হাতে উপন্যাস স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হল। কি বাংলায়, কি ইংরেজীতে অথবা যে কোনো ভাষাতেই উপন্যাসের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা নিঃসংশয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার পূর্বে একটা সময় গেছে যখন উপন্যাস উঁকি মারছে মাত্র এ কোণ ও কোণ থেকে কিন্তু স্বতন্ত্র সাহিত্যশাখা হিসাবে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। যখন লেখকের সৃজনীশক্তির সঙ্গে সমানুভূতি জমল পাঠকরুচির, তখনই এই নূতন সাহিত্যশাখাটি প্রতিষ্ঠিত হল।

হিন্দীতে যাকে বলে 'কহানি', গ্রাম্য বাংলা ভাষায় (বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে) যাকে বলা হত 'পরস্তাব'—'প্রস্তাবের' অপভ্রংশ—সেই কাহিনী কথন মানব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন প্রথা। কখনো বা কাহিনী বিবৃত হত পদ্যে (পাঁচালী, সাগা, টেল্, কিস্‌সা ইত্যাদি নামে), কখনো গদ্যে। ল্যাটিন লেখক অ্যাপিউলেইয়ুস তাঁর 'দি গোল্‌ডেন অ্যাস্' নামক প্রসিদ্ধ গদ্যকাহিনী রচনা করেছিলেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে; বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলি খ্রীষ্টীয় শতকের পূর্বে রচিত এবং কথিত হয়েছিল; আইস্‌ল্যান্ডের Vinland Saga রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দশ বা এগারো শতকে; স্পেইনের পিকারেস্‌ক কাহিনী (ঠগ জোচ্চোরদের কাহিনী) খ্রীষ্টীয় ষোল ও সতেরো শতকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, ইংরেজী উপন্যাসের প্রথম যুগে তার উপরে এই ঠগী কাহিনীর প্রভাব পড়েছিল। আঠারো শতকে ও উনিশ শতকের শুরুতেও বাংলাদেশে দোভাষী পুঁথিপাঠ হত—লায়লি-মজনু, গোলে বকাওলি, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যের মতোই

এসব কাহিনী ছিল পদ্যে রচিত। হিন্দুদের মঙ্গলকাব্যই হোক, মুসলমানদের দোভাষী পুঁথিই হোক, এসব কাব্যে জনজীবনের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী রুচির সন্তোষ হত,—কাহিনী শ্রবণের রুচি।

এই রুচি ও এই কাহিনী-কথন-শ্রবণের প্রথাই হচ্ছে উপন্যাস-সাহিত্যের মূল। যদিচ মূল এবং মহীরুহ এ-দুইয়ে ব্যবধান দুস্তর, তবুও মূল মূলই। ইংরেজী উপন্যাসের মূলে যা ছিল তার অনুরূপ মূল বাংলা ভাষায় ও বাংলা সাংস্কৃতিক ধারাতেও ছিল। যদি ইংরেজী ভাষা বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত থাকত, তাহলেও বাংলার দীর্ঘকাল প্রচলিত আত্মজ মূল (অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য এবং পুঁথি কাব্য) থেকে উপন্যাসের উদ্ভব হতই এ-বিষয়ে বর্তমান লেখকের কোনই সংশয় নেই। হয়ত কিছু দেরিতে উদ্ভব হত, যেমন হয়েছে অন্যান্য কোনো কোনো ভারতীয় ভাষায়, কিছু পূর্ব এসীয় বা কিছু আফ্রিকা মহাদেশীয় ভাষায়। উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র যে উপন্যাস-শিল্পের চর্চা করেছেন, সে-শিল্প অবশ্যই তৎকালীন ইউরোপীয় উপন্যাস-শিল্প দ্বারা প্রচণ্ড রকমে প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু যদি ইউরোপীয় প্রভাব বাংলা দেশে না আসত তাহলে বাংলা উপন্যাস কোনো কালেই জন্মাতো না এমন ধারণা নিতান্ত অস্বচ্ছ চিন্তার ফল। একথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে উনিশ শতকী উপন্যাসে (পরবর্তী কালের উপন্যাসে তো বটেই) বহু বিষয়ের, বহু প্রথার, বহু চিন্তার, বহু আবেগের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলির বাঙালিয়ানা সংশয়াতীত। 'আনন্দমঠ' কিংবা 'কপালকুণ্ডলা' পুরোপুরি বাঙালী ভাবধারার নিদর্শন। 'পল্লী-সমাজ' বা 'পদ্মানদীর মাঝি', 'কালিন্দী' অথবা 'সেইসব গ্রাম, সেইসব স্মৃতি', 'ইচ্ছামতী' অথবা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'নীল ভূঁইয়া' বা 'বারো ঘর এক উঠোন', 'কিনু গোয়ালার গলি' অথবা 'শব্দের খাঁচায়' অথবা 'ঈশ্বর পাটনী' যে মনোভাব থেকে উদ্ভূত, তারা পাঠকচিত্তে যে ধরনের সংবেদনা উদ্দীপ্ত করে, সে-গুলির অবয়বী এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশ বাঙালীত্বে প্রোজ্জ্বল। যে-অর্থে ইংরেজী সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে জেন অস্টিনের উপন্যাস, ডিকেন্স্ ও জর্জ এলিয়টের উপন্যাস, টমাস্ হার্ডির উপন্যাস সম্পূর্ণতঃ "ইংরেজী" উপন্যাস, সিন্‌ক্লেয়ার লুইস, জন ডোস্ প্যাসস্, স্কট ফিটজেরাল্ডের উপন্যাস সম্পূর্ণতঃ ইয়াঙ্কি উপন্যাস, টলস্টয়, ডস্টইয়েভ্স্কি, গোর্কি, শলোখভের উপন্যাসে আদ্যোপান্ত রুশ উপন্যাস, সে-অর্থে জাতীয় সংস্কৃতির যে অনিবার্য উদ্দীপনা অসংখ্য বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায় তাতে (আমার ধারণায়) নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, কোনো বহিরাগত প্রভাব (ইংরেজী অথবা অন্য কিছু) বাংলা উপন্যাসের প্রাণশক্তি নয়, সে-প্রাণ-শক্তি স্বকীয় অন্তরাবেগে এই উপন্যাসের প্রতি অঙ্গে কার্যকর। যেটুকু বহিরাগত প্রভাব বাংলা উপন্যাসের আদিকালে অথবা বর্তমান কালে লক্ষ্য করা যায়, সেটুকু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দে বাঙালী মূল সুরের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল-অনুসৃত বঙ্গীয় কথকতা ছিল বঙ্গীয় সমাজ-জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কিন্তু এই কথকতার বিষয়বস্তু কালক্রমে বিচিত্রতর হল, জটিলতর এবং সমৃদ্ধতর হল, তার মধ্যে নানা সুর প্রবেশ করল—উত্তেজনা, হর্ষ, বেদনা, সহানুভূতি ইত্যাদি—তার মধ্যে আদর্শবাদ প্রবেশ করল, প্রবেশ করল সমালোচনার সুর, ব্যঙ্গের সুর ও চিন্তাময়তা। কথকতার সেই বিচিত্র ব্যঞ্জনা-ময় সুর,—কখনো উচ্চভাষ, কখনো মৃদু স্বগতোক্তি—নানাভাবে লুকিয়ে আছে বাংলা উপন্যাস শিল্পে, সব সময় তাকে নিরীক্ষণ করা যায় না বটে, তবুও কথনশিল্পের archetypal অর্থাৎ আদিরূপাবৃত লক্ষণগুলি ছাড়াও যে সব লক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অনেকগুলি লক্ষণই প্রভাবিত হয়েছে বিদেশীয় কথনশিল্পের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য দ্বারা। যদি ইউরোপীয় সাহিত্যে মধ্যযুগীয় শৌর্যের, প্রেমের, অভিজাত আচরণের কাহিনী শুনতে চাই তাহলে কল্পনায় চলে যাব কোনো রাজসভায়, সেখানে শুনব ধ্রুপদীরীতিতে আবৃত্তি-করা প্যালামন ও আর্কিটের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমের কাহিনী। অন্যপক্ষে জনগণের কোনো মামুলি সমাবেশ, শ্রোতার রুচির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এমন গদ্য কাহিনীর কথন হতে পারে যে-কাহিনীতে শৌর্যের, প্রেমের, আভিজাত্যের প্রকাশে কোনো উত্তুঙ্গতা নেই, বরং আছে হালকা তুচ্ছতার কৌতুক রস। এহেন অবমূল্যায়নের প্রবৃত্তি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল বিখ্যাত স্প্যানিশ লেখক সারভেন্টিসের ডন্ কীয়োটির কাহিনী (প্রচলিত বাংলা উচ্চারণে যাকে বলা হয় ডন্ কুইক্‌সোট্)। এহেন অবমূল্যায়নের চমৎকার বাংলা প্রতিরূপ মেলে অবনীন্দ্রনাথের চাঁদ দাদার গল্পে অথবা পরশু-রামের কয়েকটি কাহিনীতে।

২

যেহেতু সাহিত্যজগতে উপন্যাসের প্রবেশ হয়েছিল সভ্যতার ইতিহাসের পরিণত অবস্থায়, সে কারণে এই নবাগত শিল্পটির নামকরণে কিছু দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা প্রকাশিত হয়েছিল। ফরাসী ভাষায় এই শিল্পকে বলা হল 'রোমান', অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হত 'রোমান্স', যাকে বাংলায় একদা রমন্যাস বলার শিথিল চেষ্টা হয়েছিল। এই ক্রম-অভিব্যক্তিশীল সাহিত্য প্রকারটিকে বলা

হল Novella, Nouvelle, যে-সব শব্দের ল্যাটিন তাৎপর্য হচ্ছে, সংবাদ, তথ্য, একটা নতুন কিছু ঘটনার পরিচয়। রোমান্স নামক শৌর্যের ও প্রেমের কাহিনী কথনে পরিক্রম ধারাবাহিকতা আছে, পৌর্বাপর্য আছে। বস্তুতঃ যাবতীয় কাহিনী কথনেরই (বিশেষতঃ গদ্য কথনের) একটা স্বাভাবিক উন্মোচন-প্রণালী আছে, যেন পাঠকের কাছে পেশ করা হচ্ছে একটির পরে একটি সংবাদ। এই পৌর্বাপর্যের ফলে কাহিনীর কথনে ও শ্রবণে প্রচুর উত্তেজনার সম্ভাবনা জন্মাল।—তারপর কী হল?—তারপরে?—তারপরে?—এই প্রশ্ন জাগল পাঠকের চিত্তে। বস্তুতঃ কিছু পাঠক আছেন যাঁরা উত্তেজনাপূর্ণ উপন্যাস পড়ার সময়, বিশেষতঃ গোয়েন্দা-কাহিনী পড়ার সময়, চট করে শেষ পাতা কয়টি দেখে নেন, তারপরে শান্ত হৃদয়ে ফিরে যান বইয়ের পাতার ক্রমশৃঙ্খলায়। প্রত্যাশা, সম্ভাবনা, সম্ভোগ; নিজে যে উদ্বেগ ও ক্লেশ সইতে পারি না সেটা অপরের হলে—অর্থাৎ যখন পাঠক হিসাবে সচেতন থাকছি যে পাঠক সত্তায় ও কুশীলব সত্তায় প্রচুর ব্যবধান—তখন উপন্যাস উপভোগ করতে পারি।

সংবাদ, সমাচার (হিন্দীতে, বেশী প্রযুক্ত), News, Novel, Novella, Roman—এই সমস্ত শব্দে বর্ণিত বিষয়ের নবত্ব বোঝায়। নভেল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান উক্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকার 'বেতালের বৈঠক' বিভাগে, ১৩২৭ আশ্বিন সংখ্যায়:

> "নভেলে নানা বর্ণনা, চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বাহুল্য ঘটনাবলীর সমাবেশ চলে—যাহা চোখে দেখা যায় না, তাহার আলোচনা থাকে, অর্থাৎ গ্রন্থকার গাইডের মত সঙ্গে থাকিয়া যাহা অগোচর, যাহা অতীত, যাহা অনুমান মাত্র, সমস্তই ব্যাখ্যাত ও বিধৃত করিয়া চলেন।"—'দেশ' রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তিসংখ্যা, ১৩৬৯।

উপন্যাসের শিল্পধর্মে দেখতে পাই একটি নিরন্তর সর্বগ্রাহিতা, কী বহিরঙ্গে, কী তার অন্তররূপে। একেকটি সাহিত্য প্রকার একেক স্বরূপের হয়ে থাকে, অর্থাৎ তার বহিরঙ্গ দেখেই আমরা বলতে পারি যে এটি কাব্য অথবা নাটক অথবা উপন্যাস। এই বহিরঙ্গের সূত্রেই উপন্যাসের একটি অনন্যতা লক্ষ্য করতে পারি। ধরা যাক কেউ স্থির করলেন তিনি নাটক লিখবেন। বহিরঙ্গে এই নাটকটি পাঁচ অঙ্কের হতে পারে (দীর্ঘকাল পর্যন্ত তেমনটিই হয়েছে), অথবা তিন অঙ্কের হতে পারে, এমন কি একাঙ্ক নাটকও হতে পারে। ক্বচিৎ কখনো অঙ্কের সংখ্যা এই এক-তিন-পাঁচের বাঁধাবাঁধির বাইরেও যেতে পারে, নেহাৎই ক্বচিৎ, যার ফলে ইংরেজী প্রবচনটির যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়: 'দি একসেপশান প্রূভ্‌স্‌ দি রূল' অর্থাৎ ব্যতিক্রম থাকলেই নিয়মটির প্রমাণ পাওয়া যায়। নাটকে ও কাব্যে রূপ-বিন্যাসের, কাঠামোর যে মোটামুটি নির্দিষ্ট গঠন থাকে, উপন্যাসের তেমনটি থাকে না, বরঞ্চ উপন্যাসের গঠনে দেখতে পাই অসংখ্য বৈচিত্র্য। শুধু আয়তনেই তো কত বৈচিত্র্য! মিখাইল সলোখভের 'অ্যান্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' চার খণ্ডে সমাপ্ত একটি বৃহদায়তন উপন্যাস, তার প্রতি খণ্ডে গড়ে ৬০০ পৃষ্ঠা। বিমল মিত্রের 'পতি পরম গুরু' চলেছে ৮৪২ পৃষ্ঠা অবধি, তাঁর 'বেগম মেরী বিশ্বাস' চলেছে ৯০৩ পৃষ্ঠা অবধি। পাশ্চাত্য উপন্যাসে ভিক্তর ইয়ুগোর 'লা মিজরেবল্', থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার', টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস,' গলসোয়ার্দির 'ফরসাইট সাগা'র সম্পূর্ণ চক্রটি, রম্যাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' এবং আয়তনিক বিশালতায় অদ্বিতীয় মার্কিন উপন্যাসকার জন ডস্‌প্যাসোস্‌-এর 'ইউ. এস. এ.' এরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে অনেক উপন্যাস আছে—নানা কারণে আধুনিক সাহিত্যজগতে এই শ্রেণীর উপন্যাস সংখ্যায় অগুনতি এবং জনপ্রিয়ও বটে—যেগুলি আয়তনে এতই ছোট যে তাদের উপন্যাস না বলে গল্প বা বড় গল্প বলতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের এমন কিছু রচনা আছে যেগুলির দৈর্ঘ্য নিতান্তই হ্রস্ব। জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণে দেখতে পাচ্ছি একদিকে যেমন 'গোরা'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫০, অন্যদিকে 'দুই বোন' মাত্র ৩৮ পৃষ্ঠার কাহিনী। এরই সঙ্গে লক্ষ্য করি যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের আয়তনও তুচ্ছ নয়। 'কর্মফল' ২৮ এবং 'নষ্টনীড়' ৪১ পৃষ্ঠা। টমাস হার্ডির এমন দীর্ঘ গল্প আছে যেগুলি আজকের রুচির নিরিখে নিঃসংশয়ে উপন্যাসের আয়তন পেয়েছে। আধুনিক উপন্যাসের এই আয়তনিক হ্রস্বতা সঙ্গত হয়েছে আধুনিক সামাজিক প্রয়োজনের এবং রুচির সঙ্গে। বাংলা ভাষায় কিছু সাময়িক পত্রিকা তাঁদের শারদীয়া পূজা সংখ্যায় (অথবা অনুরূপ কোনো সংখ্যায়) অন্তর্ভুক্ত করতে চান একাধিক উপন্যাস। পত্রিকায় সম্পাদক এই সীমিত কলেবর রচনাগুলিকে উপন্যাস বলেই অভিহিত করেন। ১৩৮৩ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসের হ্রস্ব আয়তন লক্ষ্য করি:

স্বীপ: বিমল কর (৩১ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় ৩ কলম)
আততায়ী: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (৪০ পৃষ্ঠা)
ছবির মানুষ: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (৫৩ পৃষ্ঠা)
একা: দিব্যেন্দু পালিত (৪৪ পৃষ্ঠা)

আমি, অনুপম: (নবনীতা দেবসেন) (৫০ পৃষ্ঠা)

অনুরূপ আয়তনের উপন্যাস অসংখ্য। এই সংকোপিত আয়তনে সূচিত হচ্ছে আধুনিক পাঠকরুচি এবং চাহিদা ও সরবরাহের সমতা। কিন্তু এমন কথা বলতে পারি না যে এই ভঙ্গি অনন্য। বস্তুতঃ আয়তনের সংক্ষেপন নয়, আয়তনের বিস্তৃতিই হচ্ছে ঔপন্যাসিক অবয়বের স্বভাব। স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক সংস্কৃতিতে উপন্যাস সেই ধর্ম পালন করে যা প্রাচীন সমাজে করত এপিক্ বা মহাকাব্য। ইংরেজ উপন্যাসকার হেন্‌রি ফীল্‌ডিং তাঁর উপন্যাসকে বলেছিলেন, 'এ কমিক এপিক ইন প্রোজ।' এপিক কাব্যে থাকত (সুতরাং এপিকের আধুনিক প্রতিরূপেও থাকছে) অনেক চরিত্রের, অনেক ঘটনার, অনেক ভাবনার সংমিশ্রণ, যেমন কিনা থাকে প্রাকৃত জীবনেও। এই কারণেই এপিক কাব্যে এবং মহৎ উপন্যাসে যেন বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন। বাংলা সাহিত্যেও এপিক গুণান্বিত উপন্যাস সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। কিছু নাম এলোমেলো ভাবে জড়ো করছি: তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—'গণদেবতা'; 'পঞ্চগ্রাম'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'; অন্নদাশঙ্কর রায়—'সত্যাসত্য'; বনফুল—'জঙ্গম'; অমিয়ভূষণ মজুমদার—'গড় শ্রীখণ্ড'; বিমল মিত্র—'বেগম মেরী বিশ্বাস', সাহেব বিবি গোলাম', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', প্রমথ বিশী—'কেরী সাহেবের মুন্সী', বিমল কর—'দেওয়াল'; মনোজ বসু—'নিশি কুটুম্ব'; জ্যোতিবিন্দ্র নন্দী—'বারো ঘর এক উঠোন'; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'উপনিবেশ'; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—'ইস্পাতের স্বাক্ষর'।

৩

এপিকের আধুনিক বিনিময় হওয়া ছাড়া উপন্যাস আরো বহু বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয় সাধারণ জীবনে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গিরি গোবর্ধন ধারণের মতো উপন্যাসকারেরও অভিলাষ যে তিনিও তাঁর সাহিত্যকর্মে মানবজীবনকেই ধারণ করবেন, নিদেন-পক্ষে মানবজীবনের একটি খণ্ডরূপ আঁকবেন। এই কারণে গদ্যরচনার অনেকগুলি প্রয়োগ তাঁর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্যারীচাঁদ মিত্র

শিল্পকর্মেও ব্যবহৃত হতে পারে, হয়ও, যথা—চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ, দিনলিপি, প্রবন্ধ, ইতিহাস, ধর্মীয় প্রচারপত্র, যুক্তিতর্ক, ভাষণ, বিপ্লবাত্মক রচনা, ইস্তাহার, ভ্রমণ বৃত্তান্ত। উপন্যাসে আঙ্গিকের ধরাবাঁধা অপরিবর্তনীয় কোনো নিয়ম থাকে না। উপন্যাসের রূপবিন্যাস ঢিলেঢালা, সর্বগ্রাহী। যা কিছু জীবনে আসতে পারে, তা-ই উপন্যাসেও আসতে পারে, তবে কোনটি কী পরিমাণে উপন্যাসে প্রবেশ করবে সেটি নির্ভর করে উপন্যাসকারের শিল্পী হিসাবে দক্ষতার উপরে, উপন্যাসটির শিল্প-প্রয়োজনের উপরে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করা তো উপন্যাস-শিল্পের আদি অবস্থা থেকেই চলেছে। এ বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতেই অন্তত

ছয় সাতটি আছে। আঠারো শতকী ইংরেজ উপন্যাসকার স্যামুয়েল রিচার্ডসন এবং টোবিয়াস্ স্মলেট এই পত্র-মাধ্যম কাহিনী বর্ণনার পথিকৃৎ। আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যের আদিযুগে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখতে পাই নগেন্দ্রনাথ পত্র লিখছেন হরদেব ঘোষালকে, ঘোষাল মহাশয় উত্তর দিচ্ছেন, এই উত্তরের আবার প্রত্যুত্তর হচ্ছে এবং টেনিস বল-রূপী গল্পটি মাঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ছুটেছে, আমরা পাঠকেরা গল্পের অনুধাবন করছি। আত্মকথার মূল্যবান প্রয়োগ আমাদের সাহিত্যে সর্বপ্রথম দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে; উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডে রজনীর কথা দিয়ে আটটি পরিচ্ছেদ প্রস্তুত হল, দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথের কথা দিয়ে সাতটি পরিচ্ছেদ প্রস্তুত হল, চতুর্থ খণ্ডে, "সকলের কথা" (লবঙ্গলতার, অমরনাথের, পর পর লবঙ্গলতার দুটি, শচীন্দ্রনাথের ইত্যাদি) দিয়ে সাতটি পরিচ্ছেদ প্রস্তুত হল। এই বঙ্কিমচন্দ্রেই আরো দেখতে পাই একটি গোটা পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছে একটি দ্বিগত উক্তির (ডায়ালগের) ভিত্তিতে, বস্তুতঃ দ্বিগত উক্তির প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনেক উপন্যাসের অনেক জায়গায়। এই ডায়ালগ বা দ্বিগত উক্তির এক কৌতুকী প্রয়োগ পাওয়া যায় 'মৃণালিনী' উপন্যাসটির তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে:

> "গিরিজায়াই প্রশ্নকর্ত্রী, গিরিজায়াই উত্তরদাত্রী।
>
> প্র। ও লো, তুই বসিয়া কে লো?
> উ। গিরিজায়া লো।
> প্র। এখানে কেন লো?
> উ। মৃণালিনীর জন্য লো।
> প্র। মৃণালিনী তার কে?
> উ। কেউ না।
>
> *　　　*　　　*
>
> প্র। কি বুঝিলে?
> উ। কয়েকটি লক্ষণ মাত্র।
> প্র। কি কি লক্ষণ?
>
> গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল; এক—মেয়েটি আশ্চর্য সুন্দরী; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে? দুই—মনোরমা তো হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন? তিন—একত্রে বাস। চারি—একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।"

এই প্রশ্ন-উত্তর সাজানো শিল্পকারু দিয়ে একটি চরিত্রের দ্বিধামণ্ডিত সত্তা এবং কিছু কাহিনীগত তথ্য পাঠকের কাছে পেশ করা হয়েছে অতিশয় নিপুণ ভাবে। আধুনিক উপন্যাস শিল্পকারুতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োগ করেছেন বাঙালীর ঘরোয়া কথনশিল্পের একটি প্রাচীন আঙ্গিক। এই ধরনের শিল্পকারুর সঙ্গে শিল্পী মিশিয়েছেন অন্য আঙ্গিক—শ্লোক বা ছড়া। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ত্বরিত-রচিত ছড়া পাই যখন পলায়মান দুষ্ট পল্লীবালক দরোয়ানদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। "পলায়নকালে কোন বালক বলিল:

> রামচরণ দোবে,
> সন্ধ্যাবেলা শোবে,
> চোর এলে কোথায় পালাবে?

কেহ বলিল,

> রামদীন পাঁড়ে,—
> বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
> চোর দেখ্‌লে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।

কেহ বলিল,—

> লাল চাঁদ সিং,
> নাচে তিড়িং মিড়িং,
> ডাল রুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

এসব তাৎক্ষণিক ছড়ার সঙ্গে একটি তাৎক্ষণিক প্যারডি বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন:

*　　　*　　　*

> যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা॥
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
> যা দেবী ঘরন্দারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা॥
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

উপন্যাস শিল্পের একই প্রকরণ—ধরুন দ্বিগত উক্তি, বর্ণনা, লেখকসত্তা ও নায়কসত্তার একীকরণ—যে একই উপন্যাসকারের প্রতিটি উপন্যাসেই বলবৎ থাকবে এমন কোনো অবশ্যতা নেই। উপরন্তু প্রকরণের নবত্ব যে আজকের দিনেই হচ্ছে এমনও নয়। পত্রনির্ভর-কাহিনী, চরিত্র বিশেষের স্বগতোক্তি-নির্ভর কাহিনী, বিভিন্ন চরিত্রের মনোভঙ্গি-নির্ভর কাহিনী (যাকে ই. এম. ফর্স্টার বলেছিলেন, 'পয়েন্টস্ অব ভিউ,') অন্তর্জগতের উন্মোচন—এ সমস্তই কমবেশি পরিমাণে, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী কলা-শাস্ত্রের দীর্ঘবাহী ঐতিহ্য। বিশ শতকের লেখক জেমস্ জয়স্-এর 'ইউলিসিস্' উপন্যাসে যে সম্বিৎপ্রবাহ, যে প্রাকরণিক বিরাট মূল্য নির্ধারণ করেছে, সেই প্রকরণের সূচনা পাওয়া যায় আঠারো শতকের লরেন্স্ স্টার্ন-লিখিত 'ট্রিস্ট্রাম শ্যান্ডি' নামক উপন্যাসে।

৪

যে কোনো শিল্পরূপের মতোই উপন্যাসেরও কতকগুলি সৃজনী উপাদান আছে; এসব উপাদান নিটোল ভাবে সম্মিলিত হতে পারলে যে ফলশ্রুতি দাঁড়ায় তাকেই বলি উপন্যাস। অবশ্য আমরা যারা শিল্পী নই, পাঠক মাত্র, হয়ত অল্পবিস্তর সমালোচনাশক্তি-সম্পন্ন পাঠক, এই ভেবে আত্মপ্রসাদ বোধ করি, আমাদের বিবেচনায় শিল্পের উপাদান এবং শিল্পীর সৃজনী প্রতিভায় বিধৃত শিল্প-উপাদান এ দুইয়ে বিভিন্নতা একেবারেই মৌল। সমালোচকের চিন্তায় যে উপাদানগুলি ব্যবচ্ছিন্ন বিশ্লেষিত হয়েছে, কুশলী শিল্পীর ভাবনায় সে সব মিলে-মিশে একটি প্রাণোজ্জ্বল সুষম সমগ্রতা লাভ করে। সাহিত্যের তত্ত্ববিদ্‌গণ উপন্যাসের যে সব উপাদান লক্ষ্য করেছেন তার মধ্যে প্রধানই হচ্ছে কাহিনী। কাহিনী আছে বলেই অন্য উপাদানগুলি শিল্পে প্রবেশ করে: চরিত্র, প্লট, পরিবেশ, ভাববস্তু। বস্তুতঃ কাহিনী সম্বন্ধে চিন্তা করলেই অন্য উপাদানগুলি সম্বন্ধে চিন্তাও এসে যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাবতীয় কাহিনীতেই কিছু না কিছু ঘটে, সেই ঘটনা-সমবায়েই কাহিনীটি নির্মিত হয় এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আরো কী ঘটতে পারে সে বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল জন্মায়। ঘটনা-বর্জিত কাহিনী অসম্ভব, তবে এমন হয় এবং হতে পারে যে বহিরঙ্গ ঘটনার পরিমাণ অতীব সামান্য এবং লঘু, বহিরঙ্গ ঘটনা শুধু ততটুকুই যাতে মনোজগতের প্রবাহ একটি গতিপথের নির্দেশ পায়। ঘটনা থাকতেই হবে, বিস্তৃত হোক, স্বল্পায়তন হোক, বহির্জগতেরই হোক, অন্তর্জগতেরই হোক। পাঠকের অদম্য কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য গল্পের জগতে, উপন্যাসের জগতে,

অনেকরকম কাহিনীবস্তু এসে থাকে: দুঃসাহসিক অভিযান, অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত লক্ষ্যের সন্ধান, অলৌকিক অপ্রাকৃত ঘটনা (মেরী শেলী লিখিত সুবিখ্যাত কাহিনী 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন'), যুদ্ধ-বিগ্রহ, অতীতের কাহিনী (বিশেষতঃ ইতিহাস-সম্পৃক্ত অতীতের কাহিনী), আধুনিক সাহিত্যের বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী। শক্তিশালী লেখকের কল্পনায় ও লেখনীতে সাধারণ রূপান্তরিত হয় অ-সাধারণে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু তো খুবই সাধারণ গ্রামবাসী বাঙালী ছেলে, কিন্তু তার দৃষ্টির মাধ্যমে দেখলে আকাশের পাখি, দিগন্তের রেলগাড়ি আর গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, সবই অ-সাধারণ রূপ গ্রহণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসে এমন সব কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থিত হয় যা কিনা সাধারণ পাঠকের বীক্ষায় আসে না, কিন্তু 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আসে। বাংলা উপন্যাসে কাহিনীর অভিনবত্ব চিরপ্রবহমান, বস্তুতঃ যতকাল বাঙালী উপন্যাসশিল্পী ও উপন্যাস পাঠক প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সংশ্লেষে মণ্ডিত থাকবেন ততকালই বাংলা উপন্যাসের কাহিনী 'নিতুই নব'-রূপে প্রকাশিত হতে থাকবে, যেমনটি হয়েছে অতীতে, যেমনটি হচ্ছে আজকাল।

উপন্যাস-কাহিনীর বিষয় তার ঘটনার বৈশিষ্ট্য নানারকম শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। এই বিভাগের মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করা যাক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গার্হস্থ্য জীবন। এই জীবন-চিত্রায়ণের এক প্রান্তে পাব বঙ্কিমের 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি', 'রামের সুমতি', অর্থাৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থালীর 'প্রেক্ষাপট'। অন্যদিকে পাব সচ্ছল পরিবারের কাহিনী, বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', 'পতি পরম গুরু', প্রভৃতি। কিন্তু কোনো লেখক হয়ত গৃহস্থালীর সীমিত জীবন ছাড়িয়ে এসেছেন প্রশস্ততর সমাজের বৃহত্তর পটে, যেখানে সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তির জীবনাকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে যায়। এমনটি হয়েছে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', বিমল মিত্রের 'আসামী হাজির', অসীম রায়ের 'আবহমানকাল', আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রমুখ অনেক উপন্যাসে। শুধু যদি জড় জাগতিক নৈসর্গিক পরিবেশের কথা ভাবি তাহলে দেখব বাংলার গ্রামীণ জীবনে অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাসের উৎস রয়েছে: শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', মনোজ বসুর 'সেই গ্রাম সেই সব মানুষ', গজেন্দ্র মিত্রের 'কলকাতার কাছেই'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে অরণ্যকে উপন্যাসের পরিবেশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিন রাত্রি', বাসুদেব বসুর নেফা-ভিত্তিক দুতিনটি গ্রন্থ, এবং অবশ্যই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপম 'আরণ্যকে'। সমুদ্রে উপস্থাপিত হয়েছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনব কাহিনী 'অলৌকিক জলযান।' একটি খনি হয়েছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের ঘটনাস্থল। নদী-পরিবেশের অবিস্মরণীয়

চিত্রণ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে কিছু উপন্যাস, যথা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক', অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'। যাযাবর জীবনের প্রতীকী ভাবনা নিহিত আছে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পর্বগুলিতে, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে; তীর্থযাত্রা নিয়ে রচিত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', প্রবোধ কুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে', অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রভৃতি সুখপাঠ্য ভ্রমণোপন্যাস।

বাংলা উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রধান বিষয়গুলির কিছু দৃষ্টান্তের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা তৈরি করা সম্ভব।

বিশেষ অঞ্চল-কেন্দ্রিক উপন্যাস: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ('কয়লাকুঠির দেশ', প্রকাশের পরে এই গ্রন্থ যে গভীর সাড়া জাগিয়েছিল সেকথা আজকের বর্ষীয়ান পাঠকেরা স্মরণ করতে পারবেন); তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ('হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'); মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা'), সতীনাথ ভাদুড়ী ('ঢোঁড়াই-চরিত মানস'), অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ('চরকাসেম'), সরোজকুমার রায় চৌধুরী ('ময়ূরাক্ষী'), অদ্বৈত মল্লবর্মণ ('তিতাস একটি নদীর নাম'), সুবোধ ঘোষ ('শতকিয়া'), প্রফুল্ল রায় ('পূর্বপার্বতী'), অচ্যুত গোস্বামী ('মৎস্যগন্ধা'), প্রভাত দেব সরকার ('ওরা কাজ করে'), সমরেশ বসু ('গঙ্গা), ইত্যাদি।

জনপদ জীবনের উপন্যাস: বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—'ইছামতী'; তারাশঙ্কর—'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'; প্রফুল্ল রায়—'কেয়াপাতার নৌকা'; অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে'; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—'তৃণভূমি'; মনোজ বসু—'বন কেটে বসত', 'জল জঙ্গল'; রমাপদ চৌধুরী—'বনপলাশীর পদাবলী'; অমিয়ভূষণ মজুমদার—'গড় শ্রীখণ্ড', ইত্যাদি। কারখানা ও শ্রমিক জীবন-নির্ভর উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে নিতান্ত কম নয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই ধারার পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং কতকগুলি বিষয়ে আজ পর্যন্ত তিনি অদ্বিতীয় লেখক। পরবর্তী কালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাহিনীশিল্প পাই যে সকল গ্রন্থে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'— গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য; 'বি. টি. রোডের ধারে'—সমরেশ বসু; 'লখীন্দর দিগর'—গুণময় মান্না। যন্ত্রনির্ভর আধুনিক সমাজের এক বৃত্তাংশে পাই সেই কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীণ জীবন, যে গ্রামীণ জীবনের আদিসূত্রে জড়িয়ে আছে মানব সভ্যতা এবং টমাস্ হার্ডির অবিস্মরণীয় কবিতার ভাষায় 'War's annals will cloud into night/Ere their story die.' এই জীবন বিধৃত যেসব বাংলা উপন্যাসে তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করি: রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্য কৃষকজীবন থেকে উদ্দীপনা পায়নি, শরৎচন্দ্রে সে-জীবন সম্বন্ধে চেতনা আছে কিন্তু সে-জীবন কেন্দ্র করে কল্পজগৎ সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টির ইতস্ততঃ চেষ্টা করেছেন নরেশ সেনগুপ্ত, শৈলবালা ঘোষজায়া। কিন্তু তাঁদের সৃজন-শক্তি প্রবল ছিল না। এ যুগের লেখকদের মধ্যে মনোজ বসুর বহু কাহিনীতে কৃষিজীবন সম্বন্ধে গভীর অনুরাগ ও জ্ঞান ছড়িয়ে আছে, বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তাঁর 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'। গুণময় মান্না রচিত 'লখীন্দর দিগর', প্রভাত দেবসরকারের 'ওরা কাজ করে', তরুণ লেখক মহীতোষ বিশ্বাস রচিত। 'মাটি এক মায়া জানে' এই ধারার উপন্যাস-সাহিত্যে উজ্জ্বল যোজনা।

৫

বঙ্গীয় তথা সর্বমানবিক জীবনের দিগ-দিগন্তর যে বিধৃত হয়েছে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; তবুও নিয়মমাফিক পরিসংখ্যান না করেও, এক-নজরী দৃষ্টিতেও বোঝা যায় যে এ দেশের নগর-জীবনই (অতএব মধ্যবিত্ত জীবন) এই উপন্যাস-সাহিত্যের বৃহত্তম বিষয়। এটাই স্বাভাবিক এবং বস্তুতঃ যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষার উপন্যাসেই এই নগর-জীবনপ্রাধান্য দেখতে পাই। নগরজীবনের প্রাধান্য ও মধ্যবিত্তের ব্যাপকতা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলা উপন্যাসের জন্মকাল থেকেই উপন্যাস-কাহিনীতে বিধৃত হয়েছে নগর-জীবন, এবং বাংলাদেশের বিগত আড়াইশো বছর যাবৎ (যখন থেকে মুর্শিদাবাদের পতন শুরু হল,—সেই যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাস') এদেশে নগর-জীবন ও কলকাতার জীবন সমার্থক হয়ে আছে। 'নববাবু বিলাস', 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা', 'আলালের ঘরের দুলাল' (এই সঙ্গে ১৮৩৫ সালে বাঙালী-রচিত ইংরেজী ভাষায় লিখিত কৈলাস চানডার ডাট্-এর A Journal of Forty-eight Hours of the year 1945[২] নামক আখ্যায়িকাটির উল্লেখ হওয়া সঙ্গত), এসব কাহিনীর ঘটনাস্থল দ্রুত বিস্তারশীল মহানগরী কলকাতা, যেখানে বাঙালী জাতির আচারে ব্যবহারে সংস্কৃতিতে যা কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা-ই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কলকাতার আদিরূপ নিয়ে যে কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে নির্মাণ নিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ হওয়া উচিত প্রমথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' এবং বিমল মিত্রের 'সাহেব

বিবি গোলাম'। বিশী মহাশয় সঙ্গতভাবেই লেখকের বক্তব্যে বলেছেন, "এ শহরের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে যা ভারতের প্রাচীন শহরগুলোর ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র। ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের সীমান্তে অবস্থিত এই শহর।" বিমল মিত্র পাঠককে জানাচ্ছেন, "১৯৬০ সালের ২৪ আগস্ট থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর পটভূমিকা। অর্থাৎ, কলকাতার পত্তন থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর কাল পর্যন্ত।" এই পটভূমিকা সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন:

> "প্রথমেই চোখে পড়ে বইখানির পশ্চাদ্‌পট কি বৃহৎ, কি বিশাল, কত লোকের মিছিল নিয়ে তার নাড়াচাড়া আনাগোনা।...দেশ, কাল ও পাত্র—এই তিন নিয়েই ত ইতিহাস এবং ভূগোল। এখানে সমস্ত কলকাতাটাই দেশ।...কলকাতার ইঁটপাটকেল রেখাচিত্রের পরে আসে সহরবাসীর রক্তেমাংসে গড়া তৎকালীন সমাজের ছবি।...জড় জগতের চেয়ে এই জীব জগতের ছবি আঁকতেই লেখকের বেশি কৃতিত্ব দেখতে পাই।"

কথাগুলি সর্বতোভাবে সত্য। পুরনো কলকাতার সামাজিক আবহাওয়া সুন্দর পাওয়া যায় আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থে। নগরজীবন তো ইঁটপাটকেলের জগৎ নয়, ইঁট-পাটকেলের আবেষ্টনীতে বেড়ে-ওঠা মানুষের জীবন। সেই মানুষের জীবনও ইঁটপাটকেলের মতো নিশ্চল জড় পদার্থ নয়, মানুষের জীবন চলমান, প্রগতিশীল, সেই প্রগতির কাহিনী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-তে ও তার অনুবৃত্ত কাহিনী দুটিতে। অন্য দৃষ্টিতে কলকাতাকে দেখা হয়েছে অসীম রায়ের 'আবহমানকাল' উপন্যাসে:

"বারেবারেই কলকাতার রাস্তায় বিপ্লবের জোয়ার যেমন আসে তেমনি প্রবল ভাটার কাদায় স্থান কাল গেড়ে বসে। ক্লান্তিতে অবসাদে মুখ থুবড়ে থাকে সারা শহরটা। চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় সাহেবদের আসন দখলকারী ভারতবর্ষের নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা ফূর্তি-উড়ায়, শেয়ালদা স্টেশনে রিফিউজির ভিড় বাড়ে। * * * এই শহরের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে এক প্রবল শ্বেত সত্তায় টলমল্ করে টুটুল।" ৩৮২ পৃ

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'মহানগর' উপন্যাসে কলকাতাকে দেখেছেন আধুনিক জীবনযাত্রার এক উত্তাল প্রতীক হিসাবে:

"আমার সঙ্গে এক মহানগরের পথে, যে পথ জটিল দুর্বল মানুষের জীবন ধারণার মত, যে পথ অন্ধকার মানুষের মনের অরণ্যের মত, আর যে পথ প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মত। এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত, ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।"

কিন্তু এই মহানগর নিয়ে কেবল রোমান্স বা রাজনীতি করাই চলে না, অগণিত মানুষের জীবন সংগ্রাম বা জীবন সম্ভোগ বর্ণনা করাই চলে না, এর প্রতীকী অভিধা এর সম্পূর্ণ অভিধা নয়। এই মহানগরের আরেকটি সত্তাও আছে; আতঙ্কিত, শিহরণ-জাগানো রূঢ়, বেদনার্ত, যন্ত্রণাবিদ্ধ বাস্তব সত্তা। এই বাস্তব সত্তার অবিস্মরণীয় চিত্রণ পাই কয়েক দশক আগে 'কল্লোল' পত্রে প্রকাশিত (পরে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত) যুবনাশ্ব বা মণীশ ঘটক রচিত 'পটলডাঙ্গার পাঁচালীতে'। সেই চিত্রণের চিত্রী হতে পারলে ভিক্‌তর ইয়ুগো ('লা মিজরেব্‌ল্'), ডিকেন্‌স্ ('ব্লীক হাউস্') অথবা এমিলে জোলা ('লা' আস্‌সোমোয়া') হৃষ্ট হতেন। কিন্তু মণীশ ঘটক এই বিচ্ছিন্ন গল্পগুলিকে একটি উপন্যাসশিল্পে সংগঠিত করেননি।

৬

গ্রামের বা শহরের সমাজ-জীবনের বাইরেও তো মানুষের জীবন-বিস্তৃতি কম নয়। আধুনিক উপন্যাসে চোর ডাকাতের কাহিনীও স্থান পেয়েছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বে কোনো কোনো ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যে (যেমন স্প্যানিশ ভাষায়, ফরাসীতে, ইংরেজীতে) চোর ডাকাতদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোর কাঁটা' এবং পরবর্তীকালে অনেক বেশী বিচিত্র ও প্রসারিত রূপে মনোজ বসুর দুই খণ্ডী 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসে এই অ-সাধারণ সাহিত্য বিষয়টি মর্যাদা পেয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন মধ্যভারতে, রাজস্থানে কিছু দস্যুদলের এবং দস্যু-সর্দার ও সর্দারণীর কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হতে থাকল তখন বাংলারও জীবনের এই দিকটি চিত্রিত হল কারো কারো উপন্যাস-ঘেঁষা রচনায়। সর্বভুক পাবকের মতো বাংলা উপন্যাস এ বিষয়টি আত্মসাৎ করল। চুরি নয়, ডাকাতিও নয়, অথচ চুরি-ডাকাতির চেয়ে অনেক বেশী রুদ্ধ-শ্বাস কৌতূহল-উদ্রেকী বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ ও রাজনীতি। যুদ্ধের শিল্পিত রূপ দেখতে বাঙালী অভ্যস্ত অনেক কাল থেকেই। যুদ্ধ ছাড়া যাত্রাগানের পালাই চলত না এক সময়। মনে পড়ে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের কয়েকটি ছত্র:

> "কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া পেন্টুলানের খুঁট চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব!"

বাংলার প্রথম মহৎ উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্রে রণাঙ্গনে শৌর্য আদৌ বিরল নয়; 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' তিনটি কাহিনীরই প্লটে যুদ্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। অনুরূপ উল্লেখযোগ্যতা রমেশ দত্তের উপন্যাসেও আছে। এ'দের কালের পরে যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে শান্ত সামাজিক জীবনই বাংলা উপন্যাসের প্রধানতম অবলম্বন হয়েছিল। আধুনিক বাঙালীর জীবনে যুদ্ধের চেতনা পুনরায় কার্যকর হয়েছে, সুতরাং ইদানীংকার বাংলা উপন্যাসে সামরিক অভিজ্ঞতা ফিরে আসছে। দেবেশ দাশের 'রক্তলাল' এবং 'জীবনের চেয়ে বড়', দুটি গ্রন্থেই চরিত্র, কাহিনী, ভাবজগতের সঙ্গে নিপুণ ভাবে মেশানো হয়েছে সৈনিক জীবনের তথ্যাদি। এই বিষয়ে রচনাকৌশলের আরো নিদর্শন পাওয়া যায় বরেন বসুর 'রঙরুট' এবং সুরঞ্জন সেনের 'ডানকার্কের পতন' এই দুটি গ্রন্থে।

যুদ্ধ-বিগ্রহের নিকট আত্মীয় রাজনীতি। আজকের দিনে নানারকমের রাজনীতি এবং সারা বিশ্বের বিবিধ রাজনৈতিক চিন্তা, সম্পর্ক, ক্রিয়াকাণ্ড ভারতীয় জাতীয়-জীবন থেকে দূরে নয়। সুতরাং রাজনীতি বাংলা উপন্যাসের একটি বিষয় হয়েছে। নিমাই ভট্টাচার্য লিখেছেন 'ডিপ্লো-ম্যাট'। শৌনক গুপ্ত লিখেছেন 'ফিদেল ক্যাস্ট্রো' সৌরীন সেন লিখেছেন 'কান্না ঘাম রক্ত', বেদুইন লিখেছেন 'সিয়া, একটি গোপন চক্র', চাণক্য সেন লিখেছেন, 'সে নহি সে নহি', 'মুখ্য-মন্ত্রী'। এসব গ্রন্থে সংবাদপত্রী রচনাশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং লক্ষ্য করা যায় যে যাঁরা সাময়িকী রুচিসম্পন্ন বই লেখেন তাঁরা অনেক সময়ই ছদ্মনাম লেখেন। ছদ্মনামে লেখার অন্য কারণও থাকে; লেখকের আত্মসত্তা প্রচ্ছন্ন রাখা রাজনৈতিক কারণে। স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো' একটি সম্ভাবনাময় ছোট-কাহিনী, আদর্শবাদী রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণার অভিব্যক্তি। রাজনৈতিক আদর্শ-বাদিতা প্রকাশিত হয়েছে অন্য কিছু উপন্যাসেও। সর্বাগ্রেই মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'; রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'চার অধ্যায়'; শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'; গোপাল হালদারের 'একদা'; বিমল মিত্র লিখেছেন 'রাগ ভৈরব'; বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিশীথ ফেরী', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া', মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা', মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', 'আগস্ট বিপ্লব' প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মী কারাগার থেকে বেশী দূরে থাকেন না। কিছু উপন্যাস আছে, সেখানে বন্দী দণ্ডিত হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' এই শ্রেণীর কাহিনীর অন্যতম দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি কেলাস' সাধারণ কয়েদিদের নিয়ে লেখা।

৭

উপন্যাস-কাহিনীর চরিত্রের কোনো না কোনো পেশা অবশ্যই আছে, এমন কি ভ্যাগাবণ্ড হওয়া অবধি এক ধরনের পেশা বৈ কি। এবং আমাদের সাহিত্যে ভ্যাগাবণ্ড চরিত্র বিরল নয়। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বারংবার নিজেকে ভবঘুরে বলেছে। ভ্যাগাবণ্ডের মতোই সন্ন্যাসী এবং কিছু ভিখারী সমাজের ঘরোয়া গণ্ডির বাইরে থাকে সচরাচর। এই দুই শ্রেণীও বাংলা উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীরা তো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। এদের বাইরে আমরা বাংলা উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত পাই মানবিক কর্মবৃত্তির সম্ভবতঃ প্রতিটিরই প্রতিনিধি। এসব উপন্যাসেরও শ্রেণী-প্রতিনিধির প্রতিটিরই তালিকা এখানে দেওয়া হচ্ছে না, তেমন তালিকা হবে নিতান্তই গ্রন্থাগারস্থ রেফারেন্স্ কেতাবের শিথিল অনুকরণ। কিছু শ্রেণীর নাম এবং কিছু চরিত্রের বা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল এই ধারণা সৃষ্টির অনুকূলে যে বাংলা উপন্যাসে পেশাগত শ্রেণীর নিরিখে কাহিনী-চরিত্রের সীমানা বহুবিস্তৃত, সে-বিস্তৃতি (যেমন ইংরেজী, ফরাসী, রুশ উপন্যাসে দেখা যায়) প্রমাণ করে এই সাহিত্যের প্রাণবন্ত জীবনধর্ম, এবং তেমন জীবনধর্ম অনুসৃত হয়েছে বলে এই চরিত্রাদর্শ সত্যতামণ্ডিত। যে-ভাবাভাবীর সংস্কৃতিতে এই সুডৌল সত্যতা, সেই ভাবাভাবী এবং সেই সংস্কৃতি নিরত অগ্রসরমান। চরিত্রের, পেশার এই মিছিলে আছে সন্ন্যাসী, ঠাকুরে, দোকানদার, ব্যবসায়ী, দালাল, কেরাণী, শিক্ষক (মনোজ বসু—'মানুষ গড়ার কারিগর'), অধ্যাপক (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'নির্জন শিখর'), উকিল ব্যারিস্টার (শঙ্কর—'কত অজানারে'), চিকিৎসক (আশাপূর্ণা দেবী—'প্রথম প্রতিশ্রুতি'), খেলোয়াড় (মতি নন্দী—'স্ট্রাইকার'), রাঁধুনী (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'আদর্শ হিন্দু হোটেল'), ভৃত্য (শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন'), ট্যাক্সি চালক, গোরুর গাড়ি চালক, মিস্ত্রী, গায়ক, বাইজী (বিমল মিত্র—'একক দশক শতক') রেল কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, মাঝিমাল্লা, কৃষক, বেকার।

সমাজ-জীবনে বিধৃত হয়েছে কত অসংখ্য ব্যক্তি, কত অসংখ্য ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গত না হয়ে আত্মবৈশিষ্ট্য-পরায়ণ হওয়ার দিকে চলে আজকের অনেক লোক, নানা নিজস্ব কারণে। কারণ যার যেমনই হোক না কেন, সমসাময়িক সাহিত্যে, বিশেষতঃ

উপন্যাসে, উৎকেন্দ্রিক জীবন স্থান পেয়েছে কিছু ক্ষমতাশালী রচনায়। এহেন উপন্যাসের কয়েকটির উল্লেখ করা যাক: বিমল কর—'যদুবংশ', সমরেশ বসু—'বিবর', 'প্রজাপতি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—'আত্মপ্রকাশ', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়—'ঘুণপোকা', রমাপদ চৌধুরী—'এখনই', স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়—'আঁধি', গৌরকিশোর ঘোষ—'আমরা যেখানে'। যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'ম্যাল-অ্যাডজাস্টমেন্ট', সেই আত্মিক গরমিল নামক মানসিক অস্বস্তি ক্রমে করে অনেক আধুনিক মানুষকে। এই অস্বস্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা এখানে সম্ভব নয়। এইটুকু শুধু বলা যায় যে সভ্যতা নামক সামাজিক ব্যবস্থায়, সমাজ-ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেই সহসা কোনো ক্ষেত্রে চিড় খাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আগেকার দিনে ব্যক্তিমানুষ সরে যেত সমাজজীবন থেকে, হয়ত সাধু সন্ন্যাসী হত, নতুবা সেক্সপীয়রের চরিত্র অ্যাথেন্স্‌বাসী টাইমনের মতো লোকালয়ত্যাগী সহস্র সূচিবিদ্ধ হৃদয় নিয়ে মৃত্যুর অভিসারী হত। সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' এবং 'লীয়র'ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি যোগ করেননি। বস্তুতঃ ষোড়শ শতকী ইউরোপেই শুরু হয়েছিল আজকের সুপরিচিত, বহু-আলোচিত 'আউটসাইডার' বা বেমানান ব্যক্তিচরিত্রের ধারা, যে ধারা মধ্য-উনিশ শতকেই প্রবল হয়ে ডস্‌টইএভ্‌স্কির 'নোটস্‌ ফ্রম দি আন্ডারগ্রাউন্ড' উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারপরে আমাদের বিশ শতকে (যখন একদিকে প্রচণ্ড বহু-ধ্বংসী যুদ্ধ, এবং এককেকটি জাতির মধ্যেই একাধিক বিপ্লবী বিধ্বংসী সম্প্রদায়ের উত্তেজিত জীবনযাত্রা, অন্যদিকে মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন দুয়েরই সম্পর্কের জ্ঞানের প্রসার এবং সেই সঙ্গে ধারণার বিশৃঙ্খলা) ব্যক্তির তিক্ত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সত্তা প্রকট হতে থাকল যখন মানসিক ব্যাধি বাড়তে থাকল, যখন মানুষ যেন নিজেকেই নিজে চিনতে পারল না কেননা রবর্ট লুই স্টীভেনসনের ডক্টর জিকেল্‌ হয়ে গেলেন মিঃ হাইড-এ রূপান্তরিত, যখন ফরাসী লেখক জাঁ মালাকেইয়ের° সত্ত্বভ্রষ্ট নায়ক জানল যে রবীন্দ্রনাথের বামীর মতো সেও যেন 'হারিয়ে গেছি আমি' এই পরিস্থিতিতে পড়েছে, তখন থেকে অন্যান্য জাতির উপন্যাসের মতো বাংলা উপন্যাসেও 'চরিত্র' নামক শিল্প-উপাদানটির যেন খোল-নল্‌চে বদলে গেল। আগেকার সাহিত্যে ক্যারেক্‌টার বা চরিত্রের আচরণের বা চিন্তার একটা লজিক ছিল। সেই লজিক যেন আজ অন্তর্হিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের কবিতার ছত্র স্মরণে আসে: 'কাফুরের মতো ফুরায়ে ফতুর আমি যবে যাব উঠে'।

৮

উপন্যাসে কালের প্রভাব প্রচণ্ড। উপন্যাসে একটি মুহূর্তের কাহিনী নয়, কোটি কোটি চলমান মুহূর্তপুঞ্জের কাহিনী। সবাই জানি যে কাল তিন খণ্ডে বিভাজ্য: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। এই তিনখণ্ডী কালের প্রথম দুইটি উপন্যাসশিল্পে প্রবল, ভবিষ্যৎ ততটা নয়। বাংলায় অনাগত দিনের ফ্যানটাসি, ভবিষ্যতের ইউটোপিয়া অথবা (আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের ধরনে) অ্যান্‌টি-ইউটোপিয়া, তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বা আলোচনীয় নয়। অধিকাংশ বাংলা উপন্যাসে সমকালই বিধৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলা উপন্যাসে অতীতের স্পর্শ মূল্যবান রূপ নিয়েছে। শুরু থেকেই বাংলা উপন্যাসের একটি ধারায় এলো ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশ দত্ত দুজনেই লিখলেন ঐতিহাসিক কাহিনী। হয়ত সুজনীতাগিণ এসেছিল সেকালকার স্কট-অনুরাগ থেকে, হয়ত এসেছিল জাতীয় অতীতের মধ্যে জাতীয় বর্তমানের ও জাতীয় ভবিষ্যতের অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি থেকে। 'কে তুমি'?—মেলে না উত্তর। আমাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসকারগণ সে-প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করেছিলেন। দূর অতীতের, প্রাগৈতিহাসিক অতীতের, আবার নিকট-বর্তী অতীতের চিত্র এঁকেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। শরদিন্দু তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠায় দু'চার জায়গায় যেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চরণক্ষেপ অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। এই দূর অতীত-সন্ধানের পাশাপাশি বয়ে চলেছে সন্নিকট অতীতের সন্ধান। এখানেও ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিন্তু এ ইতিহাস এক শতাব্দী অথবা দু' তিন শতাব্দীর অতীতে যায় না, কেননা এ উপন্যাসের লক্ষ্য বাংলা ও বাঙালীর আধুনিকতার সূত্রপাত কোথায় হল তার অনুসন্ধান করা। সে কারণেই তাঁর 'বেগম মেরী বিশ্বাস' গ্রন্থে বিমল মিত্র গেছেন মুর্শিদাবাদের চেহেল সুতুন প্রাসাদে, প্রমথ বিশী গেছেন ক্রমস্ফীতিশীল কিশোর কলকাতায়, মহাশ্বেতা দেবী গেছেন মিউটিনির যুগে, প্রতাপচন্দ্র গেছেন আরো আগে জোব চার্নকের আমলে, অমিয়ভূষণ মজুমদার গেছেন নীলচাষ ও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের যুগে।

কিন্তু স্থান ও কালের পরিবর্তনশীলতা—গ্রাম, নগর, অরণ্য, পাহাড় ইত্যাদি; ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—এসব উপাদান এবং আরো কিছু যদি মিশ্রিত, মিলিত, একীভূত হয়ে যায়, তাহলেই কি শিল্পত্ব এসে যায় কাহিনীতে, যে শিল্পত্বের প্রসাদে কাহিনী রূপান্তরিত হয় উপন্যাসে? বস্তুতঃ এই একীভবনের গোড়ায় আছে প্লটের ঐশ্বর্য। ঘটনা, চরিত্র পরিবেশ, এ-সমস্ত মিলে মিশে যায়, মিলে যায় আবার এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় আবার তার ঊর্ধ্বায়ন হয়, নিচু থেকে সে ওঠে উঁচুতে, এই সমস্ত এবং আরো অনেক খুঁটিনাটি আসে প্লটের আওতায়। প্লট ঢিলেঢালা

হতে পারে, টাইট হতে পারে। কেমনটি হবে সে বিচার করবেন উপন্যাসকার। বিচার করবেন তাঁর শিল্প-উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্লটের মধ্যে গঠনকৌশল অনেক রকমের থাকতেও পারে, তারও তালিকা দেওয়া এ-প্রবন্ধে সম্ভব নয়, কেননা তালিকাভুক্ত প্রতিটি কৌশলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, তার বিভিন্ন প্রয়োগ এবং প্রতিটি প্রয়োগের শৈল্পিক কারণটি আলোচনা না করলে তালিকাটি নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। অবনীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন করণকৌশল সেই টেকনিকের কিছু উল্লেখ করা হয়েছে উপরের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে যেখানে 'পয়েন্ট অব ভিউ' অর্থাৎ বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা কোনো বস্তুর বা ঘটনার তাৎপর্য পাল্টে যায়। প্লটের বাঁধুনিতে এসব টেক্-নিকের ব্যাপার সম্বন্ধে উপন্যাসকারকে অতীব সতর্ক হতে হয়। কল্পনা করুন 'ক' নামক এক-ব্যক্তি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা সবাই কি একই ব্যক্তিকে দেখছি? সম্মুখ থেকে দেখলে ব্যক্তিরূপটি একরকম, পেছন থেকে দেখলে অন্যরকম, ডান পাশ থেকে দেখলে একরকম, বাঁ পাশ থেকে দেখলে অন্যরকম, ব্যক্তির চারিদিককার ৩৬০° চক্রের প্রতিটি ডিগ্রি থেকে দেখলে ব্যক্তিরূপ বদলে যাচ্ছে; মাথার উপরে একটি পাখি উড়ে গিয়ে অন্যরকম দেখল, আরো অন্যরকম দেখল যে পিঁপড়ে লোকটির পদতল থেকে উপর দিকে তাকাল। ব্যক্তিরূপের কোনো ধ্রুব শিলাদৃঢ় সত্তা নেই। হ্যামলেট চরিত্র ততগুলি যতগুলি পাঠক সে-নাটক পড়েছে। আরো বলতে পারি, প্রতিটি অধ্যয়ন একটি নতুন অনন্য উপলব্ধি। অতএব কোনো অচল অনড় 'পয়েন্ট অব ভিউ' বা দৃক্‌ভঙ্গি নেই। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী কি মাত্র একজন স্ত্রীলোক না অনেক স্ত্রীলোকের সমষ্টি? পিয়ারী বাইজি ও রাজলক্ষ্মী তো একই ব্যক্তি, কিন্তু একই কি? কুমার বাহাদুর, তাঁর পার্ষদগণ, শ্রীকান্ত নিজে (শ্রীকান্তর দৃষ্টিভঙ্গিও পালটাচ্ছে একটি এপিসোডের পরে অন্যটিতে), ভৃত্য রতন, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব,—এভাবে যত নরনারী এসেছে এই কাহিনীর আওতায়, প্রত্যেকেই তো একটা স্বকীয় ধারণা, স্বকীয় মূল্যায়ন করে নিয়েছে। কুশলী উপন্যাসকার এই নিয়ত-চলমান মূল্যায়ন-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং সে ভাবেই চরিত্রের ও কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমের 'রজনী', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', বিমল করের 'অসময়' একই টেকনিক্ প্রয়োগ করে—অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের স্বগত ভাষণের মধ্য দিয়ে কাহিনী-উন্মোচন করিয়ে, ঘটনার মূল্যায়ন করিয়ে এমন শিল্পকর্ম প্রস্তুত করেছে যাতে শিল্পকর্মটি যেন মাত্র একটি কর্ম থাকছে না, পরিণত হয়েছে অনেকগুলি কর্মের সমবায়ে। লেখক কখনো কখনো নিজেই পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন। হাতের কাছে বঙ্কিমের 'সীতারাম' পেয়ে সেখান থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের গোড়ায় লেখা আছে: "রমার পীড়া। সে কথা পরে বলিব।"—দ্বিতীয় বাক্যটি লেখক স্বয়ং বলেছেন পাঠককে উদ্দেশ করে। কয়েক ছত্র পরে একটি বাক্য পাচ্ছি, "কথাটা শুনিয়া পাঠক সীতারামকে ধিক্কার দিবেন।" একটু পরে আরেকটি বাক্য পাচ্ছি: "যে লোকবৎসল ছিল, সে এখন আত্মবৎসল হইতেছে।" সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য: "হায়! এ শ্রী ত সীতারামের শ্রী নয়।" দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে এই বাক্য দিয়ে: "পাঠককে বলিতে হইবে না যে..."। —এসব বাক্যে ও বাক্যাংশে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই কাহিনীর মধ্যবিন্দুতে দণ্ডায়মান আছে চরিত্রগণ, আর এই নাট্যমঞ্চের অদূরে দাঁড়িয়ে লেখক কিছু কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন পাঠককে। করণকৌশলের, টেকনিকের এ-ও এক রীতি।

লেখককে তাঁর বর্ণিত কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা থেকে স্বতন্ত্র না করে অনেক সময়ই পাঠকেরা লেখক-ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-ব্যক্তিত্ব দুটিকে সমার্থ করেন। এই সমার্থতার প্রবলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-চরিত্র। অনেক পাঠক-সমালোচক-শিক্ষকই শ্রীকান্তই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একথা ভেবে সুখী হন। তাঁরা বোধ হয় ইংরেজ কবি ব্রাউনিং-এর একটি কবিতা স্মরণে রাখলে উপকৃত হতেন। সেক্সপীয়রের সনেট সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ একটি স্বরচিত সনেটে বলেছিলেন, With this key Shakespeare unlocked his heart! ব্রাউনিং তাঁর একটি কবিতায় এ-জবাব দিয়েছিলেন: "With this same key/Shakespeare unlocked his heart' once more!/Did Shakespeare? If so, the less Shakespeare he!" অর্থাৎ সেক্সপীয়রের সেক্সপীয়রত্ব থাকে না, তাঁর সর্বসংবেদী সর্বসৃজনী কল্পনাশক্তিকে আমরা অগ্রাহ্য করছি যখন বলি যে এই কবিতাগুলিতে তিনি বলেছেন যে সব আপন জীবনের কথা। এঁরা কীট্‌সের প্রগাঢ় বাক্য-গুলিও বুঝতে পারেননি: "As far the poetical character itself...it is not itself—it has no self—it is everything and nothing—it has no character." মহৎ স্রষ্টা সর্বকালেই তাঁর মহত্তম সৃষ্টির চেয়েও মহত্তর। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত নন। অপরপক্ষে তাঁর শিল্পকৌশল শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কল্পিত কাহিনীটিকে একটি সুন্দর পুনঃপুনরঙ্কিত নক্‌শায় পরিণত করল। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটির চারটি পর্বের প্রত্যেকটিতে সমগ্র কাহিনীর শুরুতে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ, এই সাক্ষাৎ পরিণত হয় স্বামী-স্ত্রী-সুলভ ঘনিষ্ঠতায়, কিন্তু পর্বের শেষে দেখছি দুজনের

বিচ্ছেদ, এমন বিচ্ছেদ যে মনে হয় না আবার মিলন হবে, আবার ঘনিষ্ঠতা হবে। তথাপি সে সব হল, চারবারই হল, হয়ে চারটি পর্ব সমাপ্ত হল। এ যেন অভিজ্ঞতার একটি বৃত্ত। বৃত্তটি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ছিন্ন হয়ে গেল। কিছু দিন যায়, বৃত্তটি আবার চলমান হল, অচিরেই ছিন্ন হল। এমনি করে গড়া ও ভাঙা, ভাঙা ও গড়া পুনরাবৃত্ত চক্রে একটি যেন চিত্রশিল্প অঙ্কিত হল অথবা সংগীত শিল্প অনুরণিত হল। অন্য ছন্দ পাই 'আনন্দমঠে'। মহেন্দ্র-কল্যাণী-শান্তি-ভবানন্দ-জীবানন্দ এদের নিজ নিজ জীবন এক অভাবিতপূর্ব চক্রে জড়িয়ে গেল 'আনন্দমঠে'র কল্পাদর্শে, চক্রে জড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অকুতোভয় উদ্যমে প্রবৃত্ত হল। কাহিনীর গতি, চরিত্রদের চলাচল, আদর্শের সংহতি ও শৌর্য, সবই যেন একটি হাউইয়ের মতো ঊর্ধ্বাভিসারী হল। সেই অভিসারের ফল হল প্রচণ্ড আবেগ, প্রচণ্ড সংগ্রাম, এবং এই সংগ্রামের পরিণতি হল হাউইয়ের আলো নিভে গেল, দেশ আবার বিদেশী শাসকের অনুগত হল। কিন্তু রয়ে গেল একটা অবিস্মরণীয় আদর্শ যে-আদর্শ উচ্চে উঠেছিল, কিন্তু সাধারণ জীবনের পর্যায়ে প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও আদর্শ হল না মর্যাদাভ্রষ্ট। ভূমিতল থেকে ঊর্ধ্বগতি, ঊর্ধ্বগতি থেকে অবতরণ, এই হচ্ছে 'আনন্দমঠে'র ছন্দ।

উপন্যাসের টেক্‌নিকের বস্তুতঃ কোনো যেন সীমা নেই। লেখকের কল্পনা অবশ্য মূর্ত হয়েছে ভাষার মাধ্যমে, কিন্তু সে-কল্পনা (যাবতীয় শিল্প-কল্পনার মতোই) আত্মপ্রকাশ করে কোনো না কোনো ছন্দে। সেই ছন্দের আকৃতি আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে কোনোটির উপরে হতে পারে। আমরা যেন দেখতে পাই, শুনতে পাই, ছুঁতে পাই। উপন্যাসকারের লিখন-নিপুণতা শেষ পর্যায়ে পাঠকের চিত্তে অবশ্যই একটি ছন্দবোধ জন্মাবে। ছন্দবোধ বর্জিত রচনা শিল্প নয়।

৯

বাংলা উপন্যাসের মহার্ঘতম পরিবর্তন এসেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন লেখক ও পাঠক দুজনেই কাহিনীর বহিরাঙ্গিক বৈচিত্র্যের চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হলেন চরিত্রের মনোধর্মে। অর্থাৎ বাইরের জগতের চেয়ে মনোজগতের মূল্য বেশী বলে বিবেচিত হল। এই পরিবর্তনের বড় কারণ হচ্ছে আগেকার দিনে কথক যা বলতেন তার শ্রোতা ছিল অনেকে এবং সেজন্যই তাঁর প্রভাব পড়ত একই কালে অনেক শ্রোতার উপরে। আমাদের বাংলা দেশে যখন ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণ শিল্পের প্রচলন হল, যখন থেকে কাহিনী লোকে পড়তে থাকল একাকী নিরালায়, শুনতে থাকল না একই কালে অনেকের সঙ্গে এক আসরে, জনতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সবাইর সঙ্গে একই মানসিক প্রতিক্রিয়া বোধ করল না, তখন থেকে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা অদ্ভুত মানসিক অন্তরঙ্গতা জমে উঠল (যদিও প্রত্যক্ষভাবে তাদের পরিচয় ছিল না)। এর ফলে কাহিনী কথন ও কাহিনী পঠন ক্রমেই অধিকতর সূক্ষ্ম ও প্রবল ভাবে মনোজাগতিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হতে থাকল। যখন থেকে আমরা পড়তে শুরু করলাম তখন থেকে দুটি ব্যাপার ঘটল: (ক) সাহিত্য-সম্ভোগে পাঠক একাকী, তিনি কোনো শ্রোতা-জনতার অংশ নন, তাঁর চিন্তা ও আবেগ তাঁরই; (খ) তাঁর সম্ভোগ শ্রোতার সম্ভোগের মতো ধাবমান নয়, তিনি খানিক দূর বইখানা পড়ে উপভোগের প্রাচুর্যে সমাহিত হতে পারেন, কিছুক্ষণ হয়ত পড়া থামিয়ে চোখ বুঁজে অথবা জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে, রচনাটির সঙ্গে আপনার মনের মাধুরী মেশাতে পারেন।

অর্থাৎ, সাহিত্য-সম্ভোগ বহির্মুখিতা থেকে, ঘটনা-প্রাবল্য থেকে, পরিবর্তিত হল অন্তর্মুখি-তায়, ঘটনায় নয় ঘটনার তাৎপর্যে।

এই অন্তর্মুখিতার পিছনে ছিল ঊনিশ শতকী সমাজ-সংগঠনের অনেক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তাদের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাইকলজি বিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি। নানাবিধ কারণে মানুষের জীবন অন্তর্মুখী হয়ে পড়ল এবং এই অন্তর্মুখিতা অচিরেই সাহিত্যে ও শিল্পে দুর্বার বন্যার মতো প্রবেশ করল। উপন্যাসে ঘটনা আর মুখ্য রইল না, ঘটনার তাৎপর্য বড় হয়ে উঠল। জীবনের যে সব ক্ষেত্রে ঘটনার প্রাবল্য স্বাভাবিক এবং অবধারিত, সেই সব ক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট উপন্যাস ঘটনাপ্রধান প্রাবল্য স্বাভাবিক এবং অবধারিত, সেই সব ক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট উপন্যাস ঘটনাপ্রধান রয়ে গেল, যেমন, ক্রাইম ফিক্‌শান, সায়েন্‌স্ ফিক্‌শান, অ্যাডভেঞ্চার ফিক্‌শান; কিন্তু উপন্যাসের বৃহত্তম ক্ষেত্রেই অন্তর্জগৎ বড় হয়ে গেল বহির্জগৎ থেকে। অন্তর্জগৎ-সন্ধানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট শিল্পকৌশল, যেটিকে ই. এম. ফর্স্টারের অনুসরণে ইতিপূর্বে বলেছি the point of view technique, অর্থাৎ ঘটনাগুলি যে সব চরিত্রের অন্তরে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই সব বিশেষ প্রতিফলনেই, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতেই ঘটনার মূল্য। এই নিবিড় অন্তশ্চেতনায় চরিত্রের ব্যক্তিসত্তা যতটা প্রকটিত হয়, বহিরাঙ্গিক কর্মের বিশ্লেষণে তেমনটি হয় না। ব্যক্তিসত্তার চেয়ে জটিলতর গহনতর আয়তন তো পৃথিবীতে নেই! সেই ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সন্ধান দীর্ঘকাল অবধি সাহিত্যে ও শিল্পে অনুসৃত হয়েছে ব্যক্তির বহিরঙ্গ কর্মবিচার দিয়ে, আধুনিক সাহিত্যে শিল্পে হচ্ছে ব্যক্তির মনোজগতের আবিষ্কার। কে আমি? কে তুমি?— এ হেন প্রশ্ন কেবল শঙ্করাচার্য অথবা পাল গোস্বামী অথবা অগণিত আরো অধ্যাত্মপন্থী করেছেন এমন তো নয়, এ প্রশ্ন তুলতে

পারেন সামান্য সাহিত্যিক, সামান্য পাঠকও। এই সত্যাসন্ধানেই আধুনিক অন্তর্লোকিক সাহিত্যের কীর্তি। বনফুল রচিত 'উদয়-অস্ত' নামক দীর্ঘ উপন্যাসটিতে বহু চরিত্র, বহু ঘটনা, বহু দিনের বিচিত্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে যেন একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে মৃত্যুপথযাত্রী সূর্যসুন্দরের দীর্ঘকাল-বাহী স্মৃতিতে, সূর্যসুন্দর শুয়ে শুয়ে কখনো বা দেখছেন কারা যায় কারা আসে, কখনো বা কতগুলি যুক্তি চিন্তা স্মরণ তাঁর ভাবনার প্রবাহকে এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে দেয়।

ইংরেজ সমালোচক অ্যান্টনি বার্জেস্ একটি কথা ব্যবহার করেছেন, The Novel as a River, উপন্যাস একটি নদী। সেই প্রাচীন গ্রীসে মহাপণ্ডিত হেরাক্লিটাস বলেছিলেন, সময় যেন নদী। এই শতাব্দীতে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরা বললেন, সময় যখন নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান, অতীত সময়কে যখন কোনো উপায়েই ফিরিয়ে আনা যায় না, তখন উপন্যাসকারের কর্তব্য সময়কে প্রবাহিত হতে দেওয়া তার স্বাভাবিক রীতিতে ও গতিতে। অর্থাৎ লেখক যে আজকের ঘটনা বলতে বলতে নিয়ে আসলেন পিছনের ঘটনাকেও, সেটি চলবে না। বাংলায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার এই সম্বিৎ প্রবাহকে বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন, অন্য কোনো কোনো লেখক সমগ্র কাহিনীটিকে একটি প্রবাহে পরিণত না করে অংশতঃ চরিত্রের চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য স্রোতধারার মতো করে এ‍ঁকেছেন। কখনো কখনো এই মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস পাঠকচিত্তে ক্লান্তি সৃষ্টি করে, যেমন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিকথার পরের কথা' বইটিতে।

অন্তর্জগৎকে বড় করা হয়েছে আধুনিক উপন্যাসে। এই বড় করার যুক্তি আভাবিত হয়েছে উপরে। কিন্তু বর্তমান লেখকের মনে একটি সংশয় থেকে যায়, সে-সংশয় অন্তর্জগতের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে। 'ক' নামে এক ব্যক্তির বহিরঙ্গ বহির্জীবন আমরা দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারি। কিন্তু তার অন্তরে কোন্ ভাবটি আছে সে কথা আমরা জানতে পারব কী করে, যদি না সেই অন্তর ভাবনাটির কোনো বহিঃপ্রকাশ হয়? লেখক যখন বলেন (ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ যেমন বলতেন), আমার কল্পিত চরিত্র এমন কথা ভাবছে, তার সম্বিৎ প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে এ কথা সে কথা, তখন লেখকের কথায় নির্ভর করতে পারি কি? কতদূর? চরিত্রটিই কল্পাশ্রিত। চরিত্রটির ভাবনা তো আরো কল্পাশ্রিত। এই দ্বি-স্তরী কল্পাশ্রিত জগতে যখন পাঠক প্রবেশ করেন তখন তিনি মনে করতে পারেন যে বায়ুভূত নিরালম্ব নিরাশ্রয় কোনো জগতে প্রবেশ করেছেন।

আধুনিক সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা স্থান পেয়েছে কিন্তু নিছক কল্পিত অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে পাঠকশ্রেণী খুব উৎসাহী বলে মনে হয় না। আমাদের ভাষায় কিছু উপন্যাস, লেখকের প্রসাদগুণান্বিত ভাষা সত্ত্বেও, এমনকি মূল ঘটনার আকর্ষণীয়তা সত্ত্বেও, চেরা-ফাঁড়া মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠককে উদ্বুদ্ধ করতে কৃতকার্য হয়নি।

১০

উপন্যাসের আদ্যাশক্তি অথবা মূল প্রকৃতি দ্বিধান্বিত কাহিনী-কথন-শ্রবণে চিত্তবিনোদিত হয়, সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে শ্রোতার উপলব্ধি সূক্ষ্মতর হয়, আবার প্রশস্ততরও হয়। দীর্ঘকাল অনুশীলনের পরে এই দ্বি-সত্তার প্রতিটি সত্তা সম্বন্ধে লেখক, পাঠক, আলোচক,—সবাইকেই সময়ে অবহিত থাকতে হয়। এই দ্বি-সত্তার দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে প্রখরতর সত্য-চেতনা সেটি কিছু দার্শনিক, কিছু আত্মিক চেতনা, সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেই চান যে শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতায় সত্যোপলব্ধি থাকবে, সেই সঙ্গে একটা আনন্দবোধও থাকবে। এই আনন্দদায়ী শক্তি উপন্যাসে বিরাজ করে কয়েকটি উপাদানে: কাহিনী, চরিত্র, প্লট, পরিবেশ, ভাষা,—সবাই স্বতন্ত্র আবার সবাই অন্বিত হয়ে যায় মহৎ শিল্পে। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। এর কাহিনী পাঠককে নিরন্তর উৎসুক করে রাখে; এর প্রায় প্রতিটি চরিত্র অবিস্মরণীয়, এর প্লট পরিচ্ছন্ন এবং কাহিনীর অপ্রত্যাশিত এবং চমকপ্রদ সমাপ্তির পটভূমি উজ্জ্বল-করা আলোতে কাহিনীর, চরিত্রের, কেন্দ্রীয় ভাববস্তুর যা-কিছু ঝাপ্‌সা ছিল সবই পরিচ্ছন্ন অর্থদ্যোতক হয়ে উঠল। এই উপন্যাসের ভাষা সম্বন্ধে নতুন করে বিশেষ কিছু বলার নেই, কেবল এটুকু বলা যায় যে বিষয় ও ভাষার এমন সহজ সঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও অপর্যাপ্ত নয়। পাঠকের মনে চিরন্তন ছাপ রেখে দেয় সেই দৃশ্যটি —'গোরা', ৩০ সংখ্যক অনুচ্ছেদটি—যেখানে ললিতা ও বিনয় স্টীমারে কলকাতায় ফিরছে:

> "রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ-আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে, ইহার মাঝখানে ললিতা নিদ্রিত। আর কিছু নয়—এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকে ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে। এই নিদ্রাটুকুকে বিনয় মহামূল্য রত্নটির মতো রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে।...'আমি জাগিয়া আছি, আমি জাগিয়া আছি'—এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষকুহর হইতে অভয়-শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দবাণীর সহিত মিলিত হইল।

> "ললিতা ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়াই দেখিল, অনতিদূরে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি বিনয় ওইখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে! এত নিকটে, তবু এত দূরে!...দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেই হেমন্তের প্রত্যূষে সেই অন্ধকার-জড়িত অপরিচিত নদীদৃশ্যের মধ্যে একাকী নিদ্রিত বিনয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। সম্মুখের দিক্‌প্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল; একটি অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।"

এখানে যে মূল সৃজনীশক্তি কাজ করছে সেটি হচ্ছে পরিবেশ-নির্মাণের শক্তি। কাহিনী ও প্লটের যে পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি সেখানে ললিতা ও বিনয়ের মধ্যে গভীর প্রেম সঞ্জাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা কাহিনী ও প্লট দুই-ই ব্যর্থ হয়ে যায়, চরিত্রায়ণ শিথিল হয়ে পড়ে। লেখক রবীন্দ্রনাথ এবার তাঁর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কল্পনাশক্তি এবং বাক্‌বৈভবের আশ্রয় নিয়ে সংক্ষেপে এমন অতুলনীয় কল্পচিত্র আঁকলেন যাতে কোনো বাক্‌বিনিময় না করেই এক তরুণ এক নিদ্রিতা তরুণীর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হল, নিদ্রামগ্ন তরুণী সেই তরুণেরই সত্তার সঙ্গে একাত্ম হল এবং সেই নির্বাক অথচ গভীর একাত্মতা সম্ভব হল এক বিশেষ পরিবেশে,—নক্ষত্রখচিত আকাশ, অবসিত রাত্রির অন্ধকার-জড়িত আবছায়া, চলমান স্টীমার, প্রবহমান নদীজলের মৃদু-ধ্বনি। ইংরেজীতে যাকে 'সেটিং' বলে, যে 'সেটিং' ছাড়া কোনো মহৎ শিল্প সম্ভব নয়, সেই 'সেটিং'-এর মহিমায় রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ভাষা শিল্পের মাহাত্ম্যে ললিতা-বিনয় সম্পর্কটি সম্পূর্ণতা অর্জন করল। বেশ কয়েক বছর আগে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় গল্প ও কবিতার সম্পর্কে চারজন তরুণ কাহিনীকারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, এই মন্তব্যগুলির দুটি কথা (আসলে একই কথা) খুব নতুন কিছু না হলেও প্রণিধানযোগ্য বলে আমার মনে হয়েছে। (১) 'সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে আজকাল অনুভূতির প্রাধান্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়' (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়)। (২) 'আজ ছোটগল্প চরিত্রগত ভাবেই কবিতার মত অন্তর্মুখী, এক জাতীয় আত্মজিজ্ঞাসার নামান্তর। আজকের গল্পের নিয়মাবলী পাল্টে গিয়ে অনেক বেশী সাবজেক্‌টিভ হয়ে উঠছে' (বরেন গঙ্গোপাধ্যায়)।[৪]

অন্তর্মুখিনতা, কাব্যধর্মিতা দুই-ই আধুনিক উপন্যাস শিল্পে প্রবেশ করেছে এবং করছে। অন্তর্মুখীন সাহিত্যে আধুনিক মানুষের কতকগুলি মনোবিকলন (যেমন, স্বাভাবিক সমাজ-সঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, অতএব নিঃসঙ্গতা, অতএব নিরন্তর ভীতি), কতকগুলি বিশেষ ধরনের চিন্তাপথ (যেমন অস্তিত্ববাদ—যদিও এই অস্তিত্ববাদী পন্থা প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংস্থাপনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, আবার সম্পূর্ণ নিরীশ্বরতার দিকেও নিতে পারে) ঘুরে-ফিরে আসছে, প্রতীচ্যের সাহিত্য প্রায় পঁচাত্তর বছর যাবৎ, আমাদের সাহিত্যে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ।

জীবনানন্দ লিখেছিলেন,

> ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
> *　　　*　　　*
> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধভিড়—অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
> যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
> মানুষের লালসার শেষ নেই;

তবুও জীবনানন্দই লিখেছেন, "একটি কুষ্ঠকলঙ্কিত নারী/কেমন আশ্চর্য গান গায়;/বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়।"

অর্থাৎ, নেতিবাদ জীবনবীক্ষার চরম কথা নয়, অস্তিবাচক উক্তি ও প্রত্যয় জীবনে আছে, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে আছে, গোড়া থেকে আজ অবধি ছড়িয়ে আছে। বিস্তৃত তালিকা দেওয়া এখন সম্ভব নয়, আবশ্যকও নয়। বাংলা উপন্যাসের বহু জায়গায় যে অস্তিপ্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে (যদিও উপন্যাসকারেরা যথেষ্টই জানেন, কত কালিমা কত কদর্য গ্লানি স্তূপীকৃত হয়ে আছে পৃথিবীতে) তার প্রকৃতিটি পাঠকের সামনে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করব। এই অস্তি-প্রত্যয়, সত্তা-বোধ, নেতিকে ডিঙিয়ে অস্তিতে পৌঁছনো আমরা বঙ্কিমেই দেখতে পাই (এর প্রকৃষ্ট প্রকাশ 'আনন্দমঠে') রবীন্দ্রনাথে তো পাই-ই, বিশেষতঃ 'গোরা' স্মরণে আনে সে-গ্রন্থের ৭৬ অনুচ্ছেদে এবং পরিশিষ্টে অতুলনীয় সদর্থক প্রত্যয় বিধৃত হয়েছে: "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

এই জীবন-প্রত্যয়ের সঞ্জীবনী স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই সকল সার্থক সৃষ্টিকর্মে। বিভূতি-

ভূষণ, তারাশংকর, মনোজ বসু থেকে আরম্ভ করে বিমল মিত্র ও অন্যান্য সমকালীন লেখকের রসোত্তীর্ণ রচনা এই প্রত্যয়ের প্রভায় সমুজ্জ্বল।

বাংলা উপন্যাসে, তার প্রথম আবির্ভাব থেকে আজ পর্যন্ত, আদর্শবাদিতার, অনবশেষ অস্তি-প্রত্যয়ের অভাব নেই; যে অস্তিপ্রত্যয়ের জন্য সারা বিশ্বের সাহিত্য-পাঠক শ্রদ্ধা করেন টলস্টয় এবং গোর্কিকে, ভিক্তর ইয়ুগো এবং রোম্যাঁ রলাঁকে, টমাস মান্ এবং হের্মান হেস্‌সেকে, পৃথিবীর আরো অনেক সার্থক উপন্যাসকারকে। উপন্যাসে উদ্দীপনাময়ী অস্তিপ্রত্যয় ভাস্বর হয়ে ওঠে পাঠকের অন্তশ্চক্ষে; কত ঝঞ্ঝা কত ব্যর্থতা, কত পতনের পরেও মানব ধর্ম ভোলে না যে তার ধর্মের অন্তরে নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে 'চরৈবেতি' এবং মানবকে এগোতেই হবে অদূরাগত সর্বসিদ্ধি পূর্ণতার দিকে; সেই অস্তিপ্রত্যয় বাংলা উপন্যাসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সঙ্গে এক শ্রেণীতে আসন দিয়েছে।[৫]

নির্দেশিকা

বাংলা ভাষায় 'উপন্যাস' শব্দটির প্রয়োগ ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, কবে থেকে ইংরেজী 'নভেল' শব্দটির প্রতিশব্দ বোঝাতে থাকল বাংলা 'উপন্যাস' শব্দটিতে, সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত অভিধানে 'উপন্যাস' শব্দের প্রথম প্রয়োগের কোনো সন তারিখ নেই, বাংলা শব্দটির কোনো ঐতিহ্য দেওয়া নেই, দেওয়া আছে পূর্বসূরি হিসাবে কালিদাস, অমরুশতক ও শারীরিক ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে ("বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা", দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ২৫, পাদটীকা) কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে (দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধ, "ভারতবর্ষ" পত্রিকা, ১৩৪৯, বৈশাখ) ভূদেব .মুখোপাধ্যায়-রচিত একটি দুই খণ্ডী গ্রন্থ ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল "ঐতিহাসিক উপন্যাস" এই শিরোনামায়, সেখানেই "উপন্যাস" শব্দটির প্রথম মুদ্রিত প্রয়োগ পাওয়া যায়। আমার প্রশ্ন যে প্রথম মুদ্রিত প্রয়োগের পূর্বেই কবে থেকে 'উপন্যাস' শব্দটিতে অধুনা নিত্য প্রচলিত একটি বিশেষ সাহিত্য প্রকার বোঝাল? ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়োগের ঠিক এক শতাব্দী পূর্বে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে 'নভেল' শব্দটির পূর্বে 'দি' বসিয়ে একটি সাহিত্যপ্রকার বোঝাতে থাকল যদিও 'দি'হীন নভেল শব্দটি ইংরেজী ভাষায় যুক্ত হচ্ছিল ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই: 'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশিওনারি' দ্রষ্টব্য। বাংলায় 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) গ্রন্থটির প্রথম দুই সংস্করণের আখ্যাপত্রে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই তারিখের কিছু পূর্বেই যে বাংলা ভাষায় 'উপন্যাস' শব্দটি তার আধুনিক অভিধা অর্জন করেছিল সে বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশের অব্যবহিত পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রিকায় (১৯২৭ সংবৎ=১৮৬৯ খ্রীঃ, ৫৭ খণ্ড, পৃ ১৪২):

"বহুকালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতার মনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশ সিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ক এক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত-প্রেতের পরিবর্তে মানুষিক ঘটনায় উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং কয়েকখানি সুচারু পুস্তকও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইংরাজীর প্রকৃত নভেলের পারিপাট্য লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবু সেই অনুরাগের অনুরাগী; এবং ইংরাজী উপন্যাস লেখকের মধ্যে স্কটনামা একজন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পর পর তিনখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহাতে তিনি সর্বতোভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন; অধিকন্তু যে কেহ ঐ তিনখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তেঁহ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার রচনা চাতুর্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতা লাভ করিয়াছে।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এই প্যারাতে, উপন্যাস ও পরে গল্পবিন্যাস এই দুটি মূল্যবান

শব্দ পাই। এর পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'রজনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র 'উপন্যাস' শব্দটি ব্যবহার করেন ("এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে...")। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অভ্যন্তরে বঙ্কিমচন্দ্র তিনবার—দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদে দুবার, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, একবার 'নবেল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর কয়েক বৎসর পরে প্রকাশিত 'রাজসিংহ' (১৮৮২) গ্রন্থের প্রাক-উপসংহার পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বলেছেন, "তারপর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসবেত্তার অধিকার, উপন্যাস লেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।" 'উপন্যাস' শব্দটির বহুলতম প্রয়োগ হয়েছে 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসে। অষ্টম পরিচ্ছেদে তৃতীয় প্যারাতে 'কথা' শব্দটি দশবার প্রযুক্ত হয়েছে; তার মধ্যে একবার বলা হয়েছে "কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা।" সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রামচাঁদ বলেছে, "গল্প কথা নয় ত?" উত্তরে শ্যামচাঁদ বলেছে, "এ কি আর গল্প কথা?" গ্রন্থের একেবারে শেষে এই সংলাপটি আছে:

রাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা,
উপন্যাস মাত্র।
শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস,
তার ঠিক কি?

মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শব্দের অর্থ অমরুশতকের "অলীক বচনোপন্যাস" বিশেষণটি মেনে নিয়েছিলেন। 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও উপন্যাসের অভিধা সম্বন্ধে অতীব মূল্যবান কথা বলেছেন।

২ এ বিষয়ে আমার ইংরেজী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: 'Bengali writing in English', *A History of Bengal*, ed. by N K. Sinha, p. 518

৩ জাঁ মালাকেইয়ের "দ্র জোকার" নামক উপন্যাসমালার আমি সমালোচনা লিখেছিলাম 'চতুরঙ্গ', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬১, পৃ ৭৫-৭৬। সেই সমালোচনায় এই বিভ্রান্ত অন্তর্জগৎ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

৪ 'চতুরঙ্গ', শ্রাবণ, ১৩৭৩, পৃ ১১৪, ১১৭।

৫ যদিও আমার আশা যে এই প্রবন্ধ আমি ইতিহাস-সচেতন ভাবেই লিখেছি, তাহলেও বাংলা উপন্যাসের ইতিবৃত্ত রচনার কোনো অভিপ্রায় নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুলনীয় গ্রন্থের পরে নতুনভাবে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস রচনার কোনো প্রয়োজন আপাতত নেই বলে আমার বিশ্বাস। উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনায় আমি কয়েকখানা বই পড়েই উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দেবীপদ ভট্টাচার্য—'উপন্যাসের কথা'; অচ্যুত গোস্বামী—'বাংলা উপন্যাসের ধারা'; কার্তিক লাহিড়ী—'বাংলা উপন্যাসের রূপকল্প ও প্রযুক্তি'; সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'; গোপাল হালদার—'উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি' (পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত); গোপিকানাথ রায়চৌধুরী—'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'।

সমাপ্ত।

বাংলা গদ্যের দুই শতাব্দী

নির্মাল্য আচার্য

১

ছাপাখানা ও ছাপার উপযোগী আল্‌গা হরফ তৈরি হওয়ার সঙ্গে বাংলা লিখিত গদ্যের ব্যাপক প্রচলনের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। যে সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক কারণে মুদ্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হয় সেই কারণ ও পরিবেশই গদ্যভাষার প্রসারে সহায়তা করে থাকে। তার আগে গদ্য নিশ্চয়ই মানুষের মুখের ভাষা, এমন কি কিছু-কিছু ব্যবহারিক কাজকর্মেও তার প্রয়োগ দেখা যায়—কিন্তু কখনোই তা সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি।

বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের নিদর্শন কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে—'শূন্যপুরাণে'র ভাঙা পদ-বন্ধে, প্রাচীন চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, মনুষ্য ক্রয়-বিক্রয় পত্রে, বৈষ্ণব দলিল ও সহজিয়া পুথিতে, পোর্তুগিজ পাদ্রিদের উদ্যোগগুলির মধ্যে? আবার, উনিশ শতকের আগে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক প্রয়োগই বা দেখা যায়নি কেন?—এসব বিষয় আপাতত আমাদের বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক।

উনিশ শতকে প্রধানতঃ বিদেশীদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক চর্চার সূত্রপাত হয়। এর পিছনে ছিল উপস্থিত বাস্তব প্রয়োজন। একদিকে, মিশনারিদের খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও এদেশীয় মানুষের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা—যাতে শ্রীরামপুর মিশনের দান স্মরণীয়। অন্যদিকে, ইংরেজ রাজপুরুষ ও বণিকদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখতে দেশীয় ভাষাগুলিতে ভাব বিনিময় ও কাজকর্ম চালানো দরকার হয়ে পড়ে। তাই নিজেদের শিক্ষার প্রয়োজনেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮০০)। উপরোক্ত দু'টি প্রয়োজনে উনিশ শতকের সূচনায় অনুবাদ-গ্রন্থ ও পাঠ্যবই লেখানোর উদ্যোগ ঘটে।

১৮০০ থেকে ১৮৩২ পর্যন্ত শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন ছাপাখানায় চীনা ভাষাসহ প্রায় চল্লিশটি ভাষায় বই ছাপা হয়েছিল। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে তখন বাংলা নিশ্চয়ই প্রাধান্য পায়, কারণ এই অঞ্চলটিই ছিল ইংরেজদের মূল ঘাঁটি। এখান থেকেই ব্যাপক খ্রীস্টধর্ম প্রচার এবং প্রলম্ব ঔপনিবেশিক অধিকার ও স্বার্থ বজায় রাখতে ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়েছিল বৈদেশিক পাদ্রি ও শাসন-কর্তৃপক্ষ। আর শুধু নিজেদের নয়, প্রজাদেরও 'দীক্ষিত' করার প্রয়োজন ছিল। আইন-আদালতের নিয়ম-কানুন নির্দেশ, আইনের অনুবাদ, কথোপকথন চালানোর উপযোগী ব্যবহারিক সংকলন-গ্রন্থ, ব্যাকরণ-অভিধান-শব্দকোষ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল বিদেশীরা আরো আগে থেকেই। সংস্কৃতভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে যে এদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ

সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করা যাবে, তা-ও বুঝতে তাদের অসুবিধা হয়নি। রাজপুরুষদের মধ্যে কোনো কোনো দূরদর্শী ব্যক্তি দেশ-শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের চরিত্রশোধনের জন্য নীতিশিক্ষা ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে পেরেছিলেন।

এ সবের মধ্যেই আমায় নানা বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয় এবং মোটামুটি অষ্টাদশ শতকের শেষ-দিক থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বিদেশীদের কারো কারো মনে উদিত হয়েছিল। এটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে তথাকথিত 'ভারততত্ত্ব' ও ভারত প্রেমের সূচনা দেখা দেয়।

নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষকেও কিছু পরিমাণে 'শিক্ষিত' হওয়ার সুযোগ দান ইংরেজ-দের স্বার্থেই অপরিহার্য হয়ে উঠল। তার কিছু বিলম্বিত ফল উনিশ শতকে বাঙালী ভদ্রলোকের 'নবজাগরণ'। এই শতকের গোড়া থেকেই আমাদের সমাজে নানা ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দেয় ও সমাজের ওপরতলায় একটা আলোড়ন ঘটতে থাকে। সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম-আন্দোলন, নীতিপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলা সাহিত্যের 'আধুনিক' পর্বের সূচনা—এ সমস্তই সম্মিলিতভাবে ঘটতে থাকে।

এ সবের ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ খুব দ্রুত ঘটতে পেরেছিল। পারিপার্শ্বিকের চাপ ও উপস্থিত প্রয়োজনবোধ ছাড়িয়ে কাজ চালাবার গদ্য ধীরে ধীরে সাহিত্যের বাহন হয়ে দেখা দিতে শুরু করল। ইতিমধ্যে 'ব্যক্তি'র জাগরণ ঘটেছে, পরিবেশের প্রতিক্রিয়া তাকে চিন্তায় ও চিন্তা-প্রকাশে উন্মুখ করছে। এই সময়ে কলকাতায় অসংখ্য সভা ও সমিতি গড়ে ওঠে, সেখানে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হয় এবং তা প্রস্তাব, প্রবন্ধ, বিতর্ক, বক্তৃতা ইত্যাদি নানা মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। এইসব রচনা প্রকাশেরও উদ্যোগ দেখা দেয়। পাঠ্যবই ও অনুবাদের বাইরে এটি একটি স্বতন্ত্র ধারা।

অন্যদিকে সাময়িকপত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রতিটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক-একদল লেখক তাঁদের লেখনী চর্চা শুরু করেন এবং তাঁদের সমবেত প্রয়াস ও আদর্শ এক-এক স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়ে দেখা দেয়। সাময়িকপত্রের চরিত্রও নানাভাবে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং এসব পত্রিকায় লেখকদের রচনা ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত গদ্য-সাহিত্যের স্পষ্ট চেহারা নিতে লাগল। উপন্যাস, জীবনী, নক্‌শা ইত্যাদির পাশাপাশি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য একটা মৌলিক রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল।

এইখান থেকেই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের আলোচনা মৌলিক ও সাহিত্য-গুণান্বিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় মৌলিক গ্রন্থের সন্ধান পাওয়াই কঠিন, সাহিত্যগুণের কথা আসছে তার পরে। এই সঙ্গে এটাও দেখা যাবে যে এ যুগে বেশ কিছু রচনা আছে যা সঠিক অনুবাদ নয়, 'অনুসরণ'। সেক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কথা ততটা না ভেবে রচনারীতির কথাই ভাবতে হবে। প্রসঙ্গতঃ বাংলা গদ্যগ্রন্থের ইতিহাসে মৌলিকতার সন্ধানে আমাদের সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম-পর্বে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

২

পাঠ্যবই আমাদের আলোচনার বাইরে হলেও বাংলা গদ্যের পরবর্তী স্বভাব-নির্ণয়ে ফোর্ট উইলিয়ম-পর্বে প্রকাশিত তিনটি মৌলিক পুস্তিকার উল্লেখ করা যেতে পারে: রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'রাজাবলি' (১৮০৮)। এর মধ্যে 'রাজাবলি' কতখানি মৌলিক তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু এই বইগুলির মধ্যে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে বাঙালীর দৃষ্টি আধুনিক যুগের গোড়া থেকেই ইতিহাসের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম ও অধ্যাত্মচেতনা থেকে তা মোড় ফেরাতে শুরু করেছে বাস্তব ইতিহাস-চেতনার দিকে।

এই বইগুলির উল্লেখ করা হল এদের ভাষা ও রীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি জরুরী কথা বলে নিতে। রামরাম বসু ফারসী নবিস মুন্‌শী, তাঁর ভাষায় ফারসী শব্দের বাহুল্য এবং তা তখনকার মানুষের ব্যবহারিক গদ্যের কাছাকাছি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁর ভাষারীতিতে সংস্কৃতের প্রাধান্য। আর রাজীবলোচনের ভাষায় বিশেষত্ব কিছু না থাকলেও শুধু বলা চলে তা বেশ সহজবোধ্য। মোটামুটি বলা চলে, তখন বাংলা গদ্যে ফারসী ও সংস্কৃত পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ মিশনারি ও 'ভারত প্রেমিক'দের প্রশ্রয়ে শেষপর্যন্ত বাংলা গদ্যে সংস্কৃত প্রভাবের পরিমাণই বাড়তে থাকে। হলহেড, কেরী প্রমুখেরা প্রথম থেকেই এতে ইন্ধন দিয়েছিলেন। এর ফল বাংলা গদ্যের পরবর্তী চরিত্রগ্রহণে সবসময় শুভজনক হয়েছিল বলা চলে না। সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘদিনের মৌখিক রীতির স্বাভাবিক গতি ভাষাবিবর্তনে যে সম্মত রূপ নিচ্ছিল তাকে জোর করে 'মুসলমানী' রীতি পরিহারের নামে সংস্কৃত ভাষার অলংকৃত পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে প্রবাহিত করার ফল, কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, আজ

পর্যন্ত আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

নিছক ঐতিহাসিক ভূমিকা ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ব্যবহৃত গ্রন্থমালার মূল্য বাংলা গদ্যের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিষ্প্রাণ ভাষা, ত্রুটিপূর্ণ পদ-বিন্যাস, অনুপ্রাসের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, যতিচিহ্নের অভাব, সমাসবদ্ধ পদের ক্রমাগত ব্যবহার, অলঙ্কারের কৃত্রিমতা, জগা-খিচুড়ি শব্দে ভারাক্রান্ত এই পর্বের বাংলা গদ্য পরবর্তী সাহিত্যিক সম্ভাবনার পথকে সামান্যই উন্মুক্ত করেছিল।

এই সমালোচনাটুকু অনিবার্য হয়ে পড়লেও এবং ভালো বা মন্দ যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, এই যুগের অন্তত একজনের রচনায় কিছুটা নিজস্ব রচনাশৈলী বা স্টাইলের ছাপ পড়েছিল—যা থেকে নির্ধারিত হতে পারে বাংলা গদ্যভাষার একটা স্বতন্ত্র চরিত্র। তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। তাঁর ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা হলেও আখ্যানমূলক রচনায় অনেকটা সাবলীল। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), ও 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) সম্পর্কে তা বলা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ও দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩)-তে নানা ধরনের ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সব দিক থেকেই 'রাজাবলি' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। আর খ্রীষ্টধর্মের প্রতিরোধে যেহেতু রামমোহন লেখনী চালনা শুরু করে দিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই এবং প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'বেদান্ত-গ্রন্থ' (১৮১৫), মৃত্যুঞ্জয় কেরী সাহেবের সমর্থন নিয়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' (১৮১৭) গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ফলে রাম-মোহন-মৃত্যুঞ্জয় বিতর্কে প্রমাণিত হতে শুরু হয়েছে যে বেদান্ত দর্শনের কঠোর শাস্ত্রীয় বিচারের ভারবহনে বাংলা গদ্য সক্ষম হয়ে উঠেছে।

তবে বাংলাগদ্যে রামরাম বসু নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের ধারাই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়, এই তথ্যটিই এখানে মূল্যবান। অপর পক্ষে বলা চলে, বিদ্যাসাগরের আগে এই মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেই একটা রচনাশৈলীর পরিচয় ফুটে উঠেছিল।

বাংলা গদ্যকে স্বাধীন বিচরণভূমিতে এনে দেওয়ার কৃতিত্ব রামমোহন রায়ের। তিনি ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভালো জানতেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক কালে বাংলা গদ্যের আলাদা চরিত্রটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বইটিতে সেই যুগের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রসর চিন্তার পরিচয় মিলবে। তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থগুলির কথা আমরা তুলছি না। যদিও সেখানে তিনি সংস্কৃত থেকে দুরূহ শাস্ত্রাদি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে দেখিয়েছিলেন যে গুরুতর তত্ত্বকথাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা যায়।

রামমোহনের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১ম, ১৮১৮; ২য়, ১৮১৯), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' (১৮২৩), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩) ইত্যাদি। নামগুলি থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে গ্রন্থগুলি সমাজ সংস্কার ও ধর্মমত খণ্ডনমূলক বিতর্ক। অধিকাংশই প্রশ্নের জবাব বা আলোচনার প্রতিবাদ।

রামমোহন ব্রহ্মবাদী ও একেশ্বরবাদের প্রচারক। তিনি একাধারে রক্ষণশীল হিন্দু ও বিদেশী খ্রীষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হয়ে পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্যে বিতর্কমূলক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। রামমোহন সাহিত্য সৃষ্টি করতে আসেননি, যে-কাজ করতে এসেছিলেন তার প্রেরণা আলাদা। আর সে-প্রেরণার মধ্যে ছিল তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদী মন। পাঠকের যুক্তিবোধের কাছেই তাঁর আবেদন, তিনি হৃদয়গত আবেদনের দিকে যাননি। তা ছাড়া শাস্ত্রকে নির্ভর করেই তিনি তাঁর যুক্তির অস্ত্রগুলি সাজিয়েছিলেন। সব থেকে বড় কথা, তাঁকে তাঁর নিজের ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছিল। তাই রামমোহনের গদ্যভাষা ও আলোচ্য বিষয় মননহীন ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় দুর্বোধ্য মনে হতে পারে।

সমাজ সংস্কার ও প্রতিপক্ষের ধর্মমত খণ্ডনেই তাঁর সব উদ্যোগ ব্যয়িত হয়েছিল। আর সে কাজ তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। নতুন যুগের সংবাতময় ভাবাদর্শ প্রকাশে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সামনে কোনো অনুকরণীয় আদর্শ তখন পর্যন্ত ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধারাটিকে অনুসরণ করার মতো লেখক এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সকলকেই রামমোহনের কাছে ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে।

অনুবাদ থেকে মৌলিক রচনাতেই রামমোহনের গদ্য অনেকখানি প্রাঞ্জল ও সহজ। তাঁর ভাষার বলিষ্ঠতা ও নৈয়ায়িক স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। আজকের বিচারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আড়ষ্ট মনে হলেও সেই যুগের বিচারে তাঁর গদ্যে যথেষ্ট স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর ভাষায় পরিহাস-রসিকতার পরিচয়ও আছে; যেমন, 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' ও 'চারি প্রশ্নের উত্তর'-এ। তবে সর্বদাই তাঁর বাক্‌ভঙ্গিতে একটা সংযত ও সুরুচির ভাব আছে।

প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রামমোহনকে নিরত লড়াই করতে হয়েছে—ভট্টাচার্য, গোস্বামী, তর্কপঞ্চাননরা তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করতে সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি, মৃত্যুঞ্জয়ও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'য় মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেননি। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পাষণ্ড পীড়নে' প্রচুর কটূক্তি করেছেন, কিন্তু তার উত্তরে লেখা 'পথ্যপ্রদানে' রামমোহন অনেক সংযত ও শোভন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ করলেও তাঁর মধ্যে সৌজন্যবোধের অভাব কখনো দেখা যায়নি।

রামমোহন রায়

বিদ্যাসাগর

এ পর্যন্ত পাঠ্যবই এবং ধর্ম ও শাস্ত্রবিচারমূলক গ্রন্থাদিতে মৌলিকতার সন্ধান করা গিয়েছে। কিন্তু এই বিষয়গত সীমা পেরিয়ে রীতিমতো প্রবন্ধ-সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করতে হবে সাময়িকপত্রের বিবর্তনের মধ্য থেকে। ইতিমধ্যে সাময়িকপত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রসঙ্গের অবতারণা সম্ভব হওয়ার উপযোগী সামাজিক পরিবেশ তৈরি হতে শুরু হয়েছে। এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি একটা মোটামুটি চেহারা নিয়েছে তার সদ্য-বিগত ভাব-সংঘাতের আকস্মিকতা থেকে এবং জন্ম নিয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। তাই এবার দেখতে হবে বাংলা গদ্যে সাহিত্যিক সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হল প্রত্যক্ষভাবে কাদের দ্বারা, কেমনভাবেই বা বিষয়গত বৈচিত্র্য দেখা দিতে শুরু করল এবং বাংলা গদ্যভাষা কখন থেকে দ্বিধামুক্ত হয়ে ব্যাপক ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়ে দাঁড়াল।

বাংলা গদ্যরচনার বিষয়বৈচিত্র্যের প্রমাণ মিলবে লং সাহেব সঙ্কলিত ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকা থেকে। সামান্য অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে ইচ্ছে হয় যে বর্তমানে বাংলা গদ্য প্রধানতঃ 'সাহিত্য'-কেন্দ্রিক, কিন্তু গত শতকের সূচনা থেকেই দেখা গিয়েছিল নানা বিদ্যা ও তত্ত্ব বাংলা গদ্যে লিখিত ও আলোচিত হচ্ছে। সেগুলিকে চিরদিন বাংলাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরা হয়েছে। সে-তুলনায় আজকে গদ্যসাহিত্যের সীমা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে অনেকখানি।

সাময়িকপত্রগুলির মধ্যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনে সব থেকে বড় ভূমিকা পালন করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), অন্তত 'বিবিধার্থসংগ্রহ' পত্রটি 'বঙ্গদর্শনে'র আগের যুগে। আর 'তত্ত্ববোধিনী'র আগে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' (১৮৩১)।

'তত্ত্ববোধিনী'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চিন্তাশীল লেখকদের আবির্ভাবের সূত্রপাত এখান থেকেই। এই পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত সম্প্রদায়-গত ধর্মীয় প্রচার থেকে পত্রিকাকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী ও জ্ঞানমার্গের পথিক। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার একটা সমন্বয় ঘটেছিল।

'তত্ত্ববোধিনী'তে মতাদর্শ বা বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিল। ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ—সব বিষয়েই মননশীল রচনা এতে প্রকাশিত হত।

অক্ষয়কুমার নিজেই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন। ১৮৪১ থেকে ১৮৮৩ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ বছরে তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার সংখ্যা ৯, এর মধ্যে তিনটি আবার একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত। তিনি নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ ও ইতিহাস—সবরকম বিষয় নিয়েই লিখেছিলেন।

এখানে বলা দরকার, অক্ষয়কুমারের একাধিক গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রচলিত ছিল—যেমন, তিন খণ্ডের 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থবিদ্যা'। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বলতে যে ফরমায়েসি রচনার কথা আমাদের মনে হয়, এগুলি তা থেকে আলাদা। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও এগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রচনাই অক্ষয়কুমারের নিজস্ব রীতিতে লেখা মৌলিক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য পেয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

অক্ষয়কুমার দত্ত

আরো একটা কথা। অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মূলে কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থ রয়েছে বলে সেগুলিকে কেউ কেউ অনুবাদ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। যেমন, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের দুটি খণ্ডের (১৮৫১, ১৮৫৩) ভিত্তিতে আছে জর্জ কুম্ব-এর 'দি কনস্টিটিউশান অফ ম্যান' (১৮২৮) এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' দুখণ্ডের (১৮৭০, ১৮৮৩) মূলে উইলসনের 'স্কেচ অফ দি রিলিজিয়াস সেক্‌টস অফ দি হিন্দুজ' নামে দু'টি ভাগে লেখা (১৮২৮, ১৮৩২) এক প্রবন্ধ, যেটি একত্রে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল ১৮৪৬-এ। 'চারুপাঠ' তিন খণ্ডের কোনো কোনো লেখার আদর্শ অক্ষয়কুমার পেয়েছেন ইংরেজী রচনা থেকে, যেমন, এই বইয়ের 'স্বপ্নদর্শন'বিষয়ক রচনাগুলির ভিত্তিতে আছে 'স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত জোসেফ অ্যাডিসনের একাধিক রচনা। অক্ষয়কুমারের 'ভূগোল' (১৮৪১) ও 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) গ্রন্থ দুটির কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অক্ষয়কুমারের কোনো রচনাকেই 'অবিকল অনুবাদ' বলা চলে না। হয়ত ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক অনুবাদ, আংশিক অনুসরণ—কিন্তু মূলতঃ এগুলি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। ক্ষেত্রবিশেষে প্রেরণা বা সূত্র হিসাবে কাজ করলেও অন্যের রচনার সঙ্গে ঐগুলির প্রায় কোনো মিল নেই। আবার একটি আদর্শ অনুসরণ করলেও ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর রচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলের উপর নব সংযোজন। তা না হলে 'বাহ্যবস্তু'র পরিপূরক হিসাবে তিনি তাঁর 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) প্রকাশ করতেন না। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে, এই গ্রন্থে অক্ষয়কুমার যে নীতি প্রচার করতে চেয়েছেন তা আধুনিক বিচারেও প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত হতে পারে।

অক্ষয়কুমারের শেষ ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' গোটা পরিকল্পনায় উইলসনের প্রভাবের পরিমাণ খুব বেশী নয়। গুণ ও পরিমাণগত শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াও এই গ্রন্থে অক্ষয়-

কুমারের ইতিহাস ও সমাজচেতনা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বদেশ-প্রীতি যুগপৎ সক্রিয় হয়ে গ্রন্থখানিকে বাংলা মননশীল সাহিত্যের প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে।

বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে অক্ষয়কুমার সচেতন ছিলেন। বাংলা গদ্যের অনুশীলনে তিনিও বিদ্যাসাগরের মতোই প্রাঞ্জলতার পক্ষে ছিলেন। বিশেষতঃ প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার ফলে তাঁর ভাষায় যাথার্থ্য ও পরিমিতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। বিবিধ দুরূহ বিদেশী শব্দের পরিভাষা তৈরিতে তাঁর দান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রধান কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিন্তু বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর খ্যাতি চাপা পড়েছে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের খ্যাতির আড়ালে। তাঁর যা-কিছু নিজস্ব রচনা সবই ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক, কেবল তাঁর স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯৮) এবং আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে লেখা পত্রাবলীতে তাঁর সাহিত্যবোধ ও সংবেদনশীলতার সার্থক পরিচয় আছে।

দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই মূলতঃ ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা বা উপদেশ। এর অনেকগুলিই প্রকাশিত হয়েছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' পাতায়। এই জাতীয় রচনার সংকলন 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১) তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টি করতে আসেননি, অথচ তাঁর আলোচনাগুলিতে সাহিত্যধর্মী সৃজনশীলতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তিনিও রামমোহনের মতো একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি ও প্রকাশের ভঙ্গি পৃথক ছিল। তাঁর রচনায় হৃদয়গত আবেদনের প্রাধান্য। তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় এক ভাবুক ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব। অবশ্য সে-পরিচয় তাঁর আত্মজীবনী ও পত্রাবলীতে সবচেয়ে সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলা গদ্যের সেই নির্মাণ-পর্বে তৎসম শব্দে আচ্ছন্ন জটিল ভাষারীতির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ একটা মৌলিক আত্মময়তার স্তরে তুলে দিতে পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব গদ্যকে। গদ্যের এই ভঙ্গি নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। আজ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের গদ্যভাষার আবেদন অম্লান রয়েছে।

সত্যিকার ভাষাশিল্পী বলতে যা বোঝা যায় তার পরিচয় আমরা পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা গদ্যের যাবতীয় ত্রুটি ও অসঙ্গতি দূর করে তিনি গদ্যের ভবিষ্যৎ পথটি বেঁধে দিলেন। তাঁর হাতে ভাষার মাত্রাজ্ঞান ও শিল্পসুষমা যুগপৎ ফুটে উঠল। যথাযথ বিরামচিহ্ন যুক্ত হয়ে গদ্যভাষা তার ধ্বনি ও ছন্দের লালিত্য নিয়ে উপস্থিত হল।

অথচ বিদ্যাসাগর মূলতঃ সাহিত্যস্রষ্টার ভূমিকায় না থেকে অধিকাংশ রচনাতেই পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ও অনুবাদক। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ্। এই উভয়বিধ দায়িত্ববোধই তাঁর রচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সাহিত্যিকের মধ্যে যে বিশেষ এক ধরনের 'আত্মকেন্দ্রিকতা' থাকে, তা তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ব্যাপক অর্থে মানবতাবোধই তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করলেই তাঁর রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় সহজে। তিনি একই সঙ্গে পণ্ডিত, রসগ্রাহী, যুক্তিবাদী ও সংবেদনশীল।

বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই পাঠ্যপুস্তক, তা-ও আবার সংস্কৃত, হিন্দি বা ইংরেজীর অনুবাদ বা অনুসরণ। তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ-গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা চলে: 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), দু-খণ্ড 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), দু-খণ্ড 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১, ১৮৭৩) এবং বিদ্যাসাগর চরিত—স্বরচিত (১৮৯১)।

বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গোটা ভারতে সম্ভবতঃ সাহিত্য-ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। এতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ চিহ্নিত করে দেওয়া তাঁর রচনাভঙ্গিতে ছিল না, যুক্তির দ্বারাই তিনি বিচার করেছেন। হয়ত সে-বিচারে কোথাও কোথাও নৈতিকতার ছাপ পড়েছে, কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণে মৌলিকতার বিস্ময়কর নিদর্শন আছে।

সমাজ-সংস্কার বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী উদ্যোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ প্রথা রোধের সপক্ষে তাঁর রচনাগুলিতে শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ যেমন আছে, তেমনি বুদ্ধিবাদের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। বিরুদ্ধপন্থীদের কটূকাটব্য অনায়াসে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর রচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন স্বচ্ছ সততার আলোয়। তাঁর সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল চেতনা তাঁর রচনাকে একটা অত্যাশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা দিয়েছে।

৪

সব ইতিহাসের মতো সাহিত্যের ইতিহাসেরও একটা পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা আছে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সেই ধারার অর্জিত সম্পদ রক্ষা ও বহন করে নিয়ে চলেন সমবেতভাবে—এক-এক যুগের লেখকগোষ্ঠী। ব্যাপারটা যান্ত্রিক বা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না—ঘটে সম্মিলিত ও স্বাভাবিক

ছন্দে। যদিও আমরা একজনের পর আর-একজন লেখকের কথা আলোচনা করছি, কিন্তু ইতিহাস সেই ক্রম গ্রহণ করে না। কার প্রভাব কার উপর পড়ছে, কে এনেছেন নতুন একটা অভিব্যক্তি বা ভাবাদর্শের তরঙ্গ, তা গভীরভাবে বিচার করা দরকার।

একটা নতুন ভাবস্রোত রচনা করতে কম করে একজন বঙ্কিমচন্দ্র বা একজন রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা দরকার হয়। গোটা ইতিহাসের পটে ওঁরাও কিন্তু অনেক অসম্পূর্ণতা ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের সমবেত যোগফল। এ'দের আগে বা পরে যা-কিছু চেষ্টার প্রবাহ চলতে থাকে, সেখানে শুধুই গতানুগতিক বিবরণ ও ভাষ্যদান অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন লেখকমাত্রেই আদর্শবাদী, দেশপ্রেমিক ও গভীর চিন্তাশীল—কখনো পন্ডিত ও বহু ভাষাবিদ্, কিন্তু দুরূহ বিষয়কে সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারেন, পান্ডিত্য তাঁদের সৃষ্টির রসহানি করে না—কখনো তাঁদের রচনায় মৌলিকতা ও প্রসাদগুণ ফুটে ওঠে, ইত্যাদি ধরনের অভিধায় সমালোচক ও ঐতিহাসিক তাঁদের ভূষিত করতে থাকেন।

এসব কথা মনে রেখে এরপর আমরা এমন কয়েকজন গদ্যলেখকের কথা আলোচনা করব যাঁরা একক ও সমবেতভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের মূলগত প্রেরণাকে ধারণ ও বহন করে নিয়ে গেছেন। যেমন, একজন লেখকের কথা এই অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করছি, যিনি নিজে লেখক হিসাবে যত না কৃতিত্বের দাবি করতে পাবেন, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী দাবি করতে পারেন সেই যুগের লেখকদের মধ্যে একটা নতুন ভাবপ্রেরণা সঞ্চার করার কৃতিত্বে। তিনি রাজনারায়ণ বসু।

নতুন যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ রাজনারায়ণ স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গল কামনায় সদাচিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর চারপাশে অনেকের মধ্যে এনে দিয়েছিলেন একটা স্থায়ী আদর্শ-বাদ। মাইকেল মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ থেকে কত-না তরুণ ও প্রবীণ রাজ-নারায়ণের কাছে প্রেরণা লাভ করেছেন। সমাজ ও ধর্মচেতনায়, শিক্ষা ও সাহিত্যে এবং স্বাদেশিকতা ও রাষ্ট্র-চেতনায় তিনি তাঁর যুগকে বিরাটভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হিন্দুমেলা ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে তাঁর ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

রাজনারায়ণ ছিলেন শিক্ষাব্রতী, বাগ্মী ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। ব্রাহ্মধর্মে নতুন চেতনা সঞ্চারে তিনি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম সামাজিক কল্যাণবিধানে স্বনির্ভর কর্মপরায়ণতার পথ স্বজাতিকে দেখালেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৬১, ১৮৭০)। সামাজিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল তাঁর 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪)। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) ও 'আত্মচরিত' (১৯০১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত'ও লিখেছিলেন (১৮৭৬)। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮)-এ তুলনামূলক সাহিত্য বিচার পদ্ধতি এবং নতুন ধারায় সংক্ষেপে সাহিত্য-ইতিহাস রচনার সার্থক পরিচয় পাই। রাজনারায়ণের বক্তৃতা বা রচনায় তাঁর গদ্যরীতির প্রাঞ্জলতা ও রসবোধের বৈশিষ্ট্যই বড় হয়ে ওঠে।

হিন্দুকলেজে সহপাঠী ছিলেন রাজনারায়ণ, মাইকেল মধুসূদন ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এ'দের মধ্যে ভূদেবের চিন্তাধারায় কিছুটা রক্ষণশীলতার ছাপ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যেও বড় হয়ে উঠেছে সমাজকল্যাণ ও স্বাজাত্যবোধ। তিনিও ছিলেন শিক্ষাব্রতী। বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'এডুকেশন গেজেট' তিনি পঁচিশ বছরেরও বেশী সম্পাদনা করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে মননশীল প্রবন্ধকার হিসাবে ভূদেবের স্থান সুচিহ্নিত হয়ে আছে। শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়েই তিনি লেখনী চালনা করেছেন। গ্রন্থাকারে তাঁর প্রবন্ধ-সংকলনগুলির মধ্যে বিখ্যাত: 'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬), 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৫) এবং দু-খণ্ডে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৫, ১৯০৫)।

পারিবারিক, সামাজিক ও আচারগত নীতিনির্দেশ নিয়েই ভূদেব বেশী উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাঁকে সাহিত্য-সমালোচকের ভূমিকায় দেখা যায়। উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমের আগেই সচেষ্ট হয়েছিলেন, অবশ্য সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ইতিহাস-কৌতূহল।

ভূদেবের রচনায় সহজচিন্তার ছাপ সর্বত্র। ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব থাকলেও তাতে জটিলতা ছিল না। তাঁর ভাষা ও রচনারীতিতে লালিত্যেরও অভাব ছিল না। আর তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর কথা ধরলে বলতে হয়, বঙ্কিমের আগে এই ক্ষেত্রে তাঁর মতো ভাবনা-বৈচিত্র্য আর কোনো লেখকের মধ্যে দেখা যায়নি।

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা হিন্দু কলেজের অপর এক ছাত্র

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভূমিকা খুব বড় নয়, কিন্তু গোটা গদ্যসাহিত্যে তিনি একটা নতুন আধুনিকতার আমেজ এনে দিয়েছিলেন। ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে তিনি সবরকম শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং গদ্যকে যতটা সম্ভব কথ্যভঙ্গির কাছাকাছি আনার চেষ্টাই তাঁর অনেকখানি কৃতিত্ব। এমন কি সাধারণ ঘরের মহিলারাও যাতে বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে পারেন এজন্যে রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যুগ্মভাবে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন—'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)।

প্যারীচাঁদের নিবন্ধজাতীয় রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) ও 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯)। এর মধ্যে রামারঞ্জিকা' সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে লেখা নীতিমূলক রচনা। আকর্ষণীয়ভাবে নারীজাতির আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক জীবন সম্পর্কে নীতি-নির্দেশই এর লক্ষ্য। 'যৎকিঞ্চিৎ' সহজ আখ্যানমূলক রীতিতে লেখা ঈশ্বর তত্ত্বমূলক দার্শনিক রচনা। 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'য় প্রাচীন মহীয়সী নারীদের জীবন-মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্যারীচাঁদের ভাষা সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। আখ্যানমূলক ভঙ্গি যেখানেই গ্রহণ করেছেন সেখানেই তিনি নানা ধরনের ভাষা ব্যবহারের সাহস দেখিয়েছেন, কিন্তু গুরুতর বিষয় নিয়ে লেখাগুলিতে সংস্কৃত শব্দবহুল সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। মোট কথা, তাঁর গোটা সাহিত্য-জীবন থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যে কথ্য ও সাধু রীতির দ্বন্দ্ব সূচিত হয়।

এইখানে আমরা কয়েকজনের কথা সংক্ষেপে বলে নিতে চাই, যাঁদের কৃতিত্ব গদ্য সাহিত্যে গ্রন্থ প্রকাশের পরিমাণ দিয়ে করা যাবে না, অথচ যাঁরা বলিষ্ঠভাবে এই ধারাকে প্রভাবিত করে গেছেন। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আগে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে একটা নতুন পথ দেখিয়েছিল। এই পত্রিকায় শিক্ষানবিসি করেছেন অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্তের 'কবিবর 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' (১৮৫৫) এবং পরবর্তী কালে প্রকাশিত বিভিন্ন কবি-জীবনী বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

'সংবাদ প্রভাকর' ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) সাহিত্যধর্মী বিষয়ের পরিবেশনে অগ্রসর হয় এবং 'বঙ্গদর্শনে'র আগে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রঙ্গলাল, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু প্রমুখ লেখকের গ্রন্থাদির সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। কালীপ্রসন্ন সিংহও এখানে নিয়মিত গ্রন্থ সমালোচনা করতেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আর একখানি পত্রিকা 'রহস্য সন্দর্ভ'। সচিত্র এই মাসিকপত্রে নানা কৌতূহলোদ্দীপক রচনা প্রকাশিত হত। রাজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ ইংরেজীতে পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসের স্বনামধন্য লেখক ছিলেন। তাঁর নিজের পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত না হওয়ায় বাংলা মনন সাহিত্যে তাঁর ভূমিকা আজও অনির্ণীত রয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক চেতনা ও যুক্তিবাদ তাঁর রচনাকে বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেছে। সংস্কৃত-ঘেঁষা হলেও ভাষাব্যবহারে তিনি সংস্কার-মুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিক পদ্ধতি ও ইয়োরোপীয় সাহিত্য-বিচারের আদর্শ যুগপৎ গ্রহণ করেছিলেন।

সাহিত্য-সমালোচনার প্রসঙ্গে এখানে স্মরণ করা যায় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বীটন সোসাইটিতে পঠিত তাঁর বিতর্কমূলক রচনা 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২) বাংলায় প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব থাকলেও বাংলা কবিতার পক্ষে এই অসামান্য পুস্তিকাটিতে রঙ্গলালের ব্যাপক সাহিত্যবোধ কাজ করেছে।

৫

সমালোচনা সাহিত্যে বলিষ্ঠ ও স্থির আদর্শ প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারার সমালোচনা-রীতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল মৌলিক জীবন-জিজ্ঞাসা ও শিল্পবোধ। বস্তুনিষ্ঠ, সৃজনমূলক, তুলনাত্মক—সবরকম সমালোচনাই তাঁর লেখনীতে সার্থক হয়েছে। দীনবন্ধু, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ, সঞ্জীবচন্দ্র থেকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্ভার তাঁর মননশীল সমালোচনায় নতুন এক সত্যতা পাঠকদের উপহার দেয়। বঙ্কিম-প্রতিষ্ঠিত সমালোচনার মান আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আদর্শ হয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক বলা যায়। প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক হলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী স্রষ্টা। সাহিত্য ও ভাবের জগতে তিনি প্রায় একটা নতুন আন্দোলন এনেছিলেন। তাঁর

সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা বাঙালীর মনন সাধনায় বিপ্লব এনেছিল। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী তাঁদের বিচিত্র সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন রবীন্দ্র-যুগ পর্যন্ত।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমের দান নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু প্রবন্ধ-গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করতেও বিস্তৃত পরিসর দরকার। প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করেননি। আর সেটা কোনো নির্লিপ্ত অ্যাকাডেমিশিয়ানের মতো করেননি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর রচনা তাঁর গভীর আদর্শবাদ, দেশপ্রেম ও দার্শনিক দৃষ্টির সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত।

১৮৭২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত বঙ্কিমের প্রবন্ধ রচনার কাল। 'লোকরহস্য'-'কমলাকান্ত'-'মুচিরাম' জাতীয় রচনার কথা বাদ দিলে নিছক প্রবন্ধ-গ্রন্থ হিসাবে তাঁর রচনা হচ্ছে: 'বিজ্ঞান-রহস্য' (১৮৭৫), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬-৮৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ, ১৮৮৭; ২য় ভাগ, ১৮৯২) এবং 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮)। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী দুটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও রচনারীতির বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যাবে বঙ্কিম গোটা বাংলা গদ্য সাহিত্যের কাঠামোটাই বদলে দিয়েছেন। গদ্যকে তিনি যেমন ইচ্ছে গড়ে নিয়েছেন, ভাষা তাঁর আজ্ঞাবাহী হয়ে বিচিত্র বিষয় প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠেছে। বিষয় অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার বঙ্কিমের সম্পূর্ণ দখলে এবং এই প্রথম পরিপূর্ণ অর্থে গদ্য-রীতি বা স্টাইল গড়ে উঠতে পারল। বঙ্কিমের নানা প্রবন্ধ থেকে সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বেরিয়ে আসে, যা তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী লেখকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বঙ্কিমের হাতেই গদ্যসাহিত্য সাবালকত্ব পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর রচনায় বিষয়-গৌরব ও প্রকাশরীতি একই সঙ্গে পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ও রসবোধকে স্পর্শ করতে সক্ষম।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিভার আলোচনা থেকে বিরত হয়ে আপাতত আমরা দেখতে পারি তাঁর চিন্তা ও আদর্শ কেমনভাবে সে যুগে অন্য লেখকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

আগে আমরা একবার উল্লেখ করেছি যে বাংলা গদ্যসাহিত্য আজকের তুলনায় সেযুগে নানা বিচিত্র বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ ছিল। গদ্য-প্রবন্ধকাররা সকলেই নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এসব গদ্য-নিবন্ধের গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরিমাণ কম ছিল না।

বঙ্কিম-যুগে সবাই বঙ্কিম-পন্থী ছিলেন না এবং সবাই তাঁর 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকও ছিলেন না। কিন্তু সেযুগে প্রায় এমন কোনো লেখক পাওয়া যাবে না যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত নন। অধিকাংশ লেখকই লিখেছেন—ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য ও সমালোচনা, ধর্ম-সমাজ-দর্শন নিয়ে। তবে এক-একজন কমবেশি এক-একটা ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

বিবিধ বিষয়ে লেখনীচর্চা করলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রধান আগ্রহ ছিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে। তিনি 'বঙ্গদর্শন' 'আর্যদর্শন', 'নব্যভারত', 'সাহিত্য', 'নারায়ণ' ইত্যাদি বহু পত্রিকায় লিখেছেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল তাঁর এবং এদিক দিয়ে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ধারার অনুসারী। কিন্তু আদর্শ ও ভাষারীতিতে তিনি বঙ্কিম-অনুগামী। ১০ম-১১শ শতকের সপ্তগ্রাম নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস 'বেনের মেয়ে' 'আর্যদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

হরপ্রসাদের প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভারত মহিলা' (১৮৮০), 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (১৯৪৬), 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯৪৮)। তাঁর জীবিতকালে অধিকাংশ রচনাই পত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ ছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সতেরটি প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত 'বৌদ্ধধর্ম' তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-গ্রন্থ। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর মতো পণ্ডিত আজও দুর্লভ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ও সমালোচনায় তিনি অতি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। *পুরাবৃত্ত, দর্শন বা তত্ত্ব যা নিয়েই তিনি লিখেছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য রচনার প্রাঞ্জলতাকে গ্রাস করতে পারেনি।*

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে অনুশীলনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রামদাস সেন। বঙ্কিমের প্রেরণায় তিনি 'বঙ্গদর্শনে' এবিষয়ে লিখতে শুরু করেন। এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো তিনি ইংরেজীতে লেখেননি, লিখেছেন বাংলায়। অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর আগ্রহের নিদর্শন আছে। তিন খণ্ড 'ঐতিহাসিক রহস্য' (১৮৭৪-৭৯), 'ভারতরহস্য' (১৮৮৫) ও 'বুদ্ধ-দেব' (১৮৯১) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। যুক্তিনিষ্ঠা, তথ্যানুরাগ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে পুরাবৃত্তে আকর্ষণ ছিল রজনীকান্ত গুপ্তেরও। কিন্তু তা নিয়ে শুরু

করলেও তিনি চেয়েছিলেন আধুনিক ইতিহাস লিখতে। সাত খণ্ডে লিখিত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' বাংলা সাহিত্যে খুবই প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এ ছাড়া 'জয়দেব-চরিত' (১৮৭৩), 'পাণিনি' (১৮৭৫), 'ভারতকাহিনী' (১৮৮৩) ইত্যাদি এঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ইতিহাস ও জীবনী—এই দুই ক্ষেত্রেই রজনীকান্ত গুপ্ত সেযুগে সফল হয়েছিলেন।

ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ বাঙালির ক্রমেই বাড়ছিল। এই ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিক চেতনার আত্মপ্রকাশের পথ মিলেছিল। এই ধারার লেখক হিসাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রামপ্রাণ গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম করা যায়।

এরপর আমরা দুজন গদ্যলেখকের কথা বলতে চাই, যাঁরা দুটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ('বান্ধব') ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ('আর্যদর্শন')। ঢাকা থেকে 'বান্ধব' ও কলকাতা থেকে 'আর্যদর্শন' একই বছরে (১৮৭৪) প্রকাশিত হতে শুরু করে 'বঙ্গদর্শনের' সহযোগী হয়ে উঠেছিল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ফারসী, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিনটি ভাষাই জানতেন কিন্তু তাঁর গদ্য বিদ্যাসাগরের অনুসারী। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকার হিসাবে তাঁর বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর 'নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৯), 'প্রভাতচিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃতচিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথচিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি একসময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সমাজ কল্যাণের কথা চিন্তা করেই তিনি এসব চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থগুলিতে তাঁর গভীর ভাবদৃষ্টির পরিচয় আছে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি একটু আবেগপ্রবণতা দেখিয়েছেন। শেষজীবনে তাঁর রচনায় আধ্যাত্মিকতার প্রভাব পড়েছিল।

আর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রধানতঃ ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিপুরুষের জীবনীকার। তখন সমাজে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটছে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশপ্রেমিক পাশ্চাত্য মনীষীর জীবনী রচনায় মন দিয়েছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, ওয়ালেস প্রমুখের জীবনী ছাড়াও 'প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্রমালা' (১৮৮৩), 'সমালোচনা মালা' (১৮৮৫), 'চিন্তাতরঙ্গিণী' (১৮৯০) ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে জাতিগঠনের চিন্তা। যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে নাম করা যায় সত্যচরণ শাস্ত্রীর। সত্যচরণ স্বদেশীয় দেশপ্রেমিকদের জীবনী অবলম্বন করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন তাঁর হিরো।

'বঙ্গদর্শনের' লেখক হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

অক্ষয়চন্দ্রকে বঙ্কিমের ভাবশিষ্য বলা চলে। 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থ সমালোচনা ও রসরচনা লেখায় খ্যাতি পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর রচনা বঙ্কিমের 'কমলাকান্তে'ও স্থান পেয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র নিজেও দুটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ও মাসিক 'নবজীবন'। সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি সবকিছু নিয়েই তিনি লিখেছেন। 'সমাজ সমালোচন' (১৮৭৪), 'সনাতনী' (১৯১১), 'কবি হেমচন্দ্র' (১৯১২), 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) ইত্যাদিতে তাঁর রসবোধ ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে। তাঁর অতি সুখপাঠ্য আত্মকথা 'পিতাপুত্র' সংকলিত হয়েছিল বিখ্যাত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে। অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যেও স্বাদেশিক চেতনা ও বাংলা সাহিত্যপ্রীতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অথচ সাধারণভাবে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ প্রাচীনপন্থী ব্যক্তি।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের সুহৃদ ছিলেন, বহুভাষাবিদ এই লেখক 'বঙ্গদর্শনে' অনেক মূল্যবান ও সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। গবেষণা ও ইতিহাস চর্চার দিকে তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল। কবিতা লিখলেও তাঁর খ্যাতি আজকের বিচারে প্রবন্ধকার হিসাবে। তাঁর 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫) মননশীল প্রবন্ধ সংকলন রূপে আজও বিখ্যাত হয়ে আছে।

'বঙ্গদর্শনে' আর একজন বহুভাষাবিদ্ লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজকৃষ্ণের মতোই প্রফুল্লচন্দ্রেরও গদ্যভাষায় আভিজাত্য থাকলেও তা হৃদয়গ্রাহী হতে পারেনি। 'বাল্মীকি ও তৎসময়সাময়িক বৃত্তান্ত' (১৮৭৬), 'গ্রীক ও হিন্দু' (১৮৮৪), তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। নৃ-তত্ত্ব ভিত্তিক 'গ্রীক ও হিন্দু'-ই তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা, তবে তা পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'পালামৌ' রচয়িতা বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উল্লেখ অপরিহার্য। 'বঙ্গদর্শনে' এই অভিনব ভ্রমণকাহিনীটি প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনী নেই, অথচ বর্ণনা ও অনুভূতির এমন মনোরম প্রকাশ বাংলাসাহিত্যে রচনাটিকে ক্লাসিকের মর্যাদা দিয়েছে। সঞ্জীবচন্দ্রের মানসিকতাও ছিল কথাসাহিত্যিকের। তাঁর রোমান্টিক উপন্যাস ও আখ্যান-

গুলি তার চিহ্ন বহন করছে। প্রথমে 'ভ্রমর' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করলেও বঙ্কিমের পরে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার ভার তাঁর উপরই পড়ে। 'যাত্রা' (১৮৭৫), 'সংকার' (১৮৮১), 'বাল্য-বিবাহ' (১৮৮২) তাঁর প্রাবন্ধিক রচনা। তাঁর রচনায় কবিত্ব, মৌলিকতা ও শিল্পনৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিমাণ বেশী না হলেও সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বঙ্কিম-যুগেও এক স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারে।

বঙ্কিম-যুগে সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনাকর্মে যাঁরা বিশেষভাবে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতি।

পূর্ণচন্দ্র বসু ভারতীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহিত্য আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর 'কাব্যসুন্দরী' (১৮৮০), 'সাহিত্যচিন্তা (১৮৯৬), 'কাব্যচিন্তা' (১৯০০) ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর রসবোধ ও বিচারশক্তির পরিচয় আছে। হিন্দুধর্ম ও সমাজ নিয়েও তিনি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে 'সমাজচিন্তা' (১৮৮২) ও 'সমাজতত্ত্ব' (১৯০২) বই দুটির উল্লেখ করা যায়। তবে দক্ষ সাহিত্য সমালোচক হিসাবেই পূর্ণচন্দ্রের খ্যাতি রয়ে গেছে।

চন্দ্রনাথ বসু ধর্মতত্ত্ব, সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে একযোগে মাথা ঘামিয়েছেন। তাঁর রচনায় এইসব নানা চিন্তা ভালভাবে সমন্বিত হতে পারেনি। সাহিত্যতত্ত্বমূলক 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর রচনাগুলি 'বঙ্গদর্শন,' 'প্রচার', 'নবজীবন', 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। 'ফুল ও ফল' (১৮৮৫), 'হিন্দু বিবাহ' (১৮৮৭), 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২) ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর দার্শনিক যুক্তিবাদী চরিত্রের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের' লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের প্রেরণাতেই সাহিত্য সৃষ্টিতে অবতীর্ণ হন। নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' গ্রন্থসমালোচনা ছাড়া তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সারস্বতকুঞ্জ' ও 'স্ত্রীচরিত্র' উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম ছিল এক সময়ে। 'পাক্ষিক সমালোচক' নামে পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর বেশীর ভাগ সমালোচনাই গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত, শুধু 'সাহিত্যমঙ্গল' (১৮৮৮) বইটি উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থ আছে। তাঁর আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্রের চিন্তাধারার তুলনামূলক বিচার এই জাতীয় আলোচনার পথ দেখিয়েছিল। এইখানেই তাঁর মৌলিকতা।

বঙ্কিমের সমসাময়িক বীরেশ্বর পাঁড়ে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'আর্যদর্শনে'র লেখক ছিলেন। তিনি নিজেও কয়েকটি পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। তাঁর রচনায় স্বাধীন চিন্তার ছাপ আছে। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য-সমালোচনা সবকিছু নিয়েই প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি—যেমন, 'মানবতত্ত্ব' (১৮৮৩) ও 'ধর্মবিজ্ঞান' (১৮৯০)। কিন্তু তাঁর সব থেকে বিখ্যাত গ্রন্থ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭)— এতে নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্য 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস' নিয়ে তাঁর সমালোচনা পাই। তবে উদার সাহিত্যচিন্তার চেয়ে এতে প্রকাশ পেয়েছে হিন্দুর রক্ষণশীল মনোভাব অধিক পরিমাণে।

'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। নাটক ও উপন্যাস রচনা করলেও গদ্যসাহিত্যে তাঁর একটা স্বতন্ত্র স্থান আছে। 'সংবাদপ্রভাকর' ও 'গ্রাম-বার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাদ্বয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। গদ্যে ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, জীবনচরিত তিনি কম লেখেননি। তাঁর গদ্যেও বঙ্কিমী যুগধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। কারবালার কাহিনী নিয়ে তিন পর্বে লেখা 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৪-৯০) বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে আছে। তাঁর আত্ম-জীবনী ছাড়া 'বিবি খোদেজার বিবাহ', 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ', 'হজরত বেলালের জীবনী', 'মদিনার গৌরব' ইত্যাদিতে তাঁর গদ্যরচনার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় সুস্পষ্ট।

এবার আমরা কয়েকজন লেখকের কথা উল্লেখ করছি যাঁরা ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তাকে একটা সাহিত্যিক স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে এঁদের দানকে অস্বীকার করা যায় না। এই ধারার একজন বিস্মৃত লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম ও তত্ত্বমূলক কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে তাঁকে পাই। তবে সাহিত্যগুণে তাতে প্রায় শূন্য। খৃষ্টধর্ম ও মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি আত্মপ্রত্যয় ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর রচনাকালের সময়ে আগে-পরে বাংলা গদ্যের এতসব লেখক এলেও তাঁদের প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর 'উপদেশ কথা' (১৮৪০) ও 'ষড়দর্শন' (১৮৬৭) ইত্যাদি ছয়-সাতটি প্রবীণ গ্রন্থে গাম্ভীর্য ও অনড় ভাষারীতিই লক্ষ্য করায়।

অথচ এই ধারার পরবর্তী সময়ে আর যে কয়েকজন লেখক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে তত্ত্বালোচ-

নায় উদ্ভাবনা ও সাহিত্যিক মানসিকতার পরিচয় যথেষ্টই ফুটে উঠেছে। বিষয়গত বৈচিত্র্যও তাঁদের রচনায় দেখা গেছে। এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ।

কেশবচন্দ্র সেন

স্বামী বিবেকানন্দ

কেশবচন্দ্র সেন প্রধানতঃ বক্তা ও ধর্মব্যাখ্যাতা। তাঁর উপদেশাত্মক রচনার ভাষা সহজ ও সরল। এগুলি পরে লিপিবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'ব্রহ্মোৎসব' (১৮৬৮), 'আচার্যের উপদেশ' (১৮৭০), 'দৈনিক প্রার্থনা' (১৮৮৪-৮৮) ইত্যাদিতে তাঁর প্রকাশভঙ্গি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর প্রচারিত 'সুলভ সমাচার' পত্রিকা (১৮৭০) সহজেই জনপ্রিয় হয়েছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম বিশিষ্ট ধর্মাচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী উপন্যাস রচনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপদেশ ও প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে 'বক্তৃতাস্তবক' (১৮৮৮), 'ধর্মজীবন' (১৯০১), 'প্রবন্ধাবলি' (১৯০৪) ইত্যাদিতে। তাঁর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' (১৯০৪) এবং 'আত্মচরিত' (১৯১৮) একাধারে সে-যুগের সমাজ ও ইতিহাসের নির্ভর-যোগ্য দলিল। শিবনাথের মধ্যে সাহিত্যিক সৃষ্টিশীলতা ছিল, তার প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধাত্মক রচনার মধ্যেও পাই।

একই ব্যাপার দেখি স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। তাঁর কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্র পৃথক ছিল এবং তিনিও ছিলেন প্রধানতঃ বাগ্মী। তবে তাঁর মধ্যে ধীর যুক্তি ও সবলতা ছিল। বাংলাগদ্যে বিবেকা-নন্দের দান সামান্য নয়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫) এবং 'ভাববার কথা' (১৯০৭) রচনাগুলিতে সাধু ও চলিতভাষা প্রয়োগে তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমাদের আগেই আলোচনা করা উচিত ছিল। কারণ, তাঁর রচনার ভাবগভীর দার্শনিকতা বাংলা তত্ত্বমূলক আলোচনার পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি মূলতঃ দার্শনিক। 'তত্ত্ববোধিনী', সাপ্তাহিক 'হিতবাদী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। 'ভ্রাতৃভাব' (১৮৬৩), চার খণ্ডে 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-৬৯), দু-খণ্ডে 'আচার্যের উপদেশ' (১৯০০-০২), 'গীতাপাঠ' (১৯১৫), 'নানা চিন্তা' (১৯২০), 'প্রবন্ধমালা' (১৯২০), 'চিন্তামণি (১৯২২) ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা ও প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গি লক্ষণীয়। তাঁর রচনায় একটা ধ্যানমগ্নতা যেমন দেখা যায় তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে পরিহাস-প্রিয়তাও পাওয়া যায়। অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির উপর তিনি বেশী জোর দিয়েছেন, কিন্তু যুক্তি ও মনন থেকে তা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি।

চন্দ্রশেখর বসু অধিকাংশ রচনাই লিখেছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'নবজীবনে'। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

নিয়ে তাঁর লেখাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি' (১৮৭৫), 'বেদান্ত প্রবেশ' (১৮৭৫), 'সৃষ্টি' (১৮৭৫), 'হিন্দুধর্মের উপদেশ' (১৮৮৪), 'বেদান্তদর্শন' (১৮৮৫), 'পরলোকতত্ত্ব' (১৮৮৫) ও 'প্রলয়তত্ত্ব' (১৮৮৬)। ফারসী ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী চন্দ্রনাথ চিন্তাশীল প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

৬

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-যুগের লেখকদের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার মধ্যে আমরা আপাতত প্রবেশ করছি না। 'ভারতী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়)', 'সবুজপত্র' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে অসংখ্য লেখক রবীন্দ্র-যুগ পার হয়ে অতি-আধুনিক যুগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন। বাংলা-গদ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধর্মিতা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মননশীলতা এবং প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর 'সবুজপত্রের' নাগরিক বৈদগ্ধ্যের নবসূচনাও আজ পুরনো হয়ে এল।

প্রমথ চৌধুরী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এক রবীন্দ্রনাথেই সবকিছুর পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। বাংলা গদ্য তার সবটুকু শক্তি ও সীমা-বদ্ধতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রূপ পেয়েছে। তাঁর সমসাময়িক যুগ তাঁর দ্বারা সজ্ঞানে প্রভাবিত হয় এবং পরবর্তী যুগ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাব ও ভাষাকেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে-অর্ধজ্ঞানে বহন করে চলে। তিনি গদ্য লিখেছেন কবির মতো। পরবর্তীকালে অনেক কবিই গদ্যচর্চা করতে গিয়ে নিজেদের কবিসত্তার কাছে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। একালেরও অনেক কবি সম্পর্কেই সে কথা বলা চলে। কিন্তু একজন কবির ভাষা ও প্রকাশক্ষমতার সত্যিকার পরিচয় বেরিয়ে আসতে পারে তাঁর গদ্যরচনা থেকেই, এ কথাটা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পাঠপঞ্জী

De, S. K. *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, 1962
অধীর দে। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, ১৯৬২
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলাসাহিত্য, ১৩৬৩
——বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, ১০৮২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৭৭
নবেন্দু সেন। গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭১
মনোমোহন ঘোষ। বাংলা গদ্যের চার যুগ, ১৯৪২
শিপ্রা লাহিড়ী। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য, ১৯৭৬
সজনীকান্ত দাস। বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ১৩৫৩
সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৬৮
সুকুমার সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৭০
—বাংলা সাহিত্যে গদ্য, ১৯৪১

ছোটদের জন্য বই

লীলা মজুমদার

প্রায় দু'শ বছর আগে প্রথম বাংলা হরফে ছাপার কাজ শুরু হয়। অবশ্য তখনই ছোটদের জন্য কোনো বই বা পত্রিকা ছাপাও হয়নি, ছাপার কথা কেউ ভাবতেও পারত না; কারণ ছোটদের জন্য আলাদা করে কোনো লেখার পরিকল্পনাও তৈরি হয়নি, তার উপযুক্ত ভাষাও গড়ে ওঠেনি। আসল কথা হল ছোটদের জন্য যে আলাদা বইয়ের প্রয়োজন থাকতে পারে, এ-কথাও কারো মনে হয়নি।

ছোটদের জন্য প্রথম বাংলা বই ছাপা শুরু হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। মনে হয় তার আগে ছোটদের খেলার বই বা পড়ার বই, কোনোটাই ছিল না। পাঠশালার পণ্ডিতরা লিখতে, পড়তে, অংক কষতে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে শিখিয়ে দিতেন। অন্য বইয়ের অভাব সেরকম বোধ করতেন না। ঐ বছর শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনারিরা তাঁদের নিজেদের ছাপাখানায় কিশোরপাঠ্য প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তার নাম ছিল 'দিগ্‌দর্শন', তার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান। রস পরিবেশনের কথা উদ্যোক্তারা ভাবেননি। তাঁদের মধ্যে জশুয়া মার্শম্যানের ছেলে জন ক্লার্ক মার্শ-ম্যানের নাম করতে হয়। রচনা প্রায় সবই ইংরেজী থেকে অনুবাদ, তবে কিছু মৌলিক লেখাও ছিল। রাজা রামমোহন রায় কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সাধারণতঃ এর কিছু দিন পরে প্রকাশিত 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকার অন্যতর সম্পাদক কৃষ্ণধন মিত্রকেই প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ রচয়িতা বলা হয়।

শিক্ষা দেওয়াই যখন প্রধান উদ্দেশ্য, তখন 'নীতিকথা', 'হিতোপদেশ', 'ইতিহাসমালা' ইত্যাদি গ্রন্থই যে প্রথম প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রথম এ জাতীয় বই ছাপতে আরম্ভ করেন, তারপর কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে কাজ শুরু করেছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই ধরনের আরো অনেকগুলি বই প্রকাশিত হল; এগুলিকেই ছোটদের জন্য লেখা বাংলার প্রথম সাহিত্যের বই বলে ধরা হয়। তখনো পাঠ্যপুস্তক আর সাহিত্যের বইয়ের মধ্যে এইটুকুমাত্র তফাৎ ছিল যে পাঠ্যপুস্তকে বড় বেশী নীরস তথ্য আর নীতিকথা থাকত; সাহিত্যের বইতে গল্প ও জীবনী ইত্যাদির ছিল প্রাধান্য।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য রচনার উপযুক্ত সহজ বিশুদ্ধ বাংলা তিনিই প্রথম লিখে-ছিলেন। যদিও তাঁর 'কথামালা', 'চরিতাবলী' ইত্যাদিকে 'পাঠ্যপুস্তক' আখ্যাই দিতে হয়, তবু সাহিত্য রচনায় কেমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে, এই ধরনের গুটিকতক বইতে তিনি তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর 'আখ্যান মঞ্জরী'তেও গল্প লেখার মুনশিয়ানা আছে। অবশ্য গল্পগুলি

মৌলিক নয়, বিদেশী কাহিনী।

আমরা ধরে নিয়েছি সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই হল কাল্পনিকতা আর সরসতা। তার সঙ্গে সততা ও মৌলিকতা। কিন্তু শুধু এই ক'টি গুণ দিয়েই সাহিত্যরচনা সম্ভব হয় না, ভাষার বনেদ যদি গড়ে না ওঠে। বিদ্যাসাগরের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষামূলক নানান্ পত্রিকা আর প্রকাশিত বইয়ের মধ্য দিয়ে একটা সহজ, সাবলীল, ছোটদের বোধগম্য বাংলা ভাষা দানা বেঁধেছিল। এর আগে কোনো যতিচিহ্নের ব্যবহার পর্যন্ত ছিল না। ছাপা লাইনের শেষে বাক্য শেষ হল বুঝতে হত। তারপর দাঁড়ি এল; কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতি চিহ্ন, জিজ্ঞাসার চিহ্ন, একে একে সব এসে ভাষাকে আরো অনুধাবনযোগ্য করে তুলল। ক্রমে একথাও সকলে মেনে নিলেন যে বাংলা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা; তার নিজস্ব একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ আছে; সংস্কৃতের সন্তান হয়েও সে সাবালকত্ব পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের জাদুস্পর্শেই এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়েছিল।

সৃষ্টিকর্ম প্রসঙ্গে—তা সে যে রকম সৃষ্টিই হোক না কেন, সাহিত্য সঙ্গীত নৃত্য বা চিত্র-কলা—অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলে তা চলবে না:

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধাতী ভারতী কবের্জয়তী।

নিয়মের মধ্যে ধরা মানুষের চেষ্টা, নতুন বর্ণে, নতুন-নতুন ছন্দে বয়ে চলল নিয়মের সীমা ছাড়িয়ে ঠিক ঠিকানার বাইরে।"

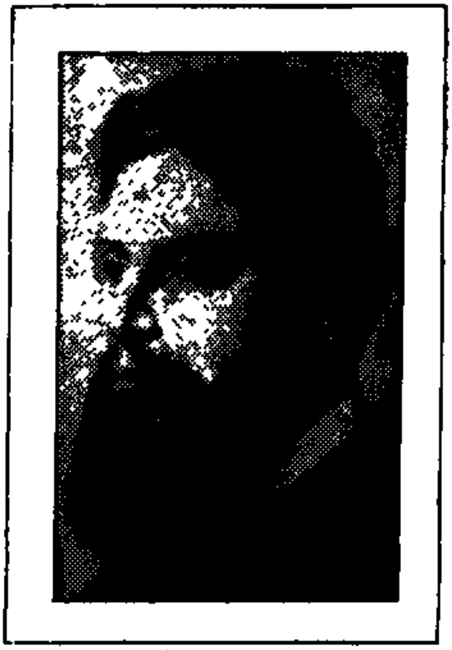

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ছোটদের সাহিত্যের বেলাও ঠিক তাই হল। লেখার উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাদান এ-কথা মানতে রাজী হল না লেখক কিম্বা পাঠক। নিছক আনন্দ বিতরণের জন্য লেখা শুরু হল। এই বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে যে গভীরতর শিক্ষা থাকে, তার সাহায্যে মানুষের ছেলেমেয়েরা জগতের মূল্য বুঝতে আপনা থেকেই শেখে। বলা বাহুল্য, বহু শিক্ষামূলক বইতেও এই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত 'পশ্বাবলি'তেই। জন্তু-জানোয়ারের বিষয়ে সচিত্র রচনা পেলে কোন ছোট ছেলেমেয়ে না মুগ্ধ হয়! সেই সঙ্গে জীব-বিজ্ঞানের তথ্যও ছিল অনেক। ছোটদের অদম্য কৌতূহল এই পৃথিবী-টাকে দেখবে, জানবে। প্রকৃতিকে দেখা জানা মানেই তাকে শ্রদ্ধা করা। প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতে জানলে, নিজেকেও শ্রদ্ধা করতে হয়। এর চাইতে বড় শিক্ষা কোনো পাঠ্যপুস্তকেও পাবার নয়।

কানে একবার সৃষ্টির মন্ত্র পৌঁছলেই হল। কল্পনার ঘোড়া অমনি লাফিয়ে চলে। কৌতূহল লাগাম চেনে না। তবে ঘোড়ার পায়ে জোর থাকা চাই। বিদ্যাদান থেকে রসদান, কিম্বা বিদ্যা আর রস একসঙ্গে দান, এক দিনে হয়নি। খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে' বিদ্যা-সাগরীয় যুগের কাল নির্দেশ করেছেন ১৮৪৭ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তার পরেই রবীন্দ্রনাথের যুগে শিক্ষার সঙ্গে রসের মিলন। তবে তার আগেও আমাদের দেশের শিশুরা যে রসের আস্বাদ পায়নি সেকথা মনে করলে ভুল হবে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্ম হয়নি; ছাপার অক্ষরে প্রথম ছোটদের পত্রিকা ও বই বেরিয়েছিল মাত্র। এর বহুকাল আগেকার একটা উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। এতক্ষণ আমরা লিখিত এবং প্রকাশিত সাহিত্যের কথাই বলেছি' সাহিত্য সব সময় লেখা থাকে না, কারণ যারা তার ধারক ও বাহক তারা হয়ত নিরক্ষর, যেমন ছিলেন সেকালের শহরের গ্রামের হাজার হাজার দিদিমা-ঠাকুমারা, মুখে মুখে এই সাহিত্য বংশানুক্রমে অগণিত পুরুষ ধরে চলে এসেছিল লোককথা, রূপকথা, উপকথার রূপ নিয়ে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আধুনিক বাংলা ভাষার চাইতে তার ইতিহাস অনেক বেশী পুরনো এবং বলিষ্ঠ। সে ইতিহাস কোনো ভাষার বাধা মানেনি। ছোট ছেলেমেয়েরা মা-দিদিমার সঙ্গে যখন যে ভাষায় গল্প করেছে, এই সাহিত্যেও তখন সেই ভাষারই ব্যবহার হয়েছে। তথাকথিত

বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস—যার মধ্যে শিশুসাহিত্যের কোনো স্থান থাকে না—তার চাইতে এ জিনিস অনেক প্রাচীন, অনেক প্রবল। এর মধ্যে বাঙালী জীবনের অন্তরঙ্গ ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে। উনিশ শতকের শেষে আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে দুজন সংসাহসী সম্পাদক ও লেখক, যথা রেভারেন্ড লালবিহারী দে আর দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পণ্ডিতদের অবহেলিত এই অমূল্য সম্পদের অনেকখানিকে গ্রন্থবন্ধ করে, অমরত্ব দিয়েছেন। লালবিহারীর ইংরেজীতে লেখা 'ফোক টেল্স্ অফ বেঙ্গল' গত বছর বাংলায় অনুদিত হয়ে প্রকাশ হবামাত্র সাত দিনের মধ্যেই অমূল্য সম্পদের অনেকখানিকে গ্রন্থবন্ধ করে অমরত্ব দিয়েছেন। লালবিহারীর ইংরেজীতে লেখা তাই কিঞ্চিৎ সম্পাদনার কাজ করতে হয়েছিল, কিন্তু কাহিনীর এমনি প্রবলতা যে সে স্থান-কাল মানে না। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ইত্যাদি বই আরো অনেক পরের কথা। আমাদের ছোট-বেলায় পড়া এ-সব গল্পের রোমাঞ্চ ভুলবার নয়। এ ধরনের বই হল বাংলার প্রাণের কাহিনী। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

আমরা যারা ছোটদের জন্য লিখে থাকি, আমাদের বারেবারে মনে হয় ছোটদের গল্পের প্রধান উপজীব্য হল কাল্পনিকতা আর সরসতা, এই দুই মিলে রসরোমাঞ্চের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত পুরনো লোককথা রূপকথা নিতান্ত মন-গড়া ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্কসের গা শির-শির করা গল্প নয়। এর মধ্যে সেকালের সাধারণ বাঙালী জীবনের দিন-যাপন, সাধ-আহ্লাদ, ভয়-ভাবনা, আশা-ভরসার কথা ধরা আছে। রাজা-রাজড়াদের কথা দেশের আসল ইতিহাস নয়, তার সঙ্গে এই মানবতার কাহিনীও পড়া দরকার। কত ঐতিহাসিক তথ্য যে উপকথার মধ্যে ছায়াপাত করেছে তার ঠিক নেই। এখন লোকে ভুলে গেছে বাঙালীরা নাবিকের জাত। তারা সপ্ত-ডিঙা-মধুকর নিয়ে জম্বুদ্বীপ ছাড়িয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। উজানে নদী বেয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছত। সাহেবরা আসার পর তারা কেরানী হয়েছিল। সেটা তাদের আসল পরিচয় নয়। উপ-কথায় কেরানীর নাম-গন্ধ নেই।

কেউ কেউ বলেন, "আগে বাংলায় অনেক ভাল ভাল ছোটদের বই লেখা হত, এখন কেন হয় না?" ভাবি কোথায় সেই অনেকগুলো ভালে ভাল বাংলা বই? তার বেশীর ভাগই তো মৌলিক নয়, প্রাচীন সাহিত্য থেকে, কিম্বা বিদেশ থেকে নেওয়া বা সোজাসুজি তর্জমা করা। এমন কি উপেন্দ্রকিশোরের কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী মৌলিক হলেও, গল্পগুলি নয়। কুলদা-রঞ্জন পুরাণ আর বিদেশী সাহিত্য থেকে রত্ন খুঁজে আনতেন। সুখলতা রাওয়ের বিখ্যাত পরীদের গল্পের সবই বিদেশী, সীতা দেবী শান্তা দেবীর বেশীর ভাগ গল্প দেশ-বিদেশের লোকসাহিত্য থেকে নেওয়া। প্রিয়ম্বদা দেবীর 'অনাথ' আর 'পঞ্চুলাল' যা পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে দুটিও বিলিতী গল্প। জ্ঞানদানন্দিনীর 'সাত ভাই চম্পা' আর 'টাক ডুমা ডুম ডুম' পুরনো গল্প। দক্ষিণারঞ্জনের অতুলনীয় গল্পগুলি মৌলিক নয়।

কিন্তু এ-কথাও সকলকে মানতে হবে যে ঐসব গল্প মৌলিক হোক বা না হোক, তাতে কিছুই এসে যায় না। মৌলিকতা না-ই বা থাকল, কি মধুর তাদের ভাষা, কি উপস্থাপনা, কি সরসতা! তাই যদি বলা যায়, অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা', 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো-আংলা', 'আলোর ফুলকি',—এগুলোও মৌলিক গল্প নয়। গল্প মৌলিক না হলেও, সাহিত্যগুণটি মৌলিক হওয়া চাই। সত্যি কথা বলতে কি রসের কোনো এ-কাল সে-কাল, এ-দেশ ও-দেশ ভেদ থাকে না। পৃথিবীর সব ছোটদের বই-ই পৃথিবীর সব দেশের ছোটদের সম্পত্তি। সব ভাল বইয়ের সব ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত এবং ক্রমে ক্রমে হচ্ছেও। তখন হত, কিন্তু এখন হয় না, এ-কথা মুখে আনা উচিত নয়।

তবু শেষ পর্যন্ত এটুকু বলতেই হচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মৌলিক হওয়া দরকার। সে রকম সাহিত্যও বাংলায় দেখা দিতে খুব দেরি হয় না। এ বিষয়ে আর কিছু বলার আগে 'শিশু-সাহিত্য' নামটি নিয়ে কিছু বলা দরকার। ইংরেজীতে যখন বলা হয় 'বুক্স্ ফর চিল্ড্রেন', কিংবা 'জুভেনাইল লিটারেচার', সকলেই বুঝে নেয়, ঐসব বই ৫ থেকে ১৬ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা, অর্থাৎ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে 'শিশুসাহিত্য' বাদে ঐ অর্থে ব্যবহার করলে কেউ কেউ আপত্তি করেন; বলেন ৮-৯ বছরের পর কেউ শিশু থাকে না, হয়ে ওঠে 'কিশোর'। যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য দুরকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা 'শিশু-সাহিত্য' বলতে ৫-১৬ পর্যন্ত সব পাঠকের কথাই মনে করি। তবে বইগুলিকে দুটি ভাগ করলে দেখা যায় যে বেশীর ভাগ বইয়ের রস উপভোগ করতে হলে অন্তত ১০-১২ বয়স হওয়া চাই। খুব ছোটদের জন্য খুব বেশী বই আজকাল বেরোয় না।

আগে ছিল দিদিমা-ঠাকুমাদের রূপকথা বলার আসল যুগ। কেউ কেউ এত ভাল গল্প বলতেন যে পাড়াসুদ্ধ সব ছেলেমেয়ে তাঁদের কাছে জুটত। তখন গল্পের বইয়ের অভাব কেউ বোধ করেনি; দরকার ছিল শিক্ষামূলক বইয়ের এবং তাই প্রকাশিত হত। এ-কথা আগেও বলা হয়েছে। ১৮৮৫

খ্রীষ্টাব্দের কতকগুলি পত্রিকা আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল: 'সখা', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' ইত্যাদি। বেশীর ভাগই প্রবন্ধ। প্রায়ই মৌলিক নয়। কবিতা খুব কম। কিছু গল্প। কিন্তু ৬-৭ বছরের পাঠকের সে-সব বোঝা মুশকিল। প্রবন্ধের বিষয়গুলি বিচিত্র এবং উপাদেয়। ভাষা শক্ত। ১৮৮৫-এর 'সখা ও সাথী'তে ২২ বছর বয়সের উপেন্দ্রকিশোরের একটি ভারি উপভোগ্য প্রবন্ধ পড়লাম। অন্ধদের বই পড়া সম্বন্ধে। তখনো ব্রেল্ পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়নি। উঁচু উঁচু হরফে বই ছাপা হত; অন্ধ পাঠকরা তার ওপর আঙুল বুলিয়ে পড়তেন। এক লাইন পড়তে হত বাঁ থেকে ডাইনে, পরবর্তী লাইন সেই ডান থেকে বাঁয়ে। যাতে জায়গা না হারায়। এমন ভাল প্রবন্ধ কম দেখা যায়। যেমন আকর্ষণীয় বিষয়-বস্তু, তেমনি সহজ ভাষা, তেমনি সরস ভাব। এ ধরনের রচনার উঁচু মান দেখে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু বয়স অন্তত বছর দশেক না হলে পাঠকরা সবটা বুঝবে না।

সুখের বিষয় এর পরেই শিশুদের দিন এল। শিশুসাহিত্যের দুই দিক্‌পাল যোগীন্দ্রনাথ সরকার আর উপেন্দ্রকিশোর হাল ধরলেন। বলা বাহুল্য, সে সময় রবীন্দ্রনাথও অনেকগুলি অপূর্ব কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি যত না ছোটদের জন্য, তার চেয়ে বেশী ছোটদের বিষয়ে। ছোটদের বিষয়ে রচনা সব সময় ছোটদের উপভোগ্য হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কিম্বা 'শিশু ভোলানাথে'র অতুলনীয় কবিতা বোঝা ৬-৭ বছরের পাঠকদের পক্ষে শক্ত। তার জন্য কিছু প্রস্তুতিও দরকার হয়। দশ বছরের ওপরে যারা তারা অবশ্য খুবই উপভোগ করে, 'মানে না বুঝলেও করে'। ছন্দের দোলা আর বিচিত্র কাব্য-গুণ মনকে স্পর্শ করবেই।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার বড়লোক ছিলেন না তবু সব ছেড়েছুড়ে আজীবন সিটি বুক সোসাইটি নিয়ে পড়ে থাকলেন। শুধু পড়ে থাকলেন না, ছাপার অশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও অননুকরণীয় কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। তার মধ্যে একটির নাম ছিল, 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী', বোঝাই যাচ্ছে সংকলন। সচিত্র ছড়া, গল্প, সহজ প্রবন্ধ। এ বই থেকে শৈশবে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তার তুলনা হয় না। ছাপা খুব ভাল না হলেও, আশ্চর্য রকম ভাল ও মজার সব ছবি। তাঁর প্রকাশিত 'খুকুমণির ছড়া' (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৯) পৃথিবীর যে-কোনো দেশের 'নার্সারি রাইম্‌স্'-এর পাশে স্থান পেতে পারে। এ ধরনের ছড়ার রচয়িতার নাম জানা অসম্ভব। লেখকরা নাম চাইতেন না, টাকাও চাইতেন না। ছোটদের জন্য বই চাই। তাই তাঁরা বই লিখে দিতেন। যখন যেটা দরকার সেটাই লিখতেন।

সুকুমার রায়

অন্নসংস্থান করতেন অন্য কাজকর্ম করে। যোগীন্দ্রনাথ সামান্য লাভে অনেক বই প্রকাশ করেছিলেন। নিজেও কম লেখেননি। উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট হলেও, কাজে নেমেছিলেন তাঁর আগে। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা প্রথম দুটি বই 'ছেলেদের রামায়ণ' আর 'মহাভারত' যোগীন্দ্রনাথই প্রকাশ করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের তাঁর ছবি পছন্দ হয়নি। নিজে শিল্পী, ছবি সম্বন্ধে মন ছিল স্পর্শকাতর। এর পর তিনি নিজেই বিলেত থেকে বই আর সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আনিয়ে, হাফ-টোন ব্লকে ছাপার পদ্ধতির কিছু উন্নতিসাধন করে, নিজের ছাপাখানা ও প্রকাশালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ইউ. রায় এণ্ড সন্স'। দেশে-বিদেশে তার খ্যাতি হয়েছিল। সেই ছাপাখানা থেকে চমৎকার তিন-রঙা চার-রঙা ছবিতে সেজে কত যে সুন্দর সুন্দর ছোটদের বই বেরিয়েছিল তার ঠিক নেই। তার অনেকগুলির রস ৬-৭ বছরের ছেলে-মেয়েরাও উপভোগ করতে পারত। 'ছোট্ট রামায়ণ', 'টুনটুনির বই', 'সেকালের কথা' ইত্যাদি বই তাদের জন্যেই লেখা। 'মহাভারতের গল্প' অতি উঁচুদরের সাহিত্য, তবে মনে হয় আরেকটু বড় পাঠকের বেশী ভাল লাগবে।

যোগীন্দ্রনাথ আরেকটি বড় কাজের গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন। সেটি হল আনন্দের সঙ্গে অ-আ লিখতে-পড়তে শেখানো। বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ পড়তে ছোটদের যে কষ্ট হয়, যোগীন্দ্রনাথের 'হাসিখুসি', 'হাসিরাশি', 'ছবির বই' ইত্যাদি পড়ে তার দ্বিগুণ মজা লাগে।

অনেকগুলি বই প্রকাশ করেছিলেন তিনি, কতক নিজের রচনা, কতক অন্যদের সাহায্য নিয়ে লেখা, প্রায় সবগুলি চমৎকার। কয়েকটির নাম না করে পারছি না: 'ছবি ও গল্প', প্রথম প্রকাশ ১৮৯৬; 'পশু-পক্ষী', প্রথম প্রকাশ ১৯১১; 'বনে-জঙ্গলে', প্রথম প্রকাশ ১৯২৯; 'ছোটদের চিড়িয়াখানা', ১৯২৯; 'দৈত্য ও দানব', ১৯২০; ইত্যাদি।

যোগীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রকিশোর এই দুজন পথিকৃৎ যে আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের পথ খুলে দিয়েছিলেন এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশ করতে শুরু করলেন, শিশুসাহিত্যের জগতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হল। ছোটদের জন্য লেখা যে কত ভাল হওয়া দরকার তার একটা মানদণ্ড তৈরি হয়ে গেল। সেকালের 'সন্দেশে'র চাইতে ভাল ছোটদের পত্রিকা আমাদের দেশে আর দেখা গেল না। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, এঁরা আমার জ্যাঠামশাই। ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে, ইউ. রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানায়, ১লা বৈশাখ, ১৩২০ সালে (এপ্রিল ১৯১৩) 'সন্দেশের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার কথা আমার বেশ মনে আছে। উপেন্দ্রকিশোর মলাটের ছবি ও ভিতরের বহুরঙা ছবি এঁকেছিলেন, রচনাও অনেকগুলি লিখেছিলেন। তবে প্রতিভাসম্পন্ন বন্ধু-বান্ধবের অভাব হয়নি। দেখতে দেখতে 'সন্দেশ'কে কেন্দ্র করে একটি উজ্জ্বল লেখকগোষ্ঠি তৈরি হয়ে উঠল। সেকালে টাকার জন্য কেউ লিখতেন না, শুধু প্রেম ও পরিশ্রমে কাগজ চলত। তবে ছেপে বের করতে খরচ লাগত বই কি! চমৎকার ক্রীমলেড কাগজ ব্যবহার করা হত, হাফ-টোনে ছাপা ছবি থাকত। দাম ছিল যতদূর মনে হচ্ছে প্রতি সংখ্যা তিন আনা কি চার আনা। এর ত্রিশ বছর পরে আমি কুলদারঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত কম দামে এমন পত্রিকা চলত কি করে। তিনি বলেছিলেন যে, মোটেই চলত না। উপেন্দ্রকিশোর ওর পেছনে টাকা ঢালতেন, যেমন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে সুকুমার ঢেলেছিলেন। দুঃখের বিষয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে সুকুমারের মৃত্যু হয়। তার বছর খানেক পরে 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে যায়। ইউ. রায় এণ্ড সন্স নিলাম হয়ে যায়। কয়েক বছর পরে নতুন মালিকরা আরেকবার কাগজ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন; সে-ও বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ত্রিশ বছরের বেশী 'সন্দেশ' বন্ধ ছিল। গত ষোল বছর ধরে সুকুমারের ছেলে সত্যজিতের চেষ্টায় পত্রিকা আবার নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে; মালিকানা রয়েছে 'সন্দেশ' সমবায়ের হাতে। পুরনো আদর্শগুলো যথা সম্ভব রক্ষার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে ছবি, সে অঙ্গসজ্জা, সে কাগজ এবং সেই রোমাঞ্চের কিছুই নেই। গুণ যা আছে, সে পাঠ্যাংশের। সেকালের 'সন্দেশে'র মতো এখনো বাংলার ছোট বড় শিশু-সাহিত্যিকরা বিনা মূল্যে, কিম্বা নাম-মাত্র লাভে ক্রমাগত 'সন্দেশে' লেখা যুগিয়ে যাচ্ছেন। শিশু-সাহিত্যিকরা আলাদা জাত।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে আমি লিখেছিলাম: "দেখতে দেখতে 'সন্দেশে'র সম্পাদককে ঘিরে দাঁড়ালেন এমন একদল গুণী, যাঁরা নানান্ দিক থেকে বাণীর দরবারে উঁচু আসন দাবি করতে পারতেন। 'সন্দেশে'র কাছে সবাই সমান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, বিজয়রত্ন মজুমদার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রিয়ম্বদা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রভৃতি। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনরা তো ছিলেনই। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের (উপেন্দ্র-কিশোরের শাশুড়ি) ভাইরা যোগেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রকিশোরের ভাইরা, ছেলে-মেয়েরা, বন্ধুবান্ধবরা...চাঁদের হাট বসে গেল। তখনকার দিনে ছোটদের জন্য লেখা বই কিম্বা পত্রিকা নিয়ে রেষারেষি দলাদলির কথা কেউ ভাবতেও পারত না।"

বহু নামকরা বই প্রথমে 'সন্দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপতরীর দেশ', প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পঞ্চুলাল', রবীন্দ্রনাথের 'সে' ইত্যাদি। স্বনামধন্য জগদানন্দ রায় জীবজন্তু সম্বন্ধে লিখতেন; জগদীশচন্দ্র জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে, যোগেন্দ্রনাথ বসু পোকামাকড়, কুলদারঞ্জন পৌরাণিক গল্প, ছোট ভাই প্রমদারঞ্জন তাঁর নিজের বনে বনে ঘোরার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিষয়ে, বড় মেয়ে সুখলতা রাও পরীদের গল্প, অন্য মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তী নানান সরস ঘটনা বিষয়ে, বিলেত থেকে বড় ছেলে সুকুমার পরে 'আবোলতাবোলে' ও অন্য বইতে প্রকাশিত অপূর্ব কৌতুক কবিতা গল্প, মেজ ছেলে সুবিনয় নানান্ তথ্যপূর্ণ সরস প্রবন্ধ ও গল্প, সাহিত্যের কোনো দিক বাদ যায়নি।

এক বছরের মধ্যে অঙ্গসজ্জা, ভাব আর ভাষার দিক থেকে বাংলা শিশুসাহিত্য এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল যে এখনো যদি 'সন্দেশে'র একটি পুরনো সংখ্যা হুবহু ছেপে দেওয়া যায়, তাহলে পাঠক মহলে নিশ্চয় কাড়াকাড়ি পড়বে। শুধু অনেক জায়গায় 'করিয়াছিল, খাইয়াছিল' ব্যবহারকে আর বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিকে সেকেলে মনে হবে।

এই সব কারণে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দকে শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর বলে

মনে করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কারণেও; 'সন্দেশে'র প্রভাবে অনেকগুলি গুণী লেখক পাঠকদের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁরাই বাংলার শিশুসাহিত্যের হাল ধরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর আর সুকুমারের আদর্শে বড় হয়ে ওঠা সব ছোটদের প্রিয় কবি সুনির্মল বসু। অনন্যসাধারণ সুকুমার তো ছিলেনই, পরিমল গোস্বামী ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ লিখতেন, কালিদাস রায় লিখতেন কবিতা, কতজনের নাম করা যায়!

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সুকুমারের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে 'সন্দেশ' বন্ধ হয়ে গেলেও ছোটদের জন্য বই লেখা বন্ধ হয়নি। ততদিনে শুধু যে অনেক অভিজ্ঞ লেখক তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন, তা নয় এক পুরুষ বৃদ্ধিমান পাঠকও তৈরি হয়েছিল। পাঠকদের ভাল না লাগলে কোনো বইকে সার্থক রচনা বলা চলে না। 'সন্দেশ' পাঠকদের সামনে বলিষ্ঠ মৌলিক লেখা তুলে ধরে, তাদের বিচারশক্তির পরিণতি ঘটাবার প্রয়াস করেছিল। ১৮৯৫-এর পর থেকে, যখন যোগীন্দ্রনাথের সিটি বুক সোসাইটি আর উপেন্দ্রকিশোরের ইউ· রায় এণ্ড সন্স একটির পর একটি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ করতে লাগল, তখনি বাংলা শিশুসাহিত্যের একটা নিজস্ব রূপ, অর্থাৎ স্বকীয়তাও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল। সেই স্বকীয়তার মূলে নিঃসন্দেহে বিদেশী শিশুসাহিত্যের অনুপ্রেরণা ছিল তবু বাংলা শিশুসাহিত্য নিতান্ত নকল ছিল না, তার মূলে ছিল ভারতীয় চিন্তা। যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ইত্যাদি রামায়ণ মহাভারত পুরাণের আর উপকথার গল্পকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই মূলধনের ওপর উদার শিক্ষার আলো পড়াতে বাংলার শিশুসাহিত্য ক্রমে একটা বিশেষ রূপ নিয়েছিল। আর ছিল বাংলার রসবোধের ঐতিহ্য, যার নকল করা অসম্ভব। শিক্ষানবিসির কাল শেষ হয়েছিল কুড়ি শতকের গোড়াতেই। শিক্ষানবিসির পর স্নাতক যদি স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সংগতি পায়, তবেই অতি বলিষ্ঠ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। বাংলা শিশুসাহিত্যের তাই হয়েছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'সন্দেশ' প্রথম প্রকাশিত হল, তখনি সে সাবালক। আর তাকে কখনো পথের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াতে হয়নি।

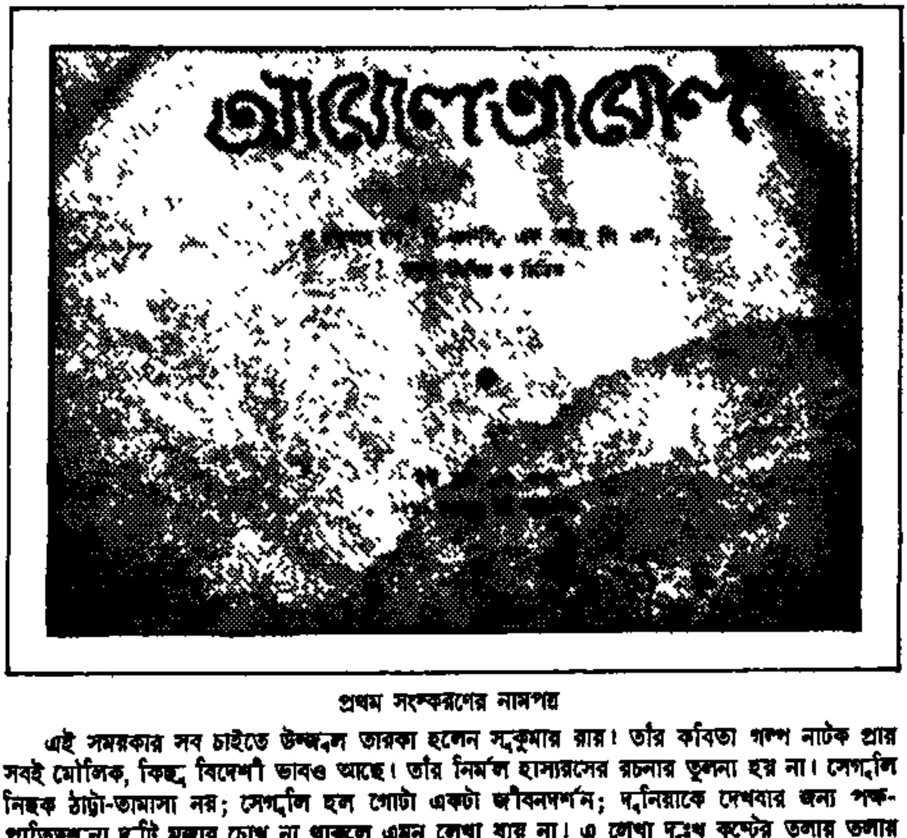

প্রথম সংস্করণের নামপত্র

এই সময়কার সব চাইতে উজ্জ্বল তারকা হলেন সুকুমার রায়। তাঁর কবিতা গল্প নাটক প্রায় সবই মৌলিক, কিছু বিদেশী ভাবও আছে। তাঁর নির্মল হাস্যরসের রচনার তুলনা হয় না। সেগুলি নিছক ঠাট্টা-তামাসা নয়; সেগুলি হল গোটা একটা জীবনদর্শন; দুনিয়াকে দেখবার জন্য পক্ষপাতিত্বশূন্য দুটি মজার চোখ না থাকলে এমন লেখা যায় না। এ লেখা দুঃখ কষ্টের তলায় তলায় এমনি আনন্দের সন্ধান দেয় যে সুকুমার-সাহিত্য আজ পর্যন্ত অনন্য ও অসাধারণ হয়ে আছে।

গুরুগম্ভীর দিকও ছিল একটি, সেটি পরিণতি পাবার সময় পায়নি। বর্ণমালা তত্ত্বে, নানান্ প্রবন্ধে, 'অতীতের ছবি' নামক কবিতাতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাকি সব রচনাকে মানব-জীবনের টীকাও বলা চলে। সংসারে বেঁচে থাকার ওপর সরস মন্তব্য। নিজেদের ছাপাখানা আর প্রকাশালয় থাকা সত্ত্বেও নিজের লেখাগুলিকে পুস্তকাকারে দেখে যেতে পারেননি। শুধু প্রথম বই 'আবোলতাবোল'র অনুকরণীয় ছবিগুলি এঁকে, 'লেআউট' গুছিয়ে, 'ডামি কপি'টি দেখে চোখ বুজেছিলেন। বাকি সব লেখাই পুরনো 'সন্দেশে'র পাতায় বন্দী হয়ে ছিল অনেক বছর। তারপর সত্যজিৎ বড় হয়ে, বইয়ের মালিকানা পেয়ে, সিগনেট প্রেসের সহযোগিতায় সেগুলি বই হয়ে বেরোল। এমন বই শুধু বাংলায় কেন, অন্য কোনো ভাষাতেও আছে বলে জানি না। ইংরেজীতে লুইস্ ক্যারলের কৌতুককর্মের তুলনা হয় না; একমাত্র তাঁর নামই মনে পড়ে। কিন্তু তিনটি বই ছাড়া—যথা, 'অ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড', 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' আর 'হান্টিং অফ দি স্নার্ক'—ক্যারলের বাকি রচনার রস ক্লিষ্ট এবং তিক্ত; ব্যক্তিগত ব্যর্থতাবোধে দূষিত। সহজেই বলা যেতে পারে যে সুকুমার রায়ের মতো শিশুসাহিত্যিক বাংলায় আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। তাঁর বইগুলির সঙ্গে সকলেই পরিচিত, তাই কয়েকটি নাম শুধু উল্লেখ করছি: 'আবোলতাবোল' (কবিতা); 'পাগলা দাশু' (মজার গল্প); 'হযবরল' (কৌতুক উপন্যাস) 'খাই খাই' (কবিতা); 'বহুরূপী' (বিবিধ); 'বর্ণমালা তত্ত্ব' (বিবিধ) ইত্যাদি। নাটক সম্বন্ধে যথাস্থানে কিছু বলা হবে।

এই সময়ের রচনার মধ্যে সুকুমারের বড় বোন সুখলতা রাওয়ের 'পরীদের গল্প', 'আরো গল্প' ইত্যাদি; সীতা দেবী-শান্তা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা', 'নিরেট গুরুর কাহিনী', 'হুক্কাহুয়া' ইত্যাদির নাম করতে হয়। এগুলি অবশ্য মৌলিক নয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রায় আমাদের সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত নানান্ রোমাঞ্চময় গল্প লিখেছেন। সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায় তাঁদের সরস ও উদ্ভট রচনার জন্যে ভারি জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু সুবিনয়ের দু-একখানি ছোট বই ছাড়া, পুস্তকাকারে কিছু বেরোয়নি।

এর পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে একটি সমালোচনার বা ইতিহাসের বই পর্যন্ত নেই। শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে তিনটিমাত্র বইতে মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে। তার মধ্যে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য' অন্যতম। অজস্র মূল্যবান তথ্য, উদাহরণ, এমন কি পুরনো ছবি এই বইতে ধৃত আছে। দুঃখের বিষয় বিবরণ ১৯১৮-তে শেষ হয়েছে। শুনেছি নতুন সংস্করণে বর্তমান কাল সম্বন্ধে ২-১ অধ্যায় জোড়া হয়েছে। কিন্তু তাকে কি মূল্যায়ন বলা যায়? আর আছে আশা গঙ্গোপাধ্যায়েব বই, তাতেও সুকুমারের পর আর বিশেষ কিছু নেই। বাণী বসুর বইটি হল ছোটদের বাংলা বইয়ের তালিকা। তাকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। তবে বহু সাম্প্রতিক বই ও তাদের রচয়িতার নাম আছে। শুধু নামই আছে। গ্রন্থপঞ্জিতে অবশ্য তার বেশী আশা করাও উচিত নয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে সে রকম পূর্ণাঙ্গ কোনো বই দেখিনি। উপেন্দ্রকিশোর আর সুকুমারের বিষয় আমার নিজের দুটি ছোট বই ছাড়া আর কিছু আছে বলে শুনিনি, বাকিদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ যখন বাংলা শিশুসাহিত্যের আসল দিন শুরু হল, তখন আরো শত শত প্রায় অখ্যাত লেখক ছোটদের বইয়ের অভাব দূর করবার জন্য নিজেদের সমস্ত সামর্থ্য নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের অবদানও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। তাঁরা এসে পাশে না দাঁড়ালে এত শীঘ্র বাংলার এমন একটা বলিষ্ঠ শিশুসাহিত্য গড়ে উঠত না। আমি সচেতন ভাবেই 'বলিষ্ঠ' শব্দটি ব্যবহার করলাম, কারণ যাঁরা 'কিছু নেই' বলে আক্ষেপ করেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই নেই। ঐ সব নীরব কর্মীদের কথা কেউ মনে করে না।

সে যাই হোক, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্য যে একটা বলিষ্ঠ স্বকীয়তা লাভ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পুরনো ঐতিহ্যকে সে কোনো দিনই অস্বীকার করেনি, বরং নদীর মতো ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, শাখা-প্রশাখা থেকে পুষ্টি লাভ করে স্রোতের স্ফীতি হয়েছে। বিকাশের ইতিহাসটিও ভারি মনোজ্ঞ। গোড়া থেকেই রসের ধারা বয়ে এনেছিল অলিখিত লোককথা, রূপকথা,—যার প্রবলতা কখনো কমেনি। কারণ স্বয়ং প্রকৃতি তার সহায়। ১৮১৮-তে ছাপা বই পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে শিক্ষামূলক প্রবন্ধ দেখা দিল। ক্রমে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের ব্যবস্থা হল। গল্প এল, কবিতা এল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে সর্বদাই নাটকের অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৪-এ 'সাথী' নামক পত্রিকায় উপেন্দ্রকিশোরের সরস নাটিকা 'বেচারাম কেনা-রাম' প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নানান নাটক ছিল। সে-সব নাটককে ঠিক শিশুসাহিত্য বলা যায় না। অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত, আদর্শ-অনুপ্রাণিত নাটক। ছোটদের জন্যেও কিছু লিখেছিলেন, তাতে যথেষ্ট রসের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু আরেকটি কথাও মনে রাখা দরকার। ঐসব আশ্চর্য নাটকগুলির প্রায় সবই রচনা হবামাত্র আগে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করানো হত। স্কুলের ছাত্র, তখনো কলেজ বা সঙ্গীতভবন, কলাভবন হয়নি। অভিনয়ের আগে ও পরে, বহু দিন ধরে, নাটকের গান আর সংলাপ সেই শিশুবিভাগ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের

মুখে মুখে ফিরত। গোটা নাটকই তাদের মুখস্থ হয়ে যেত। এমন নাটককে ছোটদের অনুপযুক্ত বলি কি করে? তার রস তো তারা উপভোগ করতই, মানে বোঝাতেও যে খুব অসুবিধা হত মনে হয় না। এ-সব জিনিস, রবীন্দ্রনাথের অনেক গভীর তত্ত্বের কবিতা আর গানের মতো বয়স বা স্থানের অতীত কোনো গুণে অনুপ্রাণিত। তবে শিশুদের উপযোগী সাধারণ নাটকের ওপর এর প্রভাব দেখি না। ভাল নাটকই লেখা হত না। যত দিন না সুকুমার তাঁর অভাবনীয় কৌতুক নাটিকাগুলি প্রকাশ করলেন। 'শব্দকল্পদ্রুম', 'ভাবুকসভা', 'চলচিত্তচঞ্চরি', 'অবাক জলপান', 'হিংসুটি', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা' ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম তিনটি তাঁদের মনডে ক্লাবের জন্য লেখা বড়দের নাটক। কিন্তু ছোটরাও কম আনন্দ পায় না। বুঝবারও অসুবিধা হয় না। এইখানে শিশুসাহিত্যের ব্যাখ্যান নিয়ে গোলমাল লাগে। মনে হয় ছোটরা যা কিছু উপভোগ করে এবং বুঝতে পারে তাকেই শিশুসাহিত্যের সভায় জায়গা দেওয়া যায়। নাটকের এই অভাব আজও দূর হয়নি, যদিও বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন কিছু রসের নাটিকা লিখেছেন। এখনো ছেলেমেয়েরা স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক অভিনয় করে। নাটকের কথা ছেড়ে এবার প্রবন্ধের ক্রমবিবর্তনের কথায় আসি।

উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য নানা তথ্যগত বিষয়ে সহজ ভাষায় সরস ভাবে প্রবন্ধ লিখতেন, যোগীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথও খুব বেশী না হলেও ঐ রকম প্রবন্ধ লিখেছেন। অন্য কেউ কেউ গল্পের বা নাটিকার আকারে তথ্যমূলক প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করেছেন। খুব ভাল হয়নি; তাছাড়া কতখানি নাটক আর কতখানি বৈজ্ঞানিক তথ্য, এ কথা বুঝতে ছোটদের অসুবিধা লাগে। আবার সেই প্রথম যুগের প্রবন্ধেই ফিরে যাওয়া হয়েছে। অপূর্ব সব প্রবন্ধ: জীব-বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিছুই বাদ যায়নি। আমরা ছোটবেলায় রসের জন্য নাটক, কবিতা, গল্প পড়তাম আর তথ্যের জন্য প্রবন্ধ। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কিম্বা ভ্রমণবৃত্তান্ত আর গল্প-উপন্যাসের মিলন ঘটিয়ে অনেকগুলি ভাল বই লেখা হয়েছে, যার কথা পরেও আসছে, যখন নবীন সাহিত্যের কথা বলা হবে।

এবার কবিতার কথাও বলতে হয়। প্রথম যুগে কবিতা প্রায় লেখাই হত না, যদিও রূপকথায়, ছড়ায় বাংলার গ্রাম মুখরিত ছিল। তারপর ভয়ে ভয়ে কবিতা প্রবেশ করেই আদর পেল। 'খুকুমণির ছড়া'র কথা আগেও বলা হয়েছে। 'সন্দেশে'র পাতায় পাতায় কবিতা ও গান (স্বরলিপি সহকারে) থাকত। উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা রাও, সুকুমার রায়, বিজয় মজুমদার, প্রিয়ম্বদা দেবী, এমন কি রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত,—কেউ বাদ যাননি। রবীন্দ্রনাথ আর সুকুমার চিরকালের মতো বাংলা শিশুকাব্যের দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এখন অনেক কবি ছোটদের জন্য চমৎকার কবিতা লিখছেন।

শিশুসাহিত্যের ভাষাও এই শতাধিক বর্ষব্যাপী সাধনার ফলে সহজ, সাবলীল, সুন্দর হয়ে উঠেছে। তবে একটি সমস্যা ক্রমে দেখা দিচ্ছে, যার মূলে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আশ্বাস পেয়ে ভাষাকে সহজ করতে গিয়ে, যে বিদ্যাসাগরী বিশুদ্ধ বাংলার প্রশংসা কবি নিজেই করে-ছিলেন তাকে ছেড়ে কথিত ভাষার মেঠো পথ ধরে লেখকরা এত দূর এগিয়ে গেছেন যে এখন আর বানানের কোনো মাথামুণ্ডু নেই, যাঁর যা ইচ্ছে লিখছেন। রবীন্দ্রনাথ কখনোই এতটা আশা করেননি। তিনি বড় জোর ছোটকে ছোটো, বড়কে বড়ো, 'করেছিল-দিয়েছিল'কে 'কোরেছিলো দিয়েছিলো' ইত্যাদি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সুকুমার রায়ের ভাষায় "ক্ষেপলে ঘোড়া থামায় কে? আজকে ঠেকায় আমায় কে?" বিদেশী পাঠকরা এই দেখে আশ্চর্য হয়ে যান: যে-ভাষার সাহিত্য এত সমৃদ্ধ, তার বানান এত কাঁচা হবে কেন! বাস্তবিকই দেশজ আর বিদেশী শব্দ তো বটেই, তৎসম তদ্ভব শব্দেরও বানানের ভিত নড়েছে। ভবিষ্যতের পক্ষে এটাকে মঙ্গল-জনক মনে করি না। তাছাড়া পণ্ডিতরা নির্দোষ ছাত্রদের নম্বর কাটেন। আরেকটি চিরকালের এবং গুরুতর প্রসঙ্গও আছে। সেটি বই লেখা সংক্রান্ত নয়, বই প্রকাশনের বিষয়। বই বিক্রির বিষয়। ছোটদের বইতে ছবি দিতে হবে; ভাল কাগজে ছাপতে হবে; বাঁধাই ভাল না হলে মলাট আলগা হয়ে যাবে; যথেষ্ট বিজ্ঞাপন না দিলে, অন্য কাজে ব্যস্ত মা-বাবারা লক্ষ্যই করবেন না; অথচ দাম ৫-৬ টাকার বেশী করলে কিনতে চাইবেন না। যাঁদের টাকাকড়ি আছে তাঁরাও না। বিদেশী কমিকস্ যাঁরা বারো-চৌদ্দ টাকা দিয়ে কেনেন, তাঁরাও না। সেকালে না হয় উপেন্দ্রকিশোর তাঁর শখের 'সন্দেশে'-কে টাকা দিয়ে পুষতেন, সে নীতিতে তো কোনো ব্যবসা চলতে পারে না। আজকাল বৃহৎ সংখ্যক লোক ছোটদের জন্য বই লিখে, ছবি এঁকে, ছেপে, বাঁধিয়ে, বিক্রি করে, নিজেদের অন্ন-সংস্থান করেন। এমন একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর এত সমস্যা আর আছে কি না জানি না। সত্যের খাতিরে আরেকটি কথাও বলতে হয়। সেকালে এত ভাগ অঙ্গসজ্জা থাকত না বটে, কিন্তু পাঠ্যাংশ আরো যত্ন করে প্রস্তুত করা হত। তথ্যের অসাবধানতা খুব কম থাকত, ছাপার ভুল প্রায় থাকতই না। আমি ১৮৯৫ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত প্রকাশিত অনেক বই আর মাসিক পত্রিকা দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে সেকালে সাজ-সজ্জার চাইতে পাঠ্যাংশকে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া

হত। আজকাল চমৎকার মলাট, সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে অনেক বই বেরোয়, যার পাতায় পাতায় বানানের ও ছাপার ভুল। প্রথমটার জন্য অবশ্য লেখকরাই অনেক সময় দায়ী। মনে হয় আরো সতর্ক ও যত্নশীল হওয়া দরকার।

শিশুসাহিত্যে অবহেলিত বিগত ষাট বছরের ইতিহাস লেখা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি এইটুকুমাত্র দেখাতে চেয়েছি সাহিত্যের ধারা কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং প্রধানতঃ কাদের চেষ্টায় হয়েছে। বলেছি তো মঞ্চ প্রস্তুত করেছিলেন ইংরেজ মিশনারিরা এবং আরো অনেকে—শিক্ষা দেওয়াই যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ দিতে পারলে তো কথাই নেই। উনিশ শতকের শেষের দিকে বিদ্যাসাগর, প্রমদাচরণ সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের সরস বুদ্ধিমত্তাও অনুপ্রবিষ্ট করেছিলেন। এইভাবে বিশ শতকের গোড়ায় শিশুসাহিত্যের সুবর্ণ-যুগে আমরা উপনীত হলাম। 'সুবর্ণ যুগ' এই জন্য বলছি যে সেই সময় রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্র-নাথ আর উপেন্দ্রকিশোর তিন দিক্‌পাল দেখা দিয়ে শিশুসাহিত্যে আগেকার ঐ সব গুণের সঙ্গে অপূর্ব এক স্বকীয়তা আর বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিলেন, যার প্রভাবে বাংলা শিশু সাহিত্য আজও পুষ্ট হচ্ছে। এ'দের পরেই সুকুমার রায়ের নাম করতে হয়, কৌতুককে যিনি সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছিলেন। তার আগে পর্যন্ত গোপাল ভাঁড়ের গল্প ইত্যাদি শুনে লোকে হাসত বটে, কিন্তু হাস্য-কৌতুককে মনে মনে শ্রদ্ধা করত না। তবে আমাদের দেশের ছোটদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির তলায় আমি যে অন্তঃসলিলা লোক-সাহিত্যের প্রবল স্রোত অনুভব করি, তাতে সরসতার অভাব ছিল না। দুঃখের বিষয় ওসব গল্পকেও অনেকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন না। উপেন্দ্রকিশোর এ বিষয়েও সচেতন ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন লোক-সাহিত্যের মাথায় মুকুট পরালেন। বাংলা শিশুসাহিত্যের পথ নির্দেশের কাজে অবনীন্দ্রনাথের যথেষ্ট দান আছে। তিনি গল্পের ভাষায় ও ভাবে শিল্প-প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন। খান কুড়ি ছোটদের বই লিখে বাংলা ভাষার ওপর তিনি জাদুকাঠি বুলিয়ে দিয়ে গেছেন। পড়লে মনে হয় যেন কথা দিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে। বইগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যের মণি-কোঠায় জমা হয়ে থাকবে।

উপেন্দ্রকিশোরের আরেকটি গুণও ছিল,—বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রস মিশ্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এক বিষয়ে একটা বড় তফাৎ দেখতে পাই। যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি যেন ছোটদের সঙ্গে এক আসনে বসে যেতেন, রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই গুরুর আসন ছাড়তে পারতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের ছোটবেলার কাজই হল আনন্দের সঙ্গে বড় হতে শেখা। বড় হতে শেখা আর ছোটদের মধ্যে ছোট হয়ে থাকার মাঝপথটি বড় সুন্দর —সেখানেই সব রস, রহস্য, রোমাঞ্চের জন্ম। তবে উপেন্দ্রকিশোর কোনো সময়ে রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁকেননি; যে মানবজীবনের বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে রোমাঞ্চের জন্ম হয়, অর্থাৎ এই রূপ-রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির প্রবল আকর্ষণ, তাকে তিনি সাহিত্যের উপকরণের মধ্যে স্থান দিতে ভোলেন-নি। জীব-বিজ্ঞান, গ্রহ-নক্ষত্র, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, বিদেশের বার্তা, সব দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। জানার মধ্যেই থাকে অজানার সংকেত। যোগীন্দ্রনাথেরও 'পশু-পক্ষী', 'জানোয়ারের কাণ্ড', 'বনে-জঙ্গলে' ইত্যাদি বই আছে। জীবনের এই বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল জাতীয়তা-বোধ। তখন স্বদেশীয়ানার প্রথম যুগ। নিজের দেশকে জানার অনুপ্রেরণা কম ছিল না। দক্ষিণা-রঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?"

গত ৫০-৬০ বছরের মধ্যে ছোটদের উপযুক্ত সম্ভবতঃ ৫০০-৬০০ খানি বই, এবং বেশ ভালো বই, প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী, সাধারণ জ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, ঐতিহাসিক ঘটনা, অনুবাদ ইত্যাদি সবই আছে। কোনো অধ্যবসায়ী গবেষক একটু চেষ্টা করলেই প্রতি বছরের ১০-১২টি উৎকৃষ্ট ছোটদের বইয়ের তালিকা তৈরি করে দিতে পারবেন। এবং ৬০ বছরে কম করে ১০০ জন প্রতিভাদীপ্ত লেখকের নামও পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এখানে তার স্থান নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হবে।

এই প্রসঙ্গে 'সন্দেশ' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনায় আমার ষোলো-সতেরো বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়। বছর বারো আগে পাঠকদের পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়ায় আমরা বৎসরান্তে জানতে চেয়েছিলাম সারা বছরের মধ্যে তাদের মতে কোন কোন লেখা সব চাইতে ভালো হয়েছে। এর ফল আমাদের কাছে যতখানি অপ্রত্যাশিত, ততখানি আলোক-দায়ক। অর্থাৎ পছন্দের গতি কোন দিকে মোড় নিয়েছে বুঝতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হল না। সব চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছিল পুরনো 'সন্দেশ' থেকে পুনর্মুদ্রিত 'পঞ্চুলাল'। 'পঞ্চুলাল' হল ইটালির প্রাচীন রূপকথা 'পিনক্কিও'-র বাংলা। কাল্পনিকতা, দুঃসাহসিকতা আর অপূর্ব সরসতায় ঠাসা। দ্বিতীয় হল নলিনী দাশের প্রথম দুঃসাহসিক অভিযানের প্রচেষ্টা। লেখিকা নতুন কিন্তু

দারুণ উত্তেজনায় ভরা বলে তার আকর্ষণ। তৃতীয় হল 'হটুমালার দেশে', প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আমার যুগ্ম-রচনা। তার মধ্যে ছিল দুঃসাহসিতা, সরসতা আর প্রচ্ছন্ন আদর্শবাদ। এর পর এল সত্যজিৎ রায়ের পর পর অনেকগুলি ছোট গল্প; প্রত্যেকটি দুঃসাহসিকতা, কাল্পনিকতা, সরসতা আর উত্তেজনার চূড়ান্ত। তারো পরে উপেন্দ্রকিশোরের তিনটি অপূর্ব পৌরাণিক কাহিনী। সবগুলি দেবতাদের বল-বিক্রমের সরস বিবরণ। নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ কাড়ি পায়নি। যে-সব গল্পে কাব্য-গুণের প্রাধান্য, তারাও না। সেবার আমাদের এই শিক্ষা হয়ে গেল যে ছোটরা যদিও ভাল বিচারক নয়, তবু তাদের পছন্দের একটা সুস্পষ্ট রূপ গড়ে উঠেছে। ছোটদের জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার অভাব থাকে বলে শুধু এই পছন্দ জিনিসটিকে মূলধন করে সাহিত্য রচনা চলে না। তবে এর সুবিধা নিয়ে যে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যায়, আজকালকার অনেক গল্পলেখক সে কথা জানেন। এক সময় এই ধরনের গল্পকে মা-বাবারা আর মাস্টার মশাইরা বিষবৎ পরিহার করে চলতেন। এখন সকলেই বুঝেছেন উত্তেজনার নৌকোয় চাপিয়ে অনেকখানি জ্ঞানও পাচার করে দেওয়া যায়।

ছোটদের জন্য এই ধরনের গল্প এর অনেক আগেও লেখা হয়েছিল। ১৮৯৪ থেকে প্রকাশিত 'সখা ও সাথী' মাসিক পত্রিকাতে হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড' নাম দিয়ে একটা রোমাঞ্চকর গল্প ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটিই বোধ হয় বাংলায় ছেলেদের জন্য প্রথম 'থ্রিলার'; তবে কাহিনীটি মৌলিক না অনুকরণ বলা শক্ত। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক'-এ 'ঠগী' বলে একটি উত্তেজনাময় গল্প বেরিয়েছিল। লেখকের নাম কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি একটি বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে রচিত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এসব জিনিসকে মন্দ বলা চলে না। এর জন্য অনুশীলন, অধ্যবসায়, কল্পনা, সরসতা, সবই লাগে। এ ধরনের লেখার প্রতি ছোটদের অদম্য আকর্ষণ। সে আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক। বাণী বসু সংকলিত বাংলা 'শিশু-সাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী'তে একা হেমেন্দ্রকুমার রায়েরই ষাটের বেশী রোমাঞ্চকর গল্পের বইয়ের নাম আছে। সাহিত্য রচনার প্রধান উপাদান হল কাল্পনিকতা আর রস। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, যা নেই তাকে অনুভব করবার প্রবল বাসনা সব অ্যাড-ভেঞ্চারের গল্পের পিছনে কাজ করে। এর মধ্যে কল্পনাই হয়ে ওঠে লেখকের আর পাঠকের প্রধান আশ্রয়। শুনতে যতই অদ্ভুত মনে হোক, বৈজ্ঞানিক গবেষণার পিছনেও প্রায় এই রকম মনো-ভাবই কাজ করে। কিন্তু সেখানে পরীক্ষা আর প্রযুক্তি পদে পদে গবেষকের হাত-পা বেঁধে রাখে। হাত-পা বেঁধে রাখলেও মাথা সমানে কাজ করে যায়। সে মাথার কল্পিত বিষয়গুলি দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প থেকে কম রোমাঞ্চময় নয়। এরোপ্লেন, সাবমেরিন ইত্যাদি তৈরি হবার অনেক আগে লেখকরা তার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

যতক্ষণ কাল্পনিকতাই প্রধান হয়, ততক্ষণ আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু যে মুহূর্তে রোমাঞ্চ কিম্বা উত্তেজনাই সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে, তখনি আমাদের বুদ্ধিমত্তাও বিদায় নেয়। আধুনিক শিশুসাহিত্যের সব চাইতে জনপ্রিয় বিভাগের সামনে এই সংকট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাল প্রবন্ধের বই বিশেষ চোখে পড়ে না; ছোটদের জন্য প্রায় কেউই ভ্রমণকাহিনীর বা জীবনীর বই প্রকাশ করেন না; ভাল নাটক দেখি না; ভাল কবিতার বই তবু মাঝে মাঝে দুটো একটা দেখি; সাহিত্যগুণে মণ্ডিত লেখা জনপ্রিয় হয় না। সন্দেহ হয় এখন শুধু গল্প উপন্যাসের যুগ শুরু হয়েছে। তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের গল্পের আদর আর সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভয় হয় ক্রমে ছোটরা সাহিত্যগুণের মর্মই বুঝতে পারবে না, একটা গোটা পূর্ণাঙ্গ বইয়ের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বার ধৈর্য থাকবে না। পড়তে চেষ্টা করলে হয়ত হাসি-ঠাট্টা ছাড়া কোনো ভাব বা চিন্তা উপভোগ করতে পারবে না। অনেক বাড়ীতে দেখি ছেলেমেয়েরা "ছবিতে গল্প" ছাড়া কিছু কেনে না; কিনে দিলেও পড়ে না। এর চাইতে হতাশার কথা আর কি হতে পারে?

সুখের বিষয়, যতখানি বললাম, ততটা নিরাশ হবার কারণ নেই। বিষ দিয়েই বিষ তাড়াতে হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য রোমাঞ্চময় গল্পের মধ্যে দিয়ে পাচার করে দেওয়া যায়। গল্পের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী চেনানো যায়, মহাপুরুষদের কথা মনে করিয়ে দেওয়া যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করা যায়। শুধু যায় বললেই হল না, এই রকম বই লেখা হচ্ছে। সুকুমারের মৃত্যুর পর ৫৫ বছর কেটে গেছে। লোকে বলে ত্রিশ বছরে এক পুরুষের হিসাব হয়। তার মানে প্রায় দুই পুরুষ কেটে গেছে। দুই পুরুষ লেখকরাও ছোটদের জন্য বই লিখেছেন। তাঁদের সকলের নাম করাও সম্ভব নয়। অজস্র ভাল কবিতা লেখা হয়েছে, তবু কবিরা যথেষ্ট মর্যাদা পাননি, কারণ রবীন্দ্রনাথ আর সুকুমার রায়ের পাশে বসাবার চেষ্টা করলে মর্যাদা পাওয়া কঠিন। প্রথম পুরুষের মধ্যে সুনির্মল বসু আজীবন কবিতা গল্প নাটিকা লিখে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়েছেন। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখনো অপূর্ব কবিতা লেখেন। এমন রসবোধ আর এমন কোমল হাত খুব বেশী দেখা যায় না। তাঁর স্মৃতিচারণেরও তুলনা হয় না। বইও বেরিয়েছে কিছু।

একটির নাম 'তিন্তিড়ী'। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ছোটদের জন্য কম কবিতা লেখেননি। মনে হয় প্রেমেন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যময় রচনাগুলির জুড়ি বাংলা সাহিত্যে নেই। নব্যদের মধ্যেও অনেক প্রতিভাবান কবি আছেন। যেমন ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত, বারীন বসু ইত্যাদি। বয়স্কদের মধ্যে উপেন মল্লিকের সরস কবিতার আর কবি-লড়াইয়ের নাম করা যায়।

তবু মনে হয় এটা হল গল্পের যুগ, এবং রোমাঞ্চময় গল্পের যুগ; ক্রমে ক্রমে ভ্রমণ-কাহিনী আর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ভূতের গল্পকে আগে বলা হত ছোটদের অনুপযুক্ত; কিন্তু সেই রূপকথার সময় থেকে ভূতের গল্পের কাছে আর কোনো গল্প দাঁড়াতে পারে না। আজকাল ছোটদের জন্য নানা রকম ভূতের গল্প লেখা হয়, পরলোক-তত্ত্বের খাতিরে নয়, স্রেফ রোমাঞ্চের জন্য। 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প' যেগুলিকে বলা হয়, অর্থাৎ 'সায়েন্স ফিক্শন', তার বেশীর ভাগই আজগুবি গল্প, অর্থাৎ ফ্যাণ্টাসি। পড়তে বেজায় ভাল লাগে, রোমাঞ্চের চূড়ান্ত কিন্তু সত্যিকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু থাকে না এ সব গল্পে। এই ধরনের গল্প সেকালে লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় আর এ-কালে সত্যজিৎ রায়। অপূর্ব সব গল্প সত্যজিতের, মুনশীয়ানার তুলনা নেই, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতে হয়, অবিস্মরণীয় সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নিত্য নতুন মৌলিক কাহিনী এ-সব। এ-গল্প বিজ্ঞান শেখাবার কৌশল নয়, একেই বলে 'বিশুদ্ধ শিল্প' বা 'পিওর আর্ট'। আরেক দল আছেন তাঁরা বাস্তব বিজ্ঞানের কাঠামোয় চমৎকার গল্প-উপন্যাস রচনা করেন। এ'দের মধ্যে নবাগত অজেয় রায়ের নাম করা যায়। এ'র সদ্য প্রকাশিত 'আমাজনের গহনে', 'কেল্লাপাহাড়ের রহস্য' অবশ্য অন্য স্বাদের বই, সেগুলি দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প। দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প অনেক দিন থেকেই লেখা হচ্ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' বইটির তুলনা নেই। এত কাল্পনিকতা, এত নির্ভীক ঘটনার সমাবেশ আর সবার ওপর এমন চরিত্র-চিত্রণ আর সাহিত্যরসের অনুপ্রেরণা অন্য কোনো বাংলা অ্যাড্ভেঞ্চারের বইতে আছে কি না সন্দেহ। এর পাশে দাঁড় করালে আর সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আরেকজন আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের গল্পে অনেক সময় একটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি থাকে। 'ড্রাগনের নিশ্বাস' এই ধরনের গল্প। আরো আছে, 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ', 'পাতালে পাঁচ বছর', 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' ইত্যাদি। দুঃসাহসের গল্প সম্প্রতি আরেকজন প্রতিভাবান লেখকও রচনা করছেন। তাঁর নাম শিশিরকুমার মজুমদার। তাঁর লেখার মধ্যে এমন একটা প্রবল পৌরুষ প্রকাশ পায়, যাকে আদর্শস্থানীয় বলা যায়। অনেকগুলি গল্প লিখেছেন; তার মধ্যে পুস্তকাকারে কয়েকটি বেরিয়েছে, 'আকাশে আগুন, পাতালে আগুন', 'সাগর-তলের সন্ধানী', 'তুফান দরিয়াব পরাণমাঝি' ইত্যাদি। এ'দের আগে ননীগোপাল মজুমদার, ধীরেন্দ্র লাল ধরও এই রকম বলিষ্ঠ জীবনের গল্প লিখেছেন। ধীরেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক গল্প, বাস্তব কাহিনীর নাটিকা ইত্যাদি খুবই ভাল।

বলেছি তো সকলের নাম করতে হলে একটি গোটা বই লিখতে হয়। তাহলে লোকে বুঝবে আধুনিক বাংলার শিশুসাহিত্য নিতান্ত দীনহীন নয়। কয়েকজন গুণী মেয়ে আছেন। মহাশ্বেতা দেবী, বাণী রায়, নলিনী দাশ, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, গৌরী ধর্মপাল, সুলতা সেনগুপ্ত, জয়িতা মিত্র এবং আরো অনেকে।

আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের অপূর্ব বৈচিত্র্য। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরেও অনেক সরস গল্প লেখা হয়েছে। কেউ কেউ ভারি জনপ্রিয়ও হয়েছিল যেমন, শিবরাম চক্রবর্তী। হাসির কথা জোর করে হয় না। অন্তরে তার উৎস থাকা চাই। যদিও দুনিয়ার সাহিত্য জগতে বিয়োগান্তক কাহিনীই বেশী সম্মান পায়, তবু বলি লোক কাঁদানোর চাইতে লোক হাসানো অনেক বেশী কঠিন। অনেক কঠিন এবং অনেক অনেক ভাল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাইপো সম্প্রতি তিরোহিত রবীন্দ্রলালের অপূর্ব রসজ্ঞান ছিল। তাঁর 'নতুন কিছু', 'বলি তো হাসব না', 'অ্যান্ড কোং', 'বীরবাহুর বনিয়াদী চাল', 'হাল্কা হাসির খাতা' শিশুসাহিত্যের সম্পদ। সম্প্রতি এই ক্ষেত্রে আরেকটি উজ্জ্বল তারকার উদয় হয়েছে; তাঁর নাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে অনেক আশা করি।

সরসতার কথা বলতে গেলে গোপাল ভাঁড়ের গল্প থেকে আরম্ভ করে আরো শত শত লেখা ও লেখকের নাম করতে হয়। সরস রচনা দুই রকম হয়। এক রকম হল খোলাখুলি মজার কাহিনী; আরেক রকম হল জীবন দর্শন করার সরস ভঙ্গি। কাহিনী যাই হোক না কেন, তার উপস্থাপনা হবে সরসতায় পূর্ণ। এ কাজ বোধহয় আরো শক্ত। অবশ্য শক্ত-সহজের কথাই ওঠে না। কারণ কেউ কেউ মজা করতে পারে, কেউ পারে না। চেষ্টা করে মজা করলে, হাসির চাইতে কান্না পায় বেশী।

এই নিবন্ধে বাংলা শিশুসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করা হয়নি। এত ছোট পরিসরে সেটা সম্ভবও নয়, তাই শত শত গুণী লেখকের নাম করতে পারিনি, তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোট নদীটি কোথায় উৎপন্ন হয়ে

কোন পথে এঁকে-বেঁকে, কোন পাহাড়ের জলে পুষ্ট হয়ে এখন কোথায় পোঁছেছে, তারই একটু হিসাব নেওয়া এবং সেই সঙ্গে বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের বিকাশে, ছাপাখানা আর প্রকাশালয়ের ভূমিকায় যে কত গুরুত্ব তার কিছুটা আভাস দেওয়া। পরিশেষে এই আশা প্রকাশ করি যে নিকট ভবিষ্যতে কোনো সংসাহসী প্রকাশ-ভবন কয়েকজন দক্ষ এবং উৎসাহী তরুণ গবেষকের সাহায্যে গত ৬০ বছরের বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি সহানুভূতিপূর্ণ ইতিহাস প্রকাশ করবেন।

বাংলা শিশুসাহিত্য

চিত্রা দেব

শিশুপাঠ্য বইপত্রকে মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, পাঠ্যপুস্তক—যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান; দুই, নিছক আনন্দ দেওয়াই যে সব বইয়ের লক্ষ্য। বাংলা বই ছাপা শুরু হবার পর শিক্ষানুরাগীরা প্রথম উদ্যোগী হলেন পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণের কাজে। কারণ শিক্ষার দাবি আগে, আনন্দ তার পরের কথা।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ছেলেদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপা নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয়। এর পূর্বে কলকাতায় যে সব মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাদের সময় ও শক্তি ব্যয় হত আইনের বাংলা অনুবাদ, অভিধান, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ছাপতে। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রথম পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হন। এসব বই লিখেছেন উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্য পাদ্রিরা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরা এবং স্কুল বুক সোসাইটি রামমোহন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আমন্ত্রিত পাণ্ডুলিপি ছাপিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসায় যখন লাভজনক হল তখন অনেক বাঙালী এ পথে এলেন। এ'দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তক আমাদের আলোচ্য নয়। শিশুমনে যে ধরনের বইপত্র আনন্দের উৎস তাদের পরিচিতি দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তবে বিদ্যালয়ে পড়ার বই এবং আনন্দের উপকরণ উভয়ের মধ্যে একেবারে জলনিরোধক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। কারণ, আদিযুগের শিক্ষকরাও জানতেন শিক্ষা সার্থক হয় আনন্দের আমেজের মধ্যে। তাই কেরীর 'ইতিহাসমালা' ও 'কথোপকথনে'র অনেক পাঠেই আছে গল্পের স্বাদ। তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের যৌথ প্রচেষ্টায় সংকলিত 'নীতিকথা'র মূল অবলম্বন ঈসপের গল্প। হস্তির ও উষ্ট্রের 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' ইত্যাদি বই পাঠ্যপুস্তক হলেও পশুদের গল্প শুনিয়ে শিশুদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই বিদ্যাসাগর এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেন 'বর্ণপরিচয়ে'। প্রথমভাগে ষোড়শ অধ্যায় থেকেই তিনি শিশুদের সামনে বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয়ভাগের শেষে উপহার দিলেন একটি পরিপূর্ণ গল্প। ভুবন ও তার মাসীকে নিয়ে লেখা। এটি বোধহয় প্রথম বাংলা শিশুপাঠ্য মৌলিক গল্প।

পরবর্তীকালের শিশুকবিতায় প্রথম যুগের পাঠ্যকবিতার প্রভাব যথেষ্টই পড়েছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'র 'পাখি সব করে রব' কবিতাটি পড়ে ছেলেরা এখনও আনন্দ পায়।

অবশ্য একথা মনে করা ভুল হবে যে, ছাপা শুরু হবার আগে শিশুসাহিত্য ছিল না। ছিল বৈকি। শিশুসাহিত্য বাঙালী সভ্যতার মতোই প্রাচীন। মুদ্রণপূর্ব যুগে এর অস্তিত্ব ছিল মা-ঠাকুমা-দিদিমা-ঠাকুর্দা-দাদামশাইয়ের মুখে। তাঁরা নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাতেন। তারপর কিছু কিছু কাহিনী পাওয়া গেল হাতে লেখা পুঁথিতে। বিশেষ করে অনেক পালাপুঁথি বয়স্ক ও শিশু উভয় শ্রেণীর শ্রোতারই ছিল উপযোগী। এদের মধ্যে 'দাতাকর্ণ', 'গুরুদক্ষিণা' প্রভৃতি পালা শিশু-তোষ উপকরণে সমৃদ্ধ। এছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী তো তাদের চিরদিনের মনকাড়া কাহিনী। এমনকি গাণিতিক ছড়া বা আর্যার নীরস অংককেও কিঞ্চিৎ সরস করা হত রানীর মুক্তোর মালা চুরি যাওয়া কিংবা সওদাগরের ঘোড়া কেনায় অছিলায়।

এখন মুখে গল্প শোনার দিন অতিক্রান্ত, পালাপুঁথি স্থান পেয়েছে জাদুঘরে। এর বদলে পেয়েছি চকচকে ছবিসহ ঝকঝকে বই। কিন্তু হারিয়েছি যে অনেক তা এখনকার শিশুদের জানা নেই। হারিয়েছি মা-ঠাকুরমার উষ্ণ স্নেহ-সান্নিধ্যে গল্প শোনার সুযোগ। ভয়ের বর্ণনায় তাঁদের গলা কাঁপত, বিস্ময়ে চকিত হত, করুণায় আর্দ্র হত, আর সঙ্গে সঙ্গে শিশুশ্রোতা হত রোমাঞ্চিত। এখন শুধু নিজে বই পড়ে একা একা হাসা-কাঁদা। যাক্, কি হারিয়েছি তা ভেবে লাভ নেই। কি পেয়েছি তারই একটু হিসাব নেওয়া যাক্।

পূর্বে আমরা পাঠ্যপুস্তকের কথা উল্লেখ করেছি। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিশুসাহিত্যের ক্ষীণধারা ক্রমশঃ অলক্ষ্যে বিস্তার লাভ করছিল। অবশ্য, পাঠ্যপুস্তক ও আনন্দের জন্য পঠনীয় পুস্তকের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাগ করা তখন সম্ভব ছিল না। অনেক গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল শিশুদের উপযোগী কিন্তু ভাষা তাদের অনুপযুক্ত। এটা খুবই স্বাভাবিক, কেন না ভাষার সেই নির্মীয়মান অবস্থায় শিশুদের পাঠোপযোগী রচনাশৈলী তখনও গড়ে ওঠেনি। গোলকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈসপের গল্প' (১৮০৩), চন্ডীচরণ মুন্শির 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস' (১৮২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ একাধারে পাঠ্যপুস্তক এবং গল্পপুস্তক। কিন্তু এদের পুরোপুরি শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ এদের ভাষা ও কিছু কিছু প্রকাশভঙ্গি শিশুদের উপযোগী নয়। শুধু গল্প পাঠের জন্যে লেখা হয়েছিল 'আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ' (১৮৩৮, ১ম খন্ড), আরব্য উপন্যাসের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ। শিশুসাহিত্যের আবির্ভাব নিকটতর হল বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) প্রকাশের পর। 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), ঈসপের গল্প অবলম্বনে 'কথামালা' (১৮৭৬) ও 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩-৬৪) সেই আবির্ভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল, ১৮০১ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সংস্করণের 'হিতোপদেশ'।

বিগত শতকের মধ্যভাগে গার্হস্থ্যশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫০)। এঁরা আজ প্রায় বিস্মৃত হলেও বাংলা সাহিত্যের শৈশবে এঁদের ভূমিকা স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই সমাজ অনুবাদের মাধ্যমে ছোটদের মনের পিপাসা কিছুটা মিটিয়েছিলেন। এঁদের প্রকাশিত প্রথম দুটি গ্রন্থ হল 'রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত' ও 'সেক্ষপীরের গল্প'। প্রথমটি সচিত্র গ্রন্থ, অনুবাদক জনৈক ইংরেজ জান রবিনসন। দ্বিতীয়টির অনুবাদক ডক্টর রোআর। এই অনুবাদক-সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি হান্স অ্যান্ডারসনের কয়েকটি রূপ-কথার অনুবাদ করে বিদেশী রূপকথার সঙ্গে বাঙালী শিশুদের প্রথম পরিচয় ঘটালেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'হংসরূপী রাজপুত্র' (দি ওয়াইল্ড সোয়ানস্), 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ার বিবরণ' (দি আগলি ডাকলিঙ), 'মরমেড' (দি লিট্‌ল মারমেড), 'ছোট কৈলাশ এবং বড় কৈলাশ' (গ্রেট ক্লজ এ্যান্ড লিট্‌ল ক্লজ) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই পর্যায়ের শেষ অনুবাদ গ্রন্থ সম্ভবতঃ 'ক্রীলফের নীতিগল্প' (১৮৭০)। এসময় ছোটদের জন্যে উপন্যাস লেখার চেষ্টাও শুরু হয়েছিল। হরিনাথ মজুমদার মহাভারতের পরীক্ষিৎ উপাখ্যান ও বাংলা রূপকথার গল্প মিশিয়ে রচনা করেন 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯)।

শিশুপাঠ্য মৌলিক কবিতার সূচনা হয়েছিল মদনমোহন তর্কালংকারের হাতে কিন্তু বাংলায় ভাল শিশুপাঠ্য কবিতা লেখা শুরু হয় আরো পরে। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘ ও চাতক', 'সিংহ ও মশক', 'কুক্কুট ও মণি' প্রভৃতি নীতিকবিতা ছোটদেরও ভাল লাগবে। দীনবন্ধু মিত্রের একটি দীর্ঘ কবিতা 'রাত পোহালো/ফর্সা হলো/ফুটলো কত ফুল' পাঠ্যপুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে শিশু-চিত্ত স্পর্শ করেছিল। নাট্যকার মনোমোহন বসু লিখেছিলেন সুখপাঠ্য 'পদ্যমালা'। মোজাম্মেল হকের 'পদ্যশিক্ষা'ও নীতিকবিতার সংকলন।

ছোটদের জন্য জীবনচরিত লেখার সূচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁকে অনুসরণ করে কালীময় ঘটক দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ করে লেখেন 'চরিতাষ্টক'। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা-

ভূষণের 'আত্মোৎসর্গ'ও এই জাতীয় গ্রন্থ। একই সময়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত রজনীকান্ত গুপ্তের 'আর্যকীর্তি' ও বীরেশ্বর পাঁড়ের 'আর্যচরিত' ভারতের স্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনচরিত। বাংলা শিশুসাহিত্যে এই ধারাটি আজও অব্যাহত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স থেকে দুটি জীবনী সিরিজ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থগুলির মূল্য তিন আনা হওয়ায় এগুলি তিন আনা সিরিজ নামেই পরিচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত যামিনীকান্ত সোমের 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রচরিতকথা। জীবনী সংকলনের সংখ্যাও কম নয়। মণি বাগচী, কালীপ্রসন্ন দাশ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকথা সংগ্রহ করেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল 'মার্কিন জাতির কর্মবীর', 'সাহসীর জয়যাত্রা' প্রভৃতিতে ভিন্ন ধরনের জীবনকথা বর্ণনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বৈজ্ঞানিকদের কথা আছে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ', শুভেন্দুশেখর বসুর 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী', সমরজিৎ করের 'অগ্রজ বিজ্ঞানী' প্রভৃতি গ্রন্থে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের লেখা একাধিক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা পাওয়া যাবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি শিশুপাঠ্য জীবনীগ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে, লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ রাহা, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ ও আরো অনেকে।

বাংলা শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধির সোনালী ফসলে পূর্ণ হয়ে উঠল রবীন্দ্রযুগে এসে। এতদিন শিশুসাহিত্য ছিল প্রয়োজনের ফসল। এবার শিক্ষার চাপ থেকে শিশুসাহিত্য সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আনন্দের উপকরণে পরিণত হল। 'বালক' পত্রিকার শিশুপাঠ্য রচনার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়। তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন দুভাবে। প্রথমতঃ, গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটক কিংবা পাঠ্যপুস্তক রচনা করে; দ্বিতীয়তঃ, বাংলা লোক-সাহিত্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিপুল শিশুতোষ রূপকথা, উপকথা, ছড়া, ধাঁধা, কিংবদন্তীর দিকে অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সত্যিকারের শিশুদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শুধুমাত্র 'সহজপাঠ'। কিন্তু বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেকটা অংশই তরুণ ও কিশোর পাঠকেরা উপভোগ করতে পারে। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, কিশোর পাঠ্য গ্রন্থকেও আমরা শিশুসাহিত্য বলে অভিহিত করি। শিশুসাহিত্যের পরিধি নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণতঃ চার-পাঁচ বছরের শিশু থেকে চোদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর-দের পাঠোপযোগী সাহিত্যকেই শিশুসাহিত্য বলা হয়। খুব ছোটদের জন্যে বই লেখা বড়দের পক্ষে সহজ নয়। তাই অধিকাংশ গ্রন্থই বালক ও কিশোরপাঠ্য, কিশোরেরা যেমন তিরস্কার অগ্রাহ্য করেও বড়দের বই পড়ে রসগ্রহণ করতে পারে এবং আনন্দ পায় তেমনি শিশুরাও কিশোরপাঠ্য বই পড়ে। তবে জীবনের এই দশটি বছর খুবই বৈচিত্র্যময়; পাঠ্যবিষয় ও পছন্দেরও তারতম্য আছে। বিভিন্ন বয়সের শিশু বিভিন্ন ধরনের গল্প শুনতে ভালবাসে। কারণ এক বয়সে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, অন্য বয়সে এ্যাডভেঞ্চার ভাল লাগে। বয়সের সঙ্গে এই যে গল্পরুচির পার্থক্য সে সম্বন্ধে আদিযুগের শিশুসাহিত্যিকরা সচেতন ছিলেন না। সেই সচেতনতা এল রবীন্দ্রযুগে। শিশুর মনের গণ্ডি না জুলে বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যটিকে অক্ষরে অক্ষরে মিটিয়ে এসময়ে লেখা হয়েছিল অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক। 'সহজপাঠ' তাদের অন্যতম। বিদেশে বিভিন্ন বয়সের শিশুর পরিচিত শব্দ সমীক্ষার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। লেখক যে বয়সের শিশুর জন্য বই লিখবেন সেই বয়সের শিশুর ব্যবহৃত শব্দগুলি জেনে নিয়ে তবে বই লেখেন। এই বিজ্ঞানসম্মত সুন্দর রীতিটি এদেশে প্রচলিত হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রীতি মেনে নিয়ে শিশুদের অক্ষর চেনাবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপাঠের দীক্ষাও দিয়েছেন :

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেলফুল তোলে। বেলফুল সাদা। জবাফুল লাল।

'সহজপাঠে'র বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মুকুট', 'নদী', 'কথা ও কাহিনী', 'শিশু', 'শিশুভোলানাথ', 'হাস্যকৌতুক' প্রভৃতি কিশোরপাঠ্য রচনা। 'নদী'র মতো দীর্ঘ শিশুপাঠ্য কবিতাও বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথম। 'হাস্যকৌতুকে' আছে কয়েকটি সরস নাটিকা। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ ছোটদের জন্যে নাটক লেখার কথা ভাবেননি। 'শিশু' ও 'শিশুভোলানাথ' সকলের উপভোগ্য বই।

শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্যে লিখেছিলেন খেয়ালখুশি ভরা অসম্ভাবনার গল্প 'সে', 'খাপছাড়া' ও 'গল্পস্বল্প'। প্রচলিত ধারার গল্পের সঙ্গে এদের যোগ কম বরং এডওয়ার্ড লিয়রের 'দি বুক অব ননসেন্সে'র সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশী। নিয়মের বেড়াজাল ভেঙ্গে আপাত উদ্ভট অসম্ভাবনার মধ্যে কবির আসল ব্যক্তিত্বটি হয়ত তির্যক কোথাও বা তীব্র, অসহিষ্ণু এবং প্রতিবাদ-মুখর, তবু ছোটদের রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায় না। প্রচলিত অর্থে যারা পাগল, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নিয়ম মেনে চলে না এডওয়ার্ড লিয়র তাদের নিয়ে লিখেছেন 'দি বুক অব ননসেন্স'। লুইস ক্যারলের

'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যাণ্ডে'ও তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের 'সে'-ও সব নিয়মের বেড়াজাল পেরিয়ে যাওয়া একটি উদ্ভট মানুষ। 'গল্পস্বল্প' আছে এমনি কিম্ভূত এবং অদ্ভুত মানুষের ভিড়। গল্পের সঙ্গে আছে ছড়া ও কবিতা। শেষ বয়সে কবির ঝোঁক ছিল ছবি আঁকার দিকে তাই 'সে' ও 'খাপছাড়া'য় পাওয়া যাবে কবিব আঁকা অজস্র ছবি। 'জীবনস্মৃতি'তে অকথিত শৈশব কাহিনী নিযে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য লিখেছিলেন 'ছেলেবেলা'। এই গ্রন্থটি বাংলা শিশু-সাহিত্যে আত্মজীবনী রচনার পথ খুলে দিয়েছে।

বাংলার মৌখিক সাহিত্যে যে বহু শিশুতোষ উপকবণ ছড়ানো বযেছে সেদিকে এতদিন কোন লেখকেরই দৃষ্টি পড়েনি। এমনকি লালবিহাবী দে-র 'বঙ্গীয় উপকথা'ও কোন শিশুসাহিত্যিককে আকৃষ্ট করেনি। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিখ্যাত ছড়াব 'বিষ্টি পড়ে টাপুব টুপুব নদেয এলো বান' পংক্তিটি নিয়ে একটি শিশুপাঠ্য কবিতা লেখেন। কবি নিজেও ছড়া সংগ্রহ কবেন। রূপকথা সংগ্রহে তাঁব আগ্রহেব কথা জানা যায 'ঠাকুবমাব ঝুলিব ভূমিকা পাঠ কবলে। তাঁব উৎসাহেই মৃণালিনী দেবী বাংলা রূপকথা সংগ্রহে মন দিযেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ কবিপত্নীব সংগৃহীত গল্পভাণ্ডাব থেকেই সংগ্রহ কবেছিলেন 'ক্ষীরেব পুতুলে'ব গল্প। ববীন্দ্রনাথেব ভ্রাতুষ্পুত্রী শোভনা দেবীও সংগ্রহ কবেছিলেন বাংলাব রূপকথা তবে লিখেছিলেন ইংবেজীতে। তাঁব গ্রন্থেব নাম 'দি ওবিযেণ্ট পার্লস্'। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমাবী দেবীব নামও স্মর্তব্য। তিনি শিশুসাহিত্যিক হিসাবে পবিচিতা না হলেও ছোটদের জন্যে কিছু কিছু ছড়া, কবিতা ও পাঠ্যপুস্তক বচনা ক'বেছিলেন। তাঁব ঘুম পাড়ানী ছড়াব ছিল ঘবোযা সুব, শিশুমনে এব মূল্য অপবিসীম। ইতিপূর্বে এ-ধবনেব ছড়া লেখা হযনি। স্বর্ণকুমাবীব পবে অনেকেই ছড়া লিখেছেন এবং আজও বাংলা শিশু-সাহিত্যে ছড়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ কবে বযেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলা শিশুসাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এসময় বাংলার অফুরন্ত লোকভাণ্ডাব থেকে বহু শিশুসাহিত্যিকই গল্প, রূপকথা ও ছড়া সংগ্রহ করছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন দেশজ কথন-ঐতিহ্যটিকে। গল্প কথনের মৌখিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন লেখার জগতে। ছ্যাবণ, ইসচে, রক্ত, সৈন্ঠব, আবাজ, হেংছন প্রভৃতি উল্টোপাল্টা ইচ্ছাকৃত বিকৃত শব্দও অবাধে, অনুপ্রবেশ করল। তবে অবনীন্দ্রনাথের রচনা ছোট-বড় সকলেরই উপভোগ্য। ছোটদের জন্যে ছোটদের মতো করে বলা হলেও তার রস উপভোগ করতে পারেন বড়রাই বেশী। সেজন্যে অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা শিশুমহলে জনপ্রিয় হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা 'শকুন্তলা' (১৮৯৫)। এ গল্প তাঁর নিজের লেখা নয়,

এমনকি বাংলা রূপকথাও নয়, তবু পরিচিত কাহিনীটিকে তিনি গড়েছেন রূপকথার ছাঁচে। এর পরে তিনি রচনা করেন 'ক্ষীরের পুতুল'। রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে ঈষৎ মিল থাকলেও মৃণালিনী দেবী সংগৃহীত এই বাংলা রূপকথাটিকে ঘুমপাড়ানী ছড়া দিয়ে মুড়ে অবনীন্দ্রনাথ উপহার দিয়েছিলেন বাংলার শিশুদের। ছোটরা এখনও 'ক্ষীরের পুতুল' পড়ে, পড়ে আনন্দ পায়। 'ক্ষীরের পুতুলে'র স্বপ্নরাজ্য সত্যিকারের রাজার রাজ্যে পরিণত হল 'রাজকাহিনী'তে। বাংলা ভাষার এমন জমকালো বর্ণাঢ্য রূপ শিশুসাহিত্যে বিরল।

শিশুর বিস্ময় ও বিশ্বাসের জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। অবনীন্দ্রনাথের গল্পও তেমনি কল্পলোকের সীমা ছাড়িয়ে অসম্ভবের সীমা স্পর্শ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ছোটদের শুনিয়েছিলেন অসম্ভাবনার গল্প আর অবনীন্দ্রনাথ কল্পনার সঙ্গে দিকহারা উদ্ভটের মিশ্রণে রচনা করলেন 'ভূতপতরীর দেশ'। এছাড়া তিনি শিশুদের জন্যে লিখেছিলেন অনেকগুলো যাত্রাপালা। বাংলা শিশুসাহিত্যে পালা, পুঁথি বা যাত্রা লেখার প্রয়াসও এই প্রথম। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ঈসপের গল্প প্রভৃতি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কঞ্জুষের পালা', 'গোল্ডেন গুজ পালা', 'লম্বকর্ণ পালা', 'মউবচ্ছালের পালা', 'ধোড়াকাক', 'বুড়োশেয়াল ইত্যাদির পালা। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছিলেন, 'বিশুদ্ধ পাগলামীর কারুশিল্প', বলেছিলেন, এমন লেখা "আর কারুর কলম থেকে বেরোবার জো নেই।' অবনীন্দ্রনাথের বাঁধনছাড়া আনন্দ-খেয়াল আরো প্রকাশ পেয়েছে যাত্রার সঙ্গে কথকতার রস মিশিয়ে লেখা মারুতির পুঁথি বা চাঁইবুড়োর পুঁথিতে। যদিও এসব রচনা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে শিশুর মনোলোকে পাকা আসন লাভ করেনি তবু শিশুদের জন্যে অবনীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

অবনীন্দ্রনাথের চারটি বই বিদেশী রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এরা হল, সুইডিশ লেখিকা সেলমা ল্যাগেরলফের 'দি এ্যাডভেঞ্চারস্ অব নীলস্' (বুড়ো আংলা), জেমস্ ম্যাথু বেরীর 'পিটার প্যান' (খাতাঞ্চির খাতা), রিচার্ড হ্যারিস বারহামের 'দি ইনগোলড্সবি লিজেন্ডস্' (হানাবাড়ির কারখানা) ও ফ্লোরেন্স ইয়েটস্ হানের 'দি স্টোরি অব চ্যানটিক্লিয়ার' (আলোর ফুলকি)। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কথনশৈলী বিদেশী কাহিনীকে এমনভাবে আত্মসাৎ করেছে যে তাদের অনুবাদ বলে মনেই হয় না। তিনি চিত্রশিল্পী সেজন্যে ছোটদের জন্যে লেখা বইয়ে ছবিও এঁকেছেন, সেইসঙ্গে এঁকেছেন কথার ছবি। তাই তাঁর নিজের দেওয়া আত্মপরিচয়টিই ছোটদের কাছে তার আসল পরিচয়, 'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে।'

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও বলা চলে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রকৃত স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাতে। তিনি হাসি ও খেলা' সংকলন করেন ১৮৯১ খৃীষ্টাব্দে। বাংলা ভাষায় এমন 'গৃহপাঠ্য ও পুরস্কার প্রদানযোগ্য সচিত্র গ্রন্থের অভাব ছিল। কবিতা ছড়া, গল্প ধাঁধা পশুপাখিদের বিবরণের সঙ্গে এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মোটা রেখায় আঁকা একরঙা ছবি।

বাংলা লোকসাহিত্যে শিশুদের উপযোগী রূপকথা থাকলেও দীর্ঘদিন সেগুলি সংগ্রহ করা হয়নি। লালবিহারী দে র 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল' প্রকাশের পরেও নয়। কিন্তু ইউরোপে রূপকথা এসেছে অনেক আগে। শার্ল পেরো ১৬৯৭ খৃীষ্টাব্দে চীনা রূপকথা থেকে সংকলন করেন সিন্ডারেলার গল্প। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮১২ ২৪) গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন রূপকথার সংকলন 'কিন্ডার মার্চেন'। ১৮৩৫ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত ডেনমার্কের হান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথাগুলিও অবিস্মরণীয়। এদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথমযুগেই এবং তার আবেদন এখনও কমেনি। তবু দীর্ঘকাল বাংলার নিজস্ব রূপকথা সংকলিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর ছড়াধর্মী কবিতাগুলির পরে যোগীন্দ্রনাথই প্রকাশ করলেন 'খুকুমণির ছড়া'। এইজাতীয় ছড়ার সংকলন বাংলা শিশুসাহিত্যে প্রথম·

আটুল বাটুল শ্যামলা সাটুল
শ্যামলা গেল হাটে,
শ্যামলাদের মেয়ে দুটি
পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না
ছোলা ভাজা দেবো,
আবার যদি কাঁদো তবে
তুলে আছাড় দেবো।

এসব ছড়া যোগীন্দ্রনাথের নিজের লেখা নয়, সংকলনমাত্র। তাঁর নিজের লেখা ছড়ার সংখ্যাও কম নয়। শিশুপাঠ্য রচনায় যোগীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয় বিদ্যালয়পাঠ্য 'জ্ঞানমুকুল' (১৮৯০) রচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও তিনি তুলনাহীন। তাঁর 'হাসিখুসি'র মতো শিশু-

প্রিয় হবার দাবি আর কোন বই করতে পারে কিনা সন্দেহ। যারা নেহাৎ শিশু, সবে পড়তে শিখছে 'হাসিখুসি' তাদেরই বই। এর পাতায় পাতায় ছড়ানো রয়েছে ছবি ও ছড়ার ছবি। 'টেন লিট্‌ল নিগার বয়েজে'র অনুসরণে তিনি যে যোগবিয়োগ শেখাবার জন্যে 'হারাধনের ছড়া'টি লিখেছিলেন আজও তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি।

যোগীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আছে অসংখ্য শিশুপাঠ্য ছড়ার বই, গল্প, ভারতীয় মহাকাব্যের কাহিনী, হাল্কা হাসির নক্‌শা, শিকার কাহিনী প্রভৃতি। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহজ-সরল শব্দচয়ন ও শিশুমনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা। আজগুবী ছড়ার প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বেশী। যা বাঁধানিয়মে চলে না তার প্রতিই তাদের আগ্রহ। তাই:

এক যে আছে মজার দেশ
সব রকমের ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।

পড়বার সংগে সংগেই শিশুদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। যোগীন্দ্রনাথের 'হাসিরাশি' প্রভৃতি অধিকাংশ বইয়েই ছবি থাকত। ছোটদের মনের মতো ছবি আঁকতেন চিত্রশিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। এসময় 'মুকুল' পত্রিকা বিলাতী ম্যাগাজিন থেকে অজস্র মজার ছবি সংগ্রহ করে তরুণ লেখকদের কাছে ছবির উপযোগী ছড়া আহ্বান করায় যোগীন্দ্রনাথ ছবির সংগে খাপ খাইয়ে বহু ছড়া রচনা করেন, পরে সেগুলি ছবিসহ 'হাসিরাশি'তে স্থান পায়। এডওয়ার্ড লিয়রের 'ননসেন্স ভার্সে'র মতো যোগীন্দ্রনাথেরও বহু উদ্ভট ছড়া পাওয়া যাবে। 'কাজের ছেলে', 'পেটুক দামু', 'কালা হাবে কি ধলা হাবে' এ জাতীয় ছড়ার সার্থক উদাহরণ।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

যোগীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালে বাংলার রূপকথা-উপকথাতে মৌখিক সাহিত্য সম্পদ থেকে চয়ন করে শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে বাংলার রূপকথা অবিকলভাবে কলমবন্দী হয়ে এযুগের শিশুদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ভাষায় ভঙ্গিতে বাংলার রূপকথাকে তিনি কিছুটা সাধুবেশ পরালেও ঠাকুমার কথা বলার ঢঙটি পুরোমাত্রায় বজায় আছে। গল্প বলার এই ভঙ্গি দক্ষিণারঞ্জনের অন্যান্য গ্রন্থেও রয়েছে তবে অন্যগুলি প্রথমটির মতো শিশুপাঠকদের আকৃষ্ট করেনি। আসলে দক্ষিণারঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছিল বিগত যুগের লুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য। বাংলা কথাসাহিত্যের চারটি বিভাগ আছে: গীতিকথা, রূপকথা, ব্রতকথা ও রসকথা। দক্ষিণারঞ্জন 'দাদামশায়ের ঝুলি'তে গীতিকথা, 'ঠানদিদির থলে'তে ব্রতকথা, 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে রূপকথা ও 'দাদামশায়ের থলে'তে রসকথা পরিবেশ করেছেন। ছোটদের উপযোগী সহজ করে লেখা বলে অনেকেই এদের শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন কিন্তু

লোককথার সব কটি শাখাই যে শিশুদের উপযোগী তা নয়, শুধু রূপকথার স্বাদ শিশুরা উপভোগ করতে পারে তাই 'ঠাকুরমার ঝুলি'ই অধিকতর সমাদৃত হয়েছে।

কথা-সংগ্রহ ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন ছোটদের জন্যে লিখেছিলেন উপন্যাস, মৌলিক রূপকথা প্রভৃতি। বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য দান মৌলিক কিশোর উপন্যাস 'চারু ও হারু' আর মৌলিক রূপকথা 'সবুজ লেখা'। 'বাংলার সোনার ছেলে'র বিষয় রবীন্দ্রনাথ, আর 'পৃথিবীর রূপকথা' অনুবাদগ্রন্থ। কিন্তু বাংলা শিশুসাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রূপকথাগুলি, এই গ্রন্থের ছবিগুলিও তাঁরই আঁকা।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রদর্শিত পথে রূপকথা সংগ্রহ করেন শিবরতন মিত্র ও সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। শিবরতন পল্লীচিত্র অংকনে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'সাঁঝের কথা' ও 'নিশির কথা' ছাড়াও 'আমার কথাটি ফুরোলো' ছড়াটিকে অন্যতম মূল্যবান সংগ্রহ বলা যায়। সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী 'ঠাকুরমার ঝোলা' ও 'ঠাকুরদাদার ঝোলা'য় রূপকথার সঙ্গে সংগ্রহ করেন কিছু ঘুমপাড়ানী ছড়া। বাংলা রূপকথাকে ভাষাভঙ্গি দিয়ে সরস করে তুলেছিলেন কার্তিক দাশগুপ্ত। 'টুলটুল', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি', 'ময়ূরপঙ্খী' ও 'আগডুমবাগডুম' অত্যন্ত সফল রচনা। 'ফুলঝুরি' ও 'তাইতাই'-এ আছে হাসির ছড়া। বিধুভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি' ও 'কাঠবেড়ালীভাই' পল্লীবাংলার লোককথা অবলম্বনে লেখা। এখনও বাংলা শিশুসাহিত্যে রূপকথা রচনার ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। ছোটরা চিরকালই রূপকথাবিলাসী। লেখকরাও দেশ-বিদেশের রূপ-কথা সংগ্রহ করেছেন নানাভাবে। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'রাজ্যের রূপকথা', 'রাশিয়ার রূপকথা', 'বাংলার রূপকথা' (২ খণ্ড), 'রূপকথার ঝাঁপি', 'ভারতের রূপ-কথা', 'ছোটদের গল্প' (মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা) প্রভৃতি গ্রন্থ। 'বাংলার রূপকথা' লালবিহারী দে-র 'ফোক টেল্‌স অব বেঙ্গল' অবলম্বনে লেখা হয়। পরবর্তী-কালে এ গ্রন্থটির আরো অনুবাদের কথা জানা গেছে। লীলা মজুমদার 'বাংলার উপকথা' নামে এবং এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় 'বাংলার লোককথা' নামে গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। হান্স অ্যান্ডারসনের গল্প মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকেই অনূদিত হচ্ছে। শিবনাথ শাস্ত্রী পুনরায় অ্যান্ডারসন ও গ্রিমভ্রাতৃদ্বয়ের গল্প অনুবাদ করেন 'উপকথা'য়। ইদানীংকালে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আবার নতুন করে অনুবাদ করেছেন 'গ্রিমের গল্পসমগ্র'। লীলা মজুমদার অনুবাদ করেছেন হান্স অ্যান্ডারসন ও লুইস ক্যারলের চিরনতুন রচনাসমগ্র। বুদ্ধদেব বসু অ্যান্ডারসনের নির্বাচিত গল্প অনুবাদ করেন 'অপরূপ রূপকথা'য়। সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর 'হিন্দু-স্থানী উপকথা', অসিতকুমার হালদারের 'চীনা রূপকথা', 'হো-দের গল্প', 'বুনোগপ্পো' স্মরণীয়। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাপানী ফানুস', 'কল্পকথা' ও 'ঝুমঝুমি' জাপানী রূপকথা অবলম্বনে লেখা। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সংগ্রহ করেন সাঁওতালী রূপকথা 'উদোল বুড়োর সাঁওতালী গল্প'। ইন্দিরা দেবী সংকলন করেন 'দেশবিদেশের রূপকথা'। অতি আধুনিক শিশুসাহিত্যও রূপকথা-প্রভাবিত। তাই একদিকে প্রকাশিত হচ্ছে রূপকথার অজস্র অনুবাদ অপরদিকে রচিত হচ্ছে মৌলিক রূপকথা। শৈলেন ঘোষের রূপকথাশ্রয়ী রচনা 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', 'হুম্পোকে নিয়ে গপ্পো', 'আজব বাঘের আজগুবি', 'ছোট্ট সোনার গল্প শোনা', 'আমার নাম টায়রা' প্রভৃতি গ্রন্থের জনপ্রিয়তা দেখে শিশুচিত্তে রূপকথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ স্বদেশের অতীত গৌরবের দিকে ফিরে তাকাতে শুরু করেছিলেন। শিশু সাহিত্যিকরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁরা একদিকে যেমন বাংলার লোকসাহিত্য থেকে নানারকম উপাদান সংগ্রহ শুরু করলেন অপরদিকে রামায়ণ মহাভারত, পুরাণের গল্প সম্ভারের দিকেও নতুন করে তাঁদের চোখ পড়ল। ছোটদের জন্যে রামায়ণ লেখার সূত্রপাত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। গদ্যভাষায় সংক্ষেপে লেখা এই 'শিশুরামায়ণ'খানি প্রকাশ করেন তিনকড়ি চক্রবর্তী। এরপরে ছোটদের জন্যে পদ্যে 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' (১৮৯১) লেখেন নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। গ্রন্থটি জনপ্রিয়তা অর্জন করলে নবকৃষ্ণ আরো ছোটদের জন্যে লেখেন 'টুকটুকে রামায়ণ'। উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছেলেদের মহাভারত' এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। গ্রন্থদুটির ভাষা ও রচনাশৈলী ছোটদের উপযোগী। যোগীন্দ্রনাথ সরকারও লিখেছিলেন 'ছোটদের রামায়ণ' ও 'ছোটদের মহাভারত'। এ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যম ভ্রাতা কুলদারঞ্জন রায়ের নামও স্মরণীয়। তিনি বাংলার শিশুদের শুনিয়েছিলেন পুরাণের গল্প। সংস্কৃত গল্প-ভান্ডার থেকে চয়ন করে তিনি ছোটদের জন্যে লিখলেন 'ছোটদের পুরাণের গল্প', 'কথাসরিৎ-সাগরের গল্প', 'ছেলেদের পঞ্চতন্ত্র', 'ছেলেদের বত্রিশ সিংহাসন', 'ছেলেদের বেতালপঞ্চবিংশতি', 'পৌরাণিক গল্প' ইত্যাদি। অপরদিকে সহজ সরল ভাষায় তিনি শোনালেন বিদেশের গল্প 'ইলিয়াড', 'ওডিসিয়ুস', 'রবিনহুড', 'ডনকুইকজোট', 'ট্যালিসম্যান', 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' প্রভৃতি।

বাংলা শিশুসাহিত্য রায়চৌধুরী পরিবারের দানে সমৃদ্ধ হয়েছে খুব বেশী পরিমাণে। শিশু ও

কিশোরের উপযোগী সহজ ভাষা উপেন্দ্রকিশোর আয়ত্ত করেছিলেন। ছোটদের কাছে ছোটদের মতো ভাষায় বললেই যে বিষয়টি সবসময় ছোটদের সহজবোধ্য হয় তা নয়, অনেকসময় শিশু তার রসগ্রহণ করতে বাধা পায়। অবনীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় তার প্রমাণ আছে। কিন্তু যেটি যেভাবে বললে শিশুর কাছে সহজ হবে উপেন্দ্রকিশোর তা জানতেন। তাই তিনি একদিকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প লিখলেও অন্যদিকে লিখেছেন 'টুনটুনির বই'। পূর্ববঙ্গের লোককথা থেকে টুনটুনির গল্প সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এ গল্পের সঙ্গে রূপকথার যোগ নেই, এদের উদ্ভব পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। তাই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা মৌখিক আটপৌরে ভঙ্গিতে লেখা।

রচনা ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন রঙ-বেরঙের অজস্র ছবি এঁকে। রঙ ও রেখা দিয়ে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলে সমগ্র বইখানিকে শিশুদের কাছে সুন্দর করে উপস্থিত করার ব্যাপারে তিনিই পথিকৃৎ। এর আগেও ছোটদের বইয়ে ছবি থাকত, কিন্তু রচনার বক্তব্য পরিস্ফুটনে তারা এমন সহায়তা করত না। উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।

উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়, সুবিমল রায় এবং জ্যেষ্ঠাকন্যা সুখলতা রাও—তিনজনেই শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এঁদের মধ্যে সুকুমার রায় অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শৈশবে মাত্র আট বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আবোল তাবোল' (১৯২৩) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে। উদ্ভট কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই শ্রেণীর কবিতা 'খিচুড়ি'তে ভাষার কারসাজিতে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নানারকম উদ্ভট প্রাণী:

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল "হাঁসজারু" কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপে—"বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি।"

এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গিরগিটিয়া, মোরগরু, বিছাগল, জিরাফড়িং, হাতিমি ও সিংহরিণ। এই উদ্ভট সন্ধির নিয়মে যারা সৃষ্টি হল সুকুমার রায় তাদের ছবি আঁকতেও ভোলেননি। এভাবেই এসেছে কাঠবুড়ো, ছায়াধরা ব্যবসাদার, চণ্ডীদাসের খুড়ো কিংবা ফুটোস্কোপ আবিষ্কর্তা। বাংলা সাহিত্যে এদের সংখ্যা বেশী নয়। লুইস ক্যারল ও এডওয়ার্ড লীয়রের রচনায় এধরনের অদ্ভুত-কিম্ভূতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু তারা বাস করে কল্পনার জগতে। সুকুমার রায় তাদের নিয়ে এসেছিলেন বাস্তব জগতে—ট্যাঁশ্‌গরু, কুমড়ো পটাশ, রামগরুড়ের ছানা সবাই জীবন্ত এবং ছোটদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য। 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই', 'হযবরল', 'পাগলা দাশু' কিংবা 'দ্রিঘাংচু'ও তাই ছোটদের খুব প্রিয়।

সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই' ও 'আরো গল্প' একেবারে বালভাষিত গদ্যে লেখা। সবে মাত্র যারা পড়তে শিখেছে একান্তভাবে তাদের জন্যেই ছোট মাপে ঘরোয়া ভঙ্গিতে রচিত। তাঁর 'নিজে পড়', 'আলিভুলির দেশে' ও নানান গল্প' শিশুদের প্রিয় বই। সুবিনয় রায়ের 'খেয়াল, 'কাজির বিচার', 'বলতো', 'জীবজগতের আজবকথা' কিংবা 'আজব বই' শিশুদের মনোরঞ্জনে সমর্থ। সুবিমল রায়ের 'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলাশিশুসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাশাখারও উন্নতি হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় প্রমুখ কবি শিশুদের ছড়া রচনায় অভূতপূর্ব সাফল্যের উদাহরণ রেখে গেলেও শিশুদের জন্যে ভাল কবিতা খুব বেশী লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' বা 'শিশুভোলানাথে'র কথা মনে রেখেও বলা যায় ছোটদের জন্যে লেখা কবিতা তখনও পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের মুখাপেক্ষী। প্রথমে যে উদ্দেশ্যেই লেখা হোক না কেন পরিণামে এ জাতীয় কবিতা পড়ার বইয়ে স্থান পাওয়ায় তার প্রতি শিশুদের আকর্ষণ কমে যেত। অথচ কাজী নজরুল ইসলামের 'থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে/দেখবো এবার জগৎটাকে' পড়তে শিশুদের ভাল লাগারই কথা। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'শোলোক বলা কাজলা দিদি'ও স্মরণীয় কবিতা। তবু কাজী নজরুল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বন্দে আলী মিয়া, জসীমউদ্দীন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবির কবিতা আজ পাঠ্যপুস্তকের জগতেই সীমাবদ্ধ। মনোমোহন সেনের 'খোকার দপ্তর' ও 'মোহন ভোগ' অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরও প্রশংসা পেয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক হলেও তাতে শিশুর রসোপভোগে ব্যাঘাত ঘটেনি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বহু শিশুতোষ উপকরণ ছড়ানো আছে। তিনি ছোটদের জন্যে কবিতা না লিখলেও তাঁর কবিতার কল্পজগতে ছোটরাই বেশী স্বচ্ছন্দ। পরীদের কবিতা, 'ঝর্ণা'র জলতরঙ্গ, 'পাল্কীর গান' ছন্দবৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয়। শিশুসাহিত্যে তাঁর প্রথম দান 'ইঁদুরের মোকর্দমা':

"...কহে যমরাজ বিড়ালের কথা শুনি,
'বিড়াল খালাস! ছেড়ে দাও এখখুনি।
যাও পুষি। তুমি মর্ত্যে বিরাজ কর,
ক্ষেতে খামারে অবাধে ইঁদুর ধর।
নেংটি বেটারে রাখ্ তো তুড়ুং ঠুকে,
মিথ্যা নালিশ! ধর্মের সম্মুখে!"

সত্যেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী সুনির্মল বসু। তিনি বিভিন্ন রসের অজস্র কবিতা রচনা করে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীবনী, স্মৃতিকথা সর্বত্রই তাঁর দক্ষ হাতের স্পর্শ অনুভব করা যায়। কবিতার জগতে তিনি এনেছিলেন নতুন সুর। 'মৌচাক' কবিতাটিই স্মরণ করা যেতে পারে:

চাঁদটা যেন সত্যিকারের আলোরই মৌচাক
দুষ্টু ছেলের ঢিলটা লেগে হঠাৎ হলো ফাঁক।
আজকে রে ভাই সাঁঝের বেলায়
আলোর মধু সব ঝরে যায়
হাজার তারা মৌমাছিরা উড়লো ঝাঁকে ঝাঁকে
নীল আকাশের নিতল নীলে উড়লো ঝাঁকে ঝাঁক—

সুনির্মল বসু ছোটদের জন্যে অনেক লিখেছেন কিন্তু তাঁর কবিতাই ছোটদের সবচেয়ে প্রিয়। তিনি শিশুদের ছন্দ ও কবিতা শেখাবার জন্যে লিখেছিলেন 'ছন্দের টুংটাং', 'ছন্দের গোপনকথা', 'ছন্দের ঝুমঝুমি' ও 'ছোটদের কবিতাশেখা'।

কিশোরদের দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার জন্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কতকগুলি ছড়া রচনা করে 'ঘুমতাড়ানী ছড়া' নামে প্রকাশ করেন। কিশোর কবি সুকান্তের কোন ছড়াকেই শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাঁর 'পুরনো ধাঁধা'র:

বলতে পারো বড়ো মানুষ মোটর কেন চড়বে?
গরিব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?

প্রভৃতি পংক্তির রস উপভোগ করতে পারেন বড়রাই। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়ার কথাও উল্লেখ করতে হয়:

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
দেশটি ভেঙে ভাগ করো।

তবে তাঁর 'রাঙাধানের খৈ' 'ডালিম গাছের মৌ', 'হৈরে বাবুই হৈ' শিশুপাঠ্য ছড়ার বই হিসাবে উপভোগ্য। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'সাদাবাঘ', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মিউয়ের জন্যে ছড়ানো ছিটোনো' প্রভৃতি ছড়ার বই হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে।

শিশুপাঠ্য-রচনায় মহিলারাও বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশুসাহিত্যে তাঁরাই এনেছেন শিশুর উপযোগী ঘরোয়া পরিবেশ। স্বর্ণকুমারী দেবীর পরে অনেকেই শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী 'হিন্দুস্থানী উপকথা' ছাড়াও সরস অনুবাদ করেছেন 'নিরেট গুরুর কাহিনী ও অন্যান্য গল্প'। মহিলা শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন রায়চৌধুরী পরিবারের কন্যা লীলা মজুমদার। তাঁর 'পদীপিসীর বর্মীবাক্স', 'হলদেঝুঁটি মোরগদুটি', 'বাতাসবাড়ি', 'বহুরূপী', 'মণিমালা, 'নাকগামা' প্রভৃতি গ্রন্থ শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। আশাপূর্ণা দেবী সাধারণতঃ বড়দের জন্যেই লেখেন কিন্তু ছোটদের জন্যেও কম লেখেননি। তাঁর লেখিকাজীবন শুরু হয় শিশুপাঠ্য রচনা দিয়েই। 'রাজকুমারের পোষাকে', 'গজউকিলের হত্যারহস্য', 'শোনো শোনো গল্প শোনো' ও আরো বহু রচনায় আশাপূর্ণা দেবী শিশুদের মন জয় করতে পেরেছেন। তাঁর 'ভুতুড়ে কুকুর' অনবদ্য রচনা। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ছোটদের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক 'আনন্দ পাঠ'। কণা বসুমিশ্রের 'টাপুনের টিয়াপাখি', 'হাতুড়ে ডাক্তারের ভুতুড়ে বাড়ি' হাসির গল্প। নলিনী দাশের 'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার'ও ছোটদের বই।

বাংলা শিশুসাহিত্যের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মূল্য অপরিসীম। যদিও শিশুপাঠ্য রহস্যকাহিনী, ভৌতিককাহিনী বা গোয়েন্দা গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব প্রাচীন নয়। প্রথম দিকের অলৌকিক গল্পে হাড়হিম করা গা ছমছমে শিহরণের ভার ছিল না। 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রমদাচরণ সেনের 'ভীমের কপাল'ই সম্ভবতঃ প্রথম মৌলিক কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। উপন্যাসের নায়ক বাঙালী কিশোর ভীম। তবে 'ভীমের কপাল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তারপর 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক

ভুবনমোহন রায় লিখেছিলেন 'সুন্দরবনে সাতবৎসর' নাম আর একটি এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। তবে খুব সফল হননি। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিশুপাঠ্য থ্রিলার 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড' সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। এ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাতে'র কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাঁর ডাকাত-কাহিনী সুখপাঠ্য ও রোমাঞ্চকর হলেও এ্যাডভেঞ্চার নয়। বহু ঐতিহাসিক গল্পপ্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ আরও একটি নতুন কাজ করেছিলেন। এগার খণ্ডে প্রকাশিত ছোটদের বিশ্বকোষ 'কিশোর ভারতী'র তিনিই ছিলেন সম্পাদক।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সুনির্মল বসু

বাংলা শিশুসাহিত্যে এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর প্রকৃত প্রবর্তক হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর 'যখের ধন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরমহলে অভাবনীয় সাড়া পড়ে যায়। 'মানুষ পিশাচ', 'সোনার আনারস', 'জেরিনার কণ্ঠহার', 'জয়ন্তের কীর্তি', 'দেড়শো খোকার কাণ্ড', 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' প্রভৃতি প্রায় আশিখানি গ্রন্থ রচনা করে হেমেন্দ্রকুমার বাংলা শিশুসাহিত্যে এ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দাকাহিনীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। এসব গল্পের কতক অংশ বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে এবং কতক মৌলিক রচনা। হেমেন্দ্রকুমার বাংলার কিশোরদের উপহার দিয়েছিলেন দুটি অবিস্মরণীয় চরিত্র জয়ন্ত ও মাণিক। শার্লক হোমস ও ওয়াটসনের ছায়ায় গড়া এই চরিত্র দুটি কিশোরসাহিত্যে প্রথম গোয়েন্দা ও তার সহকারী। পরে নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী রায় ও সুব্রত এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্শী ও শৈলেনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে কিরীটী ও ব্যোমকেশ বড়দের সাহিত্যেও অবাধ বিচরণ করে। ব্যোমকেশকে বরং বড়দের গোয়েন্দা বলাই সঙ্গত। এ প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জাপানী গোয়েন্দা হুকাকাশির নামও স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি উপন্যাস এক সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পের ফেলুদা বা প্রদোষ মিত্র এবং তার ক্ষুদে সহকারী তোপ্সেও এই পর্যায়ের দুটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। হেমেন্দ্রকুমারের গল্পের আর একটি চরিত্র সুন্দরবাবুও স্মরণীয়। চরিত্রটি নিজে না হেসে অপরকে হাসায়। সত্যজিৎ রায়ের উপন্যাসেও আছে লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু, নিরীহ কিন্তু নির্বোধ নয়। এই চরিত্রটিও অনাবিল হাসির উৎস। 'বাদশাহী আংটি' এই পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী রায় যেমন 'কালোভ্রমরে' প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর চিত্তে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছিল ফেলুদাও সেভাবেই তাদের চিত্ত জয় করেছে। সত্যজিৎ রায়ের উপন্যাসে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসাবে থাকে একটা ভ্রমণের স্বাদ। 'গ্যাংটকে গণ্ডগোলে' সিকিম, 'সোনারকেল্লা'য় রাজস্থান, 'জয়বাবা ফেলুনাথে' কাশীর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। বাংলা কিশোরসাহিত্যে ফেলুদার অগ্রজ আরো দুটি দাদা আছে তারা হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির গল্পের রাজা টেনিদা ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের আজগুবী গাঁজাখুরি গল্পকথক

ঘনাদা। তবে তাদের সঙ্গে ফেলুদার কোন মিল নেই। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসার শঙ্কুর নামও স্মরণ করা যায়। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পনাপ্রসূত ফ্যান্টাসি ও সায়েন্স ফিকশানের নায়ক প্রোফেসার শঙ্কু।

শিশুসাহিত্যে সায়েন্স ফিকশানের শুরু হয়েছে প্রধানতঃ অনুবাদের মধ্য দিয়ে। জুলে ভার্নের 'জার্নি টু দি সেন্টার অফ দি আর্থ', 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন', 'ফাইভ উইকস্ ইন এ বেলুন' প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় সায়েন্স ফিকশান রচনার সূত্রপাত হয়। সূচনা করেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। হেমেন্দ্রকুমার রায়ও এজাতীয় গল্প 'অদৃশ্য মানুষ' (দি ইন্‌ভিজিব্‌ল ম্যান), 'মানুষের গড়া দৈত্য' (ফ্রাঙ্কেনস্টাইন) অনুবাদ করেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সত্যজিৎ রায়ের 'প্রোফেসার শঙ্কুর গল্পগুলিও এজাতীয় রচনা। দীপঙ্কর লাহিড়ীর 'বিপ্রতীপবিশ্ব', অজেয় রায়ের 'ফেরোমন', সমরজিৎ করের 'সেই দিনটি ভয়ংকর' ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের 'মানুষ যেদিন হাসবে না' গ্রন্থ চারটিও শিশুমনোরঞ্জনে সমর্থ। ছোট-বড় সকলের জন্যে বেশ কিছু মনোজ্ঞ সায়েন্স ফিকশান লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধন। শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এধরনের গ্রন্থও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

রহস্যকাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভূতের গল্প। খুব ছোট শিশুরা ভালবাসে রাক্ষস-খোক্কস-ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর গল্প। একটু বড়রা পড়তে ভালবাসে হানাবাড়ি, কবরখানা, অন্ধকার শ্মশান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে যেসব ভৌতিক গল্প গড়ে ওঠে সেইসব কাহিনী। বাংলায় এজাতীয় গ্রন্থের সূচনাও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাতে। তাঁর 'যখের ধন', 'মানুষ পিশাচ' গোয়েন্দা গল্প হলেও তাতে মিশেছে ভৌতিক গল্পের শিহরণ। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'ভূতের বোঝা', দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'কায়াহীনের কবলে', হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভয়ের মুখোশ', 'কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গোসাঁই বাগানের ভূত', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভৌতিক পালঙ্ক', মহাশ্বেতা দেবীর 'ভয় দেখানো ভয়ংকর', সুরেশচন্দ্র বসুর 'ভূতের গল্প' প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থের নাম করা চলে। বিদেশী গল্পের অনুবাদ ছাড়া কয়েকটি ভূতের গল্পের সংকলনও পাওয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত বড়রা যুদ্ধ ও শিকারকাহিনী পড়তে ভালবাসে। রাজায়-রাজায় যুদ্ধের গল্প ছোটরা মায়ের কোলে বসে শুনলেও মহাযুদ্ধের কাহিনী কিশোর পাঠকদের আকৃষ্ট করে বেশী। ধীরেন্দ্রলাল ধর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আটটি যুদ্ধের গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'অসি বাজে ঝনঝন', 'আফ্রিদি সীমান্তে', 'আবিসিনিয়া ফ্রন্টে', 'ওয়ারস'র আকাশে', 'মহাচীনে মহাসমর' সবই যুদ্ধের গল্প।

যুদ্ধের সঙ্গে শিকারকাহিনীর প্রসঙ্গও স্মরণীয়। ছোটরা শিকারের গল্প শুনে রোমাঞ্চিত হয়। কুমুদনাথ চৌধুরীর বিখ্যাত শিকারকাহিনী ছোটদের জন্যে অনুবাদ করেন প্রিয়ম্বদা দেবী (ঝিলেজঙ্গলে শিকার)। এজাতীয় আরো অনেক গ্রন্থ আছে, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'বনেজঙ্গলে', আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গভীর জঙ্গলে', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঘের মুখে', ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'বাঘের লুকোচুরি', রঞ্জন সেনের 'আফ্রিকার শিকার', শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'আফ্রিকার বনেজঙ্গলে' ও 'কালকেউটে' প্রভৃতি। সাম্প্রতিককালে বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে', 'বনবিবির বনে', 'মউলির রাত' প্রভৃতি শিকারকাহিনীও শিশুদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে। বুদ্ধদেব গুহর ঋজুদাও শিকার প্রেমিক শিশুদের প্রিয় চরিত্র। আমাদের ঘরের কাছেই রয়েছে সুন্দরবন। কাজেই সুন্দরবনকে নিয়েও অনেক বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিব-শঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'সুন্দর বনের মানুষ বাঘ' ('রবিন হুডের গল্প অবলম্বনে), অতনু দত্তের 'সুন্দরবনের জঙ্গলে' প্রভৃতি।

ছোটদের জন্যে গল্প ও উপন্যাস রচনার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ 'বালক' পত্রিকার জন্য লিখলেও 'রাজর্ষি' উপন্যাসকে আমরা শিশুপাঠ্য বলে অভিহিত করতে পারিনি। তবে শরৎচন্দ্রের একাধিক গল্প বড়দের হলেও ছোটরা তার রসাস্বাদন করে। বিশেষ করে 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', ও 'মেজদিদি'র সহজ গার্হস্থ্য রস ছোটদের আকৃষ্ট করে। 'শ্রীকান্তে'র অংশবিশেষ এবং 'মহেশ' গল্প সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। অবশ্য শরৎচন্দ্র ছোটদের গল্পও লিখে-ছিলেন। তাঁর বাল্যস্মৃতি', 'লালু', 'ছেলেধরা', 'ছেলেবেলার গল্প' সবই কিশোরপাঠ্য রচনা। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কুকুরের মূল্য', 'কাশীমের মুরগী' পশুপ্রীতির গল্প। এজাতীয় করুণরস-সম্পৃক্ত গল্প শিশুসাহিত্যে বিরল। সুধীররঞ্জন খাস্তগিরের 'তালপাতার সেপাই', মণীন্দ্রলাল বসুর 'অজয়কুমার', প্রিয়ম্বদা দেবীর 'অনাথ', খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দার' একসময় শিশু-পাঠকদের অভিভূত করে রেখেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামধনু', 'তারাতী ভবন' 'শ্রীপঞ্চমী', 'সন্দীপন পাঠশালা'র কিশোর সংস্করণের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' ছোটদের বই না হলেও ছোটরা পড়ে। তারাশঙ্করের 'ছোটদের ভাল

ভালো গল্প', 'আমার ছেলেবেলা' ও বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়', 'পিরামিডের কবচ', 'মরণের ডঙ্কা বাজে', 'তালনবমী' গল্পগ্রন্থ শিশুদের জন্যেই লেখা। ইদানীংকালের গল্প উপন্যাসে নানাবিধ সমস্যার কথা থাকে। লেখকরা শিশুদেরও সমস্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। তাই নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'শঙ্কর' উপন্যাসে কারখানার শ্রমিক সমস্যা ও সংঘর্ষ স্থান পেয়েছে। বিমল সেনের 'ফুলঝুরি' ও 'মরুযাত্রী' গ্রন্থের গল্পগুলি স্বাধীনতা আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মকে ভিত্তি করে লেখা হয়। 'রাক্ষস' গল্পের মতো বলিষ্ঠ গল্প শিশুসাহিত্যে বিরল। গ্রন্থদুটিকে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করেন। রজত সেনের 'মাকড়সা' আর একটি অসাধারণ একক গ্রন্থ। কুসঙ্গী, অভাব, কৃচ্ছতার ক্লেশ, প্রলোভন, বয়স্কদের দৃষ্টান্ত কিশোর সমাজকে বিভ্রান্ত করে কিভাবে পাপ ও প্রলোভনের পথে নিয়ে যায় তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে 'মাকড়সা'য়।

সাম্প্রতিককালে বড়দের লেখক হিসাবে যাঁরা পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও ছোটদের জন্যে গল্প উপন্যাস লিখছেন। তার ফলে ছোটদের গল্পের পরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি বড়দের ও ছোটদের গল্পের সুনির্দিষ্ট সীমারেখাটিও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। বড়দের লেখকদের মধ্যে যাঁরা শিশুসাহিত্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'ঘনাদা' বা ঘনশ্যাম দাস শিশুসাহিত্যে একটি নতুন রসসঞ্চার করেছে। যাবতীয় তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করে ঘনাদা বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে, সে গল্প আজগুবী এবং উদ্ভট কখনও আবার সায়েন্স ফিকশানের মতো। ঘনাদার অসম্ভব সম্ভাবনার গল্প যারা শোনে তারাও জানে এ গল্পে বানানো, তবু ভাল লাগে। ঘনাদাকে নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন বহু গল্প ও উপন্যাস—'ঘনাদার গল্প', 'দুনিয়ার ঘনাদা', 'অদ্বিতীয় ঘনাদা', 'যাঁর নাম ঘনাদা', 'ঘনাদার ফুঁ', 'তেল দেবেন ঘনাদা', প্রভৃতি। রস ও রহস্যকে মিশিয়ে গল্প রচনার এই চেষ্টা পরে আরো অনেকেই করেছেন তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সফল হননি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেনিদা ও সদাশিব শিশুদের প্রিয় আরো দুটি চরিত্র। পটলডাঙার টেনি, প্যালারাম, হাবুল ও ক্যাবলা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরকাহিনীর চারটি চরিত্র বা 'চারমূর্তি'। তাদের নানাবিধ কীর্তিকাহিনী ছড়িয়ে আছে 'টেনিদার অভিযান', 'ঘন্টাদার কাবলুকাকা', 'তপনচরিত', 'অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ', 'চারমূর্তি' প্রভৃতি গল্পে। 'চারমূর্তি' একটু নতুন ধরনের গোয়েন্দা গল্প। টেনিদাবাহিনী রামগড়ে বেড়াতে গিয়ে ছদ্ম অভিযানের মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করে সত্যিকারের জাল নোটের কারখানা। মজার গল্পের সঙ্গে গোয়েন্দা গল্প মিশিয়ে এখানে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সদাশিব' সিরিজের গল্পগুলিও ছোটদের আকৃষ্ট করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোরপাঠ্য রচনাগুলি ইদানীংকালে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর সবুজদ্বীপের রাজা', 'ভয়ঙ্কর সুন্দর', 'ডুংগা', 'তিন নম্বর চোখ', 'জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ', 'হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি' প্রভৃতি বহু গল্প ও উপন্যাস শিশু ও কিশোরদের মুগ্ধ করেছে। বড়রাও এই গল্পগুলির রসোপভোগ করে থাকেন। কিশোর মনের কৌতূহল, স্বদেশ প্রেম, এ্যাডভেঞ্চার এবং গোয়েন্দা গল্পের রহস্য ও গতির মিশ্রণে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও গল্প ছোটদের মনের খুব কাছে পেঁছিতে পেরেছে। অন্যান্যদের মধ্যে সমরেশ বসুর 'মোক্তারদাদুর কেতুবধ', অমিতাভ চৌধুরীর 'কেতুবধ', বিমল মিত্রের 'রাজা হওয়ার ঝকমারি', 'মৃত্যুহীন প্রাণ', 'টকঝালমিষ্টি', সুজিতকুমার সেনগুপ্তের 'রহস্যময় রিভলবার', বিমল করের 'ওয়ান্ডার মামা', 'কাপালিকরা এখনও আছে', অখিল নিয়োগীর 'তিব্বত ফেরৎ তান্ত্রিক', গৌরকিশোর ঘোষের 'দুষ্টুর দুপুর', .সন্তোষকুমার ঘোষের 'দুপুরের দিকে', শেখর বসুর 'সোনার বিস্কুট', শংকরের 'খারাপ লোকের খপ্পরে', 'এক ব্যাগ শংকর', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পিনডিদার গপ্পো', গিরিধারী কুন্ডুর 'টংসা চু', 'দুষ্টু টুসটুসি', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বনের আসর', 'নিঝুম রাতের আতঙ্ক' সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'রুকুসুকু' প্রভৃতি অজস্র গল্প, উপন্যাস প্রতিনিয়ত শিশুসাহিত্যের গন্ডি প্রসারিত করছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিশুপাঠ্য গ্রন্থের এখনও প্রধান অবলম্বন হাসি ও মজার গল্প। এই হাসি ও মজার গল্প রচনার ক্ষেত্রে শিশুচিত্তে যিনি অমর হয়ে আছেন তিনি হলেন শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি ছোটদের 'ছোট' না ভেবে, বড়দের অতিরিক্ত 'বড়' না করে হাল্কা হাসির স্রোতে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাস্যরসসৃষ্টির প্রধান উপায় 'পানিং'। নিজের নামটিকে বিকৃত করে তিনি লিখেছিলেন 'শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বলার বিপদ'। অবশ্য এর আগেই তিনি লিখেছিলেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ও 'শুঁড়ওয়ালা বাবা'। 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি', 'হাতির সঙ্গে হাতাহাতি', 'হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি', 'জন্মদিনের উপহার' সবই হাসির গল্প। 'হুকাকাশি'কে নকল করে শিবরাম লিখেছিলেন হাসির গোয়েন্দাকাহিনী 'কল্কেকাশির কান্ড', 'বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ' প্রভৃতি উপন্যাস। তাঁর হর্ষবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধন এখনও শিশুদের আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রলাল রায়ের নামও এ প্রসঙ্গে করা যায়। তিনি বিষয়ের অসঙ্গতি দেখিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন 'নতুন কিছু' ও 'হালকা

হাসির খাতায়'। পরিমল গোস্বামীর 'জঙ্গলের ফুটবল খেলা' প্রভৃতি হাসির গল্পও উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'হেসে যাও', 'পোনুর চিঠি', 'দুষ্টলক্ষ্মীদের গল্প'ও এই জাতীয় রচনা।

বাংলা শিশুসাহিত্যে অনুবাদের সংখ্যা খুব বেশী। অনুবাদের প্রাবল্যেই প্রথম দিকের শিশু-সাহিত্যে মৌলিকতার অভাব ছিল। এখনও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ছোটদের জন্যে বিদেশী রূপকথার মতো আরো যে দুটি বইয়ের বেশ কিছু অনুবাদ হয়েছে সে দুটি হল ঈসপের গল্প ও আরব্য রজনীর গল্প। নিছক গল্পের আকর্ষণেই এই অনুবাদ হয়েছে তবে পূর্ববর্তী 'আরব্য-রজনী' ও 'পারস্য উপন্যাসে'র অনুবাদ বিশেষ ভাল হয়নি। হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'আরব্য উপন্যাসে'র অনেকদিন পরে প্রকাশিত তারাপদ রাহার খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত 'আরব্য রজনী' বাংলা শিশু-সাহিত্যের একটা বড় অভাব পূর্ণ করেছে। সেক্সপীয়রের গল্প অনূদিত হয়েছে বহুবার। সম্প্রতি সেক্সপীয়রের সমস্ত নাটক গল্পাকারে অনুবাদ করেছেন অশোক গুহ। সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনুবাদ করেন 'জুলিয়াস সীজার', 'টার্জান দি এপম্যান', ব্যালানটাইনের 'কোরাল আইল্যান্ড', চার্লস কীংসলির 'ওয়েস্ট ওয়ার্ড হো', ওয়ালটার স্কটের 'ট্যালিসম্যান' ইত্যাদি। কার্লো কলোদির 'পিনাচ্চিও'র অনুবাদ করেন প্রিয়ম্বদা দেবী (পঞ্চুলাল) ও অনিলেন্দু চক্রবর্তী (পিনটু)। আলেকজান্ডার ডুমা, চার্লস ডিকেন্স, মার্কটোয়েন, ডন কুইকজোটের গল্পের অনুবাদও শিশুদের খুব প্রিয়। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'গে নেক' ও 'করী দি এলিফ্যান্ট' গ্রন্থদুটির অনুবাদ করেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থদুটির নাম 'চিত্রগ্রীব' ও 'যূথপতি'। পায়রা ও হাতির জীবন নিয়ে লেখা এই অনবদ্য কাহিনীদুটি বাংলা শিশুসাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পশুপাখির জীবন অবলম্বন করে যে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার মধ্যে গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লালকালো' পিঁপড়েদের সংগ্রামী জীবন নিয়ে লেখা একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। ননীগোপাল মজুমদার লিখেছেন উইপোকার জীবনী 'ট্যাসুরাম'। এই জাতীয় রচনার সূত্রপাত করেন জগদানন্দ রায় তাঁর 'পোকামাকড়', 'মাছ ব্যাঙ সাপ', 'বাংলার পাখি' প্রভৃতি গ্রন্থে। যদিও পরে গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে তবু শিশুদের রসোপভোগে ব্যাঘাত ঘটায় না। প্রাণীবিষয়ক রচনায় একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেন সুকুমার দে সরকার। তাঁর 'দুই খুনী' দুটি কুকুরের কাহিনী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ' অসাধারণ রচনা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'খৈরী আমার খৈরী'ও ছোটদের মুগ্ধ করেছে। জীবজন্তুর কথা যুগ্মভাবে লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সাগর রহস্য' ও 'আজগুবি জানোয়ার' গ্রন্থ দুটিতে।

আধুনিক কালকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। আজকের শিশুর মন প্রথম থেকেই বিজ্ঞানমুখী। গৃহ এবং বিদ্যালয়ে ও তাদের মনকে আরো বিজ্ঞানমুখী করে তোলার চেষ্টা হয়। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গ্রন্থের সংখ্যাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার গ্রন্থ লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশের পরে শিক্ষিতমহলে এ ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় তবে তাঁর আগেই ছোটদের জন্যে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভিক কাজটি সুচারুভাবে করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর 'চারুপাঠে'ই ছিল ভাবীকালের 'বুক অফ নলেজে'র আভাস। জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্র' শিশুদের আগ্রহ জাগায়। লেখক বৈজ্ঞানিকদের মতোই বস্তুজগৎ পর্যবেক্ষণ করে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থ পূর্বে ছিল না। তিনি এই ধরনের আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন—'চলবিদ্যুৎ', 'শব্দ' ও 'চুম্বক'। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সরল অনাড়ম্বর ভাষায় লিখেছেন 'বিজ্ঞানবুড়ো' বা গল্পচ্ছলে অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার কাহিনী। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'নব-বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানপ্রবেশ' সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ না হলেও চিত্তগ্রাহী। রচনার সাবলীলতায় ও বিষয়বৈচিত্র্যে যাঁরা শিশুপাঠককে বিজ্ঞানমুখী করেছেন তাঁদের মধ্যে দেবাশিস সেনগুপ্তের 'আকাশ ও পৃথিবী', 'আজবকল', 'চাঁদের দেশে'র নাম করা যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীদাস মজুমদারের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞানবিচিত্রা' সিরিজ। এই সিরিজটি বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রতিখণ্ডের স্বতন্ত্র নাম আছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জানবার কথা' দশখণ্ডে প্রকাশিত কোষগ্রন্থ। মহাকাশ অভিযান নিয়ে প্রথম লেখা হয় রুশ বৈজ্ঞানিক জিওলকোস্কির প্রবন্ধ অনুসরণে 'পৃথিবীর বাহিরে', লেখক অমলেশ ঘোষ। বৃন্দাবন বাগচীর 'মহাশূন্যের ডায়েরী' ও গোলোকেন্দু ঘোষের 'মাটি ছেড়ে মহাকাশে'ও উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের ধাঁধা ও ম্যাজিকের কথা লিখেছেন পার্থসারথি চক্রবর্তী। তাঁর 'রসায়নের ভেল্কি', 'কেমিক্যাল ম্যাজিক' বৈজ্ঞানিক ধাঁধার বই হিসাবে পরিচিত।

প্রযুক্তি বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যেও আজকাল নানারকম গ্রন্থ লেখা হচ্ছে। এদের ঠিক সাহিত্য পর্যায়ে ফেলা না গেলেও ছোটদের হাতেকলমে কাজ শেখাবার উৎসাহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ননীগোপাল চক্রবর্তীর 'ছেলেদের হাতের কাজ', 'চামড়ার কাজ', 'বাঁশ বেত পাতা ও শোলার কাজ', 'মাটি ও মাটির

কাজ', 'রঙ বার্নিশ ও পালিশের কাজ', 'লোহার কাজ' এই জাতীয় গ্রন্থ। শৈল চক্রবর্তী লিখেছেন 'ছোটদের ক্র্যাফ্‌ট'। প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর 'ছবিকথা', নরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছবিআঁকা', পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ছোটদের ছবিআঁকা' শিশুদের অঙ্কন শিক্ষার কাজে লাগে। ম্যাজিক শেখার বই লিখেছেন প্রতুলচন্দ্র সরকার ('ছেলেদের ম্যাজিক' ও 'ম্যাজিকের কৌশল') এবং অতুলচন্দ্র সরকার ('আধুনিক ম্যাজিক')।

খেলাধুলার বইয়ের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'খেলাধুলা', পুষ্পেন সরকারের 'খেলাধুলায় জ্ঞানের কথা', শচীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম', 'যুযুৎসু ও আত্মরক্ষা', ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়ের 'খেলার ছলে ব্যায়াম', সুখলতা রাওয়ের 'খেলার পড়া', সবিতা মল্লিকের 'সচিত্র যোগব্যায়াম', শংকরীপ্রসাদ বসুর 'ক্রিকেট অমনিবাস' প্রভৃতি অজস্র বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। খেলাধুলাকে নিয়ে লেখা মতি নন্দীর কয়েকটি গল্প-উপন্যাস 'স্ট্রাইকার', 'স্টপার', 'ননীদা নট আউট' সমাদর লাভ করেছে।

ছোটদের জন্যে নাটক লেখার শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের হাতে। শিশুসাহিত্যে নাটকের স্থান নির্ণয় করা একটু কঠিন। কারণ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করা যত সহজ শিশুর উপযোগী নাটক রচনা করা তত সহজ নয়। কারণ এই নাটকের কুশীলবেরাও হবে শিশু। প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষা বা খেলাধুলার মতো নাটকেও শিশুর নিজস্ব ভূমিকা প্রধান। অবশ্য ছোটরা অভিনয় করতে পারে না তা নয়, সময় বিশেষে বড়দেরও হারিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ 'বালকের' জন্যে লিখেছিলেন 'অবাক জলপান', 'বিনি পয়সার ভোজ' প্রভৃতি। এগুলি ছোটদের জন্যেই লেখা তবে তাঁর 'ডাকঘর', 'ঋণশোধ', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটকে ছোটদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও তার রস উপভোগ করতে পারে বড়রাই। বরং বড়গল্প 'মুকুটে'র নাট্যরূপ ছোটদের আকৃষ্ট করে। অবনীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধেও সে কথাই প্রযোজ্য। 'ক্ষীরের পুতুলে'র নাট্যরূপ ছাড়া অন্যান্য যাত্রাপালার রস ছোটরা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'হিংসুটি' প্রভৃতি নাটক ছোটদের আকৃষ্ট করেছে। তবু শিশুনাটকের সংখ্যা কম। অথচ নাটক ছোটদের জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, শুধু আনন্দের উপকরণ হিসাবে নয়, নাটক শিশুশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবেও গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে।

সুনির্মল বসুর লেখা একাধিক শিশুনাটক 'তেপান্তরের মাঠে', 'আনন্দনাড়ু', 'কিপ্টে ঠাকুরদা', 'শহুরে মামা' প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য সবই হাসির নাটক। লীলা মজুমদারের 'বকবধ পালা' মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে লেখা হাসির নাটক। এই জাতীয় নাটক লিখেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য ('অমরেশের কীর্তি'), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('বারো ভূত'), মন্মথ রায় ('ছোটদের একাঙ্কিকা'), ও আরো অনেকে। অসিতকুমার হালদারের লেখা 'আলো আর কালো', 'কুণাল', 'রাজার সাজা' উল্লেখযোগ্য। বিমলচন্দ্র ঘোষের 'যারা মানুষ নয়' ও পুতুলের দেশ' রাজনীতি সচেতন নাটক হলেও শিশুদের উপভোগ্য। দ্বিতীয়টি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে বহুদিন অভিনীত হয়। সমর চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ করেন তার মধ্যে 'জিজো' জাপানী গল্পের ভাবাবলম্বনে লেখা মঞ্চসফল নাটক। তাঁর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'হাসিখুশির মেলা', 'সাতভাই চম্পা' ও 'মিঠুয়া'র নাম করা যেতে পারে। রবিদাস সাহারায় লিখেছেন 'খুশির দেশে', 'রাজকুমার' ও 'রাজপদ'। জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী রূপকথা অবলম্বনে লেখেন 'সাতভাই চম্পা' ও 'টাকডুমাডুম'। হেমলতা দেবীর 'শ্রীনিবাসের ভিটা' ও 'দুপাতা' শিশুদের অভিনয়োপযোগী নাটক। সুনীল দত্ত বাস্তব জীবন নিয়ে লিখেছেন 'হবু রাজার দেশে' ও 'অঙ্কুর', অমিতাভ চৌধুরীর 'তেপান্তরের মাঠে' রূপকথা নিয়ে লেখা নাটক। শৈলেন ঘোষের 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', 'মিতুল নামে পুতুল', 'টোরা বাদশা', 'জাদুর দেশে জগন্নাথ', 'আমার নাম টায়রা' শিশুনাটক হিসাবে ছোটদের মন জয় করে নিয়েছে। বাস্তব থেকে ফ্যাণ্টাসীর দিকে যাত্রাই এই নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রতিককালে ছোটরাও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠছে। কোন কোন সাময়িকপত্রের উৎসাহ ও প্রেরণা তাদের মনে আগ্রহ সঞ্চার করছে। ইতিপূর্বে আমরা ষোল বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে ও আট বছর বয়সে সুকুমার রায়কে সাহিত্যচর্চা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ কৈশোরেই আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তবে তাঁর কথা স্বতন্ত্র। সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবীও বালিকা বয়সে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কয়েকবছর আগে অকালে-হারানো শিশু পাপুর (সুব্রত সরকার) রচনা প্রকাশিত হওয়ায় দেখা গেছে শিশুরাও পরিণত মন নিয়ে অনেক কিছু ভাবার চেষ্টা করে। পাপুর রচনাতেও চিন্তার ছাপ আছে। শিশু পাপুর ছবির সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে বড়দের ছড়া লেখার প্রথম চেষ্টা দেখা গেল 'পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া' গ্রন্থে। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন রমাপদ চৌধুরী।

শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ছবি একটি প্রধান বস্তু। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখলে তাদের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয় আনন্দ। কল্পনারও প্রসার হয়। 'শব্দাবলি' থেকেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থে চিত্রযোজনা

শুরু হলেও শিশুগ্রন্থে উপযোগী চিত্র সংযোজন শুরু হয় উপেন্দ্রকিশোরের হাতে। অবনীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থগুলিও চিত্রসজ্জিত। 'রবীন্দ্রনাথ সে'র অনেক ছবি এ'কেছিলেন। সুকুমার রায় নতুন ধরনে গ্রন্থসম্ভার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ'দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে ধারেন বল, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল লাহিড়ী, সত্যজিৎ রায়, সমর দে এবং আরও অনেকে শিশুসাহিত্যের রূপসজ্জাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ইদানীংকালে কমিক্সের বই এসে ছবি ও ছড়ার বইয়ের স্থান অধিকার করেছে। টারজানের গল্প ছাড়াও 'অরণ্যদেব' (দি ফ্যান্টাম), 'জাদুকর ম্যানড্রেক', 'গোয়েন্দা রিপ', 'লরেল হার্ডি', 'হাঁদা ভোঁদা' প্রভৃতি বাংলা পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছে তবে এদের প্রভাব শিশুচিত্তে হিতকর মনে হয় না। গল্পের সঙ্গে ছবি থাকলে কল্পনা উজ্জীবিত হয় বটে কিন্তু কমিক্সের ছবিতে গল্প ও দু একটি সংলাপ তাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে পাঠ স্পৃহা কমিয়ে দেয়।

দেশ বিভাগের পরে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশেও বাংলা শিশুসাহিত্য নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। উল্লেখযোগ্য দুএকটি কবিতা ও ছড়ার বই—'হৈহৈরৈরৈ' (আখতার হুসেন), 'ছুটির দিনে দুপুরে' (আহসান হাবিব), 'হাট্টিমাটিমটিম' (রোকনুজ্জমান খান) ও 'জলছবি' (নিয়ামত হোসেন)। এখলাস উদ্দীন আহমদের 'এক যে ছিল নেংটি'তে ইঁদুরের রূপকে শহুরে জীবনযাত্রায় ক্ষুধার্ত মানুষের বেদনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সিরাজুদ্দীন আহমদের 'তিতি ও প্যাঁক' হাঁস ও মোরগের সুখদুঃখের মর্মস্পর্শী উপন্যাস শিশুচিত্ত স্পর্শ করে। অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থের মধ্যে অনুবাদ এবং পাঠ্যবইয়ের সংখ্যাই বেশী।

শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকাব কথাও মনে রাখতে হবে। কারণ বাংলা শিশুসাহিত্যকে পত্রপত্রিকাই পরিণত করে তুলেছে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'দিগদর্শন'ই প্রথম কিশোরপাঠ্য পত্রিকা। স্বল্পায়ু হলেও পত্রিকাটি বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোলের সামগ্রিক পরিচয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত 'পশ্বাবলি' (১৮২২) মাসিকপত্র হলেও গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। বিলাতী পেনী ম্যাগাজিনের আদর্শে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) আবালবৃদ্ধবনিতার মনের খোরাক জুগিয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষদিকে কিছু উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম মিশনারি প্রভাবমুক্ত শিশুপাঠ্য পত্রিকা কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮)। এই পাক্ষিক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা ও আনন্দ দান। তাই বিজ্ঞান, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, ব্যাকরণ, গণিত এমনকি নির্ভুল বাংলা শেখানোরও ব্যবস্থা ছিল। এই পত্রিকাই সর্বপ্রথম বালকদের সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেবার জন্য তাদের রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা করে।

প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' (১৮৮৩) এই সময়ের শ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা। রচনা, সম্পাদনা, চিত্র, মুদ্রণ পারিপাট্য সবেতেই 'সখা' কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও সম্পাদকের অকাল মৃত্যুর ফলে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সাথী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'সখা ও সাথী' নামে কিছুদিন প্রকাশিত হয়। 'সখা'র দুবছর পরে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়। ঠাকুরবাড়ির প্রথিতযশা লেখকদের সবাই 'বালকে' লিখতেন। ছোটদের গান শেখাবার জন্যে স্বরলিপি প্রকাশের ব্যবস্থাও করা হয়। ইতিপূর্বে শিশুপত্রিকা ছাপা হত বড় হরফে জ্ঞানদানন্দিনী সে নিয়ম বর্জন করে 'বালকে' ছোট হরফে ব্যবহার শুরু করেন। অবশ্য এক বছর পরেই 'বালক' 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ভারতী ও বালক' নাম গ্রহণ করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মুকুল' (১৮৯৫) বিগত শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পত্রিকা, সেকালের সমস্ত লেখক এই সচিত্র ও সুমুদ্রিত পত্রিকায় লিখতেন। গল্প, কবিতা, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ইতিহাসের গল্প, ধাঁধা, জীবজন্তুর কথা ছাড়াও থাকত অজস্র মজার ছবি। বিলাতী পত্রিকা থেকে এসব ছবি সংগ্রহ করে 'মুকুলে'র সম্পাদক তরুণ লেখকদের কাছে ছবির উপযোগী ছড়া ও গল্প আহ্বান করতেন। যোগীন্দ্রনাথ এই ছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বহু ছড়া লেখেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'সন্দেশ' (১৯১৩) রচনায়, উপস্থাপনায়, সাজসজ্জায় অতুলনীয় হয়েছিল। রায়চৌধুরী পরিবারের সকলে ছাড়াও এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই লিখতেন। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র 'সন্দেশ' পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাটির প্রকাশ দুবার রহিত হলেও সম্প্রতি 'সন্দেশ' নবপর্যায় লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে।

'সন্দেশে'র পরে অনেকগুলি ভাল শিশুমাসিক প্রকাশিত হয় তার মধ্যে 'মৌচাক' (১৯২০), 'শিশুসাথী' (১৯২২) ও 'খোকাখুকু' (১৯২৩) অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে বহু শক্তিশালী শিশুসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। 'শিশুসাথী' প্রতিবছর একখানি শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের সূচনা করে। ইতিপূর্বে শিশুদের জন্যে কোন

পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হত না। তবে শারদীয় পূজার সময় প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিশুপাঠ্য সংকলন প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সংকলনটির নাম 'পার্বণী' (১৯১৮)। শিশুপত্রিকারূপে 'জ্ঞানবিজ্ঞান' (১৯২০), 'রংমশাল' (১৯২০), 'রামধনু' (১৯২৭) 'মাসপয়লা' (১৯২৯) ও 'পাঠশালা' (১৯৩৬) কিছু নতুনত্ব সঞ্চার করে। 'মাসপয়লা'য় প্রকাশিত হয় প্রথম বারোয়ারী শিশুপাঠ্য উপন্যাস 'অজানার উজানে'। 'শুকতারা' (১৯৪৭) আর একটি উল্লেখযোগ্য শিশুপ্রিয় মাসিক পত্রিকা।

বয়স্কপাঠ্য বাংলা সাময়িকপত্রে শিশুবিভাগ স্থাপনের পথিকৃৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'প্রবাসী'তে 'ছোটদের পাততাড়ি' শুরু করেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'আনন্দমেলা' (১৯৪০) শিশুবিভাগ শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে:

মর্তে তোবা বসন্তকাল মানবলোকে
সদ্য নবীন মাধুরীকে আনলি চোখে।

বিভাগটি পরিচালনা করতেন বিমল ঘোষ (মৌমাছি)। নানান ধরনের রচনার সঙ্গে থাকত সম্পাদকীয় হিসাবে 'মৌমাছির চিঠি'। সম্প্রতি 'আনন্দমেলা' (১৯৭৪) স্বতন্ত্র পাক্ষিক পত্রিকা রূপেও

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক'

প্রকাশিত হচ্ছে। 'যুগান্তর' পত্রিকার শিশুবিভাগ 'ছোটদের পাততাড়ি' (১৯৪২) পরিচালনা করতেন অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)। অন্যান্য পত্রিকারও শিশুবিভাগ আছে। স্বাধীন ভারতে ছোটদের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা 'কিশোর' (১৯৪৮) এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। সর্বপ্রথম শিশুপাক্ষিক 'আদর্শ' (১৯৩১) বা শিশুসাপ্তাহিক 'রবিবার' (১৯৩৯), কোনটাই বেশী দিন চলেনি। 'আগামী', 'শিশুমেলা', 'নবজাতক', 'রোশনাই', 'ঝুমঝুমি', 'পক্ষীরাজ', 'ঝলমল' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, কোনটিই এখনো জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেনি। অন্যরাজ্যের একটি শিশু-

পত্রিকার বাংলা সংস্করণ 'চাঁদমামা'ও রঙবেরঙে সজ্জিত হয়ে বাংলার শিশুদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। ওপার বাংলার শিশুমাসিক পত্রিকা হিসাবে জেবউন্নিসা আহমদের সম্পাদনায় 'খেলাঘর' (১৯৫৬) উল্লেখযোগ্য।

বাংলা শিশুসাহিত্যের ধারাটি বিচিত্র পথে বিকাশ লাভ করে এগিয়ে চলেছে। এর বহুধা বিস্তৃত রূপ এবং বিষয়বৈচিত্র্য খুবই আশার কথা, সন্দেহ নেই। তবুও মনে হয় এই শতাব্দীর আরম্ভে শিশুসাহিত্যিকরা শিশুসাহিত্য রচনায় যতটা মনোযোগী ও যত্নশীল ছিলেন এখন আর তা নেই। সাহিত্যের আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর সুকুমার মনটিকে ভবিষ্যৎ জীবনের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁরা যে চেষ্টা করে গিয়েছেন বর্তমানে আর সেই প্রয়াস লক্ষিত হয় না। তাৎক্ষণিক আনন্দ বিতরণই যেন প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

পাঠপঞ্জী

আশা দেবী। বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ, কলকাতা ১৩৬৮
খগেন্দ্রনাথ মিত্র। শতাব্দীর শিশুসাহিত্য, কলকাতা ১৯৬৭
দিলীপ মুখোপাধ্যায়। বিচিত্র প্রতিভা, কলকাতা ১৯৭৭
বইয়ের খবর। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলাদেশ ১৩৮৭
বাণী বসু। বাংলা শিশুসাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী, কলকাতা ১৩৭২
বিশ্বভারতী পত্রিকা। ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা ১৩৬৬
—— ঊনত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা ১৩৮৩
বুদ্ধদেব বসু। 'বাংলা শিশুসাহিত্য', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা ১৯৭৬
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাময়িক পত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা ১৩৭৯ ও ১৩৮৪
ব্রততী চক্রবর্তী। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বারানসী ১৯৭৯
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য, কলকাতা ১৩৭৭
যোগীন্দ্রনাথ সরকার। শতবার্ষিকী স্মরণী, কলকাতা ১৯৭৭
রাণা বসু সম্পাদিত। চিন্ময়ী বঙ্গভূমি, কলকাতা ১৩৮০
শিশুগ্রন্থমেলা। স্মারকগ্রন্থ, কলকাতা ১৯৭৯
সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত। সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশুসাহিত্য, কলকাতা ১৩৮৩

বটতলার বই

সুকুমার সেন

অনেকদিন আগে বটতলার বই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছিলুম 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়'। প্রবন্ধটি অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবার বটতলার বই প্রসঙ্গে লিখছি। ভয় নেই, জাবর কাটব না। তবু কিছু কিছু পুনরুক্তি হতে পারে। তার জন্যে পাঠকদের কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

বটতলার বই কথাটি মনের মধ্যে একাধিক ভাব জাগায়। কারো কারো মনে হবে সস্তা দামের ধর্মের বই, কারো কারো মনে হবে যাত্রার পালা বই, আবার কারো কারো মনে হবে 'হরিদাসের গুপ্তকথা'র মতো গোপনে পড়বার বই। এই প্রবন্ধে আমি বটতলার বই কথাটি মৌলিক অর্থে নিয়েছি। উত্তর ও মধ্য কলকাতার বাঙালী স্বত্বাধিকারীদের ছাপাখানায় সস্তা কাগজে ও পুরানো হরফে ছাপা বই যা বেশ সস্তা দামে বিক্রি হত।

সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শ' বছরেরও বেশী কাল আগে শোভাবাজার বালাখানা অঞ্চলে একটা বড় বনস্পতি ছিল। সেই বটগাছের শান বাঁধানো তলায় তখনকার পুরবাসীদের অনেক কাজ চলত। বসে বিশ্রাম নেওয়া হত। আড্ডা দেওয়া হত। গানবাজনা হত। বইয়ের পসরাও বসত। অনুমান হয় এই বই ছিল বিশ্বনাথ দেবের ছাপা। ইনিই বটতলা অঞ্চলে এবং সেকালের উত্তর কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা খুলেছিলেন। বহুকাল পর্যন্ত এই "বান্ধা বটতলা" উত্তর কলকাতার পুস্তক প্রকাশকদের ঠিকানায় চালু ছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশকদের ঠিকানা থেকে বটতলা নাম ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে এসেছে।

বটতলার অবস্থানের একটা মোটামুটি নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে ১২৫৭ সালে (১৮৫০-৫১) ছাপা একটি বইয়ের নাম পৃষ্ঠা থেকে। বইটি হল ভগীরথ বন্ধুর 'চৈতন্য সঙ্গীতা', ছাপা হয়েছিল মহেশচন্দ্র শীল ও বিশ্বম্ভর লাহার সুধাসিন্ধুযন্ত্রে। "এই গ্রন্থ যাহার দিগের প্রয়োজন হইবেক তাহারা সহর কলিকাতার শোভাবাজারের বটতলার দক্ষিণ ও গরাণহাটার চৌরাস্তার উত্তর উক্ত যন্ত্রাধ্যক্ষ দিগের দোকানে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।" লং দুটি সুধাসিন্ধু যন্ত্রের কথা লিখেছেন। একটির (Sudha Sindhu) ঠিকানা ২২৯ চিতপুর রোড ১ নম্বর চোরবাগান। অপরটির (Suda Sindhu) ঠিকানা সিমল্যা ১২ নম্বর "গোলাবেড়ি" (Golaberie) স্ট্রীট। এই প্রেস লংএর উক্তি অনুসারে স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। গোলাবাড়ি লেন নাম পালটে এখন কী হয়েছে জানি না। মনে হয়, একদা এখানে রাজা নবকৃষ্ণের গোলাবাড়ি ছিল। গোলাবাড়ি সংলগ্ন

ছিল বটতলা। গরাণহাটার উত্তরে। কলকাতার টোপোগ্রাফি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের এই এক খোরাক রইল বটতলার যথার্থ অবস্থান আবিষ্কারের।

প্রথমের দিকে যে সব বাংলা বই—সাধারণতঃ পুস্তিকা—ছাপা হত উত্তর কলকাতার বাঙালী ছাপাখানায়, তাতে প্রায়ই ছাপাখানার উল্লেখ থাকত না। সবচেয়ে পুরানো ছাপার বই—শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে—যা দেখেছি তা হল একটি বৈষ্ণব গ্রন্থ (জগদীশচরিত্র বিজয়) ১৭৩৭ শকাব্দে (= ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে) ছাপা, পুথির আকারে, পুথির মতো, খোলা পাতায়। আরও একটি বই দেখেছি, ঠিক এমনি। সেটিও বৈষ্ণব গ্রন্থ, নাম 'নরোত্তমবিলাস'। শেষে ছাপবার তারিখ অর্থাৎ সালের উল্লেখ ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় এই সময়েই ছাপা। রামমোহন রায়ের পুস্তিকায় ও পুথির আকারে ছাপা বইয়ের মতো নাম পৃষ্ঠা ছিল না। অধিকাংশ পুস্তিকায় শুধু সালেরই উল্লেখ আছে। দৈবাৎ এক-আধটিতে মুদ্রাকরের নাম পাই। যেমন, 'কবিতাকারের প্রত্যুত্তর' পুস্তিকায় ভূমিকার শেষে আছে শুধু "ইতি ইং ১৮২০/সমাপ্ত" মূল পুস্তকের শেষে আছে "ইতি শকাব্দা ১৭৪২॥ শ্রীযুত হরচন্দ্র রায়ের দ্বারা। সমাপ্ত"। বাঙালীর ছাপাখানায় মুদ্রাকরের নাম দেওয়া বোধহয় বটতলার বিশ্বনাথ দেবই চালু করেছিলেন (১৮১৮?)।

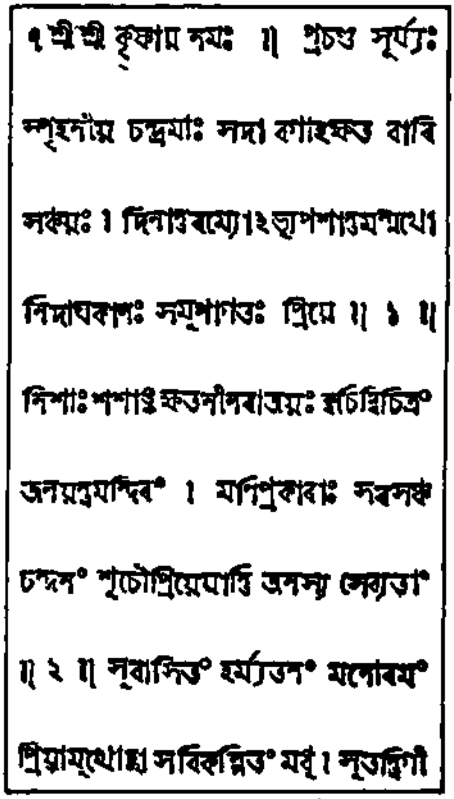
৭ শ্রীশ্রী কৃষ্ণায় নমঃ ॥ প্রচণ্ড সূর্য্যঃ
স্পৃহণীয় চন্দ্রমাঃ সদা বগাহক্ষত বারি
সঞ্চয়ঃ। দিনান্তরম্যো২ভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১ ॥
নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্বচিদ্বিচিত্রং
জলযন্ত্রমন্দিরং। মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ
চন্দনং শুচৌপ্রিয়েযান্তি জনস্য সেব্যতাং
॥ ২ ॥ সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোরমং
প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্পিতং মধু। সুতন্ত্রী

প্রথম ছাপা সংস্কৃত বই
'ঋতুসংহারে'র একটি পৃষ্ঠা

ইংরেজ অথবা ফিরিঙ্গি স্বত্বাধিকারীর প্রেসে ছাপা বাংলা বইয়ে নামপত্র থাকত ইংরেজী-বাংলা দু ভাষায় কিংবা দুটি নামপত্র থাকত। একটি ইংরেজীতে ও একটি বাংলায়। প্রথম রকমের নিদর্শন দিতে পারি রামমোহনের 'বেদান্ত-গ্রন্থে'র প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। বইটি ছাপা হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেসে। দ্বিতীয় রকমের প্রচুর নিদর্শন পাই শ্রীরামপুর মিশনে ছাপা বইয়ে—কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ইত্যাদিতে।

ইংরেজ অথবা ফিরিঙ্গি স্বত্বাধিকারীর প্রেসে ছাপা বইয়ে মুদ্রাকরের উল্লেখ থাকত।

দেশি স্বত্বাধিকারীর প্রেসের নাম গোড়ার দিকে ভাষা অনুযায়ী ছিল। যেমন, হিন্দুস্থানী যন্ত্র, বাঙ্গালা (ও বাঙ্গালী) যন্ত্র, গৌড়ীয় যন্ত্র। তারপরে নাম হতে লাগল জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের কর্তা চাঁদ ও সূর্যের প্রভা অথবা অমৃতের আধার ও লক্ষ্মীর নিবাস সমুদ্রের নামে। (আসলে সেই নাম যুক্ত সাময়িকপত্রের নাম থেকে।) যেমন, প্রভাকর যন্ত্র, ভাস্কর যন্ত্র, পূর্ণ-চন্দ্রোদয় যন্ত্র, সিন্ধু যন্ত্র, সুধাসিন্ধু যন্ত্র, কমলাসন যন্ত্র, কমলালয় যন্ত্র, জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র, ইত্যাদি। এই নামের সূত্রপাত হয়েছিল 'সংবাদকৌমুদী' থেকে। সংবাদকৌমুদী যন্ত্র নাম পরে ছাঁটাই হয়েছিল—কৌমুদী যন্ত্রে। (এই কৌমুদী যন্ত্রে অনেক ভাল ভাল বই ছাপা হয়েছিল, যেমন ভাগবত-পুরাণ। আবার এই প্রেস থেকেই সংকীর্ণ অর্থে বটতলার বইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' লিখে বটতলায় কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী পুস্তিকামালার প্রথম ফুলটি গেঁথেছিলেন। যতদূর মনে হচ্ছে বইটি তাঁর চন্দ্রিকা প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। মালার দ্বিতীয় মুখ্য ফুল গাঁথা হয়েছিল আরও কিছুকাল পরে,—'হুতোম প্যাঁচার নকশা'।)

কলকাতায় দেশী লোকের বাংলা-ছাপা প্রেসের ঠিকানা ধরলে এই কয়টি অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল দেখানো যায়।

১ মূল বাঁধা বটতলা
শোভাবাজার বালাখানা, দরজীটোলা, কুমোরটুলি, গরাণহাটা, আহিরীটোলা।
ক দরজীপাড়া, সিমলে।
খ শ্যামবাজার, বাগবাজার, টালাবাগান লেন।

গ পাথ্রেঘাটা, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, ডোমপাড়া, চোরবাগান।
ঘ শ্যামপ্কুর, ঠনঠনে, পটলডাঙা, বারসিমলে, শিয়ালদ।
২ বড়বাজার, আড়পর্লি, কল্টোলা, সেকরাপাড়া, বউবাজার, চাঁপাতলা, লালবাজার, ম্দিয়ালী, কসাইটোলা, ধর্মতলা।
৩ ভবানীপ্রে, সাহানগর।

শ্যামবাজারে, বাগবাজারে ও টালাবাগানে দ্ একটি করে প্রেস ছিল বলে অন্মান হয়। "টালা-বাগান লেন" কি টালায় ছিল? ডোম পাড়ায় বস্কোম্পানীর শর্ঘ্ প্রেসে 'হ্তোম প্যাঁচার নক্শা' ছাপা হয়েছিল। ৬নং রামের গলি বড়বাজার বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্র থেকে ওই নামে পত্রিকা বার হত। বড়বাজারে ছিল পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র (১২নং আমড়াতলার গলিতে) ও স্ধাবর্ষণ যন্ত্র। লং বলেছেন যে স্ধাবর্ষণ যন্ত্র থেকে এই নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বেরোত বাংলা ও হিন্দী এই দ্ ভাষায়। তাতে বাজারদর ইত্যাদি ব্যবসায়ের খবর থাকত। সম্পাদক ছিলেন শ্যাম-স্ন্দর সেন। পাঞ্জাব ও গ্জেরাট পর্যন্ত এই কাগজ বিক্রি হত। প্রেসটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

আড়প্লিতে হরচন্দ্র রায়ের প্রেস বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত বোধহয় প্রথম ম্দ্রাযন্ত্র। বিশ্বনাথ দেবের প্রেস এর অল্পকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল বলে মনে করি। হরচন্দ্র রায়ের প্রেসের নাম ছিল বাঙালী যন্ত্র, যদিও গোড়ার দিকে এ নামের ব্যবহার ছিল না। রামমোহন রায়ের অনেক প্স্তিকা হরচন্দ্র রায়ের প্রেস থেকে বেরিয়েছিল। "হরচন্দ্র রায়ের দ্বারা" ম্দ্রিত বলে উল্লেখ পাই 'কবিতাকারের প্রতি প্রত্যুত্তর' প্স্তিকায় (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ)।

৭নং সেকরাপাড়ায় ছিল বেঙ্গল স্পিরিয়র যন্ত্র (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)। ৪নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে ছিল স্মিথ এন্ড কোম্পানীর যন্ত্র। মালিক বোধহয় বাঙালী ছিলেন।

ম্দিয়ালী মিত্র যন্ত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বই 'তত্ত্ববিদ্যা' চারখণ্ডে ছাপা হয়েছিল (১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে)।

কসাইটোলা হল বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের অংশ, লালবাজারের কাছাকাছি। ইংরেজীতে Cossitola অনেকে ভ্ল করে 'কাশীটোলা' করেছেন। কেউ কেউ আবার এই অঞ্চলকে কাশিয়াবাগানের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। কেশেবাগান ছিল আপার সার্কুলার রোডে উলটোডিঙির কাছে। এখানে স্বর্ণ-কুমারী দেবীরা থাকতেন। 'ভারতী' পত্রিকার ছাপাখানাও এখানে ছিল সেইস্ত্রে।

"১০নং মেঙ্গো লেনে" ছিল বেন্টিঙ্ক প্রেস। এই প্রেসে 'উঃ! মোহন্তের এই কাজ!!' নাটক (ক্দ্রাকার) ছাপা হয়েছিল। তাতে চারটি ছবি ছিল দ্ রঙা লিথোয়। এর আগে বাংলা কোন সাহিত্য বা অন্য গ্রন্থে দ্ তিন রঙা ছবি দেখিনি। এর দীর্ঘকাল পরে দেখেছি অবিনাশ চন্দ্র মিত্রের অন্দিত 'একাধিক সহস্র দিবস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে ('সচিত্র ও স্রঞ্জিত', জোড়াসাঁকো 'স্লভ' প্রেসে ছাপা, ১৩০৯ সালে)।

৮নং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে কলিকাতা প্রেসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (নামপত্রে বা অন্য কোথাও লেখকের নাম নেই) 'ধ্রববাদী অগস্ত কোম্ত' ছাপা হয়েছিল (১২৮১ সন)।

এই অঞ্চলের সব চেয়ে ভাল বাংলা ছাপাখানা ছিল 'স্চার্ প্রেস' ১৬নং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটে। এই প্রেসে 'আলালের ঘরের দ্লাল' দ্বিতীয় সংস্করণ (সচিত্র) ছাপা হয়েছিল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ছিলেন প্রাণনাথ দত্ত চৌধ্রী। ছবিগ্লি এ'কেছিলেন এ'রই ভাই গিরীন্দ্র-কুমার ('প্রাণনাথ' নাটক লিখেছিলেন)। গিরীন্দ্রকুমার ছবি আঁকতেন। একখানি চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে পাঠ্যগ্রন্থও লিখেছিলেন। গিরীন্দ্রকুমারের আঁকা প্রচ্র ছবি পাওয়া যাবে 'বসন্তক' পত্রিকায় (১৮৭২-৭৪)। সম্ভবতঃ এ'রাই স্চার্ প্রেসের মালিক ছিলেন।

লং লিখেছেন, স্চার্ প্রেস ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল ৯৩নং বাহির মির্জাপ্রে। সে প্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটের প্রেসের সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না। বাহির মির্জা-প্রের প্রেস থেকে কিছ্ ভাল বই বেরিয়েছিল। এইখানে লালচাঁদ বিশ্বাস কোম্পানীর স্চার্ যন্ত্রে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা 'প্রাণেশ্বর নাটক' তার নম্না।

সেকালের ভাল প্রেসগ্লির অধিকাংশই—ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ছাড়া—লালবাজারে ও তার কাছাকাছি বৌবাজার স্ট্রীটে স্থিত ছিল। সেগ্লির মালিক সবাই ব্রিটিশ বা ফিরিঙ্গি ছিলেন না, বাঙালীও ছিলেন। এ অঞ্চলের বাইরেও ভাল প্রেস ছিল, কিন্তু সে প্রেসগ্লিতে সব বইয়ের বেলাই ভাল কাগজ ব্যবহৃত হত না এবং সে সব প্রেসে যত্নের অযত্নের সব রকম ছাপার কাজ নেওয়া হত বলে মনে হয়। বউবাজার স্ট্রীটের ভাল প্রেসগ্লি অবাঙালীর হলে বেশী ঝোঁক পড়ত ইংরেজী বইয়ে, আর বাঙালীর হলে বাংলা বইয়ে।

লালবাজার ও তার কাছাকাছি প্রেসের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রোজারিও কম্পানির ৮নং ট্যাঙ্ক স্কোয়ার (লালদীঘির ধার)। স্বত্বাধিকারীর সম্ভবতঃ আগে শ্রীরামপ্রে প্রেস ছিল।

কলকাতায় প্রথমে রোজারিওর প্রেস আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেস যখন এইখানে ছিল তখন ডিরোজিওর কাব্যগ্রন্থটি ছাপা হয় (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে)। নামপত্রের উলটো পিঠে এই কথা আছে:

Calcutta, Printed by P. S. D. Rozario, Amherst Street.

প্রকাশক ছিল Samuel Smith and Co. Hurkaru Library. বইটির কাগজ ভাল, ছাপা চমৎকার। এর চেয়ে ভাল ছাপা তখন বিলেতেও হত কিনা সন্দেহ। রোজারিওর প্রেস কলকাতার শ্রেষ্ঠ প্রেস ছিল, অন্ততঃ ইংরেজী ছাপার দিক দিয়ে।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে রোজারিওর বইয়ের দোকানও ছিল। এখানে কাছাকাছি অন্য প্রেসে ছাপা বইও পাওয়া যেত। টেকচাঁদ ঠাকুরের প্রথম চার পাঁচখানি বই রোজারিওর প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' ১২৬৪ সালে (১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথম ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ নম্বর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে সুচারু প্রেসে। বইটি যে ডি রোজারিও আর স্ট্যানহোপ প্রেসেও পাওয়া যাবে সে কথা ছাপা আছে এই সংস্করণে।

বাংলা ছাপার দিক দিয়ে সব চেয়ে ভাল প্রেস ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বসুর স্ট্যানহোপ যন্ত্র ১৮৫ নম্বর বউবাজার স্ট্রীটে। লং লিখেছেন প্রেসটি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। (লংএর মতে ৮ নম্বর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে রোজারিও কোম্পানীর যন্ত্রও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)। কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী নাটক' এই ঠিকানায় ছাপা হয়েছিল ১২৭৪ সালে (১৮৬৭-৬৮ খ্রীঃ)। তখনকার ছাপা যত বাংলা বই আমি দেখেছি তার মধ্যে এইটাই ভাল। ১২৭৫ সালে (১৮৬৮-৬৯) স্ট্যানহোপ প্রেস ২৪৯ নম্বরে উঠে যায় অথবা ঠিকানায় নম্বর বদল করা হয়। এই ঠিকানায় প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' দ্বিতীয় (১৮৬৮?) ও তৃতীয় সংস্করণ (১৮৭৫) উনিশ শতকে ছাপা বাংলা সচিত্র পুস্তকের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা।

কামিনীর লাফাইয়া ত্রাস — [illegible]

স্ট্যানহোপ প্রেসে সব রকমের বই-ই ছাপা হত। মায় পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যপুস্তকের অর্থ-পুস্তক পর্যন্ত। ১২৮০ সালে ছাপা 'মৎস্যধরা' নাটকের মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠা ভরা বিজ্ঞাপন থেকে এই খবর পাই। "স্ট্যানহোপ যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে" বলে ষাট বাষট্টিটি বই ও তার দাম উল্লিখিত আছে। তার মধ্যে আছে 'মেঘনাদবধ সটীক' থেকে 'Key to Baboo P. C. Sircar's First Book of Reading', পর্যন্ত অনেক রকমের বই।

এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আর একটি প্রেস হল 'কসাইটোলা ৬৭ নম্বর এমামবাড়ী লেন, বেন্‌টিংক স্ট্রীট'-এর জি. পি. রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্র, (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত)। এই যন্ত্র থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দুমহিলা নাটক' ১৭৯৩ শকাব্দে (১৮৭১-৭২) 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক'

ছাপা হয়েছিল। ৫৯ এমামবাড়ী লেনে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Royal Phoenix Press স্থাপিত হয়।

লালবাজারে Cone's Press ছিল। এখান থেকে পাঁজি ছাপার কথা লং জানিয়েছেন।

ভবানীপুরে একটি পুরানো প্রেসের খবর পাচ্ছি ২৮ নম্বর জেলিয়াপাড়া রোডে সুবরবন যন্ত্র। এ প্রেস থেকে অনেক ভাল বই বেরিয়েছিল। যেমন, রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শারদকুসুম' (১২৮৫ সাল)। রমেশচন্দ্রের বইও এখানে ছাপা হত।

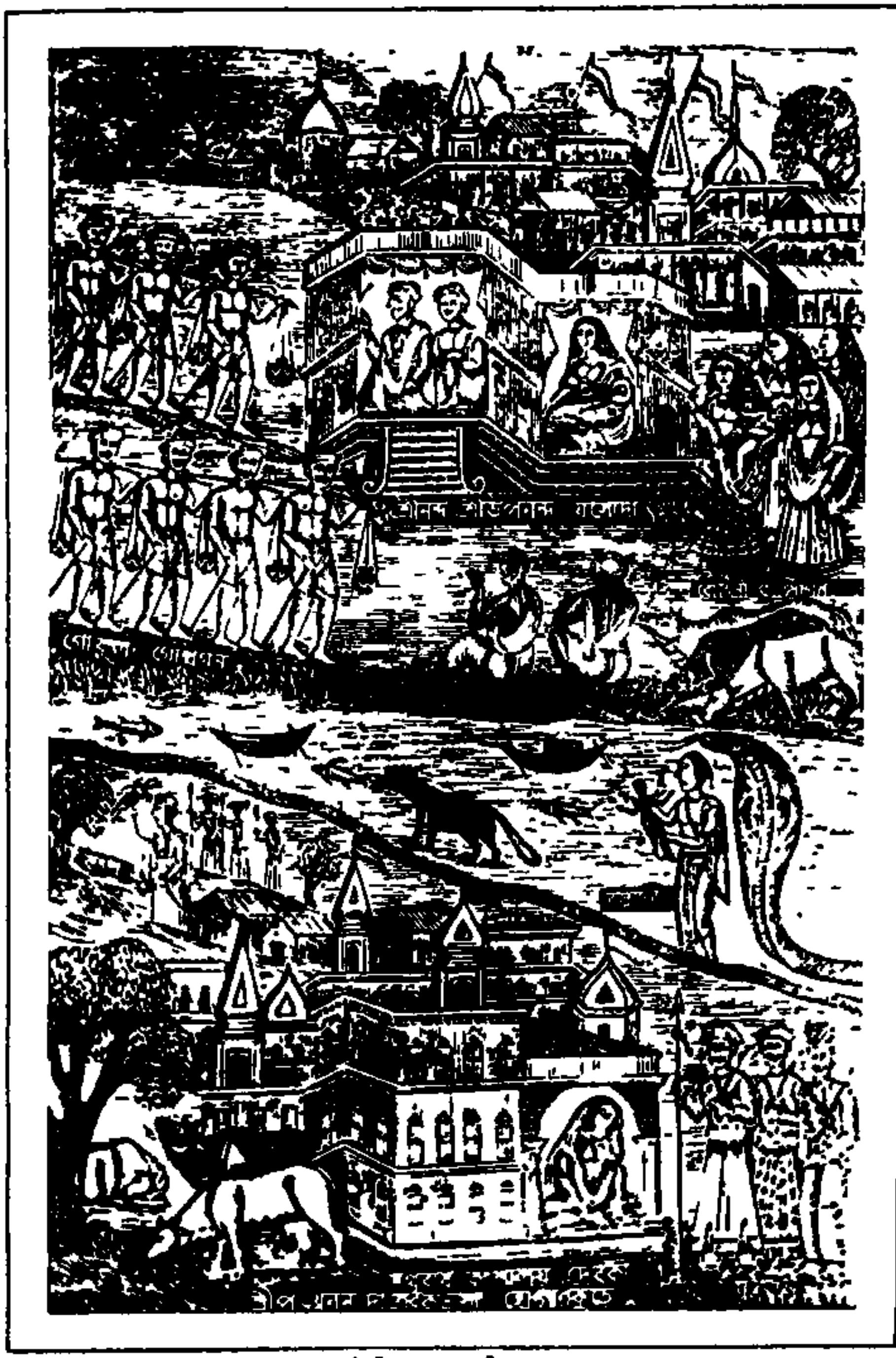

জন্মাষ্টমী নূতন পঞ্জিকা ১২৬২

এখানকার আরও পুরানো প্রেস হল হিন্দু পেট্রিয়ট যন্ত্র। এ প্রেসে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটকে'র দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল।

সাহানগর ১৬নং ভবনে কুণ্ডু এবং কোম্পানীর কাশীখণ্ড যন্ত্র। এখানে ছাপা হয়েছিল ১২৮২ সালে (১৮৭৫-৭৬) শ্রীমাধব ভট্টাচার্যের গদ্য কাহিনী 'সুলোচনা কাব্য'। মোটা কাগজে বড় টাইপে বেশ ঝরঝরে ছাপা। এ প্রেস বোধহয় জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশীখণ্ড' ছাপার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। তাই এই নাম।

মিলিটারি অর্ফ্যান প্রেসে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল যদুনাথ মাল্লকের *'Bengalee Translation/of the/Assistants' Kutcherre Companion/and/Help to the Revenue Examination.'/* "মাল সংক্রান্ত আইনের সারসংগ্রহ অর্থাৎ এতদ্দেশীয়/মাল সংক্রান্ত তাবত আইন ও চিঠী ও অপরাপর নিয়মের/সারার্থ প্রশ্ন উত্তরের ছলে রাজস্বের অতি প্রধান পদার্ভিসিক্ত/কোন মহাত্মা কর্তৃক ইংগরেজী ভাষায় বিরচিত হইয়া/সংপ্রতি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইল।" মুদ্রাকর F. Carberry. ছাপা, কাগজ অতি উত্তম। ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছেন যে তাঁর কাজে সহায়তা করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় ও অমৃতলাল মিত্র।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার কাছাকাছি প্রেসের কথা কিছু বলি। পাঠকদের জানিয়ে দিচ্ছি যে আমি বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস লিখছি না। যিনি ভবিষ্যতে লিখবেন তাঁর জন্যে কিছু উপাদান জুগিয়ে যাচ্ছি। আমি যে সব বই দেখেছি তা তাঁদের চোখে নাও পড়তে পারে। তাই আমি বটতলার বইয়ের প্রসঙ্গে নানা কথা উত্থাপন করছি।

কলকাতার সব চেয়ে কাছে ভাল প্রেস ছিল উত্তরপাড়ায়। এখানে ৯৯ নম্বর গ্র্যাণ্ট ট্রাঙ্ক রোডে ইউনিয়ন প্রেস ছিল,—সে প্রেসে ছাপা হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটক। বেশ ভাল ছাপা, বাল্মীকি প্রেস অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রেসের মতোই।

তারপর শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুরে স্থাপিত মিশন প্রেসকে বলা যায় বাংলা প্রেস মহীরুহের চারার প্রধান শাখা। এ চারার বীজ পোঁতা হয়েছিল হুগলিতে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা প্রথম বই হল 'মঙ্গল সমাচার' মাতিউ রচিত। বাইবেলের প্রকাশিতব্য অনুবাদের নমুনা হিসাবে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। এ পুস্তকের একটিমাত্র কপির অস্তিত্ব জানা আছে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ধর্মপুস্তকের অন্ত্যভাগে যে অনুবাদ আছে মথিলিখিত সুসমাচারের সঙ্গে তার সর্বত্র মিল নেই। এই প্রেস থেকে অনেক বই বেরিয়েছিল, প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার-দর্পণ'ও বেরিয়েছিল। প্রকাশন সবই মিশনের অথবা মিশনারিদের—বিশেষতঃ পাদরি উইলিয়াম কেরীর বই। বাইরের বই এখানে ছাপা হত বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে কলকাতায় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ২১ নম্বর লোয়ার সার্কিউলার রোডে। এই ছিল কলকাতার শীর্ষস্থানীয় প্রেস, নানা ভাষার বই ছাপা হত এখানে। পাদরিদের আর একটি ছাপাখানা ছিল বিশপ্‌স্ কলেজ প্রেস। বোধহয় শিবপুরে।

মিশন প্রেস উঠে গেলেও ছাপার কাজে শ্রীরামপুরের অগ্রগামিতার ব্যাঘাত ঘটেনি। পঞ্চানন কর্মকার—যিনি বাংলা টাইপ তৈরি করার কাজে চার্লস্ উইলকিন্‌সকে সাহায্য করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর কাছে শিখে অনেকে শ্রীরামপুরে একাধিক প্রেস চালিয়েছিলেন। খুব ভাল প্রেস ছিল কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের চন্দ্রোদয় যন্ত্র। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন পঞ্চানন কর্মকারের দৌহিত্র। তমোহর প্রেসের কাজও ভাল ছিল। শ্রীরামপুরের তৃতীয় ছাপাখানা নীলমণি পালের চ্যুঁচুড়া বুধোদয় প্রেস থেকে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রকাশিত হয়েছিল। রামগতি ন্যায়রত্নের অনেক বইও এখানে ছাপা। তবে ছাপার কাজ খুব ভাল ছিল না। একটি খুব ভাল প্রেস ছিল D. E. Roderique-এর। ডি. ই. রডরিক্‌স্ প্রিন্টিং এ্যাণ্ড লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে ছাপা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' তৃতীয় সংস্করণ দেখেছি। খুব ভাল ছাপা। প্রকাশের তারিখ দেওয়া নেই। সম্ভবতঃ তখন মাইকেল জীবিত ছিলেন।

বর্ধমানে ছাপা উল্লেখযোগ্য বই যা কিছু বেরিয়েছিল তা প্রায় সবই রাজবাড়ী থেকে প্রকাশিত বর্ধমানে ছাপা সবচেয়ে পুরানো বই যা আমি দেখেছি তা হল অমরকোষকে ভেঙে সাজা একটি অভিধানশ্রেণীর বই, নাম *'শব্দকল্পলতিকা'। নামপত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করছি। এর থেকে বোঝা* যাবে যে মুদ্রাকর একটি ছাড়া প্রত্যেক লাইনের শেষে দাঁড়িচিহ্ন দিয়েছেন। প্রেসের নাম আরবীতে হলেও স্বত্বাধিকারী মুসলমান ছিলেন বলে বোধ হয় না:

শ্রী শ্রী কালী॥
পদভরসা॥
শব্দকল্পলতিকা নামক॥

অভিধান।
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কারের দ্বারায়বর্ণ।
সংশোধিত হইয়া।
শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র রায়।
ও শ্রীযুক্ত কেনারাম মজুমদারের।
দ্বারায়
মোং বর্দ্ধমানের অহয়ীবাজারের আয়নল হেকমত।
যন্ত্রালয়ে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল।
এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে বা।
বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জে উক্ত মজুমদার দিগরের
বাসায় তত্ত্ব করিলে।
পাইবেন।
ইতি সন ১২৫৯ সাল তারিখ ৪ ভাদ্র॥

কাগজ হাতে তৈরি, মোটা। হরফ পুরানো ভাঙা ভাঙা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫৯ + ১। নামপৃষ্ঠার বিপরীতে অশুদ্ধিপত্র। ১৮৫২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ। সুতরাং প্রেসের প্রতিষ্ঠা পঞ্চম দশকের পরে নয়।

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর বই ছাপিয়ে প্রকাশ করার ব্যাপারে অনন্য-সাধারণ সুমহৎ কীর্তির অধিকারী। ইনি মূল রামায়ণ ও মহাভারত (হরিবংশ সমেত) বড় বড় অক্ষরে ভাল কাগজে ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। এগুলির অনুবাদ করিয়েও তা তেমনি ভাবে ছাপিয়ে বিতরণ করেছিলেন। আরও কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ফারসী থেকে 'হাতেমতাই'য়ের ও উর্দু থেকে 'মশনবীর' অনুবাদ বার করেছিলেন। বড় বড় সঙ্গীতের বই ছাপিয়েছিলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত ও মৌলবীকে পোষণ করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞদের তো কথাই নেই।

মহতাবচন্দের আরও দু তিনটি ছাপাখানা ছিল—সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, পুরুষোত্তম যন্ত্র, অধিরাজ যন্ত্র ও খাশ যন্ত্র। সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ভাল বইগুলি ছাপা হত, অপর যন্ত্রে ভালমন্দ দুরকমেরই বই ছাপা হত। খাশযন্ত্রে সেরেস্তার পুস্তিকা ও কাগজপত্রই বেশী ছাপা হত। একদা মহতাবচন্দ্ ব্রাহ্মধর্মের দিকে বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার অনু-করণে 'সত্যসন্ধায়িনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সত্যসন্ধ-গণের ব্রহ্মোপাসনা 'পদ্ধতি' ছাপা হয়েছিল দুরকম কালিতে—লাল ও ব্রোঞ্জ ব্রু। লাল কালিতে সংস্কৃত মূল, কালো কালিতে বাংলা অনুবাদ। বড় ও পরিচ্ছন্ন অক্ষরে ও ইমিটেশন পার্চমেণ্ট (?) কাগজে। এমন সুন্দর ছাপা বই কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল কিনা সন্দেহ।

আরও অন্ততঃ একটি ভাল প্রেস ছিল বর্ধমানে। নাম অর্য্যমা যন্ত্র। এই প্রেসে ১২৭৪ সালে (১৮৫২-৫৩) সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধির 'আত্মোৎকর্ষবিধান' ছাপা হয়েছিল। মুদ্রণ উৎকৃষ্ট।

বটতলার বইয়ের কোন নির্দিষ্ট রকমের প্রেস ছিল না। নিকৃষ্ট কাগজে পুরানো ও ভাঙা টাইপে ছাপা হলে আর যদি বাঁধাই হয় তবে তুলোট বোর্ডে মার্বেল কাগজে মোড়া বলেই তা বটতলার বই। এ সব বইয়ের দামও খুব সস্তা। অনেকের ধারণা আছে নড়বড়ে যন্ত্রে কাঠের টাইপে ছাপা বই মানেই বটতলার বই। তা নয়, টাইপ কখনোই কাঠের হত না। আর সস্তা প্রেসেও ভাল ছাপা হত যদি কাগজ খারাপ না হত। অনেক ভাল প্রেসেও সস্তা কাগজের জন্যে বই বটতলার বইয়ের মতো দেখাত; আসলে সস্তা প্রেসই বটতলার প্রেস।

বটতলার প্রেস যে কেমন সস্তা ছিল তার হদিশ পেয়েছি প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যা 'বসন্তক' পত্রিকার 'সংবাদসারসংগ্রহ' থেকে। উদ্ধৃতিটুকু স্বতঃপ্রমাণ। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা:

> কেদারনাথ নামে একজন কম্পোজিটার অনেক ছাপাখানা হইতে হরপ চুরি করিয়া... পুলিস কর্তৃক ধৃত হয় এবং আদালতে দাখিল করা হইলে বলে যে তার অপরাধ নাই, যাঁরা তাকে রেখেছিলেন তাঁরা সকলেই তাকে হরপ বেচে পেট চালাতে বলেছিলেন।...শুনতে পাই নাকি হাকিম বলেছেন যে লোকে যখন পাতকে পাত বাঁধা রচনা চুরি ক'রে সাজা পাচ্চে না তখন এলো হরপ চুরির সাজা দেওয়া অকর্ত্তব্য।...৩।৪ টাকা মাহিনা দিয়ে কম্পোজিটার রেখে প্রেসের খরচা খতারে ৪ টাকার দরে ফরমা ছাপানর এই রূপেই দুর্গতি হয়।

শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতায় ছাপাখানাগুলিতে ভালমন্দ দু রকমের ছাপার কাজই হত। সুতরাং তখন বটতলা নামটি বইয়ের মান নির্দেশে ব্যবহার করা যায় না। ষষ্ঠ দশকের গোড়া থেকেই উত্তর কলকাতায়—বিশেষ করে গরাণহাটা চিৎপুর-অঞ্চলে ছোটখাটো প্রেস অজস্র গজিয়ে

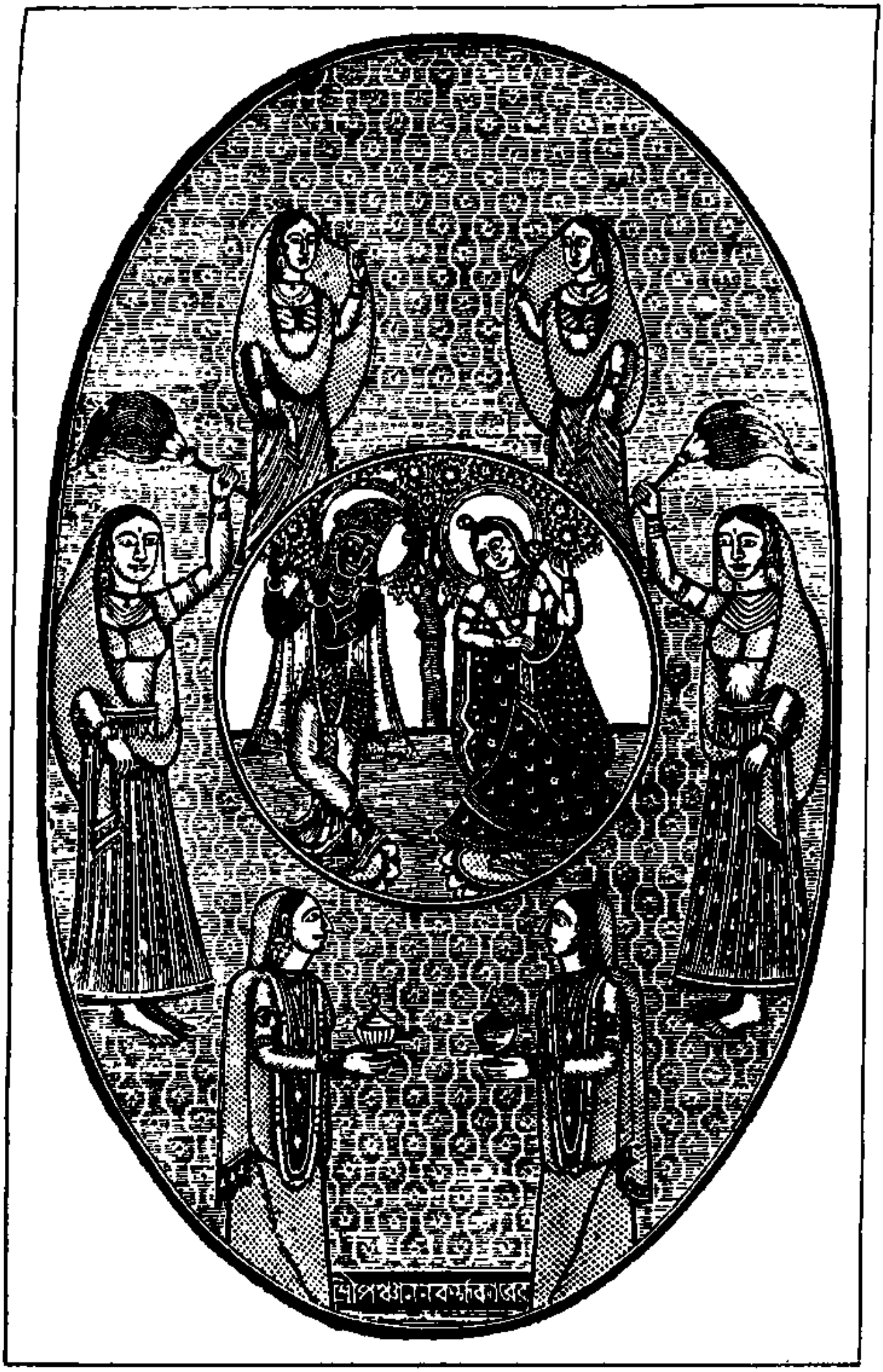

পুরানো 'বটতলা' বইয়ের ছবি: সখীপরিবৃত রাধাকৃষ্ণ

উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষা পায়নি বা পাবে না এমন সাধারণ মানুষের বিশেষ করে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের—চাহিদা মেটাবার জন্যে। অতএব এই সময় থেকে "বটতলা" বা খুব সস্তা প্রেসের ইতিহাস শুরু।

শতাব্দীর প্রথম অর্ধের প্রেস ও সেখান থেকে ছাপা বইয়ের কথা বলি।

হরচন্দ্র রায়ের প্রেসের উল্লেখ আগে করেছি। লল্লুলালের প্রেসে বাংলা বইও ছাপা হত। যেমন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অশৌচ পাঁচালি'। শেষে ছাপার খবর আছে সংস্কৃত শ্লোকে:

শ্রীমল্লল্লুকবিরাজকৃতে বর্ণযন্ত্রেঽঙ্কিতোঽয়ং
গ্রন্থঃ শাকে বিবরদহনদ্বীপচন্দ্রাঙ্ককেঽদ্য।
সৌরে ভাদ্রে প্রথম দিবসে শুক্রবারেঽতি-যত্নাৎ
পালেন শ্রীমদনপুরতো মোহনাখ্যেন সন্তঃ॥

'ওহে সংব্যক্তিগণ, এই গ্রন্থ আজ ভাদ্রমাসের পয়লা শুক্রবারে ১৭৩৯ শকাব্দে সুকবি শ্রীমৎ লল্লুর স্থাপিত ছাপাখানায় শ্রীমদনমোহন পাল কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হল॥'

বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানার কথা আগে বলেছি। আরও কিছু বলা প্রয়োজন। এই প্রেস ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পাঠ্যপুস্তক 'গণিতাঙ্ক' এই প্রেসে ছাপা হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে। নামপৃষ্ঠা এইরকম:

> গণিতাঙ্ক/পাঠশালার নিমিত্তে/কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী/দ্বারা/বাঙ্গালা ভাষায়/সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা গেল।
> [তারপর CSBS মোহর]
> কলিকাতা/শ্রীবিশ্বনাথ দেবের/ছাপাখানায় ছাপা হইল/ইং ১৮১৮/অগষ্ট মাস।

বইটিতে ৭১ পৃষ্ঠা। কাগজ ছাপা খুব ভাল।

ইতিমধ্যে স্কুল বুক সোসাইটির নিজস্ব ছাপাখানা ধর্মতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়েছিল চুঁচুড়ার পরলোকগত পাদরী মে (May) সাহেবের সংকলিত বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ। এর নামপৃষ্ঠার বাংলা অংশ এইরকম:

> অঙ্কপুস্তক,/পাঠশালার কারণ,/কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা মুদ্রিত হইল/মোকাম কলিকাতা স্কুল ছাপাখানাতে,/ইং ১৮২১ সনে, বাং ১২২৮ সনে।

মলাটে আর নামপৃষ্ঠায় ইংরেজী অংশে বইটির নাম যথাক্রমে May's Gonito ও Gonito. এ বইয়ের টাইপ কিছু ছোট। ছাপা ও কাগজ ভাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬।

হিন্দু কলেজের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। এ'দের কোন কোন পাঠ্য বাংলা বই মির্জাপুরে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞা যন্ত্রে ছাপা হয়েছিল। আমি দুটি বই দেখেছি 'শিশুসেবধি' ও 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। বইদুটির নামপত্র উদ্ধৃত করি। মাঝখানে মোহর আছে। তাতে লেখা "হিন্দু কালেজ"।

> শিশুসেবধি/
> [হিন্দু কালেজ মোহর]
> মৃজাপুরস্থ শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে/মুদ্রিত হইল।/১২৪৭

> গৌড়ীয় ব্যাকরণ। প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি।/হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের আদেশে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে সংগৃহীত।/
> [হিন্দু কালেজ মোহর]
> মৃজাপুরস্থ শ্রীশ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তির প্রজ্ঞাযন্ত্রে/মুদ্রিত হইল।/সন ১২৪৮।

'শিশুসেবধি' গ্রীস দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গৌড়ীয় ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের ছাঁটাই রূপ। ছাপা ভাল কাগজ মাঝারি ধরনের। এখন দেখলে মনে হয় যেন বটতলার বই।

১৭৬১ শকাব্দে (১৮৪০) প্রজ্ঞা যন্ত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুস্তিকা বার হয়েছিল। তার নামপত্রও উদ্ধৃতির যোগ্য।

> পরমেশ্বরের/উপাসনা বিষয়ে অঙ্কিত যোড়শ ব্যাখ্যান/শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক/ব্রাহ্ম্য-সমাজ/কলিকাতা/সোমবার ১ মাঘ/মৃজাপুরস্থ/শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্রে/মুদ্রাঙ্কিত হইল।/শকাব্দা ১৭৬১

এই পুস্তিকার স্বতন্ত্র নামপত্র রামমোহনের ধর্মের গ্রন্থে প্রথম দেখা গেল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়। "ব্রাহ্ম্য" শব্দটি লক্ষ্য করবার মতো। এটি কি পূর্ববঙ্গীয় "ব্রাইম্ম" উচ্চারণের শুদ্ধ রূপ, না ব্রহ্ম-ঘটিত অর্থে নূতন গড়া তৎসম শব্দ?

গোড়ার দিকে বাঙালীর প্রেসে ছাপা বাংলা বইয়ে কোন নামপৃষ্ঠা থাকত না (অন্ততপক্ষে আমি দেখিনি)। বিশ্বনাথ দেবের কোন কোন গ্রন্থ (যেমন, 'গণিতাঙ্ক' বা 'ভাষানুবাদিক চণ্ডী-

পুস্তক') ছাড়া। রামমোহনের জীবিতকালে ছাপা তাঁর কোন বাংলা বইয়ে নামপত্র দেখিনি। কিন্তু ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের প্রেসে মুদ্রিত বাংলা বইয়ে নামপৃষ্ঠা থাকত হয় ইংরেজীতে নয় ইংরেজী-বাংলা দুই ভাষায়। তার আগে শ্রীরামপুর মিশনে ছাপা বাংলা বইয়ে দুটি করে নামপৃষ্ঠা থাকত। একটি ইংরেজীতে অপরটি বাংলায়। যেমন, রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। নামপৃষ্ঠা সবটাই ইংরেজীতে। এ বই ছাপা হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে J. G. Balfour কর্তৃক ১ নম্বর মিশন রো-এ গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেসে। বাংলা মূলের পর ইংরেজীতে অনুবাদ আছে। মূলের শেষ আছে, "ইতি বেদান্তচন্দ্রিকা সমাপ্ত"। মূলের পত্রসংখ্যা ৬৭, অনুবাদের ৫০।

আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বটতলা অঞ্চলে (এবং অন্যত্র) যে সস্তা প্রেস-গুলি হয়েছিল সে গুলিতে অন্য প্রেসের পরিত্যক্ত পুরানো ধরনের সংযুক্ত বর্ণগুলির ব্যবহার দেখা যায়। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ এই সব প্রেস ধর্মকর্মের ও বৈষ্ণব গ্রন্থ বেশী ছাপত, সুতরাং পুথির সঙ্গে তাঁদের ছাপা বস্তুর অভিপ্রায় ছিল। তাই পুথির বানান অনুযায়ী পুরানো ছাঁদের টাইপ তাঁরা—এবং তাঁদের পাঠকরা যাঁরা পুথি পড়তে অভ্যস্থ ছিলেন—পছন্দ করতেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সব প্রেসের মালিকেরা অপর প্রেসের বর্জিত এই টাইপগুলি হয়ত সস্তাদরেই পেতেন। এই যুক্তাক্ষর টাইপগুলি হল প্রধানতঃ ক্ন (=ক্‌), স্ত (=ত্ত), দ্ব (=দ্দ), র্ণ্ণ (=র্ণ)—এই কটি তাছাড়া ড়-কারে প্রায়ই ফুটকি থাকত না আর ব-কার স্থানে পেটকাটা ৰ ব্যবহৃত হত। পরে যুক্ত টাইপগুলিও পরিত্যক্ত হয়। প্রথমে কমে যায় 'ক্ন' তারপরে কমে 'র্ণ্ণ', তারপরে কমে 'দ্ব', সবশেষে যায় 'স্ত'। নন্দকুমার কবিরত্নের 'শুকবিলাসে' (১২৫৮ সালের ফাল্গুন মাসে ছাপা) শ্রীযুৎ দাসরথী রায়ের '১ নম্বর পাঁচালী' গ্রন্থে (১৯ পৌষ ১২৫ নং) ও কালিদাসের 'কালীবিলাসে' (ছাপার তারিখ দেওয়া নেই) সব টাইপগুলিই আছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে ছাপা কোন বটতলার বইয়ে 'স্ত' দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। বিকট যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে আমরা এখনো 'হ্ম' ও 'ক্ষ' রেখে চলেছি। তার কারণ বাংলা ভাষার পক্ষে এ দুটির ধ্বনিমূল্য সংস্কৃত থেকে বদলে গেছে। 'হ্ম'=ম্‌হ্‌ অর্থাৎ মহাপ্রাণিত ম-কার আর 'ক্ষ'=ক্‌খ। এই জন্যেই এ দুটিকে সহ্য করতে হয়েছে। আরও কিছু যুক্ত বর্ণ আছে। যেমন, 'ক্ত' (=ক্‌ত), 'ত্র' (=ত্‌র) এগুলি বোঝা সোজা, তাছাড়া এগুলি দ্বিতীয়ভাগের ('বর্ণপরিচয়') অনুমোদিত।

বটতলার ছাপা ও প্রকাশ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল দুটি—নৃত্যলাল শীলের ও বেণীমাধব দে-র। শীলদের যন্ত্রে ছাপা ও "কলিকাতা বাঞ্চা বটতলা" শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল শীলের ২৪৬নং পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে "প্রাপ্তব্য কৃশদেব পালের" সাইন সংযুক্ত 'কাদম্বিনী' নাটকের উল্লেখ আগে করেছি। ছাপা হয়েছিল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে নৃত্যলাল শীলের অধিকার ছিল কিনা জানি না। নৃত্যলাল শীলের নিজস্ব ছাপাখানা—এন, এল, শীল প্রেস—৬৫নং আহিরীটোলা স্ট্রীটে ছিল। এই তথ্য পাই ১২৮৯ (১৮৮২) সালে ছাপা (মুদ্রণে "১৩৮৯") কৃশদেব পালের 'হরিবিলাসসার' থেকে।

১২৭৫ সালে (১৮৬৮) প্রকাশিত বই থেকে জানতে পারছি যে ওই সময়ে নৃত্যলাল শীলের পুস্তকালয় ৩১৯ নম্বর চিৎপুর রোডে ছিল। উত্তর কলকাতায় এটি ছিল সবচেয়ে বড় বাংলা বইয়ের দোকান। ১২৭৫ সালে ছাপা নিধুবাবুর 'গীতরত্নে'র তৃতীয় সংস্করণের মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় পঞ্চাশ ষাটখানা বইয়ের বিজ্ঞাপন আছে। তার মধ্যে স্ট্যানহোপ প্রেস প্রভৃতি অন্যান্য প্রেসে ছাপা কাব্য নাটক ইত্যাদির নাম আছে। নৃত্যলাল শীলের বইয়ের দোকান এখন পর্যন্ত বেশ চালু আছে।

বেণীমাধব দে এ্যাণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী রাজকিশোর দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থাবলীর 'মায়াকানন' (১৮৭৪) ছাড়া স্বত্ব মেকেঞ্জিলায়ল এণ্ড কোম্পানীর নীলামে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে খরিদ করে নিয়ে ভাল কাগজে বড় অক্ষরে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিল দীর্ঘকাল ধরে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের চতুর্থ সংস্করণ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮৫ নম্বর চিৎপুর রোড স্থিত বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ছাপা হয়ে ওই ঠিকানা থেকেই বেণীমাধব দে এ্যাণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরে 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র পঞ্চম সংস্করণও ছাপা হয়েছিল এই প্রেসে।

পরবর্তীকালে বেণীমাধব দে কোম্পানী বেশীর ভাগ বৈষ্ণব পুস্তিকাই প্রকাশ করতেন। এসব পুস্তিকা অধিকাংশই খুব ছোট আর পুথির ধরনে লম্বালম্বি ছাপা। কোম্পানী উঠে যায় ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। স্টক ক্লিয়ার করবার জন্যে দোকানের সামনে রকে বই রেখে বিক্রি করা হত। সেই অবস্থায় আমি বাবার জন্যে সেরকম কিছু পুস্তিকা কিনেছিলুম।

বর্তমান শতাব্দীতে বটতলার প্রকাশকদের শীর্ষস্থানীয় ছিল রামলাল শীলের ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী। ইনি অনেক সমসাময়িক লেখকের নাটক প্রহসন উপন্যাস গান ও বিবিধ ধর্মপুস্তক

প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন এ'দের দোকানে আমি যাই তখন এ'দের কারবার অনেক ছোট হয়ে গেছে। স্বত্বাধিকারী মৃত্যুঞ্জয় দে—রামলাল শীলের দৌহিত্র—আমাকে তাঁদের প্রকাশিত অনেক পুরানো বই দিয়ে অশেষ উপকার করেছিলেন।

বটতলা অঞ্চলে স্থাপিত প্রেস যে সবই হিন্দুদের তা নয়, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত প্রেসও ছিল। তবে মুসলমানদের স্থাপিত প্রেস যেখানে বাংলা বই ছাপা হত তা পাচ্ছি দুটি—"শ্রীযুক্ত মহাম্মদ দেবায়তুল্লা"-র মহাম্মদি যন্ত্র, আর নং উল্লিখিত রহমানি যন্ত্র। দুই ছাপাখানাই ছিল শিয়ালদায়। মহাম্মদি যন্ত্রে দ্বিতীয়বার ছাপা হয়েছিল মহাম্মদ মিরণের 'ধাহার দানেশ' ১২৫২ সালে (১৮৪৫-৪৬) আর রহমানি যন্ত্রে ছাপা হয়েছিল বাধামাধব মিত্রের 'বিধবা মনরঞ্জন' দ্বিতীয় খণ্ড। মুসলমান কবি ও লেখকদের পুরানো ও আধুনিক রচনার মুদ্রণে ও প্রকাশে অগ্রগণ্য হয়েছিলেন মুন্শি গোলাম মওলা। এ'দের—মুন্শি গোলাম মওলা এণ্ড সন্স—যন্ত্র হবিবি প্রেস ৬৪/৩নং মেছোবাজার স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ প্রেস সম্ভবতঃ বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে স্থাপিত হয়েছিল।

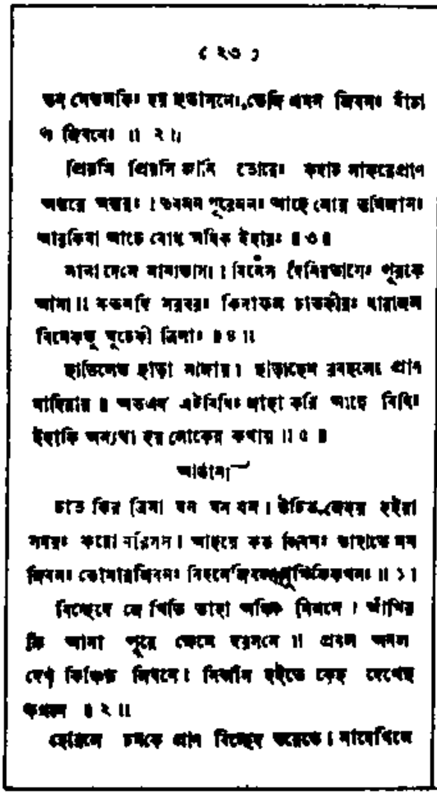
(২৩)

আরুকিবা আছে বোধ অধিক ইহার ॥ ৩ ॥

ইহাকি অন্যথা হয় লোকের কথায় ॥ ৫ ॥

নিধুবাবুর জীবৎকালে ছাপা 'গীতাবলী'র একটি পৃষ্ঠা

'ভাইফোঁটা': বটতলার বইয়ের ছবি

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের তাণ্ডবের পরেও মেছোবাজার স্ট্রীটে মুসলমান প্রকাশকের দোকান ছিল। সম্ভবতঃ এখনও আছে। তাণ্ডবের পরেই আমার নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল দৌলতকাজীর কাব্যের। সাহিত্য পরিষদে ছিল। তা আমি দেখেওছিলুম। কিন্তু তখন সাহিত্য পরিষদ যাঁদের কবলে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন যাতে কেউ তাঁদের গবেষণার ভাগীদার না হয়। তাঁদের অনুগত বাজে লোককে বই দেখতে দিতেন কিন্তু কাজের লোককে কদাপি নয়। সুতরাং আমি গেলুম বটতলায়। সেখানে মুসলমানী কেতাবের আর টুকরোও পেলুম না। তখন গেলুম মেছোবাজার স্ট্রীটে। দেখলুম ১১ নম্বর বাড়িতে 'হাজি আইজুদ্দীন আহ্‌মদ এণ্ড সন্স'এর গাওছিয়া লাইব্রেরীর সাইনবোর্ড। এ'রা দৌলৎকাজীর 'সতী ময়না' ছাপিয়েছিলেন ১৩৪২ সালে। আমি এক কপি বই কিনতে চাইলুম। ওঁরা বললেন সব আগুনে পুড়ে গেছে, একটিমাত্র কপি আছে। তা ওঁরা বেচতে চাইলেন না। বললেন, আবার যদি ছাপতে হয় তো কপি কোথায় পাব। আমি

জিজ্ঞাসা করলুম বইটি কি শীঘ্র ছাপা হবার সম্ভাবনা আছে? ওঁরা বললেন, না। তখন আমি নিজের পরিচয় ও ঠিকানা দিয়ে বললুম, যদি আপনারা ছাপান তবে যখনি বলবেন তখনি এই বই দিয়ে যাব। তাঁরা আমার কথায় বিশ্বাস করে বইটি আমায় ন্যায্য দরে দিলেন। আমি অনেক বেশী দাম দিতে প্রস্তুত ছিলুম। হাজি আইজুদ্দীন আহ্মদ এ্যাণ্ড সন্সের কাছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হেরে গেল। ওঁরা কিন্তু সে বই আর চেয়ে পাঠাননি। এখনও আমি ছাপতে ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি।

'বটতলা' ইসলামি বইয়ের ছবি: ঘোড়া দেতুব ও হানিফা

মুসলমানী কেতাব বটতলার হিন্দু প্রকাশকেরাও ছাপতেন। আর বটতলায় মুসলমান প্রকাশকদের প্রেস ও কার্যালয় ছিল। এ'দের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন কাজি সফিউদ্দিন ও তাঁর পুত্র কাজিসাহা ভিক। এ'দের ছাপাখানার নাম ছিল সোলেমানি প্রেস ও দোকানের নাম সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী। দুই-ই ছিল দরজীপাড়ায় ১১৫ (পরে ১১৫/১) নম্বর দরজীপাড়া স্ট্রীটে। প্রকাশিত বইটির নামপৃষ্ঠায় ছাপা শীলমোহর থেকে জানা যায় যে কাজি সফিউদ্দিন তাঁর কারবারের পত্তন করেছিলেন ৭ই শ্রাবণ ১২৭২ সালে (১৮৭৫)। সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী থেকে অনেক বই বেরিয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের তাণ্ডবে এ লাইব্রেরী ও প্রেস বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত একটি বইয়ের পরিচয় দিই। বর্ধমানের রাজবাড়ী প্রকাশিত মহাভারত-হরিবংশের মতোই একটি বাংলাভাষার সর্বাধিক বৃহৎকায় গ্রন্থ। আকার ৩৩ × ৩৫ সেণ্টিমিটার, ছাপা অংশ ২৭ × ১০ সেণ্টিমিটার। প্রকাশকাল ১৯১০। বইটি হল উর্দু আরব্য-উপন্যাসের বাংলা পদ্যে তরজমা। নামপৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করছি:

> সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! এই কেতাবের নকল বাহির হইয়াছে।/শ্রীশ্রীহক্নাম/এই পুস্তকের নাম।/আদি ও আসল/কেচ্ছা আলেফ-লায়লা।/৪ দস্তর পুরা ৫০ বালমে সমাপ্ত।/সাএর/পহেলা দোসরা দস্তর শ্রীযুক্ত মুন্শী ছৈয়দ নাছের আলি। ছাহেবও তছ্রা দস্তর শ্রীযুক্ত মুন্শী হবিবল হোছেন ছাহেব ও চৌথ দস্তর শ্রীযুক্ত মুন্শী আয়জদ্দিন/আহাম্মদ ছাহেব॥/
> (মোহর)
> আমি শ্রীকাজিসাহা ভিক। বেনে মরহুম কাজি সফিউদ্দিন॥ কলিকাতা।/দরজীপাড়া মসজিদবাটী ষ্ট্রীট, ১৫৫নং ভবনে/"সোলেমানি প্রেসে"/মোহাম্মদ সোলেমান দ্বারা মুদ্রিত॥ সন ১৩১৭ সাল।

গদ্যের মতো টানা ছাপা এই বড় বইটি ছাপতে অনেক দিন লেগেছিল। ছাপা শুরু হয়েছিল ১৩০৮ সালে। একথা জানা যায় প্রকাশকের "বিশেষ বিজ্ঞাপন" থেকে। বইটি খণ্ডে খণ্ডে

("বালম") প্রকাশিত হয়। এক এক খণ্ডে থাকত চার থেকে সাত ফর্মা অর্থাৎ ১৬ থেকে ২৮ পৃষ্ঠা।

যে বইটি আমি দেখেছি তাতে চল্লিশ খণ্ড অবধি আছে। "চাল্লিসন্ত বালম"—এর শেষ পাতার সংখ্যা ৭৩৪।

বটতলা থেকে অনেক বড় বড় বই বের হত 'গুপ্তকথা' নামধেয় এবং অথবা কেচ্ছাজাতীয়। এগুলির মূল উৎস হল 'হুতোম পেঁচার নকশা' আর সে উৎসস্রোতের পরিবর্ধন করেছিল রেনলড্সের ইংরেজী কেচ্ছা নভেলগুলি। এসব বই এবং অন্য বইও সম্পূর্ণ ছাপা হয়ে বেরোবার আগে খণ্ডে খণ্ডে বিক্রি হত সাময়িক পত্রিকার মতো। বিলেতেও এরকম হত। এই রকম খণ্ড বিক্রয় সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়েছি শতাব্দীর একেবারে শেষে দুটি বই থেকে।

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'পঞ্চম বেদ' মহাভারতকে ধারাবাহিকভাবে নাট্যকাব্যে রূপান্তরিত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হত। ছাপা হত ২৪ নম্বর বিডন স্ট্রীটে Full Moon Printing Works-এ। খণ্ডগুলি পাক্ষিক বার হত ১৩০৩ সালের পয়লা আষাঢ় থেকে। কিছুকাল পরে প্রকাশ কিছুদিন বন্ধ থাকায় প্রকাশক ১৫ই মাঘ ১৩০৩ সালে এই বিজ্ঞাপন মলাটে ছাপিয়েছিলেন "সরকারের ভয়ংকর প্রবঞ্চনা" শীর্ষকে। তিনি লিখেছিলেন,

> মহাভারত প্রকাশকালীন কয়েকজন প্রতারক প্রফুল্লবাবুর সরকার ছিল; এই বিশ্বাসঘাতকেরাই মহাভারতের সর্ব্বনাশ করিয়া—এমনকি হাতচিঠা পর্যন্ত লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

মহাভারত নাট্যকাব্যের ৮৯ খণ্ড অবধি দেখেছি। এই খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠার সংখ্যা ২৫২৮। তখন বনপর্বে শকুন্তলোপাখ্যান চলছে।

দ্বিতীয় বই হল শরচ্চন্দ্র সরকার 'সংকলিত' গোয়েন্দাকাহিনী। মাঝে মাঝে ডিটেকটিভ গল্প এই নামে প্রকাশিত হত ১৩০১ সাল (১৮৯৪) থেকে অন্তত ১৩০৪ (১৮৯৮ পর্যন্ত)। প্রকাশকের "বিনীত নিবেদন" (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০২) থেকে জানা যায় যে গোয়েন্দা কাহিনীর প্রত্যেক খণ্ড সপ্তাহে দুদিন করে সাময়িকপত্রের মতো ফর্মা ধরে বিক্রি হত। বিজ্ঞাপনটির অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য:

> কলিকাতার অনেক মনোহারীর দোকানে (Stationery Shop) গোয়েন্দা কাহিনী বিক্রীত হয়। রাস্তার আমাদের যে সকল লোক নগদ মূল্যে ফর্মা বিক্রয় করিত, তাহাদের মধ্যে দশ বার জন লোক, কেহ পাঁচ, কেহ সাত, কেহ দশ (নগদ বিক্রয়ের) টাকা লইয়া পলায়ন করিল দেখিয়া বাধ্য হইয়া আমাদের সে বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখন আমরা প্রতি ফর্মা কলিকাতার দোকানদারগণের নিকট (সকল দোকানদার নহে, যাহারা আমাদের গোয়েন্দা-কাহিনী বিক্রয় করিয়া থাকেন) প্রতি সপ্তাহে দুইবার (সোমবার ও বৃহস্পতিবার) প্রেরণ করিয়া থাকি যাহারা ট্রামওয়ের ধারে বা রাস্তায়, ফর্ম্মা ফর্ম্মা নগদ মূল্যে ক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন তাঁহাদের নিজ নিজ বাটীর নিকটবর্তী দোকানে ফর্ম্মা ফর্ম্মা প্রাপ্ত হইবেন। অসুবিধা ঘটিবার কোন কারণ নাই। যাঁহাদের বাটীর কাছে (গোয়েন্দা-কাহিনী বিক্রেতার) দোকান নাই, তাঁহারা কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইবেন, যাহাতে তথায় একজন দোকানদার ঠিক করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা হইবে! "গোয়েন্দা-কাহিনী" এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ ফর্ম্মা বিক্রীত হইয়াছে।

বাঙ্গালা পুস্তকের এত অধিক কাটতি আর পূর্বে কখন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। গোয়েন্দা-কাহিনী ছাপা হত কলুটোলায় ৪৯ নম্বর ফিয়ার লেনের মোহন প্রেসে।

বিভিন্ন লেখক গোয়েন্দা কাহিনীর গল্প লিখতেন। তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর পুত্র মণীন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন। শরচ্চন্দ্র নিজেও দু একখানি বই লিখেছিলেন (যেমন 'তীর্থে বিভ্রাট' ও 'গুম খুন')। শরচ্চন্দ্র লেখক হিসাবে অখ্যাত ছিলেন না। তিনি নাটকও লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'শাক্যসিংহ-প্রতিভা বা 'বুদ্ধদেব চরিত' (আদি লীলা) কিছু সমাদর লাভ করেছিল বইটি ছিল ১২৯৫ সালে।

সেকালে ভাল ভাল লোকে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তেন। অন্তত উৎসর্গ পত্র থেকে সেই অনু-মান করা যায়। প্রত্যেক সংখ্যা একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বা সাহিত্যিককে উৎসর্গ করা হত। যেমন, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি (চোরবাগানে শরচ্চন্দ্রের প্রতিবেশী ও নাট্যশিক্ষাগুরু), নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ('বঙ্গমহিলা'র সম্পাদক), রায় বৈকুণ্ঠনাথ বাহাদুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজ-নারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, দামোদর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (শরচ্চন্দ্রের পিতার সহপাঠী, পিতা ছিলেন ফার্স্টবুকের প্যারীচরণ সরকার), বিনয়কৃষ্ণ দেব, সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি।

গোয়েন্দা-কাহিনীর অনেক গল্পই একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছিল। এদের মধ্যে 'রঘুডাকাত' পাঁচকড়ি দে ভাল করে ছবি দিয়ে ছাপিয়েছিলেন। এ বই এখনও চলে।

সংকীর্ণ অর্থে বটতলার বই বলতে বুঝি 'বেশ্যাসঙ্গীত', 'নেড়ানেড়ার টপ্পা', 'রাজকন্যার গুপ্তকথা', 'পিরীতের কাট-পিঁপড়ে', 'বাওয়া ডিমে বাচ্ছা', 'হনুমানের বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি বই। তা হলেও স্বীকার করব যে এই ধরনের বইয়ের মধ্যে দিয়েও বাঙালী সংস্কৃতির সামান্য কিছু পোষকতা হয়েছে।

থিয়েটারের গান বটতলা খুব ছাপত। আর এমন পুস্তিকা খুব বিক্রি হত। এই সব পুস্তিকা সবই খেলো নয়। যেমন জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেট সঙ্কলিত 'প্রেমসঙ্গীত' (শীলযন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৯৬) ও 'রহস্যসঙ্গীত' (দ্বিতীয় সংস্করণ দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে সুধানিধি প্রেসে ছাপা, ১২৯৮)। প্রথম পুস্তিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের চারটি গান আছে 'রাজা ও রানী' আর 'বসন্ত রায়' (কেদারনাথ চৌধুরীর লেখা 'বউঠাকুরানীর হাটে'র নাট্যরূপ)। দ্বিতীয় পুস্তিকায় আছে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি গান (কোনটিই প্রেমসঙ্গীতে নেই), তার মধ্যে দুটি হল ভানুসিংহের পদ। গানের সংগ্রহ হিসাবে পুস্তিকা দুটি বেশ ভাল।

একটি নিতান্ত চটি বইয়ের পরিচয় দিয়ে আমি বটতলার আসর গুটিয়ে ফেলি। বইটির নামপৃষ্ঠা এই:

> নূতন সখের/থিয়েটারের গান/ইহাতে স্টার থিয়েটার; এমারেল্ড থিয়েটার; রয়েল/বেঙ্গল থিয়েটার; সিটী থিয়েটার; করিণথিন/থিয়েটার; আর্য-নাট্যসমাজ; লীলা/নাট্যসমাজ; ন্যাসন্যাল থিয়েটার/ইত্যাদির গান সংগ্রহ।/শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা সংগৃহীত/দ্বিতীয় সংস্করণ।/কলিকাতা।/চিৎপুর রোড ১৯ নম্বর বৃন্দাবন বসাকের লেন/নূতন বঙ্গ লাইব্রেরীর পুস্তকালয় হইতে/শ্রীলালবিহারী সেন কর্তৃক/প্রকাশিত।/সন ১২৯৮ সাল।/মূল্য ১০ আনা/

বইটি নিতান্তই চটি। বারো পৃষ্ঠা মাত্র। ছাপা হয়েছিল ৬৫ নম্বর আহিরীটোলা স্ট্রীটে। প্রেসের নাম নেই। সব শুদ্ধ গান আছে আটাশটি। তিনটির রচয়িতার উল্লেখ নেই। একটি সংকলয়িতার নিজের। গিরিশচন্দ্রের ন-দশটি, রাজকৃষ্ণ রায়ের দুটি, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের দুটি, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির একটি করে গান আছে। রবীন্দ্রনাথের গান হল, "বঁধু তোমায় করব রাজা"।

সংকলয়িতার গানটি সপ্তম গান। গানটি সমগ্র উদ্ধৃত করছি। বিশেষ দ্রষ্টব্য কবির পরিচিতিটুকু।

গীত

দয়া করি প্রিয়া মোরে কর কৃপা দান।
কিবা দুখে হেরি তব মলিন বয়ান॥
ভিক্ষা চাহি তব কাছে কর মোরে দান।
কি দুখে মলিন হিয়ে বল ওরে প্রাণ॥
বল বল শীঘ্র বল রাখ মম মান।
থাক থাক কেন প্রিয়ে কর অভিমান॥
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস—বালাখানা ইস্কুলের ছাত্র।

উনিশ শতকের শেষের দিকের কলকাতার ছাত্র কবিদের প্রেমের কবিতার নমুনা হিসাবে গানটির ঐতিহাসিক মূল্য না থাকলেও কৌতুক মূল্য কিঞ্চিৎ আছে।

পাঠপঞ্জী

সুকুমার সেন। 'বটতলার বেসাতি' বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫
Sen Sukumar. Early Printers and Publishers of Calcutta, in *Bengal Past and Present*, Jan.-June, 1968

বাংলা সাময়িকপত্র

দেবীপদ ভট্টাচার্য

কথাটি প্রথম বলেছিলেন ফ্রান্সিস বেকন: মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ আর চুম্বক দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কারলাইল প্রায় তার প্রতিধ্বনি করে 'চুম্বকের' স্থানে বসান প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতকে। আমাদের দেশে পাণ্ডুলিপির একচ্ছত্র রাজত্বে মুদ্রাযন্ত্রের পদক্ষেপ স্বভাবতঃই ঐতিহাসিক কারণে ছিল বিলম্বিত। বাংলা হরফের ধাতব রূপে আত্মপ্রকাশ হলহেডের ('হালদঙ্গেজী') 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮) ছাপবার সময় দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজনেই ঘটে। বইটিতে কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ', কাশীদাসী 'মহাভারত' ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ধাতব হরফের এই যোগাযোগ সম্ভব করে তুলল বাংলা সাময়িক-পত্র ও প্রকাশন-শিল্পকে। ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে আঠারো শতকে পাশ্চাত্য বণিকদের আধিপত্য হেতু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটায় এই বিস্তীর্ণ এলাকা ক্রমশঃ শহর-মুখী হয়ে উঠছিল। এই শহরমুখীনতা শ্রোতা বা দর্শক-সাধারণ থেকে ধীরে ধীরে পড়ুয়া-সাধারণ সৃষ্টি করল। পুথি-পাঠক বদলে গিয়ে হল ছাপা বইয়ের পাঠক। শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' ও কাশীদাসী 'মহাভারত' 'ফিরিঙ্গিনাম' মুখ চেয়ে প্রকাশিত হয়নি, বাঙালী পাঠকই তাদের লক্ষ্য ছিল। কাজেই শ্রীরামপুরে মিশন বাংলা বই প্রকাশনের ক্ষেত্রে নেমে-ছিলেন প্রথমে, পরে বার করেন 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'। (তাঁদের ছাপা 'রামায়ণ-মহাভারতে'র হরফ পুথির হরফকেই অনুসরণ করেছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।) এই 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' বাংলার ইতিহাসে অবশ্যই একটি যুগান্তর ঘটাল। 'দিগদর্শন অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশিত প্রথম বাংলা মাসিক পত্র। প্রথমে এর দ্বি-ভাষিক রূপ ছিল। এই পত্রিকায় 'আমেরিকার প্রথম দর্শন', 'চুম্বক পাথরের প্রথম অনুভব', 'মহম্মদ ও কোরাণের বিবরণ', 'পৃথিবীর আকর্ষণের বিষয়', 'নিশ্চল তারার বিষয়', 'ছাপাকর্মের বিবরণ'[১] প্রভৃতি প্রকাশিত হত, খ্রীষ্টধর্মের মহিমা ও পরধর্মের নিন্দা প্রচার এর উদ্দেশ্য ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হত বলেই স্কুল বুক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮১৭) এই পত্রিকাটির সমাদর করতেন।

'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে ফেলিক্স কেরী ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের পরিচালনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে দেখা দেয়। এই পত্রিকা জন্মকাল থেকেই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, কিন্তু কোম্পানীর কোনো কোনো কাজের সমালোচনায় তার কণ্ঠ নীরব থাকেনি। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যস্বরূপ বলা হয়েছিল ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য

দেশের সমাচার, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা এবং ইউরোপে মুদ্রিত নতুন জ্ঞানগর্ভ বই-গুলি থেকে আহৃত তথ্যাদি ছাপানো হবে। এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে কার্যে রূপায়িত হয়েছিল।

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যেমন সাময়িক পত্র সম্পাদন ও গ্রন্থ প্রকাশনের ক্ষেত্রে নেমেছিলেন, অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখতে পাই একদা 'মিশন' প্রেসের কম্পোজিটর উদ্যোগী বাঙালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মধ্যে। গঙ্গাকিশোর সমকালের অর্থনৈতিক সূত্রটি অনেকটাই ধরতে পেরেছিলেন। সে জন্য 'অন্নদামঙ্গলে'র[৭] প্রথম সচিত্র মুদ্রিত রূপ পাঠকসাধারণের সামনে আনেন ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তিনি ছাপাখানা খুললেন ৪৫ চোরবাগান স্ট্রীটে, বার করলেন 'বাঙ্গাল গেজেটি' জেম্‌স অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেটে'র (১৭৮০) অনুসরণে, 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশের প্রায় সমকালে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকা অবশ্য এক বছরের বেশী বাঁচেনি। কিন্তু গঙ্গাকিশোরই প্রথম বাঙালী, যিনি মুদ্রাযন্ত্র, গ্রন্থপ্রকাশ ও সাময়িকপত্র প্রচার,—এই তিনের পরস্পর-নির্ভরতা বুঝতে পেরেছিলেন। বাংলাভাষায় তখন 'গেজেট' জাতীয় পত্রিকা ছাপলে যে চলবে—এই বোধ তাঁর ছিল।

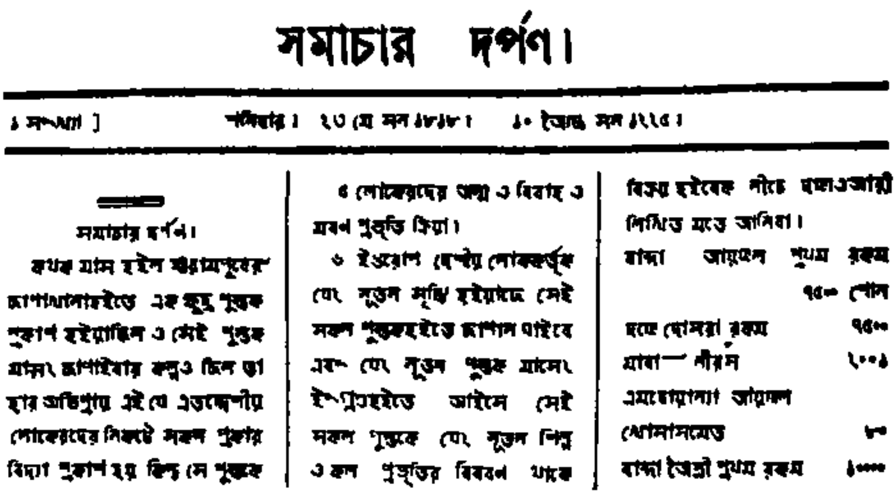

সমাচার দর্পণ।

১ সংখ্যা]   শনিবার। ২৩ মে সন ১৮১৮।   ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৫।

সমাচার দর্পণ।

প্রথম মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল এ সেই পুস্তক মাসং ছাপাইবার কল্প ও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তক

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপ দেশীয় লোককর্ত্তৃক যেং নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তকহইতে ছাপান যাইবে এবং যেং নূতন পুস্তক মাসেং ইংগ্লণ্ডহইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যেং নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে

বিক্রয় হইবেক নীচে যথাওয়ারী লিখিত মতে জানিবা।

বাফ্তা জায়ফল প্রথম রকম ৭৫০ তোল

হতে তোমরা রকম ৭৫০০

মাবা— শীরম ১০০১

এমাবোয়ানা জায়ফল

খোসাসমেত ৮০

বাফ্তা মৈত্রী প্রথম রকম ১০০০

'সমাচার দর্পণ' অর্ধশতকব্যাপী চলেছিল এবং এই দর্পণেই একদা ভেসে উঠেছিল দেওয়ান চক্রবর্তী বংশের 'বাবু' তিলকচন্দ্রের মুখচ্ছবি। সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় এই প্রথম পাওয়া গেল নক্‌শাধর্মী গদ্যরচনা; মিলল কথাসাহিত্যের স্বাদ। 'বাবুর উপাখ্যান' ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ৯ জুন তারিখে দুই কিস্তিতে ছাপা হয়। প্রমথনাথ শর্মার (ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়) 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) বা টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারীচাঁদ মিত্র) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) প্রকৃতপক্ষে 'বাবুর উপাখ্যানে'র বিস্তারপর্ব। 'সমাচার দর্পণে' আরো কিছু নক্‌শাধর্মী রচনার সাক্ষাৎ পাই।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দেরই সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্মার নামে বার করেন দ্বি-ভাষিক সাময়িকপত্র *'Brahmunical Magazine, The Missionary and the Brahmun* No. 1 ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ সং ১, ১৮২১'। 'সমাচার দর্পণে' বক্তব্য প্রকাশের বিরুদ্ধে শিবপ্রসাদ শর্মার (অর্থাৎ রামমোহনের) সম্পূর্ণ জবাব প্রকাশে মিশনারিরা অসম্মত হওয়ায় রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশে উদ্যোগী হন। তা হলে দেখা যাচ্ছে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশের পিছনে রামমোহনের ধর্মীয় ও সামাজিক মত প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশে (১৮২১ ডিসেম্বর)। তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র পরিচালনায় ছিলেন বটে, কিন্তু নেপথ্যে রামমোহনই ছিলেন সক্রিয়। ভবানীচরণ 'অংশিগণের সহিত ধর্মবিষয়ে ঐক্যমত্য না হওয়ায়' 'সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 'এশিয়াটিক জর্নালে'র সাক্ষ্যে জানা যায় রামমোহনের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (সহমরণ বিষয়) এই পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। মিশনারি ও রামমোহনের দ্বন্দ্ব যেমন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও 'সম্বাদ কৌমুদী'র পিছনে ছিল, তেমনি রামমোহনের প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজও ভবানীচরণকে সম্পাদক নিয়োগ করে প্রকাশ করলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২)। ব্রাহ্ম-

মোহনের ব্রহ্মসভা (১৮২৮) তখনো পাকাপাকিভাবে দাঁড়ায়নি বা আলেকজাণ্ডার ডাফ অ্যাসেম্বলি (১৮৩০) অথবা ধর্মসভা স্থাপিত হয়নি (১৮৩০)। কিন্তু মিশনারিগোষ্ঠী, রামমোহনপন্থী ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। এই সামাজিক দৃষ্টির দ্বন্দ্বই পত্রিকাগুলির দ্রুত প্রকাশের মূলে, কোন সাহিত্যিক প্রয়োজন নয়। 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলেছিল। সেজন্য 'সমাচার দর্পণ' মন্তব্য করেছিল:

"উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব ২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ"।

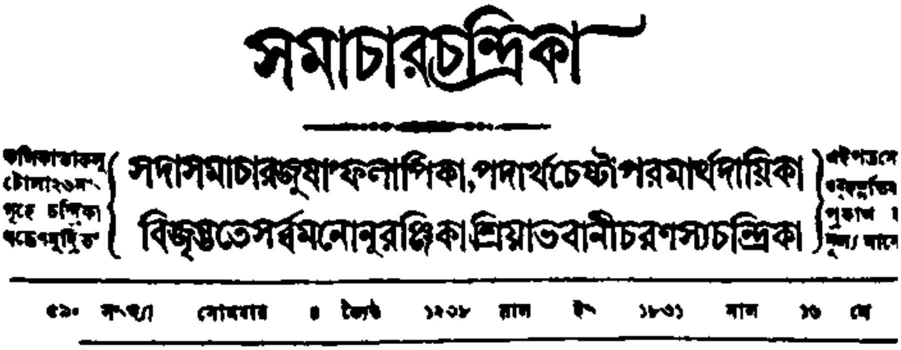

'সমাচার চন্দ্রিকা' অনেকদিন চলেছিল। তার নিজের প্রেস প্রথম ছিল ২৫ রামমোহন ঘোষ স্ট্রীটে। নিজের প্রেস না থাকলে ঠিকমত কাগজ চলে না। কিন্তু ভবানীচরণ শুধুমাত্র সাময়িকপত্র প্রকাশেই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি বঙ্গাক্ষরে 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'গীতা', 'মনুসংহিতা'ও ছাপিয়েছিলেন। এই প্রথম হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা পেল। (শোনা যায় প্রেসের কাজে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হত।) পরবর্তীকালে এই কাজ করেছিল রক্ষণশীল 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্র (১৮৮১)।

পাদ্রি জেম্‌স লং লিখেছিলেন ১৮২১ খৃষ্টাব্দে এদেশীয় লোকের পরিচালনায় মাত্র চারটি নাম করার মতো বাংলা প্রেস ছিল—লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালী প্রেস,° পটলডাঙায় লল্লুলালের সংস্কৃত প্রেস ও সভাবাজারে (শোভাবাজার) বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রেস ছিল। প্রেস ও পত্রিকা সামাজিক তাগিদে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। পাদরি লং-এর তৈরি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের তালিকায় আরো দেখা যায় বাংলা ভাষায় মুদ্রণের ৪৬টি মুদ্রাযন্ত্র ছিল; প্রচলিত ছিল ১৯ খানি সাময়িকপত্র যাদের মোট প্রচারসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮১০০।

হিন্দুসমাজের অগ্রগামী গোষ্ঠীভুক্ত রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার

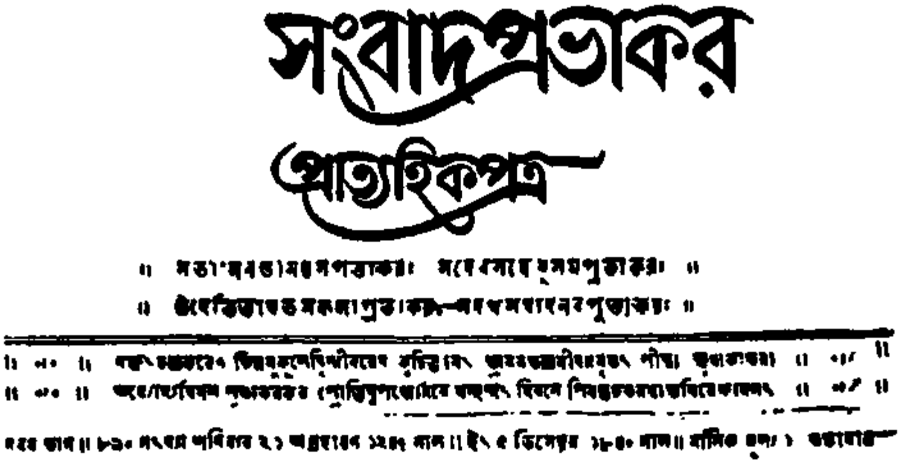

ইংরেজী 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকার বাংলা প্রতিরূপ 'বঙ্গদূত' সাপ্তাহিকের (১৮২৯) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুগোষ্ঠীর যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় ধর্মসভার অর্থপুষ্ট সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' আত্মপ্রকাশ করে উনিশ বৎসরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাতে। ঈশ্বর গুপ্ত পরে ধর্মসভা ছেড়ে দেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে যুক্ত হন। 'সংবাদ প্রভাকর' দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবশালী পত্রিকারূপে পরিচিত ছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি 'প্রাত্যহিক পত্র' হিসাবে দেখা দেয়। সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা যে বেড়ে চলেছে এ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আধুনিক কালের 'রিপোর্টাজে'র সূচনা পাওয়া যাবে ঈশ্বর গুপ্তের ছদ্মনামে লেখা 'ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্রে'। 'প্রভাকরে'র পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয় কবিওয়ালা, পাঁচালীকারদের জীবনী ও কবিত্ব ব্যাখ্যান। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী গ্রন্থাকারে (১৮৫৫) প্রকাশ করেন। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র বঙ্গানুবাদ 'বোধেন্দুবিকাস' 'সংবাদপ্রভাকরে' ধারাবাহিকভাবে বার হয়। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যযশঃপ্রার্থীদের যে আড্ডার কথা আমরা পরের যুগে শুনি, তার বৈঠক বোধ করি 'প্রভাকরে'ই প্রথম বসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রমুখ নবযুগের অনেক কবি-সাহিত্যিকেরই হাতেখড়ি 'প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায়, ঈশ্বর গুপ্তের সস্নেহ প্রশ্রয়ে। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর (১৮৫৯) পরও 'সংবাদপ্রভাকর' বেশ কয়েক বছর চলেছিল।

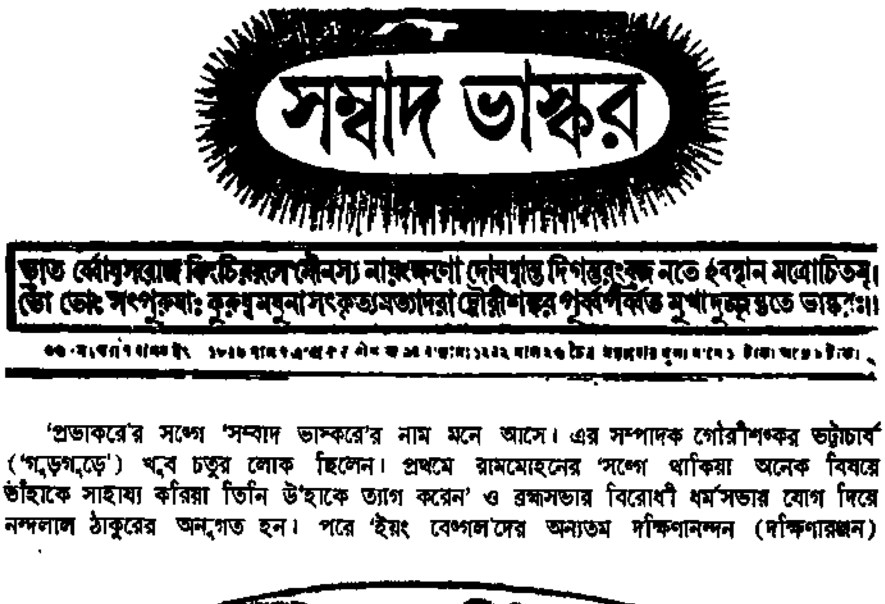

'প্রভাকরে'র সঙ্গে 'সম্বাদ ভাস্করে'র নাম মনে আসে। এর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ('গুড়গুড়ে') খুব চতুর লোক ছিলেন। প্রথমে রামমোহনের 'সঙ্গে থাকিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি উঁহাকে ত্যাগ করেন' ও ব্রহ্মসভার বিরোধী ধর্মসভার যোগ দিয়ে নন্দলাল ঠাকুরের অনুগত হন। পরে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অন্যতম দক্ষিণানন্দন (দক্ষিণারঞ্জন)

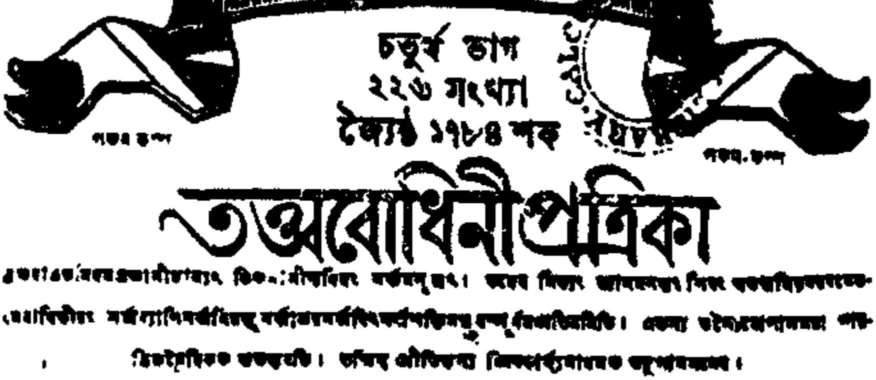

মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে নেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ ভাস্করে'র পরিক্রমা শুরু হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'শোভাবাজার রাজাখানার বাগানে' গৌরীশঙ্কর নিজের প্রেস বসান। সাপ্তাহিক থেকে বারত্রয়িক হয়েছিল কাগজটি। ভবানীচরণের মতো তিনিও তাঁর প্রেস থেকে 'গীতা', 'চণ্ডী' প্রভৃতি বঙ্গাক্ষরে মূলসহ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। স্কুলপাঠ্য বইও তিনি ছাপতেন। এ সবেরই মূলে উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জন।

দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) প্রথম উচ্চাঙ্গের বাংলা মাসিক পত্রিকা। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও 'যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ' করা। গ্রন্থ-প্রকাশ সভায় ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষীরা। এই পত্রিকার জন্যই 'একটি যন্ত্রালয় অতি আবশ্যক হইল'। রামমোহন যে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ সামাজিক। কিন্তু কাল বদলেছে, তাই দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য হল পত্রিকাটি দ্বারা 'বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার'। 'তত্ত্ব-বোধিনী'র গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ হয়েছিল বলে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন।[৪] পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। 'তত্ত্ববোধিনী'কে উচ্চাঙ্গের পত্রিকা বলা হয়েছে এইজন্য যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনা তথা বিধবা বিবাহের সমর্থনও এর পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য কালী-প্রসন্ন সিংহ নিজে একটি প্রেস কিনে তত্ত্ববোধিনী সভাকে দান করেছিলেন। গদ্যকে নিছক সাময়িকতা থেকে মুক্ত করে মনন ও উপলব্ধির বাহন করে তোলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

যে সময়ের কথা বলছি তখন ডেভিড হেয়ার সদ্য পরলোকগত (১৮৪২), মধুসূদন 'মাইকেলে' পরিণত (১৮৪৩), মেডিকেল কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলি কলেজ প্রতিষ্ঠিত, বেথুন স্কুলের দ্বার উদ্ঘাটিত (১৮৪৯), বেথুন মৃত (১৮৫১) এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নবজাত। কলেজ শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা সবই প্রসার লাভ করছে অর্থাৎ কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের (মুখ্যতঃ হিন্দু) সম্প্রসারণ খানিকটা ঘটেছে।

এই সম্প্রসারণের ফলেই দেখা দিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা Vernacular Literature Society পরিচালিত প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিক পত্র। বিলাতী 'পেনি ম্যাগাজিনে'র[৫] আদর্শে এই "পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র'টি সম্পাদনা করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই ধরনের পত্রিকার অনুপস্থিতির জন্য আক্ষেপ করেছেন। এ'দের নিজেদের প্রেস ছিল না; পত্রিকাটি ছাপা হত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে, মুদ্রাকর ছিলেন জে. টমাস। এর ছাপা সুন্দর, হরফ অন্যান্য পত্রিকা থেকে স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি রচনার শুরু অলঙ্কৃত হরফ দিয়ে। কিছু ব্লক কাঠের তৈরি, কিছু বিদেশাগত ধাতব। মুদ্রণ ও প্রকাশনের দিক থেকে এই সচিত্র মাসিকটি অদ্যাবধি অনন্য মহিমায় বিরাজমান। ধর্ম বা সমাজগত কোনো সমকালীন প্রশ্ন এখানে মাথা তোলেনি। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে এখানেই প্রথম আলোচনা শুরু হয়। হোমার, কালিদাস, ওমর খৈয়াম সবাই একসূত্রে বাঁধা পড়েন এবং 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা' অংশে এই প্রথম পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় রীতির সমালোচনা চোখে পড়ে। আরো বলা যায় তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার প্রথম বীজও এই পত্রিকার মাটিতে বপন করা হয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ বিল পাশ হয় ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বিধবা বিবাহ করেন। বিদ্যাসাগর রচিত 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব' ও 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিধবা বিবাহের কথাটি প্রথম তুলেছিলেন ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ, তাঁদের পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় (১৮৪২)। পরবর্তী কালে 'সম্বাদ ভাস্কর'ও বিধবা বিবাহ বিল সমর্থন করে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে লর্ড ডালহৌসির আমলে ডাক চলাচলের সুব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় ও রেলওয়ের প্রচলন হওয়ায় অনেক বাধা দূর হল, শহর ও মফস্বলের বিচ্ছেদ কমল এবং যাকে এখন 'মোবিলিটি' বলে তার পত্তন ঘটল। সাময়িকপত্রের চলাচলের দিক থেকে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৮৫৭-র পর বাংলা সাময়িকপত্রের জাতীয়তাবাদী মনোভাব স্পষ্টতর হয়—'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উচ্চার্য। বিদ্যাসাগরের সহায়তাপুষ্ট সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কলকাতার ১ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন (চাঁপা-তলা) থেকে 'সোমপ্রকাশ যন্ত্রে' ছেপে প্রকাশ করেন। 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) ভারতে ব্রিটিশ

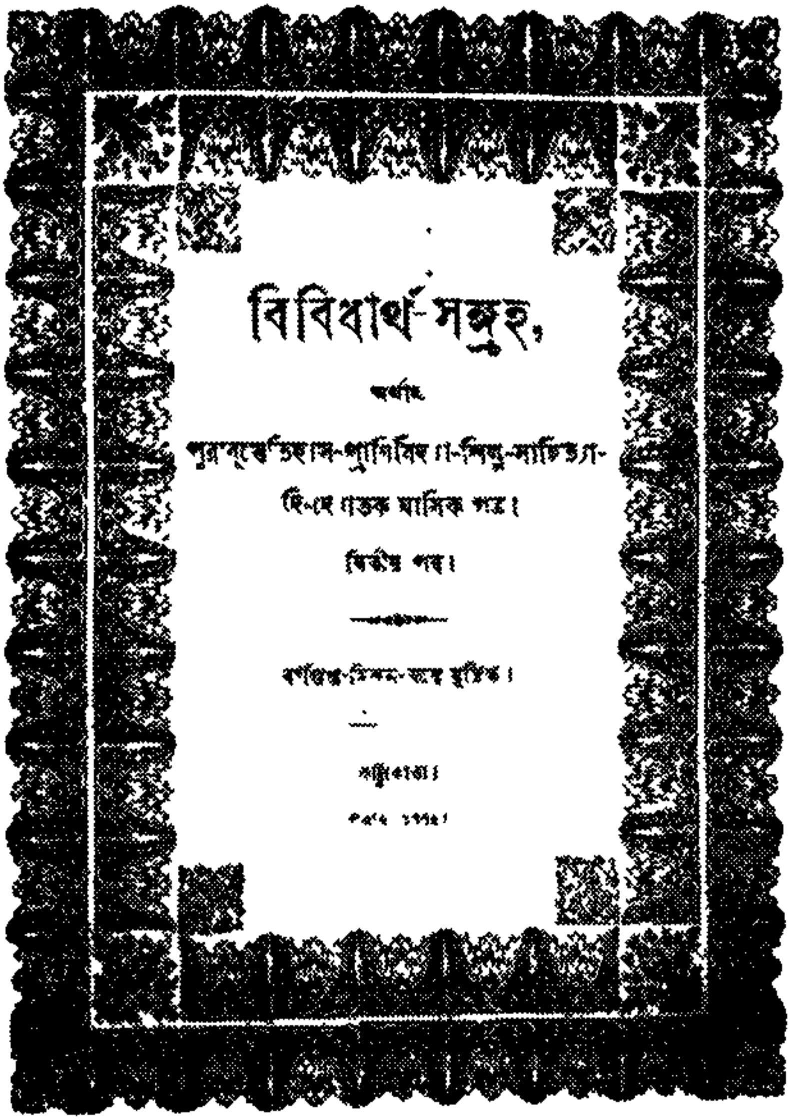
বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-

দিদ্যোতক মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় পর্ব।

কলিকাতা।

শাসনের ও বিচার পদ্ধতির সমালোচনা করত। জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনও (১৮৫১) তার সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পায়নি, কেননা 'সোমপ্রকাশ' রায়তদের স্বার্থ দেখত ও তাদের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করত। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে উদ্‌বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার যে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'[৬] জারি করেন 'সোমপ্রকাশ' তার জোরালো বিরোধিতা করেছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং সমাজে বেগ সঞ্চার করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষা-স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, বাল্যবিবাহ-পণপ্রথার বিরোধী এবং মদ্যপান ও বিভিন্ন নীতি দুষ্ট কর্ম উৎসাদনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই রিফর্‌মিস্‌ট বা সংস্কার-আন্দোলন চালাতে গেলে যুগপৎ সাময়িকপত্র ও মুদ্রাযন্ত্র উভয়ই প্রয়োজন। 'বামাবোধিনী' ও 'অবলাবান্ধব' পত্রিকাদুটি ছিল স্ত্রী-শিক্ষা ও মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকামী। মজিলপুরের তরুণ ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত মাসিক পত্র 'বামাবোধিনী' 'কলিকাতা মুজাপুরে স্ট্রীট হলওয়েল্‌স্ লেন 'মথুরানাথ তর্করত্নের প্রাকৃত যন্ত্রে' প্রথম মুদ্রিত হয়।[৭] 'পত্রিকাখানি রয়্যাল এক ফরমা, মূল্য এক আনা মাত্র ছিল। সহস্র খণ্ড প্রথম মুদ্রিত হয়'। বর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হয় 'বহুবাজার স্টান্‌হোপ যন্ত্রে'। এর পর ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা এই পত্রিকার ভার

গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব এই পত্রিকার প্রচারে আনুকূল্য করেন। 'বামাবোধিনী' পরে 'ইন্ট ইন্ডিয়া প্রেসে' ছাপা হয়েছে। অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল পত্রিকাটি চলেছিল।

এক পয়সায় সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন কেশবচন্দ্র সেন (১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭, ১৮৭০), বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এটি একটি অভিনব ঘটনা। এই পত্রিকা জমিদার ও সরকারের রায়তদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও লিখত, সেক্ষেত্রে 'সোমপ্রকাশের' সঙ্গে তার মিল। বহু অংশ লেখা হত চলিত গদ্যে:

"দরিদ্রদের প্রতি গবর্নমেণ্টের তত তত অনুরাগ নাই। প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেহ চেয়ে দেখে না। কিন্তু তাহাদের গায়ের রক্ত লইয়া সকলে বড়মানুষী করেন।"

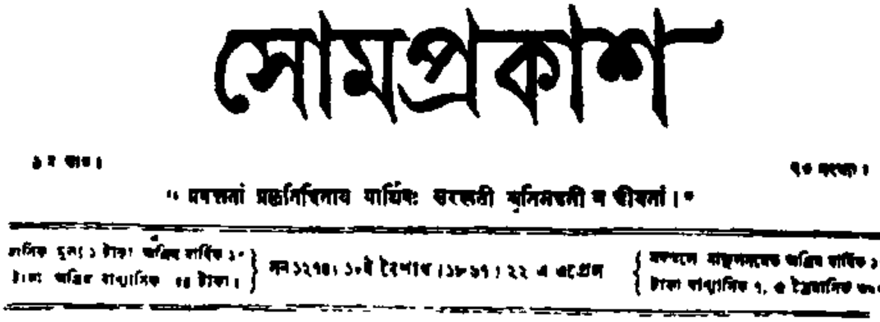
সোমপ্রকাশ

সন ১২৭৮। ১০ই বৈশাখ। ১৮৭১। ২২ এ এপ্রেল

'সুলভ সমাচারে'র গ্রাহক সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বরাহনগরের শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার (১৮৭৪) নামও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মসমাজ বাঙালী সমাজের নানা দোষ-ত্রুটি সংশোধনের প্রশংসনীয় চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ছিল মতাদর্শগত বিরোধ। কেশবচন্দ্র সেনের খ্রীষ্টপ্রীতি, পাপতত্ত্ব প্রভৃতি দেবেন্দ্র নাথ পছন্দ করেননি। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মনোভাব ও সর্বেসর্বা রূপ কেশব ও তাঁর অনুরাগী তরুণ ব্রাহ্মেরা মানতে চাননি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র-বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি নব্যপন্থীরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কেশবের 'রাজভক্তি', অবতার-বাদ ও কোচবিহারের নাবালক রাজার সঙ্গে নিজের বালিকা কন্যার বিবাহদানের প্রতিবাদে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখেরা।[৮] ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র গঠন করলেন নববিধান সমাজ। 'তত্ত্বকৌমুদী' (১৮৭৮) হয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র, তার সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। এর পূর্বে স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ-বাহক শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সমদর্শী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পর্যায়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা হয়েছিল 'সঞ্জীবনী' (১৮৮৩)। কৃষ্ণকুমার মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বিভিন্ন পত্রিকা চললেও এদের কোনটিকেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রিকা বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সেই অভাব দূর করেছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র পরিকল্পনা বহরমপুরে। বঙ্কিমচন্দ্র, রামদাস সেন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার (যিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সাধারণী' পত্রিকা বার করেন), চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যো-পাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। এই পত্রিকায় ধারাবাহিক বার হল প্রথম উচ্চকোটির 'নভেল' বা উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। বঙ্কিমচন্দ্র একাই একশো ছিলেন। অবশ্যই স্মরণীয় এই পত্রিকায় 'বন্দেমাতরম্' গীত প্রথম প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গদর্শনে'র মতো জ্যোতিষ্মান্ না হলেও 'জ্ঞানাঙ্কুর', এবং পরে 'প্রতিবিম্ব'র সঙ্গে যুক্ত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' (১৮৮২) বাংলা সাহিত্যের অনেক সাহিত্যিককে মুকুরিত করেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র চন্দ্রশেখর মুখো-পাধ্যায় এখানে মিলিত হয়েছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী থেকে দেখা দিল 'ভারতী'। ঠাকুরবাড়ীর মুখ চিরদিনই ভারতমুখী। 'হিন্দুমেলা'র গানগুলি সবই প্রায় ভারত-আখ্যাত। 'ভারতী' পত্রিকার অবশ্য নিজেদের প্রেস ছিল না, 'মুজাপুরে' 'কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে লালচাঁদ বিশ্বাস এন্ড কোং' কর্তৃক মুদ্রিত হত। 'ভারতী' নানা পর্বে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জুড়ে চলেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী,

রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারীর কন্যাদ্বয় হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদকতা করেন। প্রথম দিকে ঠাকুরবাড়ীর লেখকেরা এবং তাঁদের সুহৃদেরা 'ভারতী'তে লিখতেন। আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতির বহু রচনা এই 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় দেখা দিয়েছে। প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিরূপ সমালোচনা।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্র শাসন আইন প্রবর্তিত হবার আগে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি যশোর জেলার কপোতাক্ষ তীরের একটি গ্রাম থেকে মাত্র ৩২্ টাকায় ক্রীত একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে (অমৃতপ্রবাহিনী যন্ত্র) ছাপা হয়ে হেমন্ত, শিশির ও মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তার নাম 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৬৯ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি অবধি এটি পুরোপুরি বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। তার পর থেকে কয়েকটি স্তম্ভ ইংরেজীতে লেখা হত। পরে পত্রিকাটি কলকাতায় চলে আসে বউবাজারে ৫২ হিদারাম ব্যানার্জি লেনে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ অবধি পত্রিকাটি দ্বি-ভাষিক ছিল। কিন্তু 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' এড়াবার জন্য ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ তারিখে 'অমৃতবাজার' পুরোপুরি ইংরেজী ভাষার সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।* তখন অবশ্য আর কাঠের প্রেস নেই। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস ও পত্রিকা উঠে আসে বাগবাজারে এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইংরেজী দৈনিকের সাজে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দেখা দেয়। তখন কলকাতায় বিদ্যুৎ এসে গেছে। তার আগে ছিল শুধুই গ্যাসের ব্যবহার। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটল এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা লাইনো যন্ত্র নিয়ে এল। কিন্তু রোটারি যন্ত্র তখনো আসেনি।

তখন বাংলা দৈনিক পত্র ছিল না কেন? আসলে আমাদের 'আবেদন-নিবেদনে'র রাজনীতি বা সমাজ সংস্কার ছিল মূলত সমাজের ধনী, বিলাত ফেরত, ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের জন্য। শিক্ষাও ছিল তাঁদেরই ছোট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা, জনশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। সেজন্য 'বেঙ্গলী', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', সবই ইংরেজীতে। রাজরোষে ভীত না হয়ে বাংলা দৈনিক গড়বার পরিকল্পনা থাকলে, অর্থাৎ রাজনীতিকে জনমুখী করবার সংকল্পে দৃঢ় থাকলে বাংলা দৈনিকের প্রচলন ও প্রসার বিলম্বিত হত না এবং তার অনিবার্য প্রয়োজনে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও প্রগতি দেখা দিত।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ, প্রথম পাবলিক থিয়েটার, সিভিল ম্যারেজ বিল প্রভৃতির জন্য বাঙালীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। এই সময় থেকে হিন্দুধর্মকে নতুন করে জোরদার করবার জন্য প্রবল আন্দোলন চলে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু একদিকে যেমন হিন্দুধর্মকে নতুন করে উদারভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন, পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তেমনি অন্যদিকে সাধারণ লোকের কাছে হিন্দুধর্ম ও সমাজের মহিমা তাঁদের মতো করে ব্যাখ্যা করছিলেন। বিচারপতি উড্‌রফ-শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রব্যাখ্যা, অল্‌কট্‌-ব্লাভাটস্‌কির থিয়সফিতত্ত্ব প্রচার ও নব্যহিন্দু-আন্দোলনকে শক্তি যুগিয়েছিল।

এই পর্বের পত্রিকা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর তারিখে বার হয়। এর উদ্দেশ্য সাধু ছিল সন্দেহ নেই:

"বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার। রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদপত্র।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী, হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মুখপাত্র ছিল। ১৮৯১ সালে 'সহবাস সম্মতি বিল'-এর বিপক্ষে সবচেয়ে প্রবলবেগে লড়েছিল ও রাজরোষ কাঁধে নিয়েছিল 'বঙ্গবাসী'। মনে রাখা দরকার, পন্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। যাঁদের সাধারণতঃ 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদী' বলা হয় সেই ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সবাই সমবেত হয়েছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে সহায়তা দানের জন্য। আরো মনে রাখতে হয় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের কেউ 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হতে পারেননি। অব্রাহ্মণ বলে ঐতিহাসিক, বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখক বিহারিলাল সরকার শেষ পর্যন্ত সহ-সম্পাদকই থেকে গেলেন। 'বঙ্গবাসী'র পরিচালক যোগেন্দ্রচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'সাধারণী' (১৮৭৩) সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথমে কাজ শেখেন। 'বঙ্গবাসী'র অন্যতম সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'সাধারণী'তে সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ নেন। উপেন্দ্রনাথ সিংহরায় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় 'বঙ্গবাসী' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বাংলা সাপ্তাহিক রূপে দেখা দেয়। কয়েক বছর পর উপেন্দ্রনাথ নিজেকে সরিয়ে নিলে যোগেন্দ্রচন্দ্র গ্রাহকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তিনি বাংলা 'দৈনিক', ইংরেজী সান্ধ্য 'টেলিগ্রাফ', হিন্দী 'বঙ্গবাসী' (১৮৯০) পত্রিকাও বার করেছিলেন। পত্রিকা-প্রকাশনের ক্ষেত্রে 'বঙ্গবাসী' নিঃসন্দেহে একটি নতুন

যুগের সৃষ্টি করেছিল। 'বঙ্গবাসী'র আকার ছিল বৃহৎ (২০"×৩০")। 'বঙ্গবাসী' গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগও খুলেছিল, সেখান থেকে প্রাচীন শাস্ত্রাদি বাংলা হরফে অল্প দামে বাঙালী পাঠকের পাঠোপযোগী করে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণ ও পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন শাস্ত্রগ্রন্থাদি সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। 'বঙ্গবাসী' পরিচালিত বেশ ভাল মাসিক পত্রিকা ছিল 'জন্মভূমি' (১৮৯০)। প্রথমে 'বঙ্গবাসী'র ছিল 'স্টীম মেসিন প্রেস'—তখনো বিদ্যুৎ-চালিত প্রেস ছিল না।

চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত যে 'সাধারণী' সাপ্তাহিকে (১৮৭৩) যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ শিখেছিলেন, তৎকালে সেই কাগজ খুব প্রভাবশালী ছিল।[১০] অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নব্যহিন্দুত্ব আন্দোলনে যোগ দিলেও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানেননি, সেদিক থেকে তিনি বঙ্কিম-শিষ্য। অক্ষয়চন্দ্রের পিতা গঙ্গাচরণ 'ধরমচাঁদ কী চানাচুর' নামে উপভোগ্য রঙ্গব্যঙ্গ লিখতেন। 'সাধারণী'র সামাজিক ও রাজনৈতিক মন্তব্যের জন্য শিক্ষিত বাঙালী মহল অপেক্ষা করে থাকত।

'বঙ্গবাসী' সমকালীন কংগ্রেসের মতামতের বিরোধী ছিল। আর 'হিতবাদী' ছিল কংগ্রেসের মতবাহক। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর এই কাগজটি বার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারবির 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' শিরোভূষণ করে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' (১৮৯১) দেখা দিল।[১১] প্রথম সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, তখন তিনি রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যক্ষ। 'হিতবাদী প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং কোম্পানী' ২৫ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে গঠিত হয়, প্রতি শেয়ারের মূল্য ধার্য হয় দশ টাকা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, জানকীনাথ ঘোষাল ও নবীনচন্দ্র বড়াল ডিরেক্টর হন। নবীনচন্দ্র বড়াল হন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শেয়ার

'এতদিনে হিন্দুমেয়ের পর্দা হোল ফাঁক': 'বসন্তক'

হোল্ডার ছিলেন। পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত এক পত্রে (১৩১৭, ২৮ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন:

"সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

হিতবাদী থেকে সুলভ মূল্যে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশন সংস্থা থেকে

বহু ভাল বই বার হয়েছিল।

মুদ্রণ ও প্রকাশনের দিক থেকে সেকালের অনন্য মাসিক পত্রিকা ছিল 'বসন্তক' (জানুয়ারি ১৮৭৪)। এই রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক সচিত্র পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কলকাতার হাটখোলার দত্ত-বাড়ির প্রাণনাথ দত্ত (১৮৪০-৮৮),[১২] কার্টুন আঁকতেন তিনি ও গিরীন্দ্রকুমার দত্ত। ডাকমাশুলে সমেত বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা তিন টাকা ছয় আনা, 'নগরের অগ্রিম মূল্য ৩্ টাকা, প্রতি খণ্ড মূল্য ||০ আনা'; 'এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি' পাঠাবার ঠিকানা ছিল 'চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬নং ভবন'; পত্রিকাটি মুদ্রিত হত গরাণহাটা ৩৩৬ সুচারু যন্ত্রে, 'বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি |০ আনা'। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ ভাস্কর' প্রভৃতির মতো 'বসন্তক' শিরে একটি সংস্কৃত শ্লোক বহন করত:

নব পরিণয়যোগাৎ স্মীষদ্ধাস্যাভিষুক্তং
মদবিলসিত নেত্রং চারুচন্দ্রার্ধমৌলিং
বিগলিত ফণিবন্ধং মুক্তবেশম্ শিবেশং
প্রণমতি দিনহীনঃ কালকূটাভ কণ্ঠং॥

'অশ্লীলতা নিবারণী সভার একজন সভ্যের বাটির কালী': 'বসন্তক'

'প্লানচেট' যন্ত্রকে শিখণ্ডী করে 'বসন্তক' তখনকার বাঙালী রাজনৈতিক নেতাদের, রাজ-পুরুষদের (অ্যাশলি ইডেন, রিচার্ড টেম্পল, স্টুয়ার্ট হগ প্রভৃতি) নিয়ে রঙ্গকৌতুক করত, 'প্লানচেটে'র আসল উদ্দেশ্য তার মতে 'প্ল্যান টু চীট'। 'মানভঞ্জন', 'হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী', 'নিরেট গাধা' প্রভৃতি কার্টুন খুবই উপভোগ্য। তখনকার দিনের প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কেও কৌতুককর কটাক্ষ আছে। 'প্লানচেটে' বাল্মীকির পর কৃত্তিবাস-কাশীদাস এলেন, বললেন:

"আমাদের সকল দোষ নহে, যা দেখ তাহা আমাদের হাত-পা ভাঙ্গা কথাকার মাত্র। কতকগুলো উপাধিধারী প্রকাশকেই আমাদের এ দশা করেছে—যদিও কাঁপিতলার আক্রমণে হাড়গোড় রক্ষা পেয়েছিল, বটতলার কুষ্মাণ্ডগুলো তাও শেষ করেছে।..."

'বসন্তকে' সমকালীন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের গান ও প্যারডি ছাপা হত।

যতগুলি পত্র-পত্রিকার আলোচনা করা হল, এগুলি সবই হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ ও শিক্ষিত গোষ্ঠীর দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত। এটাই ছিল স্বাভাবিক। বাঙালী মুসলমান সমাজে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর বিকাশ বহু বিলম্বিত হওয়ায় সে সমাজে সাময়িক বা সংবাদ-

পত্র প্রকাশ সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতকের শেষ পাদে যে মুসলিম সাময়িকপত্রাদি দেখা দিয়েছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ ইস্‌লামের মহিমা কীর্তন বা ইস্‌লামের অতীত ইতিহাস-প্রচার। সেজন্য ১৮৭৭ থেকে ১৯৩০ অবধি প্রকাশিত মুসলিম পত্রিকাগুলির অধিকাংশের নাম 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' যুক্ত এবং তুরস্ক, আরব, পারস্য (ইরাণ) প্রভৃতির দিকে তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত গোষ্ঠী বাংলা ভাষার চর্চা উনবিংশ শতকে বিশেষ করেননি। মীর মশাররফ হোসেন ব্যতিক্রম মাত্র। মধুসূদন দত্তের বন্ধু আবদুল লতিফ (পরে নবাব) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যে মহামেডান লিটারারি সোসাইটি স্থাপন করেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয়, সাহিত্যিক নয়।

উনবিংশ শতকের সূচনাকাল থেকে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র, প্রকাশনা, সাময়িকপত্র প্রচলন সবই প্রথম গড়ে ওঠে শ্রীরামপুরে-হুগলিতে। তখন থেকে বিংশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল অবধি মফঃস্বল শহরের শিক্ষা ও সমাজগত প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে সারা দেশের রক্ত কলকাতার মুখে এসে উঠতে লাগল। ইংলণ্ডেও আঠারো শতকের গোড়ায় মফঃস্বলী সাপ্তাহিক বা অর্ধ-সাপ্তাহিকের খুব চলন দেখা গিয়েছিল। 'নরউইচ পোস্ট' (১৭০১-১২), 'ব্রিস্টল পোস্টবয়' (১৭০২-১২), 'রচেস্টার পোস্টম্যান' (১৭০৯) প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত। এখানেও যেহেতু উনবিংশ শতকের কলকাতা শহর ছিল ছোট এবং মফঃস্বল ছিল ভদ্র শিক্ষিত প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত চালিত সেজন্য মফঃস্বলে স্থান পেয়েছিল অসংখ্য ছোট-খাটো মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িকপত্র। তারই সাক্ষ্য বহন করছে, কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩), 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' (১৮৪০), 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' (১৮৪৭), 'বর্ধমান চন্দ্রোদয়' (১৮৪৯), 'মজিলপুর পত্রিকা' (১৮৫৬), 'উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা' (১৮৫৬), 'রাজপুর পত্রিকা' (১৮৬০), 'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১), 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (১৮৬৮), 'কুশদহ পাক্ষিক' (১৮৭৭), 'রাজসাহী সমাচার' (১৮৭৫) প্রভৃতি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকাগুলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা অবধি বহু মফঃস্বল পত্রিকা চলত কিন্তু যুদ্ধের দরুণ কাগজের কড়া নিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রাপ্যতা ও বৃহৎ পত্রিকাগুলির প্রতিযোগিতায় তারা হতজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মতো নিভে গেল।

বর্তমান শতকের প্রথমে কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক সাহিত্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় অর্ধ-শতবর্ষ অতীত হওয়ায় এই পর্ব হিন্দু সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্প, রাজনীতি প্রভৃতি চর্চার উজ্জ্বল অধ্যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বার হয় 'প্রদীপ', উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে ছাপা সচিত্র মাসিকপত্র। এ ধরনের প্রকাশন বাংলা সাময়িক সাহিত্যে এর পূর্বে বিশেষ ছিল না। ২১/১ সুকিয়া স্ট্রীটে ছিল 'প্রদীপ' কার্যালয়। বার্ষিক ২ টাকা মূল্যের এই পত্রিকাটি 'শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত' হত। বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্রের ব্লক 'প্রদীপ' কাগজেই প্রথম স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম মেলে লেখকের তালিকায়। কিন্তু 'প্রদীপ' সহসা নিভে গেল।

'প্রদীপ' বন্ধ হওয়ার বছর কয়েক পরে এলাহাবাদ-প্রবাসী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বার করলেন 'প্রবাসী', বহির্বঙ্গ হতে প্রকাশিত প্রথম উচ্চাঙ্গের বাংলা সাময়িকপত্র। ১৩০৮ সালের (১৯০১) বৈশাখ মাসে এলাহাবাদের ২/১ সাউথ রোডের ঠিকানা থেকে বিজ্ঞাপনসহ সুচিত্রিত প্রচ্ছদ নিয়ে রুচিমান পাঠকের হাতে পৌঁছল 'প্রবাসী'। প্রথম চার সংখ্যা ছাপা হয়েছিল কলকাতায়, ভাদ্র ও পরবর্তী ৮টি সংখ্যা এলাহাবাদে চিন্তামণি ঘোষের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হয়। অতি সুন্দর মুদ্রণ, কিন্তু ১৩০৯ সালে 'প্রবাসী' যখন দ্বিতীয় বর্ষে পা দিয়েছে, তখন ইণ্ডিয়ান প্রেসে বাংলা জানা কম্পোজিটর পাওয়া গেল না। কাজেই 'প্রবাসী' ছাপা হতে লাগল কলকাতার 'কুন্তলীন প্রেসে'[১০]। ১৩১৫ সালে (১৯০৮) পাকাপাকি ভাবে এলাহাবাদের পাট তুলে, রামানন্দ কলকাতায় নিয়ে এলেন 'প্রবাসী'কে, ক্রমে গড়ে উঠল প্রেস ও প্রকাশন। 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যায় প্রথম কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী'—'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে তাই সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'। (এ কাজ রবীন্দ্রনাথকে সবুজপত্র, বিচিত্রা, ধূমকেতু, জয়শ্রী প্রভৃতি পত্রিকার জন্যও করতে হয়েছে।) 'প্রবাসী' তখনকার দিনে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকা, সম্পাদকের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' তার নির্ভীক, দায়িত্বশীল সমালোচনার জন্য যেমন ভয় ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিল, তেমনি ছিল তার অনবদ্য চিত্রসম্পদ্। যত্নসহকারে প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি ছাপা হত। লেখক ও শিল্পীরা সম্মানমূল্য পেতেন। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের আঁকা চিত্রাবলী ভারতীয় চিত্রকলায় নবজীবন দান করেছিল। কিন্তু তার পরিচ্ছন্ন সুন্দর মুদ্রণ ও পরিবেশনে 'প্রবাসী'র কৃতিত্ব খুব বেশী। রামানন্দ সম্পাদিত সচিত্র 'রামায়ণ-মহাভারত' অথবা কন্যাদ্বয় সীতা দেবী ও শান্তা দেবী রচিত জনপ্রিয় বইগুলি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'প্রবাসী' প্রেস (৯১ আপার সারকুলার রোড, বর্তমান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রোড) থেকেই বেরিয়েছিল।

প্রচুর বিজ্ঞাপন পেত 'প্রবাসী'। সম্পাদক ও তাঁর সহকর্মীরা খুব যত্ন নিয়ে ছাপার কাজ দেখাশোনা করতেন। ছাপার ভুল (যা এখন হরদম নানা পত্র পত্রিকায় থাকে) 'প্রবাসী'তে দেখা যেত না। রামানন্দ শুধু বৃত্তি হিসাবে সাময়িকপত্র পরিচালনাকে গ্রহণ করেননি, এও তাঁর দেশসেবা। একদা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করলেও, তিনি সাধারণ মুদ্রণ, বহুবর্ণ ছবির ব্লক, লাইন-ব্লক মুদ্রণ, টাইপ-বিন্যাস সবদিকেই সং ব্যবসায়ীসুলভ সযত্ন দৃষ্টি রেখেছেন। 'প্রবাসী' পত্রিকা ও প্রেস উচ্চমানের মুদ্রণ ও প্রকাশনের দিক থেকে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে।

খ্যাতি-অখ্যাতি দুই-ই কুড়িয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১৮৯০); পত্রিকাটি ১৩৩০ (১৯২৩) অবধি চলেছিল। এর পূর্বে কোন পত্রিকা এত দীর্ঘকাল ধরে চলেনি। প্রথমে এই পত্রিকার সংগে যুক্ত ছিলেন 'বসুমতী'র কর্ণধার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১২৯৬ সালের (১৮৮৯) শ্রাবণ মাসে ৩নং বিডন স্কোয়ার থেকে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নিজের প্রেসে ছেপে বার করতেন। এই সাহিত্যকল্পদ্রুম'ই পরের বছর শুধু 'সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয় এবং ১২৯৭ সালের (১৮৯০) শেষভাগে উপেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' ত্যাগ করেন। 'সাহিত্য' তার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে লিখেছিল:

"জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর আমরা তাহারই আলোচনা করিব।"

'জাতীয় সাহিত্য' এবং 'সত্য ও সুন্দর' পদাংশদ্বয়ের ব্যবহারে পত্রিকাটির উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। 'সাহিত্য' পত্রিকার প্রকাশনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক, লেখক-লেখিকাদের হাফটোন ছবি ছাপা। ১৩০৭ সালের (১৯০০) বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাপা হয়েছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রথম কলকাতায় হাফটোন ছবির প্রবর্তন করেন। বাংলার মুদ্রণ জগতে এটি অবশ্যই একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ। গোড়ার দিকে 'সাহিত্য' পত্রিকার একটি 'বিশেষ' সংস্করণ বার হত। সুরেশচন্দ্র এ সম্পর্কে জানিয়েছেন:

"সেকালের 'সাহিত্যে'র একটি জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। . .একশত ছাপা হইত। একজন 'গ্রাহক' হইয়াছিলেন। তিনি...জমিদার টাঙ্গাইলের কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। অবশিষ্ট নিরানব্বইখানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম।"

এ ধরনের 'রাজসংস্করণ' প্রকাশ করায় 'সাহিত্য' পত্রিকা সম্পাদনা ও মুদ্রণ-শিল্প উভয় দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে আছে। আরো কয়েকটি কারণে 'সাহিত্য' আমাদের মনে দাগ কাটে। এখানেই প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী গল্পের অনুবাদ প্রথম বার হয়। ১২৯৮ সালের (১৮৯১) আশ্বিন সংখ্যায় প্রস্পের মেরিমির গল্পের অনুবাদ 'ফুলদানী' নামে ছাপা হয়েছিল। চিত্রকলা প্রসঙ্গে নিয়মিত আলোচনাও ছাপা হত। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় উভয়বিধ চিত্রকলার আলোচনামূলক প্রবন্ধই বার হত, ছবিও ছাপা হত। সেজন্য 'চিত্রশালা' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এর পূর্বে আর কোনো পত্রিকায় এ ধরনের প্রচেষ্টা নজরে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের লেখার বক্রসমালোচনা 'সাহিত্য' করেছে বটে, কিন্তু এই পত্রিকাতেই রবীন্দ্র-অনুরাগী দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' রচনা 'সাহিত্যে'র গোড়ার দিকে দেখা দিয়েছিল (১২৯৮, অগ্রহায়ণ)। বাঙালী পাঠকসমাজ 'সাহিত্য' পত্রিকার গুণগ্রাহী ছিল।

'সাহিত্যকল্পদ্রুমে' ও 'সাহিত্য' প্রসঙ্গে 'বসুমতী'র পরিচালক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি 'বটতলা'র এক বইয়ের দোকানে পাঁচ টাকা মাস-মাইনের কর্মচারী ছিলেন। মালিক দোকানটি বিক্রি করবেন, একথা জানতে পেরে উপেন্দ্রনাথ সামান্য টাকা দিয়ে সেটি কিনে নেন। নানা স্থান থেকে সংগৃহীত নতুন-পুরনো বই জমিয়ে বিক্রি করে যখন কিছু পয়সা হল, তখন ছেপে বার করলেন 'রাজভাষা'। শহরে-গ্রামে-গঞ্জে বইটি খুব বিক্রি হতে লাগল। এই সাফল্যে উৎসাহিত উপেন্দ্রনাথ নিজে একটি ছাপাখানা খুললেন বিডন স্ট্রীটে। একাধারে মুদ্রক, প্রকাশক ও বিক্রেতা। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিডন স্ট্রীট থেকে গ্রে স্ট্রীটে, শেষে স্থায়ীভাবে ১৬৬ বউবাজার স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়ীতে উঠে গেলেন। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধির জোরে উপেন্দ্রনাথ উপরে উঠেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ অগাস্ট প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'। 'দৈনিক বসুমতী' বার হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে এটি সান্ধ্যদৈনিক, কিছুকাল পরে প্রভাতীদৈনিকে এর রূপান্তর ঘটে। 'বৈদ্যুতিক রোটারি যন্ত্র' বাংলা কাগজের মধ্যে 'বসুমতী'ই প্রথম বিলেত থেকে (প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার ঠিক আগে) আনায়। বাংলা মুদ্রণের দিক থেকে এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক 'বসুমতী' প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার দিক থেকে বাঙালী পাঠকসমাজ কোনোদিনই 'বসুমতী'কে ভুলতে পারবে না। এক-

দিকে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত নানা শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশ (অনুবাদসহ) ও অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিকপাল সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী স্বল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করে 'বসুমতী' প্রকাশন ও বিপননক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে।

'প্রবাসী' ও 'বসুমতী'র সূত্রে 'ভারতবর্ষে'র উল্লেখ অপরিহার্য। একদা কলকাতার 'মেস-বয়' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বইয়ের ব্যবসা করে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বিরাট বাড়ী করেন। এই বাড়ী থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২০, আষাঢ়) বার হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরিকল্পিত সচিত্র মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ'। সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন জলধর সেন ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ২০০/১/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের প্যারাগন প্রেসে 'ভারতবর্ষ' ছাপা হত, ব্লক তৈরী করতেন জি. এন. মুখার্জি, মহিলা প্রেস। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' সঙ্গীতটি স্বরলিপি-সহ প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই 'ভারতবর্ষ'ই কেরানী শরৎচন্দ্রকে প্রথম মাসিক-বৃত্তি দিয়ে বর্মা থেকে টেনে নিয়ে এসে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রে দাঁড় করিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ ও একান্ত নবীন লেখকদের বই প্রকাশ করে ও তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স প্রকাশনা ও সাহিত্যপত্র পরিচালনায় দীর্ঘকাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২১, শ্রাবণ) প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' বার হয় এবং তারই প্রতিপক্ষ হিসাবে রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠীর সাহিত্যপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল চিত্তরঞ্জন দাশ পরিচালিত 'নারায়ণ' পত্রিকা।[১৪] আলিপুর বোমার মামলা চলার সময় অরবিন্দ ঘোষ চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন যে, তাঁর 'নারায়ণ'-দর্শন হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই দুইয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 'নারায়ণে'র উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ কিছু বলা হয়নি, তবে শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন:

"তিনি [চিত্তরঞ্জন] শিষ্য, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার গুরু। তিনি গুরুকে দিয়া একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখাইলেন—"নূতনে পুরাতনে"। সেই পুরাণ কথা, সেই 'হিন্দু রিভাইভ্যাল' সেই হিন্দুধর্মের নবজীবন।"

দামী মোটা কাগজে 'নারায়ণ' ছাপা হত। পত্রিকার দেখাশোনার জন্য বিপিনচন্দ্র পাল মাসে দেড়শ' টাকা পেতেন। 'নারায়ণে'র প্রচার বাড়াবার জন্য গ্রাহকদের লোভনীয় উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল পঞ্চম বর্ষ থেকে। 'নারায়ণ' প্রথমে ছাপা হত সাথী প্রেসে, পরে কিছুদিন বসুমতী প্রেসে ছাপা হবার পর মানসী প্রেসেই শেষ পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর যে সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হত, 'নারায়ণে'র গ্রাহকরা পছন্দমত তার এক খণ্ড উপহার পেতেন। পত্রিকাটি ৭৫০ কপি ছাপা হত, শেষ দিকে ১১২৫ কপি। অষ্টম বর্ষের (১৯২২) পর 'নারায়ণ' আর সাহিত্যক্ষেত্রে আলো ফেলতে পারেনি। 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রতিবাদে বিপিনচন্দ্র 'মৃণালের পত্র' লেখেন প্রথম সংখ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তাঁর কন্যা সরযূবালা দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক তালিকায় থাকলেও বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রভৃতিই ছিলেন 'নারায়ণে'র নিজস্ব লেখক। এই পত্রিকার 'বঙ্কিম সংখ্যা' (১৩২২) অতুলনীয়। এর পূর্বে কোনো পত্রিকায় এ ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এই সংখ্যাতেই বঙ্কিমের 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী'র পাণ্ডুলিপি ব্লক করে ছাপা হয়। ১৯২২-এ চিত্তরঞ্জন গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে পুরোপুরি যোগ দিলেন, সাহিত্যসেবা থেকে গেলেন রাজনীতিতে, চিত্ত-রঞ্জন থেকে হলেন 'দেশবন্ধু'—তাই 'নারায়ণ' আর বাঁচল না।

'সবুজপত্র' বার করেন প্রমথ চৌধুরী। চিত্তরঞ্জন ও প্রমথ চৌধুরী ঠিক একই সময়ে ব্যারিস্টার হিসাবে যোগ দেন। চিত্তরঞ্জন নাম করলেন ব্যারিস্টাররূপে, প্রমথ চৌধুরী সেক্ষেত্রে ব্যর্থ। চিত্ত-রঞ্জন ব্যারিস্টারি ও সাহিত্যসাধনা ছেড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলেন। আর প্রমথ চৌধুরী তাঁর হবিঃ নিবেদন করলেন সাহিত্যকে। তাঁর 'সবুজপত্র' ১৩২১ (১৯১৪) থেকে ১৩৩৪ (১৯২৭) অবধি হতভাগ্য ১৩ বছর চলেছিল। 'সবুজপত্র' বিজ্ঞাপনবর্জিত, তার মলাটের রং সবুজ। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে এর জন্ম এবং তখনকার নগরবাসী বুদ্ধিজীবীদের প্রধান জমায়েতস্থল। 'ভারতবর্ষ' আর 'সবুজপত্র' এক বছরের ছোটবড় হলেও মেজাজে একেবারেই আলাদা। 'ভারতবর্ষ' সকল শ্রেণীর বাঙালীর উপযোগী, 'সবুজপত্র' বাছাইকরা বাঙালীর। রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' নিয়ে 'সবুজপত্র' যাত্রা শুরু করেছিল। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' এখানেই বেরিয়েছিল। যাকে 'চলতি' গদ্যরীতি বলা হয় তার পিছনে সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরীর দান অনেকখানি। চৌকো ধরনের দামী পুরু কাগজে ছাপা এই মাসিক পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদা ছিল দু'টাকা ছ'আনা, প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা। প্রথমে ছাপা হত ২০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের (বর্তমান বিধান সরণি) কান্তিক প্রেসে। মাসিক পত্র প্রকাশের সাধারণ নিয়ম তিনি

মানতেন না, সেজন্য কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ওমর খৈয়মের 'রুবাই' সবটাই এক সংখ্যায় ছেপে-ছিলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'ও ছাপা হয়েছিল একটি সংখ্যার সবটুকু জুড়ে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এস্. ওয়াজেদ আলি, নলিনীকান্ত গুপ্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি লিখেছেন এই কাগজে। মননদীপ্ত সাময়িকপত্র বলতে যা বোঝায়, 'সবুজপত্র' ছিল সেই ধরনের, সেখানেই তার জীবনের ঔজ্জ্বল্য, সেখানেই তার মৃত্যুর মহিমা।

এলাহাবাদ থেকে বার হয় বলে যেমন 'প্রবাসী' নামকরণ, অনুরূপ কারণে উত্তর ভারতে জন্ম বলেই অতুলপ্রসাদ তাঁর সম্পাদিত নতুন কাগজের নাম দেন 'উত্তরা'। ১৩৩২ সালে (১৯২৫) মহালয়ার দিন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র হিসাবে 'উত্তরা'র আত্মপ্রকাশ। সমকালের বাংলা সাময়িকপত্রে নিজের মর্যাদার আসনটি 'উত্তরা' অচিরেই অধিকার করে। ১৯০৮ থেকে 'প্রবাসী' কলকাতাবাসী হয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল বহির্বঙ্গ থেকে প্রকাশিত সাহিত্যপত্রের ক্ষেত্রে, 'উত্তরা' তাকে ভরাট করে। অতুলপ্রসাদ সেন তখন লখনউবাসী। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, নীলরতন ধর সবাই তখন লখনউয়ে। বলা বাহুল্য, এই পত্রিকার প্রাণ ছিলেন অতুলপ্রসাদ। সহযোগী ছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও বারানসীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'প্রবাসী'র উদ্বোধনী কবিতা লিখেছিলেন, তেমনি 'উত্তরা'র জন্যও একটি আশীর্বাদী কবিতা লিখলেন (সেটি প্রথম সংখ্যায় ব্লক করে ছাপা হয়)। ঐ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বীণাপাণির উদ্দেশে লেখেন 'দিন্ বঙ্গ-বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ'—এর দ্ব্যর্থবোধকতা সহজেই লক্ষণীয়। লখনউতে পত্রিকার অফিস থাকলেও 'উত্তরা' প্রকাশিত হত বারানসীর সুরেশ চক্রবর্তীর বাসস্থান 'বি ১০/৪৬ ভেলুপুরা, কাশীধাম' থেকে। পত্রিকাটি প্রথম পর্বে ছাপা হত এলাহাবাদের চিন্তামণি ঘোষের ইণ্ডিয়ান প্রেসের বেনারস ব্রাঞ্চ থেকে। কিছুকাল পরে অতুলপ্রসাদ ও রাধাকমল পত্রিকার কর্মভার সম্পূর্ণরূপে তুলে দেন সুরেশ চক্রবর্তীর হাতে। ১৯৬৪ পর্যন্ত সুরেশচন্দ্রই এর হাল ধরেছিলেন।

প্রবীণ ও নবীনের অবাধ মিলনক্ষেত্র 'উত্তরা', বরঞ্চ নবীনেরাই প্রশ্রয় পেতেন বেশী। রবীন্দ্রনাথ, গোপীনাথ কবিরাজ, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, নীলরতন ধর, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতির রচনার সঙ্গেই স্থান পেয়েছেন জগদীশ গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দীনেশ-রঞ্জন দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রভৃতি 'কল্লোলীয়'দের কবিতা, গল্প, উপন্যাস। মনে রাখা প্রয়োজন জগদীশ গুপ্তের 'অসাধু সিদ্ধার্থ' বা ইয়োয়েন বোয়ারের 'গ্রেট হাঙ্গার' উপন্যাসের অনুবাদ এর পাতায় পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার লেখকরূপে আমরা আরো পাই মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলামকে; পাই রাধারাণী দেবী, নিরুপমা দেবী, অমিয়া চৌধুরী প্রভৃতি লেখিকাদের; পাই গীতিকার অতুলপ্রসাদকে, যাঁর সঙ্গীতগুলির স্বরলিপি প্রকাশ করেন দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবী। বারানসীর মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, পণ্ডিচেরির নলিনীকান্ত গুপ্ত, পূর্ণিয়ার কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গয়ার মাণিক ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালী লেখকেরাও নিয়মিত লিখতেন। অন্য যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে হুমায়ন কবির, শিবরাম চক্রবর্তী, নির্মল-কুমার বসু প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। 'প্রবাসী'র অনুসরণে 'উত্তরা'ও আকর্ষণীয় দু'টি বিভাগ খুলেছিল—'আহরণী' ও 'সঙ্কলন'। 'উত্তরা' শেষ পর্যন্ত আর্থিক সংকটে পড়ে। প্রবাসী বাঙালী-দেরও আর আগেকার মতো ক্ষমতা রইল না, সাহিত্যপ্রীতিও ক্ষীয়মাণ হল। তাই চল্লিশ বছরের যাত্রাশেষে 'উত্তরা' বন্ধ হয়ে গেল।

১৩৩৪-এর (১৯২৭) আষাঢ়ে সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের[১৩] সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'বিচিত্রা'। 'সবুজপত্রে'র দল চলে এল 'বিচিত্রা'য়। এর আবির্ভাব প্রায় রাজসিক। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা' কবিতাটি কবির হস্তাক্ষর ব্লক করে ছাপা হল প্রথম সংখ্যায়, সেই সঙ্গে চারু রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ। বিজ্ঞাপন, ছবি, 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র ব্লক সব মিলিয়ে চমক লাগাবার মতো ২৬ ফর্মার পত্রিকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৬৷৷৹ টাকা। ছাপা হত ১/২ দুর্গা পিতুরী লেনের (বহুবাজার) দি মডার্ণ আর্ট প্রেসে। লেখক-গোষ্ঠীতে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ছাড়াও অতুল গুপ্ত, প্রবোধ বাগচী, অন্নদাশঙ্কর রায় ('পথে প্রবাসে' বার হয় কার্তিক মাস থেকে), শিশিরকুমার মিত্র, হুমায়ন কবির, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, সতীশ ঘটক, অসিত হালদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ('পথের পাঁচালী'), সুকুমার রায় ('চলচিত্ত-চঞ্চরী'), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, রাজশেখর বসু প্রভৃতি ছিলেন। ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('অতসীমামী')। 'বিচিত্রা'য় সকলেই এসে গেলেন—জগদীশ গুপ্ত থেকে

বুদ্ধদেব বসু। শুধু পত্রিকা প্রকাশনে, মুদ্রণে বা পারিপাট্যে নয়, সর্ব গোষ্ঠীর বিচিত্র মেজাজের সাহিত্যিকদের এক মজলিসে বসিয়ে উপেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাময়িকীর ক্ষেত্রে নতুন রুচিমান ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন। 'বিচিত্রা' পটলডাঙ্গা ছেড়ে ফড়িয়াপুকুরে (শ্যামবাজার) গেল। ক্রমে পূর্বগৌরব হারাতে হারাতে যুদ্ধের আকাশে অস্ত গেল।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ—খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ ১৯২৩-এ নেমে যায়। এই বছরেই তরুণ সাহিত্যিকদের কল্লোল ওঠে। তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রের বয়স উনিশ, বুদ্ধদেবের পনেরো। বাঙালী যৌবনের এক দুঃসাহসী খেয়াল 'কল্লোল'কে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরবর্তী কালের যৌবন অনিবার্য বিদ্রোহে এখানে ধূমায়িত হয়েছিল; প্রচলিত যৌন ধারণা বা মূল্যবোধকে অস্বীকার করবার প্রচণ্ড ঝোঁক ফেটে পড়ছিল। লরেন্স, হামসুন, বোয়ার, গোর্কির প্রভাব 'কল্লোলে' ছিল। নঙর্থক বিদ্রোহ হলেও তাতে তার নিজের জোর ছিল। প্রায় সাত বছর মাত্র চলেছিল 'কল্লোল'। কিন্তু তার কোলাহল শ্রুত হয়েছিল বহুদিন ধরে।

গোকুল নাগ ও দীনেশরঞ্জন দাশ 'কল্লোলে'র সূচনা করেন। 'শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ কর্তৃক ১০/২ পটুয়াটোলা লেন হইতে প্রকাশিত ও শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারা বাণী প্রেস ৩৩-এ মদন মিত্র লেন হইতে মুদ্রিত' হত 'কল্লোল'। পত্রিকাটি প্রচুর বিজ্ঞাপন পেত। ডাকমাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা। 'কল্লোলে'র প্রকাশনা বিভাগও ছিল—কল্লোল পাবলিশিং হাউস, ২৭ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে। কল্লোল পাবলিশিং-এর বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায় সুনীতি দেবীর 'রবীন্দ্র জন্মতিথি', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা', অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'বাতায়ন', 'কাব্যপরিক্রমা', সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ররেখা', শৈলজা মুখো-পাধ্যায়ের 'হাসি', 'বাংলার মেয়ে', গোকুল নাগের 'রূপরেখা', প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা' ইত্যাদি বইয়ের নাম। জাঁ ক্রিস্তফের পরিচয় প্রথম 'কল্লোলে'ই মেলে।

১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা দেশকে কে না জানে? ব্রিটিশ বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন,—সহিংস ও অহিংস উভয় পথেই গিয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি, হিজলির হত্যাকাণ্ড। আবার সেই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব। উত্তাল রাজনৈতিক তরঙ্গের আঘাত এড়িয়ে সলিসিটর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বড় ছেলে 'বিংশ শতকের সমান বয়সী' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বার করলেন 'পরিচয়' তাঁদের পুতুলের রেলিঙ দেওয়া হাতিবাগানের পৈতৃক বাড়ী থেকে। অর্থ হীরেন্দ্রনাথের। হাতে তৈরি দামী, পুরু কাগজের উপর হাতে লেখা 'পরিচয়' কথাটি ব্লক করে ছাপা (হাতের লেখা গিরিজাপতি ভট্টাচার্যে'র)। লেখকেরা হলেন অধিকাংশ রাজনীতি-নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সতর্ক-বিচ্যুত, বিলেত ফেরত আই- সি. এস., অক্সফোর্ড ফেরত কিছু বুদ্ধিজীবী বা কেদারা-শায়িত সোসিয়া-লিস্ট। 'সবুজপত্রে' যা পাওয়া গিয়েছিল 'পরিচয়ে' তারই পরের পর্যায় যেন অভিনীত হল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্যের আধুনিকতম সমস্যার উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণ শুধু নয়, এই প্রথম দীর্ঘ, প্রবন্ধপ্রতিম পুস্তক-সমালোচনা বাংলা সাহিত্যপত্রে দেখা দিল। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য যা বাংলা সাহিত্যে আজও নির্দোসর, 'পরিচয়' তাকে বহন করেছে। ব্লুমস্‌বেরি গ্রুপের মতো যে আভিজাত্য 'পরিচয়ে'র অঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনা-পর্বেই তা ক্রমে ম্লান হয়ে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদক্ষেপে। কিছুদিন পরে 'পরিচয়' নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যালের (সকলেই সুধীন্দ্রনাথের আড্ডার বামপন্থী সদস্য) হাতে চলে যায়। সে অন্য ইতিহাস।

বাংলার রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গভঙ্গবিরোধী বা 'স্বদেশী' আন্দোলন প্রথম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলমান জমিদারদের বৃহদংশ এবং সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গের পক্ষেই ছিলেন। মোল্লা-মৌলবীরা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। এই পর্বের মাসিক পত্রিকা 'নব-নূরে'র (১৯০৩-০৬) লেখক তালিকায় কিছু হিন্দু লেখকের নাম থাকলেও কাগজের দৃষ্টি অ-সাম্প্রদায়িক বলা চলে না। এর অনেক পরে ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে (১৯১৮) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়, এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুজফফর আহমদ। এই কাগজেই নজরুলের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সচিত্র মাসিক 'সওগাত' মুহম্মদ নাসিরুদ্দীনের পরিচালনায় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় সচিত্র মাসিকপত্র 'মোসলেম ভারত' বার হয়। 'মোসলেম ভারতে' নজরুল, মোহিতলাল লিখতেন। এই পত্রিকা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিল না। স্বল্পায়ু হলেও ফজলুল হকের পরিকল্পিত, নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আহমদ সম্পাদিত সান্ধ্যদৈনিক 'নবযুগ' (১৯২০-২১) বাংলা পত্রিকার জগতে নতুন সাড়া জাগিয়েছিল। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন মিলে গেল এবং সেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মৌলানা আক্রাম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সেবক' নামক দৈনিক। এই পত্রিকা খিলা-

ফং ও অসহযোগের সমর্থক ছিল। 'সেবক' ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি চলেছিল। সহসা জোয়ারের জল সরে গেল এবং পাঁক দেখা দিতে লাগল। একদিকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়েন, প্রকাশ করেন 'শিখা' পত্রিকা। আবুল হোসেন, আবদুল ওদুদ, মোতাহার হোসেন প্রভৃতি ছিলেন এই গোষ্ঠীর লেখক। অন্যদিকে সে বছরই আক্রাম খাঁর 'মাসিক মোহাম্মদী' বার হয়। তখন থেকে মুসলমানের স্থলে 'মুছলমান' শব্দ চলল, তার মধ্যেই রয়ে গেল সাম্প্রদায়িক ভেদদৃষ্টি। 'মোহাম্মদী' হল মুসলিম লীগের সাহিত্যিক মুখপত্র, সে সাহিত্যধর্মের চেয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্মকেই বড়ো করে দেখেছিল।

অন্যদিকে যাকে বামপন্থী আন্দোলন বলা হয়, বাংলাদেশে রুশ বিপ্লবের (১৯১৭-২১) পরই তা রূপ নিতে থাকে। ১৯২৩-এ মুরলীধর বসুর 'সংহতি', 'লাঙল' (১৯২৫) বা 'গণ-বাণী'র নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। মুজফফর আহমদ, নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সরকার, আবদুল হালিম প্রভৃতি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে পেজেন্টস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হয়। অতুল গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মুজফফর আহমদ, আবদুল হালিম এই পার্টির নেতা ছিলেন। 'নবশক্তি' নামক সাপ্তাহিক এ'দের কার্যকলাপ প্রকাশ করত।

বিশ শতকে শুধু যে বিশিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সাহিত্যিক গোষ্ঠীই বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা বার করেছিল তা নয়, বাঙালী হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় নিজেদের গণ্ডি ঘিরে কিছু-কিছু পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'ব্রাহ্মণ সমাজ', 'কায়স্থ পত্রিকা', 'বৈদ্য প্রতিভা', 'কংস-বণিক পত্রিকা', 'কর্মকার হিতৈষী', 'তিলি সমাজ পত্রিকা', 'সুবর্ণবণিক সমাচার', 'তাম্বুলি পত্রিকা', 'নমঃশূদ্র হিতৈষী' প্রভৃতি নাতিবৃহৎ পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলির একটি বর্ণবিন্যাসগত সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আছে।

ভাবতে অবাক লাগে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুন্দরীমোহন দাসের ছেলে অশোক চট্টোপাধ্যায় ও যোগানন্দ দাস ছিলেন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র (১৯২৭) উদ্ভবের মূলে। সকল প্রকার চিন্তাগত দুর্নীতি ও মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযান চালাবেন এমন জেহাদ তাঁদের ছিল। প্রবাসী প্রেসেই শনিমণ্ডলের প্রথম আসর। 'প্রবাসী'র লেখকেরা অনেকেই 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ছিলেন। কুক্কুট-লাঞ্ছিত মলাট একটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে যেন দাঁড়িয়েছিল। ১৩৩৪ সালে সম্পাদক যোগানন্দ দাস, সহ-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, কর্মাধ্যক্ষ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মূল্য দু' আনা। বছর ছয়-সাত অশোকবাবুরা চালিয়েছিলেন, তারপর 'শনিবারের চিঠি' সজনীকান্ত দাসের হাতে চলে যায়। পরিমল গোস্বামী মাঝে কিছুদিন মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হয়েছিলেন। 'মণিমুক্তা' (পরে 'সংবাদসাহিত্য') নামে অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনা থেকে কিছু কিছু রুচিদুষ্ট অংশ বেছে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীর ছোঁড়া হত। নজরুল, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, জীবনানন্দ, যুবনাশ্ব কেউ বাদ যাননি 'চিঠি'র ব্যঙ্গ-বাণ বর্ষণ থেকে। প্রথম যুগের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য মোহিতলাল মজুমদার পরে 'শনিবারের চিঠি'র প্রধান প্রবন্ধ-লেখক হন। বনফুল, চন্দ্রহাস (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়), সম্বুদ্ধ (অমূল্য-কুমার দাশগুপ্ত), সত্যসুন্দর দাস (মোহিতলাল মজুমদার), প্র. না. বি. (প্রমথনাথ বিশী), চিত্রগুপ্ত (মনোমোহন ঘোষ), অমলা দেবী (ললিতানন্দ গুপ্ত) প্রভৃতি অনেকেই ছদ্মনামে লিখতেন। তবে 'শনিবারের চিঠি' লোকের শ্রদ্ধা অপেক্ষা ভীতির পাত্র ছিল বেশী। শনিরঞ্জন প্রেস (২৫/২ মোহনবাগান রো) ছিল 'চিঠি'র আপিস। বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে 'শনিবারের চিঠি' দুরপনেয় নাম।

যখন কবিতা ছিল বহু ক্ষেত্রে পাদপূরণের বস্তু সেই যুগে শুধু কবিতা ও কবিতা বিষয়ক আলোচনা ছেপে যে একটি ভাল কাগজ চালানো যায় তার একমাত্র প্রমাণ 'কবিতা' পত্রিকা। সারা-ভারতে আর কোথাও এ ব্যাপার কল্পনীয় ছিল না। তার কারণ আর কোথাও এ ধরনের মধ্যবিত্ত কবি ও কবিতাপাঠকগোষ্ঠী ছিল না। বাড়িটির নামও 'কবিতা ভবন' (২০২ রাসবিহারী অ্যাভি-নিউ), যেখান থেকে 'কবিতা' প্রকাশিত হত। বুদ্ধদেব বসু ১৯৩৫ সালের আশ্বিনে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পাঠকদের কাছে শরতের একগুচ্ছ কাশফুলের মতো ধরে দিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক সমর সেন। রবীন্দ্রনাথ সানন্দে যোগ দিয়েছিলেন 'কবিতা'র ডাকে। বুদ্ধদেব বসু 'ক্রন্দসী' (সুধীন্দ্রনাথ), 'খসড়া' (অমিয় চক্রবর্তী), 'পাতাল কন্যা' (অজিত দত্ত), বা 'পদাতিক' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অনবদ্য সমালোচনা লেখেন। এই কবিতাভবন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। দুই সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য দুটি পৃথক ভূমিকা লেখেন। প্রকাশনার দিক থেকে এটি উচ্চমানের বই। কবিতাভবন সব দলের কবিদের উৎসাহ দিয়েছে, কবি যশঃপ্রার্থীদের বই সুরুচিসম্মতভাবে প্রকাশ করেছে, তাদের তুলে ধরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে।

বাংলা দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

তখন 'বসুমতী' ও 'সেবক' ছাড়া বাংলা দৈনিক পত্র ছিল না। 'আনন্দবাজার' কংগ্রেস সমর্থক, জাতীয়তাবাদী পত্রিকা অর্থাৎ ব্রিটিশ-বিরোধী, আপোষ-বিরোধী নেতৃত্বের সমর্থক ছিল। এই পত্রিকা একটি বিপ্লব ঘটায় বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে; লাইনো টাইপের প্রথম ব্যবহার এই পত্রিকাতেই। ১৯৩৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলা লাইনো টাইপ যন্ত্রের কার্যারম্ভ উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলা সংবাদপত্রের মুদ্রণে এই বিপ্লব ঘটানোর মূলে ছিলেন 'আনন্দবাজারে'র প্রধান স্তম্ভ সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে উচ্চমানের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র যোজনা, এবং পুজোসংখ্যা ও বার্ষিক (দোল) সংখ্যার প্রচলন 'আনন্দবাজারে'র কৃতিত্ব। আরও মনে রাখতে হয় এখানেই বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র সপ্রশংস সমালোচনা লেখেন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে দৈনিক 'যুগান্তর' বার করলেন। কুমিল্লার কামিনীকুমার দত্ত, নরেন্দ্র দত্ত এর আর্থিক দিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করত 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার'-'যুগান্তর' নিখিল ভারত কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। বাংলা দৈনিকের পাঠক তার ফলে উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাত।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। ক্রমে কাগজের দাম বাড়ল, দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার আকার সঙ্কুচিত হল, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি পেল। তবে সদা যুদ্ধ-সংক্রান্ত চাকরি পাওয়া পাঠকের সংখ্যা বেড়ে গেল হুহু করে। রোটারি মেসিন আর লাইনো টাইপ সেই গতি-বেগের সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে লাগল। কিন্তু দৈনেক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি সাময়িকপত্র ছাড়া অন্যগুলি হয় ধীরে ধীরে উঠে গেল না হয় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল।

নির্দেশিকা

১ "ছাপা কর্মের দ্বারা গুণ ও সন্দর্ভশুদ্ধির আশ্রয় প্রাচীনেরদের পুস্তক পুনর্বার লুপ্ত হইতে পারিল না, এই কর্মের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ন্যূন হইল, তাহাতে ইতর লোকেরদের বিদ্যা প্রাপ্তির উপায় হস্তগত হইল; এবং যে যে নূতন বিদ্যা প্রকাশ হইল তাহা ছাপা দ্বারা অবিকৃত রহিল ও ইউরোপের মধ্যে শীঘ্র ব্যাপিল এবং নূতন বিদ্যা দ্বারা অন্য নূতন বিদ্যা সৃষ্টি হইল.."
(আগস্ত ১৮১৮)

২ OONOODAH MONGUL/EXHIBITING/THE/TALES/OF/BIDDAH AND SOONDER/TO WHICH IS ADDED/THE MEMOIRS/OF/RAJAH PRUTAPADITYU/EMBELLISHED/WITH SIX CUTS/CALCUTTA/FROM THE PRESS OF FERRIS & CO/1816./ এনগ্রেভিংগুলি রামচন্দ্র রায়ের করা। মনে হয় ইনি গঙ্গাকিশোরের সহযোগী হরচন্দ্র রায়ের ভাই। এই সূত্রে স্মরণীয় কাঠের এনগ্রেভিং বা কাঠখোদাই বিলেতে নতুন করে দেখা যায় আঠারো শতকের শেষে টমাস বিউইকের (১৭৫৩-১৮২৮) হাতে।

৩ হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মিলে প্রেস করলেও কিছুদিন পরে গঙ্গাকিশোর তাঁর মুদ্রাযন্ত্র নিজের গ্রাম বহেড়ায় (শ্রীরামপুরের কাছে) নিয়ে যান।

৪ ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত।

৫ 'পেনি ম্যাগাজিন' ক্লাওয়েস ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন নানা চিত্রসহ।

৬ লিটন ১৮৭৮) খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ওরিয়েণ্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যাক্ট পাশ করান। তারপর ঐ বছর অক্টোবরে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ হয়। আয়ারল্যাণ্ডের পত্রিকাগুলির ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দমনের জন্য আইরিশ অ্যাক্ট প্রচলিত হয়। ঐ অ্যাক্টের আদর্শে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট রচিত হয়। ঐ অ্যাক্ট বলে 'সোমপ্রকাশে'র বিরুদ্ধে নোটিশ জারি হলে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাগজ বন্ধ করে দেন। গ্লাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হলে ঐ অ্যাক্ট বাতিল হয়।

৭ মুদ্রাযন্ত্র পণ্ডিত মহাশয়দের অনেকেরই ছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নাম

এই সূত্রে মনে করা যায়। অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা সমকালের মুদ্রাযন্ত্রের অর্থনৈতিক চেহারাটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত বই নিজের প্রেসে ছেপে নিজের দোকান থেকে বিক্রি করতেন।

৮ এই সূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করা হয় এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চাপিয়ে দেওয়া হয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির ব্রিটিশ বিরোধিতাকে খর্ব করাতে।

৯ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নীলকরদের বিপক্ষে দাঁড়ালেও, যখন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পাবনায় জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহী হয়, তখন তার বিরোধিতা করে। অনুরূপ ভূমিকা ছিল 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র, কেননা ঐ পত্রিকা চালাতেন জমিদারগোষ্ঠী। পাবনায় যে প্রবল প্রজাবিদ্রোহ হয় তার পক্ষে দাঁড়ান রমেশচন্দ্র দত্ত, (দ্র. An Apology for Pubna Rioteers, Bengal Magazine, 1874.) 'বেঙ্গলী' দৈনিক পত্রিকা হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১০ 'The Sadharani' was very popular because even the authorities deigned to lend an ear to its demands.

১১ কৃষ্ণকমল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'হিতবাদী' নাম ও তার 'মটো' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া।

১২ প্রাণনাথ নিজে শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগের সদস্য ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে যে নির্বাচন হয় তিনি তাতে জয়ী হন।

১৩ কুন্তলীন প্রেসের মালিক এইচ. বোসের কুন্তলীন, দেলখোস্ ও তাম্বুলীনের পদ্য-বিজ্ঞাপন অনেকেই দেখেছেন।

কেশে মাখো কুন্তলীন অঙ্গবাসে দেলখোস
পানে খাও তাম্বুলীন ধন্য হোক এইচ বোস॥

কুন্তলীন পুরস্কারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই জড়িত ছিলেন। হেমেন্দ্রমোহন বসুর কুন্তলীন প্রেস উন্নতমানের প্রেস ছিল। এদেশে গানের রেকর্ডিং-এর গোড়ার যুগে তিনি বাঙালীদের মধ্যে প্রথম এদিকে নেমেছিলেন।

১৪ বিপিনচন্দ্রের ছেলে জ্ঞানাঞ্জন পাল বলেছেন, 'নারায়ণ' নামকরণ করেন বিপিনচন্দ্র। 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৮৪ সংখ্যায় শ্রীসুনীল দাসের লেখা দেখতে পারেন।

১৫ উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মাতুল হলেও 'বিচিত্রা'র প্রথম তিন বছরে শরৎচন্দ্র লেখেননি। চতুর্থ বর্ষে (১৩৩৮, মাঘ) শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বে তাঁর দেখা মিলল। প্রথম তিন পর্ব 'ভারতবর্ষে' ছাপা হয়েছিল।

অভিধান ও কোষগ্রন্থ

অমলেন্দু ঘোষ

অভিধান ও কোষগ্রন্থের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর গ্রন্থের মৌলিক পার্থক্য আছে। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি-অর্থনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিভাগের বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করতে হয় তা না হলে লেখকের চিন্তার ধারাবাহিকতা এবং বক্তব্য পাঠক সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু অভিধান ও কোষগ্রন্থ শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেই কোনো শব্দ বা প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা জানবার জন্যই দেখা হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার জন্য এরা নয়। অবশ্য বার্নার্ড শ' নাকি সমগ্র 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' আগাগোড়া একাধিকবার পড়েছিলেন। আবার কেউ কেউ নিয়মিতভাবে অভিধান পাঠ করে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই পান। এগুলো অবশ্য ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

১

প্রথমে অভিধানের কথা আলোচনা করা যাক্।

বাংলা অভিধানের বয়স প্রায় দু'শ চল্লিশ বছর হতে চলেছে। প্রথম এবং পরবর্তী কয়েকটি অভিধান ইউরোপীয়ানদের দ্বারা সংকলিত। সংস্কৃত অভিধান অবশ্য প্রায় তেরো চৌদ্দশ বছর আগেই সংকলিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার দুটি প্রসিদ্ধ অভিধান অমর সিংহ সংকলিত 'অমরকোষ' (খ্রীঃ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে) এবং হেমচন্দ্র সংকলিত 'অভিধান চিন্তামণি' (খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দী)। সংস্কৃত অভিধান সংকলনের রীতি ছিল আলাদা। যেমন, অমরকোষের শব্দবিন্যাসরীতি এখনকার মতো নয়। অভিধান ছিল ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত; শব্দগুলি স্বর্গ, মর্ত্য প্রভৃতি বর্গভুক্ত ছিল। এই জন্য অভিধানের অন্তর্ভুক্ত শব্দার্থ বোঝবার জন্যও টীকার দরকার হত। অমরকোষেরই টীকা ছিল প্রায় পঁচিশখানা।

একটি টীকা লিখেছিলেন সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। নাম 'টীকাসর্বস্ব'। সংস্কৃত শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রায় ৩০০ বাংলা শব্দের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হত। সুতরাং 'টীকাসর্বস্বে' বাংলা অভিধানের সূত্রপাত হয়েছিল বলা চলে।

খ্রীষ্টান পাদ্রিদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা শেখার প্রয়োজন ছিল। ভাষা শেখার প্রধান সহায় অভিধান। তাই তাঁরা পাশ্চাত্য রীতিতে অভিধান সংকলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রথম দিকে মিশনারিরা যে-সব অভিধান সংকলন করেছেন তার কোনোটাই বাংলা থেকে বাংলা নয়।

হয় ইংরেজী থেকে বাংলা নয়তো বাংলা থেকে ইংরেজী। বিদেশী পাদ্রিরা ইংরেজীর মাধ্যমে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন বলেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। বাঙালী পাঠকের প্রয়োজন বাংলা থেকে বাংলা শব্দের অভিধান। তেমন অভিধান সংকলিত হয়েছিল কিছু পরে।

পাশ্চাত্য রীতিতে সংকলিত প্রথম অভিধান অবশ্য দুই খণ্ডে বাংলা-পর্তুগীজ ও পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। পর্তুগীজ মিশনারিদের অন্যতম প্রচারকেন্দ্র ভাওয়ালে (ঢাকা) এটি সংকলন করেছিলেন পাদ্রি মানোএল্ দা আস্সুম্পসাম। ছাপা হয়েছিল লিসবন শহরে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ শব্দকোষের সঙ্গে আছে বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। দুই ভাগে শব্দকোষটির পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ৫৫০। হলহেডের বাংলা ব্যাকরণের বহু দৃষ্টান্ত বাংলা হরফে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে বাংলা হরফ ব্যবহার না করে পর্তুগীজ ভাষায় প্রতিবর্ণীকরণ করা হয়েছে বাংলা অংশের। আকার, ল্যাটিম, মাকুন্দা, ইঁট, গা, আলু, বাদাম, আধকপালে প্রভৃতি সুপ্রচলিত বাংলা শব্দ এই শব্দকোষে পাওয়া যাবে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় শব্দকোষটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলা অভিধানের ইতিহাসে এই শব্দকোষটি প্রথম স্থানের অধিকারী, এ গৌরব নিশ্চয়ই সংকলকের প্রাপ্য। কিন্তু পরবর্তীকালের অভিধান সংকলনে এর কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলা হরফ ব্যবহার করে কলকাতায় ছাপা প্রথম অভিধান আপজনের 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' (১৭৯৩)। বাংলা থেকে ইংরেজী শব্দের এই অভিধান সংকলকের মতে বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী শেখার এবং বিদেশীর পক্ষে বাংলা শেখার সহায়ক। এই অভিধানে বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথমে ব্যঞ্জন বর্ণের শব্দার্থ দিয়ে পরে দেওয়া হয়েছে স্বরবর্ণ। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বহুসংখ্যক দেশজ শব্দের অন্তর্ভুক্তি। বইটি ছেপেছিল ক্রনিকল্ প্রেস।

এর পরে প্রকাশিত হয় হেনরি পিটস্ ফরস্টার সংকলিত অভিধান। অভিধানটি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড ইংরেজী-বাংলা (১৭৯৯), দ্বিতীয় খণ্ড বাংলা-ইংরেজী (১৮০২)। ফরস্টার ছিলেন বেঙ্গল সিভিলিয়ান, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা সরকারী দপ্তরে এবং আদালতে মর্যাদা লাভ করেছিল। শেষ জীবনে তিনি যখন মাস্টার অব দি মিণ্ট পদে অধিষ্ঠিত তখন তহবিল তছরুপের অভিযোগে দণ্ডিত হন।

পাদ্রি লং তাঁর ক্যাটালগে উল্লেখ করেছেন, অভিধানটির শব্দসংখ্যা ছিল ১৮,০০০ এবং দাম ছিল যাট টাকা।

অভিধানের ভূমিকায় ফরস্টার ব্যাকরণের প্রাথমিক দু'একটি নিয়ম, উচ্চারণের নির্দেশ, বাংলা বর্ণমালা ইত্যাদি সংযোজন করেছেন। তিনি ভূমিকায় বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির কথা হলহেডের চেয়ে অনেক বেশী জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে বাংলা যে কোনো ভাবের বাহন হতে সক্ষম এবং ভাব প্রকাশের জন্য আরবী বা ফারসী শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। তিনি 'কর্নওয়ালিস কোড' অনুবাদের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলেছেন।

অভিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন চার্লস্ উইলকিন্স। ছাপা হয়েছিল কলকাতার ফেরিস কোম্পানীর প্রেসে। বইটির নাম:

> A/Vocabulary,/In two parts/English and Bongalee/And/Vice versa/by H. P. Forster,/Senior merchant on the Bongal Establishment, etc.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ১৮০৫ থেকে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি অভিধান সংকলন করেছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙালী (হয়ত বা উড়িষ্যাবাসী) যিনি অভিধান সংকলন করেন। প্রথমটি বাংলা-ইংরেজী ভকাবুলারি (১৮০৫); দ্বিতীয়টি সংস্কৃত-বাংলা (১৮০৯), হিন্দুস্থানী প্রেসে ছাপা; এর পর তিনি সংকলন করেন ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৮১০)। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিধান দুটির তিনটি সংস্করণ হয়েছিল এবং বিগত শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত প্রচার অব্যাহত ছিল। মোহনপ্রসাদ অকরানুক্রমে শব্দবিন্যাস করেননি। ধর্ম, শারীরবিদ্যা, ঈশ্বর, বিশ্ব, রোগ, ঔষধ, প্রাণী এই সব বিভিন্ন বর্গে শ্রেণীবদ্ধ করে শব্দের অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে।

উইলিয়াম কেরীর বাংলা(-ইংরেজী) শব্দকোষের প্রকাশ আমাদের অভিধানের ইতিহাসে এক বাঁক সৃষ্টিকারী ঘটনা। একালের বিচারে অনেক ত্রুটি চোখে পড়লেও তদানীন্তন কালে এটি ছিল আধুনিকতম রীতির সর্ববৃহৎ অভিধান। কেরী দীর্ঘ ত্রিশ বছরের পরিশ্রমে কিঞ্চিদধিক দুহাজার পৃষ্ঠায় এই কোষগ্রন্থে আশি হাজার শব্দ সংকলন করেছিলেন। তিনি কিছু সমাসবদ্ধ পদ এবং নিজের তৈরি কিছু নঙর্থক শব্দ অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করায় কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের অগ্রণী তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তারাচাঁদ নিজের সংকলিত অভিধানের ভূমিকায়

কেরীর প্রতি ঋণ স্বীকার করেও এই প্রসঙ্গের সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা যে অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিসহ তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন এই সমাসবদ্ধ পদটি: পাদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকারিদীর্ঘ; অর্থাৎ, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল সঞ্চালন করতে যে মাংসপেশী সহায়তা করে।

কেরী ছিলেন সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী এবং বিশ্বাস করতেন সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সহায়তায় বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে,—আরবী, ফারসী বা ইংরেজী শব্দ আহরণ করে নয়। কিন্তু তাই

A

DICTIONARY

OF THE

BENGALEE LANGUAGE,

IN WHICH

THE WORDS ARE TRACED TO THEIR ORIGIN

AND

THEIR VARIOUS MEANINGS GIVEN

VOL. I.

BY W. CAREY, D. D.

PROFESSOR OF THE SUNGSKRITA, AND BENGALEE LANGUAGES, IN THE COLLEGE OF FORT WILLIAM.

SECOND EDITION, WITH CORRECTIONS AND ADDITIONS.

SERAMPORE:

PRINTED AT THE MISSION-PRESS,

1825.

বলে তিনি দেশজ চলিত শব্দ উপেক্ষা করেননি। এমন অনেক সুন্দর শব্দ তিনি চয়ন করেছেন যা আজ অপ্রচলিত কিন্তু ব্যবহার করলে বক্তব্য অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

কেরীর অভিধানের বৈশিষ্ট্য হল: যেখানে সম্ভব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে; অবশ্য এখন তার ব্যখ্যা সঠিক নয় বলে মনে হবে। তা ছাড়া একটি শব্দের একাধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরিভাষাও অনেক পাওয়া যাবে।

মুদ্রণের দিক থেকেও এই অভিধান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতদিন বাংলা অভিধান বড় হরফেই মুদ্রিত হত। কেরী তাঁর অভিধানও সেই বড় হরফ দিয়ে ছাপা আরম্ভ করেছিলেন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম খণ্ড ছাপা শেষ হলে কেরী উপলব্ধি করলেন বই এভাবে ছাপলে আকার অনাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি পাবে, দাম বাড়বে এবং দেখতেও ভাল দেখাবে না। তখন তিনি অভিধানের উপযোগী এক প্রস্থ নতুন ছোট হরফ ঢালাই করে প্রথম থেকে নতুন করে অভিধান ছাপতে শুরু করেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিন ভাগ দুই খণ্ডে ছাপা সম্পূর্ণ হয় ১৮২৫-এ। দাম হল ১২০ টাকা।

এই অভিধান সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় বলে কেরীর অনুরোধে জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রায় ২৬,০০০ শব্দ সম্বলিত একটি সংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। কিছুকাল পরে তিনি ইংরেজী-বাংলা অভিধানও সংকলন করেছিলেন। দুটি অভিধানই জনপ্রিয় হয়েছিল। বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও এই গ্রন্থের নতুন সংস্করণ হয়েছে।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংকলিত 'বঙ্গভাষাভিধান'। এটি প্রথম বাংলা থেকে বাংলা শব্দকোষ। এর পূর্বে যত অভিধান সংকলিত হয়েছে তারা হয় বাংলা-ইংরেজী অথবা ইংরেজী-বাংলা। সুতরাং ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় স্কুল বুক সোসাইটি ৩০০ টাকায় অভিধানের স্বত্ব কিনে অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিধানটি প্রকাশিত হয় লণ্ডনে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। সংকলন করেছিলেন হেইলেবারি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক জি. সি. হটন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিলিয়ানদের জন্য। আখ্যাপত্র থেকে বইয়ের বিষয়বস্তুর পরিধি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে:

> A/ Dictionary,/Bengali and Sanskrit/Explained in English/and/ Adapted for students of either language;/to which is added/an Index,/Serving as a Reversed Dictionary/By/Sir Graves C. Haughton,

গ্রন্থের ২,৮৫১ পৃষ্ঠায় চল্লিশ হাজার শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্টে ত্রিশ হাজার শব্দের যে সূচী সংযোজিত হয়েছে তা ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষের কাজ করবে। বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলা দেবনাগরী ও রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহু পারিভাষিক শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেছেন সংকলক। শব্দটি বিশেষ্য কি বিশেষণ, উৎপত্তির সূত্র নির্দেশ, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোন অভিধান থেকে শব্দটি সংকলিত তা বলা হয়েছে। সংকলকের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের ছাপ অভিধানের সর্বত্র সুস্পষ্ট।

এর পূর্বে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ কলেজের রেভারেণ্ড উইলিয়াম মর্টন সংকলিত 'দ্বিভাষার্থকাভিধান' (বাংলা-ইংরেজী) একটি বিশেষ কারণে উল্লেখের দাবি রাখে। এই অভিধান থেকে আরবী, ফারসী ও ইউরোপীয় শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ সংকলকের মতে বাংলা ও তার উপভাষা সমূহ খুবই সমৃদ্ধ, অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। মর্টন প্রায় ষোলো হাজার শব্দ সংকলন করেছেন। তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বাংলা বইপত্রে বাংলা শব্দ যা ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা ষোলো হাজারের বেশী নয়।

হটনের অভিধান প্রকাশের পর বৎসর, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, রামকমল সেন সংকলিত দুই খণ্ডের ইংরেজী-বাংলা অভিধানটি প্রকাশিত হয়। এর আখ্যাপত্রে আছে:

> A/Dictionary/in/English and Bengalee; /Translated/From/Todd's edition of Johnson's English Dictionary./In two volumes./By Ram Comul Sen, etc.

দুই খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় এগারোশ, দাম প্রতি খণ্ড দশ টাকা। অভিধানে অন্তর্ভুক্ত শব্দ সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার, শুরুতে দেড় হাজার ধাতুর তালিকা দেওয়া হয়েছে। একটি দীর্ঘ ভূমিকায় রামকমল বাংলা দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবরণ দিয়েছেন। অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এতদ্ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইংরেজী শেখা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। সে কাজে সহায়তা করাই সংকলনটির উদ্দেশ্য। প্রায় ষোল-সতেরো বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফল এই অভিধান। এটি ছাপা নিয়ে নানা সমস্যায় বিব্রত হতে হয়েছিল রামকমলকে। প্রথম ছাপা শুরু হয় কলকাতায়। রামকমলের তত্ত্বাবধানে এ কাজের জন্য নতুন টাইপ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারপর নানা কারণে মুদ্রণের কাজ স্থানান্তরিত হয় শ্রীরামপুরে। সেখানেও বাধা এল ফেলিক্স কেরীর মৃত্যুতে। শেষ পর্যন্ত অনেক বিলম্বে ছাপা শেষ হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংকলিত তিনটি নির্ভরযোগ্য অভিধানের মধ্যে রামকমল সেনের অভিধান অন্যতম। অন্য দুটি কেরী ও হটনের অভিধান।

রামকমল সেন

এর পরে যে সব উল্লেখযোগ্য অভিধান বিগত শতকে প্রকাশিত হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম করা হল:

ইউ. সি. আঢ্য সংকলিত ইংরেজী-বাংলা অভিধান (১৮৫৪)। তেইশ হাজার শব্দ সংকলন করা হয়েছে। এটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

রামকমল বিদ্যালংকারের 'প্রকৃতিবাদ অভিধানে' ষোলো হাজার প্রচলিত বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ এবং তৎসহ শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি, লিঙ্গ প্রভৃতি সংকলিত হয়েছে। বাঙালী পাঠকের নিকট এটি ছিল সহায়ক গ্রন্থ। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হলেও বর্তমান শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এর প্রচলন অব্যাহত ছিল।

গুপ্ত প্রেস প্রকাশিত ১২০৫ পৃষ্ঠার বাংলা অভিধান (১৮৭৯) সংকলন করেছিলেন দুর্গাচরণ গুপ্ত।

১৮৮১-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ছয় খণ্ডের বৃহৎ ইংরেজী-বাংলা অভিধান। সংকলক ত্রৈলোক্যনাথ বরাট। এই সচিত্র অভিধানটির সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় চারুচন্দ্র গুহ সংকলিত তিন খণ্ডের ইংরেজী-বাংলা সচিত্র অভিধানটির। এটি ঢাকা থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই গ্রন্থটি বিশেষরূপে সমৃদ্ধ।

বেণীমাধব ভট্টাচার্যের 'প্রকৃতি ও প্রত্যয় সহিত বৃহৎ সচিত্র বাঙ্গালা অভিধান'টির (১৮৮৮) কথাও উল্লেখ করতে হয়। বিগত শতকে সচিত্র বাংলা অভিধান খুব কমই পাওয়া যেত।

আমরা কয়েকটি মাত্র অভিধানের নাম উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বাংলা অভিধান গ্রন্থের যে পঞ্জী সংকলন করেছেন তা থেকে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কত অভিধান সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু এদের অধিকাংশই অভিধান হিসাবে অভিহিত হবার যোগ্য নয়, এরা শুধুই শব্দ-তালিকা। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দ সংকলন করে পাশে আর একটি সমার্থক শব্দ দিয়ে অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কেরী, হটন ও রামকমল সেনের অভিধান এর বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। বিগত শতকের, অন্তত প্রথমার্ধের অভিধানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। (১) অধিকাংশ অভিধান শব্দ-তালিকা মাত্র; (২) সংস্কৃত 'অমরকোষে'র প্রভাব পড়েছে সংকলনরীতিতে। 'অমরকোষে'র অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছিল। (৩) সংকলনে ইংরেজীর প্রাধান্য। ইংরেজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজী অভিধানই বেশী সংকলিত হয়েছে, বাংলা থেকে বাংলা অভিধানের সংখ্যা কম। পরীক্ষা পাশ করতে হলে, ভাল চাকরি পেতে হলে ইংরেজী শেখা ছিল অত্যাবশ্যক। অভিধানের উদ্দেশ্যও ছিল প্রধানতঃ তা-ই। বাঙালীর বাংলা পড়ার সহায়ক অভিধান সংকলিত হয়েছে অল্প কয়েকটি।

প্রকৃতপক্ষে অভিধান আমরা ব্যবহার করি কয়েকটি উদ্দেশ্যে। প্রথমতঃ শব্দের অর্থ জানতে। শুধু মূল অর্থ নয়, অর্থের যে নানা দ্যোতনা-বৈচিত্র্য বিভিন্ন লেখকের হাতে ঘটেছে তাও জানতে চাই তাঁদের রচনার উদ্ধৃতি থেকে। শব্দার্থের কালানুক্রমিক বিবর্তনের কথা জানতে পারলে তো আরো

খুশি হই। দ্বিতীয়তঃ শুধু বানান জানতে চাই। সংকলকের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও যুক্তি থাকলে তাঁর অভিধানে গৃহীত বানান ভাষায় বানানের নৈরাজ্য দূর করবার সহায়ক হতে পারে। যেমন ডঃ জনসনের অভিধান করেছিল ইংরেজী বানানের ক্ষেত্রে। তৃতীয়তঃ শব্দের সম্যক্ পরিচিতি, অর্থাৎ বুৎপত্তি, ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি।

এই আদর্শের নিকটতম অভিধান বাংলায় দুটি। একটির সংকলক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। দুই খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এক লক্ষ পনেরো হাজার শব্দ স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণ, বর্ণ, পঙ্ক্তি, পর্যায়, বুৎপত্তি, অর্থ, প্রয়োগ প্রভৃতি নির্দেশ করেছেন সংকলক। যেখানে সম্ভব ও প্রয়োজন বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শব্দের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। শুধু মূল শব্দের অর্থ দিয়ে সংকলক ক্ষান্ত হননি। মূল শব্দকে কেন্দ্র করে যে সব শব্দ গড়ে উঠেছে তারাও স্থান পেয়েছে। যেমন 'উপর' শব্দটি ধরা যাক। এই শব্দটির সাতটি পৃথক অর্থবৈচিত্র্য নির্দেশ করে সংকলক যোগ করেছেন—উপরঅলা, উপর-উপর; উপর-চড়া; উপরচাড়া; উপরচাপ; উপরচাল; উপরতল; উপরদৃষ্টি; উপর-নীচা; উপরপড়া; উপর টান; উপরে উঠা; তার উপর। এর পূর্বে একমাত্র কেরীর অভিধানে এই ধরনে শব্দের শাখা বিস্তারের আভাস মেলে।

উচ্চারণ নির্দেশের জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের এরূপ ব্যাপক ব্যবহারও এই প্রথম। জ্ঞানেন্দ্রমোহন খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যতীত বাংলায় ব্যবহৃত অন্য সকল ভাষার শব্দই গ্রহণ করেছেন। এই অভিধানের শেষভাগে কয়েকটি মূল্যবান পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'বিদেশী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ',—এটি সংকলন করে দিয়েছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজীতে এক সময় এন্‌সাইক্লোপিডিক অভিধান জনপ্রিয় ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের পরিশিষ্টগুলি সেই এন্‌সাইক্লোপিডিক অভিধানের কিছুটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

অবশ্য বাংলায় এন্‌সাইক্লোপিডিক অভিধান বলা যায় সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' ও আশুতোষ দেবের 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' দুটিকে। প্রথমটিতে শব্দার্থ ও বিভিন্ন-বিষয়ক প্রসঙ্গগুলি এক অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় অভিধানটিতে পরিশিষ্ট হিসাবে সাহিত্য-পরিচয়, বিবিধ জ্ঞাতব্য, ভূকোষ প্রভৃতি জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' আদর্শ অভিধানের সমীপবর্তী আর একটি বিশিষ্ট শব্দকোষ। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণের অভিধান দুটিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। হরিচরণের অভিধান যাঁরা শব্দার্থের গভীরতর ও ব্যাপকতর অর্থ নির্ণয় করতে চান তাঁদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ছত্রিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে হরিচরণের অভিধান সম্পূর্ণ হয়। প্রথম পাঁচ খণ্ডে বেরিয়েছিল (১৯৩২-৫১)। এখন নতুন করে ছাপা হয়েছে দু'খণ্ডে। বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি সব ভাষার শব্দ তো আছেই, তাছাড়া আছে ইংরেজী, পর্তুগীজ, হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শব্দ। শব্দার্থ স্পষ্ট করতে যেমন বাংলা সাহিত্য থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে তেমনি আছে সংস্কৃত থেকেও। একটি শব্দের পূর্ণ পরিচিতির জন্য যে সব তথ্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সংকলক তাদের সবই সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রাজশেখর বসু এই অভিধান সম্বন্ধে বলেছেন: "এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধিলাভ করিবে।"

শুধু বাংলা শব্দের একটি অভিধান সংকলন করেছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রসঙ্গে আমাদের রেভাঃ মর্টনের অভিধানটির কথা মনে পড়ে। এ ধরনের অভিধান বাংলা ভাষার গবেষকের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যোগেশচন্দ্রের অভিধানটি আর ছাপা হয়নি।

এখন সর্বদা ব্যবহারের জন্য যে সব অভিধান বেশী প্রচলিত তাদের মধ্যে রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' এবং শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আশুতোষ দেব, সুবলচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির অভিধানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষে' মুসলমান সমাজে প্রচলিত শব্দের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ডঃ সুকুমার সেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য দুই খণ্ডে একটি প্রয়োজনীয় অভিধান সংকলন করেছেন। এটির নাম: *An Etymological Dictionary of Bengali, c.* 1000-1800 *A.D.* (1971). বাংলা শব্দগুলি রোমান হরফে দেওয়া, অর্থ ইত্যাদি ইংরেজীতে।

কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর অভিধানের কথা এখানে বলা যেতে পারে। প্রথমেই মনে পড়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত এবং ঢাকার বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত দুই খণ্ডে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের (১৯৬৬) কথা। কামিনীকুমার রায়ের লৌকিক শব্দকোষটিও

উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর অঞ্চলের ভাষাভিধানও প্রকাশিত হয়েছিল। কলীন্দ্রনাথ বর্মণ সংকলিত 'রাজবংশী অভিধান' (১৯৭২) আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রি গোল্ডস্যাক সংকলন করেছিলেন মুসলমানী বাংলা ও ইংরেজী ভাষার অভিধান। কাজী বৈজুদ্দীন যে 'মজুবাভিধান'টি সংকলন করেছিলেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাতে স্থান পেয়েছে শুধু বাংলায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ। প্রাণতোষ ঘটকের 'রত্নমালা' (১৯৫৫) বাংলা সমার্থক শব্দের অভিধান। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবার পর কিছুদিন পর্যন্ত বাংলায় ডাক্তারী পড়া যেত। ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলায় অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদীয় শব্দকোষ অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। আইন-আদালতে ব্যবহৃত শব্দের অভিধান সংকলিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি। প্রথমটি মার্শম্যানের 'ব্যবস্থাভিধান' (১৮৫১)। এর পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জন রবিনসন সংকলন করেন আর একটি ইংরেজী-বাংলা আইনের অভিধান। পরবৎসরই এইচ. এইচ. উইলসন সংকলন করেন 'বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত শব্দাবলী'। বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলিত 'রবীন্দ্র শব্দকোষ' (১৯৭১) একটি বিশেষ ধরনের গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট যে সব শব্দ অভিধানে স্থান পায়নি এবং যে সব প্রচলিত শব্দ কবি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন তাদের চয়ন, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ নির্দেশ করেছেন সংকলক।

অন্য ভাষা সম্বন্ধে বাঙালীর যে আগ্রহের অভাব ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ও অন্যান্য ভাষার যুক্ত অভিধান থেকে। পূর্বেই বলা হয়েছে 'অমরকোষে'র বহু অনুবাদ হয়েছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েটস ইংরেজী-বাংলা অর্থ সম্বলিত সংস্কৃত অভিধান সংকলন করেছিলেন। তারও পূর্বে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্কৃত-বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। সংকলক বোধহয় মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সংকলন করেন 'শব্দসিন্ধু' বা সংস্কৃত-বাংলা অভিধান। এর পর বাংলা-সংস্কৃত এবং সংস্কৃত-বাংলা অনেকগুলি অভিধান বেরিয়েছে। প্রায় সবগুলিই ছাত্র-সহায়ক গ্রন্থ। অবশ্য বাংলা বড় অভিধানগুলি অনেকটা সংস্কৃত অভিধানেরও কাজ করে। এদিক থেকে হটনের অভিধানটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ ছাড়া আরবী, উর্দু, ফারসী, হিন্দুস্থানী, গারো, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী ও বাংলা ভাষার অভিধান বিগত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সংকলিত হয়ে আসছে। হিন্দী যদিও ভারতের রাষ্ট্রভাষা তথাপি হিন্দী-বাংলা, বাংলা-হিন্দী কোনো নির্ভরযোগ্য অভিধান নেই। অথচ রামকৃষ্ণ সেন নামে এক ভাষাবিলাসী সংকলক ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দেই 'ইংরাজী-লাটিন-বাংলা' এবং 'ইংরাজী-ফরাসী-বাংলা'—এই দুটি অভিধান রচনা করেছিলেন। রুশ-বাংলা অভিধানের এর মধ্যে দুটো সংস্করণ হয়ে গেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিধানটি গবেষকদের কাজে লাগবে। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ জগতের শব্দকোষ (১৯৭১) কৌতূহল জাগ্রত করলেও শব্দতালিকাটিতে বাংলা শব্দ বেশী নেই।

২

বইয়ের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায়, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং শক্তিমান লেখকরা একটি শব্দের মধ্যে নানা অর্থের দ্যোতনা আরোপ করেন, তখনই অভিধানকার হাতে পান সুষ্ঠু সংকলনের উপাদান। তার পূর্বে পর্যন্ত সার্থক অভিধান সংকলন করা সম্ভব নয়, পাঠকরা পান শব্দতালিকা, যেমন দিয়েছিলেন আপজন, ফরস্টার বা মোহনপ্রসাদ।

কোষগ্রন্থের ক্ষেত্রে অনেকটা তেমনি কথা বলা চলে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পার হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পাঠক যখন কৌতূহলী হয়ে ওঠে তখনই কোষগ্রন্থের আবির্ভাব ঘটে। তবে বাঙালী পাঠককে খুব বেশীদিন কোষগ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়নি।

কোষগ্রন্থের সর্বপ্রাচীন রূপ ৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত প্লিনির 'হিস্টোরিয়া ন্যাচারেলিস'। তারপর থেকে ক্রমবিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে কোষগ্রন্থের বহিরঙ্গ এবং আন্তর রূপ। কোষ-গ্রন্থের মোটামুটি দুটি শ্রেণী: একটির পরিধি বিস্তৃত, যে কোনো বিষয়ের তথ্য এ থেকে আশা করতে পারি। তাই এদের বলা হয় বিশ্বকোষ। অন্য শ্রেণীর কোষগ্রন্থ একটিমাত্র বিষয়ের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, বিজ্ঞানকোষ, ভূগোলকোষ ইত্যাদি।

কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত সম্পাদকদের ধারণা ছিল কোষগ্রন্থ বুঝি শুধু পণ্ডিতদের ব্যবহারের জন্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র নবম সংস্করণ পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে। এখন সকলেই উপলব্ধি করেছেন কোষগ্রন্থ সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই ব্যস্ততার যুগে প্রয়োজনীয় তথ্য চট্ করে বের করতে কোষগ্রন্থের জুড়ি নেই।

কোষগ্রন্থের সংকলনরীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়, আঙ্গিকের দিক থেকে এবং বিষয় নির্বাচনে। পূর্বে অনেক কোষগ্রন্থ ছিল বিষয়ানুক্রমে বিভক্ত। অর্থাৎ এসরাজ, সেতার, বেহালা ইত্যাদি এ, স, ব অক্ষরানুক্রমে না রেখে এক সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বিভাগে রাখা হত। এখন প্রায় সব

কোষগ্রন্থেই প্রসঙ্গগুলি অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব বাড়ে, কোনো বিষয়ের কমে যায়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র প্রথম সংস্করণে (১৭৬৮) অ্যাটমের উপরে আছে মাত্র চারটি বাক্য, আর প্রেমের উপরে আছে পাঁচ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকের একটি সংস্করণে ব্যাপারটা গেছে একেবারে উল্টে। অ্যাটমের উপর আছে একটি বড় প্রবন্ধ, কিন্তু প্রেমের উপরে পৃথক কোন রচনা নেই। অভিযোগ এল সম্পাদকের কাছে: প্রেম কেন বাদ দিলেন? আপনি কি প্রেমে বিশ্বাসী নন? সম্পাদক উত্তর দিলেন, বিশ্বাস করি বৈকি! কিন্তু প্রেম হল ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার, প্রবন্ধ লিখে তাকে বোঝানো যায় না।

বাংলা রেফারেন্স বই সংকলনে প্রথম উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ করেছিলেন ফেলিক্স কেরী। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বৃহৎ। সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করা। অকালমৃত্যুর জন্য তিনি শুধু পরিকল্পিত 'বিদ্যাহারাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে যেতে পেরেছিলেন। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। অবশ্য সাধারণভাবে শারীরবিদ্যার কথাই এতে আছে। এটি 'এন-সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র পঞ্চম সংস্করণের অ্যানাটমি প্রবন্ধটির অনুবাদ। দ্বিতীয় খণ্ডে ছিল আইনশাস্ত্র। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৩৮। ছাপা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৮১৮ থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। আজকের কোষগ্রন্থের আদর্শ এতে যত কমই পাওয়া যাক, এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

ফেলিক্স কেরীর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ সংকলন করা। কিন্তু কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। এ কাজে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৬-৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তেরো খণ্ডে 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র সংকলন করেন। প্রসঙ্গগুলি অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত নয়, বিষয়ানুসারে। এই বিষয়গুলি হল ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম, জীবনী প্রভৃতি। তিনি যে সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা আজকের দিনেও ভেবে দেখবার মতো। নানা গ্রন্থ থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন, কোথাও বা অনুবাদ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভূ-খণ্ডের জ্ঞানবিজ্ঞানের কথাই তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। বইটি ছিল দ্বিভাষিক—ইংরেজী ও বাংলা। লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্য পেয়েই কৃষ্ণ-মোহন তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র একটি শুধু বাংলা সংস্করণও বেরিয়েছিল। এর কোনো কোনো অংশ পৃথকভাবে ছাপিয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংকলন 'ভারতকোষ' (১৮৮০-৯২ খ্রীঃ), সংকলক রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব। আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় এই গ্রন্থে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবতত্ত্ব, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্য, সংগীতশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্প ও দর্শনশাস্ত্র, আর্য-গণের ক্রিয়াকাণ্ড, প্রাচীন ভূগোল, ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত জীবনী ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি অক্ষরানু-ক্রমে বিন্যস্ত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তখনকার দিনে 'ভারতকোষ' একটি মূল্যবান গ্রন্থ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই কোষগ্রন্থের সংকলন শুরু করেছিলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। ছাপার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে দ্রুত চলতে পারে সে জন্য সম্পাদক রাহুতা গ্রামে তাঁদের বাড়ীতে একটি প্রেস স্থাপন করেছিলেন। 'কঙ্কাবতী'র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ প্রধানতঃ লেখার দিকটা দেখতেন। কিন্তু 'অ' বর্ণ সম্পূর্ণ হয়ে কাজ আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সরকারী চাকরি পেয়ে ত্রৈলোক্যনাথ লণ্ডন চলে যান। ফিরে এসেও সরকারের নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তখন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র জন্য শব্দসংগ্রহের কাজ করেন কেউ কেউ তাঁকে অনুরোধ করলেন 'বিশ্বকোষ' পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নিতে। কিন্তু তাঁর বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা সামান্য, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। কি করে এ ভার নেবেন? একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেবী আদেশ করলেন, তুমি ভার নাও, আমি সহায় আছি। নগেন্দ্রনাথ স্বপ্নদত্ত আশ্বাসে নির্ভর করে কাজ শুরু করলেন। রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ তাঁদের স্বত্ব ওঁকে লিখে দিলেন। কোষগ্রন্থ সংকলনের অজানা জগতে তাঁর এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার। অর্থসংগ্রহ, উপযুক্ত লেখকের সন্ধান, বই ছাপানো এবং বিক্রির ব্যবস্থা। বাইশ খণ্ডে বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করে নগেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করল। এই কোষগ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্দেশ এই ভাবে করা হয়েছে: "যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; নৃতত্ত্ব এবং আর্য ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের

বিবরণ, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদিক ও হাকিমী মতে চিকিৎসা-প্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদাভিধান।"

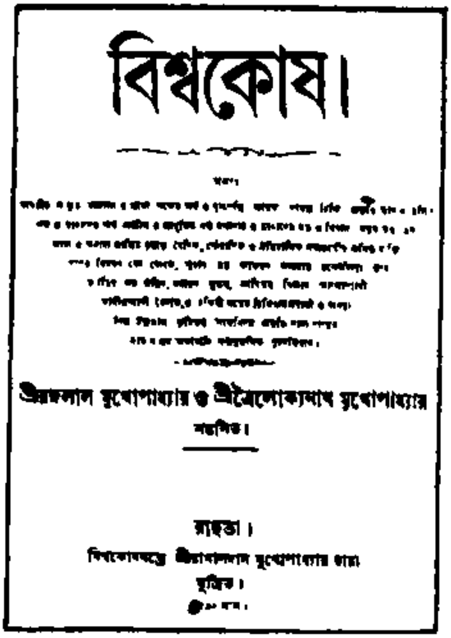

বিশ্বকোষ।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

মুদ্রিত।

সম্পাদক 'বিশ্বকোষ'কে "বৃহদাভিধান" আখ্যা দিয়েছেন এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে। 'ব্রিটানিকার' কয়েকটি সংস্করণেও শুধু শব্দার্থ দেওয়া হত। সে যাই হোক, প্রাচ্যবিদ্যার উপর এই কোষগ্রন্থের আজও তুলনা নেই। মূল বাংলা সংস্করণের উপর ভিত্তি করে নগেন্দ্রনাথ সংকলন করেছিলেন 'হিন্দী বিশ্বকোষ' (২৫ খণ্ড ১৯১৬-১৯৩১ খৃীঃ)। 'হিন্দী বিশ্বকোষে'র কয়েক খণ্ড দেখে গান্ধীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়ে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় লিখেছিলেন: "As I was talking to him I could not but recall Doctor Murray's labours on his great work ...nations are made of such giants."

অনেক উন্নত মানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ নগেন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছিলেন। মাত্র চারটি খণ্ড (১৯৩৬-৩৮) বের করতে পেরেছিলেন। এর পরে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংকলনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

'বিশ্বকোষে'র মতোই একটি কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। তাঁর সংকলিত 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খৃীষ্টাব্দে। অমূল্যচরণের মৃত্যুর জন্য এ কাজ বেশী দূর এগোতে পারেনি।

১৮৯৫ খৃীষ্টাব্দে 'বিশ্বকোষ' সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই পাওয়া গেল রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারত-দর্পণ'। দুঃখের বিষয় সুপরিকল্পিত এই কোষগ্রন্থটি চারখণ্ড পর্যন্ত বেরিয়েই বন্ধ হয়ে যায়। 'বিশ্বকোষে'র মতো এখানেও ভারতবিদ্যার ব্যাখ্যানেই প্রধান লক্ষ্য।

আরেকটি অসম্পূর্ণ কোষগ্রন্থ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানভারতী' (১৯৪০-৪২)। দুই খণ্ডে 'প' পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। প্রসঙ্গগুলির ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরল। সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী করে সংকলিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ভারতকোষ' (১৯৬৪-৭০) আমাদের সর্বশেষ বৃহৎ কোষগ্রন্থ। গ্রন্থটির সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুশীলকুমার দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সুধীবৃন্দ। এখানেও ভারতীয় প্রসঙ্গের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গ নির্বাচনে এবং সম্পাদনার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এটিই বাজারে প্রাপ্তব্য একমাত্র কোষগ্রন্থ। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান এখান থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

অবশ্য আর একটি সাম্প্রতিক মধ্যাকৃতি কোষগ্রন্থ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ থেকে। নাম 'বাংলা বিশ্বকোষ', চার খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৯৭২-৭৪)। এর প্রসঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্র বৃহত্তর, পৃথিবী সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য যথা সম্ভব আহরণ করা হয়েছে। ভারতীয় প্রসঙ্গগুলিকেও উপেক্ষা করা হয়নি। সংকলনের পশ্চাতে সুপরিকল্পনা আছে। বিদেশী প্রসঙ্গগুলি গ্রহণ করা হয়েছে 'কলাম্বিয়া ভাইকিং ডেস্ক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' থেকে।

সম্প্রতি দুটি বিশ্বকোষ সংকলিত হয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলতে চাই না।

বিশ্বকোষের কথা শেষ করেই মনে পড়ে সন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বর্ষপঞ্জী'র কথা। এই বর্ষপঞ্জীটি দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর যাবৎ প্রকাশিত হয়ে আসছে। রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বৎসরের ঘটনাপঞ্জী, রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার, খেলাধুলো, আন্তর্জাতিক নানা খবর, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইত্যাদি নানা তথ্যে সমৃদ্ধ বইটি হাতের কাছে থাকলে কাজের সময় বিশেষ উপকারে লাগবে।

এরপর কয়েকটি বিষয়কোষের উল্লেখ করে বাংলার কোষগ্রন্থ সংকলনের ধারা সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা করা যেতে পারে।

ধর্ম ও দর্শন—বাংলায় হেস্টিংসের 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়াস অ্যান্ড এথিক্‌স্' বা ঐরকম ছোট কোনো কোষগ্রন্থ নেই। শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'ভারতীয় দর্শনকোষ' (২ খণ্ড, ১৯৭৮-৭৯) হিন্দু দর্শনের ছাত্রদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় বই। প্রকাশ করেছেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজ। দু'টি পৌরাণিক অভিধান এখন বাজারে পাওয়া যায়। একটি সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত, অন্যটি সংকলন করেছেন অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই খণ্ডে। বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি কোষগ্রন্থ রচিত হয়েছে। হরিদাস দাসের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ' উল্লেখযোগ্য। সুপ্রকাশ রায় সংকলিত 'পরিভাষাকোষ' (১৯৫৮) একটি নতুন ধরনের বই। সাধারণতঃ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-বিদ্যার কয়েকটি নির্বাচিত ইংরেজী শব্দের বাংলা ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা করা হয়েছে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথম খণ্ডের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। ইংরেজী-বাংলা 'অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক অভিধান' সংকলন করেছেন যতীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৬১)। ছাত্রদের কাজে লাগবে বইটি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সংকলন করেছেন 'বিজ্ঞানের অভিধান'। একই বিষয়ে আর একটি কোষগ্রন্থ সংকলন করেছেন শুভেন্দুকুমার মিত্র। অমরনাথ রায় সংকলিত 'রসায়ন ভারতী' (১৯৭২) একটি রসায়নকোষ। অমলেন্দু সেনের 'জীব অভিধান' প্রাণিজগতের পরিচিতির সহায়ক। চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কিত বহু কোষগ্রন্থ বেরিয়েছিল কয়েক দশক আগে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হরিপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'ডাক্তারী অভিধান' বিগত শতক থেকেই লোকপ্রিয় ছিল। হরলাল চক্রবর্তীর 'আয়ুর্বেদ-ভাষাভিধান' ১৮৮৮ থেকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অনেক সংস্করণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। ডাঃ নির্মল সরকারের 'চিকিৎসা অভিধান' সর্বশেষ সংযোজন। আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণের কোষগ্রন্থ আছে অনেক। গাছপালা নিয়েও কম রেফারেন্স বই নেই। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ সংকলিত 'ভারতীয় বনৌষধি'। অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। শিবকালী ভট্টাচার্যের 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে বাঙালী পাঠক বেশ কয়েকটি কোষগ্রন্থ পেয়েছে। শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের 'যন্ত্রকোষে' (১৮৭৫ খ্রীঃ) দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ কালের পাঠকের চাহিদা মেটে না। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর 'ভারতীয় সংগীতকোষ' অনেক তথ্য পরিবেষণ করতে সক্ষম।

প্রবাদের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি পড়েছে উনবিংশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে নীলরত্ন হালদারের 'বহুদর্শন' বইটি প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে। এতে ইংরেজী, ল্যাটিন, বাংলা, ফারসী, সংস্কৃত, আরবী প্রবাদ সংকলিত হয়েছিল।

রেভারেন্ড লং দু'টি প্রবাদগ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। একটি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দু'-হাজার বাংলা প্রবাদের সংগ্রহ 'প্রবাদমালা'। চার বছর পরে বের হল তাঁর *'Three Thousand Bengali Proverbs and Proverbial Sayings illustrating Native Life and Feeling among Ryots and Women.'*

বাংলা প্রবাদের শ্রেষ্ঠ সংকলন সুশীলকুমার দে সংকলিত 'বাংলা প্রবাদ'। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। আর একটি ভাল সংকলন সত্যরঞ্জন সেনের 'প্রবাদ-রত্নাকর' (১৯৫৭)।

কবিতা রচনায় সাহায্য করবার জন্য কালীমোহন রায়চৌধুরী সংকলন করেছিলেন 'ছন্দবোধ শব্দসাগর'। প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠার 'রাইমিং' অভিধানটি বেরিয়েছিল রংপুর থেকে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। উনিশ শতকে বাঙালীর চিন্তাধারা যে কত বিচিত্র পথে ধাবিত হয়েছিল এটি তারই নিদর্শন।

জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ ও অরুণ সান্যাল সংকলিত 'সাহিত্যকোষ' সাহিত্যবিষয়ক রেফারেন্স বই। এর আয়তনের স্বল্পতা পাঠকের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুধীরচন্দ্র সরকারের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' লেখক ও পাঠকের হাতের কাছে রাখার মতো বই। বিশিষ্টার্থক শব্দ, প্রবাদ, দেবদেবী, স্থান ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন শব্দ, বিদেশী, প্রাদেশিক ও অশিষ্ট শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, পরিভাষা, যুদ্ধোত্তর নতুন শব্দ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের পরিচিতি দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, '১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা'। সম্পাদনা করেছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায়। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বই। এক বছর বেরিয়েই বন্ধ হয়ে যায়। এখন অশোক কুণ্ডুর সম্পাদনায় এগারো বছর যাবৎ বের হচ্ছে 'সাহিত্যিক সর্বপঞ্জী'। সমকালীন সাহিত্য

জগতের সংবাদে প্রতি সংখ্যা সমৃদ্ধ।

বাংলা সাময়িকপত্র নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'বাংলা সাময়িক-পত্র' (২ খণ্ড) অপরিহার্য। ১৮১৮ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সকল সাময়িকপত্রের কালানুক্রমিক তালিকা প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি রেফারেন্স বই সংকলিত হয়েছে। আরও বই, এবং উন্নতমানের বই, পাবার আশা ছিল পাঠকদের। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী' (১৯৬২) রবীন্দ্র-জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাসূচী।

'রবীন্দ্র-সুভাষিত' (১৩৭১) রবীন্দ্র-রচনা থেকে বিশিষ্ট উদ্ধৃতির সংকলন বা বুক অব কোটেশান। নির্বাচিত অংশগুলি প্রসঙ্গের বর্ণানুযায়ী বিন্যস্ত, যেমন, অংশ, আশা, গান, নদী ইত্যাদি। সংকলন করেছেন বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

দুঃখের বিষয় সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্র অভিধান' এবং চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতির 'রবীন্দ্ররচনাকোষ' অসম্পূর্ণ হয়ে আছে।

বিপুল পরিমাণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর হদিস পাবার জন্য সহায়তা প্রয়োজন। এই সহায়তা পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বই ক'টি থেকে।

'রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিধান' দুই খণ্ডে সংকলন করেছেন হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। এটি মূলতঃ রবীন্দ্ররচনার সূচী। কোন কবিতা বা গ্রন্থের নাম অথবা প্রথম লাইন জানা থাকলে রচনাবলীর (বিশ্বভারতী বা পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ) কোন খণ্ডে কোন পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে তা জানা যাবে এ বই থেকে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের উপরে ইংরেজী-বাংলা বইয়ের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী সংকলিত 'রবীন্দ্র নির্দেশিকা' (১৩৬৯) এই ধরনের তথ্য পরিবেশন করেছে। এ ছাড়া নির্মলবাবু দিয়েছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠ, রেকর্ডে রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্রসাহিত্যের চিত্ররূপ ও পেশাদার মঞ্চে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়সূচী। বিশ্বভারতী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীর সম্পূরক খণ্ড হিসাবে এমনি দুটি নির্দেশিকা বেরিয়েছে যাতে পাওয়া যাবে রবীন্দ্র রচনার প্রথম ছত্র ও শিরোনাম সূচী।

অশোক কুণ্ডু আর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকোষ সংকলন করেছেন। সেটি হল 'বঙ্কিম অভিধান' (৩ খণ্ড)। বঙ্কিম সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গগুলির ব্যাখ্যান।

কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যের 'বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ও নামান্তর' সাহিত্য-পাঠকের কাজে লাগবে।

লেখকদের জীবনী-সংগ্রহ পাওয়া যাবে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখকে' (১৯০৪)। ১০০৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থে পুরনো ও সমকালীন লেখকদের জীবনকথা সংকলিত হয়েছে। অনেকগুলি লেখকদের স্বরচিত। শিবরতন মিত্রের 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক'ও উল্লেখযোগ্য উদ্যম।

তাছাড়া সাধারণভাবে জীবনীসংগ্রহ পাওয়া যাবে শশিভূষণ বিদ্যালংকারের সাত খণ্ডের 'জীবনীকোষে' (১৯৩৬-৪০ খ্রীঃ)। বইটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম পাঁচ খণ্ডে ভারতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী; বাকী দুটি খণ্ডে আছে ভারতীয় পৌরাণিক জীবনী।

উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চরিতাভিধান' এক সময় এই বিষয়ের উপর একমাত্র বই ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক—উভয় শ্রেণীর জীবনকথা সন্নিবেশিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালের দু'টি জীবনী সংকলন হল সুধীরচন্দ্র সরকারের 'জীবনী অভিধান' এবং 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'। 'সংসদ চরিতাভিধানে' প্রায় ৩৫০০ বাঙালীর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আছে।

বাংলায় ইতিহাস সম্পর্কিত কোষগ্রন্থ এখন একটিই আছে বলে জানি। সেটি হল যোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস অভিধান' (ভারত) (১৯৭৩)। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্বরূপচন্দ্র দাস 'সন্দেশাবলি' নামে একটি কোষগ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। সংকলক তাঁর গ্রন্থের উপনাম দিয়েছিলেন 'দি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'। এটি যথার্থ নয়। আসলে বইটি ভূগোলকোষ। ভৌগোলিক বিবরণ দিতে গিয়ে কিছু ইতিহাসও দিতে হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে।

কলকাতা, ঢাকা এবং ভারতের অন্যান্য প্রধান স্থানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সে সময়ের পক্ষে এটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।

বাংলা ভাষায় একমাত্র আধুনিক ভূগোলকোষ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'নব জ্ঞান-ভারতী'। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮। সম্প্রতি নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। এখানে ভারতীয় ভৌগোলিক নামের প্রাধান্য হলেও বিদেশী জায়গার কথাও বাদ পড়েনি।

চুঁচুড়া॥ বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম দিগে ও কলিকাতা হইতে ২২ ক্রোশ অন্তরে চুঁচুড়া নামে ওলন্দাজ জাতিদিগের এক বাস স্থান আছে, ইং ১৬৫৫ বাং ১০৬২ শালে ইহারা এ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বাস করত ইং ১৭৬৯ বাং ১১৭৬ শালে রাজকর নিমিত্তে বঙ্গ দেশীয় নবাব কর্তৃক সৈন্যাবৃত হইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ওলন্দাজেরা শাসিত হয় নাই, এবং তৎকালে ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকার ছিল। ১৮৭॥

'সন্দেশবলি'র একটি প্রসঙ্গ

আমাদের বাংলা সব কোষগ্রন্থ উল্লেখের কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছোটদের বই এবং গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে এই গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে, তাই এই আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে শুধু প্রথাসিদ্ধ বা কনভেনশানেল কোষগ্রন্থের কথাই এখানে আলোচ্য। বৃহত্তর অর্থে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রভৃতিও রেফারেন্স বই। কিন্তু আমরা উপরোক্ত সীমিত অর্থে কোষগ্রন্থ বুঝিয়েছি।

কোষগ্রন্থ ও অভিধান সংকলনের বড় বড় কাজগুলি স্বাধীনতার পূর্বেই হয়েছে। এবং হয়েছে প্রধানতঃ একক প্রচেষ্টায়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে স্বাধীনত্তোরকালে অভিধান ও কোষগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এসেছে। হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মালয়ালাম, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় অনেক বৃহদাকার সচিত্র সুমুদ্রিত কোষগ্রন্থ সরকারী আনুকূল্যে সম্পাদিত হয়েছে। নতুন নতুন কোষগ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ বাঙালী পাঠক পায় না।

যাঁরা একক প্রচেষ্টায় অভিধান বা কোষগ্রন্থ সংকলন করেছেন তাঁদের নিষ্ঠা ও উদ্যম অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু কোনো বৃহৎ পরিকল্পনা একক চেষ্টায় সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হতে পারে না। তাছাড়া ব্যক্তির জীবন ও কর্মক্ষমতা সীমিত; বহুদিন যাবৎ একটু একটু করে সংকলিত গ্রন্থের উপযোগিতা দীর্ঘকালব্যাপী হতে পারে, যদি সময়োপযোগী সংশোধন ও সংযোজন করা যায়। এই সংশোধন ও সংযোজন করবার জন্য আজকাল বিদেশে 'কন্টিনিউয়াস এডিটিং' বা নিয়ত সম্পাদনার ব্যবস্থা আছে। সে জন্যই ব্রিটানিকার উপযোগিতা এবং জনপ্রিয়তা দুই শতাব্দী যাবৎ বেড়েই চলেছে। আর আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন অনেক ভাল কাজ পঁচিশ-ত্রিশ বছরে হারিয়ে যায়। নিয়ত সম্পাদনার ব্যবস্থা না হলে বাংলা অভিধান ও কোষগ্রন্থের মান উন্নত হওয়া সম্ভব নয়।

পাঠপঞ্জী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কোষগ্রন্থের কথা, দ্র 'সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার', ১৩৭০
—— —— । নগেন্দ্রনাথ বসু, দ্র 'শতবর্ষের আলোয়' অসীমা মৈত্র সম্পাদিত, ১৯৬৯
দীনেশচন্দ্র সেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; পরিশিষ্ট লং সাহেবের ক্যাটালগের অভিধান অনুচ্ছেদ
বাংলা কোষগ্রন্থের কথা, দ্র 'সাহিত্যের খবর', মাঘ-ফাল্গুন ১৩৬৭; জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র, ১৩৬৮
বাংলা ব্যকরণ ও অভিধানচর্চার এক অধ্যায়, 'প্রবন্ধ পত্রিকা', মাঘ ১৩৬৮
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়, কলিকাতা ১৯৭০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অভিধান দ্র 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৩৭

বাংলা বইয়ের ছবি

১৮১৬-১৯১৬

কমল সরকার

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা হরফ সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সচিত্র বাংলা গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ কিন্তু আরও অনেক পরে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বাংলা হরফ রচনার মাধ্যমে গ্রন্থ প্রকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় ঊনবিংশ শতকের সূচনায় যখন নানা লেখক ও মুদ্রাকর গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন তখনই অনুভূত হয় সচিত্র গ্রন্থের প্রয়োজন। হুগলিতে প্রথম বাংলা হরফ সম্বলিত হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের প্রায় চার দশক পরে কলকাতা থেকে বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

বাংলা ভাষায় সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশের পথিকৃৎ সাংবাদিক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ফেরিস অ্যান্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত ৩১৮ পৃষ্ঠার ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের যে 'অন্নদামঙ্গলে'র সংস্করণটি গঙ্গাকিশোর প্রকাশ করেন সেটিই বাংলা ভাষার এ পর্যন্ত জ্ঞাত প্রথম সচিত্র গ্রন্থ। বাংলার শিল্পীদের চিত্রাঙ্কিত প্রথম গ্রন্থ রূপেও অভিহিত হতে পারে গঙ্গাকিশোর-প্রকাশিত এই 'অন্নদামঙ্গল'। গ্রন্থটি ছ'টি এনগ্রেভিং চিত্রে (ধাতু ও কাঠখোদাই) শোভিত হলেও মাত্র দুটি চিত্রই স্বাক্ষরিত। এ দুটি ধাতুখোদাই চিত্রের নিচে খোদিত আছে: Engraved by Ramchaund Roy. সম্ভবতঃ রামচাঁদের সঙ্গে অন্য কোনো শিল্পী খোদাই চিত্রগুলি রচনা করেন। কিংবা বাকি চারটি চিত্র কাঠখোদাই হওয়ায় শিল্পী রামচাঁদের স্বাক্ষর বর্জিত। গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে।

গঙ্গাকিশোরের 'অন্নদামঙ্গল' বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র গ্রন্থ হলেও বাংলার ভৌগোলিক সীমানা থেকে প্রকাশিত প্রথম সচিত্র গ্রন্থ নয় কিন্তু। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে সচিত্র প্রকাশনার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এসিয়াটিক সোসাইটি।

এসিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-এর প্রথম খণ্ডের (১৭৮৮) নবম অধ্যায়ে স্যর উইলিয়াম জোন্স রচিত 'অন দি গডস অব গ্রীস, ইটালি অ্যান্ড ইণ্ডিয়া' প্রবন্ধে গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, কার্তিক, কৃষ্ণ, সূর্য, রাম, নারদ প্রমুখ দেবতার যে চোদ্দটি পূর্ণপৃষ্ঠা ধাতুখোদাই চিত্র মুদ্রিত হয় সেগুলিই এদেশে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম চিত্রের নিদর্শন। 'এসিয়াটিক রিসার্চেস'-এর একই খণ্ডে ফ্রান্সিস ফোক লিখিত এক চিঠি (ত্রয়োদশ অধ্যায়) এবং ম্যাথু লেসলি প্রেরিত অপর এক বিবরণের (বিংশ অধ্যায়) সঙ্গে যথাক্রমে বীণা-

বাদক ও বীণা এবং প্যাঙ্গোলিনের (বজ্রকীট) আরও তিনটি ধাতুখোদাই চিত্র মুদ্রিত হয়।

২

গঙ্গাকিশোরের 'অন্নদামঙ্গলের' মাধ্যমে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা গ্রন্থকে সচিত্র করার যে সূচনা তার পরিণতি-স্বরূপ প্রকাশিত হয় আরও নানা চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থ। বাংলা মুদ্রণের আদিপর্বের এ গ্রন্থগুলির মধ্যে ধর্মীয় উপাখ্যান, গীতা, রাজকাহিনী, কাব্য ও সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থই প্রধান। গ্রন্থগুলির সমস্তই দেশীয় শিল্পীদের ধাতু ও কাঠখোদাই চিত্রে শোভিত। অনুমান, বাংলার এ শিল্পীরা বংশপরম্পরায় অর্জন করেছিলেন ধাতু ও কাঠখোদাইয়ের কায়দা-কৌশল।

সুন্দরের বর্ধমান প্রাসাদে প্রবেশ: প্রথম সচিত্র বাংলা গ্রন্থ 'অন্নদামঙ্গল' থেকে

কারণ, বাংলার আদিপর্বের গ্রন্থচিত্রণ শিল্পীদের অনেকেই ছিলেন স্বর্ণকার ও কর্মকার পরিবার-ভুক্ত। জীবিকার প্রয়োজনে খোদাই শিল্পে পারদর্শী হবার তাগিদেই তাঁদের আয়ত্ত করতে হয় ধাতুখোদাই। ধাতুখোদাইয়ের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কাঠখোদাই সহজ। স্বভাবতঃই কাঠখোদাই শিল্পেও তাঁরা মনোযোগী হন অধিকতর সহজ শিল্পকর্মের আকর্ষণে।

আবার ইউরোপীয়দের কাছেও অর্জিত হতে পারে বাঙালী শিল্পীদের খোদাই শিল্পের জ্ঞান। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামচাঁদ রায়ের সময়ে বাংলার যে শিল্পীরা খোদাই শিল্পে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কাশীনাথ মিস্ত্রি। 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'র (১৮১৭) উদ্যোগে প্রকাশিত *Joyce's Dialogues on Mechanics and Astronomy* গ্রন্থে কাশীনাথের ধাতুখোদাই চিত্র যুক্ত হয়। স্কুল বুক সোসাইটির জনৈক সদস্যের কাছে কাশীনাথ মিস্ত্রি এবং আরও কয়েকজন ভারতীয় তামার পাত খোদাইয়ের কায়দাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

রামচাঁদ ও কাশীনাথের সময়ে জোড়াসাঁকোর হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ও খোদাই চিত্রের মাধ্যমে গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এ'দের সমসাময়িককালে খোদাই চিত্রের অন্যতম কৃতি-পুরুষ জে. লসন। মিশনারি সম্প্রদায়ভুক্ত রেভারেন্ড লসনের স্বহস্ত-রচিত খোদাইয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে 'পশ্বাবলি' মাসিক গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৮২২)। প্রতি মাসে প্রকাশিত একটি জন্তুর খোদাই চিত্র সম্বলিত এ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট প্রাণীর আলোচনা থাকত। প্রকাশ, লসনের কাছেও কোনো কোনো ভারতীয় মিস্ত্রি খোদাই শিল্প শিক্ষা করেন।

ধাতুখোদাই এদেশে নবাবী আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। মুখ্যতঃ জমিজমার অর্পণপত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং দরবারের সিলমোহর ধাতুখোদাইয়ের মাধ্যমে রচনা করার রীতি ছিল। ধাতুখোদাইয়ে তামার পাতেরই ছিল অগ্রাধিকার।

পরিধানের উপযোগী বস্ত্রমুদ্রণের উদ্দেশ্যে কাঠখোদাইয়ের প্রচলন এদেশে। বস্ত্রমুদ্রণের ছাপ তোলার জন্যে তেঁতুলকাঠের ওপরই রচিত হত খোদাই নকশা। সম্ভবতঃ, বস্ত্রাঙ্কনের উপযোগী খোদাই থেকে শিল্পীদের কাঠখোদাই চিত্র রচনার প্রেরণা লাভ।

কাঠখোদাইয়ের জন্যে নরম ও আঁশবিহীন কাঠের প্রয়োজন। চিত্রকলার রূপারোপের উদ্দেশ্যে খোদাইয়ের জন্যে নানারকম কাঠের ব্যবহার ছিল এদেশে। এক সময়ে তেঁতুল, কুল, পাইন এবং বক্স-উড খোদাই করে চিত্রের রূপ দানের রীতি ছিল। কিন্তু এই কাঠগুলির ওপর সূক্ষ্ম কাজের রূপায়ণ সাধারণতঃ অসম্ভব। সূক্ষ্ম খোদাইকাজের উপযুক্ত গাম্ভারি কাঠ। দারুভাস্কর্যেও গাম্ভারি কাঠের প্রাধান্য প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে এদেশে। 'বুলি' নামের নরুন জাতীয় এক রকম ছোট ইস্পাত শলাকার (Burin) সাহায্যে ধাতু ও কাঠখোদাই করা হয়। কাঠখোদাইয়ের জন্যে পাঁচ-ছয় রকমের বুলির প্রয়োজন। সাধারণতঃ কাঠকয়লা, চক বা পেন্সিল দিয়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ পুরু কাষ্ঠখণ্ডের ওপর চিত্রাঙ্কনের পর বুলির সাহায্যে খোদাই করে চিত্রের রূপদান করা হয়। অপরদিকে কোনো অঙ্কিত চিত্রকে কাঠখোদাইয়ের মাধ্যমে রূপান্তরিত করার সময়ে সে চিত্রটিকে আরশির সামনে রেখে তার প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির অনুসরণে কাঠখোদাই করা হয়। অতঃপর রোলারের সাহায্যে খোদিত কাষ্ঠখণ্ডে কালির প্রলেপ দিয়ে মুদ্রাযন্ত্রে অথবা কাষ্ঠখণ্ডের ওপর কাগজ রেখে ধীরে ধীরে ঘষে ঘষে কাগজে খোদিত কাষ্ঠখণ্ডের ছাপ তোলা হয়।

মুদ্রণকলার যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাঠখোদাইয়ের মাধ্যমে চিত্রকলার রূপারোপ এখন অবলুপ্ত। একমাত্র চারুকলা শিক্ষায়তনে গ্র্যাফিক আর্টের এই কলাকৌশলের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

৩

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত 'সঙ্গীততরঙ্গ' (১৮১৮) উল্লেখযোগ্য সচিত্র গ্রন্থ। রাধামোহন সেন দাস রচিত এ গ্রন্থের ছয়টি ধাতুখোদাই চিত্রের শিল্পী 'অন্নদামঙ্গলে'র রামচাঁদ রায়।

'গৌরীবিলাস' গ্রন্থের একটি অলঙ্করণ

সমসাময়িককালে প্রকাশিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত 'গৌরীবিলাস' (১৮২৪) এবং দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১৮২৪) গ্রন্থ দুটিও চিত্রাঙ্কিত। রামচাঁদ রায়ের সমসাময়িক বিশ্বম্ভর আচার্য গ্রন্থদুটির শিল্পী। 'গৌরীবিলাসে'র দুটি কাঠ ও চারটি ধাতুখোদাই চিত্রের মধ্যে বিশ্বম্ভরের 'দশভুজা'র চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র 'ভগীরথ গঙ্গা' চিত্রে তিনি গঙ্গাবতরণের দৃশ্য চিত্রিত করেন।

বিশ্বম্ভরের ধাতুখোদাইয়ের নিদর্শন আছে সচিত্র গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসনে' (১৮২৪)। কলকাতার বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত এ গ্রন্থে বিশ্বম্ভর-খোদিত 'শ্রীযুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা' এবং 'বত্রিশ সিংহাসনে'র দুটি চিত্র আছে।

উনিশ শতকের কুড়ির দশকে চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থাদির অন্যতম সাধুভাষা সংগ্রহ 'আনন্দলহরী' (১৮২৪)। হরিনাভির রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার রচিত এ গ্রন্থে রূপচাঁদ আচার্য খোদিত 'শ্রীরাজরাজেশ্বরী'র একটি ধাতুচিত্র আছে।

এই সময়ে প্রকাশিত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন কর্তৃক ভাষাপদ্যে রচিত 'ভগবতীগীতা' (১৮২৪) এবং চিরঞ্জীব শর্মার অনুসরণে রাধামোহন সেন দাস কৃত পদ্যানুবাদ 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী'ও

(১৮২৫) সচিত্র। এ দুটি গ্রন্থে যথাক্রমে 'নারদ ও শিব' এবং 'বিক্রম সেনের রাজসভার শাস্ত্রবিচার' নামের দুটি ধাতুচিত্র আছে। 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী'র শিল্পী মাধবচন্দ্র দাস।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। শিয়ালদহের পীতাম্বর সেনের ছাপাখানায় মুদ্রিত এ গ্রন্থে রূপচাঁদ আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, বীরচন্দ্র দত্ত ও রামসাগর চক্রবর্তী প্রমুখের ১০টি ধাতুখোদাই চিত্র আছে।

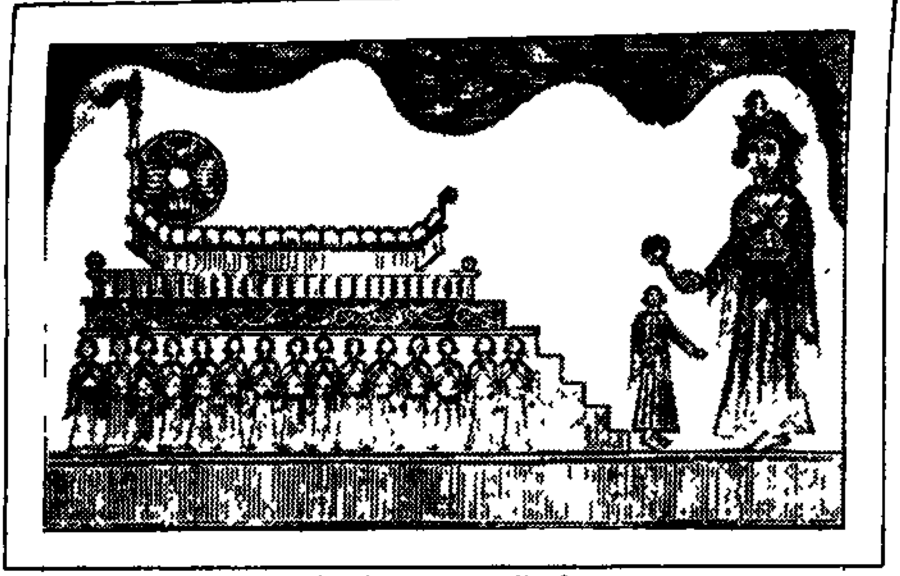

'বত্রিশ সিংহাসনে'র একটি ছবি

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যতম কৃতি খোদাইশিল্পী রামধন স্বর্ণকার। রামধনই বাংলা ভাষার সর্বাধিক ধাতুচিত্রে শোভিত গ্রন্থের শিল্পী। তাঁর সর্বাধিক ধাতুচিত্র সম্বলিত গ্রন্থের নাম 'হরিমঙ্গল সঙ্গীত'। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের আদেশে দেওয়ান পরাণচন্দ্র রচিত এ গ্রন্থটিতে রামধন স্বর্ণকারের ৭১টি ধাতুখোদাই চিত্র যুক্ত হয়। বিগত শতকের ত্রিশের দশকে গ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ।

ধাতুখোদাইয়ের মাধ্যমে মানুষের প্রতিকৃতিও রচনা করেছেন রামধন। তাঁর খোদিত ছাত্রবন্ধু ডেভিড হেয়ারের এক প্রতিকৃতি চিত্র সংগৃহীত আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। ডেভিড হেয়ারের সমকালীন রামধনের এই ধাতুখোদাই চিত্রটি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের সংগ্রহ থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্যে গৃহীত হয় (১৯০৪)।

বিগত শতকের ত্রিশ থেকে ষাটের দশকে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থে খোদাই চিত্রেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'কালী কৈবল্যদায়িনী' (১৮৩৬), 'ভগবদ্গীতা' (১৮৩৬) এবং 'হরপার্বতীমঙ্গলের' (১৮৫১) নাম করা যেতে পারে। এমনকি পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'পঞ্চদশী' (১৮৬২) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২) গ্রন্থেও এ প্রথার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে হুতোমের 'হুতোম প্যাঁচা আশমানে বসে নকশা উড়োচ্চেন' আর 'ঠনঠনের হঠাৎ অবতার' চিত্র দুটির মুদ্রণের প্রযুক্তি এক হলেও স্বাদে কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকৃতি। অর্থাৎ বাংলা গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনের ইতিহাসে হুতোমের গ্রন্থেই বোধহয় ব্যঙ্গচিত্রধর্মী চিত্রের প্রথম সংযোজন।

বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনের আদিপর্বে ধর্মীয় উপাখ্যান, রাজকাহিনী ও সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও আকৃষ্ট হন কোনো কোনো গ্রন্থকার। গতানুগতিক বিষয় থেকে অভিনব বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবার যে দৃষ্টান্ত রেভারেন্ড লসনের 'পশ্বাবলি'র মাধ্যমে প্রচলিত হয় নিঃসন্দেহে তা ছিল প্রগতিশীল এক পদক্ষেপ। শিক্ষণীয় এবং অভিনব,— এ কারণেই লসনের সচিত্র 'পশ্বাবলি'র একাধিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও প্রকাশিত হয়েছিল সচিত্র এ গ্রন্থটির এক সংস্করণ (১৮৫২)।

লসনের পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র জেমস প্রিন্সেপের পরামর্শে মোট ৬৬০ পৃষ্ঠায় দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) যে অপর এক 'পশ্বাবলি' রচনা করেন সেটিও ছিল নানা জীব-জন্তুর খোদিত চিত্রে চিত্রাঙ্কিত (১৮৩৪)। অজ্ঞাত শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত ও

পক্ষির বিবরণ।

ORNITHOLOGY.

No. I.

BY

RAM CHUNDER MITTER.

CALCUTTA:
[illegible]
[illegible]
[illegible]

খোদিত চিত্রে সমৃদ্ধ বহু খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন যথাক্রমে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও এ গ্রন্থটির কয়েকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।

জীব-জন্তু সম্পর্কিত গ্রন্থরচয়িতা রামচন্দ্র মিত্রই বোধহয় প্রথম বাঙ্গালী গ্রন্থকার—যিনি পক্ষীতত্ত্ব সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ পৃষ্ঠার তিনি যে 'পক্ষির বিবরণ' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন সেটিও ছিল কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত। বাজপাখি, ঈগল, শকুন প্রভৃতি বৃহৎ আকারের আরও বিভিন্ন শিকারী পাখির ইতিবৃত্ত এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত দু' আনা দামের এ গ্রন্থটির সম্ভবতঃ আর কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।[১]

এদেশের মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে শ্রীরামপুরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রন্থচিত্রণকলার আলোচনা প্রসঙ্গে তাই বিগত শতকের ত্রিশের দশকেই ফিরে যেতে হয় শ্রীরামপুরে। কারণ, স্বনামধন্য পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা মনোহর ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার (১৮০৫-১৮৫০) "দুইজন অক্ষর ও প্রতিবিম্ব প্রভৃতি ক্ষোদনের বিদ্যাতে সুপটু" ছিলেন।[২] মনোহর প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রোদয় যন্ত্র' থেকে তিনি স্বয়ং ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র 'বিশিষ্টরূপে পঞ্জিকা ও ইঙ্গরাজী বাঙ্গলা ও দেবনাগর অক্ষরে নানা প্রকার পুস্তক ও ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[৩]

'রেলগাড়ি'র কাঠখোদাই চিত্র: 'পঞ্জিকা' (চন্দ্রোদয় প্রেস)

চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত কৃষ্ণচন্দ্রের 'নূতন পঞ্জিকা'ও ছিল চিত্রাঙ্কিত। "কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের কৃত" বহু কাঠখোদাই চিত্রে শোভিত তাঁর 'নূতন পঞ্জিকা'র জনপ্রিয়তায় প্রলুব্ধ হয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'নূতন পঞ্জিকা' নামের আর এক পাঁজি (১২৫৪/১৮৪৭-৪৮)। কলকাতার মিশন রো-র সেন্ডার্স কোন্স অ্যান্ড কোম্পানীর প্রকাশিত নকল 'নূতন পঞ্জিকা'টির প্রথম বর্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের কাঠখোদাই চিত্রের অনুসরণে রচিত হয়েছিল "এতদ্দেশীয় ছবি সকল"।[৪]

ধাতু ও কাঠখোদাই চিত্রের সঙ্গে উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের আগেই বাংলা গ্রন্থচিত্রণে লিথোগ্রাফির ব্যবহার শুরু হয়। ইউরোপীয় শিল্পীদের প্রচেষ্টায় এদেশের ইংরেজী সাময়িকপত্র ও গ্রন্থে লিথোগ্রাফ প্রকাশের সূচনা হলেও বাংলা গ্রন্থে লিথো চিত্রের প্রচলন সঠিক কোন্ সময়ে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

লিথো চিত্র সম্বলিত বাংলা গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ফিরদৌসীর 'সাহনামা'র এক বাংলা সংস্করণের। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫৪) "ফির দৌছি তুছির কৃত" মুদ্রিত এই 'সাহনামা'টির অনুবাদক বিশ্বেশ্বর দত্ত। "শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত কর্তৃক বঙ্গভাষায় ভাষিত হইয়া শ্রীগোবর্ধন ভট্টাচার্য কর্তৃত সোধিত হইয়া কলিকাতা সিন্ধুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত" হয় এই বাংলা 'সাহনামা'টি।

এই 'সাহনামা'তেই আছে গ্রন্থের দ্বিগুণ আকারের গ্রন্থকারের একটি লিথো প্রতিকৃতি চিত্র। অনুবাদক বিশ্বেশ্বর দত্তের এই চিত্রটিতে শিল্পীর নাম খোদিত থাকলেও তা অস্পষ্ট। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় চিত্রটি অঙ্কিত হয়। সম্ভবতঃ বিদেশীর আঁকা এই লিথো চিত্রটি গ্রন্থে যুক্ত করার এক কারণও ছিল। চিত্রটি গ্রন্থে যুক্ত করে প্রকাশক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এ সংস্করণটিই বিশ্বেশ্বর অনূদিত আসল গ্রন্থ, অপরগুলি নকল। তাই 'সাহনামা'র আখ্যাপত্রে

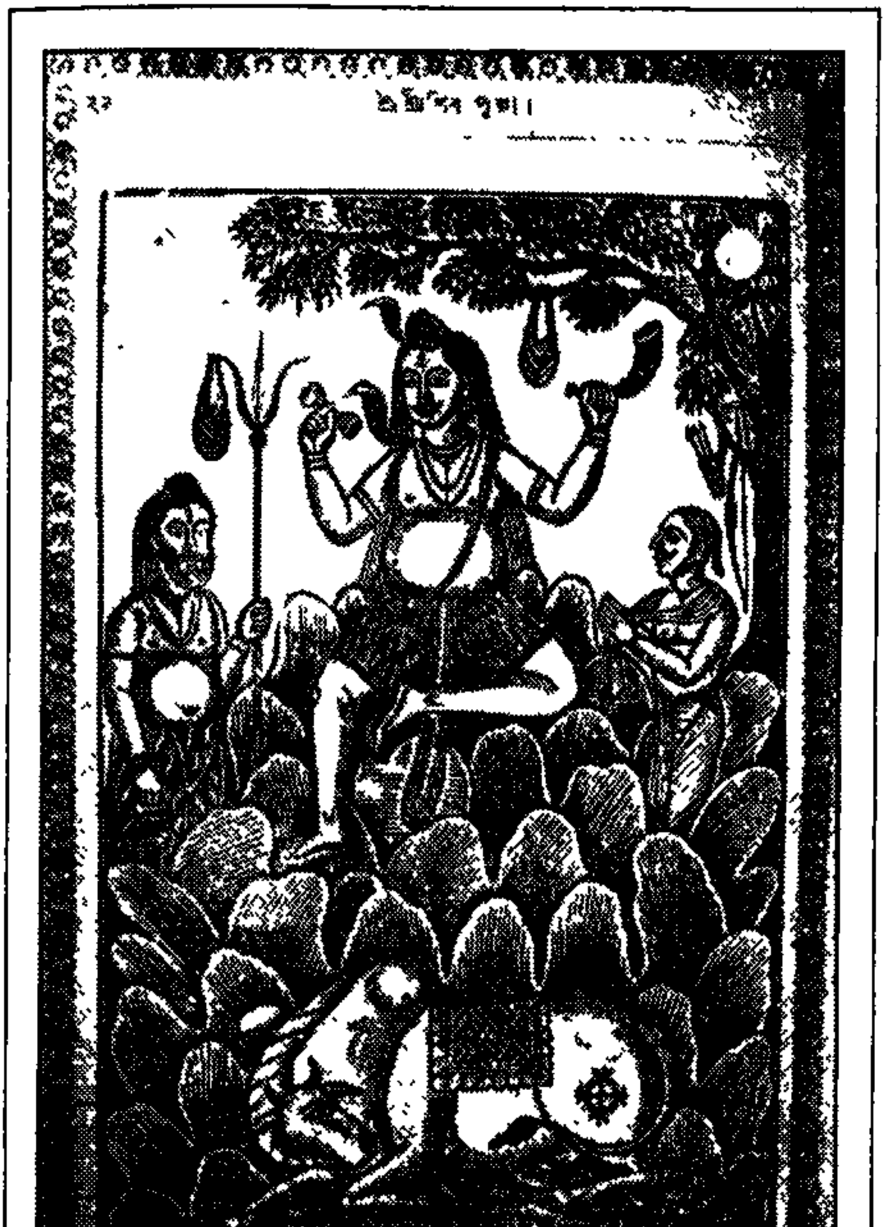

লেপ্তার্‌স কোন্‌স অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত 'নূতন পঞ্জিকা' থেকে

মুদ্রিত হয় "শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্তের মোহর ও প্রতিমূর্তি ব্যতিরেকে চোরা পুস্তক জানিবেন।" গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে।

বাংলা ভাষার লিথো চিত্র সম্বলিত অন্যতম উল্লেখ্য গ্রন্থ 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫)। শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র বিরচিত এ গ্রন্থটিতে যে তেরোটি চিত্র মুক্ত হয় তার প্রধান আকর্ষণ হাওড়া স্টেশনের চিত্র। এদেশে রেলপথ স্থাপিত হবার পর হাওড়া স্টেশনের আকৃতি কেমন ছিল তার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে 'হাওড়ার ইস্টেশান' চিত্রে। মন্দির মসজিদ গির্জা পুল পাহাড় আর কলেজের চিত্রে সমৃদ্ধ এ গ্রন্থের সব কটি চিত্রই লিথো প্রথায় পরিস্ফুট। কিন্তু শিল্পী বা লিথোগ্রাফারের নামের উল্লেখ নেই এ গ্রন্থে। সম্ভবতঃ এ লিথোগ্রাফগুলিতেও ছিল বিদেশীর হাত। লিথোগ্রাফ সে সময়ে দুর্লভ হলেও বাংলা গ্রন্থে যে লিথোগ্রাফ প্রক্রিয়ায় চিত্রকলার রূপারোপের প্রয়োগ শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্রে মুদ্রিত এ গ্রন্থের রঙিন 'কলিকাতাবধি রানীগঞ্জ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মানচিত্র'টি গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক অঙ্কিত।

৪

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে গ্রন্থচিত্রণকলায় অ্যাকাডেমিক কলাকৌশল অনুশীলনকারী শিল্পীদের ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার শুরু হয়। অর্থাৎ ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের ছাত্রদের দ্বারা গ্রন্থ চিত্রাংকনের প্রচলন এই সময়েই এবং কাঠখোদাই তখনও ছিল গ্রন্থচিত্রণের মুখ্য মাধ্যম। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী শিল্পীদের লিথোগ্রাফির কায়দাকৌশল অর্জনের সূত্রপাত হয় এই পঞ্চাশের দশকেই।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলার এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ চারুকলা বিদ্যালয়েই শুরু হয়েছিল অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কাঠখোদাই, এচিং ও লিথোগ্রাফির অনুশীলন। স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের শিক্ষক টমাস ফ্রান্সিস ফাওলারের অধীনে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রের কাঠখোদাই অনুশীলনের সূচনা এবং এই ছাত্রদের সম্মিলিত নৈপুণ্যে চিত্রাঙ্কিত হয় একাধিক ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র। স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে রচিত কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত হয় ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের *On Flowers and Flower Gardens* (১৮৫৫) গ্রন্থটি। এ সময় শিক্ষা-অধিকর্তার নির্দেশে যে ইংরেজী 'ঈসপস্ ফেবল্‌স্' প্রকাশিত হয় তার কাঠখোদাই চিত্রগুলির নেপথ্যেও ছিলেন ফাওলারের ছাত্রেরা।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টে শুরু হয়েছিল বাংলার ছাত্রদের লিথো-গ্রাফ অনুশীলন। এ বিষয়ে স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের কোনো ছাত্রের নাম এককভাবে উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও যুগ্মভাবে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে এবং এ'দের সকলেই ছিলেন লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় পারদর্শী। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতার ১, জিগজাগ লেনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে রয়্যাল লিথোগ্রাফিক প্রেস তার নেপথ্যে ছিলেন স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রি-য়াল আর্টের দিননাথ দাস, নবীনচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দাস ও তিনকড়ি মজুমদার প্রমুখ চারজন ছাত্র। সিপাহী বিদ্রোহের যুগে প্রতিষ্ঠিত এ'দের রয়্যাল লিথোগ্রাফিক প্রেসই বাঙ্গালী শিল্পী-দের প্রথম আর্ট স্টুডিও। এনগ্রেভিং ও লিথোগ্রাফির সঙ্গে পেন্টিং ও অন্যান্য বিষয়ে কাজ করার ব্যবস্থা ছিল এই স্টুডিওতে।[৮]

গ্রন্থচিত্রণে এ'দের দান কতটা তা সুস্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় এ'দের রচিত লিথো চিত্র সেযুগে প্রকাশের মাধ্যমে বিক্রয়ের রীতি ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত রয়্যাল লিথোগ্রাফিক প্রেসে রচিত রাজা রামমোহন রায়ের এক লিথো প্রতিকৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহনের এ লিথোগ্রাফটির রচয়িতা নবীনচন্দ্র ঘোষ। তদানীন্তন প্রকাশক আর. এম. বোস অ্যান্ড কোম্পানী রামমোহনের এ লিথো চিত্রের বিক্রেতা ছিলেন (১৮৫৮)।

কলকাতায় বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর লিথোগ্রাফ রচনায় প্রথম সাফল্য লাভ করেন দুজন ফরাসী শিল্পী। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর 'ক্যালকাটা জার্নাল' সংবাদপত্রের 'লিথোগ্রাফি ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে ঐ বছরে বেল্‌নস এবং দ্য স্যাভিগ্রাকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় লিথোগ্রাফ রচনায় সাফল্যের বিষয় পরিবেশিত হয়।

ঐ বছরের অক্টোবর মাসে দ্য স্যাভিগ্রাক দমদমের মিলিটারি মেসে প্রতিষ্ঠার জন্যে কোম্পানীর গোলন্দাজ বাহিনীর জেনারেল হার্ডউইক ও অন্যান্য অফিসারদের নির্দেশে জর্জ চিনারি অঙ্কিত মার্কুইস অব হেস্টিংসের তৈলচিত্রের অনুসরণে যে চিত্রাঙ্কন করেন তারও লিথোগ্রাফ এক সোনার মোহর দামে বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্য স্যাভিগ্রাক লিথোগ্রাফির মাধ্যমে রাজা রামমোহনের এক প্রতিকৃতিও প্রকাশ করেন ঐ সময়ে।[৯]

এই দুই শিল্পীর সমসাময়িক জেমস রিন্ড এবং জি. উড কলকাতায় লিথোগ্রাফি সম্পর্কিত গবেষণার জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রিন্ড ও উড 'এসিয়াটিক লিথোগ্রাফিক প্রেস' নামে এক স্টুডিও স্থাপন করেন। রিন্ড এবং এক প্রথিতযশা ফরাসী শিল্পীর কাছে লিথোগ্রাফির জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয় জনৈক টি. ব্ল্যাকের। অচিরে টি. ব্ল্যাকই এসিয়াটিক লিথোগ্রাফিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী হন এবং কলকাতার (হেয়ার স্ট্রীট) অগ্রণী লিথোগ্রাফার হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। ২৪ হেয়ার স্ট্রীটে ব্ল্যাক সাহেবের বসবাস ছিল। উনিশ শতকের বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয় শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রকে তিনি লিথোগ্রাফির মাধ্যমে মুদ্রিত ও প্রচার করেন। টি. ব্ল্যাক প্রকাশিত একাধিক লিথোগ্রাফিক চিত্র ও মানচিত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত আছে।[৭]

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়দের উদ্যোগেই এদেশে লিথোগ্রাফির প্রচলন। বিগত শতকের ইংরেজ সিভিলিয়ান এবং প্রথিতযশা শৌখীন শিল্পী স্যার চার্লস ডি'অয়লি (১৭৮১-১৮৪৫) নিজেও ছিলেন এক অগ্রণী লিথোগ্রাফার। কুড়ির দশকে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রকাশের জন্য তাঁর কর্মস্থল পাটনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিহার লিথোগ্রাফিক প্রেস। কাজে সহায়তার জন্যে জয়রাম দাস নামে পাটনা পেন্টার গোষ্ঠীর এক শিল্পীকেও তিনি লিথোগ্রাফির কাজে সহযোগী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।[৮]

কুড়ির দশকেই 'সমাচার দর্পণে' শুড়া লিথোগ্রাফিক প্রেস নামে অপর এক প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৮২৯)। মানুষ ও পশুর ১৫টি চিত্র সম্বলিত চার টাকা দামের এক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিল এই প্রেস।[৯]

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে কলকাতায় ইউরোপীয়দের উদ্যোগে নানা লিথোগ্রাফিক প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। চল্লিশের দশকে কলকাতায় বসবাসকারী শিল্পী কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্টের (১৮১৩-১৮৮০) একাধিক চিত্রগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল লিথোগ্রাফির মাধ্যমে।

৫

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার জনৈক জার্মান নাট্যকার আলয়জ সেনেফেল্ডার (Aloyz Senefelder) লিথোগ্রাফি আবিষ্কার করেন। এ পদ্ধতিতে প্রতিচ্ছবি গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিউনিকে তাঁর প্রথম কাজ শুরু। উনিশ শতকের সূচনায় সেনেফেল্ডার ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে ইংলণ্ডে লিথোগ্রাফির প্রচলন এবং এই পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রণ শুরু করার জন্যে ইংলণ্ডে পেটেন্ট লাভ করেন (১৮০১)।

খোদাইচিত্রের সঙ্গে লিথোগ্রাফিক চিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। খোদাইচিত্র ধাতু অথবা কাঠ খোদাই করে রূপ দেওয়া হয়; কিন্তু লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে খোদাইয়ের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এক খণ্ড পাথরের ওপর চিত্রের ছাপ তুলে তা মুদ্রিত হয়। সেজন্য লিথোগ্রাফিকে 'সারফেস প্রিন্টিং' বলা হয়। গ্রীকভাষায় পাথরকে 'লিথো' বলে এবং 'গ্রাফ' শব্দের অর্থ লেখা বা ছবি আঁকা। তাই লিথোগ্রাফ কথার অর্থ পাথরের ছবি। লিথোগ্রাফ দুভাবে মুদ্রিত হতে পারে। যথা, সাদা-কালো অথবা রঙিন লিথোগ্রাফ। সাদা-কালো লিথোগ্রাফকে বলা হয় 'মনো-লিথো'; রঙিন লিথোগ্রাফের নাম 'ক্রোমো-লিথোগ্রাফ'।

লিথোগ্রাফ রচনার নানা পদ্ধতি আছে। এখানে কেবল শিল্পীদের লিথোগ্রাফের বিষয়ই আলোচিত হবে। সাধারণতঃ শিল্পী অঙ্কিত চিত্রের রূপারোপের জন্য 'লাইম স্টোনে'র প্রয়োজন হয়। উনিশ শতকে ব্যাভেরিয়া থেকেই আমদানি করা হত এই চুনাপাথর। চুনাপাথরের প্রধান গুণ এটি জল এবং তেল দুটি দ্রব্যকেই ধরে রাখতে পারে। তাছাড়া, চুনাপাথর রেখাঙ্কন বা তুলি দিয়ে চিত্রাঙ্কনের পক্ষে উপযুক্ত। প্রথমে এক খণ্ড পালিশ করার পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে ছবি আঁকার পাথরটিকে মসৃণ করে নিয়ে তার ওপর ছবি আঁকতে হয়। কিন্তু ছবিতে 'টোনে'র তারতম্য ঘটাবার জন্যে মসৃণ পাথরের পরিবর্তে 'গ্রেন'ওয়ালা পাথর (দানাদার) ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ চুনাপাথরকে এক টুকরা ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে মসৃণ করে নিতে হয়। তারপর ঐ পাথরের ওপর কিছু ছাঁকা বালি ছড়িয়ে জল ছিটিয়ে এক টুকরো চুনাপাথরের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে 'গ্রেন'ওয়ালা পাথর তৈরি করতে হয়।

'গ্রেন'ওয়ালা পাথরে কাজ শুরুর আগে ভাল করে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। অতঃপর শিল্পী লিথোগ্রাফির 'চক' (লিথোগ্রাফির জন্যে চর্বিজাতীয় উপাদানে তৈরি) দিয়ে শুকনো পাথরটির ওপর চিত্রাঙ্কন করেন। চিত্রাঙ্কনের পরে ফ্রেঞ্চ পাউডার ছড়াতে হবে পাথরটির ওপর। শেষে অ্যারাবিক গাম আর নাইট্রিক এসিড মিশ্রিত হাল্কা এক সলিউশানের সাহায্যে অঙ্কিত চিত্রটিকে পাথরের মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে ('এচ')। সবশেষে চিত্রাঙ্কিত পাথরটিকে আবার শুকিয়ে নিতে হয়।

নাইট্রিক এসিড আর আধামিশ্রিত সলিউশানটির কাজই এই যে 'চক' দিয়ে আঁকা চিত্রটিকে

পাথরের গায়ে বসিয়ে বা এ'টে দেওয়া। পাথরের গায়ে বসিয়ে দেওয়া লিথোগ্রাফির চকের কালি কিন্তু আর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা সম্ভব নয়। তাই পরের অধ্যায়ে তার্পিন তেল এবং সামান্য জল দিয়ে এক টুকরো কাপড়ের সাহায্যে ঘষে পাথরের গা থেকে লিথো 'চকে'র কালি তুলে ফেলতে হবে। এর পর আবার পাথরটিকে এমন ভাবে জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে পাথরের গায়ে সামান্যমাত্র তার্পিন না লেগে থাকে।

এখন ভেজা অবস্থাতেই লিথোগ্রাফ ছাপার কালি হ্যান্ড রোলারের সাহায্যে পাথরের ওপর বুলিয়ে যেতে হবে। মাঝে মাঝে আবার পাথরটিকে জল দিয়ে ভিজিয়েও নিতে হবে। এইভাবে বার বার রোলার বুলোলেই পাথরের গায়ে শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে। গোটা পাথরের যেখানে ছবি নেই অর্থাৎ সাদা অংশটি জলে ভিজে থাকার জন্যে রোলার বুলোলেও সেখানে কালি ধরবে না। ফলে সে অংশটি সাদাই থেকে যাবে।

অতঃপর লিথোগ্রাফ ছাপার উপযোগী এক প্রকার হাতে-টানা মুদ্রাযন্ত্রে পাথরটিকে বসিয়ে এক রকম মোটা কাগজের ওপর ছাপ নিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত চিত্রকেই লিথোগ্রাফ বলে এবং এই ভাবেই হাজার হাজার গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র চিত্রণের উপযোগী চিত্র মুদ্রণ করার রীতি প্রচলিত ছিল।

রঙিন লিথোগ্রাফ রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রঙের জন্যে পৃথক পাথর ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে একটি পালিশ পাথরের ওপর লিথোকালি দিয়ে ছবির রেখাঙ্কন করে নিতে হবে। এর পর পাথরটির চার কোণে চারটি ছোট ক্রসলাইন টেনে নিতে হবে। এর ফলে পরে একই কাগজকে প্রতিটি পাথরের ওপর জায়গা মত বসানো যেতে পারবে: স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এই ভাবে আঁকা সম্পূর্ণ হলে সেই পাথর থেকে যতগুলি রঙের প্রয়োজন ততগুলি ছাপ নিতে হবে। অতঃপর এই প্রিন্টগুলির ওপর লাল ও কালো মেশানো 'আর্থ কালার' ছিটিয়ে ঝেড়ে নেবার প্রয়োজন হয়। কারণ, ঝেড়ে নিলে দেখা যাবে যে, কেবল কালির ছাপের ওপরই 'আর্থ কালার' লেগে আছে। এর পর প্রিন্ট এক একটি পাথরের ওপর যন্ত্রের মাধ্যমে 'ট্রান্সফার' করে নিতে হয়।

পরের অধ্যায়ে বিভিন্ন পাথরের ওপর বিভিন্ন রঙের স্থানগুলি লিথো 'চক' বা লিথো কালি লাগিয়ে আগের মত 'এচ' করে নিয়ে একটি কাগজের ওপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের ছাপ নিলেই রঙিন লিথোগ্রাফ হবে।

৬

বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে কলকাতার স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের পরিবর্তিত রূপ সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের ব্যাপকভাবে গ্রন্থচিত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়। উল্লেখ্য, লিথোগ্রাফ পদ্ধতিই ছিল সত্তরের দশকের বাংলা গ্রন্থচিত্রণের প্রধান মাধ্যম। লিথোগ্রাফের সঙ্গে কাঠখোদাইয়ের মাধ্যমেও গ্রন্থকে চিত্রাঙ্কিত করার নীতি তখনও অবশ্য বজায় ছিল। যে ক্ষেত্রে খরচের প্রশ্নই ছিল প্রধান সমস্যা সে ক্ষেত্রে কাঠখোদাই চিত্রেরই ছিল অগ্রাধিকার। ফলে বিংশ শতকেও বহু গ্রন্থে কাঠখোদাইয়ের চিত্র দেখা যায়।

সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রেরা লিথোগ্রাফ আর কাঠখোদাই উভয় রীতিতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে সত্তরের দশকে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালের' দ্বিতীয় সংস্করণটি চিত্রাঙ্কিত করে-ছিলেন যে গিরীন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৪১-১৯০৯) তিনি গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন না। প্যারীচাঁদের জীবদ্দশায় হাটখোলার স্বনামধন্য শিল্পী গিরীন্দ্রকুমারের ছয়টি লিথোচিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে 'আলালের ঘরের দুলালের' দ্বিতীয় সংস্করণের আত্মপ্রকাশ (১৮৭০)।

বাংলাভাষার ব্যঙ্গচিত্রপ্রধান সাময়িকপত্র 'বসন্তকের' মুখ্য শিল্পী ছিলেন গিরীন্দ্রকুমার। তাঁর জেঠতুতো অগ্রজ প্রাণনাথ দত্তের (১৮৪০-১৮৮৮) সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বসন্তকে'ও (১৮৭৪-৭৬) থাকত ব্যঙ্গচিত্রের লিথোগ্রাফ। 'বসন্তক' সম্পাদক প্রাণনাথও ছিলেন শিল্পী। কিন্তু গিরীন্দ্রকুমারের চিত্রাঙ্কন প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ।

বিগত যুগের অগ্রণী গবেষক মন্মথনাথ ঘোষ গিরীন্দ্রকুমারের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন "মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পুণ্যশীলা জননীর জন্য গিরীন্দ্রকুমার অনেকগুলি দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আত্মীয় প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' বর্ণিত অনেক বিষয় অবলম্বনে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও কতকগুলি কালিকলম দিয়া ছবি আঁকিয়া-ছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বিতীয় সংস্করণ গিরীন্দ্রকুমার চিত্রদ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা ইঁহার অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।"[১০]

মন্মথনাথ বলেছেন যে, "মাইকেলের একখানি গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে গিরীন্দ্রকুমার একটি সুন্দর চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার নিম্নদেশে একটি কোট-প্যান্ট পরিহিত কৃষ্ণকায় ব্যক্তি (কবি) নেশায় বিভোর হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, নিকটে পানাধার ও পানপাত্র এবং সেই নিদ্রিত-

প্রায় কবির মস্তকের নিকট বাগ্দেবী আসিয়া কল্পনার আলোকরশ্মি প্রেরণ করিতেছেন। শুনিয়াছি, মাইকেল স্বয়ং এই চিত্র সন্দর্শন করিয়া চিত্রকরের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।"[১১] কোন বইয়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনার কথা উপরে বলা হয়েছে তা জানা যায় না।

উনিশ শতকের অভিজাত সমাজে সাড়া-জাগানো গ্রন্থ অবলম্বনে চিত্ররচনা এবং তা দিয়ে গৃহসজ্জার রীতিও প্রচলিত ছিল। গিরীন্দ্রকুমার ও প্রাণনাথ দত্তের যুগ্ম-প্রচেষ্টায় রচিত সে যুগের এমন কয়েকটি চিত্র রচনার উল্লেখও করেছেন মন্মথনাথ। মাইকেলের সাহিত্যকর্মের এ রূপায়ণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "প্রাণনাথ ও গিরীন্দ্রকুমার উভয়ে মিলিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীর কাল্পনিক বর্ণনাগুলি অবলম্বন করিয়া যে ৪ খানি রঙ্গীন (water colour pictures) ছবি আঁকিয়াছিলেন সেগুলি আমরা দেখিয়া সর্বাপেক্ষা মোহিত ও আনন্দিত হইয়াছি। এই চিত্রগুলি না দেখিলে চিত্রকরগণের প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক য়ুরোপীয় চিত্রকরও এই চিত্রগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই চিত্রগুলির প্রতিলিপি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই চিত্রগুলি দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি গিরীন্দ্রকুমারকে অনুরোধ করিয়া তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের কতকগুলি চিত্র তাঁহার দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলেন।"[১২]

কলকাতার দ্বিতীয় চারুকলা শিক্ষায়তন অ্যালবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স অ্যান্ড স্কুল অব আর্টসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঔপন্যাসিক গিরীন্দ্রকুমার পরবর্তীকালে চিত্রাঙ্কন অনুশীলনের উপযোগী 'চিত্রবিজ্ঞান' (১৯০১) নামে সচিত্র এক গ্রন্থ রচনা করে অশেষ উপকার করেছিলেন ছাত্রসমাজের।

সত্তরের দশকের গিরীন্দ্রকুমারের আলোচনা প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে আরও এক শিল্পী ও তাঁর গ্রন্থের প্রসঙ্গ। তাঁর নাম শ্যামাচরণ শ্রীমানী (?-১৮৭৫) আর তাঁর রচিত গ্রন্থটি 'আর্যজাতির শিল্পচাতুরি'। কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের জ্যামিতিক চিত্রকলার শিক্ষক ছিলেন শ্যামাচরণ। সচিত্র 'আলালের ঘরের দুলালের' চার বছর পরে প্রকাশিত শ্যামাচরণের 'আর্যজাতির শিল্পচাতুরি'ই ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্যবিদ্যা অবলম্বনে রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ (১৮৭৪)। বলা বাহুল্য, লিথোগ্রাফ ও কাঠখোদাই চিত্রে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

৭

একমাত্র বাংলা গ্রন্থই নয়, সত্তরের দশকে ইংরেজী গ্রন্থচিত্রণেও আর্ট স্কুলের ছাত্রদের নিযুক্ত করেন একাধিক ভারতীয় ও ইউরোপীয় গ্রন্থকার। প্রকৃতপক্ষে লিথোগ্রাফির যুগে আর্ট স্কুলের ছাত্রেরা প্রথমে নিজেদের নৈপুণ্য প্রমাণ করেছিলেন ইংরেজী গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যমেই।

সত্তরের দশকের গ্রন্থচিত্রণকলায় সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী অন্নদাপ্রসাদ বাগচী (১৮৪৯-১৯০৫)। ছাত্রবয়স থেকে গ্রন্থচিত্রণকলায় পারদর্শী অন্নদাপ্রসাদ একক ভাবে নানা গ্রন্থ চিত্রাঙ্কিত করলেও তাঁর একাধিক সহপাঠী ও অনুগামী শিল্পীর সঙ্গেও যুগ্মভাবে চিত্রাঙ্কিত করেন বাংলা ও ইংরেজী ভাষার কয়েকটি স্মরণীয় গ্রন্থ।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আরও উল্লেখ্য যে, একমাত্র কলকাতা থেকেই নয়, লন্ডন থেকেও প্রকাশিত ইংরেজ গ্রন্থকারের গ্রন্থেও কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্রদের রচিত ক্রোমো-লিথোগ্রাফ যুক্ত হয়।

সত্তরের দশকে গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্রদের মনোজ্ঞ চিত্রকর্মে সচিত্র হয়ে যে স্মরণযোগ্য ইংরেজী গ্রন্থটি লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম *'Thanatophidia of India: Being a Description of the Venomous Snakes of the Indian Peninsula'*, 1872. কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের শল্যচিকিৎসক সার জোসেফ ফেরারের বিপুল আকৃতির এ গ্রন্থে যে ২৯টি পটে বিষধর সাপের রঙিন চিত্র মুদ্রিত হয় তার লিথোগ্রাফার ছিলেন গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের কয়েকজন ছাত্র।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর সর্বাধিক লিথোচিত্র সম্বলিত সর্পবিষয়ে মনোজ্ঞ এ গ্রন্থটি সচিত্র করার জন্যে আরও তিনজন যে ছাত্র নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের নাম হরিশ্চন্দ্র খাঁ, নিত্যানন্দ দে ও বিহারীলাল দাস।

উনিশ শতকে গ্রন্থকে একটি স্টুডিও বা চিত্রশালার সম্মিলিতভাবে চিত্রাঙ্কিত করার রীতিও প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ গ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে চিত্রাঙ্কিত করার সূচনা ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওতে। সত্তরের দশকে অন্নদাপ্রসাদের উদ্যোগে ১৮৫, বউবাজার স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত এই স্টুডিওর খ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। কারণ, বাংলার ললিতকলার ইতিহাসে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর অবদান অবিস্মরণীয়।

নিরক্ষরদের সাক্ষর করতে বাংলা ও ইংরেজী অ্যালফাবেট বোর্ড, হস্তলিপি অনুশীলনের উপযোগী কপিবুক, ক্যালেন্ডার এবং দেব-দেবীর অজস্র রঙিন লিথোগ্রাফ প্রকাশের সঙ্গে এই

স্টুডিওতে গ্রন্থ চিত্রাঙ্কিত করার ব্যবস্থাও ছিল।

প্রথমে অন্নদাপ্রসাদের একক প্রচেষ্টায় গড়ে-ওঠা এই আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত দেব-দেবীর চিত্রগুলি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে এখানকার সরস্বতীর এক লিথোগ্রাফ অনুসরণে রচিত হয়েছিল ঠাকুর বাড়ী থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকার প্রচ্ছদ (১৮৭৭)।

'সরস্বতী': ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর লিথোগ্রাফ

পরবর্তী সময়ে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওতে অন্নদাপ্রসাদের সামিল হন নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচরণ পাল প্রমুখ সরকারী আর্ট স্কুলের আরও চার কৃতী ছাত্র (১৮৭৮)।

এই বছরেই প্রকাশিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' গ্রন্থটি। প্যারীচাঁদের এ গ্রন্থে সংযুক্ত 'ব্রহ্মবাদিনী'র পূর্ণপৃষ্ঠা লিথোগ্রাফটি নিঃসন্দেহে 'বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনের প্রতীক। যদিও এ চিত্রটির রচয়িতা কে তার উল্লেখ গ্রন্থে বা চিত্রে প্রাপ্তব্য নয়, তথাপি অনুমিত হয় রচয়িতা ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। একমাত্র নিখুঁত অ্যাকাডেমিক অঙ্কন-রীতি এবং সুস্পষ্ট লিথোগ্রাফের জন্যেই এ সিদ্ধান্ত নয়, পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদের আরও একটি

গ্রন্থ এই স্টুডিওতেই চিত্রিত হয়েছিল বলে এই অনুমান।

অতঃপর ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওতে চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছিল প্যারীচাঁদের 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০)। দুটি পূর্ণপৃষ্ঠা লিথোগ্রাফের একটিতে চিহ্নিত আছে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর নাম। গ্রন্থটি প্রকাশের পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল (১০ মে, ১৮৮০: পৃঃ ২২৫): "The book is illustrated with some lithographs executed by the Calcutta Arts Studio."

বিগত শতকে প্রকাশিত ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচিত *Antiquities of Orissa*-র দুটি খণ্ডেই আছে (১৮৭৫, ১৮৮০) অন্নদাপ্রসাদের লিথোগ্রাফের নিদর্শন। রাজেন্দ্রলালের এ

বিদ্যাসাগর: অন্নদাপ্রসাদ বাগচী

গ্রন্থটি চিত্রাঙ্কনের জন্যে আঠারো বছর বয়সে অন্নদাপ্রসাদ ওড়িশা ভ্রমণ করে রচনা করেছিলেন চিত্রগুলি। এ গ্রন্থের সর্বাধিক চিত্র তাঁর অঙ্কিত হলেও আরও যাঁরা এ বইয়ের জন্য ছবি এঁকে-ছিলেন তাঁরা আর্ট স্কুলের গোপালচন্দ্র পাল, হরিশচন্দ্র খাঁ, কালিদাস পাল, উদয়চাঁদ সামন্ত প্রমুখ ছাত্র।

'অ্যান্টিকুইটিজ অব ওড়িশা'র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচ বছরের ব্যবধানে। এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশের (১৮৭৫) তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল রাজেন্দ্রলালের যে *Buddha Gaya: The Hermitage of Sakya Muni* গ্রন্থটি তারও চিত্রণশিল্পী অন্নদা-প্রসাদ। এ গ্রন্থটিও চিত্রাঙ্কনের জন্যে তিনি গ্রন্থকারের সঙ্গে গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়া। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদাপ্রসাদের একক চিত্রকর্মে শোভিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'বুদ্ধগয়া'।

উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণের অবিসংবাদী রূপকার অন্নদাপ্রসাদের এককভাবে চিত্রাঙ্কিত শেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নিদর্শন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫)। তাঁর অঙ্কিত ১৩টি লিথোগ্রাফ 'বিদ্যাসাগরে'র অমূল্য সম্পদ। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্র, দিনময়ী দেবী, বেথুন, মিস মেরি কার্পেণ্টার প্রমুখ এ গ্রন্থের চিত্রগুলি কেবল তাঁর লিথোগ্রাফ রচনার নিখুঁত প্রযুক্তিজ্ঞানেরই পরিচায়ক নয়, প্রতিকৃতি চিত্রকলায় তাঁর অনন্যসাধারণ ক্ষমতার দৃষ্টান্ত। অন্নদা-প্রসাদের ঋণ স্বীকার করে চণ্ডীচরণ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন: "যে সকল নয়ন-রঞ্জন লিথো চিত্রের সমাবেশে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেগুলি গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চি কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। তিনিও এই কার্য্যে বিবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।"

'বিদ্যাসাগরে'র চিত্রণকলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। এ গ্রন্থের ভগবতী দেবীর চিত্র সম্পর্কে তিনি তাঁর 'চারিত্রপূজা'য় (১৯০৭) বলেছেন: "বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগরগ্রন্থে লিথো-গ্রাফপটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে।...ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—"

লিথো চিত্রে চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থ তালিকার অন্যতম স্মরণীয় নাম 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' (১৮৯৩)। চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগরে'র দু'বছর আগে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু। মোট দশটি চিত্রে চিত্রাঙ্কিত এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দুটি কাঠখোদাই বাদে সবগুলি চিত্রই লিথো প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ গ্রন্থের মাইকেল, ভূদেব, গৌরদাস, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রমুখের নিখুঁত লিথোগ্রাফগুলির রচয়িতা কে তা জানা যায় না। গ্রন্থের নিবেদন বা প্রস্তাবনায় তার উল্লেখ নেই।

৮

ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর দৃষ্টান্তে উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানা স্টুডিও। প্রধানতঃ, সরকারী আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত এই স্টুডিও-গুলিতে চারুকলার নানা কাজের সঙ্গে কাঠখোদাই এবং লিথোগ্রাফের মাধ্যমে গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থাও ছিল।

অন্নদাপ্রসাদের যুগে কাঠখোদাই চিত্রের অগ্রণী শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব (১৮৪৭-১৯২৮)। অন্নদাপ্রসাদের কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের স্টুডিও ছিল ১১, কলেজ স্কোয়ারে। 'টি এন ডি' অথবা 'টি এন দেব' স্বাক্ষরিত তাঁর কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত হয় নানা পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ।

ত্রৈলোক্যনাথের কাঠখোদাই চিত্রে শোভিত গ্রন্থের অন্যতম ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভিদ বিচার'। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত এ গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণে (১২৮৩) যুক্ত হয় ৪৩২টি গাছ-পালা ও ফল-ফুল-লতাপাতার কাঠখোদাই চিত্র। কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র উদয়চাঁদ সামন্ত অঙ্কিত চিত্রের অনুসরণে 'উদ্ভিদ-বিচারে'র কাঠখোদাইগুলি রচনা করেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ দেব।

ত্রৈলোক্যনাথের সমসাময়িক বিহারীলাল রায়ও ছিলেন কাঠখোদাই চিত্রকলার অন্যতম দিকপাল। সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র বিহারীলাল লিথোগ্রাফিতেও কুশলী ছিলেন। ৫২, কলুটোলা স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আর্টিস্ট প্রেসে কাঠখোদাই ও লিথোগ্রাফ রচনার ব্যবস্থা ছিল।

বিহারীলালের আর্টিস্ট প্রেসে চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থতালিকার অন্যতম উল্লেখ্য গ্রন্থ বিহারীলাল সরকারের 'দশ মহাবিদ্যা' (১২৯২)। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের *Six Ragas & Thirtysix*

Raginis of the Hindus (১৮৮৭) গ্রন্থেও আছে আর্টিস্ট প্রেসের লিথোগ্রাফের নিদর্শন।

এ চিত্রশালার নামাঙ্কিত কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত হয় একাধিক রামায়ণ ও মহাভারত। বঙ্গবাসী স্টীম মেশিনে বিহারীলাল সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'রামায়ণ' (১২৯৪) এবং বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দের অর্থানুকূল্যে অনূদিত এই একই মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত অপর 'রামায়ণ'টিতেও (১২৯৮) আর্টিস্ট প্রেস নামাঙ্কিত কাঠখোদাই যুক্ত হয়। আর্টিস্ট প্রেসের 'মহাভারত' (দুই খণ্ডে: ১৩০৯)। বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দের অর্থানুকূল্যে অনূদিত ও প্রকাশিত এ 'মহাভারত'টিও মুদ্রিত হয় বঙ্গবাসী স্টীম মেশিন প্রেসে।

পরবর্তীকালে কাঠখোদাই চিত্রকলার নৈপুণ্যের পরিচয় দেন প্রিয়গোপাল দাস ও হরিদাস সেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে এ'দের আত্মপ্রকাশ এবং বিংশ শতকেও নানা গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রে এ'দের কাঠখোদাই প্রকাশিত হয়। কাঠখোদাইয়ের মাধ্যমে প্রতিকৃতি চিত্র রচনায় এ'রা বিশেষ কৃতী ছিলেন।

প্রতিকৃতি কাঠখোদাইয়ে প্রিয়গোপাল দাসের (১৮৭০-১৯২৮) নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। 'সখা ও সাথী', 'জন্মভূমি', 'মুকুল' প্রভৃতি সাময়িকে তাঁর কাঠখোদাই প্রকাশিত হয়। প্রিয়, পি জি, প্রিয়গোপাল বা পিজিডি স্বাক্ষর সম্বলিত কাঠখোদাইগুলি তাঁরই রচিত।

"১৬/১৭ বৎসর বয়স হইতে তিনি উড-এনগ্রেভিং বা কাঠের ব্লক খোদাই করিতে আরম্ভ করেন এবং আজীবন এই কার্য্য করিয়া তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি অর্জন করিয়া যান। ...যখন হাফটোন ও লাইন ব্লকের অস্তিত্ব ছিল না, তখন এদেশে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রের জন্য ব্লক তৈয়ারি করিতে হইলে প্রিয়গোপালের স্মরণ লইতে হইত।"[১০]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৩১৫) এবং 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৩১৬) গ্রন্থ দুটির শিল্পী স্বয়ং গ্রন্থকার। এ দুটি গ্রন্থেই গ্রন্থকার অঙ্কিত চিত্রকে কাঠখোদাইয়ে রূপান্তরিত করেন প্রিয়গোপাল। অবশ্য প্রিয়গোপালের সঙ্গে আরও অন্যান্য শিল্পীরও কাঠখোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত হয় দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থ দুটি।

'জন্মভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত 'এইচ সেন' বা 'এইচ এস' নামাঙ্কিত কাঠখোদাইগুলির রচয়িতা হরিদাস সেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯) এবং বিহারীলাল সরকার রচিত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের (১৩০২) অধিকাংশ কাঠখোদাই তাঁরই রচিত।

কিন্তু বাংলা গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনে একমাত্র বাঙ্গলার শিল্পীদেরই কাঠখোদাই ব্যবহৃত হয়নি। কোনো কোনো গ্রন্থকার, মুদ্রাকর ও সম্পাদকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গ্রন্থ এবং সাময়িকপত্রে আমদানী করা ইউরোপীয় শিল্পীদের কাঠখোদাইও মুদ্রিত হয়। ফলে, এদেশের কাঠখোদাই শিল্পীদের বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিগত শতকের শেষ দুই দশকে। বিদেশী কাঠ-খোদাই চিত্রে চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থের অন্যতম হারাণচন্দ্র রক্ষিতের চার খণ্ডের 'সেক্সপীয়ার' (১৮৯৬-১৯০৩)।

৯

আগেই বলা হয়েছে কাঠখোদাই পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে লিথোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় চিত্রাঙ্কিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর যুগে লিথো প্রক্রিয়ায় গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন বহু শিল্পী। শুধু বাংলা গ্রন্থেই নয়, বহু ইংরেজী গ্রন্থেও যুক্ত হয় এ'দের লিথোগ্রাফ।

উনিশ শতকের শেষ তিনটি দশকে লিথোগ্রাফিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন কৃষ্ণহরি দাস, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, হরিশ্চন্দ্র হালদার ও হরিনারায়ণ বসু। কৃষ্ণহরি দাস ও যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আরো কয়েকজন সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র লিথো চিত্রে চিত্রাঙ্কিত করেছিলেন (স্যার) জর্জ কিং রচিত বহু খণ্ডে বিভক্ত বৃহদাকার *Annals of the Royal Botanic Garden, Calcutta* গ্রন্থমালা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় শুরু হয় উক্ত গ্রন্থের প্রকাশন। কৃষ্ণহরির লিথো চিত্রে চিত্রাঙ্কিত হয়েছিল রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত ও দেব-দেবী সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থও।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে তুলিকাধারণের পথিকৃৎ হরিশচন্দ্র হালদার। সাহিত্যসম্রাটের জীবদ্দশায় তাঁর 'আনন্দমঠ' অবলম্বনে হরিশচন্দ্রের এক চিত্রের আত্মপ্রকাশ সাময়িকপত্র 'বালকে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভাসুন্দরী দেবীর লিখিত 'গান অভ্যাস' শীর্ষক রচনার সঙ্গে 'বালকে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরমে'র যে স্বরলিপি প্রকাশিত হয় তারই সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল হরিশচন্দ্র রচিত বহুসন্তান পরিবেষ্টিতা মাতৃমূর্তির সে লিথো চিত্রটি (১৮৮৫)।

'বালক' সাময়িকপত্রেই হরিশচন্দ্র চিত্রাঙ্কিত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'মা-লক্ষ্মী', 'সাত ভাই চম্পা' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'রাজর্ষি'ও চিত্রাঙ্কিত করেছিলেন হরিশচন্দ্র লিথো চিত্রের মাধ্যমে।

জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুরেব 'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' গ্রন্থে (১৩১২) যুক্ত হযেছিল হরিশচন্দ্রেব লিথো নিদর্শন। জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব এ গ্রন্থে তাঁব নিজের অঙ্কিত বঙ্কিমচন্দ্র ও বাজনাবাযণ বসুব চিত্র দুটিব লিথোগ্রাফার হবিশচন্দ্র। এ ছাড়া এ গ্রন্থেব বামগোপাল ঘোষ ও বিদ্যাসাগবেব প্রতিকৃতি দুটিব শিল্পী ও লিথোগ্রাফাব স্বযং হবিশচন্দ্র।

বাংলাভাষাব উল্লেখযোগ্য সচিত্র গ্রন্থেব তালিকায নিঃসন্দেহে স্থান পেতে পাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'বোম্বাই চিত্র (১২৯৫)। ভাবত ইতিহাসেব নানা ঐতিহাসিক অট্টালিকা, সমাধি আর বিশিষ্ট মানুষেব চিত্রে সমৃদ্ধ বোম্বাই চিত্রেব' অধিকাংশ চিত্রগুলি ফোটোগ্রাফ থেকে লিথোগ্রাফে বুপান্তবিত কবেছিলেন হবিনাবাযণ বসু (১৮৬৮-১৯২০)। কলকাতাব সবকাবী আর্ট স্কুলেব প্রধান শিক্ষক হবিনাবাযণ মোগল চিত্রকলাব অনুসবণে 'বোম্বাই চিত্রেব জন্যে অঙ্কিত কবেছিলেন বাজা-বাদশাব যে চিত্রগুলি বিভিন্ন সমযে বহু পাঠ্যপুস্তকেও তা প্রকাশিত হযেছিল।

শিল্পগুবু অবনীন্দ্রনাথেব প্রথম প্রকাশিত চিত্রও মুদ্রিত হযেছিল লিথোগ্রাফিক প্রক্রিযায। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুব সম্পাদিত ১২৯৮ বঙ্গাব্দেব অগ্রহাযণ ও পৌষ মাসেব 'সাধনা'য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব স্বপ্নপ্রযাণ অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথেব যে দুটি চিত্র প্রকাশিত হয সে দুটি চিত্রও লিথো-গ্রাফিক প্রক্রিযায পবিস্ফুটিত কবেছিলেন স্বনামধন্য ঈশ্ববীপ্রসাদ বর্মা। 'সাধনা'ব প্রথম সংখ্যায প্রকাশিত 'স্বপ্নপ্রযাণে'ব প্রথম চিত্রটিই (অগ্রহাযণ ১২৯৮) অবনীন্দ্রনাথেব প্রথম প্রকাশিত চিত্র।

একমাত্র সাময়িকপত্রেই নয, শিল্পীজীবনেব প্রাবম্ভে গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনেব উদ্দেশ্যে যে চিত্রগুলি বচনা কবেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ সেগুলিও মুদ্রিত হযেছিল লিথো প্রক্রিযায।

সাময়িকপত্রে প্রথম বিশ্বকবিব বচনা চিত্রাঙ্কিত কবাব গৌববে হবিশচন্দ্র হালদাব গৌববান্বিত হলেও গ্রন্থাকাবে ববীন্দ্রবচনা চিত্রাঙ্কনেব উদ্যোক্তা অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১ ১৯৫১)।

ববীন্দ্রনাথেব 'চিত্রাঙ্গদা' (১২৯৯) শুধু কবিবই প্রথম সচিত্র গ্রন্থ নয অবনীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কিত প্রথম গ্রন্থও বটে। পাঁচ টাকা দামেব বিশেষ সংস্কবণ চিত্রাঙ্গদা'ব অন্তর্ভুক্ত অবনীন্দ্রনাথেব ৩২টি বেখাঙ্কন পবিস্ফুটিত হযেছিল লিথো প্রথায। চিত্রাঙ্গদা'ব উৎসর্গপত্রে কবি অবনীন্দ্রনাথেব উদ্দেশে লিখেছিলেন 'তুমি আমাকে তোমাব যত্নবচিত চিত্রগুলি উপহাব দিযাছ আমি তোমাকে আমাব কাব্য এবং স্নেহ আশীর্বাদ দিলাম।"

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথেব নিজেব বচিত গ্রন্থেবও আত্মপ্রকাশ উনিশ শতকে। উনিশ শতকে প্রকাশিত হযেছিল লেখক অবনীন্দ্রনাথেব 'শকুন্তলা (শ্রাবণ ১৩০২) আব 'ক্ষীবেব পুতুল (ফাল্গুন ১৩০২) গ্রন্থ দুটি। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকাব চিত্রাঙ্কিত এ দুটি গ্রন্থেব বেখাঙ্কনগুলিও মুদ্রিত হযেছিল লিথো বীতিতে। শিল্পগুবুব প্রথম গ্রন্থ 'শকুন্তলা 'ইণ্ডিযান আর্ট কটেজে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধব কর্তৃক প্রস্তব ফলকে মুদ্রিত" হয।[১৪]

বাংলাব ভৌগোলিক সীমানাব বাইবে থেকে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশেব জন্য এলাহাবাদেব ইণ্ডিযান প্রেসেব নাম স্মর্তব্য। কর্ণধাব চিন্তামণি ঘোষেব (১৮৪৪ ১৯২৮) উদ্যোগে এলাহাবাদেব ইণ্ডিযান প্রেসে মুদ্রিত হয চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায, ববীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ আবও অন্যান্য গ্রন্থকাবেব অসংখ্য বাংলা গ্রন্থ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিযান প্রেস প্রতিষ্ঠাব পব এ ছাপাখানায লিথোগ্রাফিবও প্রবর্তন কবেন চিন্তামণি।[১৫]

অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যাযে অঙ্কিত একাধিক স্মবণীয চিত্রকে লিথো প্রক্রিযায মুদ্রিত কবে অত্যন্ত অল্প মূল্যে পৌঁছে দিযেছিলেন তিনি কলাবসিকদেব কাছে। তাঁব ছাপাখানায মুদ্রিত নানা গ্রন্থেও যুক্ত হযেছিল লিথোগ্রাফ। চণ্ডীচবণ বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'বিদ্যা-সাগবে'ব চতুর্থ সংস্কবণেব (১৯১৪) মুদ্রাকব ইণ্ডিযান প্রেস এবং এ গ্রন্থেব লিথোগ্রাফগুলি বচিত হযেছিল এলাহাবাদেই।

১০

উনিশ শতকেব দ্বিতীয দশক থেকে কাঠখোদাই চিত্রেব সাহায্যে গ্রন্থচিত্রাঙ্কনেব যে সূচনা তা বর্তমান শতকেব তৃতীয দশকেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকেব আদি পর্যাযেব ধাতুখোদাই বিগত শতকেই পবিত্যক্ত হয। কাঠখোদাই শিল্পেব নৈপুণ্য এবং সহজ ও সুলভ মূল্যেব আকর্ষণে গ্রন্থচিত্রণে ধাতুখোদাই চিত্রকলাব অবলুপ্তি ঘটে। এ ছাড়া উনিশ শতকেই লিথো-গ্রাফিক প্রক্রিযায চিত্রকলাব বুপাবোপেব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওযাব ফলে সবে দাঁড়াতে হয ধাতু-খোদাই শিল্পকে।

সাধাবণতঃ ধাতু ও কাঠখোদাইযের মাধ্যমে চিত্রেব সাদা-কালো অর্থাৎ একটি বঙেব প্রতিচ্ছবিই মুদ্রিত হত। বহুবর্ণেব প্রতিচ্ছবি সম্ভব ছিল না। লিথোগ্রাফিক প্রক্রিযায মুদ্রিত চিত্র অনেক আকর্ষণীয ও মনোজ্ঞ হলেও এই বীতিতে সাধাবণতঃ চিত্রের একটি বঙেব প্রতিচ্ছবিই পাওযা যেত। চিত্রেব বঙিন প্রতিচ্ছবি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবিষ্কৃত হয ক্রোমো-লিথো পদ্ধতি। কিন্তু

ক্রোমো-লিথো চিত্রের রঙ উজ্জ্বল নয়, হালকা। স্বভাবতঃই গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রে চিত্রকে বহুবর্ণে পরিস্ফুট করে তোলার পক্ষে ক্রোমো-লিথো পদ্ধতিও যথেষ্ট ছিল না। মুদ্রণশিল্পের এই অভাব এবং অতৃপ্তির ফলেই জন্ম নেয় প্রসেস বা ফোটো এনগ্রেভিং এবং এ রীতিতেই চিত্রকে তার নিজস্ব একাধিক রঙে মুদ্রিত করার রীতি প্রচলিত হয়।

গ্রন্থচিত্রণের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে যেমন একদিন কাঠখোদাই এবং লিথোগ্রাফির আধিপত্যে বিদায় নিতে হয়েছিল ধাতুখোদাই চিত্রকলাকে, ঠিক তেমনি হাফটোন বা প্রসেস ব্লকের প্রভাবে গ্রন্থচিত্রণকলায় বিলুপ্তি ঘটে কাঠখোদাই ও লিথো চিত্রকলার।

উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকেই কলকাতায় শুরু হয় হাফটোন চিত্রের মাধ্যমে ফোটোগ্রাফ বা চিত্রকলার রূপারোপের প্রচেষ্টা। হাফটোন বা প্রসেস ব্লক নির্মাণের পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)। ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স বিদেশ থেকে আমদানীকরা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্লক নির্মাণ বিষয়ে তাঁর তৎপরতার সূত্রপাত ও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে তিনি সাফল্য লাভ করেন। ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স কর্তৃক প্রস্তুত ব্লকে চিত্রাঙ্কিত হয় অজস্র গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত ব্লকগুলি ইংরেজী 'ইউ. রায়' স্বাক্ষরে চিহ্নিত।[১৬]

বিগত যুগের 'সখা ও সাথী', 'প্রদীপ', 'মুকুল', 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে 'ইউ. রায়' কৃত ব্লক প্রকাশিত হয়। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থে' (৮ম ভাগ: ১৩১০) প্রকাশিত কবির আলোকচিত্রের ব্লকটিরও নির্মাতা উপেন্দ্রকিশোর।

শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর নিজের অঙ্কিত চিত্রের ব্লকও রচনা করেন। তাঁর হাফটোন ব্লক রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধ্যায়ে প্রকাশিত স্বরচিত 'সেকালের কথা' (১৯০৩) চিত্রিত করেন হাফটোন ব্লকের সাহায্যে। "সেকালের কথার বিশেষত্ব ইহার ছবিতে। এই পুস্তকে ১৭খানা বড় ছবি আছে, তাছাড়া অনেক ছোট ছবিও আছে। এই ছবিগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক।...উপেন্দ্রবাবু...সেগুলি নিজে বহু পরিশ্রমে অঙ্কিত করিয়াছেন।"[১৭]

উপেন্দ্রকিশোরের সমসাময়িককালে কলকাতায় ছিল আরও কয়েকটি হাফটোন ব্লক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। বাংলা গ্রন্থকে সচিত্র করার মূলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবদানও কম নয়। হাফটোন ব্লকের সাহায্যে বাংলা গ্রন্থ সচিত্র করার সূচনারম্ভের অন্যতম টি এস অ্যান্ড কোম্পানী।

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থের সংকলন 'কাব্য গ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) যে পাঁচটি আর্ট প্লেট যুক্ত হয় তার চারটি ছিল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের আলোক-চিত্র। কবির 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র এই চারটি (পঞ্চমটি কবির হস্তাক্ষরের লাইন ব্লক) হাফটোন ব্লকের নির্মাতা টি. এস. অ্যান্ড কোম্পানী।

হাফটোন ব্লকে সচিত্র কবির গ্রন্থ তালিকার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত 'জীবনস্মৃতি'। বিংশ শতকে প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম সংস্করণের (১৩১৯) একটি মাত্র চিত্র ছাড়া সবগুলিই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮) অঙ্কিত। 'জীবনস্মৃতি'র অন্তর্ভুক্ত সেই একটি চিত্র অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের প্রতিকৃতিটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা।

উনিশ শতকে হাফটোন ব্লকের মাধ্যমে গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র অলংকরণে উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন জি. মুখার্জি এবং দি প্রসেস ব্লক কোম্পানী।

অতঃপর বর্তমান শতকের সূচনায় এ বিষয়ে কৃতী শিল্পী কে. ভি. সেন বা ক্ষীরোদবিহারী সেন। ইউ. রায় অ্যান্ড সন্সে উপেন্দ্রকিশোরের কাছে একই সঙ্গে যে তিনজন ফোটো এনগ্রেভিং সম্পর্কে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কে. ভি. সেন। অপর দুজন ললিতমোহন গুপ্ত এবং অশ্রুময় দাসগুপ্ত।

উনিশ শতক থেকে প্রায় আটাশ বছর ইউ রায় অ্যান্ড সন্সে কর্মজীবন অতিবাহিত করার পর দুজন অংশীদারের সঙ্গে ললিতমোহন গুপ্ত (১৮৭৯-১৯৫১) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী (১৯২৫)। প্রায় ছয় বছর এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পর ললিত-মোহনের একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও (১৯৩১)।[১৮] এ'দের অন্যতম সহকর্মী অশ্রুময় দাশগুপ্ত পরবর্তীকালে অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন।

বর্তমান শতকের সূচনা থেকে প্রসেস ব্লকের মাধ্যমে গ্রন্থ অলংকরণে কে. ভি. সেনের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কে. ভি. সেনের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল কে. ভি. সেন অ্যান্ড ব্রাদার্স। ৬০, মীর্জাপুর স্ট্রীটে ছিল তাঁর কার্যালয়। তাঁর নির্মিত ব্লকগুলি Seyne স্বাক্ষরে চিহ্নিত।

ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণকলায় পারিপাট্যের জন্যে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাবের ব্যক্তিগত মুদ্রাকররূপেও নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বিজয়চাঁদ মহতাবের 'বিজয় গীতিকা' (১৩০৮), 'বিজন-বিজলী' (১৯১৪), 'গায়ত্রী' (১৯১৪) প্রভৃতি সচিত্র গ্রন্থগুলির ব্লক তাঁরই নির্মিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী' (মেবার: ১ম খণ্ড: ১৯০৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫) গ্রন্থ দুটিতেও কে. ভি. সেন নির্মিত ব্লকের সন্ধান পাওয়া যাবে। 'হিতবাদী' লাইব্রেরি প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী'তে মুদ্রিত হয়েছিল নন্দলাল বসুর (১৮৮২-১৯৬৬) অঙ্কিত চিত্র। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাসে'র চিত্রগুলির অধিকাংশই আলোকচিত্রের প্রতিলিপি।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র এক সংস্করণ (সুবলচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত) সচিত্র করা হয় বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯৩২) ও গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯২৮) অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রে। বলা বাহুল্য, 'শকুন্তলা'র চিত্রগুলির রঙিন প্রতিচ্ছবির নেপথ্যে ছিলেন কুশলী কে. ভি. সেন।

কে. ভি. সেনের উদ্যোগে প্রকাশিত সচিত্র গ্রন্থতালিকার অনবদ্য দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর-চিত্রে' (১৩২১)। স্বনামধন্য শিল্পী নরেন্দ্রনাথ সরকার অঙ্কিত ৫২টি রঙিন চিত্রে চিত্রাঙ্কিত এ গ্রন্থটিও কে. ভি. সেনের ব্লক রচনার নিখুঁত নিদর্শন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনের যে সূচনা তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে আজও। মুখ্যতঃ তিনটি পদ্ধতিতে অর্থাৎ খোদাই, লিথোগ্রাফ ও প্রসেস ব্লকের মাধ্যমে গ্রন্থ চিত্রাঙ্কনের শতবর্ষের এ ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক।

পরবর্তী সময়ে চিত্রণ পদ্ধতির অগ্রগতি হয়েছে আরও। যান্ত্রিক নানা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে চিত্রের প্রতিচ্ছবির প্রকাশ হয়েছে আরও বাস্তব ও মনলোভা। কিন্তু যান্ত্রিক অগ্রগতির সময় থেকে অর্থাৎ প্রসেস ব্লকের যুগ থেকেই প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র চিত্রাঙ্কনের দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন শিল্পীরা। ধাতু অথবা কাঠখোদাই কিংবা লিথোগ্রাফির যুগে গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল শিল্পীদের। কারণ, ধাতু অথবা কাঠের ওপরই তাঁরা খোদাই করে রচনা করে দিতেন তাঁদের চিত্র। লিথোগ্রাফির যুগে যন্ত্রের মাধ্যমে চিত্রের প্রতিচ্ছবি গৃহীত হলেও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গেও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তাঁদের। কারণ, যে চুনাপাথর থেকে মুদ্রিত হত লিথোগ্রাফ সে চুনাপাথরের ওপরই চিত্রাঙ্কন করতে হত শিল্পীদের। অঙ্কিত বা খোদিত সেই ধাতু অথবা কাঠ কিংবা পাথরের ছাপ থেকেই চিত্রাঙ্কিত হত গ্রন্থ।

কিন্তু হাফটোন বা প্রসেস ব্লকের যুগ থেকে মুদ্রিত চিত্রের সঙ্গে শিল্পীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অবসান। শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রের রূপারোপের দায়িত্ব নিল এমন এক নতুন মাধ্যম যেখানে শিল্পীর কোনো ভূমিকা নেই। কেবল চিত্রাঙ্কনই হল শিল্পীসমাজের শেষ কাজ। তাঁদের অঙ্কিত চিত্র পরিস্ফুটিত করার দায়িত্ব নিলেন কারিগরি জ্ঞান-সম্পন্ন এমন মানুষেরা যাঁরা সম্পূর্ণভাবে কয়েকটি যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল।

নির্দেশিকা

১ নরেন্দ্রনাথ লাহা। 'পক্ষির বিবরণ' দ্র. 'সুবর্ণবণিক সমাচার' পৌষ ১৩৪১
২ ও ৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড দ্র. সম্পাদকীয়
৪ নূতন পঞ্জিকা। 'বিজ্ঞাপন', ১২৫৪
৫ শরচ্চন্দ্র দেব। কলিকাতার ইতিহাস, পঞ্চদশ অধ্যায়, দ্র. 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পৃ ২৫৫
৬ *Asiatic Department.* Portrait of the Marquis of Hastings in *The Calcutta Journal,* October 15, 1822
৭ Advertisement in *The Englishman,* Calcutta May 27, 1850
৮ Mildred Archer. *Patna Painting,* London 1947
৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড দ্র. সাহিত্য বিভাগ
১০, ১১ ও ১২ মন্মথনাথ ঘোষ। 'বসন্তক' দ্র. 'মানসী ও মর্মবাণী', আশ্বিন ১৩৩৩

১৩ আনন্দবাজার পত্রিকা। দ্র. 'শোক সংবাদ', ২৫ মাঘ ১৩৩৪
১৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'শকুন্তলা' দ্র. আখ্যাপত্র, কলকাতা ১৩০২
১৫ The Indian Press Limited (1884-1950). *Souvenir,* Calcutta
১৬ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'উপেন্দ্রকিশোর: শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি, দ্র. 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৭০
১৭ সেকালের কথা দ্র 'মুকুল', শ্রাবণ ১৩১০
১৮ 'স্মৃতি-তর্পণে: ললিতমোহন গুপ্ত' (১২৮৬-১৩৫৮): শ্রাদ্ধবাসর উপলক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা ১৩৫৮

পাঠপঞ্জী

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 'বাঙলার প্রথম': প্রথম সচিত্র পুস্তক, 'ভারতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
নিরাময় রায়। শিল্পসৃষ্টিতে লিথোগ্রাফ, 'দেশ' ১৩ ভাদ্র ১৩৭১
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। খোদাই চিত্রে বাঙালী, 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ৪৬শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৬
——। বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই, 'প্রবাসী' শ্রাবণ ১৩৫৩
যোগেশচন্দ্র বাগল। সেযুগের ধাতু-খোদাই ও কাঠখোদাই শিল্প, 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৬১
Mukharji, T. N. *Art-Manufactures of India,* Calcutta, 1888
The National Library. *The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing,* Calcutta, 1955

দুই শতকের গ্রন্থচিত্রন

রঘুনাথ গোস্বামী

ইউরোপে মুভেবল টাইপ দিয়ে বই ছাপা শুরু হল ১৪৫৪ বা ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এদেশে প্রথম বাংলা মুভেবল টাইপ ব্যবহার করে বই ছাপা হল এর তিনশো চব্বিশ বা বাইশ বছর পরে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি হলহেড সাহেবের 'এ গ্রামের অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। সাহেবরাই এদেশে ছাপাখানা আমদানী করেছিল, আর সাহেবদের আনা আরও পাঁচটা জিনিসের মত ভারতীয় জনজীবনে এরও ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

আমাদের আলোচনা গত দুশো বছরে বাংলা বইয়ের ডিজাইন ও গ্রন্থচিত্রণের বিবর্তন নিয়ে। ছাপাখানা ও ছাপার টেকনলজি এদেশে এসেছে বিদেশ থেকে। সেই সঙ্গে এসেছে বুকডিজাইনের মডেল। বুকডিজাইন বলতে বইয়ের কাগজ, মলাট, আকার, আকৃতি, তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বই শুরু হবার আগে নামপত্র ও অন্যান্য প্রারম্ভিক বিষয়গুলিতে ব্যবহৃত হরফের রকমফের মাপজোক, বইয়ের ভিতরে হরফ-পংক্তি সাজানোর কায়দা, তার চারপাশে ছাড়া শাদা অংশ বা মার্জিনের মাপজোক, গ্রন্থচিত্রণ ও অলংকরণের ব্যবহার ইত্যাদি। এ ব্যাপারে স্বভাবতঃই আমরা ইউরোপীয় কায়দাকানুন ও ধরনধারণকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করেছি।

ছাপাখানা আসার আগে পর্যন্ত এদেশে পুথিপাটা, নথিপত্র, সরকারী নকশা, মানচিত্র ইত্যাদির প্রতিলিপি করাটা ছিল একান্তভাবেই হাতের কাজ। এ ব্যাপারে হরফের শ্রী-ছাঁদ, ছাড় বা মার্জিন, ছবির ব্যবহার, রংএর ব্যবহার ইত্যাদির নিজস্ব পদ্ধতি ও নিয়মকানুন ছিল। কিন্তু ছাপা এদেশে সম্পূর্ণ এক নূতন ব্যাপার এবং যন্ত্রনির্ভর। এর টেকনলজি, ইউনিফর্মিটি, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আমাদের ইউরোপীয় গুরুদের কাছ থেকেই শিখতে হয়েছে ও তাঁদেরই অনুকরণ করতে হয়েছে পুরোপুরি।

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল নতুন ধরনের ডিজাইনার যারা নতুন নতুন যন্ত্রের পরিকল্পনা করতে পারে, ম্যাস-প্রোডাকশানের উপযোগী নতুন নতুন নকশা পরিকল্পনা করতে পারে। প্রয়োজন হয়েছিল নতুন ধরনের কারিগর ও যন্ত্রবিদ্, যারা ম্যাস প্রোডাকশানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রনির্মাণ করতে পারে। সেই সঙ্গে একদল শিল্পীরও প্রয়োজন হয়েছিল যারা বিপুল সংখ্যায় উৎপাদিত নানারকমের পণ্যের জন্য বিশেষভাবে চিত্রিত ও লিখিত বক্তব্য সম্বলিত মোড়ক বা প্যাকেজিং ও পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচারপত্র প্রস্তুত করতে পারে—যা হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে

ছাপা হয়ে। ছাপাখানার কাজ হল 'Reproduction of writing or picture on mass scale', সুতরাং সেদিক থেকে ছাপাখানা শিল্পবিপ্লবের একটি বড় শরিক। সেই কারণে ইউরোপে এক বিশেষ ধরনের শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যারা ছাপাখানার জন্য প্রয়োজনীয় হরফ ডিজাইন করতে পারে, বইপত্র ও অন্যান্য ছাপা জিনিসগুলিতে সুন্দর করে হরফ সাজানোর কায়দাকানুন পরিকল্পনা করতে পারে, ছাপাখানার উপযোগী নকশা, ম্যাপ, চার্ট, গ্রন্থচিত্র, ছবি আঁকতে পারে, অলঙ্করণের জন্য ডেকরেটিভ বর্ডার, কর্নার, হেডপীস, টেলপীস ইত্যাদি আঁকতে পারে। সনাতন অর্থে শিল্পী বা পেইন্টার বলতে যাদের বোঝায় ছাপাখানার প্রয়োজনে নবোদ্ভূত এই শিল্পী-সম্প্রদায় তাদের থেকে একেবারেই পৃথক। কালক্রমে এরাই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বা গ্রাফিক-ডিজাইনার নামে পরিচিত হয়।

সাহেবরা এদেশে ছাপাখানা আমদানী করেই টের পেয়েছিল যে এদেশে খুব উচ্চাঙ্গের প্রাসাদ, ইমারৎ, মন্দির, মসজিদ বা অত্যাশ্চর্য সব মূর্তি বা সামগ্রী গড়ার কারিগর কিংবা ধুরন্ধর সব পটুয়া বা মিনিয়েচার ছবি করার শিল্পী থাকলেও ছাপাখানার প্রয়োজনে বা ছাপাখানার মধ্য দিয়ে সাহেবদের তৎকালীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শিল্পী বা কারিগরের প্রয়োজন তার নিতান্তই অভাব। সুতরাং তারা নেহাৎ দায়ে পড়েই ছাপাখানার কাজে লাগে এমন ধরনের শিল্পী ও কারিগর তৈরি করে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করল।

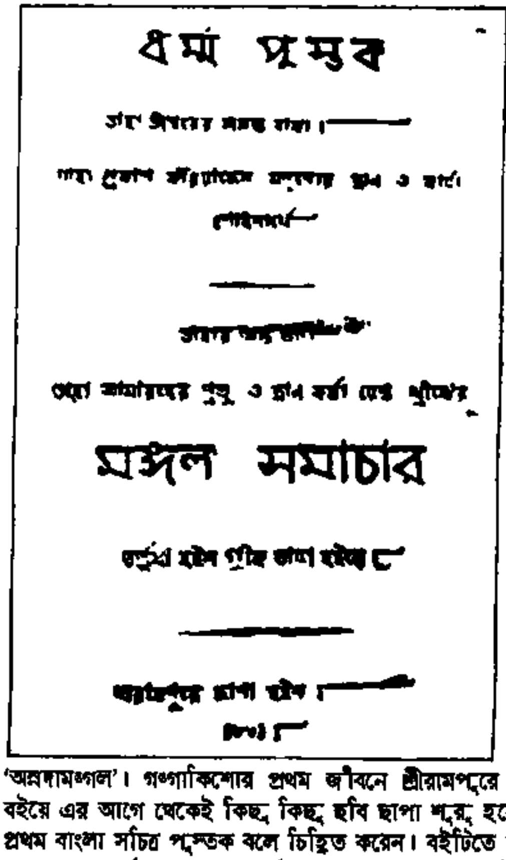
ধর্ম্ম পুস্তক

মঙ্গল সমাচার

পঞ্চানন কর্মকার হলেন প্রথম দেশীয় কারিগর যিনি সাহেবদের কাছে অক্ষর কাটা, অক্ষর ঢালাই করা ও ছবি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় ব্লক কাটারও কাজ শেখেন।

আধুনিক প্রসেস ব্লক আবিষ্কারের আগে পাথরের উপর লিথো পদ্ধতিতে বা ধাতুর পাতে কিংবা কাঠের উপর ছবি খোদাই করে তাই দিয়ে ছবি ছাপা হত। এদেশে সাধারণতঃ ব্লক যাঁরা কাটতেন তাঁরা একাধারে ছিলেন চিত্রকর ও ব্লক এনগ্রেভার। খোদাই থেকে ছাপা এই ছবি-গুলিকে 'কাটস' বলা হত। প্রকাশিত বংশ-তালিকা অনুসারে পঞ্চাননের জামাতার ছেলেরা ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'চন্দ্রোদয়' নামে একটি প্রেস চালাতেন। এঁদের ছাপা চিত্রিত পঞ্জিকার জন্য ছবির ব্লক নিজেরাই কাটতেন।

বাংলা বই ছাপা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে, আর ঠিক তার পরের শতকে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি বাংলা ছাপা বইএর জয়যাত্রা। আমরা সচিত্র বাংলা বইয়ের প্রথম সাক্ষাৎ পাই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। গঙ্গাকিশোর প্রথম জীবনে শ্রীরামপুরে ছাপাখানার কম্পোজিটার ছিলেন। বাংলা বইয়ে এর আগে থেকেই কিছু কিছু ছবি ছাপা শুরু হয়েছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা 'অন্নদামঙ্গল'কেই প্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক বলে চিহ্নিত করেন। বইটিতে ছ'খানা ছবি বা 'কাটস্' আছে। ছবিগুলির নাম: 'অন্নপূর্ণা', 'সুন্দরের বর্ধমান যাত্রা', 'সুন্দরের বর্ধমানে প্রবেশ', 'সুন্দর ও দারোয়ান', 'বিদ্যা-সুন্দরের দর্শন' ও 'সুন্দরের চোর ধরা'। মাত্র দুখানি ছবির নিচে লেখা রয়েছে 'এনগ্রেভ্‌ড বাই রূপচাঁদ রায়'। অনেকের অনুমান এর সবগুলিই বাঙ্গালী শিল্পী রূপচাঁদ রায়ের করা। এখানে উল্লেখ্য কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই নাকি সঠিক অর্থে প্রথম বাঙালী পুস্তক ব্যবসায়ী। প্রথমে তিনি সাহেবদের ছাপাখানা ফেরিস এণ্ড কোম্পানী থেকে বই ছাপালেও পরে নিজেই ছাপা-খানা করেন এবং আরও পরে নিজের গ্রাম বহড়ায় সেই ছাপাখানা তুলে নিয়ে যান। একজন গবেষক লিখেছেন, "গ্রাম-বাঙলায় সেটিই সম্ভবতঃ প্রথম ছাপার কল।" সচিত্র বাংলা বইয়ের কারবারে গঙ্গা-কিশোর খুবই সফল হন। তাঁর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই বাংলা বই প্রকাশের কাজে

নেমে পড়েন।

'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশিত হবার পর অনেকগুলি সচিত্র বাংলা বই প্রকাশিত হয়। সচিত্র এই বইগুলির মধ্যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাধামোহন দাস প্রকাশিত 'সঙ্গীত তরঙ্গ' বইয়ে ছ'খানি কপার-প্লেট এনগ্রেভিং আছে, যেগুলি শিল্পী রামচাঁদ রায়ের করা। এগুলির মধ্যে 'রাগভৈরব' ও 'রাগ দীপক' বেশ ভাবোদ্দীপক ছবি। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের লেখা 'গৌরীবিলাস' নামে সচিত্র পুস্তকে ছ'খানি কাঠ ও ধাতুর 'কাটস্' আছে। এতে শিল্পী বিশ্বম্ভর আচার্যের আঁকা 'দশভুজা'র চিত্রটি আশ্চর্য শিল্প-সুষমামণ্ডিত। বিশ্বম্ভর আচার্যের আঁকা আরো ছবি পাওয়া যায় ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বত্রিশ সিংহাসন' বইয়ে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'তেও বিশ্বম্ভর আচার্যের করা ছবি আছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী'তে ছবি করেছেন মাধব দাস—তৎকালীন প্রখ্যাত শিল্পী। এই সময়ের উল্লেখ্য সচিত্র বাংলা বইগুলির মধ্যে রয়েছে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের 'আনন্দ লহরী', ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের নন্দকুমার ভট্টাচার্যের 'কালী কৈবল্যদায়িনী'। দেওয়ান পুরাণচন্দ্র রচিত 'হরিমঙ্গল গীত' সচিত্র পুস্তকে নাকি রামধন স্বর্ণকারের আঁকা একাত্তরখানি ধাতুখোদাই ছবি আছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ছাপা 'অন্নদামঙ্গলে'র পরবর্তী সংস্করণে আরো দশখানি চিত্র সংযোজিত হয়। তৎকালীন ছাপাছবির কাজ জানা বাঙ্গালী শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন রূপচাঁদ আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, বীরচন্দ্র দত্ত, রামসাগর চক্রবর্তী প্রভৃতি। ১২৪২ ও ১২৫৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'নতুন পঞ্জিকা'তেও অনেক দেবদেবীর ছবি ছাপা হয়।

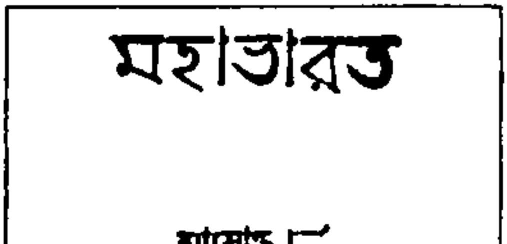
মহাভারত

ব্যাসোক্ত ।

পয়ারাদি ছন্দে ।

কাশীরাম দাস বিরচিত ।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।

১৮০১ ।

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। বহু বাঙ্গালী চিত্রকরের আঁকা ছবির সন্ধান পাওয়া যায় সোসাইটি প্রকাশিত বইগুলিতে।

গবেষকরা বলেন প্রথম সচিত্র বাংলা সাময়িকপত্র হল 'পশ্বাবলি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি বাংলায় হলেও কিন্তু এর প্রকাশক, চিত্রকর, মুদ্রাকর সবাই বিদেশী। জন লসন নামে এক বিদেশী এর চিত্রকর।

উনিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছরের মধ্যে ছাপা বাংলা বইয়ের বুকডিজাইনের ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ব্যাপার হল পুথির আকারে খোলা পাতায় ছাপা কিছু বাংলা বই। সুকুমার সেনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি এইভাবে ছাপা সবচেয়ে পুরানো বই ১৮১৫-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা 'বৈষ্ণব জীবন' কাব্য, আনন্দচন্দ্র দাসের 'জগদীশ-চরিত্র' বা 'জগদীশ বিজয়'। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'নরোত্তম বিলাস' নামে পুথির অনুকরণে ছাপা বইয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত পুথির অনুকরণে ছাপা বিখ্যাত 'শ্রীমদ্ভাগবত' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বইটির প্রকাশকাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ এবং বইটি নাকি বিশুদ্ধ হিন্দুমতে 'তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত' চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা ছাপা হয়েছিল।

পুথির আকারে ছাপা বইটির পাতায় হরফ সাজানোর ঢংটিতেও যথাসাধ্য পুথির সঙ্গে সাদৃশ্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের বিষয় অনুসারে তাকে পুথির ফরম্যাটে ছাপা বুকডিজাইনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্য প্রচেষ্টা। 'শ্রীমদ্ভাগবত' দপ্তর-কাছারীতে পড়ার জন্য নয় বা বৈঠকখানায় অথবা অবসর বিনোদনের জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ার জন্যও নয়। এটি শ্রদ্ধাসহকারে একমনে বসে পাঠ করার জন্য একটি শাস্ত্রগ্রন্থ। সুতরাং বুকডিজাইনের ব্যাপারে ভবানীচরণের 'Form follows function' তত্ত্বের প্রয়োগ উল্লেখ্য বৈকি।

এদেশে ছাপাখানার কাজের প্রয়োজনে শিল্পী ও কারিগর তৈরি করার প্রয়োজনটা সাহেবরা টের পেয়েছিল গোড়া থেকেই। কিন্তু এজন্য শিল্পশিক্ষালয় স্থাপন করার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর। অথচ বাংলা হরফের নকশা, মুভেবল টাইপের জন্য ধাতুর বাংলা হরফ ঢালাই করা থেকে শুরু করে কাঠ বা ধাতুর পাতে খোদাই করে

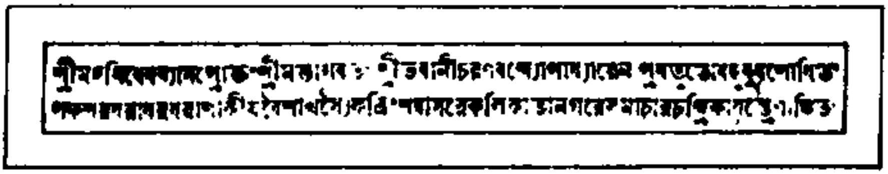

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত পুথির আকারে ছাপা 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'

ছবি ছাপা পর্যন্ত সব রকম কাজই পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই। এ যুগের বাঙালী হরফ-কারিগর ও ছাপা ছবির চিত্রকরদের উৎকর্ষ দেখে বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এসব কাজ শেখবার তেমন কোন উপযুক্ত শিক্ষালয়ই ছিল না। যেটুকু ছিল সেটুকু হল 'On job training.' সাহেব মুদ্রণবিদ্‌রা সেযুগের শিল্পী ও কারিগরদের দায়ে পড়ে কাজ শেখাতে বাধ্য হয়েছিল। আর অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে দেশীয় শিল্পী ও কারিগররা এসব বিদ্যা শিখে নিয়ে এদেশে মুদ্রণ শিল্পের ইমারৎ গড়ে তুলেছে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে।

মূলতঃ ছাপাখানার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পী ও কারিগর তৈরি করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনীসভা' স্থাপিত হয় ঊনবিংশ শতকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্প ও শিক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছেন "অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের জনাই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার অবদান, এবং 'শিল্পবিদ্যালয়' নাম দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান শুরু হয় তা থেকে কলকাতা শহরে শিল্পশিক্ষার পত্তন বলা চলে।" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সভার উদ্যোগে তৎকালীন বিখ্যাত ধনী হীরালাল শীলের বাড়ীতে 'স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বসাকুল্যে গুটি তিনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল "Etching, Engraving on wood, metal and stone."

বিনোদবিহারী লিখেছেন, "উচ্চাঙ্গের শিল্প শেখাবার জন্য বা দেশীয় কারিগরীর উন্নতি অপেক্ষা নতুন জাতের কারিগর তৈরী করাই এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল।" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ৫০৪ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এদের মধ্যে বাঙালী হিন্দু ছিল ৩৫৬। তারপরই ছিল ফিরিঙ্গি ১০৭ জন। ইংলণ্ড থেকে ২৫০, টাকা বেতনে ড্রইং ও উডএনগ্রেভিং শেখাবার শিক্ষক নিয়ে আসা হয়। কলকাতার সরকারী চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়ের এইভাবেই সূত্রপাত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বইয়ের ছবি আঁকার অর্ডার সংগ্রহ করতেন। ছাত্ররা সেসব কাজ করত ও কিছু কিছু কমিশন পেত। শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজের নমুনা ছড়িয়ে আছে তৎকালে শিক্ষাবিভাগের নির্দেশে প্রকাশিত 'ঈসপ্‌স্ ফেবলস্', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিখ্যাত বই 'অ্যাণ্টিকুইটিস্ অব ওড়িশা' (প্রথম খণ্ড) প্রভৃতি বইয়ে। এঁদের মধ্যমণি ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী ও এনগ্রেভার অন্নদাচরণ বাগচী। পরে অন্নদাচরণের নেতৃত্বে এই স্কুলের ফাইন আর্টস বিভাগের একদল ছাত্র বিখ্যাত আর্ট স্টুডিয়ো প্রতিষ্ঠা করেন। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে ছবি ও ভারতীয় মনীষীদের প্রতিকৃতি লিথোতে ছেপে এঁরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। অন্নদাচরণের উৎসাহে 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' নামে শিল্পপত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সচিত্র বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল অনেক বেশী। এর মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' দুটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ্য: প্রথমতঃ এটিই বাংলার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা, দ্বিতীয়তঃ এর ছবিগুলি শিল্পনৈপুণ্য, বাস্তবতা ও ভিসুয়্যাল ইনফরমেশান আমাদের বিস্মিত করে। পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৮৫১।

উনিশ শতকের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে সে যুগের বুকডিজাইন ও গ্রন্থচিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ছাপা বাংলা বইয়ের বুকডিজাইনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত। নামপত্র ইত্যাদি নিরাভরণ সাদামাঠাভাবে ছাপা। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা মহাভারতের নামপত্রে শুধু 'মহাভারত' কথাটি নামপত্রের উপর দিকে বড় হরফে উপর দিকে ছাপা। তার তলায় অন্যান্য সবকটি তথ্য ছাপা হয়েছে এক মাপের হরফ দিয়ে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামপুর থেকে ছাপা 'রামায়ণ'ও তদ্রূপ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'ধর্মপুস্তক' বা ১৮০৭-এ প্রকাশিত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের নামপত্র একই রকম সাদামাঠা।

হরফগুলির আকৃতি একটু বেঢপ ও নড়বড়ে। কোন বর্ডার বা অলংকরণের চিহ্নমাত্র নেই। বইয়ের ভিতরের পাতাতেও একই আদিমতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলি বাংলা ছাপাখানার আদিপর্বে উপযুক্ত শিল্পী-কারিগরের অভাবই সূচিত করে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই বাংলা বুকডিজাইনের ক্ষেত্রে বেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পঞ্জিকা ইত্যাদির নামপত্রে নানা বাহারী প্রেস বর্ডার ও অলংকরণ ইত্যাদির ব্যবহার, হরফের আকার ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে একধরনের 'সেন্স অব অর্ডার' লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪০-এর পর থেকেই বুকডিজাইনের ক্ষেত্রে বাংলা বইয়ের অগ্রগতি বেশ সুস্পষ্ট। যদিও এ ব্যাপারে বিদেশী মডেল খুবই প্রকট। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় শেষ অংকে শিক্ষিত সমাজের যে অংশটি দেশপ্রেমের দ্বারা কিঞ্চিৎ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব বই ও পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়েছিল সেগুলির পরিকল্পনা বা অলংকরণে বিন্দুমাত্র স্বাদেশিকতার ছাপও অনুপস্থিত। উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ সত্ত্বেও এই শতকে এবং পরবর্তী বিংশ শতকের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত বইয়ের ডিজাইন অলংকরণ ইত্যাদিতে বিদেশের হাস্যকর নকলনবিসী। রাজ-সংস্করণে আর্টসিল্কে বাঁধানো ফাঁপানো তুলতুলে মলাটে সোনার জলে লেখা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় বস্তাপচা প্রেস আর্টের বর্ডার, কর্নার, হেডপীস, টেলপীসের ছড়াছড়ি আর 'আর্ট নাভ্য'-এর বন্যা।

উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণ: ১৮৭৬

উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। এক ধরনের ছবিতে জন-মানুষ, বেশভূষা, বাড়ীঘর, তৈজসপত্র ও ভূচিত্রে সদাপ্রয়াত বাদশাহী আমলের সুস্পষ্ট ছাপ এবং সেই সঙ্গে কিছুটা সমসাময়িক দেশীয় চরিত্র। আর এক ধরনের ছবি আছে যাতে বাদশাহীযুগ ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সংস্কৃতির তৎকালীন কালচারের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত। উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের ছবি সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃই নস্টালজিক। কিন্তু ১২৮৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'দেবীযুদ্ধ' গ্রন্থে ছাপা ভিনিসীয় দেওয়ালগিরি লাগানো দুই ডোরিক থামের মাঝখানে কমলাসনা দেবী সরস্বতী বা 'অধ্যাত্মরামায়ণে' ছাপা অগণিত গথিক আর্চ দেওয়া দরবারে উপবিষ্ট চোগা-চাপকান পরা রামসীতার ছবির মধ্যে এমন এক কমিক এলিমেণ্ট আছে যা আমাদের তৎকালীন এক করুণ ছিন্নমূল পারম্পর্যহীন দিশেহারা সংস্কৃতির কথাই ক্রমাগত মনে করিয়ে দেয়। উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণে এইরকম উদাহরণের পরিমাণ বিপুল।

বিদেশীয়রা নিজেদের প্রয়োজনে দেশীয় শিল্পীদের পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শে ও পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষাদান শুরু করেছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'অ্যাণ্টিকুইটিস অব ওড়িশা'র মতো বইয়ের জন্য প্রয়ো-জনীয় ডকুমেণ্টেশন ধরনের অনুকৃতিমূলক চিত্রের কথা বাদ দিলে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা শিল্প-শিক্ষার আদর্শ আমাদের পক্ষে খুব স্বাস্থ্যকর হয়নি। বিনোদবিহারী লিখেছেন "নতুন শহর যেমন বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি শিল্পের এই নূতন শিক্ষা ও সামরিক রুচি জীবন-যাত্রার ব্যাপক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন।"

'দেবীযুদ্ধ' থেকে (১৮৭৬)

বিংশ শতকের গ্রন্থচিত্রণের প্রসঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত বইগুলির মধ্যে 'ঠাকুরমার ঝুলি' অবশ্যই উল্লেখ্য। বইটির প্রকাশকাল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থকার দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার স্বয়ং গ্রন্থচিত্রণ করেছেন। ছবিগুলির এনগ্রেভারদের নাম পাওয়া যায় বইয়ের স্বীকৃতিপত্রে।

বইটি এক কথায় পুরোপুরি উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণের ঢংএ চিত্রিত। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে ১৯৪০-এর এদিকে যারা জন্মেছে এবং ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে আছে, এই বইটির ছবিগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের অনেকেরই শৈশবস্মৃতি। ছবিগুলির মধ্যে এমন একটি বাঙালীআনা আছে যা আমাদের মন কেড়ে নেয়।

সম্ভবতঃ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' বা 'হাসিরাশি'ও এইরকম দুটি বই। যদিও সাম্প্রতিককালে শহরের শিশুদের জন্য প্রকাশিত বড় মাঝারি আকারের নানা ধরনের রঙিন বইয়ের বিপুল ভিড়ে এককালের অতি আদৃত 'হাসিখুসি' ও 'হাসিরাশি' নিশ্চয় হারিয়ে গিয়েছে।

বিংশ শতকের প্রথম পাদে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এমন একটি নাম যা বাদ পড়লে বাংলা ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলা বইয়ে ছবি ছাপার ক্ষেত্রে হাফটোন ব্লকের ব্যবহার তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, চিত্রকর ও মুদ্রাকর। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা উপেন্দ্রকিশোর রচিত 'সেকালের কথা' বইটিতে হাফটোনে ছাপা ১৭খানি বড় বড় ছবি আছে। সবচেয়ে বড় কথা হল তিনি ভূমিকায় লিখেছেন, "...ইহাদের একটিও ইংরাজি পুস্তকের ছবির নকল নহে।" 'টুনটুনির বই', 'মহাভারত', 'রামায়ণে' উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবি বাংলা বইয়ের পাঠকের নিকট অতি পরিচিত।

উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র ও সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সুকুমার রায় বাংলা গ্রন্থ চিত্রণের ক্ষেত্রে 'হাঁসজারু' 'রামগড়ুরের ছানা'র মতো অসংখ্য বিচিত্র জীবের স্রষ্টা; একাধারে হাস্যরসের অদ্বিতীয় কবি, লেখক, চিত্রকর ও মুদ্রণবিশারদ। কিন্তু অদ্ভুতকর্মা এই অসামান্য প্রতিভাবান কবি, শিশু-সাহিত্য স্রষ্টা ও শিল্পী বাংলার গ্রন্থজগৎ থেকে বিদায় নেন মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে।

শিল্পী: দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

'টুনটুনির বই': উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

'আবোল তাবোল': সুকুমার রায়

গাছ 'সে' গ্রন্থ থেকে: রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ বিশেষ শিল্পরীতির প্রবক্তা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থচিত্রণেও তাঁরা কম পারদর্শী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের কয়েকটি বইয়ের ছবি নিজেরাই এঁকেছেন। গগনেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গ্রন্থচিত্রণের অবলম্বন রবীন্দ্ররচনা। অবনীন্দ্রনাথ গ্রন্থচিত্রণে প্রথম কৃতিত্বের পরিচয় দেন 'চিত্রাঙ্গদা'র সচিত্র সংস্করণে। তাঁদের নিজস্ব শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়েছে।

'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদি গল্প: যতীন সেন

পরশুরাম রচিত 'গড্ডলিকা' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইয়ের ছবি আঁকেন যতীন সেন। চরিত্রের দিক থেকে এঁর আঁকা ছবিগুলি আশ্চর্য রকমের বাঙালী। পরশুরামের বংশলোচন, বংচাক, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, ছাগলে, লম্বকর্ণ প্রভৃতি যেসব চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, শিল্পী যতীন সেন সেইসব চরিত্রের ছবি এঁকে বাঙ্গালী পাঠকদের স্মৃতিতে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করেছেন। গ্রন্থচিত্রণে যতীন সেনের সমসাময়িক আর একজন চিত্রকর হলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। এঁর অধিকাংশ কাজই আমরা দেখেছি সাময়িকপত্র-পত্রিকায়। এঁর কাজে আর্ট কলেজে বিদেশী প্রথায় শেখা ড্রইংএর ঢং সনাক্ত করতে পারা যায় সহজেই। ড্রইংগুলি সেই অর্থে পারফেক্ট কিন্তু এদেশের পরিবেশের সংগে যেন একাত্ম নয়।

শিল্পী: সতীশচন্দ্র সিংহ

'কালো ঘোড়া', 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থ থেকে গগনেন্দ্রনাথ

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'। দুই শতাব্দীব্যাপী বাংলা গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাসে একে একটি মাহেন্দ্র যোগ রূপে চিহ্নিত করা যায়, কারণ রচনাকর্তা রবীন্দ্রনাথ আর সেই রচনাকে চিত্রভূষণে বিভূষিত করলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী থেকে নন্দলালের চিত্রকর্মে ভূষিত একটি বিশেষ সংস্করণরূপে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে শেষ পাতা পর্যন্ত এই বইটির এমন একটি ভারতীয় 'আইডেন্টিটি' রয়েছে, বাংলা গ্রন্থচিত্রণে সম্ভবতঃ যার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথমেই বইটির পুস্তানি চোখে পড়তেই থমকে যেতে হয়। পুস্তানিটি দেখে মনে হয় অস্ফুট সবুজ রঙ নানা রকমের গাছের ডালপালায় মাখিয়ে যেন কাগজের উপর সেগুলির ছাপ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি পাতায় হরফের পংক্তিগুলি ছাপা হয়েছে সংযত ও স্বল্প-অলঙ্কৃত একটি বর্ডার বা ফ্রেমের মধ্যে—যা প্রত্যেকটি পাতাকে করেছে সুষমামণ্ডিত। প্রত্যেক পাতায় এই বর্ডার

আমাদের ইলুমিনেটেড ম্যানাস্ক্রিপ্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। কবিতাগুলির বিষয় অনুসারে পাতায় পাতায় অলঙ্করণ। যে পাতায় রয়েছে "মধ্যদিনে যবে গান/বন্ধ করে পাখি", সে পাতায় আঁকা হয়েছে অসম্পূর্ণ অলঙ্করণ বর্জিত রেখাচিত্রে বৃক্ষহীন, তৃণহীন তৃষাতপ্ত প্রান্তরের অনন্ত বিস্তার। কৃষ্ণচূড়া আর বসন্ত-পুষ্পের সমারোহ—যে পাতায় রয়েছে "হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন!" কোথাও পাদপূরণ রয়েছে অতিপরিচিত দৃশ্য—ফসল বোঝাই গরুর গাড়ি সার বেঁধে চলেছে রিক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। শীতের সকালে খেজুরগাছের মাথায় জমে থাকা কুয়াশা। চোখে পড়ে না এমন অতি ক্ষুদ্র ঘাসফুল যেমন আঁকা হয়েছে কবিতার আশপাশে যত্ন করে—তেমনি অতি স্বল্প পরিসর চতুঃসীমার মধ্যে আঁকা হয়েছে যোজন বিস্তৃত প্রান্তর।

'শকুন্তলা': অবনীন্দ্রনাথ

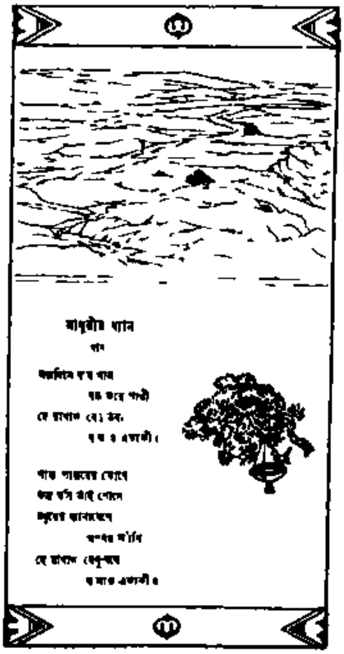

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র একটি পৃষ্ঠা: নন্দলাল বসু

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' বইটির গ্রন্থচিত্রণে কোথাও প্রকৃতির অনুকৃতিমূলক চিত্র করা হয়নি। আলোছায়াযুক্ত ত্রিমাত্রিকতা সৃষ্টির প্রয়াস কোথাও নেই। সমস্ত অলঙ্করণই সৃষ্টি হয়েছে সরু বা মোটা তুলির অভ্রান্ত ও অমোঘ টানে। প্রকৃতি এবং ঋতু সমস্ত বইটির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রূপে, রসে, বর্ণে ও সৌরভে। চিত্রকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় ক্যালিগ্রাফিক। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' শিল্পকর্ম, প্রাতিস্বিকতা, নৈপুণ্যে ও কাব্যগুণে নিশ্চিতভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থচিত্রণের উদাহরণগুলির মধ্যে অন্যতম।

নন্দলালের আর এক অসামান্য গ্রন্থচিত্রণ হল 'সহজপাঠ': প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও অংশতঃ তৃতীয় ভাগ। শিশুদের জন্য বর্ণপরিচয় ও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এগুলি বহুল পরিচিত। এখানেও রবীন্দ্রনাথ হলেন গ্রন্থকার।

শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের কোন বিরোধ থাকতে পারে একথা রবীন্দ্রনাথ কখনও বিশ্বাস করেননি। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসকে পুরোপুরি মর্যাদা দান করেছেন তাঁর এই কয়টি গ্রন্থ-চিত্রণের মধ্য দিয়ে। পাঠ্যপুস্তকের প্রাথমিক শর্ত পুরোপুরি বজায় রেখেও শিশুশিক্ষার বইয়ের চিত্রবস্তু কতখানি শিল্প-সুষমামণ্ডিত হতে পারে তার অবিস্মরণীয় নজির সৃষ্টি করেছেন নন্দলাল 'সহজপাঠে'র গ্রন্থচিত্রণে। 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগের চিত্রকর্মে তিনি ব্যবহার করেছেন লিনোকাট ছবির করণ-কৌশল, সাদা কালোর আশ্চর্য চিত্তাকর্ষক মায়া—যা শিশুদের চোখের রেটিনায় সহজেই ধরা পড়ার কথা।

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' : নন্দলাল বসু

এদেশের মাটির সঙ্গে নন্দলালের নিবিড় যোগ। 'ছোটখোকা বলে অ আ'র পাতায় ছোট-খোকার ছবিটি আসলে এদেশের সেই চিরকালের ছোটখোকা নাড়ুগোপালের ইমেজ। 'ভাত আনো বড় বৌ'-এর পাতায় নন্দলাল যে ছবিটি এ'কেছেন সেটি হল গ্রামবাংলার হে'সেলে রন্ধনরতা অন্নদাত্রীর চিরকালের ছবি।

'সহজপাঠে'র দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থচিত্রণের ট্রিটমেণ্ট অন্যরকম। সরু রেখায় আঁকা সরল ও আশ্চর্য সৌন্দর্যযুক্ত চিত্র। 'ওইখানে মা পুকুর পাড়ে' কবিতাটিতে কি আমরা নন্দলালের ঐ সরল রেখা-চিত্রটি ছাড়া তথাকথিত বাস্তব ঢংএর ত্রিমাত্রিকতাযুক্ত কোন চিত্রের কথা ভাবতে পারি?

'সহজপাঠ' : নন্দলাল বসু

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কালচারের দান 'মিকি মাউস' বা 'হাম্পটি ডাম্পটি'র ছবি দেওয়া শিশুশিক্ষার বই পড়তে অভ্যস্ত শহরের কতিপয় শিশুদের কথা ভেবে 'সহজপাঠ' লেখেননি। নন্দলালও এসব ছবি অবশ্যই তাদের জন্য আঁকেননি। দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে জাত এবং লালিত কুটীরবাসী যে ভারতবর্ষ, 'সহজপাঠে'র গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ-চিত্রকর দুজনেই হয়ত সেই ভারতবর্ষের বঙ্গপ্রদেশ অঞ্চলের শিশুদের কথা মনে রেখেই এমন বই সৃষ্টি করেছিলেন।

শিশুশিক্ষার গ্রন্থচিত্রণে নন্দলাল সৃষ্টি করে গেছেন 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ' এবং 'জ্যাক অ্যাণ্ড জিল' কালচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত 'কাউণ্টার কালচার'। নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণের চরিত্র যথার্থই দেশজ। এই প্রকৃত দেশজ গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে তিনি হলেন আদি-চিত্রকর এবং অদ্বিতীয়। শিল্পকৃতিরূপেও নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণের নিজস্ব মূল্য অনস্বীকার্য। অথচ নন্দলালের শিল্পকর্মের আলোচকরা কদাচ গ্রন্থচিত্রণে তাঁর অসামান্য দানের কথা ভুলেও উল্লেখ করেন না।

১৯২৫ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে যাঁরা বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণের কাজে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন পূর্ণ চক্রবর্তী, উপেন ঘোষ দস্তিদার, চারু রায়, সুবল পাল, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর দে প্রভৃতি। এ'দের মধ্যে কারো কারো কর্মকাল পঞ্চাশের ও ষাটের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি দীর্ঘকাল ধরে শিশু ও কিশোর সাহিত্য, বিশেষ করে অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনীর প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে দেখা গেছে। প্রতুল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ছবিতে রয়েছে আলোছায়াযুক্ত নিখুঁত ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা। রঙিন ছবি, কালিকলমে আঁকা আলোছায়াযুক্ত স্বল্পরেখায়, প্রায় আউটলাইনে আঁকা ছবি—সবকিছুতেই তাঁর সমান দক্ষতা। ইতিহাস-পুরাণের গল্প, সমুদ্রের তলার রাজ্য থেকে শুরু করে পাড়াগাঁর গাছগাছালি-ঘেরা মাটির ঘর, শহুরে মানুষের বৈঠকখানা, সবরকমের মানুষজন, বনেজঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনীর সিচুয়েশান, এমনকি নভোমণ্ডল পর্যন্ত সব কিছুর ছবিতেই ঠিক ঠিক ডিটেল

সমান দক্ষতা। তাঁর করা গ্রন্থচিত্রণে যে পরিমাণ 'ভিস্যুয়াল ইনফরমেশন' পাওয়া যায় তার জুড়ি মেলা ভার। তৎকালে এবং পরেও পাঠ্যপুস্তক বা শিশুসাহিত্যের গ্রন্থচিত্রণের কাজে নিযুক্ত বহু চিত্রকরের উপর প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব লক্ষণীয়। এক ধরনের বাংলা বইয়ের প্রকাশকরা প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। এর কারণ তাঁর ছবির রিয়ালিজম।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী আর একজন চিত্রকর যাঁর ছবির সঙ্গে বিশেষ করে রঙিন গ্রন্থচিত্রণের সঙ্গে বাঙালী পাঠক সুদীর্ঘকাল পরিচিত। এঁর চিত্রিত গ্রন্থের সংখ্যা অগণিত বলা যায়। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয়ে আঁকা এঁর ছবিগুলির মধ্যে আলোছায়াযুক্ত ত্রিমাত্রিকতা সত্ত্বেও এক ধরনের 'ওরিয়েন্টালিজম' আছে।

শিল্পী: সমর দে

শিল্পী. পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

উপেন ঘোষ দস্তিদার তাঁর রঙিন ছবি, বিশেষ করে ওমর খৈয়ামের ছবির জন্য প্রসিদ্ধ।

কমার্শিয়াল আর্ট বলতে আমরা আজ যা বুঝি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগে আমাদের দেশে তা ছিল প্রায় অজ্ঞাত। এদেশে কমার্শিয়াল আর্টের ব্যাপক চাহিদা ও ব্যবহার শুরু হয় বিজ্ঞাপন সংস্থা বা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিগুলির কল্যাণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর দিকে আমাদের প্রায় সব বড় বড় অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিগুলিই বিদেশী নেতৃত্বে পরিচালিত হত। তৎকালীন কমার্শিয়াল আর্টের চরিত্র ছিল মূলতঃ এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। দেশীয় কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের কাজ ছিল বিদেশী বই ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্র ও ইলাস্ট্রেশান থেকে অনুপ্রাণিত হওয়া এবং অন্ধভাবে অনুকরণ করে এদেশের বিজ্ঞাপন, বই-পত্র-পত্রিকার চিত্রকর্মে নির্বিচারে তা প্রয়োগ করা। চল্লিশের দশক থেকে বিজ্ঞাপন সংস্থা বা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সির ব্যবসার বেশ বাড়-বাড়ন্ত হয় এদেশে। কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের বেশ চাহিদা হয়। অনেক শক্তিমান শিল্পী বিজ্ঞাপন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন এই দশকে। এই দশকেই আমরা দেখতে পাই কমার্শিয়াল আর্ট বা গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এক নূতন স্রোত যার উদ্ভব হয় তৎকালীন বিজ্ঞাপন সংস্থায় কর্মরত প্র্যাকটিসিং আর্টিস্টদের প্রচেষ্টায়। সাংস্কৃতিক নবজাগৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু শিল্পী কমার্শিয়াল আর্ট বা গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে এমন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলেন যা চরিত্রের দিক থেকে হবে সৃজনধর্মী, বিদেশের প্রভাবমুক্ত এবং ভিস্যুয়াল ভোকাবুলারির দিক থেকে হবে দেশজ। এই ধরনের চেতনায় সঞ্জীবিত, মূলতঃ বিজ্ঞাপন বা প্রচার শিল্পে লিপ্ত বেশ কয়েকজন শিল্পী বাংলা প্রকাশনের কাজে উৎকৃষ্ট নজির সৃষ্টি করেছেন।

এই দশকে বাংলা প্রকাশনের ক্ষেত্রে বুকডিজাইন ও গ্রন্থচিত্রণের ব্যাপারে যে কয়জন শিল্পী নবদিগন্তের সন্ধান দিলেন অবিসংবাদিত ভাবে তাঁদের পুরোধা হলেন সত্যজিৎ রায়। এই সময়েই বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে নব্যতার পথপ্রদর্শক ডি. কে. গুপ্তের নেতৃত্বে সিগনেট প্রেসের আবির্ভাব। সিগনেট প্রেসের প্রথমদিকের বহু মন-কেড়ে-নেওয়া বইয়ের ডিজাইনার হলেন সত্যজিৎ রায়। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে নামপত্র, ভিতরের পাতার অক্ষর বিন্যাস, অলঙ্করণ, গ্রন্থচিত্রণ সব কাজেই

তাঁর অনন্যতা। বাংলা প্রকাশনার জগতকে সিগনেট প্রেসের প্রকাশিত বইগুলি যে প্রভাবিত করতে পেরেছে তার পিছনে সত্যজিতের দান অনেকখানি।

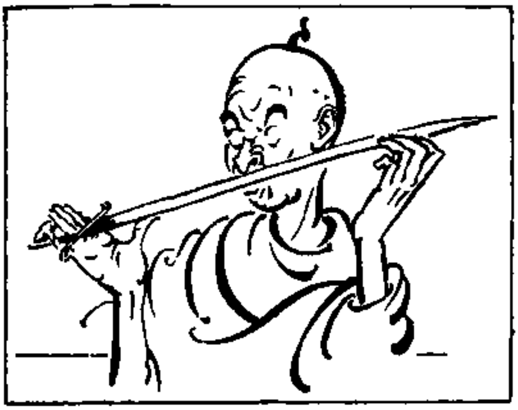

'বহুরূপী' ও 'আমআঁটির ভেঁপু' সত্যজিৎ রায়

গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে লেখার বাঙময় বিষয়বস্তুগুলির অবিকল চিত্রানুবাদ বা চিত্রগুলিকে বিষয়ানুসারে অথেন্টিক করে তুলতে পারাটাই গ্রন্থচিত্রণের শেষ কথা নয়। 'By illustration we mean any form of exposition or illucidation'— শব্দগত বিষয় বেশীমাত্রায় দৃষ্টি-গ্রাহ্য করে তোলা বা তা সম্প্রসারিত করাটাই উচ্চমানের গ্রন্থচিত্রণের উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে 'Illustration as a facet of graphic art is judged on the level of any other means of artistic expression Illustration as an element of graphic design must be judged primarily on its success or failure to make a point Frequently it is judged on both level"— গ্রন্থচিত্রণ ব্যাপারে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গ্রাফিক ডিজাইনার Bob Gill এর এই উক্তিটি স্মর্তব্য। 'পথের পাঁচালী'র শিশুসংস্করণ 'আমআঁটির ভেঁপু'তে সত্যজিৎ রায় কৃত গ্রন্থচিত্রণ আগের উক্তিটির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বাংলা প্রকাশনে বুক ইলাস্ট্রেশান অনেক ক্ষেত্রেই শুষ্ক গভীরতাহীন, শিল্পগুণ বর্জিত এক ধরনের কমার্শিয়াল আর্টের সৃষ্টি এবং যথার্থই নবত্বহীন রুটিন ব্যাপার। সত্যজিৎ প্রমাণ করলেন বইয়ের ইলাসট্রেশানকে তথাকথিত কমার্শিয়াল আর্টের শীতল কবল থেকে মুক্ত করে সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্পকর্মে পরিণত করা যায়। যেমন 'আমআঁটির ভেঁপু'র ছবিগুলি একদিকে বিভূতিভূষণের অমর রচনার মতই সবল ও ভাবময়, অপরদিকে এগুলি বিভূতিভূষণের রচনার শুধুমাত্র 'ফ্যাকচুয়াল' গ্রন্থচিত্রণ না হয়ে রচনার সম্প্রসারণ ও নিঃসন্দেহে এক মহিমাময় সংযোজন।

'আমআঁটির ভেঁপু'· সত্যজিৎ রায়

সত্যজিতের শিল্পশিক্ষার শুরু শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শিল্পাচার্য নন্দলালের শিক্ষকতায়। একটি ইংরেজী প্রবন্ধে সত্যজিৎ লিখেছেন, "I do not think my *Pather Panchali* would have been possible if I had not my years of apprenticeship of Master-mashai. I had learnt how to look at nature, how to respond to

nature and how to feel the rhythms inherent in nature."

উক্তিটি সত্যজিতের চলচ্চিত্র নির্মাণ ও গ্রন্থচিত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

সত্যজিৎ বিজ্ঞাপন সংস্থায় যোগ দেন ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে, এ কাজ ছেড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন ১৯৫৩-এ। সিগনেট প্রেসের জন্য বেশীর ভাগ অবিস্মরণীয় বুকডিজাইন ও গ্রন্থচিত্রণের কাজগুলি এই সময়ের মধ্যেই করা। সুকুমার রায়ের লেখা সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'বহুরূপী', 'খাই খাই', 'পাগলা দাশু' বইগুলিতে এবং 'আমআঁটির ভেঁপু', 'বিরস নাটক', 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা', 'বনলতা সেন', অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী', প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস', জিম করবেটের 'কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ' প্রভৃতি বইয়ের প্রচ্ছদ ও কতকগুলিতে গ্রন্থচিত্রণে পাওয়া যাবে সত্যজিতের প্রতিভার পরিচয়। এ ছাড়া সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পরশুরামের কয়েকটি রচনার জন্য তাঁর অসাধারণ চিত্র-কর্মও উল্লেখ্য। তিনি চলচ্চিত্রে যোগদানের পরেও 'সন্দেশ' পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন, এবং ছোটদের লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথমে সাময়িকপত্রে পরে বইয়ের আকারে তাঁর রচনাগুলি প্রকাশিত। এগুলিতে সত্যজিতের ভূমিকা লেখক ও চিত্রকরের। এদের মধ্যে কয়েকখানির নাম: 'গোরস্থানে সাবধান', 'ফেলুদা অ্যান্ড কোং', 'জয়বাবা ফেলুনাথ', 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য', 'সোনার কেল্লা', 'বাদশাহী আংটি', 'প্রফেসর শঙ্কু' প্রভৃতি।

'ফেলুদা অ্যান্ড কোং': সত্যজিৎ রায়

'শকুন্তলা': মাখন দত্তগুপ্ত

বুকডিজাইন ও গ্রন্থচিত্রণে সত্যজিতের কাজ শুরু থেকে দেখলে অনেকগুলি দ্রষ্টব্য ব্যাপারের আমরা সন্ধান পাই। সত্যজিতের শিক্ষার গোড়াপত্তন নন্দলালের কাছে। কিন্তু অন্যান্য নন্দলাল-শিষ্যদের মত কোথাও তিনি নন্দলালকে নকল করেননি। শুরু থেকে এ কাল পর্যন্ত গ্রন্থ সম্পর্কিত শিল্পকর্মে সত্যজিতের স্বকীয়তা ও সজীবতা বিস্ময়কর। গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে ছবির বিষয়কে কখনও তিনি প্রকাশ করেছেন স্বল্পতম রেখায় অসাধারণ সংযমে। কোথাও তাঁর চিত্রকর্ম সূক্ষ্ম সীবনকর্মের মত। ছবিতে কোথাও কোথাও বিশদ বিবরণ সম্বন্ধে তাঁর মনস্কতা ভারতীয় মিনিয়েচার পেইন্টিংএর কথা মনে করিয়ে দেয়। ছবিতে কোথাও বা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় দুচারটি ডিটেলেই তিনি বেছে নেন যা ছবির জন্য অমোঘভাবে প্রয়োজনীয়। তাঁর চিত্রকর্ম কোথাও যত্নকৃত সূক্ষ্মচিত্র, কোথাও বা ছবির বিষয়বস্তুকে এঁকেছেন চলিষ্ণু ও ত্বরান্বিত খণ্ড খণ্ড রেখার সাহায্যে যার মধ্যে রয়েছে ইংরেজীতে যাকে বলে 'আর্জেন্সি'। তাঁর ছবি কোথাও রেখার টানটোনে ক্যালিগ্রাফিক, কোথাও আছে তুলির সবল ও মোটা আঁচড়ের কাজ। লিনোকাট, কাঠখোদাই ও পেপারকাটের করণকৌশল ও প্রকাশভঙ্গিকেও তিনি গ্রন্থচিত্রণের কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করেছেন সাদা কালো ম্যাসের বিচিত্র মায়াময় ইন্দ্রজাল। আবার হাসির গল্প ও কবিতার ছবিতে তিনি সৃষ্টি করেছেন হিউমার যা তাঁর নিজস্বতায় উজ্জ্বল। সত্যজিৎ স্টিরিওটাইপের খপ্পরে পড়েননি, একঘেয়ে কোন ম্যানারিজমে বাঁধা পড়েননি। বিষয় অনুসারে নানা টেকনিকে ছবি এঁকে তিনি চাক্ষুষ করে তুলেছেন গ্রন্থের অন্তর্গত হর্ষ, বিষাদ, হাসিকান্না, ব্যঙ্গ-কৌতুক, ননসেন্স, ও রহস্য-রোমাঞ্চ। প্রয়োজন মত টেকনিকের বদল হলেও সমস্ত চিত্রকর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে সত্যজিতের নিজস্ব স্টাইল।

সত্যজিতের চিত্রকর্মে তাঁর নিজস্ব স্টাইলটার পশ্চাদ্‌ভূমি সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তি থেকেই জানা যাবে, "I was used to sketching in Western Style which lays more stress on outlines than on what is or are within the outlines. Mastermashai (Nandalal) taught me there was something more than the superficial outlines artist and the painters must be aware of. He taught us that, in objects, the most significant aspect was the inner rhythm which must be caught. Outlines in themselves are dead things. One must discover, one must feel what is within the outlines and of the object. The element of life and growth—the fundamental of nature—must be felt."

সত্যজিৎ সাম্প্রতিককালের বুকডিজাইনিং ও গ্রন্থচিত্রণকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করেছেন। বহুশিল্পীর গ্রন্থচিত্রণে সত্যজিৎ অত্যন্ত প্রকটভাবে উপস্থিত। এই প্রভাবের ভাল-মন্দ বিচারের মধ্যে না গিয়েও বলা যেতে পারে চল্লিশোত্তর যুগে গ্রন্থ-জগতের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের বুকডিজাইন, প্রচ্ছদপট ও গ্রন্থচিত্রণের ব্যাপারটিকে তিনি নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন—যার নিতান্তই প্রয়োজন ছিল।

'শকুন্তলা' : মাখন দত্তগুপ্ত

সত্যজিতের সমসাময়িক আর একজন শিল্পীর নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। তিনি হলেন মাখন দত্তগুপ্ত। এক সময় ইনি এবং সত্যজিৎ একই বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জে. কিমারে কাজ করতেন। গ্রামবাংলা বিশেষ করে দেশের সাধারণ মানুষ ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে মাখন দত্তগুপ্তের দৃশ্য সচেতনতা অসাধারণ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' নামে বইটিতে রয়েছে মাখন দত্তগুপ্তের অসামান্য সফল চিত্রকর্ম। কিন্তু সম্ভবতঃ এ'র সবচেয়ে মনে রাখার মত চিত্রকর্ম দেখতে পাওয়া যাবে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শকুন্তলা' বইটিতে। মাখন দত্তগুপ্ত বইটির সারা অঙ্গে সৃষ্টি করেছেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের পবিত্র স্নিগ্ধতা। তাঁর আঁকা শকুন্তলাকে পাই পবিত্রতা ও সরলতার প্রতীক ঋষিকন্যারূপে, তপোবনের মধ্যবর্তী সরোবর, পারাবত, মৃগকুল থেকে শুরু করে দুষ্মন্তের গজ-বাজী-রথ পরিজন সবই যথাযথ—কাহিনী বর্ণিত একটি বিশেষ যুগের স্থান কাল পাত্রের চিত্রণ, ভাবময় এবং বিশ্বাসযোগ্য। পূর্ববর্তী চিত্রকরদের মধ্যে কেউ কেউ এই ধরনের চিত্রকর্মে প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্য ও ভিত্তিচিত্র থেকে কিছু কিছু মালমশলা সংগ্রহ করে, কিন্তু সেগুলির বেশীর ভাগই প্রাণহীন ডামি। শ্রীদত্তগুপ্তের চিত্রকর্মে প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠেছে কবি কালিদাসের কাল। ইনি আমাদের কালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থজগতের জন্য ইনি কাজ করেছেন অত্যন্ত অল্প।

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের যুগের কয়েকজন শক্তিমান গ্রন্থচিত্রকরের মধ্যে রয়েছেন সমর ঘোষ, শৈল

'উজান গঙ্গা': সুধীর মৈত্র

চক্রবর্তী, সুধীর মৈত্র, সমীর সরকার প্রভৃতি। সমর ঘোষ সিগনেট প্রেস প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুলে'র চিত্রকর, এটি গ্রন্থচিত্রণের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু সমর ঘোষের কাছে বাংলা প্রকাশনার অনেক প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও এঁর গ্রন্থচিত্রণের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প।

বাঙালী পাঠক চল্লিশের দশক থেকেই শৈল চক্রবর্তীর চিত্রের সঙ্গে পরিচিত। এঁর ছবিতে সর্বদাই একটা হিউমার এলিমেন্ট থাকে, নিজস্ব স্টাইলের জন্য শৈল চক্রবর্তী কখনই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান না। পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে সমীর সরকার একজন শক্তিমান গ্রন্থচিত্রকর। এঁর বেশীর ভাগ কাজের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় সাময়িকপত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। অ্যাডভারটাইজিং

শিল্পী: শৈল চক্রবর্তী

শিল্পী: সমীর সরকার

এজেন্সির সঙ্গের যুক্ত থাকার ফলে বিদেশী গ্রাফিক ডিজাইনের নিত্যনতুন 'ভোকাবুলারি'র সঙ্গেই ইনি পরিচিত। এ'র গ্রন্থচিত্রণে সত্যজিৎ রায়েরও প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এসব সত্ত্বেও সমীর সরকার পঞ্চাশোত্তর যুগের একজন গণ্য গ্রন্থচিত্রকর। এ'র চিত্রকর্ম নব্যতাযুক্ত এবং আধুনিক চিত্রভাবা এ'র ছবিতে সুপ্রযুক্ত।

এই শতাব্দীর বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণের উৎকর্ষ এ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। দুর্বলতার দিকগুলিও দেখা দরকার। কাব্য, গল্প, কাহিনীমূলক গ্রন্থ ছাড়াও বাংলায় চিত্রসম্বলিত পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষামূলক প্রকাশনার সংখ্যা কম নয়। বাংলায় ছোটদের জন্য রচিত বেশ কয়েকখানি সচিত্র কোষগ্রন্থও রয়েছে। বাংলা ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বা বাংলা পাঠ্যপুস্তক যা ছাপা হয়ে আসছে তার গ্রন্থচিত্রণ দেখলে বোঝা যায় এ বিষয়ে আমাদের কি সীমাহীন বেপরোয়া অবহেলা। অথচ পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছবিগুলি বাস্তবানুগ, যথাযথ ও নির্ভুল হওয়ার কত বেশী প্রয়োজন নিশ্চয়ই তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শিক্ষার বিষয়কে সহজগ্রাহ্য করবার ব্যাপারে নানা ধরনের গ্রন্থচিত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ বর্তমানে এগুলি করার ভার রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক ধরনের অর্ধশিক্ষিত ও দায়িত্বহীন চিত্রকর নামের অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রকাশকের দায়িত্ব কিছু কম নয়। ছোটদের জন্য রচিত চিত্রসম্বলিত কোষগ্রন্থগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সম্পাদিত অধিকাংশ এই ধরনের এনসাইক্লোপিডিক বইগুলির ছবি এত নিম্নমানের যে সেগুলি মুদ্রণের অযোগ্য। অথচ এসব ক্ষেত্রে নির্ভুল ভিস্যুয়াল ইনফরমেশন একান্তই জরুরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বহুকাল পূর্বে প্রকাশিত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ছোটদের কোষগ্রন্থ 'শিশুভারতী'র প্রত্যেকটি বিষয়ের ছবিগুলি যথাযথ করার জন্য যে সযত্ন প্রচেষ্টা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে এই গ্রন্থটিকে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

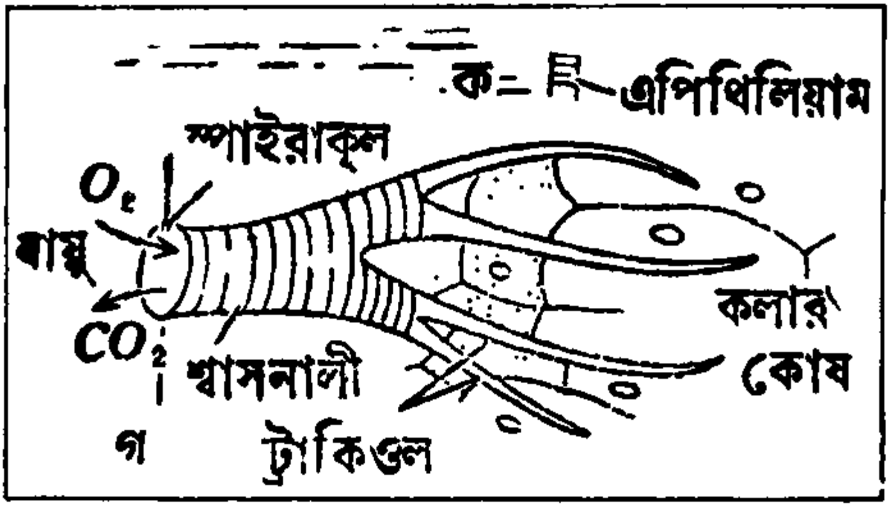

বাংলা জীববিজ্ঞানের গ্রন্থচিত্র: শ্বাসনালী খাড়াভাবে থাকার কথা
কিন্তু জায়গা বাঁচানোর জন্য শায়িত

বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণের আলোচনা শেষ করছি এই শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে। কমলকুমার মজুমদার বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণ বিষয়ে তাঁর একটি প্রবন্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রণ সম্পর্কে প্রচুর প্রশস্তি করে সম্প্রতিকালের বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণের ব্যাপারটা একেবারে শেষে তিন লাইনে মন্তব্য করেছেন: "এখন অবস্থা এই যে বাঙ্গালীর ছবির বইতে আঁকার তেমন নিষ্ঠা আমরা দেখি না। এখন প্রায়ই কমার্শিয়াল শিল্পীরা বই নির্মাণ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের গ্রন্থচিত্রে সৌন্দর্য সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই।" বাংলা বইয়ের গ্রন্থচিত্রণে সম্প্রতিকালের শিল্পী-চিত্রকরদের সম্বন্ধে এটি নিতান্তই অবিচারপ্রসূত অকরুণ উক্তি। নস্ট্যালজিয়া নামক অসুখ বিচক্ষণ সমালোচকদের বিচারবুদ্ধিকেও কতখানি আচ্ছন্ন করতে পারে এটি তার প্রমাণ। বাংলা বইয়ের দুই শতাব্দী ব্যাপী গ্রন্থচিত্রণের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করার আগে এ বিষয়ে ইতিহাস লেখক ও সমালোচকদের সম্ভবতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে উনবিংশ শতকের গ্রন্থচিত্রণের যে ভূমিকা, এই শতাব্দীতে, বিশেষভাবে চল্লিশের দশক থেকে তা বদলে গেছে। বইয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই আজকের গ্রন্থচিত্রণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এই শতাব্দীর

চল্লিশোত্তর গ্রন্থ-চিত্রকরদের জানতে হয়েছে, "Illustration is a lot of things. It can be considered as a work of art, or a visual answer to a specific literary problem. Or it can be both. It can provide information, or elucidation. It can be a means of social comment or it can entertain....By illustration we mean any form of exposition or elucidation. The degree it elucidates or reveals is the degree of its goodness or badness. It can exist on its own, or it may need to be amplified by words, or it can also serve decorative ends. It can be a drawing, a painting, a collage or a photograph; it can also be thumb-print, a geometrical diagram, an ink lot or anything else that communicates."

উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রকরদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা অস্খলিত রেখেও একথা বলা যায়। রামচন্দ্র দাস, বিশ্বম্ভর আচার্য বা মাধবচন্দ্র দাসদের গ্রন্থচিত্রণের কাজ করার সময় এত কথা ভাবতে হত না।

সবচেয়ে বড় কথা হল উনিশ শতকের গ্রন্থচিত্রকরদের জগৎ ছিল বটতলা, চিৎপুর বা কলকাতার আশপাশেই সীমাবদ্ধ; সেই সঙ্গে তাদের চেতনাও ছিল তৎকালীন কলোনিয়াল কালচারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত। প্রতিতুলনায় একালের শিল্পীদের ঘটছে বিশ্বের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ—যা তাদের যুগের দিগন্ত করে দিচ্ছে প্রসারিত। তার প্রকাশ আমরা দেখছি তাঁদের কাজে।

এছাড়া এযুগে প্রসেসব্লক, হাফটোন, রঙিন ছাপার পদ্ধতি, অফসেট প্রভৃতি এসে পড়ার ফলে ছবি ছাপার ব্যাপারে যে সব অসুবিধা দূর হয়েছে তা একালের শিল্পীদের এনে দিয়েছে প্রকাশের অপরিমেয় স্বাধীনতা—যা ধাতু বা কাঠের উপর একমাত্র খুলিখোঁচানো ব্লকের উপর নির্ভরশীল উনিশ শতকের গ্রন্থ-চিত্রকরদের কাছে ছিল কল্পনাতীত।

বাংলা বইয়ের ব্যবসা

গোপালচন্দ্র রায়

বাংলা গ্রন্থের প্রকাশনের ক্ষেত্রে ইংরেজরাই পথিকৃৎ। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সংখ্যায় 'ক্যালকাটা গেজেটে' এই খবরটি বেরিয়েছিল The first book in which Bengalee types were used was Halhed's Bengalee grammar printed at Hoogly at the press established by Mr. Andrews, a book seller in 1778

লালদীঘিতে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ নামে একটি বিলিতি বইয়ের দোকান ছিল। হুগলির প্রেসের মালিক এবং এই বইয়ের দোকানের মালিক সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ বইয়ের দোকান থেকে হলহেডের ব্যাকরণও নিশ্চয় বিক্রি হত। সুতরাং বাংলা হরফ সম্বলিত প্রথম বইয়ের লেখক, হরফ নির্মাতা, মুদ্রাকর এবং বিক্রেতা সবাই ইংরেজ। আধুনিক রীতিতে বই বিক্রির ব্যবস্থা কলকাতায় শুরু হয় ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বিদেশী বই নিয়মিত আমদানী করা হত। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখা যায় থ্যাকার ও সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজের বইয়ের দোকানে বিদেশী বইয়ের সঙ্গে কিছু দেশীয় ভাষার বইও বিক্রির জন্য রাখা আছে। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ফারসী বইয়ের নাম পাওয়া যায়। বাংলা বই ছিল 'চণ্ডী' ও 'গীতা'র অনুবাদ, 'রামায়ণ', 'বারমাস্যা' প্রভৃতি। দেশীয় ভাষার বইয়ের ক্রেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইংরেজ সিভিলিয়ানরা, বিশেষ করে যাঁদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে স্থানীয় লোকের ভাষা শিখতে হত।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হলহেডের ব্যাকরণ প্রকাশিত হবার পর থেকে শ্রীরামপুরে কেরীর ছাপাখানায় কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত কলকাতায় যে সব বাংলা বা বাংলা-ইংরেজী বই ছাপা হয়েছে তারা প্রধানতঃ আইনের অনুবাদ এবং অভিধান। শ্রীরামপুর থেকে নানা ধরনের পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হবার পর থেকে বাঙালী পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি হতে লাগল ক্রমশঃ বাড়তে লাগল বাংলা বইয়ের চাহিদা। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণ ও প্রকাশনে দ্রুত সাফল্যের মূলে ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা পড়ানোর জন্য অভাব ছিল বাংলা বইয়ের। কলেজের পণ্ডিতদের দিয়ে কেরীর নির্দেশনায় নতুন নতুন বই লিখিয়ে শ্রীরামপুরের প্রেস থেকে ছাপানো হত। কলেজ এ কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য দিত। কখনো নগদ টাকা দিয়ে কখনো বা বেশ কিছু বই কিনে। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনশিল্পের অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তার ঘটে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। এ

দেশে ছাপা সব বই তো সংগ্রহ করা হতই তাছাড়া ছিল অনেক মূল্যবান পুরনো পুঁথি। কয়েক বছরের মধ্যেই বইপত্রে গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তখন কলকাতা শহরে সাধারণ পাঠকের বই পড়বার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। তাই কর্তৃপক্ষ, ছাত্র ও শিক্ষক ছাড়া কিছু আগ্রহী নাগরিক-কেও গ্রন্থাগারে পড়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। এর ফল দেখে তাঁরা চিন্তিত হলেন। লাইব্রেরি থেকে বই চুরি যেতে লাগল এবং এই চোরাই বই অনেক বেশী দামে বিক্রি হয় এ খবরও তাঁরা পেলেন। অর্থাৎ বোঝা গেল, বই পড়ার আগ্রহ অনেকেরই আছে কিন্তু বই কিনতে পাওয়া যায় না। এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা করার উদ্দেশ্যে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে ফোর্ট উইলিয়মের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে তা বাজারে বিক্রি করা হবে। এর ফলে চোরেরা জব্দ হবে, কেউ আর ন্যায্য মূল্যের বেশী দেবে না। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন পুস্তক বিক্রেতাকে এজেন্ট করা হল। কেউ কেউ বলেন কলেজ নাকি ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে একটি ছোট বইয়ের দোকানও খুলেছিল। পূর্বে এ সব বই সাধারণতঃ ছাত্র ও শিক্ষকরাই পেত।[১]

এদিকে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসও অনেক বই প্রকাশ করেছে কয়েক বছরের মধ্যে। বাংলা বইয়ের বৃহত্তম পাঠকগোষ্ঠী কলকাতায়। সুতরাং বই বিক্রির জন্য কলকাতায় একটি কেন্দ্র খোলা হল। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায় 'সমাচার দর্পণে'র ৪ এপ্রিল, ১৮৩৫, সংখ্যা থেকে। বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বই 'মিসেস রো রাস্তায়' পাওয়া যেত।[২]

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ত্বরান্বিত হল। সোসাইটি নিজেদের বই বিক্রির সুবিধার জন্য ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু স্কুলের কাছাকাছি একটি বইয়ের দোকান খুলেছিল।

আদিযুগের বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ে মোটামুটি দু'টি ধারা দেখা যায়। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা বই প্রকাশ ও বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ব্যবসা করাটা এই সব প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। শিক্ষাদান এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার ছিল মূল লক্ষ্য।

২

দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকেই কিন্তু উনিশ শতকের শুরু থেকেই পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়কে লাভজনক ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য অনেক ধনী ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বই ছাপিয়ে, বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। ব্যবসার সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৬৫খানি বাংলা বই বেরিয়েছিল বলে স্কুল বুক সোসাইটির রিপোর্টে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা হবে আরও বেশী। কারণ শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত অনেক বই তালিকায় অনুপস্থিত। যাই হোক, তালিকা থেকে আমরা তিনজন প্রধান প্রকাশকের সন্ধান পাই। এঁদের মধ্যে লল্লুলাল-প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১২; বিশ্বনাথ দেব ছেপেছিলেন ৮টি বই; আর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ৭টি। এই কালখণ্ডে সবচেয়ে বেশী বইয়ের লেখক ছিলেন রামমোহন রায়। তাঁর প্রায় সব বই-ই ছেপেছিলেন লল্লুজী, শুধু একখানির প্রকাশক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।[৩]

আদিযুগের বাংলা বইয়ের ব্যবসায় গঙ্গাকিশোরের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন একাধারে প্রেসের অভিজ্ঞ কর্মী, লেখক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা এবং সাংবাদিক। তাঁর সম্বন্ধে 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন:

"The first Hindoo who established a press in Calcutta was Babooram, a native of Hindoosthan... He was followed by Ganga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and established a book-shop. ...He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity ;..."[৪]

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারির 'সমাচার দর্পণে' বলা হয়: "এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত করণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে।... প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল।... শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন।"

সুকুমার সেন বলেছেন, ইউরোপীয় রীতিতে পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে গঙ্গাকিশোর প্রথম।

কিন্তু তাঁব পূর্বে পুঁথিব আকারে ছাপা হযেছিল 'নবোত্তমবিলাস এবং 'জগদীশ চরিত্র বা জগদীশ বিজয়' এই বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ আছে বলে মনে হয না। পুঁথিব আকার প্রাচীনত্বের প্রমাণ হতে পাবে না। কাবণ বর্তমান শতকেও অনেক ধর্মীয পুস্তক পুঁথির আকারে ছাপা হযেছে।

গঙ্গাকিশোবেব বাড়ী ছিল শ্রীরামপুরেব নিকটবর্তী বহড়া গ্রামে। শ্রীবামপুরের মিশনারিদেব ছাপাখানায কম্পোজিটব হিসাবে তাঁব কর্মজীবন শুরু হয। এখানে মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজ দেখে বইযেব ব্যবসাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ কববাব ইচ্ছা জাগে। প্রথমেই ছাপাখানা কেনাব মতো সম্বল ও সাহস তাঁব ছিল না। কলকাতা এসে তিনি ফেবিস কোম্পানীব প্রেসে একটি বই ছাপতে দিলেন। বইটি 'অন্নদামঙ্গল—পুঁথির আকাবে এব বহুল প্রচলন ছিল সে কালে। ছাপতে দেবাব আগে গঙ্গাকিশোব পণ্ডিত পদ্মলোচন চূড়ামণিকে দিযে একটি পুঁথি সংশোধন কবিযে নিলেন। এ থেকে গঙ্গাকিশোবেব বিচক্ষণতাব পবিচয পাওযা যায। ছাপাব আগে যে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাব প্রযোজন—এ শিক্ষা তিনি হযত শ্রীবামপুব থেকে পেযেছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাজ শুরু কবে ছাপা সম্পূর্ণ হল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। এটি যে শুধু আদিযুগেব প্রথম সুমুদ্রিত বৃহৎ গ্রন্থ তা-ই নয, এটি বাংলাব প্রথম সচিত্র গ্রন্থও বটে। ছবি ছিল ছযটি। দুটি ছবিতে শিল্পী হিসাবে বামচাঁদ বাযেব নাম লেখা আছে। বইটিব দাম ছিল চাব টাকা। গঙ্গাকিশোব বই বিক্রিব সুব্যবস্থা কবেছিলেন। বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হওযায তিনি ঐ বছবই প্রকাশ কবলেন বাংলায লেখা ২১৬ পৃষ্ঠাব ইংবেজী ভাষাব ব্যাকবণ। তাবপব একে একে তিনি প্রকাশ কবলেন 'দাযভাগ' (১৮১৭), চিকিৎসার্ণব (১৮২০), 'শ্রীভগবদ্গীতা (১৮২০), দ্রব্যগুণ (১৮২৪)। এ বইগুলিব প্রায সবই তাব নিজেব বচনা বলে কেউ কেউ বলেছেন। পুবানো বই ছেপেও তিনি বিক্রি কবেছিলেন। এদেব মধ্যে 'অন্নদামঙ্গলেব কথা পূর্বেই বলা হযেছে। তাছাড়া 'গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী, বেতালপঞ্চবিংশতি, চাণক্যশ্লোক প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি প্রকাশ কবেছিলেন বলে শোনা যায।

পুস্তক বিক্রেতা হিসাবে সাফল্য লাভ কবায তিনি নিজেই হবচন্দ্র বাযেব সহযোগিতায একটি প্রেস স্থাপন কবেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নাম ছিল বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস। ঐ বছবেব মাঝামাঝি গঙ্গাকিশোব সম্পাদিত বাঙ্গাল গেজেটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয। স্বল্পজীবী এই পত্রিকাটি বাংলা ভাষাব দ্বিতীয কিন্তু বাঙালী পবিচালিত প্রথম পত্রিকা।

হবচন্দ্রেব সঙ্গে মতবিবোধ হওযায গঙ্গাকিশোব স্বগ্রাম বহড়ায প্রেস নিযে যান। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেখানেই তাঁব মৃত্যু হয। বাংলা পুস্তক ব্যবসাযেব পথিকৃৎ গঙ্গাকিশোবেব নাম আজ আমবা প্রায ভুলতে বসেছি।[৫]

গঙ্গাকিশোব যে বৎসব নিজেব ছাপাখানা খোলেন তাব এক বছব পূর্বে, অর্থাৎ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিব প্রতিষ্ঠা হয। পববৎসব সুসম্বদ্ধ রূপে শিক্ষা বিস্তাবেব উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি—যাব প্রাণপুরুষ ছিলেন ডেভিড হেযাব। কলকাতায এবং মফঃস্বলে তখন অনেক স্কুল স্থাপিত হযেছে। ছাত্রদেব জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ কবে অল্প মূল্যে সববরাহ কবাই ছিল স্কুল বুক সোসাইটিব উদ্দেশ্য The Society was formed for the preparation of publications and cheap supply of works useful for learning '

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজেব নিকটে সোসাইটি একটি বইযেব দোকান শুরু কবে। এ সম্বন্ধে সোসাইটিব বিপোর্টে বলা হযেছে With the view to promote the purchase of books by the pupils of the various institutions for native education in Calcutta, the Committee have established a retail shop near the Hindu College '

বাংলা প্রকাশনশিল্পেব ভিত্তি সুদৃঢ় কবতে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির দান শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণীয। সোসাইটি নানা বিষযেব উপব যোগ্য লোক দিযে বই লিখিযে সুন্দবভাবে ছাপিযে প্রকাশ কবেছে। বাংলা কোষগ্রন্থেব বচনা ও প্রকাশেও সোসাইটিব আগ্রহ ছিল। শ্রীবামপুব মিশন প্রেস, ফোর্ট উইলিযম কলেজ এবং স্কুল বুক সোসাইটিব মুখ্য উদ্দেশ্য পুস্তক ব্যবসা ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের বচনা ও প্রচারই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু এমন অনেক ছাত্রপাঠ্য পুস্তক ছিল যা সাধারণ পাঠকও সাগ্রহে পড়ত। সাধারণ পাঠকের চিত্তবিনোদনযোগ্য গ্রন্থ সববরাহ কবতে সক্ষম হযেছিল ভার্নাকুলাব লিটাবেচাব সোসাইটি (১৮৫১)। সাধাবণতঃ বিদেশী কাহিনীব অনুবাদ প্রকাশই ছিল এই সোসাইটির কাজ। মুখ্য অনুবাদক ছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

৩

নানা কাবণে মিশন প্রেস, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও স্কুল বুক সোসাইটির শিক্ষামূলক গ্রন্থ

রচনা ও প্রকাশের উদ্যম যখন স্তিমিত হয়ে এল তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকাশক হিসাবে আবির্ভাব ঘটল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর কলেজের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে মনোমালিন্য চলছিল। শেষ পর্যন্ত ১৬ জুলাই ১৮৪৭ তিনি পদত্যাগ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নতুন কাজে যোগ দেন ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। উপার্জনের পথ যখন অনিশ্চিত তখন তিনি সহকর্মী ও সুহৃদ মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে সংস্কৃত প্রেস এবং বইয়ের দোকান সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি স্থাপন করেন। খুব সম্ভব ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই নতুন উদ্যোগের সূত্রপাত। এটা বাংলা প্রকাশনশিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে বইয়ের ব্যবসার সূচনা এই থেকেই। স্কুল বুক সোসাইটির বইয়ের দোকান কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিদ্যাসাগর ছয় শত টাকা ঋণ করে একটি কাঠের প্রেস কিনে কাজ শুরু করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে রক্ষিত পুথি অবলম্বনে 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে এই ঋণ শোধ করা সম্ভব হয়েছিল। গঙ্গাকিশোরের মতো বিদ্যাসাগরও 'অন্নদামঙ্গল' দিয়ে তাঁর ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। মদনমোহন জজ-পণ্ডিতের চাকরি পেয়ে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করবার পর প্রেসের মালিক হন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা সব বই, তাছাড়া অন্যের বইও ছাপা হত এখানে। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি ছিল সে কালের আদর্শ বইয়ের দোকান। তাঁর নিজের লেখা ৩২টি ও সম্পাদিত ৬টি বই বিক্রির জন্যই একটি উপযুক্ত কেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', 'ঋজুপাঠ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকের বিক্রি ছিল প্রচুর। তাছাড়া 'ডিপজিটরি' অন্য লেখকদের বই জমা রাখত। বই বিক্রি হলে কিছু কমিশন কেটে টাকা দিয়ে দেওয়া হত। যথাসময়ে প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দেবার জন্য এবং যথাযথ হিসাব রাখার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি সকলেরই আস্থাভাজন হয়েছিল। সৎ পুস্তক ব্যবসায়ের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগর।[৬]

শিক্ষাব্রতী এবং সমাজসেবী বিদ্যাসাগরের সততা সম্বন্ধে আমরা অনেক দৃষ্টান্ত অবগত আছি। ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরও যে কত সৎ ছিলেন তার একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের রচিত পাঠ্যপুস্তকের তখন প্রায় একচেটিয়া বাজার। তাঁর নিজের বই থেকেই মাসিক আয় তিন চার হাজার টাকা। বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার এক কমিটি নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগরকে এর সভ্য করা হয়। কিন্তু তিনি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্বন্ধে 'মধ্যস্থ' পত্রিকা লিখেছেন:

"পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কমিটিতে শ্রীযুত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বহু পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা, এ জন্য অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু হায়! অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাগণ অম্লানবদনে উক্ত নিয়োগে সম্মত হইয়াছেন।"[৭]

৪

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রভৃতি বাংলা বইয়ের ব্যবসার একটি ধারা —যে ধারাটির উত্তরাধিকারী কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের পুস্তক ব্যবসায়। কিন্তু আদিযুগে আর একটি ধারা, যা হয়ত অধিক জোরালো, বইয়ের ব্যবসাকে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। এটি হল বটতলার প্রকাশনশিল্প। উপরে প্রাক্-১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের যে তিন জন প্রধান বাংলা বইয়ের প্রকাশকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথ দেবই হলেন বটতলার অগ্রণী পুস্তক ব্যবসায়ী। তিনিই বোধ হয় এ অঞ্চলে প্রথম ছাপাখানা খুলে বিক্রির জন্য বই ছাপাতে শুরু করেন। অঞ্চলটার পরিধি সঠিক ভাবে নির্দেশ করা না গেলেও মোটামুটি বলা যায় —শোভাবাজার থেকে আরম্ভ করে বীডন স্কোয়ার পর্যন্ত চিৎপুর রাস্তার দু'পাশের জায়গাকে বটতলা বলা হত। এই জায়গায় অনেক ছাপাখানা ছিল এবং নানা বিষয়ের বই ছাপা হত। ছাপা ও বাঁধাইয়ের প্রতি অমনোযোগী সস্তা বই যেখান থেকেই বেরুত তাকেই বটতলার বই বলে আখ্যা দেওয়া হত। বটতলায় হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীরই পুস্তকের ব্যবসা ছিল। ধর্মগ্রন্থ, সংস্কৃত ও পারস্য সাহিত্যের কাহিনীর ভাবানুবাদ, চটুল গল্পকথা, জাদুবিদ্যা, মোহিনীবিদ্যা ও নানাবিধ তুকতাকের বই ছিল পাঠকদের প্রিয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ বটতলার প্রকাশকদের জন্য প্রচার লাভ করেছে। কিন্তু পাঠশুদ্ধির দিকে প্রকাশকদের যত্ন ছিল না। অনেক সময় জ্ঞাতসারে পাঠবিকৃতি ঘটানো হত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "চন্দ্রশেখরের আর একটা ব্যসন ছিল, তিনি বটতলার দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং পুরাতন পুথি ও কাব্য যাহা ছাপা পাইতেন, তাহাই খরিদ করিতেন। চন্দ্রশেখরই বটতলার ফাঁকিবাজী ধরিয়া দেন। বটতলার অধীনে জনকয়েক পয়ারপটু ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন, তাঁহারা ত্বরিৎ রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ইঁহারা "প্রক্ষেপের" (interpolation) রাজা

ছিলেন; যেখানে পুরাতন পুথি পড়া যাইত না বা অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইত, সেখানেই ইঁহারা স্বরচিত গোটাকয়েক শ্লোক বসাইয়া কাজ সারিতেন। চন্দ্রশেখর এই কান্ডটা ধরাইয়া দেন এবং বটতলার গুপ্ত কবিদিগের দুই তিন জনের নামও প্রকাশ করেন। চন্দ্রশেখরের এই আবিষ্কারের ফলে প্রভুপাদ বলাইচাঁদ ও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, উভয়ে মিলিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া 'চৈতন্য ভাগবতে'র একটি পবিত্র সংস্করণ বাহির করেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে'রও কতকটা সংস্কার এই সময়ে ঘটিয়াছিল।"[৮]

এই সব অপরাধ সত্ত্বেও বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ের আদিযুগে অত্যন্ত সুলভ মূল্যে রামায়ণ, মহাভারত, নানাবিধ ধর্মপুস্তক, যাত্রা, পাঁচালী, গল্প-কাহিনী সরবরাহ করে বাঙালী পাঠকদের, বিশেষ করে গ্রামবাসীদের, ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন বটতলার প্রকাশকরা।

বটতলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন। মুসলমানী বইয়ের বিশেষ কেন্দ্র ছিল কলিঙ্গা বাজার,—নিউ মার্কেটের পূব দিকে ছিল এর অবস্থিতি। বিদেশী বই অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে নিয়মিত কলকাতায় আমদানী করা হত। কয়েকজন বাঙালী বিদেশী বই বিক্রির ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। চীনাবাজারের অন্যতম ব্যবসায়ী ছিলেন মধুসূদন দে।

৫

যে কোনো ব্যবসার প্রধান কথা হল বিপণন ব্যবস্থা। প্রথম যুগে এখনকার মতো এত বইয়ের দোকান ছিল না। বাংলা বই ছাপা শুরু হবার বেশ কিছুকাল পর পর্যন্ত বই বিক্রি হত ছাপাখানা থেকে। তাই বইয়ে প্রাপ্তিস্থান হিসাবে থাকত ছাপাখানার নাম, প্রকাশকের নাম থাকত না। কখনো কখনো লেখক বা তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়ের ঠিকানাও দেওয়া হত প্রাপ্তিস্থান হিসাবে। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' এবং 'সমাচার দর্পণে'র সাক্ষ্য থেকে জানা যায় বাংলা বই বিক্রির জন্য গঙ্গাকিশোরই প্রথম দোকান করেন আনুমানিক ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি মফঃস্বলের শহরে ও প্রধান প্রধান গ্রামে বই বিক্রির সুবিধার জন্য এজেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন। এর পরেই স্কুল বুক সোসাইটির দোকান (১৮২৬)। তারপরে স্থাপিত হল বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, সুপরিচালিত এবং সর্ববৃহৎ বাংলা বই বিক্রয়ের কেন্দ্র। অবশ্য এর মধ্যে বটতলা অঞ্চলে কিছু কিছু বইয়ের দোকান খোলা হয়েছে। একই বাড়ীতে প্রেস ও দোকান। সামনের দিকে ছোট দোকান, ভিতরে প্রেস।

কিন্তু প্রথম ৫০/৬০ বছর দোকানের চেয়েও বই বিক্রির জোরালো ব্যবস্থা ছিল ফিরিওয়ালার মারফৎ বাড়ী বাড়ী বই পাঠানো। বিশেষ করে বটতলার প্রকাশকরা ফিরিওয়ালার উপরই বই বিক্রির জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করতেন। ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি একজন মহিলা ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা নিযুক্ত করে ভাল ফল পেয়েছিলেন। বর্তমান শতকের প্রথম দিকেও বইয়ের ফিরিওয়ালা ছিল। এখনও দেখা যায় দু'একজন ফিরিওয়ালা 'বাল্যশিক্ষা', 'ধারাপাত', 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' জাতীয় বই নিয়ে হাঁক দিয়ে যায়। বিগত শতকের ফিরিওয়ালারা বছরে ৭/৮ মাসের মতো কাজ করত। বর্ষা ও চাষের সময়টা দেশে চলে যেত। এদের মাসিক বেতন ছিল ৬/৭ টাকা।

টাকা দিয়ে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেবার প্রথা তখন ছিল না বললেই চলে। অন্ততঃ ১৮৬০-'৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। বইয়ের সংখ্যা এত কম ছিল যে নতুন বইয়ের প্রকাশকে সংবাদ হিসাবে দেখা হত। কাগজে নতুন বইয়ের ইশতিহার বা বিজ্ঞপ্তি বের হত। সেই বিজ্ঞপ্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

সমাচার দর্পণ। "সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।—শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায়ে এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতিসংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪॥ সাড়ে চারি টাকা প্রতিপুস্তক বিক্রয় হইতেছে যে ২ মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্শ্বে জোড়া পুষ্করিয়ার নিকট শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪॥ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন। ইতি তারিখ ২০ ভাদ্র সন ১২২৬।"[৯]

সম্প্রতি অগ্রিম টাকা দিয়ে তালিকাভুক্ত হলে গ্রাহকদের কিছু কমিশন দেবার কথা বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয়। পূর্বেও অনেক প্রকাশক এই পদ্ধতিতে বই ছাপতেন, তবে অগ্রিম টাকা নেওয়া হত না। শুধু আগে নাম লেখালেই দাম কিছু কম দেওয়া যেত। 'সমাচার দর্পণে'র (৩১ মার্চ, ১৮২১) এই বিজ্ঞপ্তি থেকে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হবে:

"ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই কলমে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক।

যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"[১০]

৬

বাঙালী প্রকাশক পাঠ্যপুস্তক এবং দ্রুত বিক্রয়যোগ্য বই ছাড়া অন্য বইয়ে আগ্রহী ছিলেন না দীর্ঘকাল। বটতলার প্রকাশকরা লেখক অথবা সম্পাদককে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি কিনে নিতেই অভ্যস্ত। উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধের বই বিগত শতকের অনেক লেখক ও মনীষী বইপত্র ছাপার সুবিধার জন্য নিজেরা ছাপাখানা করেছেন অথবা কোন ছাপাখানার উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ছাপাখানার সঙ্গে জীবনের কোনো এক সময় কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর জন্য নিজস্ব প্রেস ও প্রকাশন বিভাগ স্থাপন করতে হয়েছিল।

যাঁদের ছাপাখানার সঙ্গে যোগ ছিল না এবং আর্থিক সঙ্গতিও ছিল না তাঁদের পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা প্রয়োজন হত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রকাশিত হয়েছিল পাইকপাড়ার রাজাদের অর্থানুকূল্যে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ও 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এমন কি, 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের জন্যও কোনো প্রকাশক এগিয়ে আসেননি। দিগম্বর মিত্র অর্থ সাহায্য করায় ঈশ্বরচন্দ্র বসু প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের সব বই নিজের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম অনুমোদন না করলেও পরে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[১১] ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম কাঁটালপাড়ায় নিজের প্রেস ও দপ্তরিখানা স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বৎসরের 'বঙ্গদর্শন' এখান থেকেই ছাপা হত। তাঁর কিছু বইও এখান থেকে ছাপা হয়েছিল এমন প্রমাণও আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেই দিন সকালে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি প্রেসে গিয়া ভিতরে বাঁধান একখানি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আনিয়া আমাকে দিলেন। বলিলেন—রেল গাড়ীতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানা প্রথম বাহির হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশনশিল্প সম্বন্ধে যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি চিঠি থেকে। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্কিমের সম্পাদনায় তাঁর রচনা-সংকলন 'সঞ্জীবনী সুধা' প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশকে সাহায্য করাই ছিল উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে জ্যোতিশকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা থেকে তৎকালীন প্রকাশনার ব্যয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চিঠিটি এই: ". বইখানির ('সঞ্জীবনী সুধা') একচেটিয়া লইবার জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আপাততঃ দুই শত টাকা মাত্র দিয়াছেন। বাকি টাকা বই বিক্রয় করিয়া ক্রমশ দিবেন। সে এখন দুই বৎসর, আড়াই বৎসরের কথা।

বই ছাপাইতে ১১ × ৪ = ৪৪ টাকা খরচ পড়িয়াছে। আবার কাগজেরও ঐ মূল্য অর্থাৎ চুয়াল্লিশ টাকা পড়িয়াছে। ৪৪ + ৪৪ = ৮৮ টাকা আমি ঐ দুই শত টাকা হইতে দিয়াছি। বাকি ১১২ টাকা তোমার কন্যার বিবাহের বাজার দেনা শোধ করিয়াছি।...

ঐ পুস্তক সমস্ত বিক্রয় হইলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার হিসাব দিতেছি—

ছাপা হইয়াছে—১০০০ কপি; বাদ—প্রেস কপি ১, গভর্নমেণ্ট ১, দপ্তরির কাছে কম ছিল, হওয়া সম্ভব—৩, জ্যোতিশবাবু ১, চন্দ্রনাথ বাবু ১, নিজ ১, ছোটবাবু ১, হিন্দু পেট্রিয়টের রিভিউ ১, জ্যোতিশবাবুকে বিতরণের জন্য পাঠান যাইবে ১, নিজ বিতরণের জন্য রাখিব১ = ১৬; বাকি ৯৮৪ কপি।

মূল্য বার আনা হিসাবে—	৭৩৮ টাকা
কমিশন বাদ ২৫৲ টাকা হিসাবে	১৮৪৷৷৹
	৫৫৩৷৷৹
আদায়	৩৫৩৷৷৹

ইহার মধ্য হইতে লইব বাঁধাই খরচ ১৩০ টাকা।"[১২]

'সঞ্জীবনী সুধা' বইটি ছিল ১৬ পেজি ডবল ক্রাউন কাগজে ছাপা বই। বঙ্কিমের চিঠি থেকে

জানতে পারা যায় প্রায় একশ' বছর পূর্বে ছাপা, বাঁধাই ও কাগজের ব্যয় কি ছিল, বিক্রেতাকে কি কমিশন দিতে হত।

দুঃখের বিষয় 'সঞ্জীবনী সুধা' বিক্রি হয়নি। আর একটি চিঠিতে বঙ্কিম জ্যোতিশচন্দ্রকে লিখছেন, গুরুদাসকে টাকা ফেরত দিতে হবে। অন্য এক চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, সঞ্জীবের 'জাল প্রতাপচাঁদ' ছাপাবার মতো টাকা নেই। সুতরাং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের উপরে নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। গুরুদাস রয়েলটি দেবে মাত্র ৬০্ টাকা। এই শর্তেই রাজী হতে হবে। 'জাল প্রতাপচাঁদে'র দ্বিতীয় সংস্করণের দাম ছিল এক টাকা। সুতরাং রয়েলটির হার হল শতকরা ৬্ টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

পুস্তকের অঙ্গসজ্জার দিকেও বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল। তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গ্রন্থের একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোনার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।"

রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না। তাঁর প্রথম বই 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮) প্রকাশ করেছিলেন বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। দ্বিতীয় বই 'বন-ফুল' (১৮৮০) দাদা সোমেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত নূতন পুস্তক

সচিত্র

কন্দর্প-কোহিনুর।

৫০০ বৎসরের প্রাচীন প্রথম কবি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সমস্ত কবিগণের প্রেমপূর্ণ পদ্য লহরী।

ইহা—

পূর্ব্বরাগ, সোহাগ, মান, বিদায় বিরহ ও মিলন এই ছয়টী উপাদানে সংযুক্ত হইয়া তদুপযুক্ত নানাবিধ মনোমুগ্ধকর চিত্রে পরিশোভিত।

ইহা পাঠে—

যুবক যুবতীর হৃদয়ে আনন্দ তরঙ্গ নিনাদিত হইবে, বিরহীজনের বিরহ যন্ত্রণায় মহৌষধি স্বরূপ কার্য্য করিবে, প্রণয়ীজনের প্রেম পিপাসা বলবতী হইবে, এবং প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমালাপ মধুর উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইবে।

বঙ্গের সমস্ত কবিগণের—

এই অমূল্য রত্নরাজি পাঠ করিয়া জীবন চরিতার্থ করুন, প্রণয়ে পবিত্রতা স্থাপন করুন, প্রেমে প্রাণ মিলান এবং আনন্দে আত্মহারা হউন।

যাঁহার—

যে ভাবের কবিতার প্রয়োজন হইবে, যাঁহার প্রাণ যে রকমের কবিতা পাইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহার প্রাণে যা ভাল লাগে, ইহাতে আত্মভাবের মত সেই সেই রকমের মনোমত কবিতা পাইবেন। অধিকন্তু যাঁহার কিছুই প্রয়োজন নাই কিঞ্চিৎ বিরামে বসিয়া ২।১টী মাত্র পদ্য পড়িলে সমস্ত শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

এহেন সুন্দর—

বিলাতি অ্যান্টিক প্রেস কাগজে, স্বোয়া দুই রঙে ছাপা, স্বর্ণাক্ষরে মণ্ডিত বিলাতি বাঁধান, এমন বিজ্ঞাপিত [illegible] নিজ প্রণয়িনীকে উপহার দিউন।

সংবাদপত্র ও পণ্ডিত মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত মতামত

"* * এই পুস্তক মানব হৃদয়ে আনন্দ লহরী ছুটাইবে—বিরহীর মন মরুভূমে আবার প্রণয়কলীর সৃষ্টি করিবে * *।

৩০২ পৃঃ ক্রাউন-অক্টেভো সাইজ, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী—২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[পর পৃষ্ঠায় ছবির নমুনা দেখুন]

কন্দর্প কোহিনূরের ছবির নমুনা।

'কন্দর্প' গর্বিত মন মোহিনী তোমায়।
বহু সাধে সাধি তব যোগ্য অলঙ্কার।
তাই আমি 'কোহিনূরে' দিতেছি তোমার করে।
লও প্রিয়ে সযতনে প্রেম উপহার।

[এই রূপ নানাবিধ বহু চিত্র আছে]

বইয়ের বিজ্ঞাপন

প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কবির প্রথম 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৮৯৬) প্রকাশক। পরবর্তী সময়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার লাইব্রেরি থেকে তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন। কবির গানের প্রথম সংকলন 'রবিচ্ছায়া' (১৮৮৫) প্রকাশ করেন তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিকেই তাঁর বই প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আদিপর্বে ব্যতিক্রম দেখা যায় তিনটি। কলেজ স্ট্রীটের এস. কে. লাহিড়ী ও পীপল্‌স্ লাইব্রেরি এবং ডাফ স্ট্রীটের সুর কোম্পানী মোট তিনটি বই প্রকাশ করেছিলেন। ব্যয়ের দায়িত্ব কবির ছিল কিনা জানা যায় না।[১০]

বর্তমান শতকের প্রথম দশকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসকে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। তাঁরা কবির গ্রন্থাবলী যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ছাপতেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সূচনা হয় তখন ইণ্ডিয়ান প্রেস রবীন্দ্রনাথের প্রায় একশত বইয়ের উপর তাঁদের যে স্বত্ব ছিল তা স্বল্প মূল্যে হস্তান্তরিত করেন।

এখন রবীন্দ্রনাথের বই হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়। দুঃখের বিষয় এই সমাদর কবি দেখে যেতে পারেননি। ১৩০৪ সালে মধুসূদন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বইও অর্ধমূল্যে বিক্রয়ের কথা জানা যায়। কবির পুস্তকাবলীর মধ্যে ছিল 'চিত্রাঙ্গদা', 'মানসী', 'সোনার তরী' প্রভৃতি। অর্থের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা' পর্যন্ত প্রকাশিত সকল কাব্যগ্রন্থ এবং গ্রন্থাবলী ১৩০৭ সনে ছয় হাজার টাকায় গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করতে চেয়েছিলেন।[১১]

অর্ধমূল্যে বই বিক্রয়ের বেদনা শুধু লেখকদেরই ছিল না। প্রকাশকদেরও এ নিয়ে আক্ষেপ ছিল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী ছেপেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি এই 'বিজ্ঞাপন' সংযোজন করেছিলেন: "প্রায় দুই বৎসর গত হইল, আমি রাজকৃষ্ণবাবুর ১৪ টাকা মূল্যের ক্ষুদ্রাকার ও বৃহদাকার ১৪খানি গ্রন্থ একত্র করিয়া প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী নামে প্রকাশ করি। একেবারে ১৪ টাকা দিয়া ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করা সকলের পক্ষে সুবিধা নয় বলিয়া ৪ টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। তাও আবার নিয়মিত সময়ের মধ্যে সকলের পক্ষে ক্রয় করিবার আরও সুবিধা হইবে বলিয়া ২ টাকা মাত্র মূল্য ঠিক করা হইয়াছিল। ঈশ্বরের কৃপায় ও পাঠকগণের উৎসাহে প্রথম ভাগ গ্রন্থাবলী অল্পদিনের মধ্যে আমাদের আশাতীত পরিমাণে বিক্রীত হইয়াছে।...

যদি ইউরোপ বা আমেরিকার সুলভ পুস্তকাবলীর কাটতির ছায়ামাত্রও আমাদের দেশে থাকিত, তাহা হইলে ৭০/৭৫ ফর্মা কেন, ২ টাকায় ২০০ ফর্মার পুস্তক অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারিত। এই গ্রন্থাবলী প্রতি সংস্করণে অন্তত ৫০০০ হিসাবে বিক্রিত হইলেও অনায়াসে ১০০ ফর্মা পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারিত। এ দেশে এখনও সেই শুভদিন আসে নাই বলিয়া ক্ষতির হাত এড়াইবার জন্য আর ততদূর পারা গেল না। তবু ৭০/৭৫ ফর্মার পুস্তক নিয়মিত সময়ের মধ্যে দুই টাকা দিয়া ক্রয় করিলে কে না সুলভ জ্ঞান করিবেন।

২০১ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা   শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।"

১২ই পৌষ ১২৯২

এই বিজ্ঞপ্তির পাদটীকায় গুরুদাস আরও লিখেছেন: "এ কথায় কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে অত্রত্য বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামী মহাভারত অত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় কেন? কিন্তু তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বটতলার ঐ সকল পুস্তক এ দেশের অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা প্রতি বৎসর প্রায় কুড়ি গুণ পরিমাণে বিক্রয় হয়। আবার ছাপা ও কাগজও উৎকৃষ্ট নয়। ভাল ভাল সকল পুস্তকের ঐরূপ কাটতি হইলে আর ভাবনা কি!"

গুরুদাসের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে তিনি রয়েল সাইজের ৬০০ পৃষ্ঠার সচিত্র বই দু'টাকা দামে বিক্রি করেছিলেন প্রায় ৯৫ বছর পূর্বে। বটতলার প্রকাশকরা এর চেয়ে বড় বই ('রামায়ণ', 'মহাভারত', ইত্যাদি) আরও কম দামে বিক্রি করতেন।

লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্রকে ভাগ্যবান বলতে হয়। কারণ প্রথম থেকেই প্রকাশকরা তাঁর বই ছাপবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অর্থাভাবে বিব্রত হয়ে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করে উদ্ধার পেতে চেয়েছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের নিকট ২০০্ টাকায় 'বিরাজ বৌ'-এর কপিরাইট বিক্রয় করেন। এটা মার্চ মাসের কথা। মাস তিনেক পরে তিনি ঐ মূল্যেই 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' গল্প তিনটির গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করেন। ফলে তিনি শুধু যে এ বইগুলির রয়েলটি থেকে বঞ্চিত হলেন তা নয়, কাহিনীগুলির চিত্রস্বত্ব ও মঞ্চস্বত্বের প্রচুর আয়ও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রকাশকদের বিরুদ্ধে লেখকদের নানা অভিযোগ এ কালেও যেমন আছে সেকালেও তেমনি ছিল। ববীন্দ্রনাথেরও ছিল অভিযোগ। মজুমদাব লাইব্রেরি তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছিল। সম্পাদক মোহিতচন্দ্র সেন। কবি সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখলেন,

'গ্রন্থাবলী কি পর্যন্ত হলো আমি তাব কিছুই জানিনে। ফর্মা চারেকেব ফাইল পেয়েছিলেম —তাবপবে আমাব ববাদ্দ বন্ধ। আমাব প্রতি নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকেব মত ব্যবহাব করা হচ্ছে —শৈলেশেব কাছ থেকে কোনো খববও পাইনে, আশাও পাইনে, প্রুফও পাইনে। যা ছাপা হচ্ছে তাতে ভুলচুক আছে কিনা তাও বুঝতে পাবছিনে। যে জননীব ছেলে যুদ্ধে গেছে, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সেনাপতি মহাশয় বাড়িতে খবব পাঠান নিষেধ কবেছেন আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রগত সন্তানেব [মাতাব] মত বসে আছি—ছেলেব গায়ে অস্ত্র লাগছে কিনা তাও জানিনে, সে জয়ী হচ্চে কিনা সে খববও পাইনে—এখন কোথায় কোন লড়াইটা হচ্চে সে জনশ্রুতিও আমাব কানে আসে না। কোনো দেশেব কোনো প্রকাশক গ্রন্থকাবেব প্রতি এবকম নিষ্ঠুব আইন চালায়নি। ১২ই চৈত্র ১৩০৯।"[১৩]

৭

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটবি স্থাপিত হবাব পব কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয এবং আবও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয। সুতবাং স্বাভাবিকবৃপেই কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে বইয়েব ব্যবসা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। বিগত শতকেব যে সব প্রকাশন সংস্থা বইয়েব ব্যবসাকে ক্রমোন্নতিব পথে নিয়ে গিয়েছিল তাদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য এ টি দেব, ক্যানিং লাইব্রেবী, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেবী, এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, এস সি আঢ্য, দাশগুপ্ত, বি ব্যানার্জি, মৈনুদ্দীন প্রভৃতি। এ টি দেবেব সূত্রপাত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, ছাপাব কাজ দিযে। অল্পদিনেব মধ্যেই প্রকাশন ব্যবসাও এ'বা আবম্ভ কবেন। এ টি দেবেব বিভিন্ন অভিধান সুপ্রচলিত। এক সময অভিধান প্রকাশনায় এ'দেব একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সুবল মিত্র সংকলিত অভিধান। এ'দেব সহাযক প্রতিষ্ঠান দেবসাহিত্য কুটিব (১৯২৪)। এ টি দেব ও দেবসাহিত্য কুটীব অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, অর্থ পুস্তক, ছেলেদেব বই প্রভৃতি প্রকাশেব দিকে বেশী মনোযোগী।

এ টি দেবেব প্রতিষ্ঠাতা ববদাবাবুব সংস্থাব চেযে বেশী নাম ছিল যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব ক্যানিং লাইব্রেবীব। নতুন লেখকদেব বই ছাপাবাব মতো সাহস ও ঔদার্য যোগেশবাবুব ছিল। তাবকনাথ বন্ধুদেব সংগে বাজী বেখে 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৩) সমাপ্ত কবে যখন প্রকাশেব ব্যবস্থা কবতে পাবছিলেন না তখন ক্যানিং লাইব্রেবিব যোগেশচন্দ্র এগিযে এসে নবাগত তবুণ লেখকেব বই ছাপাব ঝুঁকি নেন। পবিণামে প্রকাশক লাভবান হযেছিলেন।[১৩]

ক্যানিং লাইব্রেবীব মতো বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেবী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেবীব প্রতিষ্ঠাতা গুবুদাস চট্টোপাধ্যায ছিলেন অত্যন্ত দবিদ্র। তাই বাধ্য হযে তাঁকে কলকাতাব হিন্দু হোস্টেলে 'বয' এব চাকবি নিতে হয। ঐ হোস্টেলে কযেক জন ডাক্তাবী ছাত্রও থাকতেন। তাঁদেব চাহিদা অনুযাযী ডাক্তাবী বই সবববাহ কবে কিছু উপাবি আয কবতেন। ক্রমে তাঁব সততা ও দক্ষতা দেখে অনেক খ্যাতিমান লেখকও বিক্রিব জন্য তাঁব কাছে বই বেখে যেতেন। বজনীকান্ত গুপ্তেব 'সিপাহী যুদ্ধেব ইতিহাসেব (১ম খণ্ড) প্রকাশক গুবুদাস। প্রথমে তিনি হোস্টেলে বই বেখে বিক্রি কবতেন। ব্যবসাযেব বিস্তাব ঘটায বৌবাজাবে একটি দোকান খোলা হল ১৮৭৬ নাগাদ। এব পব থেকে ক্রমশঃ উন্নতিব মধ্য দিযে ও স্থান পবিবর্তন কবে স্থিতি লাভ কবলেন কর্নওযালিস স্ট্রীটেব বাড়ীতেই (১৮৮৫) এবং বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেবীব নাম হল গুবুদাস চট্টোপাধ্যায অ্যান্ড সন্স। পববর্তী সমযে শবৎচন্দ্র এ'দেব প্রধান লেখক হলেও বাংলাব বহু খ্যাতনামা লেখকেব গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এখান থেকে প্রকাশিত হযেছে।

বামতনু লাহিড়ীব পুত্র শবৎকুমাব এস কে. লাহিড়ী কোম্পানীব প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮৩)। বহু ভাল লেখকেব প্রবন্ধের বই এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত হযেছে। ববীন্দ্রনাথেব প্রকাশক শৈলেশচন্দ্রেব মজুমদাব লাইব্রেবিব কথা পূর্বেই বলেছি।

বিগত শতকেব বাংলা বইয়েব ব্যবসাব কথা অসম্পূর্ণ থাকবে বসুমতী সাহিত্য মন্দিবেব কথা উল্লেখ না কবলে। প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায অল্প বযসে বটতলাব এক দোকানে পাঁচ টাকা বেতনে কর্মজীবন আবম্ভ কবেন। ক্রমে মালিকেব দোকানটি কিনে তিনি নিজেব পবিকল্পনা অনুযাযী শুবু কবলেন ব্যবসা। এখানে কিছুকাল থেকে প্রথমে বীডন স্ট্রীট হযে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চলে এলেন গ্রে স্ট্রীটে। নিজস্ব প্রেস হল। বর্তমান ভবনে এসে ব্যবসাব বিস্তাব ঘটে। 'বাজভাষা', শিশুশিক্ষাব নানা বই, ধর্মগ্রন্থ বিবিধ সামাজিক কেচ্ছা প্রচুব পযসা দিযেছে। আবাব অক্ষযকুমাব দত্তের 'ভাবতবর্ষীয উপাসক-সম্প্রদায়ে'র মতো মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থও পাওয়া গেছে 'বসুমতী'র কাছ থেকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল 'বসুমতী'ব গ্রাহকদের জন্য

সুলভে গ্রন্থ উপহারের পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত প্রাচীন ও সমকালীন লেখকদের রচনা-বলী সস্তায় পাঠকদের নিকট পৌঁছে দিয়ে 'বসুমতী' বাঙালীকে সাহিত্যমনস্ক করে তুলতে সহায়তা করেছে এবং এর ফলে এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর সৃষ্টিও সম্ভব হয়েছে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' (১৮৯৬), 'দৈনিক বসুমতী' (১৯১৪) এবং 'মাসিক বসুমতীর' (১৯২২) অনেক পূর্বে 'বঙ্গবাসী' (১৮৮১) ছিল জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'বঙ্গবাসী'ও পাঠকদের সুলভ মূল্যে বই দেবার আয়োজন করেছিল। 'বঙ্গবাসী'র উপহার প্রায় সবই ছিল ধর্মগ্রন্থ। বহু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করিয়েছিলেন তাঁরা। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের ধর্ম শাখাটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

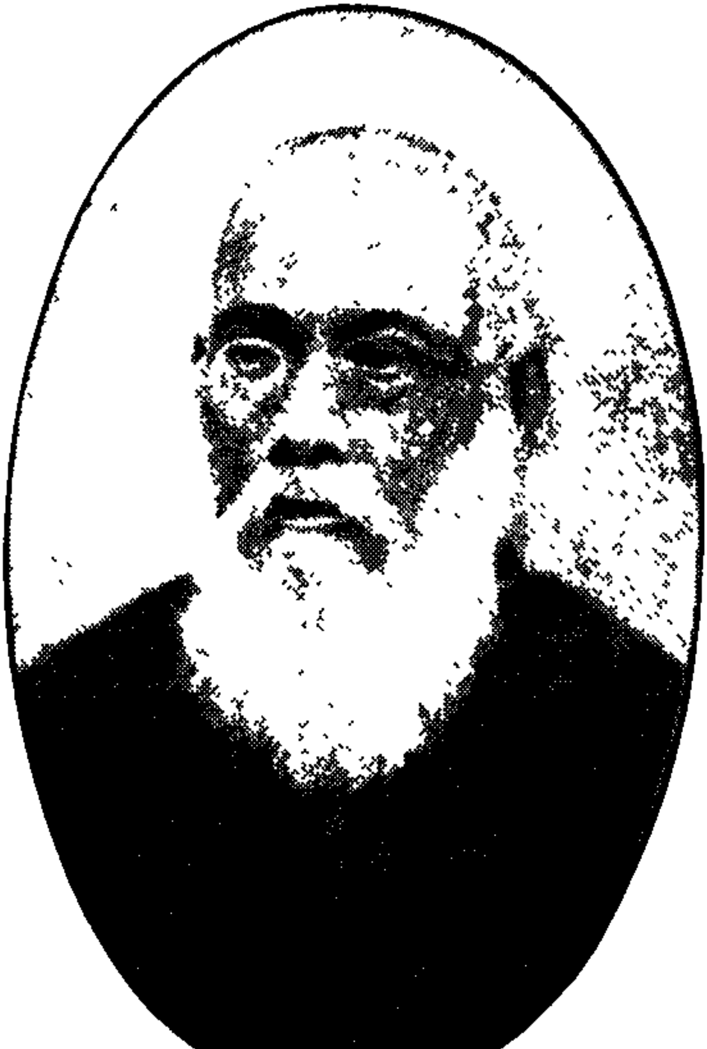

চিন্তামণি ঘোষ

১৮৯১ থেকে 'হিতবাদী'র প্রকাশ শুরু হয়। 'হিতবাদী'ও গ্রন্থ উপহার দেবার ব্যবস্থা করেছিল। উপহৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বই ছিল। 'হিতবাদী'র গ্রন্থ উপহার পরিকল্পনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

কলকাতার বাইরে দুটি প্রকাশন সংস্থার সূত্রপাত হয় বিগত শতকের শেষ ভাগে। একটি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস, পরে নাম হয়েছিল (প্রকাশন বিভাগের) ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

কাশী ও কলকাতায় শাখা আপিস খোলা হয়েছিল বহু পূর্বেই। প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণি ঘোষ[১৭] ছাপাখানা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। 'প্রবাসী' মুদ্রণের সূত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাঁদের প্রেরণায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করতে থাকেন। এদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত 'শিশু-ভারতী' বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা, চিন্তামণিবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রায় একশত বই সুন্দর করে ছেপে কবিকে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। একবার কবি গিয়েছিলেন এলাহাবাদ 'গীতালি'র ২০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি নিয়ে। মাত্র চার দিনের মধ্যে সেই পাণ্ডুলিপি রাজসংস্করণের বই হয়ে কবির হাতে পৌঁছেছিল।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ খোলায় কবির অনুরোধে চিন্তামণি ঘোষ রবীন্দ্রনাথের ৭৮,০০০ টাকা মূল্যের মজুদ গ্রন্থ মাত্র ২৬,০০০ টাকায় হস্তান্তরিত করেন। এ টাকাও বিশ্বভারতী শোধ করেছিল উনিশ বছরের কিস্তিতে।[১৮]

এই শতকের ঊষালগ্নে বৃন্দাবন ধর ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশুতোষ লাইব্রেরী। বাংলার মফঃস্বলে এত বড় বইয়ের ব্যবসার কেন্দ্র আর ছিল না। পরে এই সংস্থার হেড আপিস কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এ'দের বিশেষ কৃতিত্ব শিশুসাহিত্য প্রকাশনায়। সুলিখিত ও সচিত্র বহু বইয়ের প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী।

বিংশ শতাব্দীতে বইয়ের ব্যবসায়ে কিছু কিছু নতুন ধারা লক্ষণীয়। যে সব উদ্যোগী প্রকাশকরা প্রকাশনশিল্পে নতুন বাঁক সৃষ্টি করেছেন আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের সকলের কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে দু'একটি নাম উল্লেখ করতে হবে। শতাব্দীর গোড়ায় এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের (১৯১০) প্রতিষ্ঠা। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশনায় অনাড়ম্বর সুরুচির প্রবর্তক। তারপর ১৯৪৩-এ দিলীপ গুপ্তের পরিচালনায় স্থাপিত হল সিগনেট প্রেস। বইয়ের অঙ্গসজ্জায়, আধুনিক কবিদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনে এবং নতুন বইয়ের প্রচার-কৌশলে সিগনেট প্রেস যুগান্তর এনেছিল। পরবর্তী প্রকাশকরা এর দ্বারা অনেকটা যে প্রভাবান্বিত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ের প্রথম দিন থেকে, অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পর থেকে, বহু বৎসর কেটে গেছে। এখন বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে যেমন বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে তেমনি বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শহরে, এমন কি গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র নতুন নতুন ভাব ও ভাবনা লক্ষিত হয়। লেখক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা বিজ্ঞাপন ও প্রচার-পুস্তিকার মারফৎ অবগত আছেন কোন প্রকাশক কি ধরনের বই ছাপেন এবং তাদের গুণগত মূল্যই বা কি। সুতরাং সমকালীন প্রকাশকদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

তবে একালের প্রকাশনশিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথমেই বলতে হয়, বইয়ের অঙ্গসজ্জার প্রতি প্রকাশকরা গত শতাব্দীর চেয়ে সাধারণভাবে অধিক যত্নবান। নবপ্রকাশিত বইয়ের প্রচারেও তাঁরা বেশী মনোযোগী। ভালো বইয়ের অনেক বেশী কপি ছাপা হয়। লেখকরা রয়েলটির টাকাও পান। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকরাও বই প্রকাশ নিয়ে যে সমস্যায় পড়তেন এখন ততটা সমস্যা নেই।

স্বাধীনতার পরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা বই প্রকাশ করছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অনেক আগে থেকেই বাংলা বই প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। তবে সরকার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঠিক বইয়ের ব্যবসায়ী বলা চলে না।

স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত, অন্তত কলা বিষয়ে, বাংলায় পড়া যেতে পারে বলে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসায় অনেক উন্নতি হয়েছে। স্বাধীনোত্তর কালে গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য সরকার অনুদান দেবার প্রথা প্রবর্তন করায় বাংলা বইয়ের কাটতি যে কিছুটা বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এই ব্যবসা সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষণীয়। যত বাংলা বই প্রতি বৎসর বের হয় তার তুলনায় প্রকাশক ও বই বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী বলে মনে হয়। কারণ হয়ত এই যে, ইংলন্ড, আমেরিকার মতো আমাদের প্রকাশকরা শুধু বই প্রকাশ করেন না, খুচরো বিক্রি করেন—নিজের এবং অন্য প্রকাশকের বই। ব্যতিক্রম অল্প দু'একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া শুধু বাংলা বই নয়, ইংরেজী বই বিক্রি করাও একটা মস্ত আয়ের পথ।

সাম্প্রতিক কালে দেখছি আদিকালে বই বিক্রির যে রীতি ছিল তা আবার ভিন্ন রূপে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ, বই ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দেবার রীতি। সেকালে ফিরিওয়ালা বই নিয়ে বাড়ী বাড়ী যেত। এখন পাঠকরা বইমেলায় গিয়ে বই দেখবার যাচাই করবার সুযোগ পায়।

এটা নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ।

১ Kopf, David, *British Orientalism and the Bengal Renaissance.* Part III, Calcutta 1969
২ শ্যামল চক্রবর্তী। ছাপা হরফের হাট, কলিকাতা ১৩৭৭
৩ *The Third Report of the Calcutta School-Book Society's Proceedings*, pp. 39-46
৪ *Friend of India*, Quarterly Series, No. I, 1820
৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য' সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৭, কলিকাতা ১৩৪৭
৬ বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, 'বিদ্যা ও বাণিজ্য' অধ্যায়, কলিকাত. ১৯৭৩
৭ মধ্যস্থ, ১১ শ্রাবণ ১২৮০
৮ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫৭, পৃ ৩৩৬
৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, সংকলক। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ১৩৭৭ পৃ ৬১
১০ —— —— পৃ ৬২
১১ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা ১৯৭৫, পৃ ৪৫
১২ গোপালচন্দ্র রায়। অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, কলিকাতা ১৯৭৯, পৃ ৬৮-৬৯
১৩ পুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ দ্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৮ মে ১৯৬২
১৪ ঐ
১৫ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৯, পৃ ৪৫৩-৫৪
১৬ শ্যামল চক্রবর্তী। ছাপা হরফের হাট, কলিকাতা ১৩৭৭
১৭ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। চিন্তামণি ঘোষ দ্র 'প্রবাসী' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৪
১৮ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পঞ্চাষৎবর্ষ-পরিক্রমা, কলিকাতা ১৯৭৪, পৃ ৮

।*।*।*।*।*।*।*।*।*।*।*।*।*।*।
।*। যদ্যপি এই স্বধর্ম্ম বাক্যের সহিত শ্লোকবাক্য এবং বিপ ।*।
।*। ক্ষেব বিতণ্ডাবাক্য যোগকরাতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ ।*।
।*। হইয়াও কাঁঠালের আমসত্ত্বের ন্যায় হইয়াছে ।*।
।*। কিন্তু ইহাতে বহুতর গুণও আছে। আদৌ ই ।*।
।*। হার লিখিত কৌতুকাদিতে করিয়া বালকে ।*।
।*। রদিগের পাড়বার প্রবৃত্তি হইয়া পরে ।*।
।*। ক্রমে সৎ পথে গমনের এবং সদ্বিচা ।*।
।*। রের বুদ্ধিজন্মিবেক। এবং অন্যে ।*।
।*। র সহায়তা ভিন্ন পুস্তকের লি ।*।
।*। খিত গৌড়ীয় ভাষাতে তাহার ।*।
।*। সংস্কৃতের অর্থাবগত হইয়া ।*।
।*। কাব্য কার্য্য বিবেচনা ।*।
।*। পূর্ব্বক বীর্য্যবানেরা ।*।
।*। শিষ্টকার্য্যে রত ।*।
।*। হইবেন। ।*।
।*। ইতি। ।*।
।*।*।

নানা প্রসঙ্গ

বোলট্সের বিচল হরফ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা মুভেবল টাইপ বা বিচল হরফের আবিষ্কর্তা হিসাবে চার্লস উইলকিনসের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর তৈরি হরফেই হলহেডের ব্যাকরণের বাংলা উদাহরণগুলি ছাপা হয়েছিল। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসকাররা কখনো কখনো নাম করেন উইলিয়াম বোলট্সের। তিনি নাকি উইলকিনসের আগেই বাংলা বিচল হরফ তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন। বোলট্সের প্রচেষ্টা কতদূর এগিয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন হলহেড এবং উইলকিনস। এঁরা, এবং যাঁরা তাঁর কাজ দেখবার সুযোগ পাননি তাঁরাও, বোলট্সের চরম ব্যর্থতার কথাই বলেছেন।

কিন্তু বাংলা মুদ্রণের বিবর্তনের ইতিহাসে বোলট্সের নাম অনুল্লেখিত রাখা চলে না। আমাদের কাছে বোলট্সের পরিচয় শুধু একজন ভাগ্যান্বেষী হিসাবে। এটুকুই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

উইলিয়াম (বা উইলেম) বোলট্স জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হল্যান্ডে, আনুমানিক ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। জন্ম আমস্টারডামে হলেও আসলে বোলট্স জার্মান, এ কথা তাঁর নিজের দেওয়া তথ্য থেকেই জানা যায়। ইংরেজ লেখকরা ভুল করে তাঁকে 'ডাচ' হিসাবে প্রচার করেছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ভাগ্যের অন্বেষণে তিনি দেশ থেকে ইংলণ্ডে চলে যান। কিছুকাল পরে ইংলণ্ড ছেড়ে যাত্রা করলেন লিসবনের পথে। ইংলণ্ডে কাজের সুবিধা করতে না পারায় পর্তুগাল এলেন। কিন্তু এখানে আসবার অল্প পরেই ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্প হল। প্রাণ বাঁচল, কিন্তু দেখলেন এমন দুর্বিপাকের মধ্যে এদেশে শীগ্গির কোনো কাজকর্মের সুবিধা হবার নয়। তাই পাড়ি দিলেন ভারতের দিকে। তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার ঠিক পরেই এসে পৌঁছলেন কলকাতা। সেটা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। ইংরেজদের মধ্যে বেশ একটা আতঙ্কের ভাব। নতুন চাকরিপ্রার্থীর আসা কমে গেছে। এই পরিবেশে বোলট্স সহজেই কোম্পানীর দপ্তরে কেরানীর চাকরি পেলেন। বুদ্ধিমান এবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন বোলট্স। তাই ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁকে দেখতে পাই একটি কুঠির কর্তা হিসাবে।

তিন বছর পরে (১৭৬৫) আর একবার পদোন্নতি। বেনারস কাউন্সিলের সহ-প্রধান। কিন্তু সে বছরই তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি কোম্পানীর উচ্চ পদের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা করেছেন, কোম্পানীর স্বার্থ না দেখে দেখেছেন নিজের স্বার্থ এবং অবৈধ উপায়ে সঞ্চয় করেছেন প্রচুর অর্থ। কোম্পানীর স্থানীয় কর্তাদের চাপে পড়ে তাঁকে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।[১]

কোম্পানী তাঁকে আবার নতুন চাকরি দিল। মেয়রস্ কোর্টের অলডারম্যান বা বিচারক হলেন তিনি। কর্তৃপক্ষের হয়ত ধারণা হয়েছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলে বোলট্‌স কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না। কিন্তু তাঁদের এ আশা সফল হয়নি। নানাভাবে তিনি কোম্পানীর প্রশাসনকে উদ্ব্যস্ত করে তুললেন। বিশেষ করে তাঁরা বিব্রত হলেন যখন জানা গেল বোলট্‌স দেশীয় রাজা-বাদশাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে কোম্পানীর স্বার্থবিরোধী কাজ করছেন। কোম্পানী তাই এক আদেশ জারি করে মেয়রস্ কোর্টের অলডারম্যানের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়। আর দেওয়া হয় ভারত ত্যাগ করবার নির্দেশ। বোলট্‌স তা পালন করেননি। কলকাতার গভর্নরের কাউন্সিলের ৫ নভেম্বর ১৭৬৭ তারিখের সভায় বোলট্‌সের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি আর একবার আলোচনা করা হয়। সেই সব অভিযোগ হল: কোম্পানীর গভর্নরের প্রতি তাঁর উদ্ধত ও বিদ্রোহমূলক ব্যবহার; কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিভেদের বীজ বপনের অপচেষ্টা; সাধারণের মনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উস্‌কানি দেওয়া; শুধু কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যেই এটা নিবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বাংলার শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাঁর কার্যকলাপে; স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বিভেদ সৃষ্টির মারাত্মক খেলা খেলছেন বোলট্‌স। মোটামুটি এগুলি ছিল নতুন অভিযোগ। আলোচনার শেষে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন:

"Resolved, that our former orders to Mr. Bolts for proceeding to England shall be repeated, and that, in case of disobedience to, and contempt of our authority, his person shall be seized and forcibly sent home a prisoner in one of the ships in this season."[২]

কাউন্সিলের এই আদেশ পেয়ে বোলট্‌স এক উদ্ধত ও অপমানজনক চিঠি লিখলেন। ভারত ত্যাগে তাঁর শর্ত হল: কোম্পানী "would take his concerns and those of his constituents off his hands... ." তাঁর ব্যবসাপত্তর সব কোম্পানী কিনে নিলেই তিনি ভারত ত্যাগ করবেন।

১০ই ডিসেম্বর ১৭৬৭ কলকাতার কাউন্সিল কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে এক চিঠিতে বোলট্‌সের কথা নতুন করে জানালেন। ব্যাপারটা এমন গুরুতর হয়ে উঠেছে যে এ বিষয়ে কোর্টের "most serious consideration" দরকার। অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে এই চিঠিতে একটি নতুন অভিযোগ যোগ করা হল: "...the intelligence we have since received of his informing Monsr. Gentil, a Frenchman at the Court of Sujah Dowla, by letter, that the Company's affairs in Europe are in the utmost confusion and that his associate, Mr. Johnstone, as he terms him, would be appointed Governor on the part of His Majesty."[৩]

কোম্পানীর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের মনোবৃত্তি উপেক্ষা করা চলে না। বোলট্‌সকে ধরাও মুশকিল। বিপদের আভাস পেলেই চলে যান ডাচ কলোনি চুঁচুড়ায়। কলকাতা ত্যাগ না করবার আদেশ তিনি মানেন না। চুঁচুড়ায় কোম্পানী কিছুই করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বোলট্‌সকে বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল লন্ডনে। কিন্তু সহজে নয়। বোলট্‌স সাংঘাতিক লোক বলে এমন প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে জাহাজের কাপ্তেন প্রথমে তাঁকে নিয়ে যেতে রাজী হয়নি। পথে কি কাণ্ড করে বসেন ঠিক নেই। কোম্পানী সম্ভাব্য বিপদের জন্য পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের জামিন স্বীকার করবার পর কাপ্তেন সম্মত হয়।

লন্ডনে পৌঁছেই বোলট্‌সের প্রথম কাজ হল একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বেঙ্গল কাউন্সিলের অপকর্মের কথা প্রচার করা। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরসের সঙ্গে দেখা করে জানালেন তাঁর উপর যে সব অত্যাচার করা হয়েছে তার কথা। প্রতিকার প্রার্থনা করলেন কিন্তু ফল হল উল্টো। নানা অভিযোগ এনে কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। বোলট্‌স ভারতে উপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থের কিছুই আনতে পারেননি। আনতে দেওয়া হয়নি। যা-কিছু অর্থ লন্ডনে ছিল তা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে নিঃশেষ হয়ে গেল। মামলা ছাড়া ইংলেন্ডের জনসাধারণকে বেঙ্গল কাউন্সিলের কার্যকলাপ এবং নিজের কথা বিশদভাবে জানাবার জন্য একটি বড় বই লিখলেন: *Considerations of Indian Affairs; Particularly Respecting the Present State of Bengal and its Dependencies.*

দ্বিতীয় সংস্করণের বইটি ছাপা হয়েছিল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৪ পৃষ্ঠার বড় আকারের বই; সঙ্গে তৎকালীন বাংলার প্রকৃত জরিপভিত্তিক মানচিত্র। বিখ্যাত লেখক ও বাগ্মী বার্কের ভারত-নীতি গঠনে এ বইটি প্রভাব বিস্তার করেছে। কয়েক বছরের মধ্যে বইটির ফরাসী অনুবাদ বেরিয়েছিল। ১৮৫৭-র বিপ্লবের পটভূমিকা ফরাসী জনগণকে অবহিত করাবার উদ্দেশ্যে ঐ

সময় বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। ঠিক ঐ বছরই বাংলার প্রাক্তন গভর্নর ভেরেলস্ট একটি বই প্রকাশ করেন যার মধ্যে বোলট্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।[৩] ভেরেলস্টের বই পড়ে বোলট্স ভাবলেন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি খণ্ডন করা দরকার। তাই তিনি পূর্বোল্লিখিত বইটির দ্বিতীয় ভাগ দুই খণ্ডে প্রকাশ করলেন (১৭৭৫)। এই ভাগের উপনাম থেকেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। বোলট্স বলেছেন এই বইয়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আছে "...a complete Vindication of the Author from the Malicious and Groundless Charges of Mr. Verelst."[৪]

ক্লাইভ ফেব্রুয়ারি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে বিদায় নেবার পর ভেরেলস্ট গভর্নর হন। এঁর কার্যকালেই বোলট্সের লাঞ্ছনা চরমে ওঠে। সে জন্যই ভেরেলস্টের প্রতি বিদ্বেষের ভাব ছিল। বোলট্সের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উঠেছিল তার সবই যে সত্য বা গুরুতর তা না-ও হতে পারে। কারণ ভেরেলস্ট ছিলেন অক্ষম প্রশাসক, তাঁর অর্থলিপ্সাও ছিল প্রবল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁকে গভর্নরের পদ থেকে বিদায় নিতে হয় এবং লন্ডনে ফিরে যাবার পর তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৫] সুতরাং বোলট্সের বিরুদ্ধে হয়ত সব অভিযোগ নিছক প্রশাসনিক স্বার্থেই করা হয়নি।

যাই হোক, বোলট্সের যে অর্থ লন্ডনে ছিল তা মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে এবং তিন খণ্ড বিরাট বই ছাপাতে নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন নতুন কিছু করতে হবে। তিনি লন্ডনে অস্ট্রিয়ার দূতের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে প্রস্তাব দিলেন প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করবার। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেমন জাহাজ বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে আসছে অস্ট্রিয়াও তেমনি করে সমৃদ্ধ হতে পারবে যদি ব্যবসা করে ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে। বোলট্স তাঁর ব্যবসার দক্ষতা এবং প্রাচ্যের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। প্রস্তাবটা মনে ধরল অস্ট্রিয়ান দূতাবাসের অধিকর্তার। সুতরাং তাঁরই উদ্যোগে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার সঙ্গে দেখা করলেন বোলট্স। প্রাচ্যে বাণিজ্য বিস্তারের প্রস্তাব মারিয়ার খুবই ভাল লাগল। বোলট্স অস্ট্রিয়ান নাগরিকত্ব পেলেন, তাঁকে দেওয়া হল লেঃ কর্নেলের মর্যাদা এবং ৫ জুন ১৭৭৫ তারিখ সম্বলিত একটি সনদ পেলেন। এই সনদের সাহায্যে তিনি বিধিবদ্ধ করলেন একটি কোম্পানী যা বাণিজ্য করবে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। বোলট্স প্রথম কুঠি করলেন মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলে, নিকোবর দ্বীপে এবং তা ছাড়া আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলেও। কয়েক বছরের মধ্যেই কুঠিগুলি একে একে উঠে গেল এবং কোম্পানী ফতুর হয়ে পড়ল ১৭৮১-তে। কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বোলট্স দমলেন না। অস্ট্রিয়া ফিরে এসে আর এক নতুন কোম্পানী গড়লেন। এই কোম্পানীর নাম হল ট্রিয়েনটাইন সোসাইটি; মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য। ১৭৮৩-র শেষের দিকে এই নতুন কোম্পানীর একটি জাহাজ যাত্রা করে পণ্য নিয়ে। বোলট্সের দুর্ভাগ্য তাঁর প্রচেষ্টা সফল হল না। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে গেল। এই ব্যর্থতার পর বোলট্স অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে চলে গেলেন প্যারিস।

প্যারিস পৌঁছে বোলট্স এক নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন ষোড়শ লুইয়ের কাছে। এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা মাদাম দ্য স্তালের স্বামী। লুই তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় বোলট্স চলে এলেন সুইডেনের রাজা তৃতীয় গুস্তাভাসের দরবারে। বোলট্সের পরিকল্পনা ছিল দু'টি ভাগে বিভক্ত: এক, এসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য; দুই, একটি নতুন দ্বীপ—যেখানে এখনো কোনো বসতি নেই—সেই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করা। এই দ্বীপের অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিল, কিন্তু নাম করেননি, পাছে জানতে পেরে অন্য কেউ আগেই সেটা দখল করে নেয়!

পরিকল্পনা এমন বিশদরূপে রচিত হয়েছিল যে বোলট্সের দক্ষতা এবং এসিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হতে হয়। ক'টি জাহাজ নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে, নাবিক ক'জন থাকবে, জাহাজের কাপ্তেন কোন দেশের লোক হবে, সৈন্য থাকবে ক'জন, কি ধরনের অস্ত্রের প্রয়োজন, কার কত বেতন ইত্যাদি সব কিছু পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গে একজন উদ্ভিদ্বিজ্ঞানী এবং একজন ধাতুবিজ্ঞানী চাই। কাঠ এবং নানা রকম ধাতু সংগ্রহ করে আনতে হবে ইউরোপের বাজারে। সেই অজানা দ্বীপের নতুন উপনিবেশ থেকে পাওয়া যাবে তুলা, চিনি ও রেশম। একটি নিঃশুল্ক বন্দর গড়তে হবে। উপনিবেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। না হলে ভারতীয় এবং চীনাদের আকৃষ্ট করা যাবে না।

উপনিবেশের গভর্নর হবেন বোলট্স। তিনি উপনিবেশের সর্বময় কর্তা। আজীবন এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন। যদি অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরতে হয় তবে তাঁকে সুইডেনের রাজা কনসাল-জেনারেলের চাকরি দিয়ে ইউরোপের কোনো দক্ষিণ দেশে পাঠাবেন। তরুণ বয়স থেকে গরম আবহাওয়ায় তিনি অভ্যস্ত, সুতরাং ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে সুস্থ থাকবার সম্ভাবনা নেই।

নতুন উপনিবেশের নাম হবে 'বোলট্সহোম', তাঁর নাম অনুসারে। সুইডিশ ভাষায় 'holm' অর্থ দ্বীপ। বোলট্সের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর পর্যন্ত গভর্নরের বেতন ইত্যাদি দিয়ে যেতে হবে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হবে, এই টাকা দিয়ে তার কাজ চলবে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে উপনিবেশের বাসিন্দাদের কল্যাণসাধন করা। বোলট্সের এই শর্ত থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন অবিবাহিত।

সিন্ধুনদের ব-দ্বীপের নিকটবর্তী কোনো উপযুক্ত জায়গায় বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের প্রস্তাবটিও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। কারণ ইউরোপিয়ান বণিকরা তখনো ভারতের এই অংশে কুঠি করেনি। কুঠির কর্তা বছরে পাবে ৪০০০ টাকা মাইনে। ছয়জন ভারতীয় নিযুক্ত করা হবে মাসিক সাত টাকা বেতনে। কুঠির কাজ যাতে সফল হয় তার জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন যে, সিন্ধুর নবাব, নানা ফারনবিস এবং টিপু সুলতানের সঙ্গে দেখা করবেন রাজা তৃতীয় গুস্তাভাসের চিঠি নিয়ে। তাঁদের দেবেন নতুন আবিষ্কৃত জিনিসের উপঢৌকন,—যেমন ইলেকট্রিক মেশিন, ম্যাজিক লণ্ঠন ইত্যাদি।

বোলট্সের ভয় ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। তারা যদি পরিকল্পনার কথা জানতে পারে তাহলে বাধা দেবে। বিশেষ করে আশঙ্কা বোলট্সের বিরুদ্ধে গুস্তাভাসের কাছে লাগাবে। তাই তিনি এক ধরনের সাংকেতিক লিপি উদ্ভাবন করলেন যা চিঠিপত্রে ব্যবহার করা হবে। এই লিপিতে বোলট্স হবেন জে. পারি, বেঙ্গল বোঝাতে লেখা হবে বাল্টিমোর, ইত্যাদি।

এই বিস্তৃত পরিকল্পনা সুইডেনের রাজাকে দেওয়া হল ৩রা অক্টোবর, ১৭৮৬। সব প্রস্তাবই অনুমোদন লাভ করল। ঠিক হল ১৭৮৭-র অগাস্টে দু'টি জাহাজ বোলট্সকে নিয়ে যাত্রা করবে গোটেনবার্গ বন্দর থেকে। সময় যখন এলো তখন কিন্তু জাহাজ যাত্রা করল না। সুইডেন তখন রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হবে এই রকম আশংকা করছে। তাই গুস্তাভাস বোলট্সের পরিকল্পনা কার্যকর করতে দ্বিধান্বিত। বোলট্সের স্মারকপত্রের উত্তরে দু'বার তাঁকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হল। দেওয়া হল তাঁর "genius, enlightenment, distinguished talents"-এর স্বীকৃতি হিসাবে।

সুইডিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছে ২রা নভেম্বর, ১৭৮৬। কিন্তু সরকার যদি চুক্তি সময়মতো পালন না করে তাহলে তিনি কি করবেন? অনেক দিনের জন্য বহু দূর দেশে বাস করতে হবে, তাই তিনি ত্রিয়েস্তে থেকে বই কিনছেন। সুইডেনের এক মন্ত্রীকে চিঠিতে লিখেছিলেন (৯. ১১. ১৭৮৬), আমি যে জাহাজে যাব সেখানে আমার কেবিনের পাশে থাকবে আমার লাইব্রেরির জায়গা। লাইব্রেরির জন্য কত শেলফ লাগবে তারও হিসাব দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। বই প্রিয় সঙ্গী, তাই লাইব্রেরি সঙ্গে যাবে: ..."without which he will be but a body without a soul."

অপেক্ষা করে করে বোলট্স হতাশ। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস থেকে আবার নতুন প্রস্তাব পাঠানো হল। সুইডেন একা যদি পরিকল্পনা কার্যকর করতে দ্বিধা করে তাহলে সার্ডিনিয়ার রাজা অংশীদার হতে পারেন। এ প্রস্তাবেও কাজ হয়নি। ভগ্নহৃদয় বোলট্স এর পর প্যারিসেই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন।

সুইডিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ থেকে জানা যায় তিনি ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, পোর্তুগীজ ছাড়া দুটি ভারতীয় ভাষা জানতেন। এই দু'টি ভাষার একটি নিশ্চয়ই বাংলা, অন্যটি খুব সম্ভব ফারসী। কারণ দেখছি, অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে তিনি যে ক'টি বই কিনতে বলেছেন তাদের মধ্যে আছে জোন্সের 'পার্শিয়ান গ্রামার' এবং রিচার্ডসনের 'পার্শিয়ান-ইংলিশ ডিক্শিনারি'।*

ভাগ্য-সন্ধানী বোলট্সের জীবনের রূপরেখা শুধু দেওয়া হল। তাঁর মধ্যে নতুনকে জানবার ছিল প্রবল আগ্রহ। সেই আগ্রহ শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থ উপার্জনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। তাই কলকাতায় যখন তিনি চাকরি করেছেন তখন উপলব্ধি করলেন এ দেশে ছাপাখানা নেই। অথচ ইউরোপে তিনশ' বছর পূর্বেই মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়ে যুগান্তরের সূচনা করেছে। ছাপাখানা প্রবর্তনের বিশেষ উপযুক্ত অনাবাদী উর্বর ক্ষেত্র এই বাংলাদেশ। পশ্চিম ভারতে ছাপাখানা এসেছে অনেক আগেই। কিন্তু সেখানকার ছাপার কাজ প্রধানতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে মুদ্রণের কলাকৌশল কাজে লাগাবার সুযোগ ছিল না। এর অভাব বোলট্সই প্রথম উপলব্ধি করলেন এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজায় এবং আরও কয়েকটি প্রকাশ্য স্থানে লটকিয়ে দিয়েছিলেন নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটি:

"To The Public,

Mr. Bolts takes this method of informing the public that the

want of a printing press in this city being of great disadvantage in business and making extremely difficult to communicate such intelligence to the community, as is of the utmost importance to every British subject, he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing, to manage a press, the types and utensils of which he can produce."[৭]

দেশের পূর্বাঞ্চলে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই প্রথম ঘোষণা। বোলটস্ শুধু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, উদ্যোগী মুদ্রাকরকে তিনি সকল প্রকারে সহায়তা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে তাঁর এই আগ্রহের পশ্চাতে ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য ছিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁকে কোম্পানীর চাকরি থেকে অবসর নিতে হয়। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন একটি ছাপাখানা থাকলে তাঁর প্রতি অবিচারের কথা, বেঙ্গল কাউন্সিলের কর্তাদের দুর্নীতির কথা ছাপিয়ে প্রচার করতে পারতেন। যে কাজ তিনি লন্ডনে ফিরে করেছিলেন বই লিখে।

ইংরেজী ছাপার কাজ প্রচলন করায় তাঁর কিছু ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকতেও পারে। কিন্তু বাংলা মুদ্রণে তাঁর যে উৎসাহ সেটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে ছিল। কোম্পানীর চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে লন্ডনে বসে তিনি বাংলা হরফ নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। উইলকিনস কোম্পানীর চাকরি করতেন, হেস্টিংসের নির্দেশ ছিল এবং অর্থ পেয়েছিলেন, তাই বাংলা হরফ তৈরির কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বোলটস্ কোম্পানীর চাকরি থেকে বিতাড়িত হবার পর লন্ডনে কোনোরকম উৎসাহ বা আর্থিক সহায়তা ছাড়াই বাংলা হরফ তৈরি শুরু করেন। কেউ কেউ বলেছেন, বোলটস্ নিজেকে প্রাচ্য বিদ্যাবিদ্ হিসাবে জাহির করতেন, তার প্রমাণস্বরূপ বাংলা চর্চার এই উদ্যোগ। আবার কেউ বলেছেন, কোম্পানী বোলটস্‌কে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার দায়িত্ব দেবার ফলে তিনি বাংলা হরফ নির্মাণে উদ্যোগী হন।[৮] এ দুটি বক্তব্যের সমর্থন করা যেতে পারে এমন কোনো কাগজপত্র আমরা দেখিনি। আসলে ভাগ্যান্বেষী বোলটসের বাংলা মুদ্রণের অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে এই এক নতুন অ্যাডভেঞ্চার।

বাংলা মুদ্রণের জন্য কি করেছিলেন বোলটস্? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "...উইলিয়ম বোলটস্ বিলাতে এক প্রস্থ (ফাউন্ট) বাংলা অক্ষর তৈরি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা একেবারে বিফল হয়।"[৯]

বোলটসের সমসাময়িক হলহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন: "Mr. Bolts ...attempted to fabricate a set of types for it, with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or Primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that this project when completed, would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed."[১০]

হলহেড বোলটসের তৈরি হরফের নমুনা দেখে তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন। হরফ নির্মাণের আদিপর্বের ইতিহাসকার ট্যালবট রীড বোলটসের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়েছেন।[১১] তা থেকে জানা যায় যে বোলটসের নির্দেশে লন্ডনের বিখ্যাত হরফ-নির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কিছু বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। রীড জ্যাকসনের দপ্তরের পুরনো কাগজপত্র থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন। বাংলা হরফের উল্লেখ নেই সেখানে, বাংলাকে বলা হয়েছে "মডার্ন স্যান্‌স্ক্রিট", যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এইভাবে: "a corruption of the character of the Hindoos, the ancient inhabitants of Bengal."[১২]

রীডের মতামতের ওপর নির্ভর করে মুহম্মদ সিদ্দিক খান লিখেছেন যে "বাংলা হরফের জটিল ধাঁচের নমুনা তৈরি করার মত যোগ্যতা বোলটসের আদৌ ছিল না। বোলটস্ বাংলা অক্ষরের যে নকশাগুলো জ্যাকসনকে ছেনিকাটার আদর্শ হিসাবে দিয়েছিলেন সেগুলি অনুপযুক্ত ও অসন্তোষজনক হওয়ায় এ হরফগুলির প্রস্তুতের কাজ কিছুকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে।"[১৩] কয়েক বৎসর পরে উইলকিনস বাংলা হরফ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করেন।

রীড বোলটসের কাজের নমুনা না দেখেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। হলহেড নমুনা দেখেও তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেননি। অথচ 'জেন্টস্ লজে' তিন বছর পরে বাংলা বর্ণমালার যে নমুনা হলহেড ব্লক থেকে ছেপেছেন তা মোটেই হরফ কাটার উপযোগী নয়। বর্তমান গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠার উপরোক্ত বর্ণমালার যে প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে বাঁকা ছাঁদের এই হস্তাক্ষর হরফ নির্মাণের নমুনা হিসাবে অনুপযোগী। নিচে বোলটসের নির্দেশে তৈরি

নমুনা থেকে তৈরি বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিলিপি দেওয়া হল। তুলনায় সুবিধার জন্য পাঁচ বছর পরে তৈরি উইলকিনসের হরফের নমুনাও দেওয়া হয়েছে। এ থেকে দেখা যাবে বোলট্‌স মুনশি-দের বাঁকা ছাঁদের অক্ষরের বন্ধন থেকে প্রায় মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পাঁচ বছর পরেও উইলকিনস বর্ণমালার ছাঁদ পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাতে পারেননি। বরং দেখা যাবে বোলট্‌সের অনেকগুলি অক্ষর উইলকিনসের অক্ষর অপেক্ষা সুগঠিত। একই বর্ণের দুটি রূপ উইলকিনস ব্যবহার করেছেন। বোলট্‌সের নমুনাতেও ক, ঘ, ছ প্রভৃতি বর্ণের দুটো রূপ আছে। তবে বোলট্‌স শুধু 'র'-এর পেটকাটা রূপটাই দিয়েছেন; উইলকিনস দু' রকমের 'র' ব্যবহার করেছেন। বোলট্‌সের খ, গ, ঙ, চ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, ল, শ, ষ, স ইত্যাদি হরফের ছাঁদ উইলকিনসের তুলনায় নিম্নমানের নয়। বরং ঞ, প, ল প্রভৃতি হরফের চেহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের বলেই মনে হয়। অথচ মুহম্মদ সিদ্দিক খান মন্তব্য করেছেন:

বোলট্‌সের হরফ

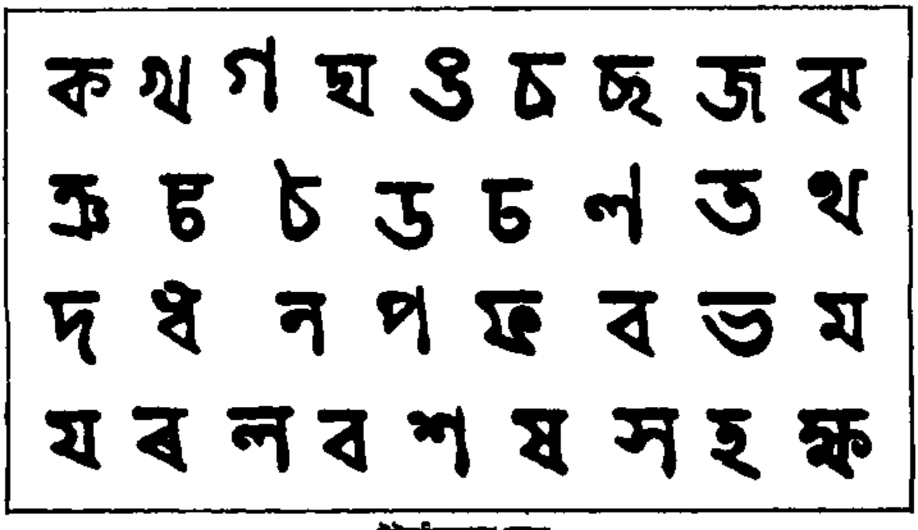

উইলকিনসের হরফ

"বিশেষজ্ঞদের মতে বোলট্‌সের এই ব্যর্থতার দোষ জ্যাকসনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করা হলে ভুল করা হবে। কেননা জ্যাকসন বোলট্‌সের দেওয়া হরফের নমুনার হুবহু অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। নিকৃষ্ট অক্ষরের নমুনা বা মডেলের জন্য সম্ভবতঃ বোলট্‌স স্বয়ং অথবা তাঁর নিযুক্ত শিল্পীদের অযোগ্যতাই দায়ী।"[১৪]

Num. LVIII.

COPY of a Letter from William Bolts *to* William James, *Esq; one of the* East India *Directors, containing a Proposal for the Introduction of Printing in* Bengal, *and a Specimen of the* Bengal *Alphabet in new-invented Types. Dated the 23d of* September 1773.

To William James, *Esq;*

SIR,

AT my leisure hours, I have sometimes employed myself in contriving a set of types for printing the *Bengal* language, which the present state of my finances will not admit of my finishing, on my own account. Inclosed you have a specimen of the letters of the alphabet, which are finished; but besides which, many compound and conjunctive characters are yet wanting.

As the introduction of printing with these types would be of eminent service in the Company's territorial dominions of *Bengal* and the adjacent provinces, particularly in your revenue-department, I should have no doubt but the Court of Directors would very readily contribute towards the completion of this desirable object, if the proposal did not come from me. But that the time which I have employed in this business may not, therefore, be thrown away, if I can help it, I take this method to know the determination of the Court, and request the favour of your proposing it to them, to take the types, on their own account, upon reasonable terms; and I will engage to compleat all the compound and other characters in a manner fit for printing with the greatest ease. I am, with respect,

SIR,
Your most obedient,
humble servant,

London,
the 23d Sept. 1773.

(Signed) WILLIAM BOLTS.

Specimen of the Bengal *Alphabet.*

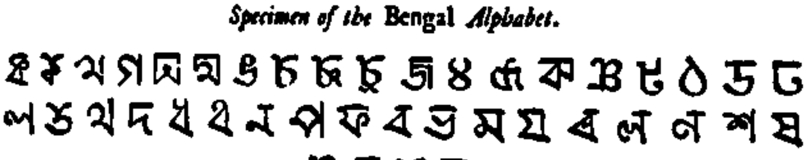

উইলিয়াম জেমসকে লেখা বোলট্‌সের চিঠি

বোলট্‌স যে ব্যঞ্জনবর্ণের পর আর অগ্রসর হতে পারেননি তার কারণ অক্ষম নকশা নয়; মূল কারণ হল অর্থাভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বাংলা হরফ তৈরির কাজ বোলট্‌স ব্যক্তিগত উদ্যোগেই আরম্ভ করেছিলেন ভারত থেকে লণ্ডনে ফিরে এসে। তখন হরফ তৈরি ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে বিদেশী ভাষার হরফ যা পূর্বে কখনো তৈরি হয়নি। বোলট্‌সের পঁচিশ বছর পরে উইলিয়াম কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ লণ্ডন থেকে ছাপানোর কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু সেখানে ছাপবার খরচের কথা জেনে সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তখন একটি পাঞ্চ তৈরির খরচ ছিল এক পাউণ্ড।[১৫] বাংলার এক গ্রন্থ ছাপার হরফ তৈরি করতে প্রায় ৬০০ পাঞ্চের প্রয়োজন ছিল। এর উপর ঢালাইয়ের ধাতুর দাম, কুশলী কর্মীর মজুরি ইত্যাদি

যোগ করতে হবে। বোলট্‌সের এত টাকা ছিল না। ভারতে সঞ্চিত টাকাকড়ি কিছুই তাঁকে আনতে দেওয়া হয়নি। লণ্ডনে যা ছিল তা আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে এবং তিন খণ্ড বড় বই ছাপতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। অর্থাভাবের জন্যই তাঁর আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

এ কাজে আর্থিক সহায়তার জন্য তিনি কোম্পানীর নিকট আবেদন করেছিলেন ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে।[১০] সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন তাঁর "নিউ-ইনভেন্টেড টাইপসে"র প্রতিলিপি। বোলট্‌স সরাসরি কোম্পানীকে লেখেননি, কারণ তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ চলছিল। তিনি লিখলেন তাঁর পরিচিত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ডিরেক্টর উইলিয়াম জেমস্‌কে। বোলট্‌স্ সুস্পষ্টরূপে বলেছেন তাঁর চিঠির বিষয় হল: "...a Proposal for the Introduction of Printing in Bengal." এই থেকে দেখা যায় যে হেস্টিংস, হলহেড এবং উইলকিনসের অনেক আগেই বোলট্‌স বাংলা মুদ্রণের কথা ভেবেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে কাজও শুরু করেছিলেন। মুদ্রণ প্রবর্তনের প্রধান শর্ত হল উপযুক্ত বিচল হরফ থাকা চাই। এই কাজে বোলট্‌স হাত দিয়েছিলেন। অবসর সময়ে বাংলা হরফ তৈরির জন্য কাজ করতেন তিনি। সেই পরিশ্রমের ফলেই ব্যঞ্জন বর্ণের হরফগুলি তৈরি হয়েছে। আর্থিক অনটনের জন্য তিনি বাকি প্রয়োজনীয় হরফগুলি তৈরি করতে পারছেন না। বাংলা মুদ্রণ প্রচলিত হলে কোম্পানীর প্রশাসন উপকৃত হবে। শুধু বাংলাই উপকৃত হবে না, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও এর সুফল ভোগ করবে। বোলট্‌স জানতেন এ প্রস্তাব অন্য কেউ করলে কোম্পানী সাগ্রহে গ্রহণ করত। কিন্তু তাঁর এত দিনের পরিশ্রম যাতে ব্যর্থ না হয় সে জন্য ডিরেক্টর জেমসের মারফৎ তিনি কোম্পানীর অভিমত জানতে চেয়েছেন। যুক্তিসঙ্গত শর্তে তিনি যুক্তাক্ষর সহ অন্যান্য বর্ণের হরফ তৈরি করে এক প্রস্থ টাইপ কোম্পানীকে দেবেন যা দিয়ে অতি সহজেই বাংলা বইপত্র ছাপা চলবে।

বোলট্‌সের সমালোচকরা বলেছেন, তিনি নিজেকে প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বলে জাহির করতেন এবং বলতেন কোম্পানী তাঁকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার ভার দিয়েছে। কিন্তু তাঁর চিঠিতে এ সব কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি, একটি নতুন আবিষ্কারের জন্য গর্বের প্রকাশও নেই।

কোম্পানীর পক্ষ থেকে বোলট্‌সকে কোনো সহায়তা দেওয়া হল না। তাঁর নিজের সামর্থ্য না থাকায় আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। জীবিকার্জনের জন্যও তাঁকে কিছু একটা করতে হবে। অভিযাত্রীর রক্তে জেগে উঠল নতুন অ্যাডভেঞ্চারের আমন্ত্রণ। এসিয়ার ঐশ্বর্য দেখেছেন তিনি। জাহাজ বোঝাই করে সেখান থেকে আনতে হবে ধনরত্ন। তাহলে হয়ত অর্থের অভাবে বাংলা হরফ কাটা বন্ধ হবে না। হয়ত বা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল মনের গভীর তলায়। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার সহায়তায় বাণিজ্যপোত নিয়ে পাড়ি দিলেন আফ্রিকা ছুঁয়ে ভারতের পথে। বাংলায় আছে সোনার খনি। কিন্তু সেখানে জাহাজ ভিড়তে বাধা পাবে। তাই ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বোলট্‌সের জাহাজ নোঙর ফেলল নিকোবর দ্বীপে। সেখানে তাঁর কুঠি স্থাপিত হল, কাছাকাছি কয়েকটি ছোট দ্বীপে অস্ট্রিয়ার পতাকা উড়ল।[১১]

এ দিকে হলহেড আর উইলকিনস বাংলা ব্যাকরণ ছাপানোর কাজ করে চলেছেন। বোলট্‌সের তৈরি বাংলা হরফের নমুনা হলহেড দেখেছিলেন তা তিনি নিজেই বলেছেন। উইলকিনসও দেখেছিলেন এ কথা মনে করাই স্বাভাবিক। ঢালাইকর জ্যাকসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবেই সহজ ছিল। তাই উইলকিনসের হরফের ছাঁদের সঙ্গে বোলট্‌সের হরফের সাদৃশ্য বিচিত্র নয়। মনে রাখা দরকার যে ছাপার অক্ষরের ছাঁদ পরিকল্পনার সময় উইলকিনসের সামনে পাণ্ডুলিপির নিদর্শন ছিল অনেক কিন্তু ছাপার হরফের নমুনা ছিল মাত্র একটি। সেটি বোলট্‌সের।

নিকোবর দ্বীপে ১৭৭৮-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোলট্‌স যখন কুঠির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করছিলেন সেই সময়ের মধ্যে উইলকিনসের কাটা বাংলা হরফে ছাপা হয়ে হুগলির প্রেসে ছাপা হল হলহেডের 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। বাংলা হরফ তৈরির সাফল্যের জন্য উইলকিনস খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁর পদোন্নতি ঘটল। বাংলা হরফের জন্মদাতা হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন তিনি।

আর সেই বছরই নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে বোলট্‌সকে নিকোবর ত্যাগ করতে হল। হয়ত জানতেও পারলেন না তাঁর বাংলা হরফ নির্মাণের স্বপ্ন অন্য একজন সার্থক করে তুলেছে।

দুঃসাহসী অভিযাত্রী স্বর্ণশিকারী বোলট্‌সের মনে বাংলা মুদ্রণের চিন্তা কেমন করে স্থান পেয়েছিল, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ভারতবিদ্যায় তাঁর বিশেষ জ্ঞানচর্চার কথা আমাদের জানা নেই। তা হলে একটা কৈফিয়ৎ পাওয়া যেত। এ কি শুধুই আর এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার?

বাংলা মুদ্রণ-ভাবনার জনক, বাংলা ছাপার হরফের আদি রূপকার এবং বাংলা গ্রন্থজগতের সূচনাকর্তা বোলট্‌স প্যারিস নগরীতে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে পরলোক গমন করেন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে।

১ Temple, R. C. Austria's Commercial Venture in India in the Eighteenth Century, *The Indian Antiquary*, December, 1917
২ Long, Rev. J. *Selections from Unpublished Records. Calcutta*, 1869, p. 482
৩ — — p. 492
৪ Verlst, Harry. *Rise, Progress and Present State of English Government in Bengal.* London, 1772
৫ Buckland, C. E. *Dictionary of Indian Biography*, London, 1908
৬ Furber, Holden. In the Footsteps of a German 'Nabob': William Bolts in the Swedish Archives, In *Indian Archives* V 12 (1958)
৭ Home, Amal, comp. *Descriptive Catalogue of exhibits in the historical Section of the Newspapers and Periodicals Court*, 1948, p. 1
৮ মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ায় কথা। ঢাকা, ১২৭১, পৃ২৬
৯ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংকলক। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় ভাগ, কলিকাতা ১৩৮৪, পৃ ৭২৫
১০ Halhed, N. B. *A Grammar of the Bengal Language*, Hooghly, 1778, Introduction, p. XXXIII
১১ Reed, Talbot Baines. *History of the Old English Letter Foundries* with notes, etc. New ed. London 1952
১২ —— p. 313
১৩ মুহম্মদ সিদ্দিক খান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা, ১৩৭১, পৃ ২৭
১৪ —— পৃ ২৭-২৮
১৫ Sen, Dinesh Chandra. *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta 1911, p. 851
১৬ Bolts, William. *Considerations of Indian affairs etc.*, Vol. II, Part II, London 1772-75, p. 285
১৭ *Selections from the Records of the Govt. of India* (Home Deptt.) No. LXXVII, Calcutta 1870, pp. 193-207

বোলটসের একটিমাত্র জীবনীর লেখক এন. এল. হলওয়ার্ড। যতদূর জানি একমাত্র জাতীয় গ্রন্থাগারেই এ বইটি ছিল, কিন্তু বহুদিনের চেষ্টা সত্ত্বেও বইটি দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। তাই বোলটসের জীবন-সংক্রান্ত তথ্যে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে।

বাংলা মুদ্রণে নবযুগ ও আনন্দবাজার

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন মিত্রাক্ষর ও ছেদযতির কৃত্রিম বাঁধনে বন্দী বাংলা পয়ারের বেড়ি মোচন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নির্বাধ গতি সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পয়ারের চৌদ্দ মাত্রার বাঁধা রীতি পরিত্যাগ করেননি। সুরেশচন্দ্র মজুমদারও বাংলা ছাপা হরফের মূল কলেবর বজায় রেখে স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ও যুক্তব্যঞ্জনের জটিলতা দূর করে বাংলা লাইনো হরফের উদ্ভাবন করেন। ফলে মুদ্রাযন্ত্রের খোপে খোপে বন্দী বাংলা হরফের শ' ছয়েক সন্তানের সংখ্যা যথেষ্ট কমল। স্বর, ব্যঞ্জন, স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ও যুক্তব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা নতুন রীতিতে দাঁড়াল দেড়শ'। এখন বাংলা মুদ্রণব্যবস্থার অনেক সরলীকরণ হয়েছে, সময় অর্থ কাগজের অনেক বাজে খরচ বেঁচেছে, হরফগুলিও সুদর্শন হয়েছে। এর সমস্ত গৌরব সুরেশচন্দ্রের প্রাপ্য। শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও লাইনো হরফ পরিকল্পনায় সুরেশচন্দ্রের পন্থাই গৃহীত হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার হয়ে সুরেশচন্দ্র দেখলেন, রোটারী যন্ত্রের চক্রাবর্তনের দ্রুতবেগে ঘণ্টায় হাজার হাজার পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয় বটে, কিন্তু প্রচণ্ড গতিবেগের ফলে অনেক সময় দু'চারটি হরফ স্থানভ্রষ্ট হয়ে যায়, কোন হরফের নাক কান বেমালুম উড়ে যায়। ফলে পত্রিকার মুদ্রিত পৃষ্ঠায় তরুণ যুবকের ভগ্ন দন্তের মতো পারিপাট্যের মাঝেও দু-একটি ফাঁকা স্থান থেকে যায়। তাছাড়া প্রবল গতিবেগের সংঘাতে হরফের আয়ু যেত কমে। সুরেশচন্দ্র পত্রিকা-মুদ্রণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থেকে এই সব সমস্যাই চিন্তা করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন, মুদ্রণে আধুনিকীকরণের জন্য কোনো একটি পন্থা অবলম্বন করা উচিত। যেটি হচ্ছে হরফ সংস্কার। অবশ্য তাঁর কিছু পূর্বে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাংলা বর্ণমালার সরলীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রচারের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে তাঁর পরিকল্পনা জনসমর্থন লাভ করতে পারেনি।

সুরেশচন্দ্র রাজশেখর বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা হরফের লাইনো সেট নির্মাণের পরিকল্পনা করেন, এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সাফল্য লাভ করেন। একালের বাংলা মুদ্রাযন্ত্রে লাইনো ছাঁদ এবং টাইপরাইটারে লাইনো হরফের ব্যবহার অতিশয় সহজ হয়েছে, বাংলা মুদ্রণ পৃথিবীর অন্য ভাষার মতোই আধুনিক হতে পেরেছে, তার মূলে আছে সুরেশচন্দ্রের অক্লান্ত চিন্তা ও পরিশ্রম। এই প্রসঙ্গে বাংলা মুদ্রণে বাংলা হরফের বিবর্তন সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বাংলা হরফ ছাপায় প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৭৭৮ সালে হলহেড সাহেবের *A Grammar of the Bengal Language*-এ, সেকথা সকলেই জানেন। কিন্তু তারও শ' দেড়েক বছর আগে বাংলা হরফের নমুনা পাশ্চাত্যের দু' একখানি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণের প্রথম পরিকল্পনা করেন দক্ষিণভারতের পর্তুগীজ মিশনারি সম্প্রদায়। চীনে বহুকাল পূর্বে ব্লক পদ্ধতিতে ছাপা চলত। ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে পঞ্চম দশকের মধ্যে চলনশীল হরফে গ্রন্থ মুদ্রণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কাপড়ে লতাপাতা-আঁকা কাঠছাপা অনেক আগে থেকে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ছাপা হরফের পরিকল্পনা পর্তুগীজদের পূর্বে ভারতীয়দের মস্তিষ্কে কেন উদিত হয়নি চিন্তার বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উপকূলে পর্তুগীজ মিশনারিরা দুটি পর্তুগীজ ভাষার মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন, ধাতুর রোমান হরফ পর্তুগাল থেকেই আনা হত। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই দুটি মুদ্রাযন্ত্র থেকে খ্রীষ্টানধর্মবিষয়ক প্রচারপুস্তিকা মুদ্রিত হতে থাকে, অবশ্য পর্তুগীজ ভাষায়। ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত *Doutrina Christiana* গ্রন্থে সর্বপ্রথম তামিল অক্ষর ব্যবহৃত হয়, ভারতীয় ভাষায় প্রথম ছাপার হরফ। ইগ্‌নিশিয়াস আইচামোনি নামে এক তামিলভাষী দেশীয় খ্রীষ্টান তামিল-পর্তুগীজ অভিধানে সর্বপ্রথম কাঠের হরফ ব্যবহার করেন। প্রসিদ্ধ লুথারীয় প্রটেস্টান্ট পাদ্রি বার্থোলোমিয়াস জাইগেনবল্‌গ তামিল হরফ নির্মাণ ও মুদ্রণে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, প্রয়োজনস্থলে তিনি বিদেশ থেকে তামিল ও মালয়ালী অক্ষর ঢালাই করে এনেছিলেন। ১৭১১ সালে তামিল হরফে মুদ্রিত তাঁর অনূদিত বাইবেল (*Biblica Damulica*) প্রকাশিত হলে তামিল হরফের পাকাপাকি রূপ দাঁড়িয়ে গেল। তামিল হরফগুলি জার্মানীর হলে শহরে ঢালাই হয় এবং পরে মুদ্রণের জন্য ভারতের ট্রাংকোবরে প্রেরিত হয়। ট্রাংকোবরের পর্তুগীজ-প্রভাবিত মুদ্রাযন্ত্র থেকে কোংকনী, মারাঠী ও মালয়ালী হরফে মুদ্রিত গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হতে থাকে শ্রীরামপুরে মিশন ছাপাখানার পূর্বে ট্রাংকোবরের ছাপাখানা থেকে একাধিক ভারতীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম নাগরী অক্ষর ঢালাই হয়। উইলিয়াম বোলট্‌সের নির্দেশে ইংলণ্ডের বিখ্যাত হরফনির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন এক সাট বাংলা হরফ ঢালাই করেন, কিন্তু সেগুলি আদৌ সুদৃশ্য ছিল না, তাই কোন গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়নি। জ্যাকসন হিন্দী, আরবী, ফারসী অক্ষরেরও ছাঁচ তোলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী কার্কপ্যাট্রিকের *Grammar and Dictionary of Hindvi Language*-এ জ্যাকসন-পরিকল্পিত নাগরী হরফ ব্যবহৃত হয়েছিল। ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণে জ্যাকসনের উদ্যোগ ও উৎসাহ প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় ছাপা হরফের ইতিহাসে চার্লস উইলকিনসের সঙ্গে জ্যাকসনের নামও স্মরণীয়। শোনা যায় দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি কৌতূহলী ছিলেন, আগ্রা দুর্গে নাকি তাঁর নিজস্ব ছোট মুদ্রাযন্ত্র ছিল। ডব্লু. এইচ. কেরী প্রণীত *The Good Old Days of Hon'ble John Company* (1909) গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে-সমস্ত পর্তুগীজ মিশনারি খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন তাঁরা বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও প্রচারপুস্তিকা রচনা করেছিলেন। সেগুলি রোমানীকৃত হরফে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে মুদ্রিত এবং এদেশের পর্তুগীজ মিশনারি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। এঁদেরই আর এক অংশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণ করে গ্রন্থ মুদ্রিত করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের পর্তুগীজ মিশনারিরা বাংলা হরফ নির্মাণের কেন প্রয়োজন বোধ করলেন না, তা বোঝা যাচ্ছে না। পর্তুগীজ ভাষার ধ্বনিতত্ত্বানুযায়ী তাঁরা বাংলা শব্দকে রোমান হরফে রূপান্তরিত করতে গিয়ে এত ভুলভ্রান্তি করেছেন যে, অনেক শব্দের প্রকৃত বাংলা রূপ কী, তা বোঝা যায় না। বাংলা ভাষার প্রথম বৈয়াকরণ মানোএল্‌ দা আস্‌সুম্পসাম্‌ তাঁর *Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez*-এ বলেছেন

যে, যে ব্রাহ্মণেরা বাংলা বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা মূলেই ভুল করেছিলেন, syllable-এর স্থলে একটি বর্ণ প্রয়োগ করতে গিয়ে সমস্ত বর্ণমালাটি নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর এ মন্তব্যের সরলার্থ করা সুকঠিন। সে যাই হোক, বাংলার পর্তুগীজ মিশনারিরা ইচ্ছে করলে উইলকিনসের তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেই বাংলা হরফ নির্মাণ করতে পারতেন। প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ মিশনারি সাঁতুচ্চি বাংলা ভাষা ও বর্ণমালা চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, বাংলা হরফে বাংলা শব্দকোষের খসড়াও করেছিলেন। সে-সমস্ত কাগজপত্র এখনো লন্ডনের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ্'-এর গ্রন্থাগারে 'মার্সডেন-সংগ্রহে' সংরক্ষিত আছে। তিনিও বাংলা হরফকে মুদ্রণে ব্যবহারের কোন চেষ্টা করেননি।

হলহেডের *A Grammar of the Bengal Language*-এ মুদ্রিত বাংলা হরফ প্রথম ব্যবহৃত হলেও তার পূর্বেই ইউরোপের দু-একখানি গ্রন্থে বাংলা হরফের নমুনা মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রীয়ার্সন তাঁর *Linguistic Survey of India* এবং ফাদার হস্টেন সাহেব *Bengal Past and Present*- এর প্রবন্ধে সর্বপ্রথম সেই সমস্ত তথ্যের উদ্ধার করেন। তার থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক জেসুইট পাদ্রি রচিত *Observations Physiques et Mathematiques* গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় বাংলা ও বর্মী অক্ষরের কিছু নমুনা মুদ্রিত হয়। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর লাইপজিগ শহরের গেয়র্গ য়্যাকব কের লাটিন ভাষায় ঔরংজেবের যে জীবনী (*Aurenk Szeb*) রচনা করেন তাতে বাংলা সংখ্যা ও ব্যঞ্জনবর্ণের চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি বাংলা হরফে একটি জার্মান নামও মুদ্রিত করেন—"শ্রীসরজন্ত বলয়কাং মাএর" (Sergeant Wolfgang Meyer)। এই হরফগুলি পরে জোহান ফ্রিদরিখ ফ্রিৎজ-এর *Orientalischer und Occidentalischer Sprachemeister* গ্রন্থেও গৃহীত হয়েছিল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যান্ডের লাইডেন শহর থেকে ডেভিডিস মিলিয়াসের লাটিন ভাষায় লেখা *Dissertationes Seletae*- এর পরিশিষ্টে বাংলা ও নাগরী হরফের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছিল। মিলিয়াসের মতে, ১৮শ শতাব্দীতে বিহার ও উড়িষ্যাতেও ব্যাপকভাবে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হত।

হলহেডের *Gentoo Laws* (অর্থাৎ হিন্দু আইনের ইংরেজী অনুবাদ) গ্রন্থে দুটি প্লেটে বাংলা ও নাগরী অক্ষর মুদ্রিত হয়েছিল। বাংলা হরফ পুরো ব্যবহৃত হল তাঁর ব্যাকরণে। এই জন্য চার্লস উইলকিনস হুগলির পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে বাংলা হরফ ঢালাই করেন এবং উক্ত গ্রন্থ ঐ শহরের অ্যান্ড্রুজ কোম্পানীর ছাপাখানায় ছাপা হয়। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর কোন কোন বাংলা পুথিতে অতি চমৎকার হাতের লেখা দেখা যায়; মনে হয় ছাপার অক্ষর নির্মাণে পুথির অক্ষরই নকল করা হয়েছিল। উইলকিনস বাংলা বর্ণমালার পুরো ছাঁচ নির্মাণ করেন তা ঠিক বটে, যদিও তিনি পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে তিনি নিজে এই হরফ লিখেছিলেন, না কোন পুথি-লেখকের সাহায্য নিয়েছিলেন তা জানা যায় না। এর পর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলাইজা ইম্পের 'আইন' তর্জমা করেন জোনাথান ডানকান। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে ব্যবহৃত বাংলা হরফের বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি ফরস্টার 'কর্নওয়ালিশ কোডের' যে বাংলা অনুবাদ করেন, তার জন্য পঞ্চানন কর্মকার এক সেট তামার হরফ নির্মাণ করেন। এই গ্রন্থে বাংলা হরফ মোটামুটি স্থায়ী রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে বাংলা হরফের যে ছাঁদ প্রচলিত হয়েছে তা নাকি কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তির পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা থেকে নকল করা হয়। কিন্তু শ্রীরামপুরের মিশন থেকে যে সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে তার ছাঁচ সুদৃশ্য নয়, যদিও এখানে পঞ্চানন ও তাঁর জামাতা মনোহর কাজ করতেন। অনেক পরে বিদ্যাসাগর মুদ্রণে বাংলা হরফের শৃংখলা আনেন এবং অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে স্বর, ব্যঞ্জন, স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন, যুক্ত ব্যঞ্জন ও স্বরযুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের জন্য পৃথক পৃথক হরফের পরিকল্পনা করেন; ফলে সর্বসাকুল্যে ছাপার হরফের সংখ্যা দাঁড়াল ছ'শ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত (এবং এখনও), প্রায় একশ' বছর ধরে মুদ্রণে এই ছ'শ হরফ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অবশ্য অক্ষরনির্মাতারা সব সময়ে ছাঁচ নির্মাণে একই ধারা অনুসরণ করতেন না, বিশেষতঃ যুক্তাক্ষরের বেলায়। কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ভারতের প্রধান প্রধান ভাষার হরফ নির্মান করেছিলেন, সেই সমস্ত ভাষায় তাঁরা বহু গ্রন্থ মুদ্রিত করেছেন। কিন্তু তাঁরাও বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের বেলায় সব সময়ে বিদ্যাসাগর-পরিকল্পিত রীতি অনুসরণ করতেন না, ইচ্ছামতো তাঁরা বাংলা যুক্তাক্ষরের ছাঁচ তৈরি করতেন। ১৮৬১ সালে ছাপা এঁদের একখানি বাংলা গ্রন্থে আমরা বাংলা যুক্তাক্ষরের বিচিত্র বেশভূষা দেখে বিস্মিত হয়েছি।

বাংলা হরফের মুদ্রণ বিবর্তন দেখলে দেখা যাবে ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে এ বর্ণমালা প্রায় নিখুঁত, কিন্তু ফলা বানানের জটিলতার ফলে এর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। যদিও বাংলা মৌলিক হরফ মাত্র ৫০টি, কিন্তু এই ৫০টি হরফ যুক্তব্যঞ্জনের বৈচিত্র্যের ফলে দশগুণেরও বেশী আকার লাভ করেছে। সেই তুলনায় রোমান হরফের সংখ্যা কম নয়, ২৬টি বড় হাতের এবং ২৬টি ছোট

হাতের, মোট ৫২টি। ইউরোপীয় ভাষায় স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্যঞ্জনের জন্য পৃথক হরফ নেই বলে মাত্র ৫২টি হরফেই যাবতীয় মুদ্রণকার্য নির্বাহ হয়। অবশ্য দেশভেদে আরও দু' চারটি বাড়তি হরফ এবং অল্পস্বল্প বিশেষ চিহ্ন (diacritical marks) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলার ১২টি স্বর ও ২৮টি ব্যঞ্জনে মিলে ছাপার জগতে যে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়, ছাপাখানার কর্মীরাই তার প্রাতিক্রিয়া জানেন। কোন কোন হরফ গায়ে গা লাগিয়ে বসে, একে অপরের ঘাড়ে চড়ে, পিঠে বসে, মাথায় ওঠে, তলায় নামে। ফলে ছাপাখানায় যুক্তব্যঞ্জনের কুচকাওয়াজ আধা-সামরিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে, ছাপা চলে ঐরাবতী চালে মন্থর গতিতে। ছাপাখানার কর্মীরা দুর্বিনীত যুক্তাক্ষরগুলিকে বশে আনতে গিয়ে ব্যর্থ হন, বিভ্রান্ত প্রুফরীডার কলমের সঙিন উঁচিয়ে ভুল যুক্তাক্ষরগুলিকে তাড়িয়ে বেড়ান। বাংলা টাইপরাইটারের সীমাবদ্ধ খোপে ছ'শ হরফের স্থান সংকুলান হয়

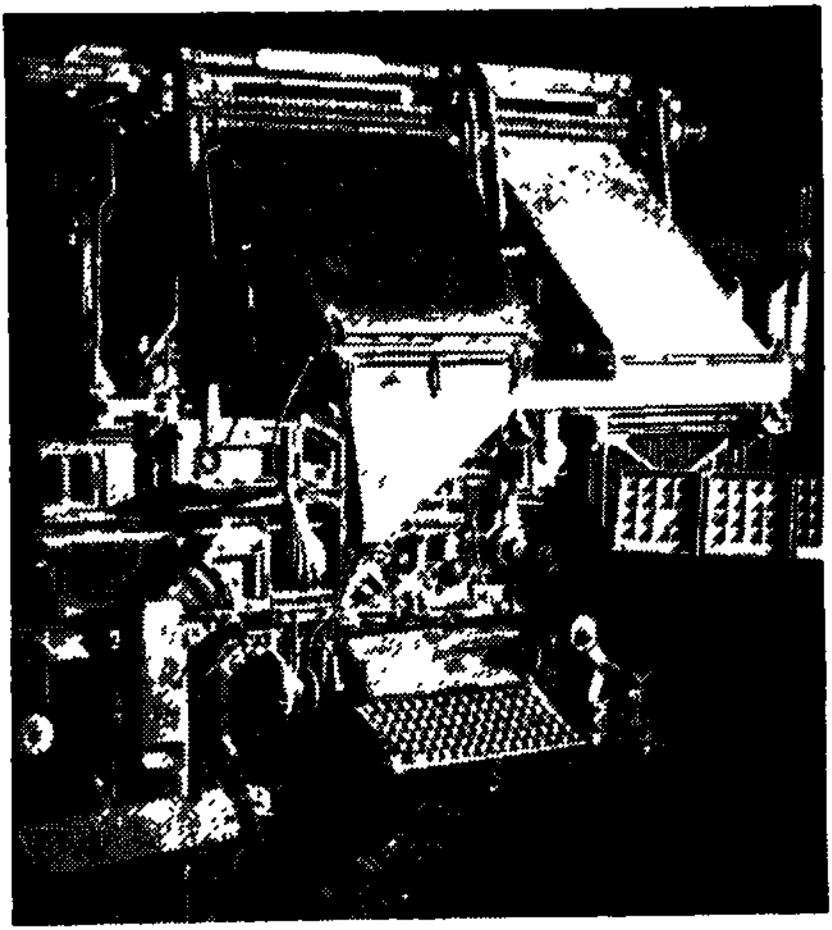

প্রথম বাংলা লাইনোটাইপ মেশিন

না। সুতরাং বাংলা মুদ্রণকে আধুনিক ও সহজ করতে গেলে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা আশু হ্রাস করা কর্তব্য, কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব। সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা হরফের সংখ্যাধিক্যে চিন্তিত হয়ে বাংলা ছাপা হরফের বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্যকে কোন-একটা সংক্ষেপীকরণের নিয়মের মধ্যে আনা যায় কিনা সে বিষয়ে নানা লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। ১৯৩৫ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যায় তিনি 'বাঙ্গালা লাইনোটাইপ ও অক্ষর সংস্কার' নামে একটি ছোট প্রবন্ধে এই সমস্ত সমস্যার কথা বলেন এবং বাংলা হরফের লাইনো পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর পূর্বে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে সর্বভারতীয় ভাষার

বন্দে মাতরম্

গ্রামবাসীদিগকে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত রাজনীতিক শিক্ষা দান করিতে হইবে। গ্রামে, গ্রামে গিয়া স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিতে হইবে। এরূপ যুবকদল আজ কোথায়? গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত উদ্বুদ্ধ কর। যদি স্বরাজলাভ করিতে চাও, তবে জনসাধারণকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আন।

—লোকমান্য তিলক

আনন্দবাজার পত্রিকা

সোমবার, ২৯শে শ্রাবণ ১৩৪৬ সাল

বাঙ্গলার কর্ত্তব্য

দুইবার নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি এবং বর্ত্তমান প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে তিন বৎসরের জন্য অযোগ্যতার অপবাদে দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অপসারিত করিয়া, কার্য্যকরী সমিতি যে ভারতব্যাপী বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছেন, বাঙ্গলা দেশেই তাহার তীব্রতা অধিক হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। গত ১৮ বৎসর নিরলস নিষ্ঠায় তিনি সর্ব্ববিধ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও দেশ ও কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন। কংগ্রেসের আদর্শ ও মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী করিয়া নিজের জীবন ও কর্ম্মধারা গঠন করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির উপর বিশ্বাস লইয়াই বাঙ্গলা দেশ তাঁহাকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছে এবং কালক্রমে তাঁহার না। কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় ঐক্যকে বাঙ্গলা দেশ খণ্ডিত করিতেছে—এই কলঙ্ক প্রচার করিয়া সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস-বিদ্বেষণকারী আখ্যা দিয়া ক্ষমতাচারী নেতৃবৃন্দ নিজেদের ওয়ার্ধা সিদ্ধান্তের দূরদর্শিতা প্রমাণ করিবেন।

এই বিপদ, বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে ধৈর্য্য, সংযম, কর্ম্মনৈপুণ্য ও মনীষা আবশ্যক, বাঙ্গলা দেশে তাহার অভাব নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় আদর্শবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আজ এই বিরোধকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। নিয়ম সকলেরই মান্য এবং কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীর পবিত্র দায়িত্ব। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও আমাদের বিশেষ বড় কর্ত্তব্য আত্মবিস্মৃত ও ক্ষমতার লোভে সংস্কারপন্থী ক্ষমতাচারী দল যেভাবে কংগ্রেসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপোষ-রফার পথে লইয়া যাইতেছেন তাহার প্রতিরোধ করা। মহাত্মা গান্ধীর রোষ, ক্ষমতাচারী দলের হিংসা ও অসূয়া উন্নত শিরে ধারণ করিয়া সুভাষচন্দ্র এই ব্রতই গ্রহণ করিয়াছেন। নিয়মতান্ত্রিকতার কর্দ্দম-পঙ্কিল পথে কংগ্রেসের আত্মঘাতী অভিযান মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রাম-বিমুখ আত্মসমর্পণের দ্বারা আপোষের নূতন টেকনিক অহিংসার বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিরোধকারী আধ্যাত্মিক বাষ্পাবরণ আজ কংগ্রেসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভুলাইয়া সমাজ-সংস্কারক সুনীতি প্রচার-সভায় পর্য্যবসিত করিতে উদ্যত!

এই কংগ্রেসকে আমরা তিন পুরুষ ত্যাগ, সেবা দ্বারা বহু রক্ত-ক্ষতি স্বীকার করিয়া গড়িয়াছি,—কংগ্রেসের বেদী বাঙ্গলার বহু কৃতী সন্তানের অস্থি-মজ্জা-মেদের দ্বারা গঠিত হইয়াছে এই

প্রথম সম্পূর্ণ লাইনোতে ছাপা সংখ্যা (বিজ্ঞাপন ছাড়া)

বাঙ্গলা মুদ্রণ কার্য্যে নবযুগ আরম্ভ

লাইনো টাইপ মেসিনের উদ্বোধন

ভাইস চ্যান্সেলারের উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা

'ওয়েব অফসেট'

জন্য হরফের রোমানীকরণের কথা বলেন। কিন্তু পিতৃপরিচয় যেমন ভোলা যায় না, একটা জাতির বর্ণমালাও তেমনি মনের অত্যাজ্য ধর্ম। অসুবিধা হলেও তা পরিত্যাগ করা কুলত্যাগের মতোই দোষণীয়। তাই তাঁর এ প্রস্তাব অতিশয় যুক্তিসঙ্গত বলেও কেউ গ্রহণ করেনি। সে যাই হোক, সুরেশচন্দ্র দেখলেন বাংলা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ও যুক্তব্যঞ্জনের আকার-আকৃতি সব সময়ে একই ধারা অনুসরণ করে না। 'ও' বর্ণের উপরে মাত্রা দিলে 'ত্ত' হয়, 'স'-এর নিচে 'হ' দিলে স্থ (sth) হয়। আরো অনেক গোলমাল আছে। পুথি-লেখার যুগে এই বিভ্রাট বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটায়নি, কিন্তু মুদ্রণের যুগে পুথির অক্ষরের রীতি হুবহু অনুসরণ করার ফলে সব মিলিয়ে হরফের সংখ্যা দাঁড়াল ছ'শ। বিশেষতঃ একালে গতির যুগে হাতচালা রীতিতে সংবাদপত্র ছাপানো প্রায় অসম্ভব, রোটারী যন্ত্রে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক পৃষ্ঠা ছাপানো যায় বটে, কিন্তু অতি দ্রুত ঘূর্ণায়মান রোটারী যন্ত্রে বাংলা হরফ ভেঙেচুরে যায়, কোন কোনটি বা কেস থেকে ছিটকে পড়ে। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য রাজশেখর বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে সুরেশচন্দ্র বাংলা হরফকে লাইনো টাইপে পরিণত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশ্য তিনি বাংলা হরফকে আগা-গোড়া বদলে ফেলতে চাননি। বাংলা বর্ণমালার মোটামুটি ক্রম বজায় রেখে যতটা সম্ভব প্রচলিত রীতি স্বীকার করে তিনি স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন যুক্তব্যঞ্জনের আকারগত বিশৃংখলা দূর করে নিয়মের ঐক্য আনতে চেষ্টা করলেন। যুক্তব্যঞ্জনকে উপরে নিচে কাঁধে বসবার সুযোগ না দিয়ে তাদের যথাসম্ভব পাশাপাশি রাখবার ব্যবস্থা করলেন। ফলে ছ'শ হরফের বদলে দেড়শ হরফ লাইনো রীতিতে স্বীকৃত হল। অবশ্য প্রথম প্রথম এই পরিবর্তন অনেকের কাছে অসুবিধাজনক মনে হয়েছিল কারো কারো কাছে দুষ্পাঠ্যও লেগেছিল। কিন্তু ক্রমে চোখ অভ্যস্ত হয়ে এল। প্রথমে 'আনন্দবাজার' ছোট ছোট কয়েক পংক্তি লাইনো হরফে ছাপা হত, যাতে ধীরে ধীরে পাঠকের চক্ষু ও অভ্যাস বদলাবার সময় পায়। পরে কর্তৃপক্ষ আর একটু সাহস সঞ্চয় করে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লাইনো হরফ ব্যবহার করতে লাগলেন। এর বিরুদ্ধে অল্পস্বল্প বাদপ্রতিবাদ কিছু ব্যঙ্গ-কৌতুক হয়েছিল। কিন্তু অকুতোভয় সুরেশচন্দ্র নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। অতঃপর গোটা-কাগজখানাই লাইনো হরফে মুদ্রিত হল ক্রমে পাঠকের প্রতিকূলতাও হ্রাস পেল। তারপর আর কোন বাধা রইল না এই হরফে বই ছাপা হতে লাগল, অন্যান্য সাময়িকপত্রও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তার কিছু পরে এল মনোটাইপ, আরো পরে ইণ্টারটাইপ। কিন্তু ছোটদের বর্ণপরিচয়-মূলক প্রাথমিক বইয়ে এখনো বিদ্যাসাগরের যুক্তাক্ষর চলেছে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। দু' রকমের বর্ণমালা একই সময়ে চললে গোলমাল দেখা দেবেই। গোড়া থেকে যদি সমস্ত গ্রন্থে, ছোটদের আদর্শলিপিতে লাইনো পদ্ধতি স্বীকৃত হয় তাহলে বানানের ঐক্য ও নিয়মের আনুগত্য ফিরে আসে। সুরেশচন্দ্রের যুগে তা সম্ভব ছিল না। এখনই এ সম্বন্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সম্প্রতি চলনশীল লাইনো-ফেস হরফের ব্যবহার হচ্ছে। সুতরাং লাইনো মুদ্রাযন্ত্র ছাড়াও সাধারণ লেটার প্রেসে ঐ একই ধরনের হরফ ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য যুক্তব্যঞ্জনকে পৃথক হরফে বিভক্ত করা যায় এবং চোখ ও কানের সংস্কার যদি তা মেনে নেয় অর্থের কোনো গোলমাল না হয় তাহলে লাইনো হরফের সংখ্যা আরো কমানো যেতে পারে। পার্কসার্কাস-কে যদি লেখা হয় পারকসারকাস মন্থন-কে মনথন, মণ্ডলকে মনডল, চাতুর্যকে চাতুরয, ঊর্ধ্ব-কে ঊরধ, তা হলে অদীক্ষিত পাঠকের মনে কৌতুকরস মাথা চাড়া দিতে পারে। কেউ হয়ত অসুবিধা দূর করবার জন্য প্রচুর হস্ চিহ্নের সাহায্য নিতে চাইবেন, মন্থন, অণ্ড, চিন্তা, পারলামেন্ট ইত্যাদি। অবশ্য তাহলে একখানি প্রমাণ মাপের বই ছাপতে কত হন্দর হসন্ত চিহ্ন লাগবে তা হিসাবের বিষয়। সুতরাং উচ্চারণ অনুযায়ী হসন্তচিহ্নের ব্যবহারের প্রস্তাব আপাতত মুলতুবী রাখা হল।

সুরেশচন্দ্র আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে ছাপাখানার অসুবিধা দূর করবার জন্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন "বর্তমান যুগে লাইনোটাইপ বিনা সংবাদপত্রের বহুল প্রচার অসম্ভব। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের দ্রুত মুদ্রণে যে বাধা ছিল তাহা এইবার দূর হইবে। আশা করি এদেশে যে বাঙ্গালা টাইপ প্রস্তুত হয় তাহাও শীঘ্র নূতন পদ্ধতিতে গঠিত হইবে, এবং তাহার ফলে ছাপাখানার খরচ কমিবে, সময় সংক্ষেপ হইবে, পুস্তকাদির মূল্য কমিবে এবং দেশে শিক্ষার প্রসার হইবে। নূতন যুক্তাক্ষরগুলি শিক্ষা করা সহজ, সেজন্য শিশুদেরও সুবিধা হইবে।" একালে তাঁর স্বপ্ন অনেকটা সফল হয়েছে। বাংলা দেশে অবশ্য এখনো ব্যাপকভাবে লাইনোটাইপ গ্রন্থ-মুদ্রণে ব্যবহৃত হচ্ছে না, অর্থকৃচ্ছ্রতা ও কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা তার প্রধান কারণ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে লাইনো হরফ জনপ্রিয় হচ্ছে, চলনশীল অক্ষরের ছাপাখানাতেও লাইনো ধাঁচের অক্ষর ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশ্চাত্যে চলনশীল অক্ষরের মুদ্রণকার্য প্রায় বাতিল হয়েছে, লাইনো মুদ্রণই সেখানে সর্বত্র চালু হয়েছে। কালে ভারতবর্ষেও বিভিন্ন ভাষায় লাইনো রীতি গৃহীত হবে। যখন এদেশে সমস্ত দেশীয় ভাষায় সেই রীতি গৃহীত হবে, তখন

ছাপাখানার কর্মীরা হাতে-ঢালা কম্পোজ প্রথা থেকে মুক্তি পাবে। তখনো সমগ্র দেশ সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে শ্রদ্ধা জানাবে।

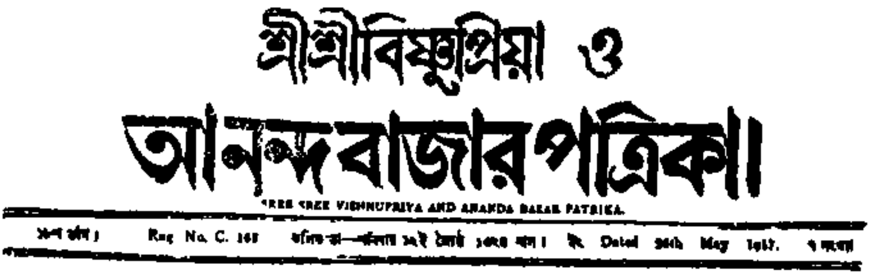

'আনন্দবাজার পত্রিকা' নানা পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। 'অমৃতবাজারে'র প্রকোষ্ঠে সাপ্তাহিক 'আনন্দবাজারে'র প্রথম আবির্ভাব হয়, অল্পকাল পরে জীবনান্তও ঘটে। পরে আবার 'সাপ্তাহিক আনন্দবাজার' প্রকাশিত হল নব নামে—'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার'। কিন্তু রাজনীতি ও ভক্তিধর্মকে এক গ্রন্থিতে বাঁধা গেল না, মহাযুদ্ধের সময়ে আবার এ সাপ্তাহিকের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর নবরূপে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ (বাংলা ১৩২৮, ২৯ ফাল্গুন) তারিখে দোলপূর্ণিমা তিথিতে অঙ্গে আবিরের রাঙা রঙ ধারণ করে সান্ধ্য দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হল। ঐ বছর জুন মাস থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুলেখক প্রফুল্লকুমার সরকার। লাল কাগজে ছাপা নতুন দৈনিকটি দেখে ফিরিঙ্গি কাগজ

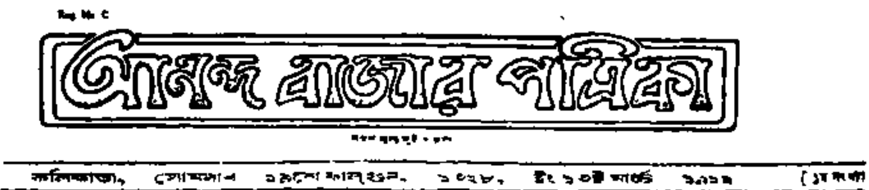

'স্টেট্সম্যান' ও ইংলিশম্যান' ভীত হলেন, তাঁদের মনে হল, এ পত্রিকা "coloured like a danger signal." আসলে দোলের সন্ধ্যায় প্রকাশিত হয় বলে কর্তৃপক্ষ লাল কাগজ ব্যবহার করেছিলেন, নিতান্ত ধর্মীয় প্রেরণায়। কিন্তু 'জনবুলে'র তখন রুশ-বিপ্লব-ভীতি দেখা দিয়েছে, ইউরোপ থেকে তখন রুশ বলশেভিকদের লোমহর্ষণ কাহিনী এদেশে আসতে আরম্ভ করেছে, তার উপরে আছে দেশীয় সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ। সুতরাং 'ইংলিশম্যান' 'আনন্দবাজারে'র প্রথম সংখ্যায় লাল কাগজ ব্যবহৃত দেখে শঙ্কিত তো হবেন-ই। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ এই প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার' মন্তব্য করলেন, "গতকল্য দোলের দিন বলিয়াই আমাদের কাগজের রং লাল করা হইয়াছিল; নতুবা লাল রংএ কাগজ বাহির করিবার কোন রাজনৈতিক মতলব নাই। 'ইংলিশম্যান' কিন্তু আমাদের 'আনন্দবাজার'কে 'danger signal' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'ইংলিশম্যান' দেখিতেছি সোজাসুজি মনের ভয়টা ব্যক্ত করিয়াছেন। লাল রং দেখিয়া ষাঁড় ক্ষেপিয়া উঠে; ইংলিশম্যান ক্ষেপিয়াছেন কেন?" এর পর বৎসরখানেকের মধ্যে সান্ধ্য দৈনিক প্রভাতী দৈনিকে পরিণত হল (১৯২৩, ১লা জুন)। তারপর কত বিশেষ সংখ্যা, শারদীয়া সংখ্যা, দোল সংখ্যা, রাজনৈতিক সংখ্যা, নেতৃবৃন্দের স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হতে লাগল। বাংলা সাংবাদিকতার প্রথম মান নির্ধারণ করেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর দৈনিক 'সংবাদপ্রভাকরে'। তার প্রায় বিরানব্বই বৎসর পরে দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করল। সুরেশচন্দ্র মজুমদার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র জন্যই লাইনো হরফের উদ্ভাবন করেছিলেন। বাংলা মুদ্রণের এই বিপ্লব সাধিত না হলে দৈনিক 'আনন্দবাজারে'র গতি ক্রমে মন্থর হয়ে পড়ত। 'আনন্দবাজারে'র নীড়েই বাংলা লাইনো হরফ লালিত হয়েছে, এবং এর সৃষ্টি ও লালনক্রিয়া একজন ব্যক্তি, সুরেশচন্দ্রের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়েছে, এ সংবাদ বিস্ময়কর।

যদিও মুখ্যতঃ 'আনন্দবাজারে'র প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সুরেশচন্দ্র বাংলা লাইনোর আবিষ্কার করেছিলেন তথাপি এর ফলে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা

হয়। তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভা বাংলার যান্ত্রিক অক্ষরযোজনার পথ উন্মুক্ত করেছে। তিনি অক্ষর সংখ্যা কমাবার যে পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা পরবর্তীকালের মনোটাইপ, ইণ্টারটাইপ, ফটোসেটিং প্রভৃতি যান্ত্রিক অক্ষরবিন্যাসের পদ্ধতি প্রচলনের সহায়ক হয়েছে। মুদ্রণে এই নবযুগ বাংলা প্রকাশনের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বইয়ের বহু সংখ্যক কপি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে ছাপা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আনন্দবাজার ও সুরেশচন্দ্রের উদ্যমের ফলে বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে উপকৃত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

হক নাম আলী

مع

قصهٔ فیروز شاه بنام گل دیوگانه

গোলে দেও্ গাক্কার পুঁথি

শুনো জতো বেরাদর য়্যরোজ
আমার তর্ জমা করিয়া কেচ্ছা
ফিরোজ সাহার গোলে দেওগাক্কা
বলে রাখিনাম নাম বহোত মাজল বাত
এহাতে অ নাম আসোক ফিরোজ সাও কা
যের সহিতে হাছেল্ করিলো কাম জেয়্ ছাই
ছুরতে মছোল্ মানি য়্যাল্কাজেতে রছিণ ব
য়াবে লিখীনু কএক্ জজ কেতাবের সানে
মুঁছি এতেজাম মিঞা করিলেণ ছহি বাদে ছা
পাইয়া দিনু মঁদোতে এলাহি এই কেতাবে
র রিনি খাহেস্বা হইবে নজ্‌দিগে য়াইলে
যেরা কেতাব পাইবে মোতা বাজারের
বিচে চৌরাহার কোনে ঠেকানা জানিবে
মো। কাপোড়ের দোকানে থেদ্মতে
খাদেম সেখ হাএমজা নাম পর্
গানে বালিয়া আফি মৌজাতে
মকাম — সন ১২৬০।
তাং — ১৭ আষাঢ়

ভাবীকালের মুদ্রণ
দীপঙ্কর সেন

গত তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এবং জাপানে মুদ্রণ-শিল্পের অগ্রগতি এত বেশী পরিমাণে ঘটেছে যে এ যুগের ছাপার কাজকে ফলিত বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করলেও ভুল হয় না। গতানুগতিক ধারায় হাতে কম্পোজ করা টাইপ ফর্মায় এ'টে প্লাটেন অথবা ফ্ল্যাটবেড যন্ত্রে ছাপার কাজ সেরে মান্ধাতার আমলে প্রচলিত রীতিতে বই বাঁধাই করলে আজ আর চলে না। এ যুগে কম্পিউটারের সাহায্যে অক্ষরযোজনা করে ফটোগ্রাফিক রীতিতে তা দিয়ে মুদ্রণীয় প্লেট তৈরি করা হচ্ছে। প্রগতিশীল দেশগুলিতে প্রাচীন লেটারপ্রেস মুদ্রণ পদ্ধতি ছোট ছোট টানের কাজ নিয়ে একঘরে হয়ে আছে। তার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র দখল করে নিয়েছে অফসেট লিথোগ্রাফি অথবা ফোটোগ্রাভিওর। বহু সংখ্যক কপি মুদ্রণের ব্যাপারে তাদের দক্ষতা লেটারপ্রেসের চেয়ে অনেক বেশী। সেগুলিতে লোকও কম লাগে এবং আখেরে খরচপত্রও কম হয়। সর্বোপরি মুদ্রিত জিনিসগুলি দেখতে হয় অনেক সুন্দর। এমনকি ছবি ছাপার জন্য প্রাচীন শিল্পপ্রথাকে পরিহার করে নতুন ভাবে কাজ করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখনই বলা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে যা কিছু নতুন তার সবগুলিই বিরাট আকারের জিনিস এ কথা বললে ভুল করা হবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ আজকের দিনে সিল্ক স্ক্রিনের লোকপ্রিয়তা। অতি সামান্য আয়োজনে সিল্ক স্ক্রিন পদ্ধতি অথবা লাইনোকাটের মধ্য দিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার শিল্পীরা বহু বিস্ময়কর মুদ্রণের কাজ নিজেদের হাতে করছেন। এ সম্পর্কে বলার মতো অনেক কথাই আছে এবং স্বল্প পরিসরে একটু গুছিয়ে বলতে হলে একটি নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে সে বক্তব্য শুরু করা উচিত। এই ক্ষেত্রে ফোটোগ্রাফিক রীতিতে অক্ষরযোজনা (type-setting) দিয়েই শুরু করা হচ্ছে।

সঠিকভাবে তারিখ সালের হিসাব দিয়ে ফোটোটাইপসেটিং কবে থেকে শুরু হয়েছিল সে-কথা কেউ বলতে পারবেন না। ডব্লু. ফ্রিজ গ্রীন নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এ নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেন।[১] ফোটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে অক্ষরযোজনার জন্য কিছু কিছু জিনিস তৈরি করে তিনি সেগুলির জন্য পেটেন্টও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পুরোপুরিভাবে চালু করবার মতো একটি যন্ত্র আবিষ্কার করতে তিনি পারেননি। সে সময় লাইনোটাইপ, ইন্টারটাইপ অথবা মনোটাইপ যন্ত্র দিয়ে আজকের মতো সূক্ষ্ম কাজ করা যেত না। মামুলি লেটারপ্রেসই ছিল তখনকার প্রধান মুদ্রণ পদ্ধতি। সুতরাং ফটোগ্রাফির সঙ্গে অক্ষরযোজনার মিলন ঘটাবার মতো প্রয়োজনের তাগিদ না

থাকায় মিঃ গ্রীনের পরিকল্পনা কার্যে রূপান্তরিত হয়নি।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের আর্থার ডাটন ফোটোলাইন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। এই যন্ত্রটিতে একটি টাইপরাইটারের সংগে একটি ক্যামেরা লাগানো ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্ট-হাণ্টার-পেনরোজ ফোটোকম্পোজিং মেশিন আবিষ্কৃত হবার পর মুদ্রণের জগতে নতুন যুগের সূচনা হল। এই যন্ত্রটির সংগে আজকের ফোটো কম্পোজিং যন্ত্রের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি আমেরিকার ইণ্টারটাইপ কোম্পানীর যন্ত্র-বিশেষজ্ঞরা কোডাকের যন্ত্রবিদ্‌দের সহযোগিতায় ইণ্টারটাইপ ফোটোসেটার তৈরি করেছিলেন। তারপর থেকেই ছাপাখানায় ফোটোকম্পোজিং যন্ত্রের ব্যবহার একটু একটু করে শুরু হয়।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মার্জেনথেলার কোম্পানী একটি বিশেষ ধরনের লাইনোটাইপ যন্ত্র উদ্ভাবন করে। তার হরফের ছাঁচগুলো ছিল কঠিনীকৃত কালো রবারবিশেষ বা ebonite দিয়ে তৈরি। এই যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল লাইনোফিল্ম। কিন্তু বর্তমান যুগের লাইনোফিল্ম যন্ত্রের সংগে তার বিশেষ কোন মিল নেই।

মনোটাইপ কর্পোরেশনের ফোটোকম্পোজিং-এর প্রাথমিক প্রয়াস ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। চল্লিশের দশকের শেষভাগ থেকে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত মনোটাইপ কর্পোরেশন যে ফোটোকম্পোজিং যন্ত্র তৈরি করার কাজে নিযুক্ত ছিল সেই যন্ত্রই পরবর্তী কালে মনোফোটো মার্ক ওয়ান থেকে মনোফোটো মার্ক ফাইভে উন্নীত হয়েছে। অদ্ভুত তাদের কর্মক্ষমতা। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ১৯৬৯ সনটি ফোটোটাইপসেটিং-এর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বছর জানুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে কুড়িটি নতুন মডেলের যন্ত্র তৈরি হয়েছিল। এর ভিতরে ছিল অতি উন্নত ধরনের ভিডিওকম্প ৮৪০ থেকে আরম্ভ করে আপেক্ষিকভাবে সরল এ এম ৭০৭ এবং জাসটোটেক্‌স্‌ট্‌ ৭০-এর মতো যন্ত্র। তার আগের বছরেও ১৫টি নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় নতুন নতুন যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনার কথা শোনা গেল। অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ পাওয়া গেল সে-সব কেবল কথার কথা নয়।

এমন দ্রুতগতিতে ফোটোটাইপসেটিং-এর প্রসার ঘটার ফলে মুদ্রণ বিশেষজ্ঞরাও সর্বপ্রকার ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে খুব নির্দিষ্টভাবে মতামত দিতে পারেন না। প্রায় বারোটি যন্ত্র প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছ থেকে এখন চল্লিশটিরও বেশী ফটোটাইপসেটিং যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। এই তালিকায় যে-সব যন্ত্র কেবলমাত্র শিরোনাম রচনা করে সেগুলিকে ধরা হয়নি। তবে এ কথাও সত্যি চল্লিশের বেশী এই বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের একের সংগে অপরের কর্মপদ্ধতিতে এত বেশী মিল খুঁজে পাওয়া যায় যে মুদ্রণ বিশেষজ্ঞরা এগুলিকে মোট চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তা হল:

১ দীর্ঘ পাঠ্যবস্তু কম্পোজ করার যন্ত্র:
২ রকমারি চিত্তাকর্ষক টাইপ কম্পোজ করার যন্ত্র;
৩ কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র; এবং
৪ সাধারণভাবে সর্বপ্রকার কাজের উপযোগী যন্ত্র।

ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্রের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা নিচে দেওয়া হল।

দীর্ঘ পাঠ্যবস্তু কম্পোজ করার যন্ত্র:

এ এম ৭২৫	অ্যাড্রেসোগ্রাফ-মালটিগ্রাফ
এ এম ৭০৭	
অ্যালফাটাইপ	অ্যালফাটাইপ কর্পোরেশন
এ টি এফ টাইপসেটার বি-৮	আমেরিকান টাইপ ফাউণ্ডারস
ফোটোকম্প ২০	
সি জি ২৯৬১	কমপিউগ্রাফিক কর্পোরেশন
সি জি ২৯৭০	
সি জি ২৯৭১	
সি জি ৪৯০০	
সি জি ৪৯৬১	
সি জি ৪৯৭১	
সি জি ৪৯৬২	
পি টি এস ২০২০	ফেয়ারচাইল্ড গ্রাফিক ইকুইপমেণ্ট
পি টি এস ৮৯০০	
জাস্‌টোটেক্‌স্‌ট্‌ ৭০	ক্লাইডেন

টাইপোডাইন (আট রকমের মডেল)	গ্রাফেক্স ইনকরপোরেটেড
লাইনোফিল্ম সুপার কুইক	মার্জেনথেলার লাইনোটাইপ কোম্পানী
লাইনোফিল্ম সুপার কুইক, ওয়াইড রেঞ্জ	
লাইনোট্রোন ৫০৫	লাইনোটাইপ-পল লিমিটেড
মনোফোটো ৬০০	দি মনোটাইপ কর্পোরেশন লিমিটেড
ফোটোন ৭১৩-৫	ফোটোন ইনকর্পোরেটেড
ফোটোন ৭১৩-১০	
ফোটোন ৭১৩-২০	
ফোটোন ৭১৩-৩০	
ফোটোন ৭১৩-৪০	
ফোটোন ৭১৩-১০০-১৫	
ফোটোন ৭১৩-২০০-৮	
ফোটোন ৭১৩-২০০-১৫	
ফোটোন ৭৭০০	
ফোটোন ৭৪৪৫	
কম্পস্টার	স্টার পার্টস কোম্পানী

তিরিশের চেয়েও বেশী সংখ্যক যে-সব যন্ত্রের নাম এই তালিকায় আছে তার মধ্যে কোনটির চেয়ে কোনটি বেশী ভাল সে সমীক্ষা খুবই সাবধানে করা প্রয়োজন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন যন্ত্রের কেবল নামটুকুই নতুন। কর্মপদ্ধতিতে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। ফোটোন ৭১৩-৫ থেকে শুরু করে ফোটোন ৭১৩-২০০-১৫ অবধি ব্রিটিশ মুদ্রকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ১৯৬৯-এর অক্টোবরের মধ্যে সারা ইউরোপে নব্বইটির চেয়ে কিছু বেশী এই রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই যন্ত্রগুলি সংবাদপত্র এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকার পাঠ্যাংশের জন্য হরফ-যোজনার কাজেই লাগানো হয়েছিল। তবে এর মধ্যে কম করেও পাঁচটি যন্ত্র গ্রন্থ-মুদ্রকেরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

রকমারি চিত্তাকর্ষক পাঠ্যবস্তু কম্পোজ করার যন্ত্র:

ফোটোন ৫৪০	ক্রসফিল্ড ইলেকট্রনিকস লিমিটেড
ফোটোট্রনিক ৪৮০	হ্যারিস ইন্টারটাইপ কর্পোরেশন
ফোটোট্রনিক ২২০০	
লাইনোফিল্ম কল ২৮	মারজেনথেলার লাইনোটাইপ কোং
লাইনোফিল্ম কে ই ১৮	
লাইনোফিল্ম কে ই ২৮	
ফোটোন ২০০ বি অ্যাডমাস্টার	ফোটোন ইনকরপোরেটেড
ফোটোন ২১৩ টেপমাস্টার	
ফোটোন ২৬০ টেপমাস্টার	
ফোটোন ৫৬০ ডিসপ্লেমাস্টার	
ফোটোন ৫৩২ ডিসপ্লেমাস্টার	

কোন কোন মুদ্রক এই যন্ত্রগুলির চাবি-পাটাতনে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রণীয় চিহ্ন সংযোজন করে নেন। ইংলন্ডের আনউইন ব্রাদার্স লিমিটেড (দি গ্রেসাম প্রেস) ওয়োকিংএ অবস্থিত তাঁদের নিজস্ব ছাপাখানায় এমনি করে কয়েক শত স্বল্প প্রচলিত চিহ্ন, বৈজ্ঞানিক প্রতীক এবং গাণিতিক চিহ্ন জুড়ে নিয়েছেন তাঁদের ফটোকম্পোজিং যন্ত্রগুলিতে। এসব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ বিশেষজ্ঞের মতে এই যন্ত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা বেশ কঠিন।

কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র:

ফোটোট্রনিক সি. আর. টি.	হ্যারিস ইন্টারটাইপ কর্পোরেশন
লাইনোট্রোন ১০১০	মারজেনথেলার লাইনোটাইপ কোং
ফোটোন জিপ ৯০১	ফোটোন ইনকরপোরেটেড
ফোটোন জিপ ৯০২	
ভিডিওকম্প ৮২০	আর সি এ
ভিডিওকম্প ৮৩০	
ভিডিওকম্প ৮৪০	

এই যন্ত্রগুলি যে দ্রুতগতিতে কাজ করে তা সত্যিই বিস্ময়কর। অবশ্য তার জন্য প্রাথমিক

কিছু আয়োজন মুদ্রকেরও করতে হয়। কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের জন্য কপি তৈরি করাও কঠিন কাজ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেশ ভাল করে চিন্তা করার আগে এই জাতীয় যন্ত্র কেউ চট করে কিনে ফেলেন না। প্রসঙ্গক্রমে কমপিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগুলির দামের বিষয়ে দু' এক কথা লিখছি। ফোটোট্রনিক সি. আর. টি.-এর মূল্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার, লাইনোট্রোন ১০১০-এর চার লক্ষ ডলার, ফোটোন জিপ-এর এক লক্ষ কুড়ি হাজার পাউন্ড, ভিডিওকম্প ৮২০-এর দু' লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশ' ডলার (মাসিক ভাড়া ছ' হাজার পাঁচশ দশ ডলার) এবং ভিডিওকম্প ৮৩০-এর তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার নশ' প'চাত্তর ডলার (মাসিক ভাড়া আট হাজার কুড়ি ডলার)।

সাধারণভাবে সর্বপ্রকার অক্ষরযোজনার কাজের উপযোগী যে-সব যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সে-গুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। সেই সব যন্ত্র দিয়ে যে কোন ধরনের কপিই কম্পোজ করা যায়। অর্থাৎ দীর্ঘ পাঠ্যবস্তু, রকমারি চিত্তাকর্ষক অক্ষরযোজনা, রেলওয়ে টাইম টেব্‌ল্‌ জাতীয় কাজ এবং বৈজ্ঞানিক ফরমুলা অল্প খরচে কম্পোজ করা সম্ভব। এই তালিকায় মনোফোটো এবং বের্থল্ড-এর ডায়াট্রনিক যন্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংলন্ডে এই জাতীয় যন্ত্রের সর্বাধিক মূল্য হল ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড।[২]

ফটোটাইপসেটিং-এর প্রচলিত ইতিবৃত্তে সামান্য কিছু গরমিল থাকলেও সে ইতিহাসের ধারা-বাহিকতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে। 'দি নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় এই যন্ত্র উদ্ভাবন সম্পর্কে প্রাথমিক চিন্তার কৃতিত্ব দেওয়া হয় ইউজিন পোরট্‌সোল্ট নামে হাঙ্গেরির একজন যন্ত্র বিশেষজ্ঞকে।[৩] ১৮৯৪-এ তিনিই নাকি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ফোটোকম্পোজিং যন্ত্রটি ডিজাইন করেছিলেন। এছাড়া এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ফোটোসেটার জাতীয় কোন যন্ত্রই পাওয়া যায়নি। 'এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা'য় দাবি করা হয়েছে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইন্টারটাইপ ফোটোসেটার মার্কিন মুলুকে চালু করা হয়েছে এবং ১৯৪৬ থেকেই ম্যাসাচুসেটস-এর কেম্ব্রিজ অঞ্চলে ফোটোন যন্ত্র তৈরির জন্য Rene A. Higgonet এবং Louis M. Moyroud নামক দুজন ফরাসী যন্ত্রবিশেষজ্ঞের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হয়েছে।[৪]

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছরে ফোটোগ্রাভিওর এবং ফোটোলিথোগ্রাফির অসাধারণ অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও অক্ষরযোজনার ব্যাপারে গলানো সীসের পাত্রসহ লাইনো, মনো অথবা ইন্টারটাইপ যন্ত্রকে পরিহার করা সম্ভব হয়নি। ফোটো কম্পোজিং চালু হবার পর আপেক্ষিকভাবে নতুন এই দুটি মুদ্রণ পদ্ধতির কর্মক্ষেত্রের দিগন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। তারপর গলানো সীসে দিয়ে তৈরি টাইপ কম্পোজ করে, তার ছাপ নিয়ে তা থেকে প্রয়োজনমত নিগেটিভ অথবা পজিটিভ তৈরির ক্লান্তিকর কাজটি বন্ধ করে দেওয়া গেল। মুদ্রণের ইতিহাসে এইভাবে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।

সব ফোটোকম্পোজিং যন্ত্রেরই মূল উপাদান হল একটি নিগেটিভ টাইপের ছাঁচ এবং একটি লেন্স। এছাড়া প্রয়োজন কৃত্রিম একটি আলোর রশ্মি। এই আলোর রশ্মিকে লেন্সটির ভিতর দিয়ে নিগেটিভ টাইপের ছাঁচের স্বচ্ছ অংশটির মধ্য দিয়ে আলোর প্রতি সংবেদনশীল বা সুবেদী (light sensitive) ফিল্ম অথবা ফোটোগ্রাফিক কাগজের উপর প্রক্ষেপ করা হয়। বেশীরভাগ ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্রেই নানা আকারের হরফ তৈরি করা সম্ভব। সেজন্য হয় নানা আকারের ছাঁচ ব্যবহার করা হয় নতুবা লেন্সের সাহায্যে হরফটির ছোট অথবা বড় প্রতিবিম্বের (image) ছবি তুলে নেওয়া হয়। হরফগুলির ছবি ফিল্ম অথবা ফোটোগ্রাফিক কাগজে ঠিক জায়গায় তুলে নেবার জন্য হয় ফিল্ম অথবা ফোটোগ্রাফিক কাগজকে সঠিকভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে নতুবা লেন্স, আয়না অথবা ত্রিপার্শ্ব কাচের (Prism) সাহায্যে সে কাজটি সেরে নিতে হবে। এই সময় একটি হরফের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের দিকের সামগ্রিক মাপটির দিকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ একটি হরফের সঙ্গে তার পাশের হরফ স্থাপিত হবার সময় তাদের মাঝখানে বাঞ্ছিত পরিমাণ ফাঁক রাখার আয়োজন করতে হবে। একটি পংক্তির যোজনার পর তার পরের পংক্তিটি যোজনার সময় তাদের মধ্যে ন্যূনতম ফাঁক রাখার কথা ভুললে চলবে না।

ফোটো কম্পোজিং মেশিন তৈরি করার সময় দুটি জিনিস প্রাধান্য লাভ করেছিল। প্রথমতঃ প্রচলিত গরম সীসার পাত্রসহ কম্পোজ করার যন্ত্রের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাগুলি হাতে রেখে তার সঙ্গে ফোটোগ্রাফিকে যুক্ত করার সম্ভাবনার কথা এক শ্রেণীর মানুষ চিন্তা করেছিলেন। এতে নতুন যন্ত্র উদ্ভাবনের কাজটি আপেক্ষিকভাবে সহজ হয়ে যাবার সম্ভাবনার দিকটি দেখতে পাওয়া গেল। তাছাড়া পুরনো কম্পোজিং মেশিন যাঁরা চালাতে পারতেন তাঁদের দিয়েই নতুন যন্ত্র চালাবার সুবিধার কথা বলা হল। দ্বিতীয়তঃ পুরনো যন্ত্রের কথা ভুলে গিয়ে নতুন করে ফোটো কম্পোজিং যন্ত্র তৈরি করার কথা আরেক শ্রেণীর মানুষ বলতে লাগলেন। তাতে অক্ষরযোজনার

গতিবেগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনার কথা তাঁরা বললেন। তবে তার জন্য আপেক্ষিকভাবে বেশী মূলধন প্রয়োজন এবং নতুন যন্ত্র চালাবার মতো দক্ষ পরিচালকদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, এ বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন। এ ছাড়া প্রাচীনপন্থী মুদ্রকদের মধ্যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই জাতীয় যন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলা যে কত কঠিন সে কথাও তাঁরা বিবেচনা করলেন। আজ এই দু' রকম যন্ত্রই অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মনোফোটো তার আদি রূপটিকে বিসর্জন না দিয়ে তার সঙ্গে কিছু নতুন যন্ত্রাংশ সংযোজন করে জনপ্রিয়তার চরম শীর্ষে উপনীত হয়েছে। লাইনোফিল্ম, ফোটোন এবং এ. টি. এফ. যন্ত্রগুলিতে নিম্নলিখিত সরঞ্জামের কিছু কিছু অথবা প্রায় সবই খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কাগজের ফিতার মাধ্যমে যন্ত্রচালনার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক কী-বোর্ড, ফিল্ম অথবা প্লেটের উপর তৈরি বিভিন্ন প্রকার টাইপের অনেকগুলি সাট (fount) এবং স্বয়ংক্রিয় প্রথায় টাইপের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ।

এই প্রসঙ্গে গোড়ার কথার পুনরাবৃত্তি করছি। বর্তমান যুগে মুদ্রণশিল্প এতই সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে যে অতীতের মুদ্রকেরা আধুনিক ছাপাখানায় ঢুকে কাজ করতে গেলে বেশ অস্বস্তি বোধ করবেন। কারণ আজকের ছাপাখানায় বিশেষজ্ঞ ছাড়া কাজ চলে না। তাঁদের কারো অধীত বিদ্যা ইলেকট্রনিকস, কারো পদার্থবিদ্যা, কারো অপটিক্স, কারো এঞ্জিনিয়ারিং, কারো বা কম্পোজিং, টাইপোগ্রাফি অথবা কম্পিউটারের কাজ।

এই কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কেবলমাত্র কম্পিউটারের সাহায্যে আজকাল কিভাবে অক্ষরযোজনা করা হচ্ছে তা আলোচনা করলেই যথেষ্ট হবে। বর্তমান শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে অক্ষরযোজনার জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। সেই সময় সাধারণ কাজের জন্য IBM 1620 এবং RCA 801 ব্যবহার করে অসমানভাবে কম্পোজ করা পংক্তিগুলোকে কম্পিউটারের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সমান করে তোলা হত এবং পংক্তির শেষে কোন শব্দকে ভাঙতে হলে কম্পিউটার প্রয়োজনমত জায়গায় হাইফেন চিহ্ন বসিয়ে আদিযুগের অক্ষরযোজকের যন্ত্রচালনার কাজকে অনেকটা সহজ করে তুলেছিল। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য যে-সব কম্পিউটার ব্যবহার করা হত সেগুলির মধ্যে Linasec-এর নাম উল্লেখ করা উচিত। এই যন্ত্রে একটি সতর্ককারী অংশ (Monitor) থাকত এবং সেটি ব্যবহার করে যন্ত্রচালক টেলিভিশনের পর্দার মতো Nixie screen-এর উপর যোজনা করা অক্ষরগুলির আসল রূপটি প্রতিফলিত করে কোথায় কি ভুল হয়েছে তা দেখে নিতেন। তারপর স্বয়ংক্রিয় Justape-এর সাহায্যে পংক্তিগুলোকে সমান এবং নির্ভুল করে নেওয়া হত।

এবার সহজ ভাষায় কম্পিউটার সম্পর্কে কিছু বলছি। কম্পিউটার হল সেই শ্রেণীর যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবপত্র এবং তথ্য বিতরণের কাজ করে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, একটা কম্পিউটার মাত্র এক সেকেন্ডে যতগুলি যোগ করতে পারে তা করতে একজন মানুষের দিনে চব্বিশ ঘণ্টা হিসাবে কাজ করেও ত্রিশ বছর লাগবে।[৩] কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি অতুলনীয়। তাছাড়া তার ভুল বড় একটা হয় না।

বেশীরভাগ কম্পিউটারই ডিজিটাল কম্পিউটার। অর্থাৎ সংখ্যা নিয়েই তাদের যত কাজ কারবার। ডিজিটাল কম্পিউটারের তিনটি মূল অংশ। প্রথম, ইনপুট এবং আউটপুট ইউনিট; দ্বিতীয়, মেমারি এবং তৃতীয়, সেনট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। যেসব তথ্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার কাজ করে ইনপুট ইউনিট সেগুলিকে গ্রহণ করে থাকে। তারপর আউটপুট ইউনিট কাজটি শেষ করে। মেমারির কাজ হল যেসব তথ্য এবং নির্দেশের ভিত্তিতে কাজ হবে সেগুলিকে কম্পিউটারের স্মৃতির পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত করে রাখা। তবে সেনট্রাল প্রসেসিং ইউনিটই কম্পিউটিং-এর আসল কাজটি করে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। চালক ছাড়া মোটর গাড়ি যেমন চলে না, ঠিক তেমনই কম্পিউটারও পরিচালনার অভাবে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকে। কম্পিউটারে কাজ করার জন্য একটি কর্মসূচী (Programme) লিপিবদ্ধ করতে হয়। প্রোগ্রাম বলতে এখানে কতকগুলি নির্দেশের কথা বোঝায়। এই নির্দেশের ভিত্তিতেই কম্পিউটার বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান করে থাকে।

বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য তৈরি কম্পিউটার একটির বেশী কাজ করতে পারে না। মুদ্রণ-শিল্পে জাস্টিফিকেশন (Justification) এমনিতরো একটি কাজ। জাস্টিফিকেশন বলতে আমরা বুঝি একটি পংক্তিতে টাইপ এবং স্পেস দিয়ে সামান্যতম ফাঁক না রেখে একটি বাঞ্ছিত দৈর্ঘ্যে দাঁড় করানো। বলা বাহুল্য এই দৈর্ঘ্যে অক্ষরযোজনার সময় পংক্তির সব শব্দগুলির মাঝের ফাঁকটি সমান রাখার চেষ্টাও করতে হয়। সাম্প্রতিক কালে য়ুরোপ এবং আমেরিকার অনেক সেমিনারেই একটি বহু আলোচিত বিষয় হল অক্ষরযোজনা এবং আনুষঙ্গিক কাজের জন্য সাধারণ কম্পিউটার ভাল না বিশেষ কাজের জন্য তৈরি কম্পিউটারগুলোও জাস্টি-ফিকেশনের সঙ্গে আরো বেশ কিছু কাজ করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম ইউরোপের

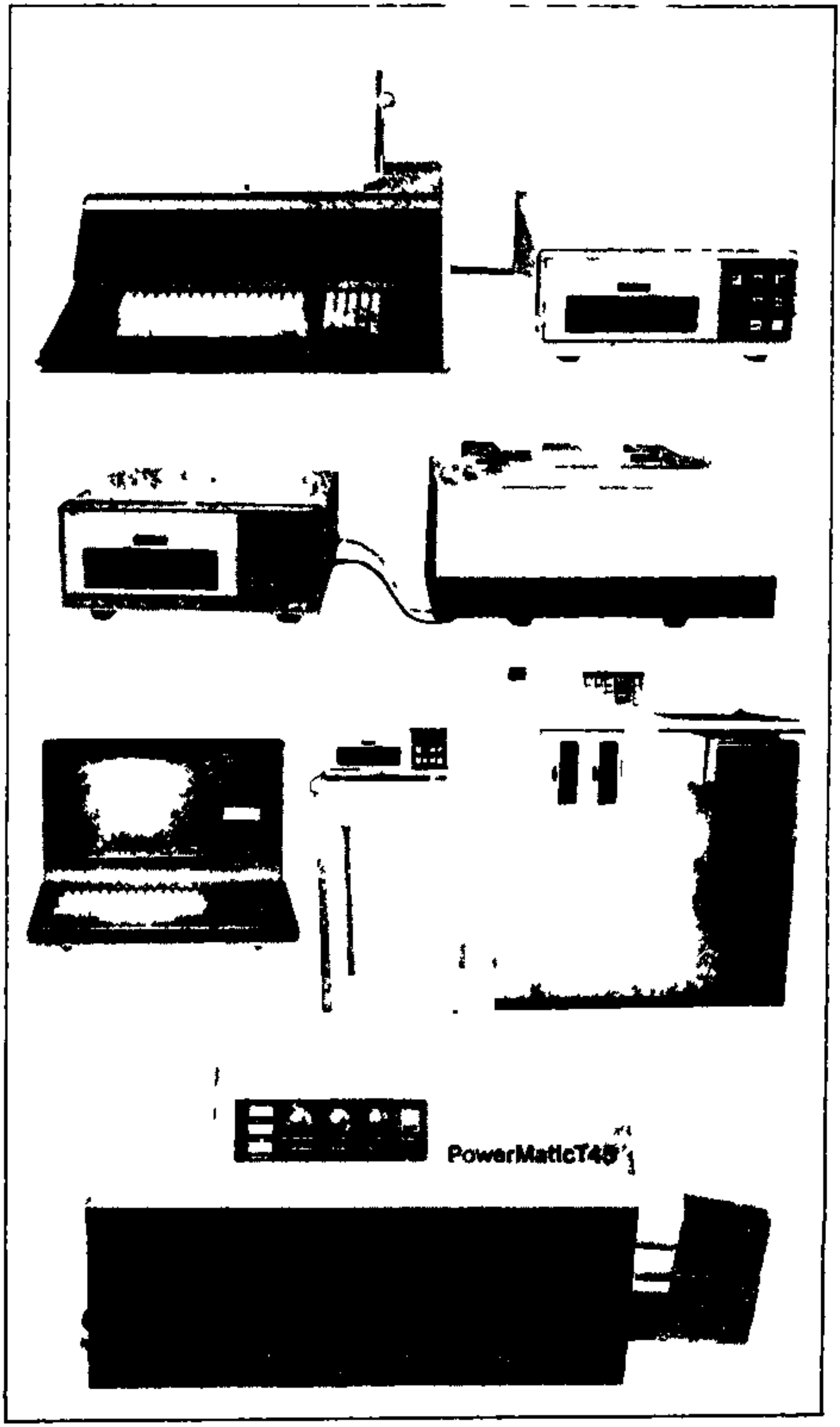

প্রসেসার সমেত ফোটোটাইপসেটিং মেশিন

বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার সম্পর্কে একটি পক্ষপাতিত্বের ভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু এখনও সাধারণ কম্পিউটার দিয়ে অক্ষরযোজনা এবং আনুষঙ্গিক কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি।

ষাটের দশকে কম্পিউটার দিয়ে কেবলমাত্র জাস্টিফিকেশন এবং লাইনের শেষে হাইফেন চিহ্ন বসানো ছাড়া আর কিছু করা যেত না। কিন্তু এখন কম্পিউটারের কাজ তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত হয়েছে। কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অক্ষরযোজক যন্ত্রগুলির চাবি টেপার কাজ (Keyboard Operation) পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা এ যুগে সম্ভব। কম্পোজ করা জিনিস সংরক্ষণ, সংশোধন এবং সম্পাদনার ব্যাপারেও কম্পিউটার ছাড়া আজ আর চলে না।

কম্পিউটারের দক্ষতার উদাহরণ হিসাবে কেবলমাত্র লাইনোট্রোন-303 কি কি করতে পারে তাই উল্লেখ করছি:

১ প্রতি মিনিটে ১৫০টি পংক্তি তৈরি করা;

২ ৪ থেকে ৭২ পয়েন্টের টাইপে অক্ষরযোজনা। প্রয়োজনমত টাইপের আকার আধ পয়েন্ট করে বাড়ানো। এক পয়েন্ট বলতে স্থূলভাবে ১ ইঞ্চির বাহাত্তর ভাগের এক ভাগ বোঝায়;

৩ বিভিন্ন পংক্তির মাঝে মাঝে প্রতি ধাপে ½ পয়েন্ট করে ফাঁকা জায়গা বৃদ্ধি করা;

৪ ২৪টি পর্যন্ত আধারের প্রতিটিতে ১৪৪টি হরফ রাখার সুযোগ;

৫ অসাধারণ দ্রুতগতিতে টাইপের আকৃতির পরিবর্তন;

৬ অপ্রতিদ্বন্দ্বী টাইপ ফেসের সংগ্রহ।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের লাইনোটাইপ-পল সংস্থার একজন প্রতিনিধি আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁদের উদ্দেশ্য হল রবিবারের টাইমস্ পত্রিকার মত বিরাট আকারের কাগজ আড়াই ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করা। সেদিন এখনও আসেনি, তবে আসতে খুব বেশী দেরী আছে বলেও মনে হয় না।

এবার অফসেট লিথোগ্রাফি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। মুদ্রণপদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রাচীনতার বিচারে লিথোগ্রাফি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে লিথোগ্রাফির লোকপ্রিয়তা এখনও খুবই বেশী। এমনকি হরফ বা টাইপ মুদ্রণেও লিথোগ্রাফি লেটারপ্রেসকে কোনঠাসা করে ফেলেছে। সত্যি কথা এই যে, পাশ্চাত্যে লেটারপ্রেসের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এই ব্যাপারটি বেশী করে ঘটেছে ফোটোটাইপসেটিং আবিষ্কৃত হবার পর, কারণ এই পদ্ধতিতে যোজনা করা হরফকে সোজাসুজি লিথোগ্রাফির প্লেট তৈরি করার কাজে নিয়োগ করা যাচ্ছে। লিথো মুদ্রণের এতদূর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ওয়েব অফসেট যন্ত্রের জন্য। খুব ভাল কাজ করছে ওয়েব অফসেট মেশিনগুলি। এরা হল সেই শ্রেণীর যন্ত্র যাতে মুদ্রণীয় কাগজ টুকরো হিসাবে ছাপার জন্য মেশিনে না চড়িয়ে লাটাইয়ে যেমন করে সুতো গুটিয়ে রাখা হয় তেমনি করে যন্ত্রাংশগুলির একটি বেলনাকার বস্তুতে পরিয়ে দেওয়া হয়। সর্বপ্রকার রোটারি মুদ্রণযন্ত্রের মত ওয়েব অফসেট মেশিনেরও প্রচণ্ড বেগে কাজ করার শক্তি আছে। অধিকাংশ ওয়েব অফসেট যন্ত্রে একসঙ্গে কাগজের দু'পিঠ ছেপে নেওয়া যায়। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে Perfector. তাছাড়া ওয়েব অফসেট যন্ত্রগুলিতে এক সঙ্গে একাধিক রঙের কালি দিয়ে মুদ্রণ করাও সম্ভব। বিলেতের দৈনিক সংবাদপত্রগুলিকে ধীরে ধীরে লেটারপ্রেস থেকে লিথোগ্রাফিতে রূপান্তরিত করার ইচ্ছাকে ওয়েব অফসেট যন্ত্রই সফল করে তুলতে পারবে বলে মনে হয়। ওয়েব অফসেট যন্ত্রের মূল কাজের সঙ্গে সহায়ক কাজগুলিও উল্লেখযোগ্য। কাগজ ছিদ্র করা (punching), বা কাগজ বিদ্ধ করার (Perforating) ব্যাপারেও এই যন্ত্রের জুড়ি নেই। কিছু কিছু যন্ত্র মুদ্রণীয় গ্রন্থের মলাটের ভিতর দিকটি ছেপে নিয়ে সেগুলির বাঁধাইয়ের কাজও সেরে ফেলেন।

মুদ্রণশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্র মুদ্রণের বিষয়ে কিছু বলা উচিত। মুদ্রণশিল্পের এই শাখাটিতেই একজন ভারতীয় মৌলিক কাজ করে গেছেন। আজ সত্তর বছরেরও কিছু আগে উপেন্দ্রকিশোর রায়ের মৌলিক গবেষণা হাফটোন ব্লক মুদ্রণের দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল। তাঁর আবিষ্কার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে যখন ধন্য হয়েছিল তখনও আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মুদ্রণ চর্চার কথা বোধহয় কেউই ভাবতেন না। তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, দেশে কয়েকটি মুদ্রণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য কাজ এ পর্যন্ত হয়নি।

ইউরোপ-আমেরিকায় ফোটো-এনগ্রেভিং-এর কাজ খুবই উন্নত হয়ে উঠেছে। একাধিক যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে মুদ্রণালয়ের এই বিভাগের কর্মীরা দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা অর্জন করার আগেই সুন্দর ব্লক অনায়াসেই তৈরি করছেন। এ যুগের ডার্করুম ক্যামেরা দিয়ে এমন অনেক কিছুই করা যায় যা ফোটো-এনগ্রেভিং-এর গোড়ার যুগে কল্পনাও করা যেত না। অবশ্য এর জন্য আধুনিক প্রোসেস ক্যামেরা ব্যবহার করার মত সুশিক্ষিত কর্মীরও প্রয়োজন। ফোটো-

এনগ্রেভিং-এর দিগন্তে স্ক্যানার যন্ত্র এক নতুন যুগ এনেছে। এক রঙের কাজের জন্য যেসব ইলেক-ট্রনিক স্ক্যানার ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি মূলে চিত্রটির আলো-ছায়ার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করার সংগে সঙ্গেই অধিক স্ক্রিন সহ প্লেট অথবা ফয়েল তৈরি করে দিচ্ছে। আর ইলেকট্রনিক কালার স্ক্যানার বিভিন্ন রঙের উপযোগী আলাদা আলাদা মুদ্রণীয় সমতল তৈরি করে বিস্ময়কর-ভাবে মানুষের হাতের কাজকে লাঘব করেছে।

পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলিতে মুদ্রণশিল্পের এত উন্নতি ঘটেছে যে এখন কোন একটি জাতির সাংস্কৃতিক মানের প্রথম পরিচয় পেতে হলে দুটি জিনিসের মধ্য দিয়ে আমরা তা পাবার চেষ্টা করে থাকি। এক হল তার তৈরি ঘরবাড়ী, আর দুই তার মুদ্রিত সামগ্রী। বিখ্যাত টাইপো-গ্রাফার বিয়াট্রিস ওয়ার্ড তাঁর 'ক্রিস্টাল গবলেট' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন: "ভাল লাগুক আর নাই লাগুক আজকের দিনের নগরবাসীদের দুটি বিশিষ্ট নমুনায় তৈরি জিনিস চোখ মেলে দেখতেই হবে—ঘরবাড়ী আর মুদ্রিত শব্দ। সমাজের সাংস্কৃতিক মান বিচারের জন্য তার স্থাপত্য-রীতি এবং মুদ্রিত বস্তুর মত প্রামাণ্য সূত্র আর কিছু নেই। সুরুচি, বিচারবোধ এবং সমকালীন শিল্পকৌশল সম্পর্কিত শিক্ষা এবং যাবতীয় জিজ্ঞাসার যথাযথ জবাব টাইপোগ্রাফির সম্মুখ এবং বাস্তব চিত্রের মধ্য দিয়ে যতটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এমন আর কিছুতেই নয়।"

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন আশা করা যায় তা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো কথা। আধুনিক যুগের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের মান যে অনেক উন্নীত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। নতুন নতুন যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কাজের-গতিবেগ অনায়াসেই বৃদ্ধি পাবে। বাংলা ভাষায় রকমারি হরফের বিশেষ অভাব। ফোটোটাইপ-সেটিং যন্ত্র প্রবর্তিত হলে সেই ঘাটতি খুব তাড়াতাড়ি পূরণ করা যাবে। বাংলা বইয়ের একঘেয়ে পাইকা, স্মল পাইকা টাইপের পরিবর্তে শুধু যে নানারকমের টাইপ ডিজাইন করা যাবে তাই নয়, হয়ত বেশ তাড়াতাড়ি ইটালিক এবং বোল্ড টাইপের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। আধুনিকতম যন্ত্র মানুষের নিজস্ব নিপুণতার দিকটিকে অতীতের মত অপরিহার্যভাবে ধরে রাখেনি। লাইনো-টাইপ, মনোটাইপ যন্ত্রচালকদের যে পরিমাণ হিসাবপত্র শিখে কাজ করতে হত ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্রের চালকদেব তেমন কিছু করার প্রয়োজন নেই। যে কর্মী স্ক্যানার যন্ত্র ব্যবহার করে রঙিন ছবির ব্লক তৈরি করছে তার নানা বর্ণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলেও সে অনায়াসে ব্লক তৈরি করে নিতে পারবে। সর্বপ্রকার যান্ত্রিক সুবিধার ফলে শিল্পীদের আঁকা একঘেয়ে প্রচ্ছদের পরিবর্তে বিদেশী বইয়ের মত নানাপ্রকার নতুন নতুন টাইপোগ্রাফিক ডিজাইন প্রবর্তন করা যাবে। এদেশে ভাল শিল্পীর অভাব নেই। সিল্ক স্ক্রিন বা লাইনোকাট পদ্ধতির সাহায্যে বইয়ের জ্যাকেট নিশ্চয় অনেক বেশী সুন্দর করে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে ঘটবে বলে মনে হয় না। তার মূল কারণগুলি সর্বজনবিদিত। এ যুগে যেসব যন্ত্র কাজের গতি এবং দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলেছে সেগুলি বিদেশে তৈরি। সুতরাং সেসব যন্ত্র বিদেশ থেকে আনিয়ে কাজ করতে হলে ব্যবহারের সময় এবং মেরামতের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। ভাল ধরনের সব যন্ত্রেরই দাম এত বেশী যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মুদ্রকদের পক্ষে সেগুলি কেনা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভারতবর্ষের অর্থনীতিক অবস্থার সঙ্গে যাঁদের একটা মোটামুটি পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত বই কিনে পড়বার মতো পাঠকের সংখ্যা এখনও খুবই কম। সেই হিসাবে কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্র দিয়ে বাংলা বইয়ের জন্য অক্ষরযোজনার কথা চিন্তা করার সময় এখনও আসেনি। অবশ্য লক্ষাধিক কপির প্রচার সম্বলিত বাংলা সংবাদপত্র এই নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলে প্রকাশক উপকৃত হবেন। এই নতুন রীতিতে মুদ্রিত বাংলা সংবাদপত্র পাঠকদের হাতে পৌঁছতে বেশী বিলম্ব হবে মনে হয় না। তবে আমাদের বর্ণমালার হরফকে সংস্কৃত করে নিলে ছোট চাবি-পাটাতনওয়ালা ফোটোটাইপসেটার যন্ত্রের প্রবর্তন সম্ভব হতেও পারে। সব দেশেই শিল্পের উন্নতির সঙ্গে অর্থনীতিক অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। আমাদের দেশের অর্থনীতিক উন্নতি তেমন করে না হলে পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির ছাপাখানার মতো করে আমাদের ছাপাখানা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখার কোন অর্থ হয় না। ছাপাখানা মানুষকে পড়বার সামগ্রীর যোগান দেয়। আমাদের দেশ স্বাধীন হবার তিন দশক পরেও এখানে শিক্ষিত মানুষের চেয়ে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। সেদিকটি আগে ঠিক করা দরকার। দেশের অর্থনীতিক উন্নতি হলে এবং শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে গেলে যন্ত্রপাতির অভাবে মুদ্রণশিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে বলে মনে হয় না। আর তা না হলে বর্তমান অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়।

১ Cameron, C. A. *Pira Internal Report*, April 1975
২ ফোটোটাইপসেটিং যন্ত্রের তালিকা, মূল্য এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্র· The Phototypesetting Jungle by L. W. Wallis in *Printing in the 20th Century*—A Penrose Anthology, edited by James Moran. 1974
৩ *The New Encyclopaedia Britannica*, Micropaedia V. VIII, 15th ed. p. 996
৪ *Encyclopedia Americana*, Vol. 22, 1976 pp. 604a and 604b
৫ *The New Book of Knowledge*, Vol. 3, New York, 1974, p. 419

ছবি ছাপার কলাকৌশল

নীলমণি সেনগুপ্ত

মুদ্রণশিল্প আজ যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। মুদ্রণের এই উন্নতি এক-দিনে ঘটেনি অথবা একজনের প্রচেষ্টায় নয়। সাম্প্রতিকতম মুদ্রণ পদ্ধতিগুলি আজকের গতিময় জগতের সঙ্গে যে ভাবে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে তাকে বুঝতে হলে অতীতের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে, মুদ্রণের আবিষ্কার ও অগ্রগতির মূলে যাঁদের দান সবচেয়ে বেশী তাঁরা কেবল কারিগর ছিলেন না, ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী। লিথোগ্রাফির ইতিহাস আলোচনা করে এই প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ছাপা আবিষ্কার করেছিলেন অস্ট্রিয়ার অধিবাসী আলয়জ সেনে-ফেল্ডার[১]। সেনেফেল্ডার বলেছেন, শৈশবে পাথরের উপর কালি দিয়ে লেখার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে, বোধহয় পাথরের উপর লিখে ছাপার সম্ভাবনা রয়েছে। সেনেফেল্ডারের পূর্বে কেউ এই পদ্ধতিতে ছাপার চেষ্টা করেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে তাঁরা শিল্পী-সুলভ প্রেরণায় আত্মপ্রকাশ করবার জন্য শিল্পের আঙিনাকে আরো বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। সেনেফেল্ডার নিজে ছিলেন নট ও নাট্যকার। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে তিনি নিজেই তাঁর রচনা ছেপে প্রকাশ করবার চেষ্টা বহুদিন ধরে করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল পাথরের উপর লেখা ছেপে। তিনিই আজকের লিথোগ্রাফির জনক। এই পদ্ধতির তিনি প্রভূত উন্নতি সাধন করে গেছেন। প্রামাণ্য ইতিহাসের নজির অনুসারে নিঃসন্দেহে বলা যায় স্বরলিপি মুদ্রণের জন্যই লিথোগ্রাফির সূচনা।

বিখ্যাত গীতিকার গ্লাইস্‌নার তাঁর কয়েকটি গান ছেপে দেবার জন্য যখন সেনেফেল্ডারকে অনুরোধ করেন তখন আর এক বিখ্যাত সুরকার এগিয়ে এসেছিলেন সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করতে। তার নাম কার্ল মারিয়া ফন ভেবার। ইনি হলেন জার্মান অপেরার রোমাণ্টিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সেনেফেল্ডারের ছাপাখানায় কাজ করার সময় ভুলবশতঃ কিছুটা নাইট্রিক এসিড পান করে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। অল্পের জন্য বেঁচে যান। তিনিও লিথোগ্রাফির বহু উন্নতি সাধন করে গেছেন।

ইউরোপের মুদ্রণশিল্পে বিখ্যাত মুদ্রণকুশলী শিল্পীদের তালিকায় রয়েছেন জার্মানীর এ্যাডল্‌ফ্‌ ফন মেন্‌ট্‌সেল, ফ্রান্সের অনরে দমিয়ের, ইনিয়াস ফাঁদালাতুর, স্পেনের গইয়া ও ব্রিটেনের

স্যামুয়েল প্রাউট। তুলুজ-লুত্রেক লিথোগ্রাফিক পদ্ধতিতে অসংখ্য নতুন নতুন ধরনের পোস্টার ছেপে গেছেন। তাদের মধ্যে মুদ্রণের ক্রমোন্নতির স্বাক্ষর দেখা যায়। এছাড়া খাদ্যতালিকা, অনুষ্ঠান-সূচী, বইয়ের জ্যাকেট প্রভৃতিও তিনি ছেপেছিলেন। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে লিথোগ্রাফির সাহায্যে কত সুন্দর মুদ্রণ সম্ভব। লুই রেমেকার, জোসেফ পেনেল, হেনরী বেন প্রমুখ শিল্পীদেরও লিথোগ্রাফির ক্ষেত্রে বহু দান রয়েছে।

এ পর্যন্ত মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে যেসব ইউরোপীয় শিল্পী জড়িত ছিলেন কেবল তাঁদের কথাই বলা হয়েছে। আমাদের দেশেও যাঁরা মুদ্রণশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা কেউ ঠিক ছাপাখানার কারিগর ছিলেন না। চার্লস উইলকিনস, উইলিয়াম কেরীর সহায়তায় পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর কর্মকার তাঁদের শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে মুদ্রণজগতে যা করে গেছেন তা সত্যিই অবিস্মরণীয়।

লিথোগ্রাফি প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মার কথা আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। অথচ এই মানুষটি নিজের আঁকা ছবি লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রণের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা সত্যিই অসাধারণ।

ভারতীয় মুদ্রণের প্রসঙ্গে আরেকজনের নামও বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর দানের কথা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি। যাঁদের শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি আছে তাঁরা অনেকে অন্যদের মধ্যেও সেই সৌন্দর্যবোধ সঞ্চারিত করতে পারেন। মুদ্রণের মাধ্যমে যাঁরা সৌন্দর্য বিস্তার করেছেন তাঁরাও শিল্পীর দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে পারতেন বলেই তাঁদের দান মুদ্রণশিল্পকে আরও সুন্দর করে তুলেছে।

ইতিহাসে সঠিকভাবে কোথাও লেখা নেই মানুষ কবে থেকে ছবি আঁকা শুরু করেছে। দা ভিঞ্চির সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর কোনও এক বিতর্কের সময় মাইকেল এঞ্জেলো বলেছিলেন, ছবির চেয়ে ভাস্কর্য পুরানো শিল্প। ভাস্কর্যের পরেই এসেছে ছবি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে অক্ষর সৃষ্টি হবার বহু পূর্বে মানুষ মূর্তি গড়েছে এবং তারপর ছবি এঁকেছে। আদিম-যুগে মানুষ যখন গুহায় বাস করত, তখনও তারা ছবি আঁকত।

ছবি থেকেই অক্ষরের জন্ম। মিশরের হায়ারোগ্লিফিক এক শ্রেণীর ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ছবি ক্রমে ক্রমে অক্ষরে রূপান্তরিত হয় এবং তার থেকেই প্রচলিত অক্ষর তৈরি হয়। তখন মানুষ কেবল লেখবার জন্য অক্ষর আবিষ্কার করেছে। মুদ্রিত বইয়ের কথা ভাবেনি। সেই সময় আজকের মত কাগজ, কালি ও কলম আবিষ্কৃত হয়নি। বড় বড় পাথরের গায়ে নবাবিষ্কৃত অক্ষর তখনকার দিনে খোদাই করা হত। পরে মানুষ বুঝতে পারে বড় পাথরের চেয়ে ছোট পাথরের গায়ে অক্ষর খোদাই করলে অনায়াসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

একটা পুরো বই লিপিবদ্ধ করার জন্য সেদিন শত শত ছোট পাথরের প্রয়োজন হত। বই বাঁধানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাথর খোদাই করে বিভিন্ন জিনিস লিপিবদ্ধ করার রেওয়াজ বহুদিন প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন যুগে যত রকম লেখবার সামগ্রী ছিল তার মধ্যে পার্চমেণ্টের জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ দলিল পার্চমেণ্ট কাগজে লেখা হয়। এর সবচেয়ে বড় কারণ এমন মজবুত কাগজ আর নেই। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে তালপাতা, ভূর্জপত্র ইত্যাদির উপর লেখার প্রথা ছিল। কিছুদিন আগেও ব্রহ্মদেশে ও ভারতবর্ষে নানা রকমের পাতার উপর পুঁথি লেখা হয়েছে। তবে একথা খুবই সত্য যে হাতের লেখার উন্নতি হয়েছে কাগজ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। মুদ্রণ প্রচলিত হবার পর যেসব কাগজ তৈরি হয়েছে আর আজকের যে কাগজ আমরা পেপার মিল থেকে পাই তার পার্থক্য অনেক। তখনকার দিনের কাগজ খুব মজবুত হলেও আজকের মত মসৃণতা এবং অন্যান্য বহু গুণ তার ছিল না।

ইতিহাস বলছে যে ইউরোপে মুদ্রণ আবিষ্কৃত হবার শত শত বছর আগেই চীনদেশে মুদ্রণ প্রচলিত ছিল। চীনাদেশের অধিবাসীরা প্রথম নানা রকমভাবে ব্লক তৈরি করে মুদ্রণ আরম্ভ করে এবং পরে চৈনিক মুদ্রকেরা আলগা হরফ বা টাইপ দিয়ে মুদ্রণকার্যও শুরু করেছিলেন।

গুটেনবার্গের আবির্ভাবের ফলে পাশ্চাত্যে সভ্যতার দিগন্ত অদ্ভুতভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। গুটেনবার্গ যে মুদ্রণযন্ত্র তৈরি করেন তাতে ছাপার কাজ সহজতর হয়েছিল এবং তাঁর আবিষ্কৃত আলগা হরফ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক স্থায়ী কীর্তির পরিচয় রেখে গেছে। গুটেনবার্গ দরিদ্র খৃষ্টানদের জন্য বাইবেল মুদ্রণ করেছিলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রণের মাধ্যমে ধর্মীয় চিন্তার বিকাশ ঘটানো।

ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছবি ছাপার প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু হয়। ছবি ছাপা শুরু হয় ব্লক দিয়ে। সেকালের হাতে এনগ্রেভ করা বহু ছবি শিল্প হিসাবে কালাতিক্রমণ

করেছে। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রণের সঙ্গে ফটোগ্রাফের সংযোগ সাধিত হবার আগে পর্যন্ত এনগ্রেভারেরা খুবই নিপুণভাবে ছাপা ছবির চাহিদা মিটিয়ে এসেছেন।

নিজেদের দেশের কথাই বলি। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে বঙ্গভূমিতে কাঠ খোদাই করে যাকে ইংরেজীতে বলে উডকাট এবং উড এনগ্রেভিং ব্লক তৈরির মাধ্যমে ছবি ছাপার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

১৬৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্যারিসে কাঠ খোদাই করে ব্লক যোগে বাংলা বই ছাপান হয়। বইটির লেখক কয়েকজন জেসুইট যাজক। বইটির বিষয়বস্তু ছিল ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, জলবায়ু ইত্যাদি। ১৭৭৬ সনে অর্থাৎ হুগলিতে ব্যাকরণ ছাপার দু'বছর আগে হলহেড সাহেব *A Code of Gentoo Laws* নামে একটি বই লন্ডনে ছাপান। বইটিতে দুটি ব্লক দিয়ে ছাপান হয় কিছু বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ। ১৭৭৭ সনে 'আইন-ই-আকবরী' লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইটি এবং 'এ্যান এসিয়াটিক ভোকাবিউলারি'র সবটুকুই প্লেট দিয়ে ছাপা হয়। প্লেট দিয়ে মুদ্রণের সময় লিপির চেহারার রকমফের হয় কারণ সব লিপিকারের হাতের লেখা একরকম নয়।

লন্ডনের পরেই হুগলি। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেডের পাণ্ডুলিপি আসে চার্লস উইলকিনস এবং পঞ্চানন কর্মকারের হাতে ছাপার জন্য। কথা হয় হস্তলিপির বদলে হরফে, কাঠ বা ধাতু-খোদাইএর বদলে ছাঁচে ঢালা বর্ণমালা দিয়ে ছাপা হবে। শেষ পর্যন্ত চলনশীল হরফ দিয়েই ব্যাকরণের বাংলা অংশগুলি ছাপা হয়।

পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা মনোহরের পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রি একজন দক্ষ কারিগর ও নিপুণ শিল্পী ছিলেন। মনোহর মারা যান ১২৫৩ সনে। তাঁর পর থেকেই কৃষ্ণচন্দ্র বাবার ছাপাখানাকে শুধু চালুই রাখেননি, তাকে অনেক বাড়ান। পঞ্জিকার ছবিগুলি তিনি নিজেই আঁকতেন এবং তার ব্লকও নিজের হাতে করতেন। তিনি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এক লোহার যন্ত্র তৈরি করেন। তা দিয়ে তিনি সমস্ত পুস্তকাদি ছাপতেন। এই সময় ব্লকের সাহায্যে শুধু বইই নয়, আরও বহুরকম জিনিস ছাপা আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এক সক্ সাহেবের নকশা ছাপা হয়। বাংলা অক্ষরে এই প্রকার নকশা ইতিপূর্বে আর ছাপা হয়নি। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের আর একটি অভূতপূর্ব খবর —'শুড়ার পাতুরিয়া ছাপাখানা'; এই ছাপাখানা স্থাপিত হয় নানাপ্রকার ছবি ছাপানর জন্য।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম সচিত্র বাংলা বই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করেন। বইটি ছাপা হয় ফেরিস কোম্পানীর ছাপাখানায়। এই বইটিতে ছয়টি চিত্র ছিল। 'অন্নদামঙ্গলে'র ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়। এ ছাড়া ইতিহাসে আরও কিছু সচিত্র বাংলা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা: 'গৌরীবিলাস' (১৮২৪), 'সঙ্গীততরঙ্গ', (১৮১৮), 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' (১৮২৪), 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮২৪), 'আনন্দলহরী', (১৮২৪) ইত্যাদি। শিল্পীরা সবাই স্বদেশী, শুধু বইয়ের জন্য ছবি আঁকা এবং খোদাই নয়, মুদ্রিত ছবিগুলি শিল্পের উপাদান হিসাবেও দর্শনীয়। মস্ত মস্ত কাঠে খোদাই করে ব্লক ছাপান হত। এতে রঙ করা হত হাতে। কালীঘাটের পটের মতোই এই ব্লক প্রিণ্ট আজও সমান উপভোগ্য। সে সময় আমাদের শিল্পীরা ব্লক নির্মাণে ও ছাপাতে এত উচ্চমানের পরিচয় দেন যে বিদেশীরা তাঁদের সঙ্গে করণকৌশল এবং ডিজাইনের লেনদেন করতেন।

প্রথম বাংলা সচিত্র সাময়িকপত্র বোধ হয় 'পশ্বাবলি'। 'পশ্বাবলি'র প্রথম প্রকাশ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রকাশ করেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। এর প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে জন্তুর বিবরণ এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই জন্তুর কাঠ খোদাই চিত্র থাকত। এই পত্রিকার লেখক, চিত্রকর ও মুদ্রাকর সবাই বিদেশী। কাঠ খোদাই চিত্রগুলি ছিল জন লসনের। তিনি কাঠ খোদাই কাজে সুপটু ছিলেন। বাঙ্গালীদের হাতে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫১ সনে। সেটি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। এই পত্রিকায় যে ছবিগুলো ছাপা হয়েছিল সে আজও দেখবার মতো। লিথো পদ্ধতিতে ছাপা উৎকৃষ্ট ছবি বাংলা দেশে দেখা যায় এর কিছু পরে। লিথো ছবি সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বিবরণে জানিয়েছেন (১৮৮৮), কলকাতায় একটা আর্ট স্টুডিও রাশি রাশি ছবি ছেপে বিক্রি করেছে। সে সব ছবি ইউরোপীয় শৈলীর নকল, শিল্পগত মান মোটেই উন্নত নয়। ছাপার পর ছবি রঙ করা হত হাতে। পরে অবশ্য ক্রমো-লিথোগ্রাফিক প্রথায় ছবি ছাপার কাজ আরম্ভ হয়। ১৮২৪ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কিছু লিথোগ্রাফিক প্রেসের হদিস মেলে। তার আগে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে শিল্পীদের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু উচ্চমানের ছবি লিথো পদ্ধতিতে ছাপা হয়। শিল্পীর নাম বেল্‌নস এবং দ্য স্যাভিগ্নাক। তাঁরা বার বার বিফল হওয়ার পর লিথো পদ্ধতিতে সার্থক ছবি ছাপতে সমর্থ হন, তাঁদের কাজের নমুনা বিলিতি শিল্পীদের কাজের চেয়ে খারাপ ছিল না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জুসিংটনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (দি হিসট্রি, ডিজাইন, অ্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট অব রিলিজিয়ান ইত্যাদি) ছবিগুলো ছাপা হয়েছিল লিথো পদ্ধতিতে গভর্নমেণ্ট লিথোগ্রাফিক প্রেসে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে 'এসিয়াটিক রিসার্চেস্'-এর জন্য

ছবি ছেপেছিলেন এসিয়াটিক লিথোগ্রাফিক প্রেস। এ ছাড়া আরও কিছু লিথোগ্রাফিক প্রেসের নাম শোনা যায়, যথা: টি. বি. টাসিন কোং, কমার্শিয়াল লিথোগ্রাফিক প্রেস, কালিন্স লিথো, ওরিয়েন্টাল লিথোগ্রাফিক কোং ইত্যাদি। ছবির পরে মানচিত্র, নকশা ছাপারও চলন শুরু হয়। ফলে ধীরে ধীরে বহু চিত্রশিল্পী, ব্লক নির্মাতা মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কেউ আবার একই সঙ্গে চিত্রকর এবং খোদাইশিল্পী দুই-ই। ১৮৫৪ সনে 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী-সভা' একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিদ্যালয়ে কাঠখোদাই ছিল অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অন্তত তিরিশজন শিক্ষার্থী সেখানে কাঠখোদাই শিখেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজের নমুনা বহু বইতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়টিতে বাইরে থেকে কাজ যোগাড় হত। ছাত্ররাই ছাপার কাজ করতেন। যোগেশচন্দ্র বাগল তাদের মধ্যে বিশেষ করে ডি. এল. রিচার্ডসনের 'অন ফ্লাওয়ারস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার গার্ডেনস্' এবং 'ঈসপ্‌স্ ফেবলসে'র নাম উল্লেখ করেছেন। 'এ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িষা' (১ম খণ্ড) বইটিকে চিত্রিত করেছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এই বিদ্যালয়ের কিছু ভূতপূর্ব ছাত্র কাঠ খোদাইকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন গোপালচন্দ্র কর্মকার। তাঁর হাতের কাজ যে কোন ইউরোপীয় শিল্পীর কাজের সঙ্গে তুলনা করা যেত। কাঠ খোদাইএর সঙ্গে কপার প্লেটের ব্লকের প্রচলন ছিল। আরও পরদর্শী ছাত্রের কথা জানা যায়। 'অন্নদামঙ্গল' বইটিতে কাঠ ও ধাতু খোদাই করা দুরকমই ছবি আছে। লসন্ বাংলা বইতে ধাতুনির্মিত ব্লক ব্যবহার করতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে প্রকাশিত সচিত্র 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক বইটির মুদ্রণ সত্যিই দেখবার মতো। এর চিত্রকর এবং ব্লক নির্মাতা দুজনের দক্ষতাই প্রশংসনীয়।

কাঠখোদাই ও কপার প্লেট খোদাই করে ব্লকের মাধ্যমে ছাপা সর্বত্র উচ্চমানের হত না। এই সব পদ্ধতিতে খুব বেশী সময় লাগত এবং সব সময় ছাপা একরকম হত না। সময়ও প্রচুর লাগত। উড্‌কাট্ এবং উড্‌এনগ্রেভিং, কপার প্লেট, লিথো পদ্ধতিতে সব ছবির সর্বপ্রকার বিবরণ বিকশিত হত না বলে মানুষ নানা রকম পরীক্ষা ও গবেষণা করে প্রথমে হাফটোন ব্লক পরে ফটোলিথো ও ফটোগ্রাভিওর পদ্ধতিতে ছবি তৈরির প্রণালী আবিষ্কার করেন। হাফটোন ব্লকের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর নাম।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিখ্যাত মুদ্রক ছিলেন। মুদ্রণের (লাইন ও হাফটোন) জগতে তাঁর দান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করেছে।

সেকালে আমাদের দেশে ছবি ছাপা হত কাঠের ওপর খোদাই করা ব্লক দিয়ে। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'ছোটদের রামায়ণ' বইটির ছবি ছাপাতে এই পদ্ধতিতে ব্লক মুদ্রণের ব্যবস্থাটি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। সুতরাং নিজেই ব্লকমুদ্রণের উন্নতি সাধনের জন্য গবেষণা শুরু করেছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় অনেক পড়াশুনা করে জানতে পেরেছিলেন যে তামা ও দস্তার (জিঙ্ক) পাতে খোদাই করে ছাপলে অনেক সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছবি হয়। পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকাল ধরে তিনি অন্ধকার ঘরে বসে ছবি তোলা এবং ছবি ছাপা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছাপার কাজ ও ব্লক মেকিং সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। হাফটোন ব্লক মুদ্রণের যে সূত্র তিনি আবিষ্কার করলেন তা ভবিষ্যৎ অগ্রগতির দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত করে দিল। তাঁর নকশা অনুযায়ী হাফটোন স্ক্রিন তৈরি করার কোন উপায় এ দেশে ছিল না। তিনি এই নকশা বিলেতে পাঠিয়ে একটি স্ক্রিন তৈরি করার ফরমায়েস দিয়েছিলেন। যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তিনি কাজটি করতে চাইলেন না। অন্য এক ভদ্রলোক এই রীতিতেই স্ক্রিন তৈরি করে নিজের নামে তার পেটেন্ট করিয়ে নেন। এই সব কথা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পেনরোজ এ্যানুয়েলের' একাদশ সংখ্যায়। উপেন্দ্রকিশোরের আঁকা ছবি হাফটোনে ছাপা হয় 'সেকালের কথা' বইটিতে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সনে। ছাপা হয় ভারত মিহির ছাপাখানায়। এই বইটিতে ১৭খানি বড় বড় ছবি আছে। এদের একটিও ইংরেজী পুস্তকের ছবির নকল নয়, এ ছাড়া তাঁর 'সন্দেশ' পত্রিকার ছবিগুলোর ব্লকও তিনি নিজে করে ছাপতেন। বাঙালী মুদ্রাকর সেদিন সত্যই অবিশ্বাস্য উদ্ভাবক। তিনি শুধু বই লিখে নিজে ছেপে বের করতেন তা নয়, নানান পত্রিকায় বহু বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। বিলাতে বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ফোটোগ্রাফি, ছাপার কাজ ও নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড়া তিনি দেশের বহু পত্রপত্রিকায়ও লিখতেন। সেগুলো পড়লে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ফটো মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে ব্লক তৈরি করে আমরা লেটার প্রেসের মাধ্যমে ছাপি। লেটার প্রেসের ছাপা ডাইরেক্ট (অর্থাৎ সরাসরি ধাতু থেকে কাগজে) হওয়ায় খুব উঁচুমানের মোলায়েম কাগজ হাফটোন ছাপার সময় ব্যবহার করতে হয়। ছাপা খুব উঁচুমানের হয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে উঁচু মানের কাগজ ব্যবহারে খরচ খুব বেশী পড়ে যায়। এ ছাড়া ব্লক তৈরির সময় খুব বেশী মাত্রায় (vigorous) এচিং হওয়ার এবং ছাপার জন্য প্রত্যক্ষভাবে চাপ সৃষ্টির জন্য ছবির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বিবরণগুলি পাওয়া যায় না। ফটো লিথো পদ্ধতি এর উল্টো, ছাপা হয় পরোক্ষভাবে সৃষ্ট চাপের মাধ্যমে এবং এচিং খুব হালকাভাবে করা হয়ে থাকে। তাই অতি সস্তার কাগজে খুব ভাল করে ছবির বিভিন্ন অংশের রঙের গভীরতর বিবরণকে ফুটিয়ে তোলা যায়।

ছাপার নতুন নতুন পদ্ধতি বহুদিনের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। এক একটি নতুন পদ্ধতি সস্তায় ছাপা সম্ভব হচ্ছে। এতে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়েছে নতুন যুগের সূচনা। সার্থক হয়েছে। মুদ্রণের প্রসারের ফলে বহু জিনিস যথা সচিত্র বই, সচিত্র পত্রিকা উচ্চমানে এবং সস্তায় ছাপা সম্ভব হচ্ছে। এতে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়েছে নতুন যুগের সূচনা। ফটোগ্রাফ অথবা শিল্পীর আঁকা ছবির ব্লক তৈরি করে সাধারণ কাগজের উপর সেগুলো মুদ্রণ করার পন্থা বের করতে না পারলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে বড় রকমের একটি ফাঁক থেকে যেত। আজকের পাঠকরা সংবাদের মাধ্যমে নিত্য নতুন খবর পাওয়ার জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করেন এবং তাঁরা এও চান যে যতটা সম্ভব চিত্রের মাধ্যমে সেইসব সংবাদ পরিবেশন করা হোক। তাই আজকের দিনে দেখা যায় সচিত্র সাময়িক পত্রিকার এত জনপ্রিয়তা।

এবার চিত্র মুদ্রণের সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা করা যাক।

২

প্রধানতঃ যে তিন প্রকার পদ্ধতিতে ছবি ছাপা হয় লেটার প্রেস পদ্ধতি তার মধ্যে একটি। লেটার প্রেসে মুদ্রণীয় এলাকাটি সব চেয়ে উঁচু বলে তাকে ইংরেজীতে Relief Printing Process বলে। টাইপ দিয়ে আমরা অক্ষর ছাপি। কিন্তু কোন ছবি এক রঙের হোক অথবা বহু রঙেরই হোক তা ছাপতে গেলে ব্লকের প্রয়োজন হয়। সেই ব্লক কপি অনুযায়ী টাইপের সঙ্গে স্থাপন করে অথবা আলাদা করে লেটার প্রেস যন্ত্রে (Machine)এর সাহায্যে ছাপতে হয়। ব্লক দুই রকমের—লাইন ও হাফটোন। লাইন ছবিতে কালির বর্ণের বিভিন্ন প্রকার আঁচ অথবা আমেজ ভালভাবে ফোটানো যায় না। হাফটোন ছবিতে কিন্তু কেবলমাত্র কালো রঙে ছাপা চিত্রেও কাগজের সাদা এবং কালির কালোর সঙ্গে, সাদা এবং কালোর মাঝামাঝি রঙের নানা প্রকার আমেজ চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করা যায়। অর্থাৎ গভীর কৃষ্ণবর্ণ থেকে পুরোপুরি সাদা রঙের মাঝে ঘোর ধূসর রঙের আঁচ বা আমেজ থেকে হাল্কা ধূসর রঙকেও সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তোলাই হাফটোন ব্লকের কাজ।

লাইন অথবা হাফটোন ব্লক প্রসেস ক্যামেরা দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রসেস ক্যামেরার সঙ্গে সাধারণ ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার কোন পার্থক্য নেই। তবে প্রসেস ক্যামেরায় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে কৃত্রিম আলোর সাহায্যে নিশ্চল পদার্থের ছবি তোলা হয়। এখন বহু বর্ণের হাফটোন ব্লক কিভাবে তৈরি হয় তার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলছি।

যে জিনিস ছাপা হবে প্রথমেই তার একটা নমুনার (copy) দরকার হয়। সাধারণতঃ colour transparency অথবা আঁকা কিম্বা ক্যামেরায় তোলা কাগজের উপর ছাপা রঙিন চিত্র থেকে প্রসেস ক্যামেরার সাহায্যে নেগেটিভ তৈরি হয়। Colour transparency জিনিসটি ফটোগ্রাফিক কাগজের পরিবর্তে ফিল্মের উপর ছাপা একটি রঙিন ছবি। লেন্সের মধ্য দিয়ে তার উপর কৃত্রিম আলো ফেলে সে ছবি সিনেমার স্লাইডের মত সাদা পর্দায় প্রক্ষেপ করা হয়।

রঙিন ছবি ছাপার জন্য প্রতিটি মূল রঙের একটি আলাদা নেগেটিভ দরকার। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাঁচের ফোটোগ্রাফিক্ প্লেট অথবা ফিল্মের উপর এই নেগেটিভ তৈরি করা হয়। প্রকৃতির তিনটি মূল রঙ হল—সবুজ (green), বেগুনী (Blue-violet) এবং কমলা (Orange-red) আবার এই রঙগুলির সংমিশ্রণে নানা রঙের সৃষ্টি হয়। সবুজ এবং বেগুনী মিশে হয় সবুজ-নীল (cyan), সবুজ এবং কমলা মিশে হয় হলুদ (yellow) রঙ এবং বেগুনী ও কমলার সংমিশ্রণে পাওয়া যায় নীলাভ লাল (Magenta)। এইগুলিই আমরা আকাশের রামধনুতে দেখি। এ হল প্রকৃতির আলোর মধ্যস্থিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আচরণের কথা।

কিন্তু মুদ্রণের সময় ছাপাখানায় ব্যবহৃত রঙিন পদার্থের মিশ্রণে যে ফলাফল আমরা পাই তা ঠিক এক রকম নয়। মুদ্রণ-শাস্ত্রে এ নিয়ে Additive এবং Subtractive theory-র বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে শুধু এটুকু বলছি যে, রঙিন পদার্থের অর্থাৎ ছাপাখানার নানা রঙের কালির আচরণের ধরনটা একটু আলাদা—সেখানে হলদে হল বেগুনীর আমেজবিহীন, নীলাভ-লাল সবুজ বিহীন এবং সবুজ-নীল কমলা বিহীন। ঠিক এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের নেগেটিভ তৈরি করতে তার বিপরীতধর্মী রঙের ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে। যেমন হলদে রঙের নেগেটিভের জন্য বেগুনী ফিল্টার, কমলার জন্য সবুজ ফিল্টার এবং সবুজ-নীলের জন্য কমলা ফিল্টার ব্যবহার করতেই হবে।

এইভাবে প্রতিটি রঙের নেগেটিভ তৈরি করার পর দেখা যায় যে, যেরকম ফল পাওয়া উচিত

ছিল তা ঠিক পাওয়া যায়নি। আমরা নীলাভ-লাল (Magenta) নেগেটিভে এই দোষটি বেশী করে দেখি তবে হলুদ রঙের নেগেটিভেও কিছু দোষ থাকে, তার কারণ যে রঙগুলির কথা আগে বলা হয়েছে তাদের আলো প্রতিফলন (reflection) ও আত্মসাৎ (absorption) করার শক্তি বাঞ্ছিত মাত্রায় থাকে না। সেইজন্যই সেগুলিকে নিখুঁত করতে হলে নেগেটিভগুলোকে সংশোধন করতে হবে। একে ইংরেজীতে colour correction বলা হয়। ফটোগ্রাফির সাহায্যে ও যে উপায়ে এই সংশোধন করা হয় তাকে Masking method বলে। কারণ এই কাজে একটি রঙের নেগেটিভ কিংবা পজিটিভ আর একটি রঙের নেগেটিভ কিংবা পজিটিভের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে একটি রঙের নেগেটিভের অন্তর্গত অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি আরেকটি রঙের নেগেটিভ এসে বন্ধ করে দেয়। এখন নানা উপায়ে মাস্কিং করা হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আজ electronic-এর যুগে electronic machine-ও বেরিয়েছে যার দ্বারা আমরা রঙিন কাজের জন্য সংশোধিত নেগেটিভের একটি সম্পূর্ণ সেতো যান্ত্রিক উপায়ে পাচ্ছি। ফিলটারের ব্যবহার সম্বন্ধে আগে দুই-এক কথা লিখেছি। এই ফিলটারগুলি রঙিন কাচের টুকরো অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত কাচের মতো পদার্থ যা ছবি তোলার সময় পদার্থ বিদ্যার নিয়মানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মূল রঙকে ছেঁকে আলাদা করে নেয়।

রঙিন ছবি মুদ্রণের জন্য নেগেটিভ তৈরি করতে গিয়ে হাফটোন স্ক্রিনকে বিভিন্ন মূল রঙের জন্য ক্যামেরার ভিতর বিভিন্ন জ্যামিতিক কোণে স্থাপন করতে হয়—যেমন হলুদের জন্য ১৫ ডিগ্রি, সবুজ-নীলে (cyan)র জন্য ১৫ ডিগ্রি, নীলাভ লাল (magenta) ৪৫ ডিগ্রি এবং কালোর জন্য ১০৫ ডিগ্রি।

নেগেটিভে মূল ছবির সাদা জায়গা কালো ওঠে ও কালো জায়গা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। নেগেটিভ তৈরি হবার পর ব্লক করার জন্য তামা অথবা দস্তার পাতের প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় একটি পাতের ওপর শিরিষ, এ্যামোনিয়াম বাইক্রোমেট, ডিমের সাদা অংশ প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরি করা এক রকম আঠাল জিনিস লাগিয়ে শুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার ঘরে একটি কাচ লাগানো ফ্রেমের মধ্যে নেগেটিভের পিছনে তামা বা দস্তার ফলকটিকে লাগিয়ে নানা প্রকার কৃত্রিম আলোর সাহায্যে ছবিটিকে ছেপে নেওয়া হয়। পরে সেই পাতটিকে ফ্রেম থেকে বার করে এ্যাসিড দিয়ে ক্ষয় করিয়ে ধাতুর পাতটির অনাবশ্যক বা অমুদ্রণীয় অংশটিকে নিচু করা হয়। ছবির মুদ্রণীয় অংশ উঁচুই থেকে যায়। পরে ফলকটিকে ছেঁটে ঠিক করে কাঠের টুকরোর উপর লাগিয়ে ছাপার হরফের সমান উঁচু করা হয়। ব্লকগুলি তৈরি হবার পর লেটার প্রেস যন্ত্রে ছাপা হয়।

৩

মুদ্রণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেগুলি সর্বাধিক প্রচলিত, ফটো-লিথো তাদের অন্যতম। পোস্টার, ক্যালেন্ডার, বিভিন্ন সচিত্র পুস্তিকা, কার্টুন, কার্ড এবং উচ্চমানের প্রায় সর্বপ্রকার বই এই পদ্ধতিতে ছাপা হয়। এই পদ্ধতিতে এচিং খুব হালকা ভাবে করা হয় এবং ছাপা হয় পরোক্ষভাবে সুষ্ট চাপের মাধ্যমে, তাই এখানে খুব সূক্ষ্ম স্ক্রিন ব্যবহার করে মুদ্রণীয় চিত্রের সর্বপ্রকার বিবরণকে সস্তার কাগজে সামগ্রিকভাবে ফুটিয়ে তুলে সুচারু মুদ্রণকে সম্ভব করে তোলা যায়।

ফটোগ্রাফির দিকটি অনেকটা ফটো এনগ্রেভিং-এর মত। দুই প্রকার প্লেট তৈরির প্রণালী আছে ফটোলিথো পদ্ধতিতে—যথা সারফেস এবং ডিপ্-এচ পদ্ধতি। সারফেসের জন্য শুধু স্ক্রিন নেগেটিভ করা হয় এবং ডিপ্-এচের জন্য প্রথমে নেগেটিভ করে তার থেকে পজিটিভ তৈরি হয়। সারফেস প্লেটগুলিতে মুদ্রণীয় এবং অমুদ্রণীয় এলাকা একই সমতলে থাকে আর ডিপ-এচে মুদ্রণীয় এলাকা থাকে কিছুটা নিচু। কপি অনুযায়ী প্রথমে continuous tone negative এবং পরে ক্যামেরা অথবা contact পদ্ধতির সাহায্যে স্ক্রিন পজিটিভ করা হয় অথবা প্রথমে স্ক্রিন নেগেটিভ করে পরে ক্যামেরা অথবা contact পদ্ধতির সাহায্যে পজিটিভ করা হয়। Continuous tone negative বলতে আমরা বুঝি ক্যামেরায় স্ক্রিন না লাগিয়ে সরাসরি তৈরি করা নেগেটিভ। সেই নেগেটিভ থেকে হাফটোন স্ক্রিনের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রিত পজিটিভ-টিই হল contact screen positive. এই পদ্ধতির সুবিধা হল এতে ছবির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অনেক বেশী মাত্রায় উদ্ঘাটিত করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এই স্ক্রিন পজিটিভ ক্যামেরার সাহায্যেও তৈরি করা যেতে পারে। স্ক্রিন এবং ফিলটারের ব্যবহার প্রয়োজন ফটো এনগ্রেভিং-এর মতোই। এ ক্ষেত্রেও ছবি ছাপার জন্য একটি নমুনার দরকার হয়। নমুনাটি হয় Colour Transparency অথবা আঁকা কিংবা ক্যামেরায় তোলা কাগজের উপর ছাপা রঙিন চিত্র।

ছবি ছাপার জন্য সংশোধন করা (corrected) নেগেটিভস এবং পজিটিভসের সেট প্লেট মেকিং শাখায় চলে যায়।

প্লেট মেকিং-এর আগে দস্তা অথবা এ্যালুমিনিয়াম প্লেটের Graining প্রয়োজন। কেন এমন করতে হয় তা জানতে হলে লিথোপদ্ধতির সূচনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে হবে। লিথো

মুদ্রণের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমিত। আদি যুগে যে পাথরের উপর মুদ্রণীয় নকশা তৈরি করা হত তার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। পাথরের উপর এক শ্রেণীর কালি দিয়ে কোন কিছু এ'কে নিলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার পাথরের উপর একটি নতুন যৌগিক পদার্থ তৈরি হত। তৈলাক্ত কালির 'স্টিয়ারিক' অথবা 'ওলিয়িক' এ্যাসিড লিথো স্টোন অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংস্পর্শে এসে ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট অথবা ক্যালসিয়াম ওলিয়েট প্রস্তুত করত। এর ধর্মই হল চট্‌চটে কালিকে আকর্ষণ করা এবং জলকে সরিয়ে দেওয়া। এমনি করে প্লেটের মুদ্রণীয় অংশ সৃষ্ট হত। অমুদ্রণীয় অংশ তৈরি করার জন্য আরেকটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। কারণ সেই অংশ কালি ধরলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। গাম এ্যারাবিক দিয়ে অমুদ্রণীয় অংশ অনায়াসে তৈরি করা যায়। ব্যাপারটি এইরকম। ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে আরবী আঠার মিশ্রণ হলে যে যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হয় তার নাম ক্যালসিয়াম এ্যারাবিনেট, যা সর্বদাই জলকে আকর্ষণ করে এবং তৈলাক্ত পদার্থকে বিকর্ষণ করে। এমনি করে একটি পাথরের একটি সমতলে দুটি যৌগিক পদার্থ সৃষ্টির ফলশ্রুতি হল লিথো মুদ্রণ। যাতে জল এবং কালির প্রলেপ মুদ্রণীয় পাথরের গায়ে একই সঙ্গে লাগিয়ে যেতে হয়। কালি মুদ্রণীয় এলাকার জন্য আর জল অমুদ্রণীয় এলাকাতে। একই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজ দস্তা এবং এ্যালুমিনিয়ামের চাদর দিয়ে মুদ্রণ সম্ভব হচ্ছে। লিথো পাথরের গায়ে নিজস্ব স্বাভাবিক ছিদ্র আছে যা অমুদ্রণীয় এলাকার জল ধরে রেখে দেয়। ধাতব চাদরের নিজস্ব ছিদ্র নেই বলে কৃত্রিম উপায়ে সেই ছিদ্র প্রস্তুত করতে হয়। একে বলে গ্রেনিং। গ্রেনিং-এর পদ্ধতিতে লিথোপ্রণালী অনুযায়ী প্লেটগুলোতে কালি ও জল ধরার ক্ষমতা করিয়ে নেওয়া হয়। গ্রেনিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেমন (১) Sand blasting, (২) Chemical, (৩) Electrolysis ও (৪) Rotary tub. এদের মধ্যে রোটারি টাব পদ্ধতির চলন সবচেয়ে বেশী। এই প্রথায় গ্রেনিং করার সময় এ্যাবরেসিভ, মারবেল, জল এবং একটি ঘূর্ণমান গ্রেনিং যন্ত্রের দরকার হয়। সূক্ষ্ম গ্রেইন করার সময় ছোট আকারের মারবেল এবং সূক্ষ্ম এ্যাবরেসিভ ধাতব চাদরের উপর রেখে যান্ত্রিক উপায়ে চাদরটিকে নাড়াচাড়া করলে অসংখ্য ছিদ্র তৈরি হয়। মোটা গ্রেইনের জন্য বড় আকারের মারবেল এবং মোটা এ্যাবরেসিভ দিয়ে এ কাজটি চলে। সব প্রকার গ্রেইনের জন্য যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন।

আগেই বলেছি প্লেট মেকিং দুই পদ্ধতিতে হয়। এক পদ্ধতির নাম সারফেস পদ্ধতি এবং আর একটির নাম ডিপ্‌-এচ। নেগেটিভ সারফেস পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়, পজিটিভ হয় ডিপ্‌-এচের জন্য। ভাল ছাপার প্রয়োজনে ডিপ্‌-এচের প্রচলন সবচেয়ে বেশী। গত কয়েক বছর ধরে প্লেট মেকিং-এ বাই এবং ট্রাই মেটাল প্লেট মেকিং পদ্ধতি চালু হয়েছে। এটি খুব উন্নত ধরনের প্রসেস। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এর চলন খুব বেশী। আমাদের দেশেও এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু ছাপাখানা কাজ করছে। বাই মেটাল দুটি ভিন্ন ধর্মী (একটি জলকে আকর্ষণ করবে ও অন্যটি কালিকে আকর্ষণ করবে) ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত।

প্লেট তৈরি হবার পর শিট-ফেড অফ্‌সেট অথবা ওয়েব-ফেড অফ্‌সেট মেসিনের সাহায্যে ছাপা হয়। মেসিন অনুযায়ী একটি রঙ একবারে অথবা বহু রঙ একসঙ্গে ছাপা যায়। শিট-ফেড মেসিনে একটি করে কাগজ একবার ছাপার জন্য যায়। ওয়েব মেসিনে রিলের মাধ্যমে কাগজ ছাপা হয় এবং খুব সস্তার কাগজ এই মেসিনে ছাপা সম্ভব। পাশ্চাত্যের লোকপ্রিয় সংবাদপত্রগুলির জন্য এই যন্ত্রগুলির প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

৪

ফটোলিথোর পর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফটোগ্রাভিওরের স্থান সর্বাগ্রে। এই পদ্ধতিতে কাগজ ছাড়া এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, সেলফেন পেপারের ওপরও ছাপার আয়োজন করা যায়। কোন কিছু খুব বেশী সংখ্যায় ছাপতে হলে তা গ্রাভিওরে ছাপা লাভজনক। মুদ্রণশিল্পে ফটোগ্রাভিওরের জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ প্যাকেজিং শিল্পের পক্ষে এই প্রণালী আদর্শনীয়। ওষুধের মোড়ক, নানাবিধ বিস্কুট, চকোলেট, মাখন বা পনিরের মোড়ক, দুধের বোতলের ঢাকা, বোতলের নানাবিধ দ্রব্যের লেবেল, ব্লেডের মোড়ক ইত্যাদি ছাপার জন্য এই পদ্ধতি এখন বহুল প্রচলিত কারণ অতি সস্তার কাগজেও সুন্দরভাবে ছাপার কোন অসুবিধা নেই।

ফটোগ্রাভিওর ও ফটোলিথোগ্রাফির ফটোগ্রাফির দিকটা মূলতঃ একরকম। তবে বহুল প্রচলিত দ্রুপদী (conventional) গ্রাভিওরে ক্যামেরার কাজে স্ক্রিন ব্যবহার করা হয় না। এখানেও রঙিন ছবি ছাপার জন্য প্রতিটি মূল রঙের একটি আলাদা নেগেটিভ দরকার। ক্যামেরার মাধ্যমে ফিলটারের সাহায্যেই তা তৈরি হয়। এই নেগেটিভগুলি স্বভাবতই continuous tone negatives. Continuous tone negativeগুলি থেকে ক্যামেরা অথবা Contact পদ্ধতির সাহায্যে পজিটিভ প্রস্তুত করা হয়। এই পজিটিভগুলিকে continuous tone Screen positive বলা হয়। গ্রাভিওরের ক্ষেত্রেও মাসকিং পদ্ধতিতে নেগেটিভের রঙকে সংশোধন করে।

ফটোগ্রাফির কাজ শেষ হবার পর রঙিন ছবি ছাপার পজিটিভগুলি বেলনাকার তামার পাতের উপর ফুটিয়ে তোলা হয়। অফ্‌সেট ও গ্রাভিওরে এখানেই মূল পার্থক্য। অফসেটের ছবিগুলি দস্তা অথবা এ্যালুমিনিয়াম প্লেটের মাধ্যমে এবং গ্রাভিওরের ছবিগুলি তামার বেলনাকার পাতের মাধ্যমে ছাপা হয়।

ফটোলিথোগ্রাফিতে স্ক্রিন ব্যবহার করা হয় সমস্ত ছবিটির টোনেন (gradation) বিভিন্ন আকারের মুদ্রিত বিন্দুতে (dot) ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। ছবির সবচেয়ে কালো অংশ থেকে সর্বাধিক সাদা অংশ এইভাবে নানা আকারের মুদ্রিত বিন্দুর সমষ্টি। এই বিন্দুর আকৃতির উপর কালির ঘনত্ব নির্ভর করে। কিন্তু গ্রাভিওরের বেলনাকার তামার পাতের যে স্ক্রিন ব্যবহার করা হয় তা বেলনাকার তামার পাতের ওপর কালির নানাপ্রকার গভীরতার কয়েকটি সেল গড়ে তোলে। সেলগুলি কালি ধারণ করে তাদের নিজস্ব গভীরতা অনুযায়ী এবং সেলের গভীরতার তারতম্যের উপরই কালির আঁচ বা আমেজ নির্ভর করে।

এক একটি পজিটিভ এক একটি তামার বেলনাকার পাতের গায়ে ছেপে নেওয়া হয়। প্রথমে বেলনাকার তামার পাতের ওপর থেকে তৈলাক্ত ভাবটিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর জিলেটিন মাখানো কাগজ (carbon tissue paper)-কে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দিয়ে আলোকের সংস্পর্শে প্রতিক্রিয়াশীল করে নেওয়া হয়। টিস্যু কাগজটি শুকিয়ে গেলে প্রথমে তাকে গ্রাভিওর স্ক্রিনে রেখে আলোর সামনে খুলে দেওয়া হয় (expose)। পরে টিস্যু কাগজে এর উপর পজিটিভ ফেলে আলো লাগান হয়। তারপর আলো লাগা টিস্যুর জিলেটিন সমতল (surface) ঐ তামার বেলনাকারে ছেপে নেওয়া হয়। এবপর ছবিটি ডেভেলাপ করা হয়। সেলগুলো চার দেওয়াল এ্যাসিড প্রতিরোধকের কাজ করে এবং মাঝের অংশ ক্ষয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক শক্তিতে তৈরি করা ফেরিক্‌ ক্লোরাইড দিয়ে ক্ষয় কার্য সম্ভব। প্রায় ১২ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ক্ষয়-কার্য সম্পূর্ণ হয়। এরপর জল দিয়ে বেলনাকার তামার পাতটিকে পরিষ্কার করা হয় এবং তার উপরের সমতলকে ব্রাসো দিয়ে পালিস করা হয়। পরিশেষে বেলনাকার তামার পাতটি গ্রাভিওর যন্ত্রে ছবি ছাপার জন্য তোলা হয়।

বাংলার তথা ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনীতিক পটভূমিকায় ইউরোপ অথবা আমেরিকায় সম্প্রতি মুদ্রণের যে সব প্রয়োগিক প্রকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলির কথা কল্পনা করতেও আমরা পারি না। বলা বাহুল্য আমরা কেবলমাত্র মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। অন্যান্য নানা ব্যাপারেও পিছিয়ে আছি। কিন্তু এ অবস্থা যে চিরদিন থাকতে পারে না এই কথাটি অনায়াসেই মেনে নেওয়া যায়। আমদের দেশে মুদ্রণশিল্প পিছিয়ে থাকার মূল কারণ হল আমরা মুদ্রণের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকি। এই আমদানী স্বাভাবিক উপায়ে বন্ধ করে যেদিন আমাদের প্রয়োজন মত জিনিস তৈরি করে নিতে আমরা পারব তখন থেকেই আমাদের মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। একথা খুব জোরের সঙ্গে বলছি এই কারণে যে ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রদায় বিশেষ কুশলী। কলকাতার পাশে হাওড়াতেই বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার তার লেদ্‌ মেশিনকে সম্বল করে যে সব অঘটন ঘটাচ্ছে তার খবর সকলে রাখেন না। এঁরা অথবা পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন কোন অংশে ভারতীয় যন্ত্রবিশেষজ্ঞরা ছোট করে যে-সব কাজ করেছে, বৃহদাকারে সেগুলি শুরু হলে দেশের যান্ত্রিক সাধনা অন্য রূপ পরিগ্রহ করবে।

ত্রিশ বছরের স্বাধীনতা এদেশের সমস্ত মানুষের নিরক্ষরতা দূর করতে পারেনি। তার কার্য-কারণ বিষয়ক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের এক্তিয়ারের বাইরে। তবে এ-কথাও সত্যি যে এই অবস্থার উন্নতি অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে মুদ্রিত সামগ্রীর চাহিদা বহুল পরিমাণে বেড়ে যাবে। তার জন্য আরও অনেক বেশী ছাপাখানার প্রয়োজন হবে। আর দ্রুত গতিতে কাজ চালাতে হলে কেবল প্রাচীন লেটার প্রেস মুদ্রণ পদ্ধতিকে পাথেয় করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। তখন লিথোগ্রাফি এবং ফোটোগ্রাভিওর সহজেই লোকপ্রিয় হয়ে উঠবে। এই গরীব দেশে যদি গাড়ি, জাহাজ এবং এরোপ্লেন তৈরি হতে পারে তবে মুদ্রণ-যন্ত্র, ক্যামেরা এবং মুদ্রণের অন্যান্য উপকরণই বা কেন তৈরি করা যাবে না।

পরিশেষে ভারতীয়দের মনন এবং চিত্তবৃত্তির সম্পর্কে দু-এক কথা বলে আমার কথা শেষ করছি। আত্মপ্রশংসা যদিও কুরুচির পরিচায়ক—আত্মসচেতনতা বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্পদ। ভারতীয় কারিগরের শিল্পীসুলভ মন আছে, কল্পনা শক্তি আছে এবং আছে অসাধারণ সৌন্দর্য-বোধ। যান্ত্রিক সাধনার মেধার অভাবে সে পিছিয়ে নেই। অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কারণে এদেশের মানুষ আজও তার নির্মাণ করার প্রতিভাকে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি। আজ হোক বা কাল হোক এ অবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তখন থেকে মুদ্রণের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রগুলির মধ্যে আমাদের দেশের নামও লিখিত থাকবে।

কাগজ ও কালি

অতুল সুর

মাত্র হরফ আর ছাপাবার যন্ত্র হলেই বই ছাপা হয় না। বই ছাপবার আরও উপকরণ আছে। যথা, কাগজ ও কালি। কালির কথা পরে বলব। কাগজের কথা নিয়েই শুরু করি। আমাদের দেশে কাগজ শব্দটা খুব পুরানো শব্দ নয়। একখানা অর্বাচীন তন্ত্রগ্রন্থেই এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] 'কাগজ' শব্দটা হচ্ছে ফারসী শব্দ। মনে হয় মোগল যুগেই শব্দটা এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। পারস্য দেশে একে 'কাগজ'ই বলা হয়। আরবরা বলে 'কর্তাস'। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'পেপার'। ফ্রান্স ও জার্মানীর লোকেরা বলে 'পেপিয়ার'। শব্দটা ল্যাটিন ভাষার 'প্যাপিরাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রীকরা বলত 'প্যাপুরস'।[২] শব্দটা আসলে মিশর দেশের। মিশরের লোকেরা এক রকম নলখাগড়ার ওপর লেখার কাজ করত। তাকে 'প্যাপিরাস' বলা হত।[৩] প্রাণীজ ত্বকের ওপরও ইউরোপে লেখার কাজ করা হত। তাকে 'পার্চমেন্ট' বলা হয়।

প্রাচীন ভারতের লোকেরা গাছের পাতার ওপর লিখত। এ পাতা হয় ভূর্জপত্র, আর তা নয়তো তালপাতা। আমাদের বহু প্রাচীন পুথিই তালপাতার ওপর লেখা।

এখন কাগজ বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছে তন্তুজ মণ্ড থেকে প্রস্তুত। এর প্রস্তুত প্রণালীটা আবিষ্কার করেছিল চীনদেশের লোকেরা। ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে চাই লুন (Ts'ai Lun) নামে চীনদেশের এক ব্যক্তি এটা আবিষ্কার করে। সেখানেই এর উন্নতি ঘটে। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কাগজ প্রস্তুত করবার প্রণালী চীন থেকে জাপানে যায়। ৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী চীনাদের কাছ থেকে সমরকন্দের লোকেরা এটা শেখে। আরবরা ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এটা মিশরে নিয়ে যায় ও ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে নিয়ে যায়। ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীতে, ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে ও ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার প্রথম কাগজ তৈরি হয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে।[৪] তার আগে আমেরিকার আদিবাসীরা গাছের ত্বকের ওপর লেখার কাজ করত।

ইউরোপের লোকেরা যখন প্রথম কাগজের কারখানা স্থাপন করে, তখন তারা শণের মণ্ড দিয়ে কাগজ তৈরি করত। মধ্যযুগে ভারতেও শণের মণ্ড দিয়ে কাগজ তৈরি করা হত। শণ ছাড়া তুলা দিয়েও কাগজ তৈরি করা হত। সেরূপ কাগজকে তুলট কাগজ বলা হত।

২

হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয়েছিল হুগলির এনড্রুজ সাহেবের ছাপাখানায়। ছাপার জন্য কাগজ এনড্রুজ দেশজ সূত্র থেকেই পেতেন। কেন না, প্রাচীন পুঁথিপত্রের প্রমাণ থেকে আমরা

বুঝতে পারি যে এদেশে কাগজশিল্পের বয়স ন্যূনপক্ষে ১২০০।১৩০০ বছর। যদিও কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত, এই শিল্প বিস্তৃত ছিল, তথাপি উৎকর্ষের দিক দিয়ে বাংলাদেশের কাগজই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলার যেসব জায়গায় কাগজ তৈরি হত তার মধ্যে ছিল বর্ধমানের নিরালা, সাতগাঁ, মানাদা, শাহবাজার ও মৈনন গ্রামসকল, হরিহরগঞ্জ, ঢাকা, দিনাজপুর, পাবনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা ও শ্রীরামপুর। তবে সব জায়গার কাগজ সমান গুণবিশিষ্ট ছিল না। শ্রীরামপুর, বর্ধমান ও ঢাকার কাগজই ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। বাংলার বাইরে যে সব জায়গায় কাগজশিল্পের কেন্দ্র ছিল, তাদের মধ্যে বালেশ্বর, বাঁকিপুর, আরওয়াল, শহার, পাটনা, উত্তর-প্রদেশ ও কাশ্মীরের নাম উল্লেখনীয়। নেপাল থেকেও একরকম কাগজ আসত। সে কাগজের মণ্ড সম্বন্ধে ১৮ জুলাই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' মন্তব্য করা হয়েছিল যে, "কিছুকাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংলণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাংকনোটের নিমিত্ত কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে।" এদেশের হাতে তৈরি কাগজেই হলহেডের 'গ্রামার' ছাপা হয়েছিল । বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় যে বইখানা ছাপবার জন্য দুরকম কাগজ ব্যবহৃত হয়েছিল। একরকম কাগজ, যাকে আমরা আজকালকার দিনে 'ছাপার কাগজ' বলি, তাতে ছাপা হয়েছিল বইখানার ভূমিকা অংশ। আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে রকম কাগজকে আমরা 'লেখার কাগজ' বলতাম তাতে ছাপা হয়েছিল মূল বইখানা।

অবশ্য বিলাতেও তখন কাগজ হাতে তৈরি করা হত। এদেশে যে কাগজ হাতে তৈরি করা হত, তার মণ্ড তৈরি করবার মূল উপকরণ ছিল শণ, তিসির তন্তু ও তুলা। এগুলিকে চূর্ণ করা হত ঢেঁকিতে। অনেক সময় এগুলিকে চুনের জলে ডুবিয়ে রাখা হত। চূর্ণ করবার পর সেগুলিকে গামলার জলে ফেলে মণ্ড তৈরি করা হত। দুখানা কাঠের ফ্রেমে শক্ত করে কাপড় লাগানো থাকত। দুখানা ফ্রেম একসঙ্গে কাপড়ের দিকে মুখোমুখি করে ধরে প্রস্তুতকারক গামলার মণ্ডের মধ্যে চুবিয়ে দিত। তার হাতের কায়দার ওপর কাগজের পুরুত্ব নির্ভর করত। তারপর ফ্রেমদুটিকে একবার নেড়ে নেওয়া হত যাতে মণ্ড সমানভাবে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর একখানা ফ্রেম তুলে নেওয়া হত। অপর ফ্রেমের ওপর অবস্থিত কাগজটি একখানা মসৃণ বনাতের ওপর ফেলে আর একখানা বনাত চাপা দিয়ে আবার দ্বিতীয় কাগজ ফেলা হত। তারপর অনেকগুলি কাগজ প্রস্তুত করার পর সেগুলিকে শুকানো হত রৌদ্রে। মণ্ডের সঙ্গে অনেক সময় হলুদ মেশানো হত, যাতে কাগজগুলি হলদে রঙের হয় এবং কীটদষ্ট না হয়। আর তুলার মণ্ড দিয়ে তৈরি কাগজের নাম ছিল তুলট কাগজ। ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে তুলট কাগজের বিদ্যমানতা আলেকজাণ্ডারের অভিযান কাহিনীর মধ্যে উল্লিখিত আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করে বই ছাপতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁরা দেশজ সূত্র থেকেই কাগজ সংগ্রহ করতেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডের লেখা এক চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে ঐ বছর বা তার পূর্বেই শ্রীরামপুর মিশন নিজেদের ছাপাখানায় ব্যবহারের জন্য কাগজ কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় এক অগ্নিকাণ্ডে বহু রীম কাগজ ভস্মীভূত হয়ে যায়। শ্রীরামপুরে মিশনারিদের কাগজ কলের উপকরণ চূর্ণ করা হত ঢেঁকিতে, কিন্তু কাগজ কলটা চালানো হত পায়ে। পরে ঢেঁকির পরিবর্তে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড থেকে একটা পেষাই যন্ত্র নিয়ে আসা হয়। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পেষণ যন্ত্র চালনার জন্য ও কাগজ শুকাবার জন্য স্টীম ইঞ্জিন প্রবর্তিত হয়। সরকারী সহানুভূতির অভাবে শ্রীরামপুরের কাগজ কলকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বালিতে রয়্যাল পেপার মিল স্থাপিত হয়, তখন তারা শ্রীরামপুর মিশনের কাছ থেকে ওই যন্ত্রপাতি কিনে নেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে টিটাগড় পেপার মিল বালির ওই মিলের স্বত্ব কিনে নেয়। তারপর থেকে ওই ঐতিহাসিক যন্ত্রপাতি টিটাগড়ে চলে যায়।

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ঠিক কি ভাবে কাগজ তৈরি করতেন, তার একটা প্রতিবেদন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেরীসাহেব সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। ওই প্রতিবেদনে তিনি বলেছিলেন, "কিছুকাল পূর্বে আমরা যখন প্রথম কাগজ তৈরি শুরু করি, তখন আমাদের যন্ত্রপাতি কিছু ছিল না। সেজন্য এদেশীয় কাগজ প্রস্তুতকারকদের ওপরই আমরা নির্ভর করেছিলাম। তাদের অভ্যস্ত প্রণালী অনুযায়ী কাগজ তৈরি করবার জন্য আমরা তাদেরই নিযুক্ত করেছিলাম। কেবল একটা জিনিস আমরা পরিহার করেছিলাম; সেটা হচ্ছে কাগজ পালিশ করবার জন্য ভাতের মাড় ব্যবহার করা। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কাগজকে কীটের আক্রমণ থেকে অভেদ্য রাখা। গোড়ার দিকে আমাদের প্রয়াসের অনেক ত্রুটি ছিল। যে প্রণালী আমরা অবলম্বন করেছিলাম, তা হচ্ছে—এক গোছা শণ নিয়ে, তা আমরা পুনঃ পুনঃ চুনের জলে ভিজিয়ে নিতাম। তারপর হাওয়ায় শুকিয়ে নেবার জন্য সেগুলিকে আমরা ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিতাম। তারপর সেগুলিকে ঢেঁকিতে পুনঃ

পুনঃ চূর্ণ করে, গামলার জলে ফেলে মণ্ড তৈরি করতাম। তারপর ওটাকে সুরুয়ার মত পাতলা করে নিতাম। কাগজের আকার অনুযায়ী দরমার 'ফ্রেম' তৈরি করা হত। প্রস্তুতকারক গামলার পাশে বসে, ওই ফ্রেমটাকে মণ্ডের সুরুয়ার মধ্যে নিমজ্জিত করত। তারপর ফ্রেমটাকে তুলে নিয়ে জল নিষ্কাশনের জন্য, পাশের একজন সহকারীর হাতে দিত। সে ওটাকে ঘাসের ওপর শুকাতে দিত। এরপর আমরা আর কিছু করতাম না। কিন্তু দেশীয় প্রস্তুতকারকরা এরপর কাগজের প্রান্তভাগ ধরে কাগজগুলোকে পালিশ করবার জন্য ভাতের মাড়ের মধ্যে এমন ভাবে চুবিয়ে দিত যাতে প্রত্যেক কাগজখানাই পৃথক থেকে যায়। তারপর কাগজগুলোকে শুকিয়ে, পাট করে দুখানা তক্তার মধ্যে রেখে, ওপরের তক্তার ওপর পাথর চাপা দেওয়া হত।

"এখন আমরা কাগজ যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করি। এখন মণ্ডের সুরুয়াটা জালের ওপর দিয়ে বাহিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কয়েকটা বেলনাকার পেষণ যন্ত্রের ওপর দিয়ে চালিয়ে, শেষ কাগজ-খানাকে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে তাপ লাগানো হয়। তাতে কাগজখানা শুকিয়ে যায় ও ব্যবহার-যোগ্য হয়। তরল অবস্থা থেকে ব্যবহারযোগ্য কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রণালীটা সমাপ্ত হতে মাত্র দু মিনিট সময় লাগে।"[৩]

শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে ছাপা অসংখ্য বই প্রমাণ করে যে শ্রীরামপুরের কাগজ কলে প্রস্তুত কাগজ বিলাতী কাগজের সমতুল্য না হলেও, ছাপার কাজের পক্ষে এদের প্রস্তুত কাগজ সন্তোষ-জনকই ছিল। কিন্তু সরকারের সহানুভূতির অভাবে ও বিলাত থেকে কাগজ আমদানী করার নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে, শ্রীরামপুরের কাগজের কলকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৩

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বিলুপ্ত হবার পর দেশে যে সব বিলাতী মাল অবাধে আসতে থাকে, কাগজ তারই অন্যতম। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রকাশকরা যে বিলাতী কাগজ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওবা যায় ৩০ অক্টোবর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' ডঃ উইলসন সাহেবের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানের সমাচারে। তাতে বলা হয়েছে যে, "তাহার মূল্য ইংরাজী কাগজে একশত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।" এই সমাচার থেকে আরও বোঝা যায় যে, বিলাতী কাগজের দাম দেশী কাগজের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশী। কিন্তু ২৫ শতাংশ বেশী হলেও বিলাতী কাগজের উৎকর্ষ প্রকাশক ও পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করত, কেন না ভাল ছাপার জন্য সকলে বিলাতী কাগজই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল। এ পরিস্থিতি বর্তমান শতাব্দীর তিনদশক পর্যন্ত বহাল ছিল। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত যাঁরা এদেশে বিলাতী কাগজ আমদানী করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভোলানাথ দত্ত, পান্নালাল শীল, পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু, চন্দ্রমোহন সুর, জে. বি. আদভানি, এল. কে. চৌধুরী, জন ডিকিনসন, শম্ভু সিং ও জি. লোচেন। তখনকার দিনের বিলাতী কাগজের মধ্যে জন ডিকিনসন কর্তৃক আমদানীকৃত 'লায়ন' মার্কা কাগজের চাহিদাই খুব বেশী ছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত কাগজ ব্যবসায়ীদের আমদানী লাইসেন্স দেওয়া রহিত করবার পর থেকে এ'রা আর বিলাতী কাগজ আমদানী করেন না। এখন আমদানী লাইসেন্স শুধুমাত্র প্রকৃত ব্যবহারকারীদের দেওয়া হয়।

যখন বিলাতী কাগজ আসত, তখন এদেশের ভাল প্রকাশক ও মুদ্রাকরগণ দেশী কাগজ প্রায় স্পর্শই কবত না। মাত্র নিকৃষ্টমানের বই ও পাঠ্য পুস্তক ছাপার জন্যই দেশী কাগজ ব্যবহৃত হত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮) যখন এদেশে বিলাতী কাগজের আমদানী বিশেষ-ভাবে ব্যাহত হয়, তখনই গত্যন্তর না থাকায় দেশী কাগজে বই ছাপা হত। এমনকি খবরের কাগজও। বর্তমান লেখকের মনে আছে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলকাতার ইডেন গার্ডেনে "পীস সেলিব্রেশন এগজিবিশন" অনুষ্ঠিত হয়, তখন টিটাগড় পেপার মিল রোটারী মেশিনে ছাপার উপযোগী একটা বড় কাগজের 'রোল' প্রদর্শন করে বড় বড় হরফে ঘোষণা করেছিল যে 'স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা' এই কাগজে ছাপা হয়। তারপর যুদ্ধান্তে যখন কিছুদিনের জন্য টাকার বিনিময় হার দুই শিলিং-এ বেঁধে দেওয়া হয়, তখন অন্যান্য বিলাতী মালের সঙ্গে কাগজও প্রভূত পরিমাণে সস্তাদরে এদেশে আসতে থাকে। টিটাগড় পেপার মিল এ সময় বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। এবং একমাত্র ভোলানাথ দত্ত সে সময় তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে কাগজের ব্যবসায়ে ভোলানাথ দত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ভোলানাথ দত্ত প্রথম জীবনে তাঁর শ্বশুরদের পরিচালিত 'তারকনাথ নাগ' নামক কাগজের দোকানে চাকরি করতেন। কাগজের ব্যবসায়ে সেখানেই তাঁর হাতে খড়ি। তারকনাথ নাগের দোকান উঠে যাবার পর, ভোলানাথ দত্ত সেই ঘরেই কাগজের ব্যবসা শুরু করেন। নিজের অধ্যবসায় ও সততার প্রভাবে তিনি অচিরে কলকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়ান। তিনি নরওয়ে থেকে নিজস্ব 'সোয়ান' নামক বিশেষ মার্কাযুক্ত কাগজ এদেশে আমদানী করেন। যদিও পরবর্তীকালে ভোলানাথ দত্ত

এনড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানী পরিচালিত 'ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প' কোম্পানীকে দিয়ে 'সোয়ান' ব্র্যান্ড কাগজ এদেশেই তৈরি করাতে আরম্ভ করেছিলেন, তা হলেও ভোলানাথের 'সোয়ান' মার্কার 'ডান্ডিরোল' এখনও নরওয়ের সেই পেপার মিলে আছে। (কাগজের ওপর যার সাহায্যে জলছাপ দেওয়া হয়, তাকে 'ডান্ডিরোল' বলা হয়)। ভোলানাথের সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে বিদেশী কাগজের প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হয়ে টিটাগড়ের সাহেবরা যখন তাঁর শরণাপন্ন হন, তখন এদেশে বিলাতী কাগজের পরিবর্তে টিটাগড়ের কাগজ বাজারে চালানো। ভোলানাথ খানিকটা ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা ও খানিকটা ধারে মাল বেচার ঝুঁকি নিয়ে এ কাজটা সাধন করেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি যা করেছিলেন তা হচ্ছে, বিলাতী কাগজ কিনে, তা টিটাগড়ের মোড়কের মধ্যে ভর্তি করে, টিটাগড়ের কাগজ বলে বেচা। কাগজের উৎকর্ষ দেখে লোকের টিটাগড়ের কাগজের ওপর আস্থা বেড়ে যায়। এদিকে তিনি টিটাগড়ের সাহেবদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন বিলাতী কাগজের সমতুল মানের কাগজ তৈরি করবার জন্য। তারপর প্রকাশক মহলে দেশী কাগজের ব্যবহারের প্রসারের জন্য তিনি হ্যারিসন রোডে এক শাখা দোকান খোলেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল একদৃষ্টিতে বিচার করবার, কোন খরিদ্দার ধারের টাকা মেরে পালাবে আর কে পালাবে না। এইভাবে ধারে কাগজ বেচে তিনি কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশক ও মুদ্রাকর মহলে যে মাত্র টিটাগড়ের কাগজের ব্যবহারের প্রসার বৃদ্ধি করলেন তা নয়, কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলের বহু প্রকাশক ও মুদ্রাকরকেও দাঁড় করিয়ে দিলেন। যে সকল মুদ্রাকর ভোলানাথের কাছ থেকে ধারে কাগজ পেতেন, তাঁদের অনেকেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন।

যা হোক, বর্তমানে ভোলানাথই বলুন, আর অন্য কোন কাগজ ব্যবসায়ী বলুন, সকলেই মোটামুটি দেশী কাগজের ব্যবসা করে।

৪

এতক্ষণ পর্যন্ত দেশী কাগজ শিল্পের অভ্যুত্থানের কথা বলিনি। এবার সেটা বলে নিতে চাই। আগেই বলেছি যে, শ্রীরামপুর মিশনের কেরী সাহেবই ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পূর্বে এ দেশে প্রথম কাগজ কল স্থাপন করেন। তারপর সেই যন্ত্রপাতি নিয়ে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বালিতে রয়্যাল পেপার মিল স্থাপিত হয়। এরা লালচে বাদামী রঙের কাগজ তৈরি করত। কিন্তু এটাও লুপ্ত হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশকে আরও কয়েকটা পেপার মিল স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি পরে লুপ্ত হয়ে যায়। যেগুলি এখনও জীবিত আছে, প্রতিষ্ঠা ও সময়ানুক্রমে তাদের নাম নিচে দেওয়া হল:

১ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত উত্তর প্রদেশের বাদশাহ নগরে অবস্থিত আপার ইন্ডিয়া কুপার পেপার মিল। এর বর্তমানে বিনিযুক্ত মূলধন ৭১·২৪ লক্ষ টাকা।

২ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত টিটাগড় পেপার মিল। এর একটি মিল টিটাগড়ে, অপরটি কাঁকিনাড়ায়। বর্তমানে বিনিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ৩০·৯৫ কোটি টাকা।

৩ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কেরল রাজ্যের পুনালুরে অবস্থিত পুনালুর পেপার মিল। এর বিনিযুক্ত মূলধন ৬·৩৭ কোটি টাকা। সম্প্রতি এরা হিমালয় প্রদেশে একটি মিল স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন।

৪ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত রানীগঞ্জে অবস্থিত বেঙ্গল পেপার মিল। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১২·৮০ কোটি টাকা।

৫ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ২৪ পরগণার নৈহাটীর নিকট হাজিনগরে অবস্থিত ইন্ডিয়া পেপার পাল্প কোম্পানী। এর বিনিযুক্ত মূলধন ৭·৬৮ কোটি টাকা। বর্তমানে মিলটি সরকার অধিগ্রহণ করেছেন।

৬ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত উড়িষ্যার ব্রজরাজনগরে অবস্থিত ওরিয়েন্ট পেপার মিল। পরে মধ্যপ্রদেশের আমলাইতে এরা আর একটি মিল স্থাপন করে। বর্তমানে বিনিযুক্ত মূলধন ৪০·২৬ কোটি টাকা।

৭ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত মহীশূরের ভদ্রবাটীতে অবস্থিত মাইশোর পেপার মিল। এর বিনিযুক্ত মূলধন ৭·৭৬ কোটি টাকা।

৮ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুরে অবস্থিত স্টার পেপার মিল। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১২·৩২ কোটি টাকা।

৯ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত আম্বালা ও সাহারাণপুরের মধ্যে জগাধরি রেল স্টেশনের কাছে অবস্থিত শ্রীগোপাল পেপার মিল। বার্ড হিলজারস্ কোম্পানীর প্রধান অংশীদার স্যার উইলোবি কেরী (the Knighted beggar of Clive Street) যে পেপার মিল স্থাপন করেছিলেন, তারই যন্ত্রপাতি নিয়ে এটা স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে যমুনাপুর পেপার অ্যান্ড বোর্ডস্ কোম্পানীর সহিত সম্মিলিত হয়ে এখন বল্লারপুর ইন্ডাস্ট্রীজ্ নাম গ্রহণ করেছে।

বিনিযুক্ত মূলধন ৬৩·২১ কোটি টাকা। এর বল্লারপুর শাখা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত চন্দ্রপুরে অবস্থিত।

১০ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলার সিরপুরে অবস্থিত সিরপুর পেপার মিল। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১৫·৩৭ কোটি টাকা।

১১ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ও উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় অবস্থিত স্ট্র প্রোডাক্ট্‌স্‌। এর বিনিযুক্ত মূলধন ৩৯·০৪ কোটি টাকা।

১২ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বল্লারপুরে স্থাপিত বল্লারপুর পেপার ও বোর্ডস কোম্পানী। আগেই বলা হয়েছে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোপাল পেপার মিল অধিগ্রহণের পর এটি বল্লারপুর ইণ্ডাস্ট্রীজ নামে পরিচিত।

১৩ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ও ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটিতে অবস্থিত ত্রিবেণী টিস্যুস্‌। এরা প্রধানতঃ সিগারেটে ব্যবহৃত কাগজ তৈরি করে। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১৯·৯৯ কোটি টাকা।

১৪ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত উত্তর কর্ণাটকের দান্দেলী নামক স্থানে অবস্থিত ওয়েস্ট কোস্ট পেপার মিল। এর বিনিযুক্ত মূলধন ২০·৩৪ কোটি টাকা।

১৫ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট অ্যাণ্ড পেপার মিল। এখন সরকারী পরিচালনাধীনে। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১২·১৮ কোটি টাকা।

১৬ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত অশোক পেপার মিল। এর দুটি মিল—একটি বিহারে, অপরটি আসামে। এর বিনিযুক্ত মূলধন ৩০·৭৩ কোটি টাকা।

১৭ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ও হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার অবস্থিত ইস্ট-এণ্ড পেপার ইণ্ডাস্ট্রীজ। এর বিনিযুক্ত মূলধন ২·১৪ কোটি টাকা।

১৮ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত সালেম জেলার পল্লীপালায়ামে অবস্থিত শেশসারী পেপার অ্যাণ্ড বোর্ড মিল্‌স্‌। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১৩·৪৮ কোটি টাকা।

১৯ ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে অবস্থিত কেমো পালপ টিস্যুস। এর বিনিযুক্ত মূলধন ১·০৮ কোটি টাকা।

ইদানীং কালে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে কাগজের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। তার ফলে, নতুন অনেক কাগজের কল স্থাপিত হয়েছে। সবগুলির নাম দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। তবে যে-গুলির মূলধনের আধিক্যের জন্য শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ারের কেনা বেচা হয়, তাদের মধ্যে আছে—অন্ধ্র পেপার মিল, ঔরঙ্গাবাদ পেপার মিল, বালকৃষ্ণ পেপার মিল, বসন্ত পেপার মিল, ভদ্রচালম পেপার মিল, সেনট্রাল পালপ্‌ মিল, কোস্টাল পেপার মিল, ডেলটা পেপার মিল, ইলোরা পেপার মিল, ইওরোকোট পেপার মিল, হরিয়ানা কোটেড পেপার মিল, জয়ন্ত পেপার মিল, কাবিনি পেপার মিল, ম্যাণ্ডিয়া ন্যাশনাল পেপার মিল, প্যাপাইরাস পেপার মিল, পারফেক্ট প্যাক মিল, পলিমার মিল, পণ্ডিচেরি পেপার মিল, প্রিমিয়ার পেপার মিল, রিগেল পেপার মিল, রোহিত পালপ অ্যাণ্ড পেপার মিল, রোলাটেনারস্‌, সরফ পেপার মিল, সর্বোদয় পেপার মিল, সিবালিক সেলুলোজ, স্পেশালটি পেপার মিল, শ্রী রায়ালসীমা মিল, ইউনি-ভারসাল পেপার মিল, ভেনাস পেপার মিল, বিদর্ভ পেপার মিল, বিনোদ পেপার মিল প্রভৃতি।

সাম্প্রতিক কালে সরকারী মহলে কাগজকল স্থাপনের জন্য একটা কোম্পানী গঠিত হয়েছে। এর নাম হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন। এই সংস্থা বে-সরকারী মহলের ইণ্ডিয়া পেপার পাল্‌পের পরিচালনা অধিগ্রহণ করেছে। এছাড়া আসামেও এর অধীনে একটা কাগজকল স্থাপিত হয়েছে। ত্রিপুরাতেও একটা কাগজকল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৫

আগেই বলা হয়েছে যে গোড়া থেকেই দেশীয় কাগজ কল সমূহকে বিদেশী কাগজের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিদেশী কাগজের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় কাগজশিল্পের অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে তাদের অবস্থা 'যথা পূর্বং তথা পরং' হয়। তখন কাগজশিল্প সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কাগজশিল্পে সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করেন। বাঁশের মণ্ডের বহুল প্রচারের ওপর এই সংরক্ষণনীতি গঠিত হয়। ১৯৩১ ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নীতির পুনঃ সমীক্ষায় কাঠের মণ্ড আমদানী বন্ধের চেষ্টা ও শুল্কনীতির কিছু পরিবর্তন করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নীতি অনুসৃত হয়।

ভারতীয় কাগজকল সমূহের উৎপাদনের ক্রমবর্ধমানতা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। শতাব্দীর গোড়াতেই মোট বার্ষিক উৎপাদন ছিল ২০ হাজার টন। ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ হাজার টন। সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের পর উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ হাজার টনে ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ হাজার টনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহা ৯৮ হাজার টনে দাঁড়ায়। বর্তমানে কাগজশিল্পের মোট উৎপাদন পরিমাণ নয় লক্ষ টন। বিদেশী কাগজের আমদানী এখন লাইসেন্স নির্ভরশীল হয়েছে। মাত্র প্রকৃত ব্যবহারকারীদের এই লাইসেন্স দেওয়া হয়। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নিউজপ্রিণ্ট, কেননা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এদেশে নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদন হয় খুবই সামান্য। নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদন করে সরকারী মহলের কাগজকল সংস্থা নেপা মিল (ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট অ্যাণ্ড পেপার মিল)। এর উৎপাদন ৪০ হাজার টন থেকে ৭০ হাজার টনে বর্ধিত করা হচ্ছে। কেরলেও একটা মিল করা হয়েছে। যে সকল দেশী কাগজ এখন বাজারে পাওয়া যায় তাদের নানা নাম। যথা, হোয়াইট প্রিণ্টিং, ম্যাপলিথো, ক্রীম উভ, হোয়াইট উভ, এ্যাণ্টিক, কার্টিজ, লেজার, ব্যাঙ্ক বা বণ্ড, কভার পেপার, র‍্যাপিং পেপার, আর্ট পেপার, আইভরী কোটেড আর্ট পেপার, ক্রোমো আর্ট পেপার, বাইবেল পেপার, টিস্যু পেপার ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম কাগজ ব্যবহার করা হয়। কোন কাজের জন্য কোন কাগজ উপযোগী তা অভিজ্ঞ মুদ্রাকরদের জানা আছে। তবে আগেকার দিনে প্রচলিত দু'এক রকম কাগজ এখন আর তৈরি হয় না বা বাজারে পাওয়া যায় না। তাদের অন্যতম হচ্ছে আইভরি ফিনিশ পেপার ও ক্রেপ পেপার। ক্রেপ পেপারের চলতি নাম ছিল রুমাল পেপার। এ কাগজগুলো ঠিক রুমালের মতো দেখতে। এতে ছাপা হত বিয়ের প্রীতি-উপহার। বাইবেল পেপার খুব পাতলা কাগজ—বিলাতী ইণ্ডিয়া পেপারের সামিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপা হয়েছিল বেঙ্গল পেপার মিল কর্তৃক প্রস্তুত বাইবেল পেপারে। বর্তমানে আরও সুন্দর বাইবেল পেপার তৈরি করছে টিটাগড় পেপার মিল। 'কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্‌সনারি'র নতুন ষষ্ঠ সংস্করণ ছাপা হয়েছে এই কাগজে। এসব কাগজের উৎকর্ষ দেখলে বুঝতে পারা যায় যে ভারতীয় কাগজ কলসমূহ খুব ভাল কাগজ তৈরি করতে পারে, যদি তার যথাযথ মূল্য পায়। কেননা বাইবেল পেপার প্রভৃতি বেখাপ্পা কাগজ নেগোশিয়েটেড্ প্রাইসে বিক্রয় হয়। অন্য কাগজের বেলায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকায়, কাগজকল সমূহ নির্দিষ্ট দামের মধ্যে কাগজ তৈরি করবার যতটা প্রবণতা দেখায়, উৎকর্ষসাধনের দিকে ততটা সচেষ্ট হয় না। তবে বাজারে চলতি কাগজের স্ট প্রোডাক্‌ট্‌স্, ডালমিয়া ওয়েস্ট কোস্ট, ও বেঙ্গল পেপার মিল সমূহের কাগজ ব্যবহারকারীরা বেশী পছন্দ করে। সিগারেট প্রস্তুতে ব্যবহৃত টিস্যু পেপার তৈরি করে ত্রিবেণী টিস্যু। এরা ইলেকট্রিক্যাল কনডেনসর পেপারও তৈরি করে। ওয়েস্টার্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরীরও একটা কাগজের কল আছে। তবে সেখানে তারা যা কাগজ তৈরি করে, তা নিজেদের প্রস্তুত দিয়াশলাইতে ব্যবহার করা হয়।

সকল মুদ্রাকর ও কাগজ ব্যবহারকারীই জানেন যে কাগজের গুণাগুণ স্পর্শানুভব দ্বারা যতটা বোঝা যায়, আর কোন মানদণ্ডের দ্বারা ততটা বোঝা যায় না। তবে কাগজটা নিউজপ্রিণ্ট কিনা (তার মানে কতটা কাঠের মণ্ড আছে) তা যাচাই করবার জন্য একটা রাসায়নিক পদার্থ আছে। এটা কাগজে লাগিয়ে দিলেই মেকানিক্যাল পেপার (তার মানে নিউজপ্রিণ্ট) লাল হয়ে যায়। তবে কাগজের অনচ্ছতাই (opacity) হচ্ছে ভাল কাগজের লক্ষণ।

কাগজ সম্বন্ধে আরও দু একটা কথা বলব। কাগজ মিলে 'রোল' হিসাবে তৈরি হয়, পরে তাকে আকার অনুযায়ী কেটে রীম বাঁধা হয়। দ্বিতীয় কথা, কাগজ সাদা করবার জন্য টাইটেনিয়াম ডায়োক্‌সাইড্ ব্যবহার করা হয়। তবে আজকাল কাগজের দাম বাড়াবার জন্য মিল সমূহ অনেক কাগজের ওপর 'ও. বি.' (optical bleached) মার্কা দিকে থাকে। মনে হয় এই প্রক্রিয়ার জন্য যে রাসায়নিক পদার্থটা ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে টাইটেনিয়াম ডাই-অকসাইড। আর কাগজের ওপর জলছাপ দেওয়ার জন্য, কাগজ তৈরির প্রায় শেষ মুহূর্তে কাগজটাকে একটা রোলারের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়। একে 'ডাণ্ডিরোল' বলা হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে কাগজ মিলে 'রোল' হিসাবে তৈরি করা হয়। তারপর তাকে কেটে 'সাইজ' করে নেওয়া হয়। আগে কাগজের ভিন্ন ভিন্ন সাইজের নাম ছিল—'ফুলস্কেপ', 'ক্রাউন', 'ডবল ক্রাউন', 'ডিমাই', 'ডবল ডিমাই', 'মিডিয়াম', 'ডবল মিডিয়াম', 'ইম্পিরিয়াল', 'রয়েল', 'ডবল রয়েল' ইত্যাদি। এখন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস্ ইনস্টিটিউশন কাগজের সাইজের যে সংজ্ঞা স্থির করেছে, তা হচ্ছে— 4AO, 2AO, AO, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 এবং A12.

৬

শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ এ দেশে কাগজ-যোগানের একটা সংকট চলছে। বর্তমান দেশের মধ্যে কাগজ উৎপাদনের প্রতিষ্ঠিত শক্তি (installed capacity) রয়েছে ১৫.১০ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছিল মাত্র ১০.১১ লক্ষ টন। প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন শক্তির মাত্র ৮২ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, ৮১ শতাংশ ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ৭৭ শতাংশ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ৬৮.৬৮ শতাংশ ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৮০

খ্রীষ্টাব্দে উৎপাদনের এই অবনতি রোধ করবার চেষ্টা চলেছে। কাগজ উৎপাদনের এই অবনতির কারণ হচ্ছে—তড়িৎ শক্তির ঘাটতি, পূর্বাঞ্চলে কাঁচামালের অভাব, কয়লা সরবরাহের হ্রাস ও রেল পরিবহনের বিশৃংখলতা। কাঁচামালের অভাব দূরে করবার জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার টিটাগড় পেপার মিলকে বাঁশ উৎপাদনের এক পরিকল্পনায় সাহায্য করছে।

চাহিদা অপেক্ষা যোগানের অসমতার জন্য খোলা বাজারে কাগজ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সংকট মোচনের জন্য সরকার কাগজ আমদানী নীতি অবলম্বন করেছে। লেখবার এবং ছাপবার —এ দুরকম কাগজই আমদানী করা হচ্ছে। ১৯৮০-তে ৫০,০০০ টন লেখার কাগজ বিদেশ থেকে আনা হচ্ছে। এ ছাড়া, খবরের কাগজ ছাপবার কাগজ তো আছেই। ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১,৪৫,৪৭৬ টন 'নিউজ প্রিন্ট' আমদানী করা হয়েছিল। গত বছর এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩,০৬,০০০ টনে। এ বছর আরও বেশী 'নিউজ প্রিন্ট' আমদানী করা হচ্ছে। কিন্তু বিদেশে বর্তমানে 'নিউজ প্রিন্টে'র মহার্ঘতা চলছে। সেজন্য এখানে 'নিউজ প্রিন্টে'র দাম ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। টন প্রতি এর দাম ছিল ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩,৭১০ টাকা, ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩,৯৮৭ টাকা ও ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৪,২০০ টাকা। এদিকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের কাগজ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী সরকার সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ অধিগ্রহণ করছেন। কিন্তু এই সুলভ মূল্যও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'হোয়াইট প্রিন্টিং' কাগজের দাম ছিল টন প্রতি ২,৭৫০ টাকা। বর্তমানে এর প্রায় তিনগুণ।

৭

এবার ছাপার কালির প্রসঙ্গে আসা যাক। ছাপার কালি প্রথমে মিশরে কি চীনদেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটা বিতর্কিত ব্যাপার। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশের লেখক Kia-se-hie তাঁর রচিত *Tsi-min-yao-shu* নামক গ্রন্থে ছাপার কালির উল্লেখ করে গেছেন। কাঠের খোদিত ব্লকের ওপর কাপড়ের প্যাডে করে এই কালি লাগিয়ে ছাপার কাজ হত। অত পূর্বে ভারতে যে খোদিত কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপার কাজ হত, তার কোন প্রমাণ নেই। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে যখন মুদ্রণ কার্য শুরু হয়, তখন চীনদেশের মতো কোন কালি ব্যবহৃত হত, তা অনুমান করা যেতে পারে। চীনদেশে এই কালি তৈরি করা হত তেলের সঙ্গে ভুসা মিশিয়ে। ভুসার গুণাগুণের ওপর কালির গুণাগুণ নির্ভর করত। ওয়ার্ডের ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক চিঠি থেকে জানতে পারা যায় যে শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস নিজেদের ছাপাখানার মধ্যেই ছাপার কালি তৈরি করত। তারপর ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদ দ্বারা যখন বে-সরকারী মহলের সামনে ব্যবসার পথ খুলে দেওয়া হল, তখন বিলাত থেকে কালি আমদানী হতে লাগল। যদিও ছোটখাটোভাবে দু'একটা ছাপার কালি তৈরি করবার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, তা হলেও বিংশ শতাব্দীর দুই দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিলাতী কালির জনপ্রিয়তাই এদেশে বেশী ছিল। যে সকল বিলাতী কালি এদেশে আমদানী করা হত, তার মধ্যে কোটসের (Coates) বা ম্যান্ডারসের (Manders) কালির চলনই বেশী ছিল। তারপর বড় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি প্রিন্টিং ইঙ্ক কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে নরউইজিয়ান উদ্যোগে জি. লোচেন কর্তৃক গ্যাঞ্জেস প্রিন্টিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কোটস কোম্পানী বিলাত থেকে কালি আমদানীর পরিবর্তে ভারতেই ছাপার কালি তৈরি করবার জন্য কোটস অব ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে সম্পূর্ণ বাঙালী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ছাপার কালি প্রস্তুতকারী সংস্থার নাম উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে। এটা হচ্ছে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সান্যাল লাহিড়ী অ্যান্ড কোম্পানী।

ছাপার কালি তৈরির চারটি প্রধান উপাদান। সেগুলো যথাক্রমে ১ রঙ (pigment): উদ্ভিজ ও রাসায়নিক দুরকম রঙই ব্যবহৃত হয়। ২ মাধ্যম (vehicle): সাধারণতঃ তিসির তেল ব্যবহার করা হয়। তবে রেসিন ও কাঠের তেলও ছাপার কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ৩ তারপর কালি ঘনীভূত করবার জন্য কোন additive পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যেমন মোম। তবে কোন কোন কালি তেলের দ্বারাই ঘনীভূত হয়। ৪ কালিতে শুষ্কতাগুণ দেবার জন্যও নানারকম পদার্থ ব্যবহার করা হয়। বার্নিশ তাদের অন্যতম। সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণে কালির সমরূপ (homogeneity—সমসত্ত্বতা) পাওয়া চাই। তা ছাড়া ভাল কালির সান্দ্রতা (viscocity), প্রবহনের দৈর্ঘ্য (length of flow) ও ভিন্ন ভিন্ন রকমের মুদ্রাযন্ত্রে ব্যবহারের উপযোগিতা থাকা আবশ্যক। এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ছাপার কালি নানা রকমের হয়। খুচরা জিনিস ছাপবার বা জব প্রিন্টিং-এর কালি, বই ছাপবার কালি, অফসেটে ছাপার কালি, টিনের ওপর ছাপার কালি, গ্রাভিওর (gravure) প্রণালীতে ছাপার কালি প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন গুণসম্পন্ন কাগজে ছাপার জন্য অনেক সময় বিভিন্ন কালির প্রয়োজন হয়। কেননা, ছাপার কালির একটা বড় গুণ থাকা চাই—ছাপার পর কালিটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাওয়া। সেজন্য খবরের কাগজ ছাপবার জন্য

বিশেষ প্রকৃতির কালির প্রয়োজন হয়। এছাড়া, ফরমাস দিলে কালি প্রস্তুতকারকরা বিশেষ প্রকৃতির বা বর্ণের কালি তৈরি করে দেয়।

নির্দেশিকা

১ নগেন্দ্রনাথ বসু। বিশ্বকোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৮৬
২ *The Compact Edition of the Oxford English Dictionary*, vol 11, 1972
৩ *Encyclopaedia Britannica*, vol 13, 15th ed, p 968
৪ *The New Columbia Encyclopedia*, 4th ed, p 2062
৫ Smith, George *The Life of William Carey*, pp 233-234

এ

মুদ্রণের সমস্যা

সুধীর মুখোপাধ্যায়

ভারতে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রণ প্রবর্তিত হলেও, বাংলায় বিচল হরফে মুদ্রিত প্রথম বই বের হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসী হলহেডের বাংলা ব্যাকরণেই বাংলা হরফে কিয়দংশ প্রথম ছাপা হয়েছিল। চার্লস উইলকিন্স নিজের হাতে টাইপ কেটে হুগলিতে নিজস্ব ছাপাখানায় এ বইটি ছাপেন। মতান্তরে বইটি হুগলিতে এন্ড্রুজের ছাপাখানায় ছাপা হয়। এই মুদ্রণালয়টি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এরপর বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী পঞ্চানন কর্মকারের আবির্ভাব। পঞ্চানন হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে শিল্পী কালীকুমার রায়কে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলা হরফের সুশ্রী নমুনা খোদাইকরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পঞ্চানন কর্মকারের জামাতা মনোহর কর্মকার টাইপ খোদাই ও ঢালাইয়ের কাজে শ্বশুরমশাইকেও ছাড়িয়ে যান।

এদিকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লাইনোটাইপের আবিষ্কার হয়ে গেছে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছে মনোটাইপের আবিষ্কার। কিছুকাল পরে লাইনো ও মনো মেশিন ভারতে আসতে শুরু করে। বাংলায় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কম্পোজ করবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য এগিয়ে এলেন আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা লাইনোটাইপে তাঁর দান অপরিসীম। তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেছিলেন রাজশেখর বসু আর শিল্পী যতীন্দ্র কুমার সেন। এঁদের কাছেও বাঙালীর ঋণ কম নয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুরেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতি-রক্ষার্থে প্রতি বৎসর সারা ভারত মুদ্রণ প্রতিযোগিতায় একটি বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

অষ্টাদশ আর বিংশ শতাব্দীর এমন সহাবস্থান আমাদের দেশের মতো বিশ্বের আর কোন্ দেশে আছে? এখানে যেমন চলছে ঠেলাগাড়ী, তেমনি চলছে আধুনিকতম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মোটর গাড়ী, আমরা যেমন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি, তেমনি পারি অনায়াসে নির্ভর করতে হাতুড়ে বদ্যি আর ওঝার ওপর। একদিকে যেমন চলছে সর্বাধুনিক কাপড়ের কল, অন্যদিকে হাতে-চলা তাঁতও চলছে সমান উৎসাহে। মুদ্রণ শিল্পে এই সহাবস্থানের প্রভাব পড়েছে আরও বেশী।

মুদ্রণশিল্পে এই বৈচিত্র্যময় সহাবস্থান তুলনায় স্পষ্টতর। বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের কাজ, বিভিন্ন ধরনের পরিচালন ব্যবস্থা। এখানে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শতাধিক কর্মচারী আধুনিকতম মেশিনে ঘণ্টায় দশ থেকে বিশ হাজার ছাপছে। আবার কোথাও মালিক নিজেই পায়ে চালানো মেশিনটি চালিয়ে ঘণ্টায় তিনশর বেশী ছেপে উঠতে পারছেন না। এখানে 'কিশলয়ে'র মত লক্ষাধিক পুস্তকের চাহিদা যেমন আছে, তেমনি অধিকাংশ প্রকাশকেরাই এগারোশ'র বেশী বই ছাপেন না।

তাছাড়া স্বল্প ছাপার কাজও আছে বিভিন্ন রকমের। কাজেই আধুনিকতম যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর যন্ত্রের প্রয়োজনও রয়েছে সমভাবে। এর ফলেই মুদ্রণশিল্পে কর্মীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এই শিল্পকে কর্মীপ্রধান শিল্প বললেই ঠিক বলা হবে। সারা ভারতে প্রায় তিরিশ হাজার মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার কলকাতায়। ১৯৬২ সনের সি-এম-পি-ও'র একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, সমগ্র কলকাতায় কলকারখানার কর্মীদের মোট বেতনের ৯·৬ ভাগ আসে এই মুদ্রণশিল্প থেকে, আর মোট নিয়োজিত কারখানার কর্মীদের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ এই শিল্পের কর্মী। আর এর শতকরা ৭৫ ভাগ কর্মীই বাঙ্গালী। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক ট্রেড্‌ল ও হাতে চালানো বিভিন্ন ধরনের মুদ্রণযন্ত্র, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান আর বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য এই শিল্পে অনিবার্য কারণেই বেতনের ক্ষেত্রেও এসে গেছে বিরাট অসামঞ্জস্য।

কোথাও দেখা যায় সরকারী কানুনের চেয়ে কর্মীরা বেশী বেতন পেয়ে থাকেন, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নূ্যনতম বেতনটুকুও দেবার ক্ষমতা থাকে না, কোথাও বা এ নিয়ম-কানুনের খবরটুকু পর্যন্ত পেঁছয়নি। কাজেই বাঁধা-ধরা কোন কাঠামোর মধ্যে এ শিল্পকে ফেলা যায় না। শুধু কি এই! একই মুদ্রণযন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের কাজে সময়ও লাগে বিভিন্ন রকমের। অন্যান্য শিল্প থেকে এ শিল্প সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

এক জনের কাছে যে জিনিসের দাম লক্ষাধিক টাকা, অপরের কাছে তার দাম কানাকড়িও নয়। মুদ্রণযন্ত্রের চাকা ঘোরে তার কাজ সংগ্রহের উপর, কাঁচামাল সরবরাহের উপর। এর উপর আছে সুষ্ঠু পরিচালনা আর কর্মীদের কর্ম-দক্ষতা। মূলধনের কথা না হয় নাই তুললাম। কখনও কখনও কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না, কখনও বা বসে বসে শুধু মাছি তাড়াতে হয়। তৈরি প্রত্যেকটি জিনিস একটির চেয়ে অপরটি আলাদা। হয়ত এই বৈচিত্র্যের জনাই মুদ্রণশিল্পে কিছু বাঙালী আজও টি'কে আছেন।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমরা বাঙালীরা একটু ভাবপ্রবণ জাত। কোন জিনিস গড়ার সময় আমরা যেমন স্ত্রীর অলংকার পর্যন্ত বিক্রয় করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করি না, তেমনি সব রকমের দৈহিক বা মানসিক কষ্টকেও উপেক্ষা করি। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান যখন লাভের অঙ্কে পেঁছয়, তখন তার মালিকানা যায় বদলে। কারণ একঘেয়েমি আমরা পছন্দ করি না। যা নূতন, বাঙালী সব ক্ষতি স্বীকার করেও তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। তারপর তার ভালমন্দের ফল ভোগ করে দেশের লোক।

একদিন এই বাংলাদেশ সারা ভারতের মুদ্রণশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু আজ সে পিছিয়ে পড়েছে। বোম্বাই, দিল্লী, তামিলনাড়ু আজ এগিয়ে চলছে জোর কদমে। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে কলকাতার চেয়ে ওরা অনেক সমৃদ্ধ। কারণ, লাভ যাই হোক না কেন, মুদ্রণশিল্পে মূলধনের প্রয়োজন অনেক বেশী, তারপর আছে সরকারী আনুকূল্য। বাঙালীর মূলধন নেই, তাদের একমাত্র ভরসা পরিচালন-দক্ষতা আর কারিগরী বিদ্যা।

হ্যাঁ, পরিচালন-দক্ষতার কথাটা একটু খুলে বলি। এখানে পুঁথিগত বিদ্যার দাম খুব একটা নেই বা বিশেষ দরকার হয় না। এ শিল্পে জন-সংযোগ একটা বিশেষ অংশ। ক্রেতার বিশ্বাসভাজন হতে হবে। কাঁচামালের সংগ্রহে বিলম্ব করা চলবে না। সময়মত ক্রেতাকে তার মাল ডেলিভারি দিতে হবে। মুদ্রণের উৎকর্ষ বজায় রাখতে হবে। এরপর কর্মীদের সঙ্গে চাই সুষ্ঠু যোগাযোগ আর চাই সৃজনধর্মী পরিচালন-দক্ষতা।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় যে এগুলির অভাব আমরা দেখতে পাই বড় বড় সরকারী আর আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে। যেখানে অর্থের অভাব নেই, মুদ্রণ যন্ত্রেরও রয়েছে প্রাচুর্য। কাজ যোগাড় করার জন্যে এদের দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরতে হয় না। ঘুরতে হয় না পাওনা টাকার তাগাদায়। তবু বছরের পর বছর লোকসানের মাত্রা বেড়েই চলেছে। অপরদিকে পারিপার্শ্বিক বহুবিধ চাপের মধ্যেও বাংলাদেশের মুদ্রকেরা মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে। তবে?

তবের কথাই বলছি।

এখানে অনেক বড় বড় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান উঠে গেছে, কতকগুলি ধুঁকছে আর অনেকগুলির দিন শেষ হয়ে এল প্রায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে এর কারণ কি?

কারণ কি একটা? না, অনেকগুলি।

প্রথমতঃ, বাঙালী ব্যবসায়কে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চাকরি না পেয়ে ব্যবসায়ে যোগ দেয়। কাজেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানটির ভার নেবার মত উপযুক্ত লোক তৈরি হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ধরনের সরকারী আইন-কানুন। যার চাপে পড়ে অনেক ছোট ছোট মুদ্রণ-প্রতিষ্ঠানেরই টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তারপর আছে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা ও পাওনা টাকা সময়মত না পাওয়া। এর উপর আছে পরস্পরের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা।

তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের কর্মীদের আধুনিক ট্রেড-ইউনিয়নগুলি।

ট্রেড-ইউনিয়নের প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই বলতে হয়, শ্রমিক সংস্থা তখনি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় যখন সেখানে রাজনীতি ঢুকে পড়ে। শ্রমিক সংস্থার উদ্দেশ্য শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা—কিন্তু ওঁরা অতি উৎসাহে ভুলে যান প্রতিষ্ঠানটি উঠে গেলে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা হয় কি না।

আগেই বলেছি, একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্ভর করে ১ সুষ্ঠু পরিচালনা, ২ মুদ্রণের কাজ যোগাড় করা, ৩ প্রয়োজনীয় মূলধন, ৪ কাঁচামাল সংগ্রহ, ৫ মুদ্রণ-যন্ত্র, ৬ কর্মীদের দক্ষতা এবং ৭ সময়মত ক্রেতার জিনিস ডেলিভারি দেওয়া। এর যে কোন একটার অভাব হলে প্রতিষ্ঠানটি অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মীগণের সংস্থা প্রায় সময়েই কর্মীদের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করে যাতে তাঁরা মনে করেন প্রতিষ্ঠানের সব কিছু লাভের মূলেই কর্মীগণ। এর ফল শুভ হয় না। স্পর্শকাতর বাঙালী মালিকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে তাই মোটেই বিলম্ব হয় না। ফলে, মালিক কর্মচারী দুজনকেই পথকে সম্বল করতে হয়, দু-দিন আগে আর পরে। এই কর্মীসংস্থাগুলি যদি কর্মীদের স্বার্থ দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার দায়িত্বের কথাটাও মনে রাখত তবে এখানে হয়ত একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারত।

অবশ্য সব মালিকরাই যে 'ধোয়া তুলসীপাতা', তা আমি বলছি না। তবে একটা মুদ্রণ সংস্থার সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত থেকে আমি দেখেছি এক একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের এক এক ধরনের সমস্যা। কোনও বাঁধাধরা পথে তাদের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের সমস্যাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে।

এবার লক্ষ্য করার বিষয় হল, মুদ্রণশিল্প সম্পর্কে সরকারের ভূমিকা। মুদ্রকেরা বিশ্বাস করে, শ্রমিক এবং মালিক দু-পক্ষেরই স্বার্থরক্ষা না হলে মুদ্রণশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে, এর জন্য চাই প্রস্তুতি, চাই অনুকূল পরিবেশ। এবং এর ব্যতিক্রম হলেই নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন, একদিন মুদ্রণশিল্পের উপর চেপে বসল ন্যূনতম বেতনের আইন। এর সঙ্গে ন্যূনতম উৎপাদনের কোন যোগ রইল না। কাজের সময় যেটা ধার্য করা হল, তাতেও রইল বিতর্কের অবকাশ। সে যাই হোক, এর জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না মুদ্রকদের। সাধারণতঃ, মূল বেতনের ভাগটাই ছিল বেশী, দুর্মূল্য ভাতার দিকটা ছিল কম। ন্যূনতম বেতনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মূল বেতনের হার ছাড়িয়ে দুর্মূল্য ভাতা উঠে গেল অনেক বেশী উপরে। এ ব্যবস্থার ফলে "ঠাকুরমার ঝুলির বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির"—কথাটাই ফলে গেল। দুর্মূল্য ভাতা আর মূল বেতন দুটোকে জুড়ে মোট বেতন ধরে নিলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কর্মীদের বেতন বেশ বেড়ে গেল। কারণ শিক্ষানবিসদের বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণী কারিগরদের স্বীকৃতি না দিলে মুড়ি-মুড়কি এক দর হয়ে যায়।

এরপর এল প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্রাচ্যুইটি স্কীম। এ দুটো স্কীম মুদ্রকদের উপর নতুন করে আর্থিক চাপের সৃষ্টি করলেও কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে মুদ্রকেরা এটা মেনে নিতে কোন আপত্তি তোলেনি। তবে গ্রাচুইটি স্কীমের আওতায় পূর্ববর্তী বছরগুলিকে ধরায় মুদ্রক সম্প্রদায় অত্যন্ত বিপাকে পড়ে। এই গ্রাচুইটি নীতি ১৯৭২ সালে বলবৎ হয়। এই নীতির ফলে তিরিশ বছর আগে যে মুদ্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাকে তার কর্মীদের মাথা-পিছু বছরে ১৫ দিনের মাইনে হিসেবে গ্রাচ্যুইটি দিতে হবে। আর তাও তাঁরা অবসর নেবার সময় যে হারে মাইনে নেবেন সেই হারে। কোন প্রকারেই এ নীতির যৌক্তিকতা স্বীকার করা যায় না।

মুদ্রকেরা ছাপার মূল্যায়ন করে থাকেন কাঁচামালের দরের উপর, কাজটির জন্য শ্রমিকের কতটা সময়ের প্রয়োজন হয় তার উপর এবং অফিস প্রভৃতির খরচের উপর। ভবিষ্যৎ গ্রাচুইটির কথা তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবেননি। তখনকার লাভের উপর তাঁরা ইনকাম-ট্যাক্স দিয়েছেন, নিজেদের খরচা মিটিয়েছেন এবং মুদ্রণালয়টিকে বড় করতে লগ্নীও করেছেন। আজকে এই

অভাবনীয় আর্থিক চাপ তাঁদের কোথায় নিয়ে যাবে সে কথা কেউ ভাবেননি।

এরপর বিশজনের বেশী কর্মী থাকলেই মুদ্রণালয় পড়ে যায় স্টেট্ ইন্সিওরেন্স, প্রভিডেণ্ট ফান্ড আর গ্রাচ্যুইটির আওতায়। আর পঞ্চাশ জনের বেশী কর্মী হলেই বাড়ীভাড়ার আইনটিও চেপে বসে।

এদিকে সেল্স্-ট্যাক্স, ইনকাম-ট্যাক্স, প্রভিডেণ্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, ফ্যাক্টরীর নিয়ম-কানুন, খাতাপত্র সামলাতেই দু-তিনজন লোককে প্রায় সারাক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকতে হয়। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটা একটা বিশেষ সমস্যা। একটা জিনিস এ থেকে খুব পরিষ্কার বোঝা যায় যে ছোট থেকে বড় হবার বাধা পদে পদে। কিন্তু যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একইভাবে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। ব্যবসার একটা মূল নীতি হল, 'হয় বড় হও অথবা উঠে যাও।" একই অবস্থায় ব্যবসা কখনও স্থিতিশীল হয় না। একটু চোখ খুলে দেখলেই এর সত্যতা যাচাই করা যায়। ফলে ছোট থাকবার চেষ্টা করে অনেক মুদ্রণালয় অংকুরেই শেষ হয়ে গেছে। আর কেউ কেউ ঠিকে লোক দিয়ে কাজ করাতে গিয়ে আরও বিপদে পড়েছেন। এর কারণটা আরও একটু খুলে বলি। মুদ্রণালয়ের বয়স যত বাড়ে, খরচাও তত বেড়ে যায়। বছরের পর বছর কর্মীদের বেতন বেড়ে যায়, অভিজ্ঞতাও হয়ত বাড়ে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষমতা যে কমে যায়, সেটাতো অস্বীকার করা যায় না। এদিকে মুদ্রণ যন্ত্রটিও বছরের পর বছর বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে চলে। তার দেবার ক্ষমতাও কমে যায়। একদিন তাকে পাল্টাতে হয়। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফল চিন্তা করেই প্রতিষ্ঠানের খরচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনে নতুন মুদ্রণ যন্ত্র আমদানী করতে হয়।

এবার আসি স্টেট ইনসিওরেন্সের কথায়।

নিজেদের কিছু আর্থিক চাপ এলেও কর্মীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্যে মুদ্রকেরা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ এ কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুদ্রকদের নিজের খরচেই করতে হত।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় রোগ নিরাময়ের চেয়ে কর্মীরা প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে স্টেট-ইনসিওরেন্স থেকে ছুটি পাওয়ার সুযোগটাই নিয়ে থাকেন বেশী। অন্যদিকে চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁদের অভিযোগের অন্ত নেই। এ দুটি বিষয়েই সরকারের দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন।

এবার আর একটা কথাও না বলে পারছি না। আমাদের শ্রম নীতিরও কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন বোধ হয় এসে গেছে। এ সমস্যা শুধু মুদ্রণ শিল্পেই নয়, অপরাপর সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এর প্রয়োজন।

উৎপাদন বাড়ানো তো দূরের কথা ন্যূনতম উৎপাদনের জন্যেও দরকার নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু তার পরিবেশ কোথায়? ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত না হলে যেমন কর্মীদের উৎসাহ নষ্ট হয়, তেমনি মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারের বিধানও থাকা দরকার। ইনসেনটিভ ছাড়া যেমন ভাল কাজ হয় না শাসন ছাড়া তেমনি নিয়মানুবর্তিতাও থাকে না। যেখানে একজন কর্মী এক মাসের নোটিশে চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে সেখানে মালিকপক্ষকেও অনুরূপ কিছু সুবিধা দেওয়া দরকার। এর ফল খারাপ হবে না। শিল্প বাঁচবে, আর তার ফলেই সুযোগ আসবে নতুন কর্ম-সংস্থানের।

এবার আসি আরও কয়েকটি মূল সমস্যায়। মুদ্রকের পাওনা টাকা দিতে অনেকেই অযথা বিলম্ব করেন। অনেকে দেবার প্রয়োজনটুকুও মনে করেন না। এদিকে কাঁচামাল কাগজ, কালি, দস্তার পাত, সীসা, তামার পাত, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম প্রভৃতি ছাপার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনতে হয় নগদ দামে। তারপর আবার সরকারী আমদানী নীতির দরুণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম আমদানী হয়। ভাবতে আজকাল বেশ কিছু জিনিস তৈরি হলেও অনেক সময় তার মানের বিচার না করেই আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশী অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জিনিসের দামও হয়ে যায় বিদেশী জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী—সে মুদ্রণ-যন্ত্রই হোক আর কাগজ কালি, বা মেটাল প্রভৃতিই হোক। তারপর প্রয়োজনের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন কম বলে অনেক রকমের খেলাই চলে কাঁচামালের বাজারে। এর ওপর আছে যখন-তখন দাম বাড়ানো। মুদ্রকদের একটু আগে এ খবরটাও জানানো হয় না। এর ফলে মুদ্রকদের তাদের পূর্বচুক্তির উপর প্রতিবারেই ভর্তুকি দিতে হয়। আবার মুদ্রণ যন্ত্র, দেশী বিদেশী যাই হোক না কেন, তার আকাশ-ছোঁয়া দামের দরুণ নতুন মেশিন কেনা প্রায় সব মুদ্রকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রকদের পুরনো মেশিনের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মেশিন মেরামত করার কারিগর পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। এত বড় একটা মুদ্রণশিল্পে গোনা-গুণ্তি কয়েকটি মাত্র কারিগর আছে। মেরামতির বিল বেশ ভারি হলেও সময়মত তাদের পাওয়া যায় না। অচল মুদ্রণ-যন্ত্রটি পড়ে থাকে দিনের পর দিন, কখনো

কখনো মাসের পর মাস। কর্মীদের মাইনে গুনতে হয় মুদ্রককে। এ সমস্যার হাত থেকে ছোট বড় কোন মুদ্রকই রেহাই পায় না।

এখানে একটি প্রিন্টিং স্কুল আছে। সেখানকার ছেলেরা মোটামুটি পুঁথিগত বিদ্যেটাই শিখে আসেন, আসল শিক্ষা শুরু হয় মুদ্রণালয়ে যোগদানের পর। তবু সেখানে যদি মেশিন মেরামতের কাজটা শেখানো হত তবে হয়ত বা কিছুটা সমস্যার সমাধান হত। নবীন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরা যদি এ দিকটায় একটু দৃষ্টি দেন তবে তাঁদের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণশিল্পও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

তারপর বিনা নোটিশে লোড-শেডিং আজকাল আর একটি প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে উঠেছে। সাধারণতঃ ছাপার মেশিন বিদ্যুৎ আসার সঙ্গে সঙ্গেই চালু হয়ে যায়। অবশ্য মেশিন পরিষ্কার করা ও কালির জন্য কিছু খেসারত দিতে হয়। কিন্তু কম্পোজিং মেশিনের গরম সীসা পারেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে লাইনো ও মনো মেশিনের কাজ প্রতিবার অন্ততঃ ঘণ্টা দু-এক করে পিছিয়ে যায়। ওভারটাইমের ব্যারোমিটার বেড়েই চলে, কাজের মনে কাজ পড়ে থাকে। লোকসানের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে মুদ্রক।

মুদ্রণশিল্প নির্ভর করে খদ্দেরের নির্দিষ্ট চাহিদার উপর। এবং তার জন্য পর্যাপ্ত সময় মুদ্রককে দেওয়া হয় না। তাই তাকে থাকতে হয় খদ্দেরের পাশাপাশি। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মুদ্রণালয় শহরের মধ্যেই দেখা যায়।

কলকাতায় হঠাৎ শুরু হল মুদ্রকদের শহর থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা। কেউ বলেন কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য, কেউ বলেন শহরকে দূষিত বাষ্পের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। কেন জানি না, কলকাতার পৌর সংস্থা ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলির হেল্‌থ লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করতে শুরু করলেন। প্রথমে যাঁদের লাইসেন্সের টাকা বাকী পড়েছে তাঁদের, পরে কোথায় গিয়ে থামতেন কে জানে? এর আওতা থেকে খবরের কাগজ, সরকারী মুদ্রণালয়, এমনকি পৌর সংস্থার নিজস্ব মুদ্রণ বিভাগটিও যে রক্ষা পেত না, সে কথা তাঁদের মনে ছিল কিনা জানি না। শুধু এটুকুই জানি, এর ফলে হয়ত একদিন কলকাতার তিরিশ হাজার কর্মীর অধিকাংশকেই পথে বসতে হত। আর দূষিত বায়ুর কথায় এলে বলতে হয় পরিবেশ দূষিত করতে ডিজেল চালিত বাস আর লরির তুলনায় শহরেব মুদ্রণশিল্প তো সমুদ্রে শিশির বিন্দু।

ছাপাখানা একটা অবহেলিত শিল্প হলেও এর শক্তি পৃথিবীর যে কোন শক্তির চেয়ে কম নয়। ছাপাখানা না থাকলে কার্লমার্কসের কথা কেউ জানতেও পারত না। হত না রাশিয়ার বিপ্লব। 'আংকল্‌ টম্‌স কেবিন' ছাপা না হলে, দাসত্ব-প্রথা লোপ পেতে আরও কয়েক শ বছর হয়ত কেটে যেত। স্বাধীনতার যুদ্ধে 'আনন্দমঠে'র দানও কি ভোলবার মত?

আজ দেশকে বাঁচাতে হলে তৈরি করতে হবে মানুষ—আর মানুষ তৈরি করতে হলে সবার আগে দরকার শিক্ষার, দরকার বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইয়ের। মুদ্রণশিল্প হচ্ছে সেই শিক্ষার বাহক।

আজ সারা কলকাতায় ছোট, বড় মিলিয়ে কম বেশী পাঁচ শ ছাপাখানা বাংলা বই ছাপেন। আর্থিক অবস্থার দরুণ আজকাল বই ছাপার মুদ্রণালয় কমে যাচ্ছে। হয়ত আরও যাবে। তবু সকলেই আজ একযোগে চিৎকার করে বলে ওঠেন—"ছাপার দাম কমাতে হবে। বই যেন ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে।" তাঁদের কথার যুক্তি বুঝি, কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পাই না। এ চাওয়াটা মনে হয় যেন "আমার সোনার হরিণ চাই" ধরনের।

সব কিছুর দাম যেখানে আকাশ-ছোঁয়া, সেখানে মুদ্রণের দাম কমানো কি সম্ভব?

গত দশ বছরে মুদ্রণ যন্ত্রের দাম বেড়েছে দুগুণ থেকে চারগুণ। মেটালের দাম বেড়েছে টন প্রতি ছ' হাজার টাকা থেকে বাইশ হাজারের মত। পালিশ করা দস্তার পাতের দাম বেড়েছে আটচল্লিশ টাকা থেকে একশ পঞ্চান্ন টাকা, পালিশ করা তামার পাত একশ পঁয়ষট্টি টাকা থেকে ছয়শ টাকা। কাগজের দামও হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। কালির দাম দ্বিগুণ তো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় তিনগুণ পর্যন্ত বেড়ে গেছে।

মুদ্রণশিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের বেতন শুধু দুর্মূল্য ভাতা হিসাবেই বেড়েছে ৪৭·২০ পয়সা থেকে ১৮৫·৪৪ পয়সা। এরপর কাজের সময় কমাবার জন্যেও শুনছি তোড়জোড় চলছে। তারপর আছে ক্রমবর্ধমান সরকারী করের চাপ। মুদ্রণের দাম কিন্তু এদের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে ওঠেনি।

মুদ্রকেরা পারতপক্ষে দাম বাড়াতে চান না। দাম কমাতে হলে মুদ্রণের উপর করের বোঝা হাল্‌কা করতে হবে। করের বোঝা কমাতে হবে কাঁচামালের উপর। তারপর স্বল্পমূল্যে কাগজ সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে হবে। দরকার হলে সরকারকে এগিয়ে এসে আংশিকভাবে সাহায্য করতে হবে। ব্যাঙ্কগুলিকেও এগিয়ে এসে স্বল্প সুদে টাকা ধার দিতে হবে মুদ্রকদের। আমদানী

নীতিও সর্বক্ষেত্রেই কিছুটা খোলা রাখতে হবে। এর ফলে যেমন স্থানীয় জিনিসপত্রের উৎকর্ষ বজায় থাকবে, তেমনি যখন তখন দাম বাড়ানোর হাত থেকেও এ শিল্প অব্যাহতি পাবে।

সরকারী কয়েকটি সংস্থা আজকাল অনেক শিল্পকেই অর্থ সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু তার নিয়ম-কানুনের জটিলতার দরুণ ছোটখাটো মুদ্রকেরা সাহস করে এগিয়ে যেতে পারেন না। এই অর্থ সাহায্যের পদ্ধতি একটু সহজ ও সরল না করতে পারলে ছোট ছোট মুদ্রকেরা এর সুবিধা থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবেন।

এ সব দিকে দৃষ্টি দিলেই হয়ত আংশিকভাবে কিছুটা দাম কমানো সম্ভব হবে। সর্বক্ষেত্রে দাম না কমলে একটা বিশেষ শিল্পে দাম কমানো সম্ভব নয়।

এই সমস্যা-বহুল মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে বলতে এসে আগে যা বলেছি, তাই আবার বলছি। ছোট বড় সকলের প্রয়োজন মেনে নিয়েই আমাদের সমগ্র মুদ্রণশিল্প। কোন সমস্যাকেই ছোট করে দেখা চলবে না। পুরনো আর নতুনের সহাবস্থানে ভারতের যে বৈশিষ্ট্য, তাকে বজায় রেখেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের চলতে হবে। আর এর মধ্যেই রয়েছে ভারতের অগ্রগতির ইঙ্গিত।

প্রকাশকের কথা

শ্রীশকুমার কুণ্ড

প্রকাশন শিল্প অন্যান্য ব্যবসা থেকে অনেকটাই আলাদা। কেন না, এই ব্যবসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সুতরাং যিনি সৎ প্রকাশক তাঁর শুধুই অর্থোপার্জনের লক্ষ্য থাকলে চলবে না। জাতির জীবন গঠনেও তাঁকে যথাসম্ভব সহায়তা করবার আদর্শ সামনে রেখে কাজ করতে হবে।

বাঙালী প্রকাশকের ব্যবসা বাঙালী পাঠকদের নিয়ে। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চুয়ান্ন কোটি আশি লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীর সংখ্যা চার কোটি তেতাল্লিশ লক্ষের মতো। কিন্তু এর মধ্যে এক বৃহৎ অংশ বাংলাভাষী নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে অনেক বাঙালীর বাস। তাদের গণনা করে ভারতে মোট বাংলাভাষীর সংখ্যা চার কোটি পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশী। ভারতে বাংলাভাষীর সংখ্যা তৃতীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় যথাক্রমে হিন্দী ও তেলুগু। বাংলাদেশকে ধরলে পৃথিবীতে মোট বাঙালীর সংখ্যা নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষের উপরে। পৃথিবীতে বাঙালীর স্থান অষ্টম।

কিন্তু মাথা গুণতিতে সংখ্যাটা বড় হলেও এক ভগ্নাংশের জন্য প্রকাশকরা বই ছাপান। নিরক্ষরতার অভিশাপের জন্য অধিকাংশ বাংলাভাষী বইয়ের রাজ্যের বাইরে অন্ধকার জগতে বাস করে। বিগত লোকগণনায় পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের সংখ্যা ছিল ১,৪৭,১১,৭৩৯ বা মোট জনসংখ্যার ৩৩·২০% মাত্র। মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গের এই সাক্ষররা সবাই যে বাংলাভাষী তা কিন্তু নয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসী অন্য ভাষাভাষীরাও আছে। ভাষা হিসাবে সাক্ষর ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে-সব বাঙালী বসবাস করছে উপরোক্ত হিসাবে তাদের ধরা হয়নি। প্রবাসী বাঙালীদের গণনা করলে হয়ত বাঙালী সাক্ষরদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট সাক্ষরদের সমানই দাঁড়াবে।

এখন এক দশক পরে সাক্ষরের সংখ্যা লাখ পঁচিশেক বাড়তে পারে। তাহলে বলা যায় যে বাঙালী প্রকাশকদের সম্ভাব্য ক্রেতার সংখ্যা প্রায় পৌনে দু'কোটি। তবে সেন্সাসের সংজ্ঞা অনুসারে যারা সাক্ষর তারা সবাই বই পড়তে সক্ষম নয়। কিন্তু বই পড়বার সুযোগ দিয়ে তাদের পাঠক করে তোলা যেতে পারে। তথাপি বাঙালী প্রকাশকের বাজার যে খুব সংকীর্ণ তা বলা যায় না। হাঙ্গারিয়ান, ডাচ, চেক প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা আমাদের সাক্ষরদের চেয়ে অনেক কম। অথচ এই সব ভাষার প্রকাশন কত সমৃদ্ধ। আমরা যে তাদের মানে পৌঁছতে পারছি

না শুধু তা-ই নয়, ঊনবিংশ শতকের অবস্থার তুলনায় আমাদের প্রকাশনশিল্পের অগ্রগতিটা বিশেষ লক্ষণীয় নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লং হিসাব দিয়েছেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩২২টি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং প্রতিটি বইয়ের গড় মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ২০৩৮। তখন শতকরা তিন জন পল্লীবাসী বাঙালী সাক্ষর ছিল। গল্প-উপন্যাস আজকালকার মতো এত বেরুত না। এখন শতকরা ৩%-এর জায়গায় সাক্ষরের হার হয়েছে ৩৩·২০%; শিক্ষার প্রসার ঘটেছে; আর্থিক উন্নতি হয়েছে, বহু লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে। এসব সত্ত্বেও বাংলা টাইটেলের গড় মুদ্রণসংখ্যা বেড়েছে বলে মনে হয় না, অবশ্য স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে।

শুধু টাইটেলের সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে আমরা জীবনের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় প্রকাশনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারছি না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বই বেরিয়েছিল ৯০৯টি। ১৯৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা ১০৩৯। সুতরাং ক্রমোন্নতির প্রমাণ কোথায়? শেষোক্ত হিসাবটি জাতীয় গ্রন্থাগারের। সব বই যে আইন অনুযায়ী সেখানে জমা পড়ে তার নিশ্চয়তা নেই। সংখ্যাটি আরও কিছু বেশী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অন্য একটি সূত্র থেকে আমরা এর যাথার্থ্য বিচার করে দেখতে পারি। সেটা হল বই ছাপার জন্য ব্যবহৃত কাগজের হিসাব। পরে আমরা এই হিসাব নিয়ে আলোচনা করব। তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে চোরাপথে কাগজ অন্যত্র পাচার যদি না হয়ে যায় তবে আরও বেশী বাংলা বই আমাদের পাবার কথা। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে শুধু কাগজের হিসাব দিয়ে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যার সঠিক নির্ধারণ সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নানা ভাষার বই প্রকাশিত হয়, এবং বলা বাহুল্য স্থানীয় কাগজ দিয়েই সে সব বই ছাপা হয়ে থাকে। ১৯৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত বইপত্রের ভাষার বিশ্লেষণ এইরূপ:

ভাষা	বইয়ের সংখ্যা (টাইটেল)
বাংলা	৯৩৯
ইংরেজী	৭২২
নেপালী	১০১
অসমীয়া	৩০
উর্দু	২৬
হিন্দী	২১
পাঞ্জাবী	৫
সংস্কৃত	৫
তামিল	২
গুজরাটী	২
আরবী	১

ঐ বছর আরও একশ' বাংলা বই অন্যান্য রাজ্যে ছাপা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে মোট বই ছাপা হয়েছিল ১,৮৫৪টি। সুতরাং আমাদের পুস্তক উৎপাদনের যে সামর্থ্য আছে তার প্রায় অর্ধেক মাত্র বাংলা বই প্রকাশের জন্য নিয়োজিত করা হয়।

বাংলা প্রকাশনার আশানুরূপ উন্নতি না হবার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এদের মধ্যে প্রধান হল ইংরেজীর আধিপত্য। স্বাধীনতার এত দিন পরেও বাংলা দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজকর্মের ভাষা হয়ে উঠতে পারল না, যেমন জাপানী ভাষা হয়েছে জাপানে। আমাদের জীবনে ইংরেজী বইয়ের যেমন প্রভাব, বইয়ের বাজারেও তেমনি ইংরেজী বইয়ের আধিপত্য। দেশে উন্নয়নমূলক যত কাজ চলছে তাতে সহায়ক ইংরেজী বইপত্র, বাংলার স্থান সেখানে নেই বললেই চলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত বইপত্রের আমদানী স্বাধীনতার পর থেকে কেবলই বেড়ে চলেছে। সাধারণ পাঠক, লাইব্রেরি ও সরকারের বই কেনার বরাদ্দ টাকার সিংহভাগ জোটে ইংরেজী বইয়ের ভাগ্যে, বাংলা পায় ছিটেফোঁটা। এই কারণে বাংলা বইয়ের চাহিদা ও বিক্রি কম। যার ফলে প্রকাশনের কোনো বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করতে প্রকাশকের ভরসা হয় না।

শুধু শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দিলে অথবা সরকারী দপ্তরে বাংলায় নোট লিখলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে না। বাংলায় যাতে সকল বিষয়ের বই প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা আজও হল না। যতদিন আমরা একমাত্র বাংলা বইয়ের উপর নির্ভর করে শিক্ষালাভ, চিত্তবিনোদন ও জীবিকার্জন করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত বাংলা প্রকাশনশিল্পের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নয়। বর্তমানে উন্নতিশীল জাতির পক্ষে যে সব শ্রেণীর বই দরকার তা হল মোটামুটি এই: বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক; বৃত্তিমূলক বই; চিত্তবিনোদনের বই এবং নানাবিষয়ক প্রবন্ধপুস্তক।

এদের মধ্যে নাটক, গল্প-উপন্যাস, রম্যরচনা, কবিতা ইত্যাদি জাতীয় চিত্তবিনোদনের গ্রন্থই অনেক প্রকাশকের প্রধান অবলম্বন। উপন্যাসের বাজার সবচেয়ে ভাল। নামকরা লেখক হলে বিক্রি হয় অনেক কপি। সরকারী অর্থ সাহায্যপুষ্ট গ্রন্থাগার উপন্যাসের বড় পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত লেখকের উপন্যাস প্রকাশ করতে প্রকাশকরা স্বভাবতঃই অগ্রহান্বিত। এই শ্রেণীর, অর্থাৎ চিত্তবিনোদনের বই সম্বন্ধে আমাদের আপাততঃ কিছু না করলেও চলে।

পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশ সরকার নিজের হাতে অনেকটাই তুলে নিয়েছেন এবং হয়ত ক্রমশঃ সবটাই নেবেন। সাধারণ প্রকাশকরা এর ফলে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের মান যে খুব উন্নত হয়েছে তা বলা যায় না। তাছাড়া সরকারী প্রশাসনযন্ত্র যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে দিতেও পারছে না। পুস্তক-পর্ষদও উচ্চতর শ্রেণীর উপযোগী বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে। এ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কোটি টাকা মূলধন হিসাবে দিয়েছেন।

একমাত্র পাঠ্যস্তরে মূল পাঠতব্য গ্রন্থাদি প্রকাশনার জন্য কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কাগজ সুলভ মূল্যে দিয়ে আসছেন তার মূল্যায়ন করলেই সাম্প্রতিক প্রকাশনাশিল্পের অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছর পাঁচ থেকে ছয় হাজার টন কাগজ অপেক্ষাকৃত কম দামে মিল থেকে সংগ্রহ করে নেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন স্থানীয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের। শিক্ষাবিভাগের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এই সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গের কাগজ কলগুলিই প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ১৫/১৬ হাজার টন কাগজ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করে থাকে। এই হিসাব থেকে দেখা যায় শুধু পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকরা সুবিধা দরে ছয় লক্ষ নব্বই হাজার রীম কাগজ পায়। এই কাগজের দাম প্রায় চার কোটি টাকার মতো। এর উপর আছে ছাপা, বাঁধাই ও অন্যান্য খরচা। যদি প্রতিটি বই গড়ে দশ ফর্মার হয় এবং প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার কপি ছাপা হয় তাহলে উপরোক্ত পরিমাণ কাগজ দিয়ে (ঝড়তি-পড়তি ২½% বাদ দিয়ে) প্রায় ১৩,৪০০টি বই হবে। কাগজ ছাড়া অন্যান্য খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় চার কোটি টাকা। মোট আট কোটি প্রকাশন ব্যয় হলে বইয়ের সম্মুখ মূল্য অন্ততঃ আড়াই গুণ (সুলভে কাগজ পাবার জন্য), অর্থাৎ কুড়ি কোটি টাকা হবে। পাঠ্যপুস্তকের নিয়োজিত অর্থ কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসে বলে বাঙালী প্রকাশকদের অধিকাংশই এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত। একটি কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে উপরে আমরা পাঠ্যপুস্তকের যে হিসাব দিয়েছি তা সবই বাংলা বইয়ের নয়। কারণ সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে ইংরেজী, হিন্দী, নেপালী, উর্দু, সাঁওতালী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার পাঠ্যপুস্তকও ছাপা হয়। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া নব-সাক্ষরদের জন্য নানা রকম বইও এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যেতে পারে।

আমাদের বৃত্তিমূলক বইয়ের দৈন্য বিশেষ বেদনাদায়ক। জীবিকার্জনের সহায়ক এবং জাতি-গঠনমূলক বই বাংলায় প্রায় নেই বলা যায়। প্রকাশনাশিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জাতির উন্নতি প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

যে কোনো সাহিত্যের মেরুদণ্ড হল প্রবন্ধ পুস্তক। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সেই বিভাগটিও দুর্বল। সরকার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু নানা বিষয়ে প্রবন্ধের বই ছাপায় তাঁদের আগ্রহের অভাব। বিদ্যালয়ে নিচের শ্রেণীতে যারা শুধু বাংলায় পড়াশুনা করবে তারা স্কুলের বাইরে এসে উপযুক্ত বাংলা বই পড়বার সুযোগ না পেয়ে চর্চার অভাবে নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে যায়।

সব শ্রেণীর বই-ই বিভিন্ন মানের হওয়া দরকার। অর্থাৎ, নব-সাক্ষর, বিদ্যালয়ের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণী, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে লেখা না হলে সমাজের সকল স্তরে বই সমাদৃত হবার আশা নেই। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় শিশু-সাহিত্যের কথা। শিশুদের বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারলেই ভবিষ্যতের পাঠক পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। শিশুদের মন জয় করতে হলে চিত্তাকর্ষক রচনাভঙ্গি, মুদ্রণ-সৌকর্য এবং বিষয়ানুগ ছবির সংযোজন আবশ্যক।

সকল বিবেকী বাঙালী প্রকাশকই সচেতন যে বাংলা বইয়ের ছাপা, ছবি, বাঁধাই এবং পাঠ্য-বস্তুর মান বিদেশী বইয়ের মতো নয়। প্রকাশকরা এ সম্বন্ধে অবহিত হয়েও প্রতিকার করতে অপারগ। অবশ্য কিছু কিছু যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে বাংলা বইয়ের মান উন্নয়নের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কিন্তু বাংলা বইয়ের বাজার সংকীর্ণ বলে প্রকাশকের আয় কম এবং তাই প্রকাশকের দ্বিধা হয় মান উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। যুক্তিকুশলী সম্পাদক, অনুবাদক, চিত্রকর, প্রভৃতি যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ বর্তমান অবস্থায় শুধু এই কাজ করে জীবিকা-নির্বাহ করা কঠিন। লেখাকে জীবিকা করাও কম লোকের পক্ষেই সম্ভব। অনেকের নিকটই এটা

উপরি উপার্জন; তাই উৎকর্ষের জন্য যে নিষ্ঠা ও সাধনা প্রয়োজন তার অভাব ঘটে।

এমন কি, প্রকাশকরাও শুধু প্রকাশনের কাজ নিয়ে থাকে না। কারণ খুব কম প্রকাশকেরই যথেষ্ট সংখ্যক বই (টাইটেল) আছে যার উপর নির্ভর করে চলতে পারে। সুতরাং বই বিক্রির কাজও করতে হয়। শুধু নিজের বই নয়, কেবল বাংলা বইও নয়, ইংরেজী বাংলা যে কোনো বই বিক্রি করে। বাংলা বইয়ের চাহিদা কম হওয়ায় প্রকাশক প্রকাশনার মান উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারে না। তা যদি না পারে তাহলে দক্ষতা অর্জন করবে কি উপায়ে?

এখন বাংলা বইয়ের যে অবস্থা তাতে আমরা জীবনের সকল স্তরে বাংলা বইয়ের সাহায্যে চলবার কল্পনাও করতে পারি না। এই অবস্থার অবসান না ঘটলে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে জাতীয় জীবনে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসেন তবেই প্রকাশনাশিল্পের পূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হবে। এ কাজে প্রকাশকদের নিশ্চয়ই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ কাজে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কিছু বাংলা বই প্রকাশ করেছেন। বই কেনার জন্য লাইব্রেরিগুলিকে কিছু অনুদানও দেওয়া হয়। সরকারী প্রকাশন ব্যবসায়ের রীতিনীতি অনুযায়ী হয় না। সুতরাং দেশের প্রকাশন-শিল্প উন্নয়নে প্রেরণা যোগাতে পারে না সরকারী প্রকাশনার একান্ত সীমিত উদ্যোগ।

সরকার কত ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবার জন্য কমিটি গঠন করেন। অথচ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্পের জন্য কোনো তথ্যানুসন্ধানী কমিটি আজ পর্যন্ত হয়নি। বাংলা প্রকাশনশিল্পের কি কি দুর্বলতা, কোন উপায়ে সে সব দুর্বলতা দূর করা যায় সে বিষয়ে কমিটির সমীক্ষা প্রকাশনশিল্প বিকাশের পক্ষে সহায়ক হবে। ব্যবসার প্রধান কথা মূলধন। বর্তমানে পঁচিশ থেকে ত্রিশ কোটি টাকা নিয়ে প্রকাশকদের কারবার। আমরা যদি সত্যি বাংলাকে জীবনের ভাষা হিসাবে মর্যাদা দিতে চাই তাহলে জাপানের পুস্তক প্রকাশের মানে পৌঁছতে হবে। তার অর্থ হল বর্তমানে যত বাংলা বই বের হয় তার চেয়ে আট থেকে দশ গুণ বেশী বই বের করতে হবে। এর অর্থ আট-দশ গুণ বেশী মূলধন, কাগজ, লেখক, চিত্রশিল্পী, ছাপাখানা, দপ্তরী প্রভৃতি। প্রথম বাধা মূলধন। কোথায় পাওয়া যাবে! সরকার প্রকাশনকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসাবে ঘোষণা করলে ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে ঋণ পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে—যেমন কাগজ, কালি, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি—সকল প্রকার কর থেকে রেহাই দেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ কমিটি এসব বিষয় খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দিলে সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা ছাড়া এদিকে সরকারের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। অথচ বাংলা প্রকাশনশিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা আছে। সবচেয়ে বড় কথা বিকাশ লাভ করলে এই শিল্প বহু উচ্চ ও মধ্য শিক্ষিত ব্যক্তির এবং নানাবিধ কারিগরের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

সরকার এগিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা বসে থাকতে পারি না। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। এগিয়ে যাবার পথে অন্তরায় উদ্যমশীল দক্ষ প্রকাশকের। দক্ষতা অর্জনের জন্য একদিকে যেমন হাতে-কলমে কাজ করা দরকার তেমনি অন্যদিকে প্রকাশনশিল্পের তত্ত্বগত জ্ঞানও প্রয়োজন। এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলার বাইরে এরূপ শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদিকে দৃষ্টি দিলে প্রকাশনশিল্প উপকৃত হবে।

কিন্তু ব্যষ্টির দক্ষতা কিছু দূর নিয়ে যেতে পারে মাত্র। আরও অগ্রসর হতে হলে সমষ্টিগত উদ্যোগ চাই। প্রকাশকদের সমিতি থাকলেও তার মধ্যে দৃঢ় সংহতিবোধের অভাব। বর্তমানে সংহতিই যে শক্তি সে উপলব্ধি এখনও বাঙালী প্রকাশকদের মধ্যে তেমন পরিস্ফুট হয়নি। আমরা মিলিতভাবে ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণ করতে পারি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্র নির্বাচন করে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারে। তাতে দ্বন্দ্বের আশঙ্কা থাকে না এবং শক্তিরও অনাবশ্যক অপচয় ঘটে না।

জনকল্যাণের কথা মনে রেখে প্রকাশকদের কাজ করতে হবে। দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির আঘাতটা সবচেয়ে বেশী লাগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য তারা বই কেনা কমিয়ে দিচ্ছে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বাংলা বইয়ের পৃষ্ঠপোষক। জীবিকার্জনের সহায়ক বলে ইংরেজী বই তো কিনতেই হয়। বাদ পড়ে অবসর বিনোদনের বাংলা বই। সস্তায় পেপার ব্যাক প্রকাশের ব্যবস্থা করে এই সমস্যার হয়ত কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। সু-সম্পাদিত পুরনো বাংলা বইও অপেক্ষাকৃত সস্তায় দেওয়া যেতে পারে। নব-সাক্ষরদের জন্য উপযুক্ত বই ছেপে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করাও প্রকাশকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাংলায় সু-সংকলিত রেফারেন্স বইয়ের চাহিদা আছে। প্রতিদিনই এ ধরনের বই প্রয়োজন। ধীরে ধীরে হলেও শেষ পর্যন্ত বিক্রি হবে। শিশুসাহিত্যের জন্য অনেক কিছু করবার আছে। সুপরিকল্পিতভাবে বিদেশী বইয়ের অনুবাদ

করলে পাঠকের মনের দিগন্ত প্রসারিত হবে। এখানে কয়েকটি ক্ষেত্রের সম্ভাবনার কথা শুধু উল্লেখ করা হল। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে, পাঠকের সম্ভাব্য চাহিদা অনুমান করে প্রকাশন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। প্রকাশককে মনে রাখতে হবে অদূর ভবিষ্যতে 'লেখাপড়ার' চেয়ে 'দেখাশোনাই' হয়ত শিক্ষার বড় মাধ্যম হয়ে উঠবে। তাই বিষয়বস্তুতে, রচনাশৈলীতে ও অঙ্গ-সজ্জায় প্রতিটি বই যাতে মনোরঞ্জক হয়ে উঠতে পারে প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ দেশে সেদিন আসতে এখনও দেরী আছে। আপাততঃ বাংলা বইয়ের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের এদিকটা অত্যন্ত দুর্বল। বাংলা বইয়ের বাজার মূলতঃ কলিকাতা-নির্ভর। তাও আবার একটি সীমিত এলাকায় বইয়ের ব্যবসা সীমাবদ্ধ বলা চলে। কলকাতারও বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেশুনে বই কেনার সুযোগ নেই। কয়েক বছর যাবৎ যে বই মেলা বসছে তারও মূল লক্ষ্য কলকাতার পাঠক। অথচ কলকাতায় এমন একটি বড় দোকান নেই যেখানে গেলে সব প্রকাশকের উল্লেখযোগ্য বইগুলিও পাওয়া যেতে পারে। পাঠককে যদি ঘোরাঘুরি করতে হয় তবে তার বই কেনার আগ্রহ হ্রাস পায়।

এ ছাড়া মফঃস্বলে এক বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠী রয়েছে যারা ইচ্ছা করলেও বই কিনতে পারে না। প্রধান বাধা অত্যধিক ডাকমাসুল; সাধারণ ডাকে বই পেঁছানো আজকাল অনিশ্চিত। রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে গেলে অনেক সময় বইয়ের দামের চেয়ে মাসুল পড়ে বেশী।

ক্রেতার সঙ্গে বইয়ের সহজ যোগাযোগ করে দেবার দায়িত্ব প্রকাশকের। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এটা ব্যয়সাপেক্ষ। যৌথ উদ্যোগে প্রকাশক সমিতি এ কাজটা করতে পারেন। কলকাতায় কি একটি বাংলা বইয়ের গ্যালারি স্থাপন একেবারেই অসম্ভব? জেলা শহরে সমিতির ব্যবস্থাপনায় সব প্রকাশকের বইয়ের ডিপো খোলা যায়। গ্রামাঞ্চলের স্টেশনারি দোকানে বই রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রবাসী বাঙালীদের কথা ভুললে চলবে না। তাঁদের শিক্ষা ও আর্থিক সাচ্ছল্য তুলনায় বেশী। দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে বাংলা বই বিক্রয়ের লাভবান কেন্দ্র হতে পারে।

পাঠকের সঙ্গে প্রকাশকের যোগাযোগের আর একটি উপায় হল নব-প্রকাশিত বইয়ের খবর পেঁছে দেওয়া। এখানেও প্রকাশক সমিতির অনেক কিছু করবার আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রকাশক সমিতি গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করে এবং প্রকাশনশিল্প বিষয়ক সাময়িকপত্রে নব-প্রকাশিত বই এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের খবর প্রচার করেন। আমাদের নির্ভর করতে হয় কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার উপরে, তা ব্যয়বহুল এবং ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। সিগনেট প্রেসের মতো প্রচার পুস্তিকা নিয়মিত সম্ভাব্য ক্রেতাদের পাঠালে তাদের মনে বই সম্বন্ধে আগ্রহ জেগে উঠবে।

বাংলা বইয়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজী বই। ইংরেজী বই থেকে মন ফেরাতে হলে জাতীয় জীবনে বাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রকাশকদেরও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিষ্ঠা, সততা ও উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে হবে পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা রচনায় এবং তা কার্যে পরিণত করায়।

হরফ নির্মান ও বিপনন

শঙ্কর রুদ্র

আমাদের মুদ্রণশিল্পে বাংলা টাইপের যে প্রধান ভূমিকা আছে তা বলাই বাহুল্য। তবুও অনেকেই হয়ত জানেন না বাংলা টাইপের সঙ্গে জড়িয়ে যে শিল্প, তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওই সব সমস্যার ভিতরে দৃষ্টি দেবার আগে টাইপ বা হরফ নির্মাণে পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার।

শুরুতে শিল্পী কাগজে-কলমে অক্ষর বা হরফের রূপ দেন, তারপর কারিগর বা খোদাইকার তাকে ইস্পাতের ছেনীতে যাবজ্জীবন বন্দী করেন। তামা বা পিতলের বুকে তারই আবার রূপ-লেখা হয় ওই কঠিন ছেনী ঠুকে 'পাঞ্চ' করে। পাঞ্চ করা (রূপান্তরিত) এই হরফের তামা বা ম্যাট্রিক্স অতঃপর ঢালাই মেশিনে চলে যায় নির্দিষ্ট মাপের মোল্ড বা ডাইসে সংযুক্ত হতে। সেখানে মেশিনের গলিত তরল ধাতু এসে সেই ছাঁচকে এক পূর্ণ অবয়ব দেয়। ঠাণ্ডা হবার পর ঘষা-মাজার পালা চলে। অবশেষে তাকে যখন ঘরে তোলা হয়, তখন সে ঝকঝকে চকচকে নিটোল নিখুঁত একটি হরফ বা টাইপ।

কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ কাজ আদৌ সহজ নয় এবং কাজটা দ্রুত সম্পন্নও করা যায় না। এদেশে এই টাইপ নির্মাণ পদ্ধতি এখনও বেশ জটিল, ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়সাপেক্ষও বটে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে এখনও যে আমরা নির্মাণ পদ্ধতিতে পিছিয়ে আছি, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। দেশ পিছিয়ে আছে হরফশিল্পেও। আর এই পিছিয়ে থাকারও পিছনে যে কারণগুলি নিহিত, সেগুলিকে হরফশিল্পের সমস্যা বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এখন পর্যায়ক্রমে এইসব সমস্যার দিকে নজর দেওয়া যাক।

টাইপ ফাউণ্ড্রির জন্য একজন শিল্পী পছন্দমাফিক হরফ বা টাইপের ছাঁদ (ডিজাইন) এঁকে দেবেন। কিন্তু প্রথম কথা তেমন হরফ শিল্পী ইদানীংকালে খুব কমই দেখা যায়। আর দেখা গেলেও তাঁরা আগেকার শিল্পীদের মতন নিখুঁত ছাঁদ অঙ্কনে পটু নন। হরফের ছাঁদ পেয়ে যে কারিগর ইস্পাতের ছেনীতে তা খোদাই করবেন, তেমন সুদক্ষ কারিগরও আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত খ্যাতি ছিল শর্বরীভূষণ কর্মকারের, যিনি বর্তমানের অনেক শ্রীময় বাংলা টাইপের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর মৃত্যুর পর তেমন নামও অন্য কারোর শোনা যায় না, হয়ত এই হরফশিল্পে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয় জেনেই অনেকে অন্যান্য শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন। হরফ নির্মাণের এই সূক্ষ্ম কাজে একজন কারিগর হরফ পিছু বর্তমানে ৪৫/৫০ টাকার

মতো নিয়ে থাকেন। বাংলা হরফ নির্মাণের আদিপুরুষ পঞ্চানন কর্মকার একটি হরফ তৈরি করতে নিতেন প্রায় পাঁচ সিকি।

ইংরেজী বর্ণমালার তুলনায় বাংলায় অনেক বেশী অক্ষর। টাইপ ফাউন্ড্রির হিসাবে তা দাঁড়ায় প্রায় পাঁচশ'র মতো। বাংলা বর্ণলিপি অনুযায়ী অসংখ্য যুক্তাক্ষর এবং দুই পাশের ও মাঝের া-কার, ি-কার, ী-কার, ে-কার, ৈ-কার ইত্যাদি বহু বর্ণ বাংলা টাইপকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। বাংলা বানান সংস্কারের দ্বারা এই ভার অনেকটা লাঘব করা যায়। বাংলা হরফের লিপি-বৈচিত্র্য এমনই যে, তাকে ইস্পাতের ফলায় রূপ দেওয়া অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন কাজ। এতে অসাধারণ কারিগরি দক্ষতা লাগে। সব রকম অক্ষর নিয়ে বাংলা হরফের যে ফাউন্ট বা সাট হয়, তা নির্মাণে একজন কারিগরের লাগে প্রায় এক বছর সময়। খুব দক্ষ হলেও দিনে দুটির বেশী ছেনী নির্মাণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই স্টীল ছেনীকে মরচে ধরার হাত থেকে রক্ষার জন্য নারকেল তেলে ডুবিয়ে রাখা হয়।

এখন ম্যাট্রিক্স নির্মাণ প্রসঙ্গে আসা যাক, যাতে হরফের ছাঁচ থাকে। তামার মান নিখুঁত না হলে অল্প সময়ের মধ্যে হরফের ফেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন আবার নতুন করে ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে হয়। সব ম্যাট্রিক্সই মোটামুটি পাঁচশ কিলোগ্রাম টাইপ ঢালার পর নিয়মমাফিক বদলে নতুন করে বানাতে হয়। সে পদ্ধতি ব্যাটারির সাহায্যে ইলেকট্রোপ্লেটিং-এ হয়। অনেকে আবার এই পদ্ধতিতে অন্যের ডিজাইনের টাইপ হুবহু নকল করে নেয় নতুন ম্যাট্রিক্সে তার ছাঁচ তুলে, যদিও কিছু কিছু টাইপ পেটেন্ট রাইটের অধিকারভুক্ত। ছেনী পাঞ্চের মতো গঠনসৌকর্য ইলেকট্রো-প্লেটিং-এ সম্ভব নয়।

২

এবার টাইপ উৎপাদন এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যার দিকে তাকানো যেতে পারে। পশ্চিম-বঙ্গে ছোট ছোট ঢালাইকার সমেত প্রায় চল্লিশটি টাইপ ফাউন্ড্রি আছে, যার সম্মিলিত মূলধন হবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঊর্ধে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই হ্যান্ডকাস্টিং বা হাতে ঢালাইয়ের মেশিন আছে। খুব অল্প সংখ্যকেরই অটোমেটিক সুপারকাস্টার বা মনোকাস্টার ধরনের বিদ্যুৎ চালিত আধুনিক মেশিন আছে। হ্যান্ডকাস্টিং মেশিনগুলি সাধারণতঃ কয়লা বা গ্যাসে চলে। ওই সব মেশিনে উৎপাদন যেমন ধীর গতিতে হয়, তেমনই টাইপও কিছুটা অপরিচ্ছন্ন থাকে। আর অটোমেটিক মেশিনে উৎপাদন দ্রুত এবং টাইপও নিখুঁত অবস্থায় তৈরি হয়। তাই ওই মেশিনকে ফিনিশ মেশিনও বলে। অপরিচ্ছন্ন টাইপের ত্রুটি দূর করতে ভাঙা-ঘষা-র‍্যাঁদা করার প্রয়োজন এবং এ কাজের জন্য লোক চাই। ফিনিশ মেশিনে তার দরকার হয় না। টমসন, কুস্টার-মান প্রভৃতি অটোমেটিক মেশিনের জন্য সাধারণ এই ম্যাট্রিক্সই যথেষ্ট। কিন্তু মনোকাস্টারের ম্যাট্রিক্স স্বতন্ত্র ধরনের হওয়ায় এতদিন বিদেশ থেকে আমদানী করা হত। সম্প্রতি এদেশে পুনেতে তা নির্মিত হচ্ছে।

টাইপ উৎপাদনের মূল উপাদান হল টাইপ মেটাল, যাতে আছে সীসা, টিন এবং অ্যান্টিমনির অ্যালয় (সংকর ধাতু)। এই অ্যালয়ের মধ্যে অ্যান্টিমনি টাইপকে শুধু কঠিনই করে না, সেই সঙ্গে আয়তন সামান্য বাড়িয়ে টাইপকে নিটোল সুন্দর করে, আর টিন আনে টাইপের ঔজ্জ্বল্য। বেশীর ভাগ টাইপ ফাউন্ড্রিকে এই টাইপ মেটালের জন্য ধাতু ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তারা এই অ্যালয় তৈরি করে থাকে। অ্যান্টিমনি, টিন এবং সীসা সবই দেশের বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। আর এই আমদানীর পেছনে একটা নোংরা ফাটকাবাজী বহুকাল যাবৎ চলে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই অ্যালয় ধাতু ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বস্তুর মতোই মহার্ঘ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পরে মূল্যমান স্থিতিশীল হয়ে উঠলেও অ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি, বরং স্বাধীনোত্তর কালে তার আরো মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। সেকালে যে টাইপের মূল্য ছিল মণ প্রতি ৫০ টাকার মতো, একালে সেই টাইপের মূল্য দাঁড়িয়েছে কিলো প্রতি ৫৫/৬০ টাকার মতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টাইপ মেটালের মানও যেন ক্রমে নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়েছে। দিল্লীর মানক সংস্থার মান অনুযায়ীও অ্যালয় মেলে না। আগে যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠান এই টাইপ মেটাল সরবরাহ করত, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওই সব প্রতিষ্ঠানের দেশী মালিকরা পূর্বের মানও বজায় রাখতে পারেননি। ফলে এই নিম্নমানের অ্যালয় বা সংকর ধাতু টাইপের আয়ু এবং কার্যক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করে দিচ্ছে। এতে টাইপ ফাউন্ড্রির সুনামও ক্ষুন্ন হচ্ছে। অনেক ছোট ছোট ঢালাইওয়ালা আছে, যারা পুরনো ব্যবহৃত টাইপ সস্তায় কিনে নতুন করে ঢালাই করে দেয়। তাতেও টাইপের আয়ু এবং কার্যকাল খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ইদানীংকালে উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়িয়েছে গ্যাস এবং বিদ্যুতের সংকট। এ এক দৈনন্দিন সমস্যায় পরিণত হয়েছে, পরিণামে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বাজারের চাহিদা মতো টাইপও সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে মেটালের উচ্চ মূল্যের জন্য টাইপ ফাউন্ড্রির পক্ষে

অপর্যাপ্ত টাইপ মজুত রাখা আজকাল আর সম্ভব নয়। এ ভিন্ন কয়লার মানও আগের মতো নেই, এবং মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যেসব টাইপ ফাউণ্ড্রির বয়ঃসীমা চল্লিশের ঊর্ধে, তাদের অধিকাংশ মেশিনপত্র ক্রমে পুরনো হচ্ছে এবং বিদেশী হলেও এই সব মেশিনেরও উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ সব নানা কারণে উৎপাদন সংকুচিত হলেও উৎপাদন ব্যয় কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

৩

ইংরেজ আমলেও যেমন কেবলমাত্র বাংলা টাইপ সম্বল করেই টাইপ ফাউণ্ড্রি চলেনি, এখনও তাই। কারণ বাংলা টাইপের বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সেকালেও দেখা গেছে কোনো কোনো ফাউণ্ড্রি বাংলা ও ইংরেজী ছাড়াও আরবী ফারসী উর্দু, হিব্রু ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাভাষীর টাইপ তৈরি করে বিক্রি করছে। এখনও কিছু টাইপ ফাউণ্ড্রি আছে যারা ওড়িয়া, দেবনাগরী ইত্যাদি টাইপ তৈরি এবং বিক্রি করে। পশ্চিমবঙ্গে যেসব টাইপ ফাউণ্ড্রি আছে তার পঁচানব্বই ভাগই কলকাতায়। উৎপাদন এবং বিপণনের যে সুবিধা কলকাতায় আছে এ রাজ্যের অন্যত্র তেমন নেই। আগে ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে হুগলি এবং শ্রীরামপুরে এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র ছিল। পরে মুদ্রণ শিল্পের প্রসার এবং অগ্রগতি ঘটেছে কলকাতায়। সেই সঙ্গে হরফশিল্পেরও। কিন্তু রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পর থেকে বাংলার হরফশিল্পেরও অগ্রগতি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়তে থাকে। কারণ তখন এই শহরেই ইংরেজ সারা দেশের যাবতীয় মুদ্রণের কাজকর্ম করত। দিল্লীতে রাজধানী চলে যাবার পর কালক্রমে কলকাতা সে গুরুত্ব হারায়।

দেশবিভাগও বাংলার হরফশিল্পকে এক বিরাট আঘাত হেনেছে। স্বাধীনতার আগে পূর্ববঙ্গ ছিল বাংলা টাইপের এক মস্ত বড় বাজার। দেশবিভাগের জন্য সে বাজারকেও হারাতে হল। সে সময়ে প্রায় সমস্ত টাইপ ফাউণ্ড্রিই পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। আশা করা গিয়েছিল পূর্ববঙ্গের বাজার আগের মতোই থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের ভারতের প্রতি বৈষম্যমূলক বাণিজ্য নীতি গ্রহণের ফলে সেই বাজারও বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অনেকেরই মনে নতুন করে আশা সঞ্চারিত হয়েছিল যে বুঝি বা এ বিষয়ে একটা বোঝা-পড়া সম্ভব হবে। কিন্তু আশা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে, কারণ ইতিমধ্যে ওই দেশ এই হরফশিল্পে যথেষ্ট স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।

আর খণ্ডিত এই পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন না থাকায় বাংলা টাইপও এখানে সর্বাঙ্গীণ প্রসার লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানে বাংলা টাইপের চাহিদা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। বাংলা টাইপের বিভিন্ন মাপের মধ্যে প্রধানতঃ পাইকা স্মল পাইকা এবং গ্রেট, ডবল গ্রেট ইত্যাদি মাপের টাইপেরই বেশী প্রয়োজন দেখা যায়। আজকাল নতুন প্রেসগুলি কম্পোজের সুবিধার জন্য পয়েণ্ট মাপের টাইপ পছন্দ করে যেমন ১০ পয়েণ্ট, ১২ পয়েণ্ট, ১৮ পয়েণ্ট, ২৪ পয়েণ্ট ইত্যাদি যদিও টাইপ ফেস উভয়েরই একই মাপের থাকে। এখন চাহিদা অনুসারে এই উভয় ধরনের টাইপই ফাউণ্ড্রিকে নির্মাণ করতে হয়।

এখানে ছোটখাট প্রেসের সংখ্যাধিক্যই বেশী, এদের বাংলা টাইপের প্রয়োজন সামান্যই। আর বড় বড় প্রেস লাইনো, মনো ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে যুগপৎ টাইপ নির্মাণ এবং মুদ্রণে স্বনির্ভর। কেবল মাঝারি ধরনের প্রেসই টাইপ ফাউণ্ড্রির এখন আশা-ভরসা। এই সব প্রেসে বাংলা টাইপের মোটামুটি চাহিদা আছে। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাজার সংকুচিত হওয়ার আরো একটি অন্যতম কারণ হল, অধিকাংশ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ভার সরকার গ্রহণ করায় যান্ত্রিক অক্ষরযোজনা প্রাধান্য লাভ করেছে।

এখন এই অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বহির্বঙ্গের বাজারের দিকে নজর দিতেই হয়। ধানবাদ জামশেদপুর ইত্যাদি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো সীমান্ত অঞ্চলে আর উত্তর প্রদেশের বারাণসী শহরে বাংলা টাইপের কিছু চাহিদা আছে। এমন কি রাজধানী দিল্লীতেও বাঙালীর প্রেস আছে। তবে বাংলা টাইপের এখনও ভাল বাজার আসাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুর রাজ্যে। আসামে সামান্য কয়েকটি অক্ষর (ৰ, ৱ ইত্যাদি) ছাড়া আর সবই বাংলা বর্ণলিপি অনুসারী। মণিপুরেও বাংলা বর্ণলিপি চলে, যদিও ভাষা স্বতন্ত্র। আর ত্রিপুরায় তো বাংলা ভাষাভাষীরই প্রাধান্য। কিন্তু এ সব জায়গাতেও বাজার পাওয়ার জন্য একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলেছে।

৪

ভাল একটি টাইপ ফাউণ্ড্রিতে আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার মূলধন বিনিয়োজিত। পশ্চিম-বঙ্গে এই ব্যবসায়ে এখনও বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য। কিন্তু নানবিধ সমস্যার জন্য এই ব্যবসায়ে নতুন করে মূলধন বিনিয়োগ এখন প্রায় বন্ধ বললেই চলে। একজন মালিকের পক্ষে এই হরফশিল্প থেকে লাভ করা ইদানীং আর সম্ভব হচ্ছে না। এই শিল্পকে লাভজনক করতে গেলে পরিকল্পনা অনুসারে যে সব সম্প্রসারণ ব্যবস্থার দরকার, তার জন্য মূলধনের একান্ত অভাব।

বর্তমানে ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের যে উচ্চ হার, তাতে কোনো টাইপ ব্যবসায়ী আগ্রহী হতে চায় না। তাই আধুনিকী করণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুরনো মেশিনপত্র নিয়ে কোনো রকমে গতানুগতিক-ভাবে কাজ চালাতে হয়। ভাল কোনো ধাতু ব্যবসায়ী আজকাল আর ধারে অ্যালয় সরবরাহ করতে চায় না। সেজন্য টাইপের মজুদ বৃদ্ধিও সম্ভব হয় না। আবার যথাযথ মজুদ না থাকলে সর্ট টাইপের অভাবে খরিদ্দার অন্যত্র চলে যায়।

নতুন ধরনের বাংলা টাইপ বার করতে হলে শুধু একটি হরফের তামা ও ছেনী খরচ প্রায় ত্রিশ টাকার মতো। এখন যুক্তাক্ষর সহ পাঁচশ রকম হরফ নিয়ে বাংলা একটি সাটের আনুমানিক খরচ দাঁড়ায় প্রায় পনেরো হাজার টাকা। আবার কেবল একটি বিশেষ পয়েন্ট করলেই হবে না, চালু প্রায় সব কটি পয়েন্ট নিয়ে পুরো একটি সিরিজ করতে হবে। তাহলে আনুপাতিক হারে তার খরচের যে অংক দাঁড়ায়, একজন টাইপ ব্যবসায়ীর পক্ষে তা হবে এক বিরাট ঝুঁকি। যে কোনো পয়েণ্টের নতুন সাট নির্মাণে করতে গেলে কম করে হলেও এক বছর সময় লাগে। তারও পরে চিন্তা আসে, যদি সেই নতুন ফেসের টাইপ বাজারে আদৌ না চলে! বাজারে চালু বাংলা টাইপের বর্তমান মূল্য কিলো প্রতি ৪৫/৫০ টাকার মতো। তার ওপর আবার ৭% স্থানীয় বিক্রয় করের বোঝা। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা এই কর ফাঁকি দিয়ে সস্তায় টাইপ সরবরাহ করে খরিদ্দার আকর্ষণ করছে। তা ছাড়া ব্ল্যাঙ্ক বা স্পেস মেটেরিয়াল (বাক্যগুলির মাঝে মাঝে শূন্য স্থান পূরণের জন্য) আজকাল ঢালাইওলাদের কাছে খুব কম দরে পাওয়া যাওয়াতে ভাল টাইপ ফাউণ্ড্রির আয় অনেক গুণ হ্রাস পেয়েছে। মুস্কিল এইখানেই, একজন ন্যায়নিষ্ঠ টাইপ ব্যবসায়ীর পক্ষে সততার সঙ্গে বাজারে টিঁকে থাকা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে। তার ওপরে শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমবর্ধমান, যে শ্রমিকের ভালমন্দের সঙ্গে তার ভাগ্যও বিজড়িত।

এই হরফশিল্পের সঙ্গে যারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তারা সকলেই বাঙালী শ্রমজীবী। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে সবশুদ্ধ তাদের সংখ্যা হবে প্রায় হাজার খানেক। এরা কেউ হরফ ঘষে, মাজে, সাজায়, কেউ মেশিন চালায়, কেউ তামা সই করে (ছাঁচের ভুলত্রুটি সংশোধন), কেউ বা সাট বা ফাউণ্ট বানায় কিংবা সর্ট টাইপ দেয়। তবে আগের দিনের মতো এই শিল্পে শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক বড় একটা কেউ ইদানীং আসতে চায় না। কারণ, এই শিল্পে প্রলুব্ধ হওয়ার মতো সুযোগ-সুবিধা শ্রমজীবীরা খুঁজে পায় না। এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকও সুযোগ পেলেই অন্য শিল্পে চলে যায়। ফলে এই শিল্পে ক্রমেই দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এখানে তরুণ বয়সে নিযুক্ত একজন শ্রমিকের দক্ষ কারিগরে পরিণত হতে প্রায় দশ-পনেরো বছর সময় লাগে। ওই সময়ের মধ্যে তার উৎসাহ-উদ্যম এবং কর্মশক্তিতে অনেক ভাঁটা পড়ে যায়। কারণ, এই সুদীর্ঘ সময়ে তার বেতনহার বৃদ্ধিতে বিশেষ কোনো তারতম্য থাকে না। তাছাড়া এই শিল্পে স্বাস্থ্যহানি ঘটারও আশংকা থাকে, যেমন—লেড পয়জেনিং, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি। যদিও আজকাল এখানেও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যেমন—ই-এস-আই স্কীম, প্রভিডেণ্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও হরফশিল্পে শ্রমিকের আরও ক্ষোভ রয়ে গেছে। তার অন্যতম হল, সরকার-নির্ধারিত নিম্নতম বেতনহার অনেক ক্ষেত্রে চালু না হওয়া। তবুও বলা যায়, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা টাইপ নির্মাণের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত এবং সহযোগিতার হাত সর্বদা প্রসারিত রেখেছে।

৫

হরফশিল্পের নানা সমস্যার বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি করে যতীন হুই টাইপ ফাউণ্ড্রি-গুলিকে একত্রিত করার উদ্যোগ নেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে তিনি আধুনিক বহু বাংলা টাইপের প্রচলন করে গেছেন। প্রায় কুড়িটি টাইপ ফাউণ্ড্রি নিয়ে সংগঠিত যে সংস্থা তার নাম হল 'বেঙ্গল টাইপ ফাউণ্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন'। এই সংস্থা টাইপ ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত নানা সমস্যার মোকাবিলা করার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রধান সমস্যা হল, যেসব টাইপ ফাউণ্ড্রি সমিতির সদস্য নয়, তারা অবাধে নিয়মবহির্ভূত কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতির কতকগুলি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও রয়েছে: যেমন, বাংলা টাইপের নতুন ম্যাট্রিক্স তৈরি করে তা ভাড়া দেওয়া; টাইপ মেটাল ভাল মানের তৈরি করে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা, ইত্যাদি। কিন্তু পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গেলে যে মজুদ অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন তা সম্ভব হচ্ছে না, তাই সব পরিকল্পনা কাগজে কলমেই রয়ে গেছে।

হরফশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই শিল্প ক্রমেই এক কঠিন রুগ্নতার দিকে এগিয়ে চলেছে। যতদিন লাইনো ও মনো হাতে-কম্পোজকে সম্পূর্ণরূপে হটিয়ে দিতে না পারবে ততদিন আমাদের হরফ-শিল্প নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবে, কিন্তু বাঁচবে মুমূর্ষু অবস্থায়।

লন্ডনে পুরনো বাংলা বই

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছর। এই হাজার বছরের আটশ বছর পুথির যুগ, শেষ দু'শ বছর মুদ্রিত গ্রন্থের যুগ। মুদ্রণ যুগের সূচনা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছর ইংরেজীতে লেখা একখানি বাংলা ব্যাকরণের উদাহরণগুলি (এবং উদাহরণ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু অংশ) বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। যদিও ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু আগে ইউরোপে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে লিথোগ্রাফিতে বাংলা অক্ষরের নমুনা পাওয়া যায়, মুদ্রণের উদ্দেশ্যে বাংলা অক্ষরের সৃষ্টি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম। তথাপি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা বই বলতে যা বুঝি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে তার অস্তিত্ব ছিল না। ১৭৮৫-১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনখানি আইনের বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, একখানি বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৭৯৩), আর একখানি ইংরেজী-বাংলা অভিধানের প্রথম খন্ড ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপকভাবে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রকাশ শুরু হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই বছর প্রকাশিত হয় উইলিয়াম কেরীর 'মঙ্গল সমাচার মতীয়র রচিত'। পরের বছর প্রকাশিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই। রামরাম বসুর বই ব্যাকরণ-অভিধান নয়, বাইবেল বা আইনের অনুবাদ নয়, বাংলা গদ্যে লেখা মৌলিক রচনা। সে বিচারে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাসের শুরু। এর আগে ১৭৭৮-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যা হয়েছে তা এই ইতিহাসের ভূমিকা।

বাংলা মুদ্রণ যুগের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বলে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের কোনো সংগ্রহ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও খুব বেশী সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাংলা বই সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ ছিল না। অথচ গ্রন্থ সংগ্রহ অর্থাৎ লাইব্রেরি ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য। রাজামহারাজার প্রাসাদে, বৌদ্ধ বিহারে, হিন্দু-বৈষ্ণব-জৈন মন্দিরে, ব্রাহ্মণ-পন্ডিতের বাড়িতে আবিষ্কৃত পুথি-সংগ্রহ এই ঐতিহ্যের প্রমাণ। রাজামহারাজারা ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, মন্দির ছিল ধর্মসাহিত্যের আশ্রয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলা বইয়ের মুদ্রণ আরম্ভ হয়েছে তখন একাধিক কারণে সেগুলির সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। প্রথমতঃ, প্রথম যুগে মুদ্রিত বাংলা বইগুলি সাহিত্য নয়, পাঠ্যপুস্তক; দ্বিতীয়তঃ, বাংলা গদ্যের মর্যাদা তখনও সর্বস্বীকৃত নয়; তৃতীয়তঃ, মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ মন্দিরের সামগ্রীর মধ্যে গণ্য ছিল না। তথাপি যে কয়েকটি গ্রন্থ-সংগ্রহের সংবাদ পাওয়া গেছে সেগুলি

হয় রাজামহারাজার, নয় বিদ্যানুরাগীর। এ ছাড়া এ যুগের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল সরকারী সংগ্রহ। সরকারের দ্বারা সংগৃহীত হওয়ার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের কিছু অংশ রক্ষা পেয়েছে, যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সরকারের তৎপরতাও এদিকে ছিল না বললেই চলে। উপযুক্ত সংগ্রহ এবং গ্রন্থপঞ্জীর অভাবে মুদ্রণ যুগের প্রথম পর্বের ইতিহাস সমগ্র-ভাবে উদ্ধার করা অসম্ভব। এই যুগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রতি বছর কতগুলি বাংলা বই প্রকাশিত হত, প্রত্যেকখানি বইয়ের কত কপি মুদ্রিত হত, কতগুলি বাংলা ছাপাখানা ছিল সে ইতিহাসে অনেক ফাঁক। লন্ডনে এবং শ্রীরামপুরে রক্ষিত ব্যাপটিস্ট মিশনের কাগজপত্র থেকে শ্রীরামপুরের প্রেস, টাইপ ফাউণ্ড্রি এবং কাগজের কল সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের পক্ষে এই তথ্য যৎসামান্য। লং এবং ওয়েঙ্গারের তালিকায়[১] এই যুগে মুদ্রিত বাংলা বই সম্পর্কে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক বিব্লিওগ্রাফির প্রয়োজন মেটাবার উপাদান এগুলিতে নেই। বহু পরিশ্রমে লং ১৮৫৩-র এপ্রিল থেকে ১৮৫৪-র এপ্রিলের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এই সংবাদের নির্ভর-যোগ্যতা সম্বন্ধে লং-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

'In Statistical Researches in this country, one can only attain an *approximate* accuracy, considering the agents we have to employ and the little interest felt in Statistical Research by the Native community generally."

কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বই বিক্রির ব্যবস্থা সম্বন্ধে লং জানিয়েছেন:

' there are few regular book-shops where those books are to be found. The books are given out on Commission to hawkers who traverse the streets of Calcutta and its neighbourhood to sell them, carrying them on their heads."

লং-এর সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৮৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ৪৬টি ছাপাখানায় বাংলা বই ছাপা হত, এই বছর ২৫১খানি বাংলা বই ছাপা হয়েছে এবং মোট মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ৪,১৮,২৭৫। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লং লিখেছেন, There are more than 70 Vernacular Presses in Calcutta—There is no regular publishing system, no central depot, consequently it was often very difficult and expensive to procure various works.'

ছিটেফোঁটা হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে এই একমাত্র উপাদান।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থ সংগ্রহের কথা মনে রেখেও বলতে পারি গত শতাব্দীতে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বৃহত্তম সংগ্রহ লন্ডনের তিনটি লাইব্রেরিতে। এই তিনটি লাইব্রেরি হল, ইণ্ডিয়া আপিস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ। কি উপায়ে বিদেশের লাইব্রেরিতে বাংলা বইয়ের এরকম বৃহৎ সংগ্রহ গড়ে উঠেছে সংক্ষেপে তার বিবরণ দেওয়া এই আলোচনার উদ্দেশ্য।[২]

২

লন্ডনে বাংলা গ্রন্থ-সংগ্রহের ইতিহাস মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের কাল-সীমা ১৮০১ থেকে ১৮৬৬; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৭ থেকে ১৯৪৮। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা-কালে (১৭৫৯) ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে ছিল মাত্র ছখানি সংস্কৃত পুথি। রাজকীয় সনদ দিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্কুল হিসাবে ওরিয়েন্টাল স্কুলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯১৬ সালে। ১৮০১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিই তাই ইংলণ্ডে বাংলা গ্রন্থ-সংগ্রহের প্রাচীনতম।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং ভারত প্রত্যাগত ইংরেজরা যে সব ভারতীয় ভাষার পুথি-বই সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন সেগুলি কোম্পানীর Leadenhall Street-এ জমা হত। এই পুথি-বইগুলি দিয়ে কোম্পানীর ডিরেকটররা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি স্থাপন করেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হলেও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লাইব্রেরিটি বইয়ের গুদাম ছিল না। নতুন প্রকাশিত বই দিয়ে লাইব্রেরিটিকে সমৃদ্ধ করে তোলার দিকেও কোম্পানীর দৃষ্টি ছিল। নতুন বই কেনবার জন্য বার্ষিক কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ছিল জানা নেই; তবে বহু লোকের ব্যক্তিগত-সংগ্রহ এই লাইব্রেরিতে যুক্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ভারতবিদ্যায় কৌতূহলী গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য ছিল। এর সংগ্রহে ছিল একদিকে ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের পুথি-বই, অন্যদিকে অনতিপূর্ব এবং সমসাময়িক ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ।

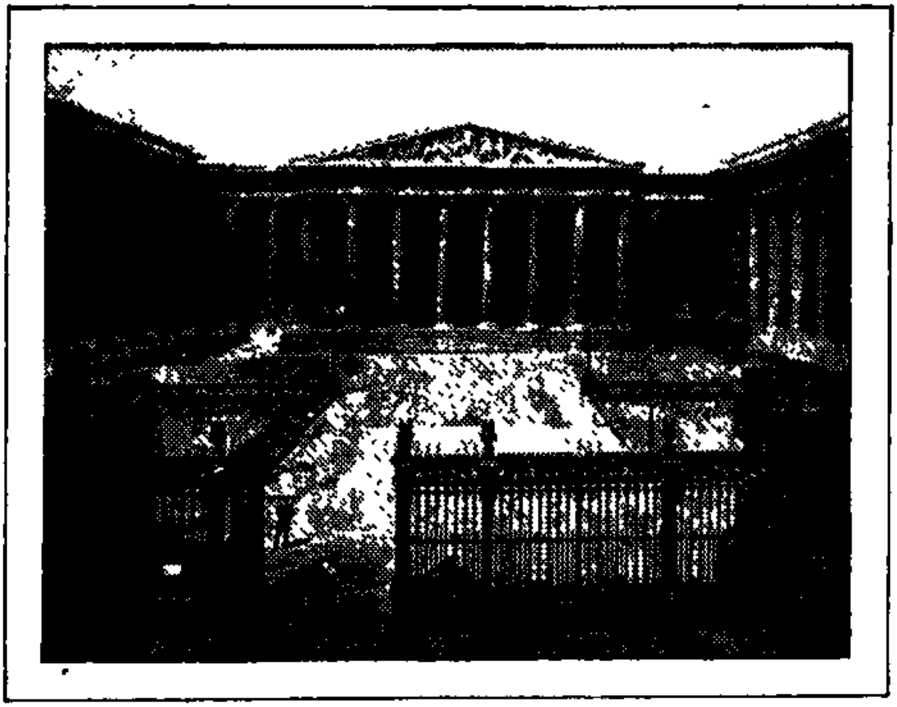

ব্রিটিশ মিউজিয়াম

এই সংগ্রহ শুরু থেকেই গবেষকদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা হস্তান্তরিত হলে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির দায়িত্ব পড়ে ব্রিটিশ সরকারের নব-প্রতিষ্ঠিত Department of State, the India Office-এর উপর এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে Leadenhall Street থেকে কোম্পানীর অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে লাইব্রেরিটিও Whitehall-

ইণ্ডিয়া আপিস, যেখানে বাংলা বই প্রথম জমা করা হত

এর King Charles Street-এ স্থানান্তরিত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর Secretary of State for Commonwealth Relations হলেন এই লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক। সম্প্রতি লাইব্রেরিটি Blackfriars Road-এ স্থানান্তরিত হয়েছে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইংলণ্ডে বাংলা বই সংগ্রহের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। কিছু বই কেনা হত, কিছু বই উপহার পাওয়া যেত। গ্রন্থপঞ্জী না থাকায় নতুন প্রকাশিত বইয়ের সংবাদ পাওয়াও অসম্ভব ছিল। এই যুগের অধিকাংশ বাংলা বই বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত হয়েছে। হলহেড, উইলকিনস, কোলব্রুক প্রভৃতি যাঁরা প্রাচ্যবিদ্যায় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং যাঁরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা করতেন তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু বই এবং পুঁথি ছিল। এই সংগ্রহগুলি তাঁরা ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ উঠে গেলে এই লাইব্রেরির বইগুলি শিক্ষকরাই ভাগাভাগি করে ইংলণ্ডে নিয়ে এসেছিলেন।[৩] আরবী, নাগরী এবং বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ 'পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম' ছাপযুক্ত বহু বই লণ্ডনের তিনটি লাইব্রেরিতে আছে। এর থেকেই অনুমান হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই নানা জনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আসার পর ভারত সচিব লণ্ডন থেকে কলকাতার গভর্নর-জেনারেলকে ইংলণ্ডের লাইব্রেরির জন্য ভারতবর্ষ থেকে বই পাঠাতে অনুরোধ করতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব উড-এর লেখা চিঠি[৪] থেকে প্রমাণ হয় যে সে অনুরোধ আশানুরূপভাবে রক্ষা করা হত না

'It has been the object of orders sent from time to time to the several Governments in India that copies of all works published in India should be sent home for deposit in the Library, formerly at the East India House, and now attached to Office The orders do not seem to be systematically observed, and I have now to request that the attention of the several local Governments may be called to the subject, and that steps may be taken for the regular transmission to this country of works of interest and importance which may issue from the Press in India"

মহাদেব প্রসাদ সাহা জানিয়েছেন, '১৮৫৬ হইতে [সরকার] ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরিতে [ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরিতে কিংবা ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে] কলিকাতার প্রকাশিত প্রত্যেকটি বাংলা পুস্তকের এক খণ্ড পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন।" ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে রালিনসন, ম্যাকেনজি, রায়ান এবং কোলব্রুক ভারত-সচিবের কাছে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতেও এমন ইঙ্গিত ছিল.

on legal grounds, five of our great Libraries are entitled to a copy of every work published in the British Empire The law conferring on them this privilege was intended to preclude the ultimate loss of any such book Hitherto, however, these libraries have been practically deprived of fruits of this privilege so far as India is concerned, chiefly as we suppose, because the Hindoos are unaware of the obligation imposed on them by law to furnish copies of their publications to the libraries in question.'

কোন আইনের ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয়।[৫] ১৮৬৭ সালের আগে এরকম কোনো আইন ছিল বলে মনে হয় না, থাকলে ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত Long-এর তালিকার ভূমিকায় যে মন্তব্যটি করা হয়েছে ' a Bill is now before the Legislative Council of India for the compulsory registration of books and pamphlets" —তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অর্থহীন না হলেও এই মন্তব্য থেকে প্রমাণ হয় ১৮৬৭ সালের আগে বাংলা বইয়ের জন্য compulsory registration প্রথা প্রচলিত ছিল না।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের Indian Press and Registration of Books Act (Act XXV of 1867) অনুসারে ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রত্যেকখানি বই 'by copyright requisitioning' ইণ্ডিয়া আপিস ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির প্রাপ্য ছিল। এই সময় থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে (এবং কোনো কোনো দেশীয় রাজ্যে) প্রকাশিত বই তালিকাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে *Quarterly Catalogues* প্রকাশিত হতে থাকে। এই *Quarterly Catalogues* থেকে বই নির্বাচন করা হত। এতে প্রমাণ হয় প্রকাশিত বইয়ের প্রত্যেকখানি ইংলণ্ডে আসত না, কেবলমাত্র নির্বাচিত বই-ই আসত। বই নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের উপর। বলা বাহুল্য যে দুটি

লাইব্রেরিতে বই আসত সে দুটি-ই সরকারের পরিচালিত লাইব্রেরি (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অবশ্য ট্রাস্ট-এর দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু এর কর্মীরা সরকারের দ্বারা নিযুক্ত)। যতদূর জানি এসিয়াটিক সোসাইটির 'Copyright requisitioning'-এর অধিকার ছিল না।*

CATALOGUE

OF

BENGALI PRINTED BOOKS

IN THE

LIBRARY

OF THE

BRITISH MUSEUM.

BY

J. F. BLUMHARDT,

FORMERLY OF THE BENGAL CIVIL SERVICE, TEACHER OF BENGALI IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND AT UNIVERSITY COLLEGE, LONDON

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

LONDON:
SOLD BY LONGMANS & CO., 39, PATERNOSTER ROW, B. QUARITCH, 15, PICCADILLY, A. ASHER & CO., 13, BEDFORD STREET, COVENT GARDEN, AND TRUBNER & CO., 57, LUDGATE HILL

1886

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগ

ইণ্ডিয়া আপিস এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির মুদ্রিত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকা থেকে এই দুটি লাইব্রেরির গ্রন্থ-সংগ্রহের পরিমাণ এবং প্রকৃতি জানা যায়। তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরও প্রতি বছর নিয়মিত বই কেনা হয়েছে বা ভারতবর্ষ থেকে পাঠান হয়েছে। সব বইয়ের সংখ্যা নিরূপণ করা শক্ত। তবে দশ বছর আগে প্রকাশিত এক পুস্তিকায় জানান হয়েছিল ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে বাংলা বই-র সংখ্যা ২৪০০০। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বাংলা

বইযেব সংখ্যা এব চেযে কিছু কম হবে। তবে ১৮০০-১৮৫০-এর মধ্যে প্রকাশিত বইযেব সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিযামেই বেশী।

৩

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালযেব ওবিযেণ্টাল স্কুল কপিরাইট আইনে বই পাবাব অধিকাবী ছিল না। তবে একাধিক সূত্রে উনবিংশ শতাব্দীব কিছু বাংলা বই স্কুলেব লাইব্রেরিতে সংগৃহীত হতে পেবেছে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ওবিযেণ্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওযাব আগে লণ্ডনে প্রাচ্য বিদ্যাব অধ্যযন এবং অধ্যাপনা হত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালযেব কিংস এবং ইউনিভার্সিটি কলেজে। এই দুই কলেজেব অধ্যাপকমণ্ডলী এবং লাইব্রেবি একত্র কবে প্রতিষ্ঠিত হল ওবিযেণ্টাল স্কুল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দেব ২০শে জুন বিশ্ববিদ্যালযেব সেনেট প্রস্তাব কবলেন

'The University to lend to the School the following books About 300 volumes on subjects from the University General Library, The Morrison Collection (৯৩৭১ খানি চীনা ভাষা ও সাহিত্য বিষযক বই) and about 2,000 volumes and pamphlets of Orientalia from University College, About 2,500 volumes from the Marsden Library (প্রধানতঃ ভাবতীয ভাষা-সাহিত্য বিষযক) and about 500 volumes from the oriental section of the General Library of King's College'

এইভাবে ওবিযেণ্টাল স্কুলেব লাইব্রেবিব গোড়া পত্তন হল। এব মধ্যে মার্সডেন লাইব্রেবি সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য প্রযোজন। উইলিযাম মাবসডেন দীর্ঘকাল জাভা সুমাত্রা-ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন অঞ্চলে কাটিযে তিনি যখন ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন কবেন তাঁব সঙ্গে এসেছিল বহু পুথি এবং বই। এই পুথিগুলিব মধ্যে ছিল একখানি পর্তুগীজ বাংলা শব্দকোষ (আনুমানিক সপ্তদশ শতকে সংকলিত)। এই পুথিখানি এখন ওবিযেণ্টাল স্কুলেব সম্পত্তি।[৭] স্কুলেব সংগ্রহে যে পুবনো বাংলা বইগুলি আছে তাব অনেকগুলিই মাবসডেনেব সংগ্রহে ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে Ernest Hass এব মৃত্যুব পব তাঁব বইগুলি (প্রধানতঃ ভাবতীয ভাষা সংক্রান্ত) স্কুলেব লাইব্রেবিতে আসে। শ্রীবামপুবে মুদ্রিত কিছু বাংলা বই স্কুলেব লাইব্রেবিতে এসেছিল ক্যানটাববেবিব সেণ্ট অগাস্টিন কলেজ থেকে। ফোর্ট উইলিযম কলেজ লাইব্রেবিব কিছু বই যে অজ্ঞাত সূত্রে স্কুলেব লাইব্রেবিতে প্রবেশ কবেছিল সে কথা আগে বলা হযেছে। এই কযেকটি সূত্র ছাড়া আব একটি সূত্রে ১৮৬৭-ব আগে প্রকাশিত অনেকগুলি বাংলা বই স্কুলেব লাইব্রেবিতে সংগৃহীত হযেছিল। সেটি হল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যাবিস এগজিবিশান। স্কুলেব অনেক পুবনো বাংলা বইতে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা যায় South Kensington Museum/Educational Library/from the/Collections of the Indian Publications/Sent to the Paris Exhibition of 1867/Given by the Commissioner for India/

প্যাবিস প্রদর্শনীতে যে বাংলা বইগুলি পাঠান হযেছিল তাব একটা তালিকা লং প্রস্তুত কবেছিলেন (মহাদেব প্রসাদ সাহাব পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), এই তালিকাব প্রায প্রত্যেকখানি বই স্কুলেব লাইব্রেবিতে আছে (Long এব তালিকায যে ৬৫টি খানি Musalman Bengali Works published in Calcutta in 1865 বইযেব নাম আছে সেগুলিও প্যাবিস প্রদর্শনীতে পাঠান হযেছিল এবং সেগুলিও স্কুলেব লাইব্রেবিতে আছে)। প্যাবিস প্রদর্শনীতে প্রেবিত বাংলা বইগুলি South Kensington Museum এ কেন গেল এবং Commissioners for India কোন্ সালে বইগুলি কোন্ প্রতিষ্ঠানে দান কবেছিলেন তা জানা নেই। অনুমান কবি বইগুলি কিংস্ কলেজ থেকে স্কুলেব লাইব্রেবিতে এসেছে।

ওবিযেণ্টাল স্কুলেব কোনো মুদ্রিত তালিকা না থাকায এই লাইব্রেবিব কযেকখানি পুবনো বাংলা বইযেব নাম এখানে উল্লেখ কবা হল

উইলিযাম কেবী	কথোপকথন ১৮০১
গোলকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ ১৮০১
বামবাম বসু	লিপিমালা ১৮০২
মৃত্যুঞ্জয শর্মা	হিতোপদেশ ১৮০৮
বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায	মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাযস্য চবিত্র ১৮১১
মৃত্যুঞ্জয শর্মা	হিতোপদেশ ১৮২১
লক্ষ্মীনাবাযণ ন্যাযালঙ্কাব ও চার্লস উইলকিনস	হিতোপদেশ ১৮৩০ (বাংলা-ইংবেজী অনুবাদ)

Rowe, N.	অনুতাপিনী নবকামিনী ১৮৫৭ (ইংরেজী/অনুবাদ)
জগদীশ তর্কালঙ্কার	কীর্ত্তিবিলাস নাটক ১৮৫৭
বিহারীলাল নন্দী	বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক ১৮৫৭
উমেশচন্দ্র মিত্র	বিধবা বিবাহ নাটক ১৮৫৭
নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি	কলি-ই কৌতুক ১৮৫৮
হরচন্দ্র ঘোষ	কৌরব বিয়োগ ১৮৫৮
তারকচন্দ্র চূড়ামণি	সপত্নী নাটক ১৮৫৮
টেকচাঁদ ঠাকুর	মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় ১৮৫৯
কুঞ্জবিহারী দেব	কলঙ্কভঞ্জন নাটক ১৮৬০
অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	নলদময়ন্তী নাটক ১৮৬০
রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী	নরদেহ নির্ণয় ১৮৬০
গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	পুনর্বিবাহ নাটক ১৮৬০
গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রমদা-প্রমদী নাটক ১৮৬০
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	বাল্যবিবাহ নাটক ১৮৬০
উমাচরণ দে	অগত্যা স্বীকার ১৮৬১
রামনারাণ তর্করত্ন	কুলীনকুলসর্বস্ব (৩য় সং) ১৮৬১
Rowe, N.	গোপাল নাটক ১৮৬১
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ ১৮৬১
গুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	বউ হওয়া এ কি দায়, গঞ্জনায় প্রাণ যায় ১৮৬১
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	শুভস্য শীঘ্রং ১৮৬১
কুশদেব পাল	কাদম্বিনী নাটক ১৮৬২
অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	কার কপালে কে যায়? ১৮৬২
জগদীশ তর্কালঙ্কার	কুমার কামিনী ১৮৬২
ভবানীচরণ চৌধুরী	ফোতো নবাবী নাটক ১৮৬২
জগদীশ তর্কালঙ্কার	বুধেলা রহস্য ১৮৬২
যদুনাথ চৌধুরী	লম্পট চৈতন্যোদয় ১৮৬২
জগদীন্দ্রনারায়ণ বসু	বিলাসবতী ১৮৬৩
দ্বারকানাথ মিত্র	মুশলং কুলনাশনং ১৮৬৩
বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক ১৮৬৩
নফরচন্দ্র পাল	কন্যাবিক্রয় নাটক ১৮৬৪
নিমাইচন্দ্র শীল	কাদম্বরী নাটক ১৮৬৪
নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি	চারুমুখ চিত্তহরা ১৮৬৪
রামেশ্বর বেদরত্ন	নবীন বিরহিনী নাটক ১৮৬৪
	প্রেমনাটক ১৮৬৪
ক্ষেত্রমোহন সেন	প্রেমারার হাটহদ্দ ১৮৬৪
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	বিধবাবিলাস ১৮৬৫
মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী নাটক ১৮৬৫
হরিশচন্দ্র মিত্র	জয়দ্রথ নাটক ১৮৬৫
সৌদামিনী সিংহ	নারীচরিত্র ১৮৬৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা (মাসিকপত্র) ১৮৬৫
প্রেমচাঁদ মুখোপাধ্যায়	প্রমথ তরঙ্গিণী ১৮৬৫
দীনবন্ধু মিত্র	বিয়ে পাগলা বুড়ো ১৮৬৫
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়	রমণী নাটক ১৮৬৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	সীতার বনবাস (৬ষ্ঠ সং) ১৮৬৫
কৈলাসবাসিনী দেবী	হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ১৮৬৫
হরিশ্চন্দ্র মিত্র	জানকী নাটক ১৮৬৬
রামনারায়ণ তর্করত্ন	নবনাটক ১৮৬৬
দীনবন্ধু মিত্র	নবীন তপস্বিনী ১৮৬৬

ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত	প্রেমাধিনী নাটক ১৮৬৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বুঝলে কিনা ১৮৬৬
তিনকড়ি ঘোষাল	সাবিত্রী সত্যবান গীতাভিনয় ১৮৬৬
রামেশ্বর বেদরত্ন	মসনবী ১৮৭৬

৪

আধুনিক কালে যে বিদ্যার নাম বিব্লিওগ্রাফি বাংলা বই সম্পর্কে সে বিদ্যার সূচনা করেছিলেন লং ও ওয়েঙ্গার। সাম্প্রতিক কালে দু'একজনের সামান্য কিছু মনোযোগ এদিকে পড়েছে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা বই সম্বন্ধে আমাদের অসংখ্য জিজ্ঞাসা; শুধু তালিকায় (যদিও সে রকম কোন তালিকাও নেই) সব জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যাবে না। আমরা জানতে চাই বঙ্কিমচন্দ্রের বই কতগুলি করে ছাপা হত, বিক্রির সংখ্যা অনুসারে তাঁর কোন্ বইখানি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল। আমরা জানতে চাই ইংরেজ রাজত্বে কতগুলি বাংলা বইয়ের প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলির রচয়িতা সম্বন্ধেও যেমন বিষয় সম্বন্ধেও তেমনি আমরা কৌতূহলী। বাংলা মুদ্রণের দুশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ব্যাপকভাবে বাংলা বিব্লিওগ্রাফির কাজ শুরু করা যায় না?

নির্দেশিকা

১ মহাদেব প্রসাদ সাহা। জেমস লং, 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা ১৩৭১। আনিসুজ্জমান। বাংলা বইয়ের তালিকা, 'সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা ১৩৭১

২ বিস্তৃত বিবরণ সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। কৌতূহলী পাঠক এই বইগুলি দেখতে পারেন।
Arberry, A. J. *The Library of the India Office: A Historical Sketch*, London, 1938
Pearson, J. D. The Library of the School of Oriental and African Studies, *Journal of Asian Studies*, 17, 1959
Treasury. *Committee on the Organisation of Oriental Studies in London. Report.* London 1909
Lodge, A. The History of the Library of the School of Oriental and African Studies, in Saunders, W. L. ed., *University and research Library Studies*. London 1968
Long, Rev. J. *Descriptive Catalogue of Books and Pamphlets Forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibition of 1867*. Calcutta, 1867. Introduction.

৩ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক John Gilchrist ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় ১৮১৮ সালে লণ্ডনে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে Oriental Institution স্থাপন করেন। ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইগুলি সম্ভবতঃ তিনি কলকাতা থেকেই নিয়ে এসেছিলেন। Price-এর ব্রজভাষার ব্যাকরণখানি (১৮০২)-র যে কপি ওরিয়েন্টাল স্কুলে আছে সেটি এক সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পত্তি ছিল।

৪ মহাদেব প্রসাদ সাহা। জেমস লং, 'সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা ১৩৭১।

৫ পত্রলেখকদের ধারণা ছিল ব্রিটিশ কপিরাইট আইন ভারতেও প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে ব্রিটেনের চারটি লাইব্রেরি প্রত্যেকটি প্রকাশিত বই পাবার অধিকারী। কিন্তু ভারত ঐ আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। —স.

৬ ১৮৬৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রকাশিত *Quarterly Catalogues* ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এইগুলির সাহায্যে ঐ যুগে প্রকাশিত যাবতীয় বাংলা বইয়ের হদিস পাওয়া যায়।

৭ উইলিয়াম মারসডেনের সব পুঁথি-বই কিংস কলেজে দেওয়া হয়নি। অনেক মূল্যবান কাগজপত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও দান করা হয়েছিল। এই কাগজপত্রের মধ্যে প্রায় ৫০

খণ্ড পর্তুগীজ documents আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পর্তুগীজ পাদরিরা বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠাতেন গোয়ায়। এই reportগুলি মারস্‌ডেন কিভাবে সংগ্রহ করলেন তা কারও জানা নেই। ডেনিসন্‌ রস্‌ এবং ফাদার হস্টেন অনুমান করেছিলেন এগুলি গোয়া থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। অনেকগুলি report-এর উপর গোয়ার মহাফেজখানার মোহরও আছে। দোম আন্তোনিও সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে তাঁরা এই রিপোর্টগুলি থেকে অনেক নূতন তথ্য পাবেন।

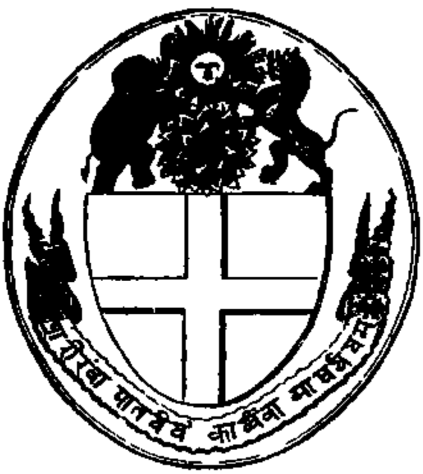

পুরনো বইয়ের সংগ্রহ

শিবদাস চৌধুরী

ভারতের মঠে, মন্দিরে, বৌদ্ধ বিহারে এবং রাজদরবারে গ্রন্থ-সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল সুপ্রাচীন কাল থেকে। নালন্দা বিহারের গ্রন্থ সম্পদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এসিয়ার বিভিন্ন দেশে। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই সব সংগ্রহ ছিল পুথিনির্ভর। পুথির সংখ্যা সীমিত, পাঠকের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়। মুদ্রণের যুগ শুরু হবার পর গ্রন্থ-সংগ্রহের ও তা ব্যবহারের রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটল।

এদেশের প্রথম আধুনিক গ্রন্থাগার বোধ হয় স্থাপিত হয়েছিল ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে,— মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জে। এটি ছিল বিদেশী বইয়ের গ্রন্থাগার। বাংলা দেশে আধুনিক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার সূচনা হয় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। এখানেও ছিল বিদেশী ভাষার বইয়ের প্রাধান্য। প্রায় চার দশক পর্যন্ত ভারতীয়দের সোসাইটির সভ্য করা হত না। সুতরাং দেশীয় ভাষার বই সংগ্রহ করবার তাগিদ থাকবার কথা নয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে হোরেস হেমান উইলসনের প্রস্তাবানুযায়ী ভারতীয়দের সোসাইটির সভ্য করা হয়। প্রথম যাঁরা সভ্য হলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দ্বারকানাথ ঠাকুর; প্রসন্নকুমার ঠাকুর; রামকমল সেন; রসময় দত্ত ও শিবচন্দ্র দাস। স্বভাবতঃই মনে করা যেতে পারে বাংলা বই সংগ্রহে এ'রা আগ্রহী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত (১৮০০) হবার পর থেকেই বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার বইপত্রের সংগ্রহ শুরু হয়। পুথিও সংগৃহীত হত। কিছু দিনের মধ্যেই কলেজের গ্রন্থাগারটি বিশেষরূপে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক ছাড়া কিছু কিছু সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেত। দুঃখের বিষয় কলেজটি বন্ধ হবার পর এখানকার বাংলা বইয়ের মূল্যবান সংগ্রহটি ছত্রখান হয়ে পড়ে। কলকাতার কোনো কোনো লাইব্রেরিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মোহর সম্বলিত কিছু বই এখনও দেখা যায়। অনেক বই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল লণ্ডনে।

শ্রীরামপুর মিশন লাইব্রেরিতেও ঊনবিংশ শতকের একেবারে শুরু থেকেই বাংলা বই সংগ্রহ আরম্ভ হয়।

হিন্দু কলেজ এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির গ্রন্থাগারও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে গ্রন্থাগারটি কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটি হল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য

লাইব্রেরির দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। কলকাতার সকল বিশিষ্ট বাঙালী ও ইংরেজ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদেশীরাও বলেছেন যে এমন সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ইউরোপেও তখন খুব বেশী ছিল না। নানা কারণে গত শতাব্দীর শেষভাগে লাইব্রেরির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে লাইব্রেরি আইন পাশ হয়। তার প্রভাব এদেশেও পড়ল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা এবং মফঃস্বলে একে একে পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হতে লাগল। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' লেখা হল: "ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্বসাধারণের সর্ব-কালীন বংশপরম্পরার উপকারার্থে গ্রাম ভেটি ও বারোয়ারির ধন বা মাসিক দান বা গ্রামস্থ জমিদার মহাশয়দিগের বদান্যতায় এক এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে...অতুল উপকার হইবে। গ্রাম মধ্যে এমত এক এক গ্রন্থালয় হইলে গ্রামস্থ সকলে ঐ স্থলে একত্র হইয়া সংবাদপত্র পাঠ দ্বারা জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারেন, মনোহর কবিতা পাঠ করতঃ মনকে প্রফুল্ল করণে সক্ষম হয়েন। ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা পাঠ দ্বারা জ্ঞানজ্যোতিতে ভাসমান হইতে পারেন, স্বগ্রামের মঙ্গলোন্নতির উপায় স্থির করেন, এবং এতদ্দেশের রীতিনীতির পরিশোধন চেষ্টা করেন।"

উনবিংশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে: রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর (১৮৫১); হুগলি (১৮৫৪); কৃষ্ণনগর (১৮৫৬); কোন্নগর (১৮৫৮); উত্তরপাড়া (১৮৫৯); জনাই (১৮৬০); মাহেশ (১৮৬৯); চন্দননগর, আড়িয়াদহ (১৮৭০) প্রভৃতি। কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরি, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরির ন্যায় কয়েকটি সমৃদ্ধ বাংলা বইপত্রের সংগ্রহের কথা আমরা অনেকেই জানি। সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়াও উনবিংশ শতকের জমিদার পরিবারে বাংলা বইয়ের মূল্যবান সংগ্রহ ছিল। আমাদের চরম ঔদাসীন্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের অনেক নিদর্শন লুপ্ত হয়ে গেছে। শহরে ও গ্রামে কয়েকটি গ্রন্থাগার এখনও নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে পুরনো বাংলা বইয়ের সংগ্রহ রক্ষা করে চলেছেন। তাঁদের এমন অর্থের সংস্থান নেই যে আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যাটালগ করবেন; বাঁধাই করবার টাকা নেই; পাঠকদের বসিয়ে পড়াবার মতো জায়গা নেই। তবু তাঁরা পুরনো বাংলা বইগুলি সংরক্ষণের জন্য কাজ করে চলেছেন। কোন গ্রন্থাগারে কি কি পুরনো বই আছে তার একটি সমীক্ষা করে সেগুলি সংরক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান নিদর্শন রক্ষা পেতে পারে।

যাই হোক, আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ-সংগ্রহের কথা বলছি, যেখানে বইয়ের হদিস পাওয়া এবং ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

২

এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার সবচেয়ে পুরনো। প্রথম দুই দশক সোসাইটির নিজস্ব কোন গৃহ ছিল না। সোসাইটির কাজ চলত উইলিয়াম জোন্‌সের কর্মস্থল সুপ্রীম কোর্টে। বইপত্র যা

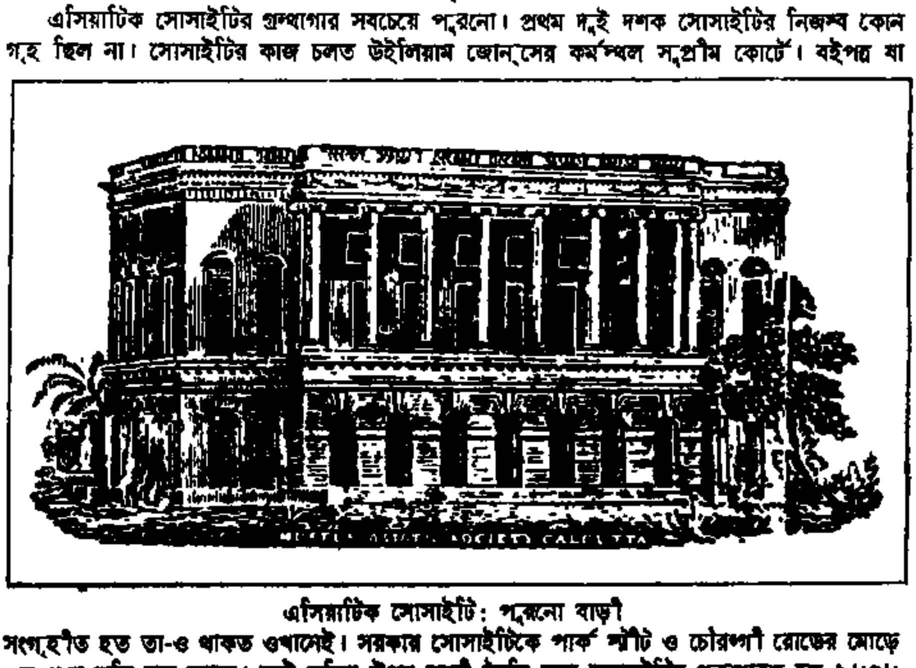

এসিয়াটিক সোসাইটি: পুরনো বাড়ী

সংগৃহীত হত তা-ও থাকত ওখানেই। সরকার সোসাইটিকে পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে এক খণ্ড জমি দান করেন। সেই জমির উপর বাড়ী তৈরি করে সোসাইটির গৃহপ্রবেশ হয় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে সোসাইটির গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। এখন গ্রন্থাগারে মোট

বইপত্রের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এ ছাড়া আছে ষাট হাজার পুথির সংগ্রহ। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্যেই সোসাইটির জন্ম। স্বভাবতঃই এখানকার গ্রন্থসংগ্রহে সেই উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন লক্ষণীয়। এই সংগ্রহ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য টিপু সুলতানের গ্রন্থাগার, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, বিমলাচরণ লাহা, রমাপ্রসাদ চন্দ, নির্মল-কুমার বসু প্রভৃতি সংগ্রহের দান। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র দানে বাংলা বিভাগ সমৃদ্ধ হয়েছে।

পৃথিবীর বহু ভাষার বই এই সংগ্রহে রয়েছে। আমরা এখানে শুধু বাংলা বইপত্র সম্বন্ধে আগ্রহী। এসিয়াটিক সোসাইটিতে বাংলা বইয়ের সংখ্যা বেশী নয়। তবে বাংলা বইয়ের মুদ্রিত তালিকা প্রকাশিত (১৯৬৮) হবার পর অনেক বাংলা বই সংযোজিত হয়েছে। তালিকাটি থাকায় বাংলা বই ব্যবহারের সুবিধা হয়েছে। সংগৃহীত বাংলা বইয়ের সংখ্যা কম হলেও বিগত শতকের বেশ কিছু বই—যা এখন দুষ্প্রাপ্য—তা পাওয়া যাবে। তাছাড়া পাওয়া যাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত কয়েকটি বিদেশী ভাষায় লেখা বই। যে বইটিতে বাংলা অক্ষরের নমুনা আছে সেই 'চায়না ইলাস্ট্রাটা' (১৬৬৭), রোমান হরফে বাংলা বই 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (লিসবন, ১৭৪৩), হলহেডের বাংলা ব্যাকরণ (১৭৭৮) প্রভৃতি রয়েছে সোসাইটির সংগ্রহে। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু গ্রন্থাদি পাওয়া যাবে। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নাম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা হল কালীকৃষ্ণ বাহাদুর—সংক্ষিপ্ত সম্বিদ্যাবলী; খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা (১৮৫১); নীলরতন হালদার—কবিতা-রত্নাকর (১৮৩০); বঙ্গীয় পাঠাবলী (১৮৫২); বিদ্যাকল্পদ্রুম; বাংলা গারো অভিধান, মনিপুরী ও কুকি ভাষা শিক্ষা, মহেন্দ্রচন্দ্র বাযের বঙ্গদেশের তীর্থ-বিবরণ, মহেন্দ্রনাথ রায়—কুসুমাবলী, স্বরূপচন্দ্র দাস—সন্দেশাবলি, ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পত্রিকার মধ্যে আছে: সমাচার দর্পণ, সত্যার্ণব, মাসিক পত্রিকা; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; বিবিধার্থ-সংগ্রহ; রহস্য সন্দর্ভ; উপদেশক; প্রচার; প্রকৃতি ইত্যাদি।

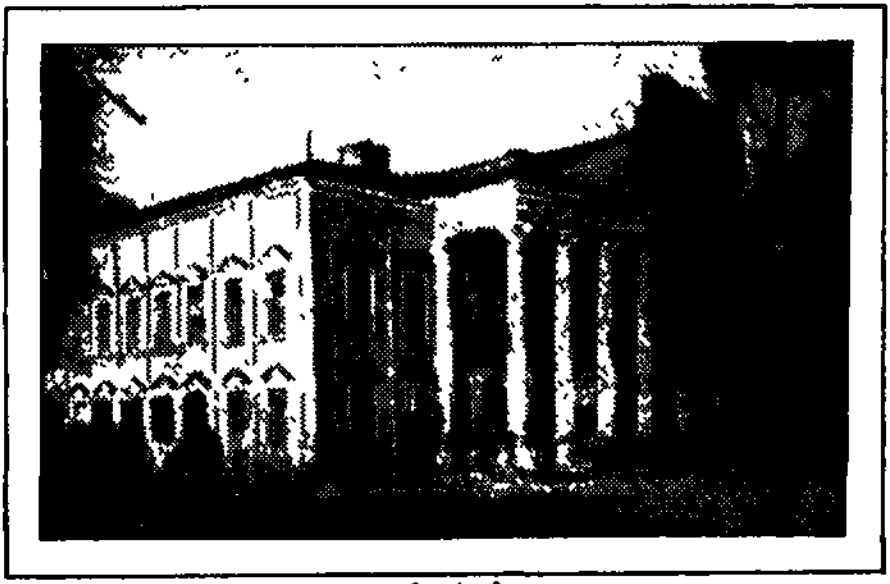

কেরী লাইব্রেরি

এর পরেই নাম করতে হয় শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরির। শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস স্থাপিত হবার পর থেকেই বাংলা বইপত্রের সংগ্রহ শুরু হয়। ঐ প্রেসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বইও ছাপা হত। সুতরাং আদিযুগের বাংলা বই সংগ্রহের সহজ সুযোগ ছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হবার পর এই সংগ্রহটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগারের রূপ নিতে থাকে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর প্রেস ৪০টি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় ২,১২,০০০ কপি ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ক বই ছেপেছিলেন ৮০,০০০ পাউন্ড ব্যয় করে। প্রতিটি মুদ্রিত গ্রন্থের একটি করে ছাপাখানায় সংরক্ষিত করা সাধারণ রীতি। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' শ্রীরামপুরে থেকেই প্রকাশিত হয়। এদের সম্পূর্ণ ফাইল ঐ লাইব্রেরিতে থাকবে আশা করা যায়। তাছাড়া কেরীর ছিল নানা বিষয়ে আগ্রহ। ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং কলেজ গ্রন্থা-গারটির ঐশ্বর্য সহজেই অনুমেয়। কলেজ লাইব্রেরি থেকে পুরনো বইপত্র পৃথক করে বর্তমান

শতকের প্রথম ভাগে গড়ে উঠেছে কেরী লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরিতে পুস্তকের সংখ্যা ৭,৪১৫; পুস্তিকা—১,৭২৫; এ ছাড়া আছে কিছু সংস্কৃত ও বাংলা পুথি। পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে আছে ১৭১৪ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় ভারতে প্রকাশিত ১০১৭টি বইপত্র। ১৮০০ থেকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ৩৩৮। দু' একজন কলেজ-কর্তার অবিবেচনার ফলে বেশ কিছুকাল পূর্বেই বাংলা বইয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। পুরনো বাংলা বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। তবে বাংলা তথা ভারতের মুদ্রণশিল্পের বিকাশ সম্পর্কে কেরী লাইব্রেরিতে রক্ষিত নানাবিধ রিপোর্ট ও পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এসব দলিলগুলি অবশ্য ইংরেজীতে লেখা।

৩

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এখন এর নামকরণ হয়েছে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার। অনেক বছর অবহেলিত থাকবার পর এখন সরকারী পরিচালনায় গবেষক ও সাধারণ পাঠক আবার লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন।

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পঁচাশি হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য এক সুরম্য ভবন নির্মাণ করেন। এবং গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৮৫৯-এ লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই বইপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লং-এর 'ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগে'র ভূমিকায় বলা হয়েছে যে তালিকায় উল্লেখিত ১৪০০ বাংলা বইয়ের অধিকাংশই উত্তরপাড়া লাইব্রেরিতে দেখা যাবে। এ থেকেই বোঝা যায় পুরনো বাংলা বইয়ের সংগ্রহ কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল। গ্রন্থাগার-ভবনের দোতলায় বিশিষ্ট অতিথি ও গবেষকদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হাণ্টার সাহেব এখানে থেকে এই লাইব্রেরির বইয়ের সাহায্য নিয়ে গেজেটিয়ার সংকলন করেছিলেন। অনেক বড়লাট এবং ছোটলাট দেখে গেছেন এই লাইব্রেরি। মেরি কার্পেণ্টার তাঁর 'সিক্স মান্থস ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে উত্তরপাড়া লাইব্রেরির উল্লেখ করেছেন।

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে প্রীতিলাভ করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত দু'বার কিছুদিন করে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এই লাইব্রেরির। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া ভাষণে জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরির দ্বার যখন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তখন

বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩,০০০। অনেক ছোট ছোট পুরনো বইয়ের সংগ্রহ এবং 'হরকরা' পত্রিকার লাইব্রেরিটি কিনে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল। বাংলা বইয়ের সংখ্যা ছিল আড়াই হাজারের মতো। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর এক চিঠিতে উইলিয়াম হাণ্টার তাঁর স্ত্রীকে লাইব্রেরির সমৃদ্ধ সংগ্রহের বিষয়ে লিখেছিলেন: "...unique store of local literature, alike in English and vernacular tongues...."

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত বাংলা বইপত্রের সংগ্রহে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। এদের সংখ্যা প্রায় ৬০০। সব মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় ১৫০০ বই আছে। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সংগ্রহ খুবই ভাল। বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় ইতিহাস ও ভূগোলের বইয়ের কথা। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির অনেক বই এখানে আছে। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি বইয়ের নাম দেওয়া হল: ফেলিক্স কেরী প্রণীত ভারতের ইতিহাস, ১৮২০; মিশর দেশীয় লোকের বিবরণ: গ্রীক লোকের বিষয়, ১৮২০-২৬; শিশুসেবধি; ভূগোলবৃত্তান্ত (এসিয়া) ১৮৩৯; বৈদ্যনাথ আচার্যের অজ্ঞান তিমিরনাশক, ১৮৩৯; মদনমোহনের শিশুশিক্ষা, ১৮৫১; গোপালচন্দ্র সেন—বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৮৪০: জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়, ১৮১৯; ইত্যাদি। ব্যাকরণ, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনেক পাঠ্যপুস্তক আছে।

সাহিত্য বিভাগে শ্রীরামপুরের রামায়ণ, ১৮০২; ফুলমনি ও করুণার বিবরণ, ১৮৫২; কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের রসসিন্ধু প্রেমবিলাস, ১৮৫২; তারকনাথ দত্তের সুকুমার বিলাস, ১৮৫২; কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের অবলা প্রবলা, ১৮৫৬; শ্রীনাথ দাসঘোষের রাজপুত্র ও সেনাপতির জীবনোপাখ্যান, ১৮৫৮; গোলেবকাওলি, ১৮৫৮; সিদ্ধেশ্বর দাসের ভুবনমোহিনী, ১৮৫৯; বিপিনবিহারী সরকারের কুমারী কুমার, ১৮৫৯ ইত্যাদি। এ ছাড়া ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী গ্রন্থ থেকে বহু অনুবাদ গ্রন্থ আছে। সেকালের প্রখ্যাত অনুবাদক মধুসূদন মুখো-পাধ্যায়ের অনেকগুলি বই এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞান-বিষয়ক বইয়ের সংখ্যাও মন্দ নয়। কয়েকটির নাম: নৃসিংহদেব ঘোষাল প্রণীত বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, ১৮৫৭; উপেন্দ্রলাল মিত্রের বস্তুপরিচয়, ১৮৫৯; ব্রজনাথ বিদ্যালংকারের উদ্ভিদবিদ্যা, ১৮৫৪; মুনশি কাফীতুল্লার কৃষিদর্পণ, ১৮৫৩; মধুসূদন গুপ্তের লণ্ডন ফার্মা-কোপিয়া, ১৮৪৯; রাধাবল্লভ দাস প্রণীত মনতত্ত্বসার, ১২৫৬ বঙ্গাব্দ। এ ছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থও এখানে পাওয়া যাবে।

বিবিধ প্রসঙ্গের উপর যে সব বই আছে তাদের কয়েকটি: কাশীনাথ দাসগুপ্তের কন্যাপণ বিনাশিকা, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ; নন্দকুমার কবিরত্নের বৈধব্য ধর্মোদয়, ১৮৫৬; রামমোহনের পথ্যপ্রদান, ১৮২৩; মথুরনাথ তর্করত্নের জীবনবৃত্তান্ত, ১৮৫৯; পিয়ার্সনের বাক্যাবলী, ১৮২০ প্রভৃতি বহু বই লাইব্রেরির সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। তাদের পৃথকভাবে উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। এখানকার পুরনো পঞ্জিকার সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

পুরনো পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: দিগদর্শন, সোমপ্রকাশ, কল্পদ্রুম; তত্ত্ববোধিনী; নিত্য-ধর্মানুরঞ্জিকা; বিবিধার্থ-সংগ্রহ; সত্যার্ণব; সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি।

এখানে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত বইপত্রের কথাই বিশেষ করে উল্লেখ করা হল। কারণ অন্যান্য লাইব্রেরিতে এসব বইপত্র সহজলভ্য নয়। পরবর্তীকালের বইপত্রের সংগ্রহও বেশ ভালো।

৪

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারের সূচনা হয়। পর বৎসর এই সভার ইংরেজী নাম বদলে নামকরণ হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকেই পরিষৎ গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ দান হিসাবে পাওয়া বই নিয়েই গ্রন্থাগারের পত্তন। পরিষদের মুখপত্রে সমালোচনার জন্য যে-সব বইপত্র পাওয়া যেত সেগুলিও গ্রন্থাগারে রাখা হত। বর্তমানে গ্রন্থাগারে প্রায় ৮০,০০০ বাংলা বই, পুস্তিকা ও পত্রিকা আছে। এদের মধ্যে ক্যাটালগ করা বইয়ের সংখ্যা ২৫,৩৬০ এবং পত্রিকা ৩০০০ খণ্ড। তালিকাভুক্ত পত্রিকার (টাইটেল) সংখ্যা ১২৭৫। মোট বাংলা বইয়ের অর্ধেকেরও কম ক্যাটালগ করা হয়েছে। সুতরাং অবশিষ্ট বইয়ের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। যথাযথরূপে তালিকাবদ্ধ করা হয়নি এমন বাংলা বইপত্রের মধ্যে আছে: বিদ্যাসাগর, সত্যেন দত্ত, ঋতেন ঠাকুর, বিনয়কৃষ্ণ দেব, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশ দত্ত, যতীন পাল, সাবিত্রী লাইব্রেরি প্রভৃতি সংগ্রহ। পরিষদের প্রথম যুগে নানা সূত্র থেকে যে সব দুষ্প্রাপ্য বইপত্র সংগৃহীত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ক্যাটালগ করা হয়ে গেছে, সুতরাং পাঠক তাদের বিবরণ জানতে পারবেন। সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী লেখকদের রচনার প্রথম সংস্করণে এবং অন্যত্র অপ্রাপ্য বহু দুর্লভ বাংলা

পত্রিকায় পরিষৎ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে।

বাংলা মুদ্রণের প্রথম পর্বের কয়েকটি বইয়ের নাম করা যেতে পারে: রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ১৮০১; বত্রিশ সিংহাসন, ১৮০২; লিপিমালা, ১৮০২; রামায়ণ, ১৮০৩; তোতা ইতিহাস, ১৮০৫; রাজাবলি, ১৮০৮; ইতিহাসমালা, ১৮১২; পুরুষ পরীক্ষা, ১৮১৫; শব্দসিন্ধু, ১৮১৭;

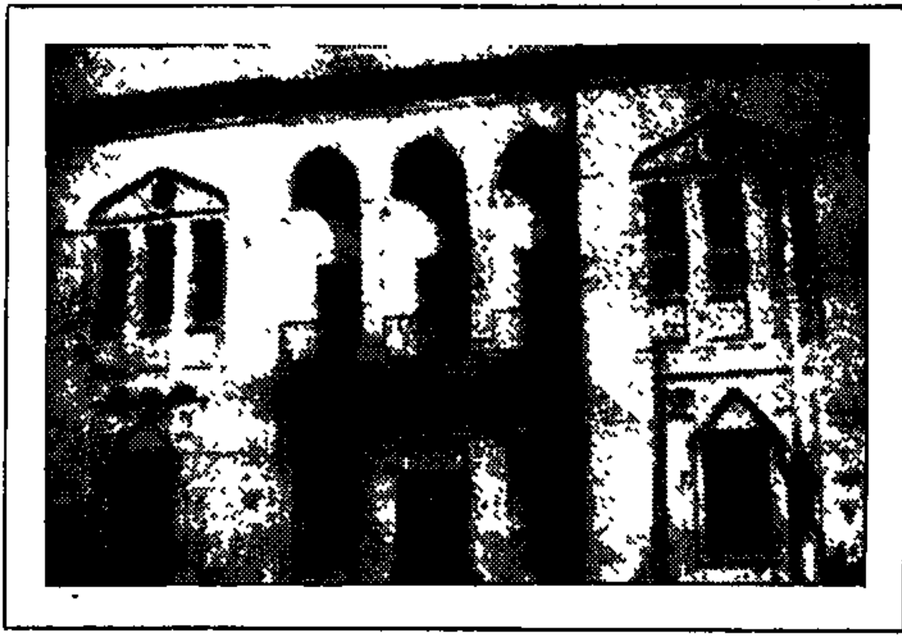

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার

কথোপকথন, ১৮১৬; গীতরত্ন (রামনিধি গুপ্ত), ১৮৩৭; জ্ঞানচন্দ্রিকা, ১৮৪৪; দূতী বিলাস, ১৮৪৭; সংগীত গৌরীশ্বর, ১৮৫০, ভদ্রার্জুন ১৮৫২; কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক, ১৮৫৪; গোপালকামিনী, ১৮৫৬; চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা, ১৮৫৮; কিছু কিছু বুঝি, ১৮৬৭; কলকাতার নুকোচুরি, ১৮৬৯, ইত্যাদি। প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হল গঙ্গাকিশোর প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬)। এ বইটি আর কোথাও আছে বলে জানা যায় না। রামমোহনের যে কটি প্রথম সংস্করণের বই আছে তা হল: গোস্বামীর সহিত বিচার, ১৮১৮; সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, ১৮১৯; কবিতাকারের সহিত বিচার, ১৮২০; পথ্যপ্রদান, ১৮২৩; গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ১৮৩৩; ইত্যাদি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত এক মূল্যবান সংগ্রহ গবেষকদের জন্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

যেসব পত্রপত্রিকা এখানে পাওয়া যাবে তার কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা হচ্ছে: অনুশীলন; অনুসন্ধান; অন্তঃপুর; অবোধবন্ধু, অরুণোদয়; আর্যদর্শন; কৃষক; কৃষিতত্ত্ব; গভর্নমেণ্ট গেজেট; চিত্রদর্শন; জন্মভূমি; জাহ্নবী; জ্ঞানাঙ্কুর; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; দর্শক; দাসী; দিনাজপুর পত্রিকা; নবজীবন; নবভারত; নাচঘর; নাট্য-প্রতিভা; পরিচারিকা; পরিদর্শক; পুণ্য; পূর্ণিমা; প্রচার; প্রবাসী; বঙ্গদর্শন; বামাবোধিনী পত্রিকা; বালক; বালকবন্ধু; বিজ্ঞান; বিজ্ঞানদর্পণ; বিদূষক; ভ্রমর; মধ্যস্থ; মহিলা; মানসী; মাসিক পত্রিকা; রঙ্গমঞ্চ; রঙ্গালয়; রহস্যসন্দর্ভ; শিল্পপুষ্পাঞ্জলি; সংবাদ প্রভাকর; সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়; সঞ্জীবনী; সন্দেশ; সবুজপত্র; সমদর্শী; সমাচার দর্পণ; সম্বাদ ভাস্কর; সাধনা; সাধারণী; সাহিত্য; সুলভ সমাচার; সোমপ্রকাশ; হিতৈষী, প্রভৃতি। অবশ্য অধিকাংশ পত্রিকার ফাইলই অসম্পূর্ণ।

৫

জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর সূচনা হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ, যেদিন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের দক্ষ পরিচালনায় প্রায় চল্লিশ বছর এই গ্রন্থাগার কলকাতার নাগরিকদের পাঠস্পৃহা নিবারণে বহুলাংশে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৭৫ থেকে লাইব্রেরির অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বিপিনচন্দ্র পাল গ্রন্থাগারিক হয়ে এসেও এই ক্রমাবনতি রোধ করতে

পারেননি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন এলেন মেটকাফ হলে পাবলিক লাইব্রেরি দেখতে। দেখলেন অযত্নে অবহেলায় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের এক অমূল্য সংগ্রহ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি সংকল্প করলেন এই জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করতে হবে এবং জনসাধারণকে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের তদানীন্তন বিভাগীয় গ্রন্থাগার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত করলেন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরিকে। কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিলেন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অংশীদারদের। তারপর নতুন রূপে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হল জনসাধারণের কাছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি এই লাইব্রেরি উদ্বোধন করে কার্জন বলেন যে এখানে ". the student may explore the records of the past, where the businessman or official may furbish up his knowledge of the present, and where the speculative intellect may perhaps divine the secrets of the future."

ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয় এক লক্ষ বইপত্র নিয়ে। সে সংখ্যা এখন দ্রুত কুড়ি লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে বাংলা বইয়ের সংখ্যা ৮০ হাজারের মতো হবে। সব বই অবশ্য এখনও ক্যাটালগ করা হয়নি। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে ন্যাশনাল লাইব্রেরি নামকরণ হয় ১৯৪৮-এ।

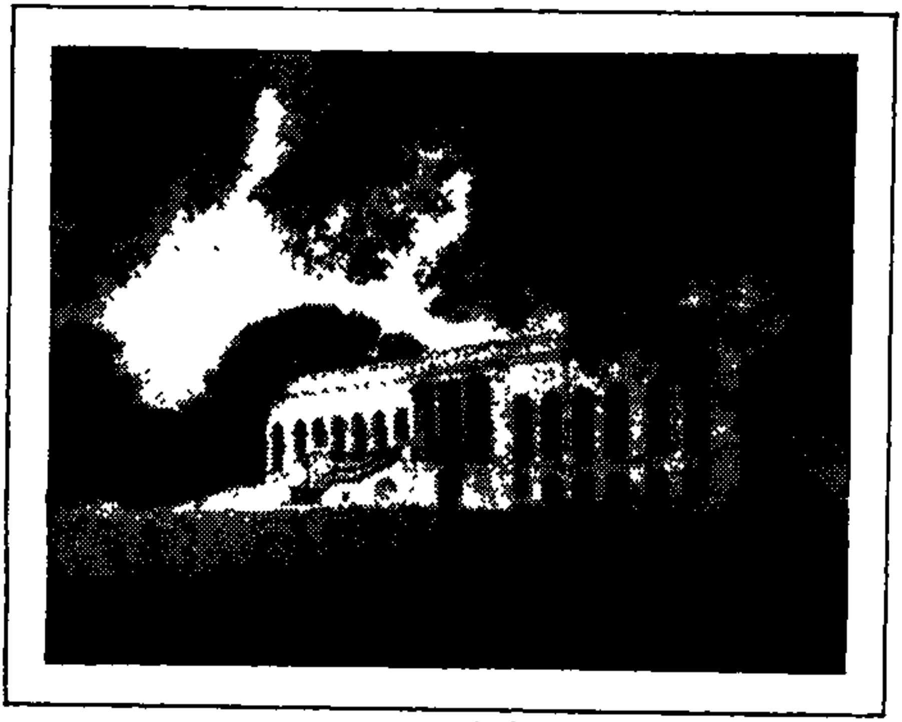

ন্যাশনাল লাইব্রেরি

জাতীয় গ্রন্থাগারের বাংলা বইয়ের সংগ্রহ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের দুষ্প্রাপ্য বইপত্র; এবং বর্তমান শতকের, বিশেষ করে ১৯৫৪-এর পরবর্তী প্রকাশন। এই সময়কার বাংলা বইয়ের সংগ্রহে জাতীয় গ্রন্থাগার বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। কারণ, ডেলিভারি অব বুকস অ্যাক্টে ভারতে প্রকাশিত সব বাংলা বইয়ের একটি করে কপি জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেবার কথা। সাহিত্য পরিষৎ বা অন্য কোনো গ্রন্থাগার এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং পুরনো বইয়ের সমৃদ্ধির জন্যই তাদের খ্যাতি।

জাতীয় গ্রন্থাগারে বাংলা বইয়ের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে নানা সূত্রে। পুরনো দুষ্প্রাপ্য বইগুলির অধিকাংশই পাওয়া গেছে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কিছু বই ঐ লাইব্রেরির মাধ্যমেই এসেছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি যখন খোলা হল তখন বাংলা সরকার অনেক বই দান করেছিলেন। সরকার এসব বই মুদ্রাকরদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ১৮৬৭-এর রেজিস্ট্রেশান অব বুকস অ্যাক্ট অনুসারে। এর পর বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত

নেন যে ঐ আইনে যত বই পাওয়া যাবে তা থেকে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি যে কোনো বই বিনামূল্যে পেতে পারবে। যেহেতু লাইব্রেরিয়ানরা প্রায় সকলেই ছিলেন অবাঙালী, বাংলা বই সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সুযোগ পেয়েও তাঁরা সব সংগ্রহ করেননি। এ ছাড়া আছে দান। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহে বেশ কিছু মূল্যবান বাংলা বই আছে। রামদাস সেন সংগ্রহে বিগত শতকের কতকগুলি স্বল্পপরিচিত নাটক-নাটিকা, সামাজিক চিত্র ইত্যাদি রয়েছে। এ ছাড়া কিছু পুরনো বই কেনাও হয়েছে।

এই বিরাট সংগ্রহ সম্বন্ধে শুধু একটু আভাস দেওয়া যেতে পারে, বিস্তৃতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এখানে যে সব প্রসঙ্গের উপর বাংলা বই আছে তাদের কয়েকটি: অভিধান ও কোষগ্রন্থ; অনুবাদ; ধর্ম; নৃতত্ত্ব; বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা; বংশাবলী; ইতিহাস; ভূগোল; জীবনী; জ্যোতিষ; সাহিত্যগ্রন্থ; পুরনো পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি। বাঙালীর বিভিন্ন জাতির (যেমন, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য প্রভৃতি) উপর বেশ কিছু বই আছে। আবার এই সব জাতির মুখপত্রও কম নয়: যেমন, বৈদ্যহিতৈষিণী; কায়স্থ পত্রিকা; মাহিষ্য সমাজ ইত্যাদি।

বাংলা মুদ্রণের আদিযুগের উল্লেখযোগ্য যে সব বই জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার ও সাহিত্য পরিষদে রয়েছে, এখানেও তা পাওয়া যাবে। বাইবেলের অনুবাদ 'ধর্মপুস্তক' (১৮০১) এখানকার একটি দুষ্প্রাপ্য বই। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে এত বড় বই এই প্রথম। জাতীয় গ্রন্থাগারের পঞ্জিকার সংগ্রহ ভাল। প্রাচীনতম পঞ্জিকাটি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভবানীচরণ, কালীপ্রসন্ন, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক সাহিত্যের রূপকারদের পুরনো সংস্করণের অনেক বই সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্ররচনার বেশ কয়েকটি প্রথম সংস্করণ পাওয়া যাবে। আবার অনেক অখ্যাত অনালোচিত বইও লাইব্রেরির তাকে পড়ে আছে। হয়ত আজ পর্যন্ত কেউ পড়ে দেখেননি এদের মূল্য কতখানি।

বাংলা পত্রপত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটির নাম দেওয়া হল: আগমনী; ঐতিহাসিক চিত্র; অলকা; আত্মশক্তি; আর্যদর্শন; আয়ুর্বেদ; আয়ুর্বিজ্ঞান; বালক; বান্ধব; বঙ্গবাণী; বঙ্গদর্শন; বঙ্গদূত; বঙ্গমিহির; বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা; বসন্তক; ভাণ্ডার; ভারত মহিলা; ভারতবর্ষ; ভারতী; বিবিধার্থ সংগ্রহ; বিজ্ঞান; বিক্রমপুর; বীরভূম; ব্যবসা ও বাণিজ্য; চিকিৎসা-প্রকাশ; চতুরঙ্গ; দাসী; ধূমকেতু; দিগদর্শন; দুর্জনদমন মহানবমী; গল্পলহরী; গৃহস্থ; গুলিস্তান; হুতোম; কৃষিতত্ত্ব; কৃষি গেজেট; কাজের লোক; কল্লোল; মহিলা; মৌচাক; মুকুল; নবজীবন; নবনূর; নারায়ণ; নাচঘর; নাট্যমন্দির; মানসী ও মর্মবাণী; মাসিক বসুমতী; প্রবাসী; সবুজপত্র; সমাচারচন্দ্রিকা; সমাচার সুধাবর্ষণ; সমাচার দর্পণ; সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়; সঙ্গীত-বিজ্ঞান; সওগাত; সত্যপ্রদীপ; সচিত্র শিশির; সুপ্রভাত; বিশ্বভারতী পত্রিকা ইত্যাদি।

৬

উপরে আমরা শুধু মুদ্রিত গ্রন্থের কথা বলেছি। বাংলা পুথিও গবেষণার উপাদান। এই পুথিগুলি ছড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগারে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এই সব পুথি-সংগ্রহ সমীক্ষা করে 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়' (১৯৭৮) সংকলন করেছেন। প্রায় চল্লিশ হাজার পুথির বিবরণ এই তালিকায় পাওয়া যাবে। উপরে আলোচিত গ্রন্থাগার সমূহের পুথি সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে এই তালিকায়। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য দুষ্প্রাপ্য বাংলা বইয়ের যদি এমনি একটি ইউনিয়ন ক্যাটালগ সংকলন করা যায় তাহলে গবেষকদের কত সুবিধা হতে পারে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা যে-সব গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে গেছেন আজ আমরা তাদের ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু আমরা কি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করছি? এখন জমিদারী প্রথা লোপ পেয়েছে; ব্যক্তিগত বৃহৎ সংগ্রহ গড়ে ওঠবার সুযোগ নেই। আইনের সুযোগ পেয়েও কোনো একটা বা একাধিক লাইব্রেরিতে সব বইপত্র সংগ্রহ করা হয় না। জাতীয় গ্রন্থাগারে সব না হলেও অনেক বই আসে। কিন্তু এটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এখানকার সংগ্রহের উপর বাংলার নিজস্ব কোনো অধিকার নেই। আগে বাংলা চর্চার জন্য লন্ডনে যেতে হত। আর বর্তমানে আমরা বই সংগ্রহ করে রাখছি না বলে কয়েক দশক পরে বাঙালী গবেষককে যেতে হবে আমেরিকায়। কারণ সেখানে প্রায় গোটা কুড়ি কেন্দ্রে বাংলা বই সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

খ্রীষ্ট জন্মের ১২৭৫ বৎসর পূর্বে প্রাচীন মিশরের একটি গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথে এই বাণীটি খোদাই করা হয়েছিল: "Dispensary of the soul." ব্যক্তির নয়, গ্রন্থাগার সমগ্র জাতির আত্মার ঔষধাগার।

কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সচেতন নই।

কৃণাল সিংহ। প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৯৭২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংকলক। পরিষৎ-পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৪৬
Chaudhuri, Sibadas comp. *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the Asiatic Society*. Calcutta, 1968
Kesavan, B. S. *India's National Library*. Calcutta, 1961 pp. 155-67

বাংলা বইয়ের খবর

দেশের জনসাধারণ কি ভাবছে, কি করছে তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রকাশিত বইপত্রের বিবরণ থেকে। লং তাঁর 'ডেস্‌ক্রিপটিভ ক্যাটালগে'র (১৮৫৫) ভূমিকায় বলেছেন: "Popular literature is an Index to the state of the Popular mind."

শুধু জনগণের ভাবনা ও সংস্কৃতির দর্পণ হিসাবেই নয়, গ্রন্থ-তালিকা গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাসকারকেও পূর্ব-প্রকাশিত বইয়ের তালিকা অবশ্যই দেখতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা বইয়ের তেমন কোনো সামগ্রিক তালিকা নেই। মারাঠীতে, হিন্দীতে আছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত তামিল বইয়ের পঞ্জী প্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ু সরকার। কিন্তু বাংলায় তেমন কোনো সামগ্রিক তালিকা নেই। অবশ্য কোনো গ্রন্থ-পঞ্জীই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যদিও সংকলকের লক্ষ্য থাকে সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করা।

বাংলা বইয়ের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন তালিকার উপর। এদের মধ্যে লং সাহেবের ক্যাটালগগুলি প্রধান। রেভারেন্ড জেমস লং কলকাতা এসেছিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। কিছুকালের মধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাংলা বইপত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এই অনুরাগ ও অনুসন্ধানের ফলে তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি কয়েকটি গ্রন্থ-তালিকা। লং-সংকলিত বাংলা বইয়ের প্রথম তালিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ হলহেডের ব্যাকরণের চুয়াত্তর বছর পরে। এর পূর্বে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টের সঙ্গে সংযোজিত করা হয়েছিল একটি বাংলা বইয়ের তালিকা। তা ছাড়া পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশিত হত। সুতরাং যতদূর জানা যায় লং-ই সর্বপ্রথম পৃথকভাবে বাংলা বইয়ের তালিকা সংকলন করেছিলেন।

তালিকাটির নামপত্র এইরূপ: 'গ্রন্থাবলী/অর্থাৎ/লং সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত বঙ্গভাষার/পুস্তক সকলের/নাম/শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত/১৮৫২ সাল।'

পঁচিশ পৃষ্ঠার এই তালিকাটিতে শুধু বইয়ের নাম এবং বিষয় নির্দেশ ছাড়া আর কোন বিবরণ নেই। একমাত্র পত্রিকার ক্ষেত্রে সাল দেওয়া হয়েছে। বিষয় নির্দেশের জন্য বইয়ের নামের পাশে ই (ইতিহাস), উ (উপাখ্যান), গ (গল্প) প্রভৃতি সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। লং-এর ব্যক্তি-গত সংগ্রহের তালিকা এটি। সুতরাং ঐ সময় পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এখানে স্থান পেয়েছে।[১]

এর পর লং একে একে কয়েকটি গ্রন্থ-তালিকা প্রকাশ করেন। বইয়ের বাজারে ঘুরে ঘুরে এ জন্য তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রথমটি হল: ***Returns Relating to Native Printing-presses and Publications in Bengali, 1853-54.***

প্রেসে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করে তালিকা প্রণয়ন এই প্রথম। ১৮৫৩-৫৪ এই এক বছরে বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল ২৫১টি; সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল ১৯। কলকাতায় তখন বাংলা বই ছাপার জন্য প্রেস ছিল ৪৬টি। এই সব প্রেসে বই ছাপা হয়েছিল ৪,১৮,২৭৫ এবং পত্র-পত্রিকা ৮,১০০ কপি। পত্রিকার একটি পৃথক তালিকা আছে। বইপত্র সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে মোটামুটি তা হল এই: প্রকাশের স্থান; প্রেসের নাম; বই বা পত্রিকার নাম; প্রত্যেকটি বইপত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা; কত কপি ছাপা এবং বিক্রি হয়েছে; পৃষ্ঠা সংখ্যা ও দাম, ইত্যাদি। লেখকদের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা সংযোজিত করা হয়েছে। মৃত লেখকদের নাম তারকা-চিহ্নিত। ভূমিকায় লং বলেছেন, গত দশ বছরে কুড়ি লক্ষ কপি বাংলা বই কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচার লাভ করেছে। এটা সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লং সরকারের কাছে আর একটি তালিকা পেশ করেন। এর নাম: *A Return of the names and writings of 515 persons connected with Bengalee Literature, either as authors or translators of printed works, chiefly during the last fifty years.* .

এই সঙ্গে আছে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের একটি ক্যাটালগ, ১৮১৮ থেকে ১৮৫৫ কালখণ্ডে প্রকাশিত সকল বাংলা পত্র-পত্রিকার বিবরণ। প্রথম প্রকাশের তারিখ, কতদিন চলেছে; দৈনিক, মাসিক না সাপ্তাহিক; সম্পাদকের নাম ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যাবে এই তালিকায়।

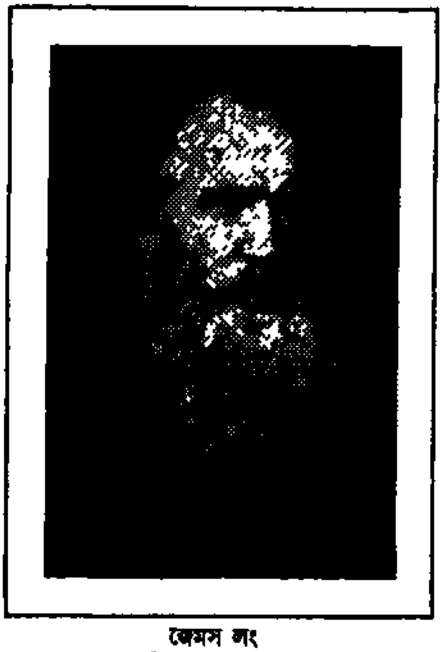

জেমস লং

৫১৫ জন লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত। তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় হানা ক্যাথেরিন মালেন্স ও তাঁর রচিত 'ফুলমণি ও করুণা'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় লং-এর *A Descriptive Catalogue of Bengali Works.* এই ক্যাটালগে বিগত ষাট বছরে যত বাংলা বই বেরিয়েছে তাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বইগুলি বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত। তিনটি প্রধান বিষয় বিভাগ, যেমন: শিক্ষা, সাহিত্য ও বিবিধ এবং ধর্ম। প্রত্যেকটি প্রধান ভাগের অন্তর্গত প্রসঙ্গগুলি পৃথক করা হয়েছে। শিক্ষার অন্তর্গত গণিত, অভিধান, ব্যাকরণ, নীতিকথা প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক রয়েছে। বই, পুস্তিকা, খ্রীষ্টান ধর্মসাহিত্য, পত্রিকা সবই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। বই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই দেওয়া হয়েছে। আর আছে বইয়ের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা। লং-এর মন্তব্য অনেক ক্ষেত্রে সরস। তবে কোথাও কোথাও তাঁর মন্তব্য সঠিক নয়। তালিকার অন্তর্ভুক্ত বইপত্রের মোট সংখ্যা প্রায় ১,৪০০। তালিকার অধিকাংশ বইপত্র উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে দেখা যাবে বলে লং জানিয়েছেন। কিনতে চাইলে নগদ মূল্যে পাওয়া যাবে রোজারিও কোম্পানীর অথবা হে কোম্পানীর দোকানে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ডি'রোজারিও কোম্পানী সে সময় বাংলা বইয়ের বৃহত্তম বিক্রেতা ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেই এই কোম্পানী একটি বাংলা বইয়ের তালিকা সংকলন করে জানিয়েছিল যে এসব বই তারা সরবরাহ করতে পারে। তালিকায় ছিল ২৭৫টি বইয়ের বিবরণ। বইয়ের নাম, লেখকের নাম, বিষয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা, দাম ইত্যাদি তথ্য দেওয়া হয়েছে। লং-এর তালিকাগুলির মতো এটিও ইংরেজীতে সংকলিত।

ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগে'র ভূমিকায় লং বলেছেন যে তিনি বাংলা বইয়ের একটি বিস্তৃততর তালিকা প্রেসের জন্য তৈরি করছেন। কিন্তু সে তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। যে তালিকাটি তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তার মূল্য আমাদের নিকট অপরিসীম। এটি বাংলা মুদ্রণের প্রথম ষাট বছরে প্রকাশিত বইপত্রের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা। তালিকাটি ছেপেছিল স্যান্ডার্স কোন্‌স কোম্পানী। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পরিশিষ্টে তালিকাটি পুনর্মুদ্রিত করায় আমাদের নিকট সহজলভ্য হয়েছে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লং আর একটি তালিকা সংকলন করেন। ৫৬ পৃষ্ঠার এই তালিকাটি

হল: *Catalogue of the Vernacular Literature Committee's Library*. মোট ১৪৪টি বই তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। বইগুলি কিনে দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। লং লেখক ও বইয়ের নাম, পৃষ্ঠাসংখ্যা ও দাম দিয়েছেন। বিষয়নির্দেশও আছে। একটি দৃষ্টান্ত: "পাঁচিমালা। History of Durga's Limbs. pp. 11 ; 1 anna." দাম সম্বন্ধে লং জানিয়েছেন যে এটা সঠিক নয়, কাছাকাছি। কারণ বাংলা বইয়ের দাম "very fluctuating."

১৮৫৭ বিপ্লবের পর সরকার লং সাহেবকে অনুরোধ করলেন প্রকাশিত বইপত্রের বিবরণ সংকলন করবার জন্য। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা বইপত্রে বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হয়েছে কিনা তা জানা। লং কলকাতার প্রত্যেক প্রেসে ঘুরে ঘুরে সংকলন করলেন: *Returns relating to publications in the Bengali language, in 1857 to which is added, a list of the Native Presses, with the books Printed at each, the price and character with a notice of the past condition and future prospects of the vernacular Press of Bengal*. Calcutta, 1859.

বাংলা বই ছাপার প্রেসের সংখ্যা তখন কলকাতায় ছিল ৪৬। কোন প্রেসে ঐ বছর কি কি বই ছাপা হয়েছে, তাদের দাম কত, মোট কত কপি ছাপা হয়েছে ইত্যাদি বিবরণ পাওয়া যাবে। লং-এর হিসাব অনুসারে ঐ বছর কলকাতায় ছাপা হয়েছিল ৩২২টি বইপত্র এবং এদের মোট মুদ্রণ সংখ্যা ৬, ৫৬, ৩৭০। সংস্কৃত প্রেস ছেপেছিল সবচেয়ে বেশী কপি,—৮৪,২২০; তার পরেই ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের স্থান—৫৫,০০০ কপি। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ে'র নবম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল দশ হাজার কপি। 'আলালের ঘরের দুলালে'র মুদ্রণ সংখ্যা ২,০৫০ কপি; ১৮০ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ছিল বারো আনা। লং প্রকাশিত পুস্তকের একটি বিষয় সারণী দিয়েছেন। তা থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী কপি ছাপা হয়েছিল শিক্ষাবিষয়ক, ৪৬টি বইয়ের ১,৪৫,৩০০ কপি; ১৯টি পত্রিকার ১,৩৬,০০০ কপি বাজারে ছাড়া হয়েছিল। গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা ছিল ২৮, মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩,০৫০। রিপোর্টের ভূমিকায় লং প্রত্যেক শ্রেণীর বইপত্রের উপর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। এরূপ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা লং অন্য কোনো তালিকায় দেননি। এই হিসাবের মধ্যে পত্রিকার সংখ্যাও ধরা হয়েছে।[২]

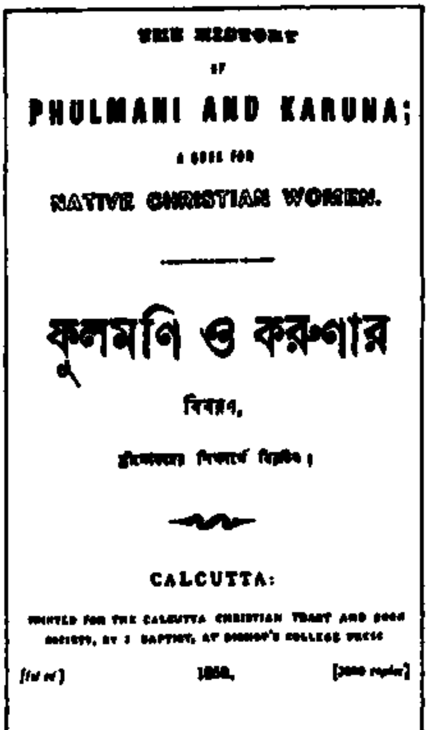
THE HISTORY
OF
PHULMANI AND KARUNA;
A BOOK FOR
NATIVE CHRISTIAN WOMEN.

ফুলমণি ও করুণার
বিবরণ,

CALCUTTA:

লং এই রিপোর্টে এমন একটি সুপারিশ করেছিলেন যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি সরকারকে বলেন, দেশীয় ভাষায় যেসব বইপত্র বের হয় তার সঙ্গে সরকারের পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জনসাধারণের চিন্তাভাবনা অভাব-অভিযোগ এদের মধ্য দিয়েই জানা যায়। শুধু বিপ্লবের আশংকা দূর করবার জন্যই নয়, সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্যও বইপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে সেতুবন্ধন প্রয়োজন। সরকার এ প্রস্তাব মেনে নেবার ফলে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হল 'প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুকস অ্যাক্ট'। এই আইন অনুসারে সকল প্রেসকে বই, পুস্তিকা, পত্রপত্রিকা যা-কিছু ছাপা হবে সব বিনামূল্যে সরকারের নিকট জমা দিতে বাধ্য করা হয়।

লং-এর সর্বশেষ বাংলা বইয়ের তালিকাটি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও 'নীলদর্পণ' প্রচারের দায়ে লং-এর কারাদণ্ড হয়েছিল তথাপি তালিকা প্রণয়নে তাঁর দক্ষতা যে অনন্য এ বিষয়ে সরকারের সন্দেহ ছিল না। তাই প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যখন বাংলা বই পাঠানোর কথা উঠল তখন এ সব বইয়ের তালিকা তৈরি করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন রেভারেন্ড লং। তালিকাটির নাম: *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets forwarded by the Government of India to the Paris Universal Exhibiton of 1867*...

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশিত কিছু হিন্দী, ফারসী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার বইয়ের তালিকাও এই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

১৪

নিত্তে ভবানীর কবি	ক
নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি	প
নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকা ১৮৪১	পং
নিত্যানন্দ সভা	পং
নিদানার্থ প্রকাশিকা	ঠ
নিধুবাবুর গীত	ক
নিবেদন পুস্তক	ধ
নিয়ম সেবা	বৈ
নির্ম্মল ধর্ম্ম নির্ণয়	ধ
নিশাকর ১৮৫১	সং
নিশ্চয়ার্থক পত্র	সং
নিস্তার রত্নাকর	ধ
নীতিকথা ১	নী
——— ২	—
——— ৩	—
——— ৪	—
নীতি দর্শন	র
———বাক্য	নী
———বোধ	নী
———বোধক ইতিহাস	নী
———শতক	নী
নীলকমল অভিধান	শ
নীল বিষয়ক আইন	ব্য
নীলু রামপ্রসাদের কবি	ক
নূরেল ইমান্	ম
নূতন চরিত্র	ধ
ন্যায় দর্শন	পদ

পক্ষি বিবরণ	পদ
পঞ্চ কল্যাণ	
———দশী	[illegible]
———পক্ষী	পা
পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী	পা
———	প
পঞ্চানন গীত	প
পঞ্জাব ইতিহাস	[illegible]
পঞ্জিকা (১৮২৪ সনের)	পং
পড়িবার বহি	প
পণ্ডিত ও সরকার	ব
পণ্ডিত বৈদ্যোদ্ধার	প
পত্র কৌমুদী	প
———চিন্তামণি	.
———ধারা	॰
পথ্য প্রমাণ	[illegible]
পদ কল্পলতিকা	টা
———	প
পদকাবলি	
পদাঙ্ক দূত	টা
পদাবলী	ব
পদার্থ প্রবোধ	[illegible]
———বিদ্যা (ভক্তাবোধিনী-	
তে মুদ্রিত	পব
———(কৃষ্ণমকৃত)	পব
———(গ্রেটকৃত)	পব
পরমার্থ সংগীত	[illegible]

বাংলা বইয়ের প্রথম ক্যাটালগ

লং-এর তালিকায় প্রাধান্য পেয়েছে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা এবং অল্প কয়েকটি সংস্কৃত বই। এদের মোট সংখ্যা ২৯০। এর সঙ্গে যোগ হবে ঐ বছরে প্রকাশিত ৬৫টি মুসলমানী সাহিত্যের বই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত বিশেষ বিষয়ক ৭৭টি বইপত্র তালিকায় স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া লং দিয়েছেন ১৮৪টি বাংলা সামাজিক নাটকের নাম। এই শ্রেণীর বই কোনো সময় সীমায় নিবদ্ধ নয়। ১৮৫০-এর নাটকও আছে। অন্যত্রও নির্বাচিত পুস্তকের তারিখ সূচীপত্রের নির্দেশ মেনে চলেনি। মনে হয় লং বাংলা সামাজিক নাটকের ঐশ্বর্য কিংবা কৌতূহলোদ্দীপকতার উপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন। বাঙালী প্রকাশকদের মধ্যে একমাত্র আই. সি বোস কোং প্রদর্শনীতে পৃথক স্থান পেয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বসু পাঠিয়েছিলেন ৮টি বই, এর মধ্যে পাঁচটি মধুসূদনের।

লং যে ভাবে গ্রন্থবিবরণী দিয়েছেন তার নমুনা দেওয়া হল 'Chitabilasini—On the affection of a Woman for her husband, by Shrimat Krishna Kamini Dasi, 12 mo, pages 72, 6 annas, 1863"

ক্যাটালগে সকল ক্ষেত্রে লেখকের নাম দেওয়া হয়নি। কোনো কোনো সাময়িক পত্রকেও বই হিসাবে গণনা করা হয়েছে।

তালিকার মুখবন্ধ থেকে জানা যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বই ছাপার প্রেসের সংখ্যা ছিল ৪৬, দুই দশকে তা বেড়ে হয়েছে ৭০।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের এই তালিকাটি দুষ্প্রাপ্য ছিল। ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩৭১ এর শীত সংখ্যায়।

এর পূর্বে বাংলা বইয়ের আর একটি ক্যাটালগ পাওয়া গেছে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। লন্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে বাংলা সরকার পাদ্রি রবিনসনকে বাংলা ও সংস্কৃত বইয়ের তালিকা সংকলনের ভার দেন। রবিনসনের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় কাজটি সম্পূর্ণ করেন রেভারেন্ড জে ওয়েঙ্গার। তালিকাটির নাম *A Catalogue of Sanskrit and Bengalee Publications printed in Bengal* Calcutta, 1865

১৪০০ বই ৩৯টি পত্রপত্রিকা এবং ৪৩টি ছাপাখানার বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। বইপত্র সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে বইয়ের নাম, লেখক, সম্পাদক বা অনুবাদক, বিষয়বস্তু, আকার মুদ্রাকর অথবা প্রকাশকের নাম ছাপা কপির সংখ্যা দাম সংকলকের মন্তব্য। বইগুলিকে ৩০টি বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে—অনুবাদ আইন ধর্ম পাঠ্যপুস্তক ও অভিধান, সাধারণ সাহিত্য বিধবা বিবাহ, দর্শন ব্রাহ্মসমাজ, খ্রীষ্টধর্ম, ইত্যাদি।

২

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান অব বুকস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হবার পর মুদ্রাকর সরকারের নিকট বই জমা দিতে থাকে। এই সব বই এবং পত্রপত্রিকা তালিকাবদ্ধ করবার জন্য সরকার নির্দেশ দেন। ত্রৈমাসিক ক্যাটালগ আইন অনুসারে পাওয়া বইপত্রের বিবরণ থাকে। 'ক্যালকাটা গেজেটে'র সাপ্লিমেন্ট হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়। বইপত্রের প্রকাশনা সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য আর কোনো তালিকায় পাওয়া যায় না। অন্যান্য তালিকায় যে সব তথ্য থাকে তার অতিরিক্ত পাওয়া যাবে প্রকাশকের নাম (প্রতিষ্ঠান নয়), প্রকাশের সঠিক তারিখ, লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করলে প্রকৃত নাম, কত কপি ছাপা হয়েছে সেই সংখ্যা, স্বত্বাধিকারীর নাম এবং ইংরেজীতে বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিষয় পরিচিতি। এই 'কোয়ার্টারলি ক্যাটালগ'টি সাধারণতঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হিসাবে পরিচিত। ১৮৬৭-এর পরবর্তীকালের বাংলা গ্রন্থ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই ক্যাটালগ অপরিহার্য। এর প্রথম সংখ্যা বের হয় ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৭।

দুঃখের বিষয় এমন প্রয়োজনীয় তালিকাটির প্রকাশ এখন অনেক পিছিয়ে আছে। তাছাড়া বই জমা সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের জন্য অনেক বই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় না, সুতরাং এর মূল্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

বাংলা মুদ্রণে এবং বাংলা সাহিত্যে খ্রীষ্টান মিশনারিদের দান অনস্বীকার্য। এই দানের যথার্থ সমীক্ষার জন্য জানা দরকার কি ধরনের বইপত্র তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ কপি বই ছেপে বিতরণ বা বিক্রয় করার জন্য তাঁদের সংগঠন কেমন ছিল তার পরিচয় নেওয়াও প্রয়োজন। জন মারডকের *Catalogue of the Christian Vernacular Literature of India· With hints on the Management of Indian Tract Societies*, 1870, থেকে দরকারী তথ্য পাওয়া যাবে। বিবিধ প্রকারের প্রকাশন বাদ দিয়ে ১৮২০ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্মমূলক বাংলা বইপত্রের মোট সংখ্যা ছিল ৩৭,২৬,৮৫০। এদের মধ্যে বইয়ের সংখ্যা ১,১৩,৯৭৫; বাকি পুস্তিকা। আমাদের মুদ্রণ, সাহিত্য এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়

নিয়ে আলোচনা করেছেন মারডক। বাংলা বইয়ের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় আছে। তালিকায় পাওয়া যাবে বই ও লেখকের নাম, প্রকাশের বছর, পৃষ্ঠা ও সংস্করণ সংখ্যা, এবং মুদ্রণ সংখ্যা।

বিদ্যালয়ের উপযোগী বাংলা বইয়ের একটি তালিকা সংকলন করেছিলেন বাংলা সরকার কর্তৃক নির্বাচিত School Book Revision Committee on Bengali School Books. কমিটির আটজন সদস্যের মধ্যে বাঙালী ছিলেন: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তালিকাটির নাম: *Catalogue of Bengali Books for Schools, Vernacular Medical Classes, Normal Schools,* etc. Calcutta, 1875.

ক্যাটালগ সংকলনের প্রয়োজন কেন দেখা দিল কমিটি ভূমিকায় তার কারণ নির্দেশ করেছেন। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে এবং বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য বই কিনতে সহায়তা করবে এই তালিকা। অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের বইগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে কালের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে কমিটির একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ বই বিভিন্ন ইংরেজী বই থেকে অনুবাদ অথবা তাদের পরিবর্তিত রূপ।

এই ক্যাটালগে অন্তর্ভুক্ত পুস্তকের সংখ্যা ১,৫৪৪। চৌদ্দটি প্রধান বিষয় বিভাগে এই বইগুলি বিন্যস্ত। এই সব প্রধান ভাগের মধ্যে আবার কয়েকটি করে শ্রেণী আছে; যেমন, 'সাহিত্য' বিভাগের বই বর্ণপরিচয়, পাঠমালা, প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যান, অন্যান্য আখ্যান ও কাব্য—এই ক'টি শ্রেণীতে বইগুলি সাজানো হয়েছে। মোট শ্রেণীর সংখ্যা ৫৪। তখন বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিসের জন্য বই উল্লেখ করা হয়েছে ৪১টি, আয়ুর্বেদের বই ২৭। এ ছাড়া অ্যানাটমি, সার্জারি, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপরও বই আছে। লং-এর তালিকায় বই সম্বন্ধে যে-সব খবর পাওয়া যায় এখানেও তা পাওয়া যাবে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে সরকার মুদ্রাকরদের নিকট থেকে প্রত্যেক বইয়ের কয়েক কপি করে সংগ্রহ করতেন। সে সব বই এদেশে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে বই পাঠানো হত এবং তার ফলে লণ্ডনে দুটি সমৃদ্ধ বাংলা বইয়ের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। দুটি সংগ্রহেরই মুদ্রিত পুস্তক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁদের নিকট এদের সহায়তা বিশেষ মূল্যবান। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাংলা বইয়ের ক্যাটালগ সংকলন করেন J. F. Blumhardt. ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ডটি বের হয়। দুই কলামে ছাপা ১২০ পৃষ্ঠার এই ক্যাটালগে বইগুলি লেখকের নামানুসারে বিন্যস্ত। শেষ ভাগে বইয়ের নাম-সূচী দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাবে ১৮৮৬ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাপ্ত বাংলা বইয়ের বিবরণ। ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে; সংকলক ব্লুমহার্ট। এই খণ্ডে নাম-সূচীর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে বিষয়-সূচীর। প্রথম খণ্ডে কোনো বিষয়-সূচী ছিল না বলে ঐ খণ্ডের বইগুলিকেও এই বিষয়-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শেষ বা তৃতীয় খণ্ডটিতে (১৯৩৯) পাওয়া যাবে ১৯১১ থেকে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রন্থেব বিবরণ। এখানেও নাম-সূচী ও বিষয়-সূচী দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগ থেকে গ্রন্থ-বিবরণীর একটি নমুনা দেওয়া হল:

"Jagach-chandra Vidya-Vinoda. শ্রীবাৎস চরিতম্ [Vatsya-Charita, An historical account of the Vatsya Brahmans and Kayasthas of Bhatikhain, in Chittagong in Bengali and Sanskrit.] pp ii, viii, 216. *Chittagong* ১৮৩৭ [1916] 12"

ইংরেজদের পক্ষে তুচ্ছ অথচ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস রচনার জন্য মূল্যবান বইটি বিদেশে সংরক্ষিত আছে।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির ক্যাটালগের সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। কারণ উভয়ের সংকলক অধ্যাপক ব্লুমহার্ট। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরির ক্যাটালগের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার সঙ্গে অসমীয়া ও ওড়িয়া বইয়ের তালিকাও পৃথক ভাবে দেওয়া হয়েছে। ছয়টি শ্রেণীতে বইগুলি বিন্যস্ত: কলা ও বিজ্ঞান; ইতিহাস ও ভূগোল; সাহিত্য; পাঠ্যপুস্তক; ধর্ম; বিবিধ। একেবারে শেষে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থ নাম ও ব্যক্তিনামের সূচী। ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ড বের হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত পুস্তকের বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। এবার বইয়ের বিন্যাস নাম (টাইটেল) অনুসারে। ব্যক্তি-সূচী ও বিষয়-সূচী যুক্ত করায় বই খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিতে (এখন জাতীয় গ্রন্থাগার) ২২,০০০ বাংলা বইপত্র সংগৃহীত হয়েছিল। এই সংগ্রহের তালিকা মুদ্রিত হয়েছে চার খণ্ডে (১৯৪১-

১৯৬৩)। গ্রন্থ-বিবরণী বিন্যস্ত হয়েছে লেখকের নাম অনুসারে। লেখকের নাম যে সব ক্ষেত্রে নেই সেখানে বইয়ের নামকেই লেখকের স্থান দেওয়া হয়েছে। এই ক্যাটালগে পত্র-পত্রিকার বিবরণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ডে অর্থাৎ 'এ' থেকে 'এল' পর্যন্ত প্রকাশের বৎসর বাংলা ও ইংরেজী—এই দুটিতেই দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দুই খণ্ডে শুধু ইংরেজী সাল পাওয়া যাবে। তবে অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে যোগ করা হয়েছে প্রকাশকের নাম, যা পূর্বের দুই খণ্ডে ছিল না। পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং বইয়ের আকার দেওয়া হয়নি। এই ক্যাটালগের প্রধান গুণ হল প্রতিটি বইয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষেপে আভাস দেওয়া। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগেও ইংরেজীতে লেখা এই ধরনের টীকা আছে। ইংরেজদের সুবিধার জন্যই এটা করা হয়েছিল।

ভারতীয় সাহিত্যের নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেছেন সাহিত্য আকাদেমি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায়। ১৯০১ থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত বই পঞ্জীতে স্থান পেয়েছে। *The National Bibliography of Indian Literature*-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই খণ্ডে আছে অসমীয়া, বাংলা, ইংরেজী ও গুজরাটী বইয়ের পঞ্জী। নির্বাচিত বাংলা পঞ্জীতে আছে প্রায় ৫০০ বই। মোট আটটি শ্রেণীতে বইগুলি বিন্যস্ত। গ্রন্থ-বিবরণী দেওয়া হয়েছে ইংরেজীতে। জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগের মতো এখানেও প্রতিবর্ণী-করণের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। বইয়ের নাম ও লেখকের নাম এক বর্ণানুক্রমে সূচীবদ্ধ করায় প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি খুঁজে বার করা সহজ হয়েছে।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা'। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই তালিকা সংকলিত হয়েছে। তালিকার ২,৩০০ বই ডিউইর দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। শেষ ভাগে আছে বর্ণানুক্রমিক সূচী। চারটি পরিশিষ্টে অতিরিক্ত তথ্য যা পাওয়া যাবে তা হল এই: রবীন্দ্রচর্চা: গ্রন্থপঞ্জী; রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পত্রপত্রিকার তালিকা; নির্বাচিত বাংলা পত্রপত্রিকার তালিকা এবং নির্বাচিত প্রকাশকদের তালিকা।

অনেক গ্রন্থাগারের মুদ্রিত পুস্তক তালিকা রয়েছে। কিন্তু খুব কম তালিকা থেকেই বই সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে তিনটি তালিকার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির বাংলা বইয়ের মুদ্রিত তালিকা তিনবার বেরিয়েছিল: এই তালিকার সর্বশেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ের তালিকাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। পরিষদের নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ ছাড়া দান হিসাবে প্রাপ্ত বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্তের সংগ্রহ পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে। শেষভাগে একটি বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থসূচী দেওয়া না থাকলে তালিকা থেকে বই খুঁজে পাওয়া কঠিন হত। গ্রন্থকারের কোন সূচী নেই।

এদিক থেকে সবচেয়ে ভালো শিবদাস চৌধুরী সংকলিত এসিয়াটিক সোসাইটির বাংলা বইয়ের ক্যাটালগ। গ্রন্থবিবরণীতে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই দেওয়া হয়েছে। সূচীটিও সুসংকলিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাংলা পত্রপত্রিকার রচনা-সূচী সংযোজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, চৈতন্য লাইব্রেরি এবং আরও অনেক পাবলিক লাইব্রেরির ছাপানো তালিকা আছে। সবগুলির কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়।

উপরে যে সব তালিকার কথা বলা হয়েছে সেগুলি পুরনো বইপত্রের খবর দিতে পারে। সমকালীন বইয়ের খবর পাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়ে নির্ভরযোগ্য তালিকার অভাবে। বিদেশে প্রকাশকদের সংস্থা এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক তালিকা প্রকাশ করে। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা এ কাজে হাত দিয়ে তিন খণ্ড 'পুস্তক তালিকা' প্রকাশ করেছিলেন। সর্বশেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এ। কয়েকটি বিষয় বিভাগে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন বইগুলিকে সাজানো হয়েছে। বই, লেখক ও প্রকাশকের নাম এবং দাম শুধু এই বিবরণই পাওয়া যায়। তালিকায় শুধু যে সব প্রকাশক সমিতির সভ্য তাদের বই উল্লেখ করা হয়েছে। সভ্য নন, এমন প্রকাশকও অনেক আছেন। সুতরাং তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে প্রাপ্ত বইপত্রের কোয়ার্টার্লি ক্যাটালগ নিয়মিত বেরুলে নবপ্রকাশিত প্রকাশনের খবর পাওয়া সহজ হত। পূর্বেই বলেছি এই ক্যাটালগের প্রকাশ পিছিয়ে থাকে, কখনো কখনো দশ-পনেরো বছর। সুতরাং নতুন বইয়ের খবর ক্রেতা ও পাঠকের নিকট পেঁছে অনেক দেরীতে।

৩

নতুন বইয়ের তালিকা সংকলনের আর একটি সুযোগ পেয়েও আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার 'ডেলিভারি অব বুকস্ (পাব্লিক লাইব্রেরিজ্) অ্যাক্ট' পাশ করেন। এই আইন অনুসারে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের

দ্'টি গ্রন্থাগার প্রত্যেকটি বইয়ের একটি করে কপি পাবার অধিকারী হয়। পরে একটি সংশোধনী দ্বারা দৈনিক এবং সাময়িকপত্রও এই আইনের আওতায় আনা হয়। আইন দ্'টির মধ্যে দ্'টি মৌলিক পার্থক্য আছে। ১৮৬৭-এর আইনে বই সরকারের নিকট জমা দেবার দায়িত্ব ছিল মুদ্রাকরের; ১৯৫৪-এর আইনে এ দায়িত্ব এসে যায় প্রকাশকের উপরে। প্রথম আইনে সরকারী বইপত্র বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় আইনের আওতা থেকে কিছুই বাদ পড়েনি।[৩]

কিছুকাল নিয়মিত বইপত্র আসার পর ১৯৫৮ থেকে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি' বা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন শ্রুর্ হয়। প্রথম ত্রৈমাসিক সংখ্যা (পরে মাসিক হয়েছে) তারপর বৎসরের সবগুলি সংখ্যা ক্রমচয়িত হয়ে একটি বার্ষিক খণ্ড। ভারতের সব ভাষার বই রোমান হরফে বিষয়ানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে বর্ণানুক্রমে। পঞ্জীর শেষে প্রদত্ত সুসংকলিত সূচীর সাহায্যে নির্দিষ্ট বইটি খ্'জে পাওয়া সহজ। তবে সকল ভাষার মিলিত তালিকা থেকে একটি সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে বাংলা বইগুলি খ্'জে বার করা সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য স্থির হয় যে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব লিপিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার পঞ্জী প্রকাশ করবেন। এই সিদ্ধান্তের ফল হিসাবে প্রকাশিত হল 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী। বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮'। বছর ছয় সাত প্রকাশ করেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি নিয়মিত প্রকাশিত হলে বাঙালী পাঠক উপকৃত হতেন। এখানেও গ্রন্থবিবরণী বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত, প্রয়োজনীয় সব তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অতিরিক্ত খবর বইটি অনুবাদ কিংবা শিশুদের উপযোগী হলে তার উল্লেখ। বাঁধাই কি ধরনের তার নির্দেশও পাওয়া যাবে। বইয়ের নাম ও লেখক সূচী ছাড়া রয়েছে একটি প্রকাশকদের তালিকা।

রোমান হরফে সংকলিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি' কয়েক বছর যাবৎ বন্ধ আছে। এটি নিয়মিত প্রকাশিত হলে বাংলা বইয়ের খবর পাওয়া যেত।

অল্পদিন হল সুনীলকুমার রায়ের সম্পাদনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'বাংলা গ্রন্থপঞ্জী' প্রকাশিত হয়েছে। এটি ক্রয়লভ্য বাংলা গ্রন্থের বিষয়ানুগ তালিকা। ১৩৮৫ সালের চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত এবং বাজারে ক্রয়লভ্য ৯৩১২টি বই আলোচ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য তালিকার মতো বই সম্বন্ধে সব তথ্যই পাওয়া যাবে। মূল পঞ্জীর পরে আছে সূচী। এ ছাড়া কয়েকটি পৃথক পঞ্জী বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। এগুলি হল: রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জীর বিষয়ানুগ বিন্যাস; কিশোর ও শিশুসাহিত্যের পঞ্জী এবং সদ্যসাক্ষরদের উপযোগী বইয়ের তালিকা। সংকলনে কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালের বাংলা বই সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য পঞ্জীটি দরকারী।

নতুন বইয়ের খবর পাবার জন্য আমাদের আমেরিকান সরকারের দ্বারস্থ হতে হবে বলে মনে হয়। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস সব ভাষার বই কেনে। অবশ্য কিছুটা নির্বাচন করে। দিল্লীতে এই বইগুলি ক্যাটালগ করে আমেরিকায় পাঠানো হয়। সংগৃহীত বইগুলির একটি তালিকা প্রতি মাসে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। সুমুদ্রিত এই তালিকাটির নাম: *Accessions List : India.* বই সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকেও বই কেনা হয়। সে সব বইয়ের অনুরূপ ষান্মাসিক তালিকা বের হয়। সুতরাং বাংলা দেশের বাংলা বই সম্বন্ধে খবর পাবারও এই তালিকাটি আমাদের প্রধান অবলম্বন। লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ছাড়া কোন ঊনিশটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা বইয়ের সংগ্রহ গড়ে উঠছে তাদের নাম তালিকাটি থেকে পাওয়া যাবে।

'বাংলা সাময়িকপত্রে'র দুটি খণ্ডে পাওয়া যাবে ১৮১৮ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের বিবরণ। সংকলক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যেক পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সঠিক তারিখ, ইতিহাস, সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নাম এবং রচনার নমুনা প্রভৃতি বিবরণ পাওয়া যাবে। প্রথম খণ্ডটির বিবরণ বিস্তৃততর। দুঃখের বিষয় এখনও কেউ ১৯০১ থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িকপত্রের পরিপূরক তালিকা সংকলন করলেন না। তবে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে সব সাময়িকপত্রের বিবরণ পাওয়া যাবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত সাময়িমপত্রের তালিকা (১৩৪০) থেকে প্রায় ৮৪০টি পত্রিকার নাম পাওয়া যাবে। পত্রিকার নাম বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত।

এখন যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পাওয়া যাবে প্রেস রেজিস্ট্রার কর্তৃক সংকলিত বার্ষিক রিপোর্ট 'প্রেস ইন ইণ্ডিয়া'-তে।

যে কোন সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল তার শিশুসাহিত্য। বাণী বসু একটি সুন্দর পঞ্জী সংকলন করেছেন। তাঁর 'বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী'তে (১৩৭২) বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে ১৮১৮ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী বই। বই সম্বন্ধে যেসব বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা এই: গ্রন্থকার ও বইয়ের নাম; সংস্করণ, প্রকাশের স্থান, প্রকাশক, সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে এবং টীকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া

আছে শিশু-পত্রিকার একটি তালিকা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য'ও একটি তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

বিশেষ বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থপঞ্জী আছে। বইয়ের সঙ্গে বা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় অনেক পঞ্জী ছড়িয়ে আছে। সেই পঞ্জীর উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়, আমাদের তা লক্ষ্যও নয়। আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব।

অনুবাদ সাহিত্যের খবরাখবর পেতে হলে দেখতে হয় *Index Translationum.* লীগ অব নেশনসের আমল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এখন প্রতি বছর একটি খণ্ড বের হয়। প্রকাশক ইউনেস্কো। পৃথিবীর সব ভাষার অনুবাদ সাহিত্যের পরিচয় একটি খণ্ডের মধ্যে দেওয়া হয়। বাংলায় কোন ভাষা থেকে কি বই অনুবাদ হয়েছে বা অন্য ভাষায় বাংলা থেকে কোন বই অনুবাদ হয়েছে তা খুঁজে নিতে হবে। এক দল লোক আজকাল প্রচার করে থাকে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে এখন অপঠিত। 'ইনডেক্স ট্রানস্লেশানাম' ঘাটলে দেখা যাবে এখনও তাঁর বই বিভিন্ন ভাষায় কত অনুবাদ হয়।

এই বই থেকে শুধু ভারতীয় অনুবাদ গ্রন্থগুলি পৃথকভাবে সংকলিত করে জাতীয় গ্রন্থাগার ছাপিয়েছে *Index Translationum Indicarum* নাম দিয়ে (১৯৬৩)। ইনডেক্স ট্রানস্লেশানামের ২-১১ খণ্ড থেকে এই সংকলনের সংশ্লিষ্ট বইগুলি নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। অনুবাদ সম্পর্কে আর একটি বই জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের *Bengali Literature in English* (1970).

রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে যে সব বইপত্র সরকার বাজেয়াপ্ত করেন তাদের তালিকা মাঝে মাঝে প্রকাশ করে থাকেন বাংলা সরকার। কেন্দ্রীয় বা যে কোনো রাজ্য সরকার বই বাজেয়াপ্ত করলে তার বিবরণ দেওয়া হয় তালিকায়। *List of Publications Proscribed in Bengal during the period from 1st March, 1910 to 9th December 1919.* প্রথম তালিকা। বাজেয়াপ্ত বইপত্রের সংখ্যা ১৭৮। বইপত্র সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য ছাড়া থাকে সরকারী আদেশের বিবরণ।

এই তালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯২০ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে বাজেয়াপ্ত করা ২০১৯টি বইপত্রের উল্লেখ আছে। তৃতীয় তালিকার সময় ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০; অন্তর্ভুক্ত বইপত্রের সংখ্যা ১,১১৮। সব খণ্ডের বিন্যাসরীতি এক নয়। তবে দরকারী তথ্য সব খণ্ড থেকেই পাওয়া যাবে। নানা ভাষার বই একই সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের বাইরে প্রকাশিত কিছু বইপত্রও এই তালিকায় পাওয়া যাবে। যেমন, প্রথম তালিকায় আছে জেনিভা থেকে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নাম।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বইপত্র বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ গড়েছিল। এদের বিবরণ পাওয়া যাবে K. S. Diehl সংকলিত *Early Indian Imprints* (1964)-এ, স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সনের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকোয়ারি' (৩২ খণ্ড)-তে লিখিত প্রবন্ধ থেকে এবং মুহম্মদ সিদ্দিক খানের 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা' বইটি থেকে। সিদ্দিক খান শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত বইয়ের কালানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যগ্রন্থের তালিকা সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। 'বাংলা সাহিত্যের অভিধান' প্রথম খণ্ড বের হবার পর কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। দেবকুমার বসুর 'বাংলা নাটক: ১৮৫২-১৯৫৭' নাট্যগ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা।

প্রবোধচন্দ্র সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য' (১৯৮০) একাধারে ছন্দ-সাহিত্যের পঞ্জী ও ধারাবাহিক আলোচনা। এ ধরনের বই এই প্রথম। তাঁর আর একটি বই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেটি হল 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' (১৩৬০)। ১৯১ পৃষ্ঠা থেকে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক ও তথ্যের বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তাদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ধর্ম ও দর্শনের বই এবং প্রবন্ধের একটি তালিকা পাওয়া যাবে কার্ল এইচ. পটার সম্পাদিত *Bibliography of Indian Philosophies* (1970)-এ।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সংকলিত *A Bibliography of dictionaries and Encyclopaedias in Indian languages* (1964) এর অন্তর্ভুক্ত আছে বাংলা অভিধান ও কোষগ্রন্থের তালিকা। কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় (১৭৪৩-১৮৬৭)' অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। প্রতিটি অভিধানের প্রয়োজনীয় তথ্যের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা। পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে অভিধানকারদের পরিচিতি। বইটি প্রকাশ করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে।

দিল্লীর কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ

করেছেন *Indian Scientific and Technical publications.* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর বাংলা বইয়ের তালিকা এই পঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে। দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। পুরনো বাংলা বই এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ১৯৬০-'৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের জন্য একটি পরিপূরক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং তাঁর উপরে লেখা বইয়ের বেশ কয়েকটি পঞ্জী সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপরিচয়' পথপ্রদর্শক হিসাবে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ললিত-কলা আকাদেমির উদ্যোগে প্রকাশিত পঞ্জীটি নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পঞ্জীটি পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা রচনা কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত বইয়ের বিবরণ পাওয়া যাবে। তৃতীয় বিভাগে দেওয়া হয়েছে ২২টি এসীয় ভাষায় রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ এবং রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা। চতুর্থ ভাগ ইংরেজী বইয়ের জন্য। পঞ্চম ভাগে পাওয়া যাবে ৪২টি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ এবং কবি-সম্পর্কিত পরিচিতি গ্রন্থের তালিকা।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের উপর রচিত পুস্তকের তালিকা (১৯৬১ পর্যন্ত) প্রকাশ করেছিলেন।

পুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী', ১ম খণ্ড, আমরা পেয়েছি ১৩৮০ বঙ্গাব্দে। এই খণ্ডে 'কবি-কাহিনী' থেকে 'রাজা ও রানী' পর্যন্ত পঁচিশটি বইয়ের বিবরণ আছে। বাংলায় এ ধরনের পঞ্জী আর নেই। পঞ্জী না বলে বলা উচিত রবীন্দ্র-গ্রন্থকোষ। একেকটি বই সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

অবিনাশ ঘোষাল সংকলন করেছেন 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী'। এখানেও শরৎচন্দ্রের বইগুলি সম্বন্ধে টীকা দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর সারাংশ দেওয়া এই পঞ্জীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীপক গোস্বামীর শরৎচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জীটি আধুনিক রীতিতে সংকলিত।

জীবিত লেখকের রচনাপঞ্জী আমাদের দেশে এক দুর্লভ জিনিস। এটি সম্ভব করেছেন অরুণ সেন 'বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জী' সংকলন করে (১৯৮০)। কালানুক্রমিক এই তালিকাটি নানা তথ্যে সমৃদ্ধ।

স্বাধীনতার পরে পুস্তক তালিকা রচনায় উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছে মনে হয়। প্রাক্‌স্বাধীনতা কালে কত গ্রন্থপঞ্জী বেরিয়েছে। আর বইয়ের বিবরণ সংগ্রহের জন্য কত কষ্ট করা প্রয়োজন ছিল। লং প্রেসে ঘুরে ঘুরে, ব্যক্তিগত সংগ্রহ দেখে দেখে বইয়ের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন! আর এখন একটি কেন্দ্রে সব বই জমা পড়া সত্ত্বেও বইয়ের তালিকা বের হয় না। এখনকার পাঠক বইয়ের খবর পান না, ভবিষ্যতের পাঠকরাও পাবেন না।

বাংলা বইয়ের পুরনো ক্যাটালগ দেখতে দেখতে কত বইপত্র পড়বার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কোথায় সেই বই? আমরা তাদের যত্ন করে রাখিনি, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। লং বলেছেন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ডের 'চিত্র পুস্তক' বা ছবির অ্যালবাম বেরিয়েছিল। ২০২টি পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্রের সংগ্রহ। এটি বাংলার শিল্পচর্চার ইতিহাসের দিক থেকেও যেমন মূল্যবান, তেমনি সামাজিক ইতিহাসের পক্ষেও। কিন্তু বইটি কোথায়? এমনি নানা বিষয়ের শত শত বইপত্র হারিয়ে গেছে।

নির্দেশিকা

১ অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সৌজন্যে এই তালিকাটি দেখবার সুযোগ পেয়েছি।
২ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৫৭ সালে বাংলা বই; দ্র. দেশ, ৯ বৈশাখ, ১৩৫৭
৩ Kesavan, B. S. *India's National Library,* Calcutta, 1961.

APPENDIX.

Extracts from the manuscript Proceedings of the Governor-General's Council (Revenue Department) relating to the printing of Halhed's *A Grammar of the Bengal Language* and a proposal for the establishment of a printing press under the Superintendence of Charles Wilkins The text has been printed without any correction The errors are obvious

—*Editor.*

REVENUE DEPT.

Fort William 9th January 1778.

Rev Dept

Friday

At a Council Present

The Hon'ble Warren Hastings
Governor General President

Richard Barwell Philip Francis Edward Whiler[1]	Esqrs

Read and approved the Proceedings of the 6th Instant

Govr Generals Minute on presenting a Bengal Grammer

The Governor General Lays before the Board the specimen of a Bengal Grammer written by[2] Mr Halhed and intended to be printed by Mr Wilkins which has been presented to him by those Gentlemen and He recommends it to this Board as a Work highly meriting their Countenance and Patronage besides the great labor and Assiduity which have been bestowed upon it a considerable Expence has been already incured in the Prosecution of it which if the Board concur in their opinion of the utility of such a Publication They will doubtless think it reasonable to reimburse He

[1] This is obviously a misprint for Edward Wheler (1733 1784) He was a member of the Supreme Council from 1777 in succession to Colonel Monson who died in 1776 was at one time much opposed to Warren Hastings, but later supported him steadily in Council, laid the foundation of St John's Church in the Governor-General's absence from Calcutta in April 1784, died in October, 1784 C E Buckland *A Dictionary of Indian Biography*, p 448

[2] This shows that the manuscript was already complete before January 1778 though the printing was deferred till a few months later in July-August of the same year.

will not at this time offer that or any other proposition to the Board or anticipate the Judgement which they may pass upon it after examination but content himself at present with simply recommending it to their perusal.

Fort William 20th February 1778.

Govr. General's Minute in favr. of Mess Halhed & Wilkins

Governor General.

On the 9th ultimo I recommended to the consideration of the Board and to their Patronage, a Work jointly undertaken by Messrs. Halhed and Wilkins which I thought likely to be attended with great advantages to the service. I mean the Composition and Printing of a Grammer of the Bengal Language. At the same time I laid before the Board a specimen of this performance already executed. This I understand to be nearly one half of the work. It is in my opinion and I hope the other Members of the Board will agree in the same sentiments, highly deserving not only the Encouragement, but the substantial Assistance of Government.

The original composition is I venture to pronounce on my own Judgement correct, and not devoid of Elegance. The form in which it is proposed to appear for the sake of giving it Publication is the Effect of an attempt hitherto untried in this Country, and has been executed with a degree of perfection which might have been expected only from long practice and successive Improvements. The Board will Judge whether in the present state and constitution of this Government it ought to be ru-mouned *(sic)* a part of its Duties to encourage the Efforts of Genius or to facilitate the introduction of new Arts by which the Dispatch of Business, may be quickened,[3] or even the general Intercourse of society rendered more practicable. For my own part, yielding to the impression of this Principle and convinced it could not be better applied than to the Occasion in question I have given every aid to the undertaking which it was in my power to afford it.

It was begun and continued by my advice and even solicitation.[4] It has been attended with much Trouble

[3] This underscores the objective of the work, *viz.* acquaintance of the Company's Civilians with the language of the 'Natives' so as to render them better fitted to deal with official matters and despatches much more quickly than it was possible before.

[4] Halhed corroborates the 'Solicitation' of the Governor-General in his learned Preface to the Grammar.

and some Expence. To encourage the prosecution of it, and to compensate for the Time which they shall have bestowed upon it, I venture to recommend that they be both directed to prosecute it under the sanction of Government with a Promise that the whole Impression when finished, which will amount to 1000 Copies, may be taken as the property of the Company, and that a Gratuity be allowed to the present proprietors of 30 Rupees for each. Copy to be distributed at the same rate to such of the servants of the Company, or others who may Chuse to take them under the Direction of the superintendant of the Khalsa Records.

If the Board shall deem this Proportion, from the novelty of it, improper, as I am well convinced from the liberal Encouragement which the Court of Directors have given to other Performances[5] much inferior both in Composition and utility, that I shall run no risk in what I shall now add, I request that the Board will permit me to receive from the Companys Treasury for the above purpose the sum which will be required for it, on my giving a Bond for the Amount, payable at the Expiration of two years from the Date of it unless the Court of Dircctors shall before the Expiration of that time release me by permitting the charge to be placed to their Account.

Opinions thereon

Mr. Francis

I approve of the undertaking and do not doubt but our giving it Encouragement will be approved of by the Court of Directors I would consent therefore to engage for 500 copies on the Terms proposed by the Governor and to recommend the Remainder of the Proposal to their favourable consideration. On this footing it will be unnecessary for the Governor to bind himself personally to be responsible for an Act in which I am willing to take my share.

Governor General

I entirely agree in the amendment made by Mr. Francis.

Mr. Wheler

I likewise agree

Resolutions

Resolved that 500 copies of the Bengal Grammer composed and printed by Messrs Halhed and Wilkins

[5] These refer, among others, to *A Code of Gentoo Laws* by N. B. Halhed, London, 1776 and *Ayeen-i-Akbery* tr. by Francis Gladwin, London, 1777.

be taken as the property of the Company, that a Gratuity be allowed to those Gentlemen of 30 Rupees for each copy and that it be recommended to them to prosecute the work under the sanction and protection of this Government.

Resolved further that the remainder of the Governor Generals Proposal on this subject be recommended to the favorable consideration of the Court of Directors.

Orders in consequence — Ordered that the Secretary do communicate these Resolutions to Messrs Halhed and Wilkins and that the superintendant of the Khalsa[6] records be directed to receive 500 copies of the Bengal Grammer from those Gentlemen and distribute them at the above rate to such of the Company's servants or others as may chuse to take them. And that he be further Directed to advance 15,000 Rupees being the amount of 500 copies to Messrs Halhed and Wilkins from the Khalsa Treasury.

Revenue
General letter to the Court of Director
1777-80

To the Hon'ble The Court of Directors for Affairs of the Hon'ble the United Company of Merchants of England Trading to the East Indies.—

Hon'ble Sirs.—

Consn. L. R. and L. P. — Paragraph 1st We have herewith the honour to transmit you by this conveyance a Duplicate of our address by the Sea-horse dated 18th Ultimo with the continuation of our Proceedings from the 13th February to the 11th Instant inclusive.

* * *

20th Feby. — 4th. The Governor General having laid before us a specimen of Grammar of the Bengal Language composed by Mr. Halhed and printed by Mr. Wilkin, and having recommended this Performance as highly meriting our countenance and Patronage, We agreed to take 500 copies of it as the property of the company allowing these Gentlemen a Gratuity of 30 Rupees for each copy and recommending it to them to prosecute the work under the sanctions and protection of this Government.—

5th. The Superintendant of the Khalsa Records has been directed to receive the 500 copies of the Bengal

[6] By *Khalsa* was meant the Revenue Office.

Grammar from Messrs Halhed and Wilkins and to distribute them at the abovementioned Rate to such of your servants or others as may chuse to take them.—

6th. As we understand that the whole Impressions of this undertaking when finished[7] will amount to 1,000 copies. We beg leave to recommend to your favourable considerations that the remaining 500 be also taken as the property of the company.—

20th Feby. 7th. For our proceedings on this subject we desire to refer you to them noted in the Margin and as soon as a complete Impression can be made of the Grammar accompanied with the preface we shall have the honour to forward it to you.—

Do. 8th. Understanding that great Dissentions[8] had arisen between the President of the Calcutta Committee and the other Members of it and that the former had withdrawn himself from their Meetings, which separation must have been attended with hurtful consequences, if not a total obstruction to the Business of the Committee, we proceeded to make a strict Enquiry into the causes of it by Summoning the President and members before us, and we beg leave to refer you to our Proceedings on the subject, as also to the Rules laid down for the conduct of the Committee, which we hope will effectually prevent the like Disorders happening in future.

20th Feby. / 24th / 6th March

* * *

We are with great Respect

Fort William
the 20th March 1778.

Hon'ble Sirs,
Your most faithful
Humble Servants

To The Hon'ble The Court of Directors for Affairs of The Hon'ble the United Company of Merchants of England

Trading to the East Indies.—

Hon'ble Sirs

Since closing our Dispatches by the Ship Resolution, Mr. Wilkins has presented to us Twenty four

[7] This suggests that the printing was not completed in February, 1778.

[8] Dissensions referred to, were virtually over after the death of Clavering in August, 1777 except for personal rivalry which persisted between the Governor-General and Philip Francis. The latter left India at the end of 1780. The dissensions, however, did not affect the progress of work in regard to the Grammar. Francis gave his approval to the proposal of Hastings "to engage for 500 copies on the Terms proposed by the Governor and to recommend the Remainder of the proposal to the favourable consideration" of the Directors.

Seperate Impressions of the preface* to the Grammar of the Bengal Language composed by Mr. Halhed, with a specimen of the Grammar itself, we therefore beg leace to transmit them to you by this Conveyance.—

We are with great Respect

Hon'ble Sirs

Fort William
the 24th April 1778.

Your most faithful
Humble servants.

Revenue Department
Governor General in Council Proceedings
1st—28th April 1778

Fort William the 28th April 1778.

Governor Generals Minute regarding Mr. Halheds Bengal Grammar.

The Secretary received on the 24th Instant, the following Minute from the Governor General.—

Governor General

Mr. Wilkins having prepared Twenty four separate Impressions of the Preface of Mr. Halhed's Grammer, I request that the Board will permit them to be sent with a specimen of the Grammer itself comprizing 100 pages to the Court of Directors by the present Dispatch.—

(Signed) Warren Hastings

Grammer set Home

The Proposition therein contained having been agreed to, the Books of the Bengal Grammer were accordingly dispatched to the Hon'ble the Court of Directors, in a separate packet on the 25th Instant.—

Revenue Department
Governor-General in Council
Proceedings
3rd-24th Nov. 1778

Fort William the 13th November 1778

Governor General's Proposal for the Establishment of a printing

The Governor General lays before the Board the following application from Mr. Wilkins should the Board deem it irregular in point of Form, the Governor desires to observe, that It was drawn up at his own

*The Preface to the Grammar was thus already in print by 1778.

office under the Superintendance of Mr. Wilkins.

request, and by Instructions given to Mr. Wilkins; the Governor Himself intending to have added the Proposal for the Establishment of the Printing Office in His own Name: But as Mr. Wilkins has connected It with the offer of his services for the Execution of It, and as it accords entirely with the Governor's Ideas, He desires the Board will accept the Proposal in this Form, & ventures to recommend It to Their favorable attention.—

Much Expence has already been incurred in bringing this art to its present Decree of Perfection: all that is intended by the present Proposition is to apply it to public use and prevent It from being lost. The Patronage of Government has already been liberally bestowed—upon It, but without its further support It cannot be rendered effectual, or of general use, as no Man could prudently hazard his fortune and sacrifice his Time in the Prosecution of It, without a certainty of Its success. The Experience of one year will be sufficient to ascertain the utility of such an Establishment[10] to the Public, and the Profits which may be eventually derived from It in private Hands.—

Governor General's Proposal for the Establishment of a printing office. continued.—

Mr. Wilkins Rank,[11] and views *(sic)* in the service are such as will render any Emoluments which can be annexed to an Establishment of this kind of little consideration to him, but It will require his superintendance of it, until it shall be fully compleated and until some other person shall be qualified by Practice to receive it from Him. For this Reason, and on the Grounds premised, the Governor General recommends, that a Printing office be established under the Direction of Mr. Wilkins, with the monthly salaries & allowances for Expences together with the Rates of printing inserted in the Papers which accompany Mr. Wilkins Minute: That this Establishment be formed for one year only, & then to cease, unless the Board,—by a new act, shall think proper to continue It.

The salary of the Superintendant & the sum for house rent having been properly left Blank in the Establishment formed by Mr. Wilkins, the Governor-General further proposes that the former be fixed at 350 Rupees Pr. Month, being the amount of Mr. Wilkin's present salary, as assistant at Malda; & the latter at 350 Rupees Pr. Month.

[10] The idea of a Printing Establishment with Mr. Wilkins as Superintendent was initiated earlier than November 1778 *i.e.*, shortly after the publications of Halhed's *Grammar*.

[11] Wilkins was then an Assistant at Maldah.

Mr. Wilkin's Papers accompanying the Governor's Minute.....

Mr. Wilkins having already experienced such great encouragement, and protection from the Hon'ble Board in the prosecution of his late undertaking the construction of a Set of Types of the Bengal Character, & printing a Grammar of that Language, flatters himself they will continue to support him, and render his labours of further service to the country and to his Hon'ble Employers: He therefore takes the liberty to inform the Board, that he has compleated his Work, and he hopes in such a manner, as well induce them to pay attention to what he now presumes to offer to their consideration.—The beneficial consequences[12]

Mr. Wilkin's papers regarding the Establishment of printg. office continued.—

that would arise from the introduction of printed papers, in the different Departments of this Government for Pottahs, Caboolyets Amulnamahs, Perwannahs, Rowannahs, Dustucks, Choor Chitties &ca. and all such others as are confined to a settled form, must be so self evident that it would be unnecessary to point them out.— As every thing necessary for printing in the Bengal and English character have been provided, and a fount of Persian Types is nearly compleated, it is humbly proposed to Government, to establish an Office for the purpose of printing all such papers as have been above described, whether in the Persian, Bengal or English character under such Regulations & Restrictions as the Hon'ble Board shall think necessary to make.— That the said Office be put under the management of a Superintendant of the Hon'ble Company's Press.— That the Superintendant be allowed a salary for his own trouble, with an Establishment for the necessary servants & assistants he must employ together with a Home for an office—That in consideration of the very great expence and loss of time, which has been sustained in Constructing Presses, Types and

Mr. Wilkin's paper regardg. the Establishment of a printing office continued.—

other implements, and which it will be necessary to renew from time to time, exclusive of the salary and Establishment the Superintendant shall be paid a reasonable price for every paper he shall be ordered to print—The accompanying Establishment and Rates of Printing are humbly proposed.—

Establishment for a Printing Office for
two Presses or as many more as may be employed.—

	Superintendant	
	Office Rent	
2	Compositors for Bengalese & Persian	150 " — "

[12] Gives an idea of the nature of work to be undertaken by the proposed Printing Establishment.

1	Ditto for English		..	..	..	100 " — "
1	Sorter	..	..	..	..	20 " — "
1	Pundeet	..	..	..	..	30 " — "
1	Moonshee	..	..	..	..	30 " — "
8	Press Men	..	@ 7	..	..	56 " — "
1	Head Ditto	..	..			12 " — "
4	Peons	..	20			
1	Jemmadar	..	10			30 " — "
1	Bookbinder		..	..	..	15 " — "
	Allowance for candles &ca. contingencies.					50 " — "

Mr. Wilkin's papers regardg. the Establishment of a printing office continued.—

Rates of Printing

For English Impressions—

For every Quire of Folio Post, Paper included—
If printed on one side Sa. Rs. 3 —
If printed on both sides .. 5 —

For Persian or Bengals

For every Quire of Folio Post, printed on one side. 5 " -
on both .. 7 " -

Memorandum of Papers which will admit of being printed —

Revenue — Pottahs .... Caboolyots Amulnaamahs Perwannahs Chelanes Tullub Chitties Orders for Confinement	Persian Bengal & English—
Customs Perwannahs .... Dustucks Passes	Persian Bengal & English —

Secretary's Office

Commissions .... Warrants to Surgeons....	Copper Plates

Mr. Wilkin's papers regardg. the Establishment

Treasurer's
&

of a printing office continued.—

Revenue accomptants office—
Daily Ballance sheets—
Receits for sums diposited
Pass Chits
Certificates for offices, & others &ca. &ca.—

Mr. Wheler

Mr. Wheler's opinion on the subject.

Mr. Wilkins has furnished this Board with a List of Official Papers which he thinks will admit of being printed, and likewise with a List of Rates for printing the same, so far as that goes, I am willing to concern with the proposals of Mr. Wilkins, but whether a printing press shall be established under the sanction of Government for other purposes, is a Question of too great Magnitude to be hastily determined. I should wish therefore that Mr. Wilkin's further proposition for establishing an office under the Management of a Superintendant of the Company's press with a Monthly salary and allowances—for the Superintendant and assistants should for the present be laid aside, as it will draw upon the Company an Encrease of their annual Expences at—a period when economy and Frugality appear to me particularly necessary—And if Mr. Wilkins is amply satisfied for the papers which are proposed to be printed, he ought not in my Opinion to look for further Encouragement from the Company, The Expence of his printing press and other utensils having, as I understand, in part been defrayed by them.—

Minutes on the Establisht. of a Printg. Press.

Mr. Francis—

Mr. Francis's opinion.

I am at all Times very unwilling to increase Establishments or to engage the Company in new Expences. The present Season I think particularly calls for the strictest attention to economy. In addition to these Motives for not agreeing to the Motion, I confess I am of Opinion, that the Institution of a printing press, to be supported at the sole Expence of Government,—cannot produce any adequate Benefit either to Government or to the Public.— If the state of the country or the general uses of society be not such as to Demand the Introduction of a Press, and find Sufficient Employment for it, the Moment that Government withdraws its direct support, the Institution falls to the Ground: and this I apprehend must be the Fate of every Establishment of this kind, which the actual state of society is not prepared to adopt and support— I have no objection to our employing the press occasionally, at the

Minutes on the Establisht. of Printg. Press.—

lates proposed, but I object to the Establishment.—

Governor General

Governor's further Minute

When pressed to add the allowances of the Superintendant and the House—Rent, I did—expect and thought that I had a right to expect a different reception to my proposal—Since however I have been disappointed, I submit to the wish expressed by Mr. Wheler that the Question may remain suspended. I must only observe that Mr. Wheler has been misinformed in supposing that the Expence of the Printing press and other utensils have been inpart defrayed by the Company, unless the allowance of 15,000 Rupees made to Mr. Halhed and Mr. Wilkins jointly, for one half of the Impression may be deemed such.—

Minutes on the Establisht. of a Printg. Press, & Resolutions

Resolution

Resolved that Mr. Wilkins be allowed for such Papers as he may print for the use of the Company, the Rates inserted in his Paper, accompanying the Governor General's Minute, but that the Establishment for this office do lie for further consideration.—

Rev. Dept.
Governor General in Council Proceedings
5th-26th Jan. 1779

Fort William the 8th January 1779.

Read the following Letter from Mr. Wilkins

Mr. Wilkins

L. R. No. 11

To the Hon'ble Warren Hastings Esqr.
Governor General &ca. members of the Boards of Revnue

Hon'ble Sir & Sirs,

In consequence of the appointment the Hon'ble Board have been pleased to confer on me to superintend the press, I presume to request you will be pleased to determine upon some mode for collecting from the different offices the business that I am to print; and at the same time I take the Liberty to point out what appears to me to be the most eligible method—Vizt. That a circular Letter be written to the Provincial Council and Collectors and to all other Heads of offices informing them of the Establishments and the rates of printing, and ordering them to prepare and transmit to me, or to whom also the Board shall think proper to appoint, copies of all such papers as will admit of being printed; whether in the persian, Bengals or

Roman Character, leaving Blanks for names, dates, and other occurrences as are liable to alter, and specifying the number of each form they usually issue in the course of a year.

As the greatest difficulty attending printing is in composing and preparing the Work for the press, I humbly request the Hon'ble Board will take this into their consideration and direct me to strike off as many copies may be required for those or four years.

I have the honor to subscribe myself with great respect.

Fort William
6 January 1779.

Hon'ble Sir &ca.—
(Signed) Chas. Wilkins

Revenue Department
Governor General in Council
Proceedings
5th-26th Jan. 1779.

Fort William the 8 January 1779.

Governor General's proposition thereon

The Governor General proposes that Circular Letters be written to the Provincial Councils and Collectors and to all other heads of offices, informing them of the Establishment of the Printing Press and the Rates of Printing and ordering them to prepare and transmit to Mr. Wilkins Copies of all such papers as well admit of being printed, whether in the Persian Bengal or Roman Character, leaving Blanks for names, dates and other occurrences as are liable to alter and specifying the number of each form they usually issue in the course of a year.

Agreed to and circular letter inconsiquence

This proposition being agreed to the followig Letter is accordingly written to the several Provincial Councils &ca.—

L. S. No. 6

To Mr. Edwards Golding
President & Provincial Council
for the Divisions
Calcutta

Gentlemen,

Having thought proper to establish a printing office under the direction of Mr. Charles Wilkins, We now enclose a copy of the notes of Printing, and direct that you prepare and transmit to Mr. Wilkins copies of all such papers as well admit of being printed,

whether in the Persian, Bengal or Roman character, leaving Blanks for names, Dates and other occurrences as are liable to alter, and specifying the number of each form usually issued in the course of a year.[13]

Fort William
8 January 1779.—

[13] The actual work of the establishing the proposed press was undertaken a little later A letter dated 8 January 1779 from Hodgson to Auriol reads as follows

'The Hon'ble the Governor-General and Council having thought proper to establish a printing press under the Superintendence of Mr Charles Wilkins, I am directed to transmit you the enclosed copy of the Rate of Printing "

Margarita Barns in her book, *The Indian Press* writes

"A printing press was in operation in Madras in 1772 and in 1779 an official printing press was established at Calcutta The latter was under the direction of Sir * Charles Wilkins who became known as the father of native typography in Bengal."

* Wilkins was knighted in 1833.

নির্বাচিত পাঠপঞ্জী

প্রদীপ চৌধুরী

এই নির্বাচিত পাঠপঞ্জীতে বই, পত্রিকা ও স্মারকগ্রন্থের প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র প্রভৃতি সবই এক অক্ষরানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে কোনো গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে অসম্পূর্ণতা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই পঞ্জীতেও যে অনেক লেখা বাদ পড়েছে সে সম্বন্ধে সংকলকের সচেতনতা আছে। তবে কতকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধ ইচ্ছাকৃতভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ হয় সেগুলি আমাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট নয় অথবা অন্যত্র প্রাপ্তব্য তথ্যের পুনরুক্তিমাত্র।

কোথাও কোথাও রচনা সম্বন্ধে পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বাংলা

অজিত ঘোষ। মুদ্রণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ। পঞ্চপুষ্প (ফা ১৩৩৮): ১৩৪৫-৫২।

অজিত দাস। কেরী সাহেব ও বহুভাষা কোষ। সমকালীন ৮ (কা ১৩৬৭): ৪৪১-৫০।

অতুল সুর। ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্ফোরণ। আনন্দবাজার পত্রিকা; (২৮ মাঘ, ১৩৮৫): পৃ ৪

—বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৮৫। ৮০ পৃ। (বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, ১৩)।

অনিলকুমার ভৌমিক। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার ইতিহাস। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ৯৯-১০০।

—সুলভ মূল্যের বই: পেপার ব্যাক ও পকেট বুক। অমৃত (১৮ আশ্বিন ১৩৮০): ৬২-৬৩।

অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গে পর্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্তুগীজ-পদাঙ্ক। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৮,১: ৪৫-৫৮।

অমরজ্যোতি সেন। ছাপাখানার গল্প। দেশ। (১১ শ্রা ১৩৫৩): ৪৮৯-৯১।
শেষাংশে এদেশের ছাপাখানা সম্পর্কে আলোচনা আছে।

অমলেন্দু ঘোষ। 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় সমকালীন বটতলার বইপত্রের কথা। গ্রন্থাগার ২৫ (কা ১৩৮২): ১৫৫-৬২।

অমলেন্দুনাথ ঘটক। পঞ্চানন কর্মকারের ঐতিহাসিক ভূমিকা। আনন্দবাজার পত্রিকা, (৪ ফাল্গুন, ১৩৮৫): ৭

অমিতাভ চৌধুরী। ছাপাখানা ও বানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ; ১৩৫৬-১৩৮১। ১ বৈ ১৩৮১; পৃ ২০-২১।

—বত্রিশ বর্ণের বাঙলা। যুগান্তর (১ ফাল্গুন, ১৩৮৫): ৩

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। প্রথম বাংলা সাময়িক ও সংবাদপত্র। দেশ (২৫ জ্যৈ ১৩৭৫): ৬৯৭-৭০০।

দিগ্দর্শন ও সমাচার দর্পণ-এর প্রকাশনা সম্পর্কে আলোচনা।

—বাংলা মুদ্রণ: দ্বিশতবার্ষিকী। দেশ, ৪৫; (১১ চৈ ১৩৮৪): ২৩-৩২।

—বাংলা মুদ্রণশিল্পের সংস্কার। চতুষ্কোণ, ৯ (আশ্বিন ১৯৭৬): ৭২০-২৩।

—সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের বাজার। আনন্দবাজার পত্রিকা (১০ আষাঢ় ১৩৮৫)।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। আদি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও হালহেড সাহেব। বঙ্গভাষা (ত্রিপুরা) (কা ১৩১৪): ১৭৭-৮৩।

—বাঙলার প্রথম। অতুল সুর সম্পাদিত ও শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ সংকলিত। কলিকাতা, সাহিত্য-লোক, ১৩৮৭। ১৫০ পৃ।

প্রথম ব্যাকরণ, অভিধান, সংবাদপত্র, ইউরোপীয়ানের ছাপা বই, সচিত্র পুস্তক, ছাপায় বঙ্গাক্ষর, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলন।

অমৃতলাল সরকার। শ্রীরামপুরে: ভারতবন্ধু উইলিয়ম কেরী, ২ সং। ১৯৩৬। পৃ ৩৯-৪৬।

অরুণকুমার সেনগুপ্ত। বাঙলার প্রথম মুদ্রাকর পঞ্চানন কর্মকার। দৈনিক বসুমতী; (৬ শ্রা ১৩৮৫)।

অলোককুমার মিত্র। বাংলা বইয়ের প্রকাশনা: আদিপর্ব। স্মরণিকা (৫ আগ ১৯৭৮): ২৭-৩১।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বর্ধমান জেলা শাখার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকা।

অশোক ঘোষ। আমরাও হ'তে পারি মুদ্রণ বিশারদ। কলিকাতা, স্বাক্ষর লিঃ, ১৯৫৫। ১৪২ পৃ। সচিত্র।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬১, ৪ (১৩৬১): ১৯৩-২০৩; ৬২, ১ (১৩৬২): ৪১-৪৮।

আতোয়ার রহমান। গ্রন্থজগতের সংকট: লেখকের চোখে। বই (বাংলাদেশ), জাতীয় গ্রন্থমেলা সংখ্যা (মে ১৯৭৪): ৯-১৫।

আদিত্য ওহদেদার। প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ১২০-২১।

আনন্দ বাগচী। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু'শ বছর। দেশ ৪৬, ১৯ (২৫ ফাল্গুন, ১৩৮৫): ১১-১৬।

আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী আয়োজিত বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু'শ' বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীর বিবরণ।

আনিসুজ্জামান। বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা। সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), বর্ষা সংখ্যা (১৩৭৩)।

আবদুল কাইউম। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, পরিবর্ধিত ২ সং। ঢাকা, মখদুমী অ্যান্ড আহ্সান উল্লাহ লাইব্রেরী, ১৯৭৬। ২২৪ পৃ।

—বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বই। বক্তব্য (বাংলাদেশ) (অ ১৩৮৫): ৫৫-৫৯।

—সেকালের ঢাকা: মুদ্রণ ও প্রকাশনা। বক্তব্য (বাংলাদেশ) (শ্রা-আশ্বিন ১৩৮৪): ৭৫-৮৯।

—হ্যালহেডের পূর্ববঙ্গীয় মুন্শী। ভাষা-সাহিত্য পত্র (বাংলাদেশ), বার্ষিক সংখ্যা (১৩৮৩): ১৩৯-৫৩।

আবদুল গণি হাজারী। গ্রন্থজগতের সংকট: প্রকাশকের ভাষ্য। বই (বাংলাদেশ), জাতীয় গ্রন্থ-মেলা সংখ্যা (১৯৭৪): ৩১-৩৫।

আবু জাফর শামসুদ্দীন। গ্রন্থজগতের বর্তমান সংকট: প্রকাশকের ভাষ্য। বই (বাংলাদেশ), জাতীয় গ্রন্থমেলা সংখ্যা (১৯৭৪): ২৩-২৭।

আবুল হাসান। পুস্তক শিল্পের আর্থিক সমস্যা; নারায়ণ চৌধুরী অনূদিত। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ১২৮-৩১।

—পুস্তক সম্প্রচারে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের ভূমিকা; নারায়ণ চৌধুরী অনূদিত। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ১১৪-১৯।

আলমগীর রহমান। গ্রন্থ প্রকাশনা শিল্পের সঙ্কট। বইয়ের খবর (বাংলাদেশ), নববর্ষ সংখ্যা

(১৩৮৭): ১০১-৭।
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। নিস্কৃতিলাভ প্রয়াস (১২৯৫ বঙ্গাব্দ)। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ; গোপাল হালদার সম্পাদিত। ৩ খণ্ড, ১৯৭২। প‍ৃ ৪০৭-৫২।
বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত যন্ত্র সম্পর্কে তথ্য।
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। বাঙলা মুদ্রণ শিল্পের দু'শো বছর। ধনধান্যে (১৬-৩০ সেপ্টে ১৯৭৮): ১০-১২।
উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়। কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৬৯। ৫৯৮ পৃ। সচিত্র।
মডার্ন বুক এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের আত্মজীবনী। মডার্ন বুক এজেন্সি; সেন, রায় এণ্ড কোং, লিটারারি বুক ডিপো, সরস্বতী লাইব্রেরি, বি. সি. ধর এণ্ড কোং, অল ইণ্ডিয়া পাব্লিশিং কোং, আর্য্য পাব্লিশিং হাউস, সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সি, অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং, বসু ভট্টাচার্য কোং, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ওয়ার্ল্ড প্রেস লিঃ, বি. বি. ব্রাদার্স ইত্যাদি প্রকাশন সংস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।
কনককান্তি বসু। অবহেলিত কলিঙ্গাবাজার। সাহিত্য সেতু, কলকাতা সংখ্যা (মহালয়া ১৩৮২): ৪১-৪৫।
বর্তমান নিউমার্কেটের পূর্ব দিকটাতে ছিল কলিঙ্গাবাজার, মুসলমানী বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার কেন্দ্র। 'সমকালীন' পত্রিকার আশ্বিন (১৩৮২) সংখ্যায় মোটামুটি একই লেখা প্রকাশিত হয়।
কমল চৌধুরী। মুদ্রাযন্ত্রের স্মরণীয় অধ্যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৩ (বৈ-আষাঢ় ১৩৭৪): ৫৭-৬৬।
কমল চৌধুরী ও পরিমল চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাঃ)। কলকাতার ছাপাখানা। কলিকাতা, নব যুবক সংঘ [১৯৭৮]। ১০২ পৃ। সচিত্র।
বাংলা ছাপাখানার দু'শ বছর পূর্তি উপলক্ষে নব যুবক সংঘের শ্রীশ্রী'কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ। বাংলা ছাপাখানার প্রথম দিকের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।
কমলকুমার মজুমদার। ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা। দেশ, ৪৫, (২ ভা ১৩৮৫): ২৭-৩২।
শ্রীপান্থের 'যখন ছাপাখানা এলো' প্রসঙ্গ প্রবন্ধাকারে আলোচনা।
—বঙ্গীয় গ্রন্থ চিত্রণ। এক্ষণ, ১০; (কা-মা ১৩৭৯): ৭৫-৯৬।
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'সুশীলকুমার ঘোষ স্মৃতি বক্তৃতামালা—২'।
কম্পোজিটারি শিক্ষা। কলিকাতা, জেনারেল লাইব্রেরী।
কম্পোজিটারি শিক্ষা। কলিকাতা, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী।
কম্পোজিটার্স ম্যানুয়েল, বা কম্পোজিটারি শিক্ষা, ২ সং। কলিকাতা, সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১৯৫৭। ৬৪ পৃ।
কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। পুস্তক ব্যবসায়। গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী সংখ্যা, ২৫ (অ ১৩৮২): ২২৮-৩১।
—পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকদের সমস্যা এবং কয়েকটি দাবি। আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮ ফাল্গুন, ১৩৮৫): ৬
কালীপদ সিংহ। গঙ্গাকিশোরের জীবনী সম্বন্ধে দু'চার কথা। দৈনিক দামোদর, ২ (৩১ বৈ ১৩৮২): ৩-৪।
কুণাল সিংহ। উইলিয়ম কেরী। গ্রন্থাগার, ১৭ (কা ১৩৭৪): ২৯৩-৯৭।
কুমারেশ ঘোষ। বৃত্তিমূলক প্রকাশ প্রণালী। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪, (এপ্রি-মে ১৯৭৩); ৬৩-৬৬।
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। উপেন্দ্রকিশোর। বিশ্বভারতী পত্রিকা (কা-পৌ ১৩৭০): ১০৮-১৮।
হাফটোন ও লাইন ব্লক সম্পর্কে উপেন্দ্রকিশোরের দান উল্লেখিত হয়েছে।
কৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশন শিল্পে বিক্রয় প্রসারণের পদ্ধতি। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৯৩-৯৮।
কৃষ্ণ ধর। বাংলা বই ও পাঠকরুচি। যুগান্তর (১৯ ফাল্গুন, ১৩৮৫): ৪
কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রী। সত্যপ্রদীপ (২৫ মে ১৮৫০)।
মনোহর-পত্র কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে প্রকাশিত সংবাদ।
গজেন্দ্রকুমার মিত্র। পেপার ব্যাক ও সুলভ সংস্করণ। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৮১-৮২।
—বাংলা বইয়ের ভবিষ্যৎ। আনন্দবাজার পত্রিকা (২৪ ফেব্রু ১৯৭৭)।
—স্বপ্নের মানুষ উপেন্দ্রকিশোর। কথাসাহিত্য। (বৈ ১৩৭০): ১০-১৪।

গজেন্দ্রনাথ মাইতি। মাস্টার প্রিন্টার্স বা আধুনিক কম্পোজিটারি শিক্ষা, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত। কলিকাতা, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী [তাং নাই]। ৮০ পৃ।
ছাপাখানার বিভিন্ন প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বিজ্ঞাপন। রাজকৃষ্ণ রায় গ্রন্থাবলী, [পদ্য ও গদ্য], ২য় ভাগ। ১২৯২। পৃ ১-২।
শ্রীচট্টোপাধ্যায় তৎকালীন সময়ে গ্রন্থ প্রকাশে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন।
গোপালদাস মজুমদার। আমার কথা। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২) ৮৭।
ডি এম লাইব্রেরী সম্পর্কে কিছু তথ্য।
গোরাচাঁদ মিত্র। ভারত বিদ্যাবিদ্ স্যার চার্লস উইলকিন্স। দেশ, ৪০ (৫ শ্রা ১৩৮০) ১২২১-২৪।
গোলাম কিবরিয়া মনু। প্রকাশনায় বরিশাল একাল (১৯৪৭-১৯৭৯), স্মরণিকা (১৫ মার্চ ১৯৮০) ১১-১।
জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহ ১৯৮০ উপলক্ষে বরিশাল (বাংলাদেশ) থেকে প্রকাশিত।
গোলোকেন্দু ঘোষ। ঊনিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল স্মারকগ্রন্থ, মোহনলাল মিত্র ও কানাইলাল দত্ত সম্পাদিত। ১৯৭৪। পৃ ৪০৫-১৪।
—শিশু সাহিত্য প্রকাশন প্রণালী। গ্রন্থজগৎ প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩) ৯১-৯২।
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। স্যর চার্লস উইলকিন্স। বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক, ২ সং। ১৯৭৭। পৃ ৩০-৩৫।
'সমকালীন' (কার্ত্তিক ১৩৬১) ১০ বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।
গৌরীশংকর দে। বটতলার বই। গল্পভারতী (কা ১৩৮৪) ৩৭-৩৯।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২) ৬৩-৬৬।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশনের গোড়ার কথা।
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপজিটারি। বিদ্যাসাগর, ৬ সং। ১৯২৩। পৃ ৩৫৭-৫৯।
চণ্ডীচরণ সেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী। কলিকাতা, মণিমোহন রক্ষিত দ্বারা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৭। ২৫৮ পৃ।
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বইয়ের জগতে বাংলা। যুগান্তর (জানু ৩১, ১৯৭৩)।
—বাংলা প্রকাশনের ধারা। আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০ জানু ১৯৮১)।
—ভারতীয় প্রকাশন শিল্প। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৪। পৃ ২১৪-২০।
—সাম্প্রতিক ভারতীয় প্রকাশনের ধারা। গ্রন্থজগৎ (ফেব্রু-মার্চ, ১৯৮০) ৯-২০।
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক। দু'শ বছরের বাংলা বই স্মারকপত্র। কলিকাতা, বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু'শ বছর পূর্তি উৎসব পর্ষদ্। ১৯৭৯, ৭৪ পৃ
সূচী অশোককুমার সরকার। প্রদর্শনী প্রসঙ্গে, শ্রীপান্থ। বাংলা হরফ, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। বাংলা ছবির বই চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কী বই কত বই, প্রদর্শপঞ্জী।
চৈতালী সেন। ত্রয়ী কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড। গ্রন্থাগার, ১১ (শ্রা ১৩৬৮) ১৬৭-৭১।
ছাপাকর্মের বিবরণ। দিগদর্শন (আগ ১৮১৮) ২০৭-২০৯
বাংলায় মুদ্রিত সর্বপ্রথম মুদ্রণ সম্পর্কিত রচনা।
জগদিন্দ্র ভৌমিক। বাংলা প্রকাশনে রুচি। বিভাব, দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা (শীত ১৩৮৬) ৯০-৯৪।
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু'শ বছর পূর্তি উৎসবে (১৩ ফেব্রু ১৯৭৯) পঠিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পাঠ।
জানকীনাথ বসু। বাংলা পুস্তক-প্রকাশনার দৈন্য। আনন্দবাজার পত্রিকা (২০ ফাল্গুন, ১৩৮৫)· ৬
জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ঘরে বাইরে বটতলা। সমকালীন (কা ১৩৭৪)।
—বটতলানি। সমকালীন ১৬ (শ্রা ১৩৭৫) ১৯২-২০৫।
—বটতলার অন্তরাগ। সমকালীন ১৬ (আষাঢ় ১৩৭৫) ১৪৪-৫২।
—বটতলার দলিল। সমকালীন (কা ১৩৭৬)।
—বটতলার বইগুলো। সমকালীন; ১৬ (জৈ ১৩৭৫)· ৮৯-১০১।
—বটতলার বসন্তক। সমকালীন ১৭ (বৈ ১৩৭৬)।
—বটতলার ভোরবেলা। সমকালীন, ১৫ (চৈ ১৩৭৪)।
—বটবৃক্ষমূলে। সমকালীন, ১৭ (ভা ১৩৭৬)।
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। সাহিত্যে চিত্রশিল্প। বঙ্গভাষা (ত্রিপুরা), ১ (আষাঢ় ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ):

৬১-৬৫।
সচিত্র পুস্তক ও পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুদ্রাযন্ত্র। ভারতী। (আষাঢ় ১৩২৫): ২৩৮-৪১।

টিচার অব কম্পোজিটর্স। কলিকাতা, জেনারেল লাইব্রেরী। ৭২ পৃ।

তপংকর চক্রবর্তী। বরিশালের প্রকাশনা: সেকালের কথা (১৮৬২-১৯৪৭)। স্মরণিকা (১৫ ১৯৮০): ৪-১০।
জাতীয় গ্রন্থসপ্তাহ ১৯৮০ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত।

তাজুল ইসলাম। প্রকাশকের দৃষ্টিতে প্রকাশনার সমস্যা ও তার সমাধান। দৈনিক দেশ (বাংলাদেশ), প্রথম বর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ (ডিসে ১৯৮০) ৪৮-৪৯।

তারকনাথ চক্রবর্তী। বাংলা ছকের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১ (১ বৈ ১৩৮১) পৃ ২৭-২৮।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়। হ্যালহেড বোলট্স-উইলকিনস। দেশ, ১০ ফাল্গুন ১৩৭৫: ৪০৫-০৮।

ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উইলিয়ম কেরী। দেশ, ১৫ (২১ ফা ১৩৫৪): ২৩১-৪৪।

দাশরথি তা। সারা ভারতের সাংবাদিক তীর্থ বর্ধমানের বহড়া। দৈনিক দামোদর, ১ম বার্ষিক সংকলন (১৩৮১): ৩-৪, ১৩-১৫।

দিব্যেন্দু পালিত। দায়িত্ব প্রকাশকের, পাঠকেরও। আনন্দবাজার পত্রিকা (২৪ ফেব্রু ১৯৭৮): ৭।

দিলীপ চৌধুরী। বাংলার ক্যাক্সটন: চার্লস উইলকিন্স। গ্রন্থাগার, ১১ (শ্রা ১৩৬৮): ২১৩-১৪।

দিলীপকুমার দাশগুপ্ত। পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশন। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৪৬-৪৭।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পুস্তক ব্যবসায় সমস্যা ও তার সমাধানের পথ। গ্রন্থজগৎ, ৩ (জানু ১৯৬০): ৩০-৪১।

দীপঙ্কর সেন। ঊনিশ শতকের রেণেসাঁস ও এদেশের মুদ্রক। দৈনিক বসুমতী (১৫ অ ১৩৭৮): ৯,১১।

— কর্ণওয়ালিসের রেগুলেশনের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ। মাসিক বাঙলাদেশ, ৫ (আষাঢ় ১৩৮৩): ৮১-৮২, ১২৯।

— পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর। দৈনিক বসুমতী (৫ মা ১৩৭৫): ৯-১০, ১২।
উপেন্দ্রকিশোরের হাফটোন ব্লক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

— বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর ও বাংলা বর্ণমালার সংস্কার। গ্রন্থাগার, ২৮ (ফা ১৩৮৫): ৬৯৩-৭০০।

— বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিপর্ব ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। গ্রন্থাগার, ২০ (চৈ ১৩৭৭): ৪৬৪-৬৮।

— বাঙালীর মনন ও দু'শ বছরের মুদ্রণ। অমৃত, ১৭ (১৪ পৌ ১৩৮৪): ২০-৩০।
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতামালা, ১৯৭৮।

— ভবিষ্যৎ ভারতের মুদ্রক। দৈনিক বসুমতী (২৮ ফেব্রু ১৯৫৪)।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে লেখকের কয়েকটি প্রস্তাব।

— মুদ্রণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। পুরশ্রী, বিশেষ সংখ্যা (২৫ বৈ ১৩৮৫): ৪৬-৪৯।

— মুদ্রণ বিদ্যায় শিল্পীদের অবদান। দৈনিক বসুমতী (৫ পৌ ১৩৭৬)।
কেরী, পঞ্চানন, মনোহর, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজা রবি বর্মা ও উপেন্দ্রকিশোরের দান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি 'শ্রীদীপঙ্কর' ছদ্মনামে লেখা।

— মুদ্রণ শিল্প, প্রথম খণ্ড। কলিকাতা, কালিকা টাইপ ফাউন্ডারি, ১৯৭৫। ১৬৮ পৃ।

— মুদ্রণ শিল্পে অক্ষর বিন্যাস। শারদীয়া বসুমতী, ১৩৭৬। পৃ ৫১-৫৩, ১৬২।

— সুকুমার রায়ের মুদ্রণ চর্চা। আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় (১২ চৈ ১৩৮৪): ৪-৫।

দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয় দাস। মুদ্রণ পরিচয়। কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৬২। ৭৭ পৃ।

— রবীন্দ্র রচনাবলী মুদ্রণ। সাপ্তাহিক বসুমতী, ৭১ (২৪ জ্যৈ ১৩৭৪): ৩৩১২-১৪।

দেবীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। বাংলা বইয়ের সেকাল ও একাল। অমৃত, ১(৪) (১১ ফা ১৩৬৮): ২৭৭-৭৮।

দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য। বাংলার অক্ষর শিল্প। দেশ (৩০ ডিসে ১৯৩৯): ২৭৪-৭৬।

নগেন্দ্রনাথ বসু। মুদ্রাযন্ত্র। বিশ্বকোষ, খণ্ড ১৫ (১৩১১ বঙ্গাব্দ) পৃ ১৮৭-২১১।
বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

নরেন্দ্রনাথ দে ও গোষ্ঠবিহারী দে। প্রিন্টার্স গাইড। কলিকাতা, দি ইস্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ, ১৩৪৫-৬০। ২ খণ্ড। সচিত্র।

নারায়ণ চৌধুরী। বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার অতীত ও ভবিষ্যৎ। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, ১৪ (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ১০৯-১৩।

নাসির আলী, মোহম্মদ। গ্রন্থজগতের বর্তমান সংকট: প্রকাশকের ভাষ্য। বই (বাংলাদেশ), জাতীয় গ্রন্থমেলা সংখ্যা (মে ১৯৭৪): ২৮-৩০।

নিখিল সরকার। দু'শ বছর: হাজার প্রশ্ন। আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১০৮৬। পৃ ২৩-২৮।

'শ্রীপান্থ' ছদ্মনামে লিখিত।

— বাংলা শিশুগ্রন্থ সজ্জার একশ' বছর। দেশ, ২২ (২০ কা ১৩৬১, ৬ নভে ১৯৫৪): ৩৬-৪০।

— বাংলা হরফ। আনন্দবাজার পত্রিকা (৩ ফা ১০৮৫): ৬।

'শ্রীপান্থ' ছদ্মনামে লিখিত।

— যখন ছাপাখানা এলো। কলিকাতা, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন, ১৯৭৭। ১৫০ পৃ। সচিত্র।

'শ্রীপান্থ' ছদ্মনামে লিখিত।

— হ্যালহেড-এর ব্যাকরণের হরফ। আনন্দবাজার পত্রিকা (২৮ মা ১০৮৫): ৪।

'শ্রীপান্থ' ছদ্মনামে লিখিত।

— হ্যালহেড ও তাঁর ব্যাকরণের গুরুত্ব। চতুরঙ্গ, ৪১ (শ্রা-আশ্বিন ১০৮৭): ৯৫-১০২।

নির্মল দাশ। বোলট্‌স-হ্যালহেড প্রসঙ্গ। দেশ, ৮ চৈত্র ১৩৭৫:৮২২-২৪।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। পঞ্চদশ ভারতীয় মানক সম্মেলনে 'পুস্তক প্রকাশনের মান' স্থিরীকরণের উদ্যোগ: কোয়াম্বাটোর, ১৯৭৩। গ্রন্থাগার, ২৪ (জ্যৈ ১০৮১): ৪২-৪৭, (আষাঢ়-শ্রা ১০৮১): ৭১-৮৫।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও সজনীকান্ত দাস। আধুনিক কাঠ-খোদাই চিত্র। প্রবাসী, ২৭ (আশ্বিন ১৩৩৪): ৮২১-২৯।

কাঠ-খোদাই চিত্র শিল্পের প্রতি বাঙালী শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নীলিমা দেবী। আমাদের সিগনেট প্রেস। বিভাব, দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা (শীত ১০৮৬): ১১৩-১৭।

পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সভ্যতা ও মুদ্রণ। আনন্দবাজার পত্রিকা (৪ ফাল্গুন, ১০৮৫): ৬।

পশুপতি ভট্টাচার্য। গ্রন্থ ও মুদ্রণ শিল্প। গ্রন্থাগার, ৭ (জ্যৈ ১৩৬৪): ৩৭-৩৯।

পশুপতি শাশমল। হালহেডের ব্যাকরণে প্রাচীন বাংলাকাব্যের মুদ্রিত পাঠ। চতুষ্কোণ (আষাঢ় ১৩৭৮): ৩৭৩-৮২।

পুলকেশ দে সরকার। বৃটিশ রাজরোষে সাহিত্য ও প্রকাশক। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ৩৫-৪০।

পুলিন বড়ুয়া। উইলিয়ম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। গ্রন্থাগার, ২২ (আষাঢ় ১৩৭৯): ৮৩-৮৬।

পুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ। আনন্দবাজার পত্রিকা: রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি ক্রোড়পত্র (২৫ বৈ ১৩৬৯): ১১-১২।

পুস্তকাদি বাঁধাই যন্ত্র চালান সম্বন্ধে উপদেশ। [কলিকাতা] বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯১১। ৩০ পৃ।

বি. এস. প্রেসের বইগুলি বাঁধানোর কাজ চালানোর জন্যে মাত্র ২৪-কপি ছাপানো হয়েছিল। পুস্তিকাটির লেখকদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত নাম N.C.R. এবং J.L.C. আসল নাম এখনো জানা যায়নি। বর্তমানে একটি-মাত্র কপি 'মুদ্রণ পত্র'-র সম্পাদক শ্রীপ্রসূন দত্ত মহাশয়ের নিকট আছে।

প্রকাশ ভাণ্ডারী। পূর্ব বাঙলার প্রকাশন শিল্প। গ্রন্থজগৎ; বাংলাদেশ সংখ্যা, ১২ (এপ্রি-মে ১৯৭১): ২৪-২৫।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ৫৯-৬২।

প্রবোধ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন শিল্পের ক্রমবর্ধমান সংকট ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার। গ্রন্থাগার, ২২ (পৌ ১৩৭৯): ২২৩-২৯।

প্রবোধচন্দ্র সেন। ছান্দসিক হালহেড। বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ, ১৯৭৮। পৃ ১২৪-৩২।

লেখকের মতে, হালহেডের ব্যাকরণে Of versification অধ্যায়ে বাংলা ছন্দ নিয়ে প্রথম প্রত্যক্ষ চিন্তা ও আলোচনার সূত্রপাত হয়।

প্রভাতকুমার দাস। বটতলার বিজয়-বৈজয়ন্তী। সমকালীন, ২৫ (কা ১০৮৪): ২৮৪-৮৯।

প্রমথ চৌধুরী। বইয়ের ব্যবসা। বীরবলের হালখাতা। ১৩৬৭। পৃ ৪৪-৫১।
প্রমীলচন্দ্র বসু। পাদরি লঙ ও লঙ সাহেবের ক্যাটালগ। মোহনলাল মিত্র ও কানাই দত্ত, সম্পাদিত উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল। নব বারাকপুর, ১৩৮১; পৃ ৩৭৬-৯৩।
—মুদ্রিত গ্রন্থে বাংলা অক্ষর ও বাংলাভাষা আবির্ভাবের গোড়ার কথা। গ্রন্থাগার, ২১ (জ্যৈ ১৩৭৮): ৪১-৪৮।
প্রসূন দত্ত। একটি আবিষ্কারের অপমৃত্যু। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১। ১ বৈ ১৩৮১। পৃ ৩৭-৪০।
মনো-লাইনো মুদ্রাযন্ত্রের কথা।
—বাংলা হরফ সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব। আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৬। পৃ ১৩৪-৩৬।
—সাম্প্রতিক বাংলা মনোটাইপের কীবোর্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১। ১৩৮১। পৃ ৫২-৫৩।
—সম্পাদিত। মুদ্রণপত্র; বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার [তারিখ নেই] ৫৬ পৃ।
মুদ্রণ সম্পর্কিত ১৩টি প্রবন্ধের সংকলন।
ফজলে রাব্বি। আমাদের পূর্বাঞ্চলে ছাপাখানা। ছাপাখানার ইতিকথা। ১০৮৪। পৃ ৮০-৮৭।
বইবাহিক (ছদ্ম) বইয়ের দাম। দেশ, ২১। (২৫ বৈ ১৩৬১); ৮৫-৮৮।
বরদাপ্রসাদ মজুমদার। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১০ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ৬৭।
এ. টি. দেব বা দেবসাহিত্য কুটীরের কথা।
বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের আদিযুগ (১৬৬৭-১৮৩৪)। ১৯৭৫। ৫৪৭ পৃ। সচিত্র।
অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখককে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়।
বাংলা গ্রন্থপঞ্জী: ক্রয়লভ্য বাংলাগ্রন্থের বিষয়ানুগ তালিকা; সুনীলকুমার রায় সম্পাদিত। কলিকাতা, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ১৩৮৭। ৫৭৭ পৃ।
১৩৮৫ সনের মধ্যে প্রকাশিত ৯৩২১ সংখ্যক বইয়ের বিবরণ সম্বলিত বিষয়ানুগ তালিকা।
বাঙ্গলা মুদ্রণ কার্যে নবযুগ আরম্ভ: লাইনোটাইপ মেসিনের উদ্বোধন। আনন্দসঙ্গী: ১৯২২ থেকে ১৯৭১—এই অর্ধ শতক জুড়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর নির্বাচিত সংকলন। ২ সং। ১৯৭৫। পৃ ২৩৪-৪৫।
আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, থেকে পুনর্মুদ্রিত।
বাংলা লাইনোটাইপ উদ্ভাবন। প্রবাসী (ফা ১৩৪০): ৭২৮-২৯।
বাদল সমাদ্দার। বটতলার উপন্যাস। সাহিত্যসেতু, কলকাতা সংখ্যা (মহালয়া ১০৮২) ২৬-৪০।
চিৎপুরের প্রকাশকদের সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা।
বিজয়কুমার ভৌমিক। ছাপাখানায় ভূতের সমস্যা। প্রবাসী, ৪১ (ভা ১৩৪৮): ৫৭৬-৭৯।
বিনয় ঘোষ। ছাপাখানার আদিকেন্দ্র কলকাতা শহর। পুরশ্রী, বিশেষ সংখ্যা (২৫ বৈ ১৩৮৫): ৫৭-৫৯।
—জনসভার সাহিত্য, পরিবর্ধিত সংস্করণ। কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১৩৮৫। পৃ ২০২।
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের আলোচনার জন্য দ্র. পৃ ১৩৯-২০২।
—বটতলার প্রকাশক। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১০ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ১-৪।
—বিদ্যা ও বাণিজ্য। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। লংম্যান সং। ১৯৭৩। পৃ ১৫৯-৭০।
মুদ্রক-প্রকাশক-গ্রন্থকার বিদ্যাসাগরের কথা।
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে। দৈনিক বসুমতী, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। ১৩৭১। পৃ ৩০-৩৩।
বসুমতী প্রকাশনা সম্পর্কে তথ্য আছে।
বিশু মুখোপাধ্যায়। সুলভ সাহিত্য প্রচারে বসুমতীর বিস্ময়কর অবদান। দৈনিক বসুমতী, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ। ১৩৭১। পৃ ১০৯-১৩।
বিশ্বকর্মা (ছদ্ম)। লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা। কলিকাতা, শ্রীমতী দত্ত, ১৯৬১। ৩৮৬ পৃ।
দি রেডিয়্যাণ্ট প্রোসেস (ব্লক মেকিং); ঈগল লিথোগ্রাফিং কোম্পানী (অফসেট প্রিন্টিং); শ্রী সরস্বতী প্রেস (লেটার প্রেস ও অফসেট); কালিকা টাইপ ফাউন্ড্রী; মডার্ন বুক এজেন্সী সম্বন্ধে তথ্য আছে।
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পঞ্চাশৎ বর্ষ-পরিক্রমা, ১৯২৩-১৯৭৩। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪। ১০৭ পৃ। সচিত্র।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। পুস্তক ব্যবসায় সমস্যা ও তার সমাধানের পথ। গ্রন্থজগৎ, ৩ (মার্চ ১৯৬০): ২৬-৩০।

বিহারীলাল সরকার। বিদ্যাসাগর, ৪ সং। কলিকাতা, শান্ত প্রকাশ কার্যালয় হইতে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৯ (১৯২২ খ্রীঃ)। ৮২৫ পৃ।

সংশ্লিষ্ট তথ্য সূচী

(১) সংস্কৃত যন্ত্র, ১৯৫। (২) সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপোজিটরী, ৩৫০ ২। (৩) ছাপাখানার স্বত্ব, ৪৪৮। (৪) ছাপাখানা বিক্রয়, ৪৭১। (৫) ডিপজিটরীর স্বত্বত্যাগ, ৪৭৫। (৬) ছাপাখানা শেষ, ৪৭৭।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। খোদাই চিত্রে বাঙালী (প্রাচীন কাঠখোদাই)। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৬, ২ (১৩৪৬) ১৪৯-৫৬।

—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ২ সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৯। ২৪ পৃ। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৭)।

—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৪, ১ (১৩৪৪) ১-৯।

—বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরাজী ব্যাকরণ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪০, ৪ (১৩৪০), ১৮৪-৮৫।

—বাংলার প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র। প্রবাসী, ৪৬ (শ্রা ১৩৫৩) ৩৯৩-৯৫।

প্রবন্ধটি সংবাদপত্রে সেকালের কথার দ্বিতীয় খণ্ডে সম্পাদকীয় বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (পৃ ৭৩৬ ৪৩)।

—সংকলক। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ৩ সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৬। ২ খণ্ড।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি উইলিয়াম কেরী, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলার প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র মুদ্রাযন্ত্র, লিথোগ্রাফি ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড পঞ্চানন কর্মকার বাবুরাম ও কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন বাংলা ছাপা হরফ মনোহর মিস্ত্রী শ্রীরামপুর মিশন টাইপের কারখানা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। ক্যাপ্টেন জেম্‌স স্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৮। ৫৭ পৃ।

ভবতোষ বসু। ছাপার ভুল। শ্রীসরস্বতী, ১০, ১ (১৯৭২) ২৫-৩৫ এবং ১১, ১-২ (১৯৭৫) ৪ ৮।

ভবানী মুখোপাধ্যায়। বই-এর বাজারে ক্রেতা। বেতারজগৎ (শারদীয় ১৯৬০) ৪০।

ভূপেশ দাস। মুদ্রণ পারিপাট্যে টাচিং আপের গুরুত্ব ও প্রভাব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬ ১৩৮১। (১ বৈ ১৩৮১)। পৃ ৪৫।

ভোলানাথ চক্রবর্তী। পুস্তক ব্যবসায়ে সমস্যা ও তার সমাধানের পথ। গ্রন্থজগৎ, ৩ (মার্চ ১৯৬০) ৩১-৩২।

মণি বাগচি। বুক কোম্পানী ও গিরীন্দ্রনাথ মিত্র। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২) ৭০-৭১।

মণিকা সেন। বাংলা মুদ্রণের দু'শ বছর। সাপ্তাহিক বাংলাদেশ (৯ ডিসে ১৯৭৭)।

মদন ভট্টাচার্য। সহযোগ প্রকাশনা (co publishing)। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩) ১২৬-২৭।

মনোজ বসু। বইয়ের বাজার। দেশ, ২০ (২৬ বৈ ১৩৬০) ৯৬-৯৯।

মনোজকুমার মিত্র। লাইনো মেসিনে ছাপা বনাম সাধারণ ছাপা। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১২ (শ্রা-আশ্বিন ১৩৮৩) ২৪৬-৫৫।

মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী। আদর্শচরিত, কিম্বা কেরী, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান চরিত। ১৮৮০। ১৫৩ পৃ।

মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরী, ওয়ার্ড এবং মার্শম্যানের অবদান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।

মাধব্য (ছদ্ম)। বাংলা বইয়ের বাজার। আনন্দবাজার পত্রিকা (২৬ অক্টো ১৯৭০)।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র 'গ্রন্থজগৎ'-এর ডিসেম্বর ১৯৭০ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হয়।

মাস্টার অফ প্রিন্টিং বা কম্পোজিটারি-শিক্ষা। কলিকাতা, সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, (ভাদ্র ১৩৩৯)। ৬২ পৃ।

মাস্টার অফ প্রিন্টিং বা প্রাথমিক কম্পোজিটারী শিক্ষা। অভিজ্ঞ কম্পোজিটার কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, দি হিন্দুস্থান পাবলিশিং কোং [তাং নাই]। ৭২ পৃ।

মীরা সান্যাল। উইলিয়ম কেরী: একটি বিচিত্র জীবন। গ্রন্থাগার, ১১ (শ্রা ১৩৬৮): ১৮৬-৯০। মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র। নববার্ষিকী, ৯ম বৎসর। ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের প্রথম পঁচিশ বৎসর (১৯১৯-১৯৪৪) সুবর্ণলেখা, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৭৪। পৃ ২৭-১২৮।

দ্রষ্টব্য: কয়েকটি প্রধান ভাষায় সাহিত্য সঙ্কলন প্রকাশ, বাংলা পুস্তক-প্রকাশন সমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণযন্ত্র।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচনা। কলিকাতা, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র। সম্বৎ ১৯২৯ (১৮৭২ খৃঃ)। ৩০ পৃঃ।

ইং ১৮৭০ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে জাতীয় মেলার মাসিক সভার চতুর্থ অধিবেশনে প্রথম পঠিত। বাংলা মুদ্রণবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ।

যোগেশচন্দ্র বাগল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কার্যারম্ভ। বাংলার জনশিক্ষা: ১৮০০-১৮৫৬ (কার্তিক ১৩৫৬)। পৃ ১০-১৫।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির গোড়াপত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা যাবে।

—কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটি। বেতারজগৎ, ২০, (১৯৪৯)।

—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ। প্রবাসী, ৫৪(১) (শ্রা ১৩৬১): ৪১৫-১৯, ৫৫(১) (বৈ ১৩৬২): ৫৪-৫৮।

—বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কথা। প্রবাসী, ৫৪(২) (চৈ ১৩৬১): ৬৭৫-৮০।

—মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা। গ্রন্থাগার (১৩৬৯); শ্রীসরস্বতী, ১, ১-৪ সংখ্যা।

—সে যুগের ধাতু-খোদাই ও কাঠ-খোদাই শিল্প। প্রবাসী, ৫৪(১) (বৈ ১৩৬১): ৭০-৭৮।

রঘুনাথ গোস্বামী। ডিজাইন ও লে-আউট। গ্রন্থজগৎ; প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৩২-৩৪।

—প্রকাশন ও গ্রাফিক ডিজাইন: আগামী দশক। কৃত্তিবাস, ৪ (জানু-ফেব্রু ১৯৭৮): ৩২৮-৩৫।

রজনীকান্ত গুপ্ত। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১২৮৫ (১৮৭৮)। ২৯ পৃ।

'মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস, ১৮৭৮ সালের ৯ আইনের বিবরণ এই আইন জারি হওয়াতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের কি কি অপকার হইতেছে, সংক্ষেপে তাহা লিখিবার উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাবে প্রকাশ হইয়াছে।'

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। হ্যান্ডপ্রেসে ছাপা তালপাতার পুথি। আনন্দবাজার পত্রিকা (৫ ফাল্গুন, ১৩৮৫): ৪।

রণবীর দাশগুপ্ত। মুদ্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১ (১ বৈ ১৩৮১): ২৫-২৬।

রণেন আয়ন দত্ত। প্রকাশন শিল্পে ডিজাইন ও লে-আউট। গ্রন্থজগৎ; প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ২৮-৩১।

রণেশ দাশগুপ্ত। গ্রন্থজগতের সংকট: লেখকের চোখে। বই (বাংলাদেশ), জাতীয় গ্রন্থমেলা সংখ্যা; (মে ১৯৭৪): ২১-২২।

রণেশ ভট্টাচার্য। কোয়ার্টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার, রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১; (১ বৈ ১৩৮১): ৩৫-৩৬।

রবীন বল। প্রকাশক-পুস্তক বিক্রেতা সম্পর্ক। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩); ১০৬-৮।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। পুরনো কলকাতার বইপাড়া। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট; কলকাতা। কলকাতা সংখ্যা (১৯৭৭): ৪৫-৪৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বানান বিধি। রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৫শ খণ্ড, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৭৩। পৃ ১৮৯-৯৩।

—লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরী। ভারতী (জ্যৈ ১২৯০): ৭১-৭৮।

লেখকের নাম ছাপানো ছিল না।

রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। প্রকাশন প্রণালী—স্কুল পাঠ্য-পুস্তক। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৫৪-৫৭।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা: বিশেষ হ্যালহেড সংখ্যা; ১৬ (কা-পৌ ১৩৮৫)। হলহেডের ব্যাকরণ এবং সাধারণভাবে বাংলা ব্যাকরণের ওপর বিভিন্ন লেখকের আলোচনা ও বাংলা ব্যাকরণের বিবরণপঞ্জী।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ছবি ছাপের ছবির কথা। বৈশাখী (বার্ষিকী), বুদ্ধদেব বসু ও অন্যান্য সম্পাদিত। ১৩৪৮। পৃ ৬৮-৭১।

রাজশেখর বসু। বাংলা বানান। লঘুগুরু প্রবন্ধাবলী, ২য় সং। কলিকাতা, এম. সি সরকার, ১৩৫৬ পৃ ১২৭-৩৩।

রাণা বসু। বাঙলা পুস্তক ব্যবসায়, সেকাল ও একাল। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২). ১৩-২২।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। জনপ্রিয় সাহিত্য। সাহিত্য চিন্তা, সাহিত্য সংখ্যা (বৈ ১৩৮৫) ২৫-৩৪। বাংলা পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

রাধারমণ মিত্র। বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপজিটারি। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর, ১৯৭৭। পৃ ২৪-২৬।

রায় রত্নাকর (ছদ্ম)। গ্রন্থাবলী হুজুগ না নেশা। অমৃত, ১৭ (২৪ চৈ ১৩৮৪) ১৩-১৫। বিশ্ববাণী, ভারবী, অখিল ভারত জনশিক্ষা সমিতি প্রভৃতির গ্রন্থাবলী প্রকাশনার কথা।

লং, জেম্‌স। গ্রন্থাবলী, অর্থাৎ লং সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত বঙ্গভাষার পুস্তক সকলের নাম। শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত। ১৮৫২। ২৫ পৃ।

লীলা মজুমদার। উপেন্দ্রকিশোর। কথাসাহিত্য (বৈ ১৩৭০) ৬-৯। উপেন্দ্রকিশোরের ব্লকে ছবি ছাপানোর কথা।

—উপেন্দ্রকিশোর। কলিকাতা, নিউস্ক্রিপ্ট, ১৮৮৫ শকাব্দ। ৯৩ পৃ। হাফটোন ব্লক প্রিন্টিং এ উপেন্দ্রকিশোরের দান, পৃ ৫৬ ৬২।

—প্রকাশকের ভূমিকা। বিভাব, দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা (শীত ১৩৮৬) ২২-২৫। মূলতঃ দিলীপ গুপ্তের (সিগনেট) প্রকাশনার কথা।

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রকাশনা জগৎ। গ্রন্থজগৎ, ১২ (সেপ্টে-অক্টো ১৯৭১) ৩-৪।

—প্রকাশক-পুস্তক বিক্রেতা সম্পর্ক। গ্রন্থজগৎ প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩) ১০৩ ৫।

শরৎ মুখোপাধ্যায়। বাংলা বইয়ের সালতামামি (১৯৬৯-৭০), অশোক দাস অনূদিত। গ্রন্থজগৎ, ১২ (মার্চ ১৯৭১) ৩-৫।

শিশির সেন। প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। গ্রন্থজগৎ ৪ (সেপ্টে ১৯৬০) ৩০-৩৩।

শুভেন্দুসুন্দর মুখোপাধ্যায়। বাংলা অক্ষরডালার পুনর্বিন্যাস। আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা। ১৩৮৬। পৃ ৬৯-৭১।

—বাংলা বানান। আনন্দবাজার পত্রিকা (৩ জুন ১৯৫৯) ৮। বানান নিয়ে মুদ্রণের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা।

শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়। এ দেশের মুদ্রণ শিল্পে বিভিন্নমুখী সমস্যা। শ্রীসরস্বতী, ৪, ১ ২, (১৯৬৬) ৮-১২। ১৯৬৬ র ২৮ ২৯ মে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও অ্যাসোসিয়েশন অব মাস্টার প্রিন্টার্স ওয়েস্ট বেঙ্গলের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ মুদ্রক সম্মেলনের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

—পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রণ শিল্প সমস্যা। শ্রীসরস্বতী, ৩, ১ (১৯৬৫) ১৭-২২।

—মুদ্রণের আদিপর্ব ও বাংলার সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। গ্রন্থাগার, ২০ (পৌ ১৩৭৭) · ৩১১-১৫। শ্রীসরস্বতী ৯, ১ (১৯৭১) সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

শ্যামল চক্রবর্তী। ছাপা হরফের হাট। কলিকাতা, সাহিত্য সদন, ১৩৭৭। ৯৬ পৃ। সচিত্র। কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকদের কথা।

শ্যামসুন্দর ধর। বৃন্দাবন ধর একজন কৃতী প্রকাশক। গ্রন্থজগৎ, হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২) ৬৮-৬৯। আশুতোষ লাইব্রেরী (১৮৯৬) সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।

শ্রীকম্পোজিটর (ছদ্ম)। আমরা ও লেখকসমাজ। শ্রীসরস্বতী, ১০, ১ (১৯৭২) ১৯-২২।

শ্রীপান্থ (ছদ্ম), নিখিল সরকার দ্রষ্টব্য।

শ্রীশকুমার কুণ্ড। বাংলা বইয়ের প্রকাশন ও বিপণন অবস্থা ও ব্যবস্থা। সত্যযুগ (৩১ জানু ১৯৮১)।

শ্রীসরস্বতী (পত্রিকা)। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শ্রীসরস্বতী ১, ৪ (১৯৬৩) ১-৩। উপেন্দ্রকিশোরের হাফটোন্ ব্লক সম্পর্কে আলোচনা।

সজনীকান্ত দাস। উইলিয়ম কেরী; ৫ সং। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬৩। ৫৬ পৃ।

(সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১৫)।
সাহিত্য সাধক চরিতমালার ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।
—জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ৬৫, ২ (১৩৬৫): ৮৯-১১৪।
—ফেলিক্স কেরী। ১৩৭১। পৃ ১৭-৬০। (সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৮৮)।
সাহিত্য সাধক চরিতমালার ৮ম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
—বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালা মুদ্রণ শিল্প। দেশ; ৩২ (২৭ চৈ ১৩৭১): ৯৫৯-৬১।
—বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ৪০, ৪ (১৩৪০): ১৬৩-৭০।
—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ২ সং। কলিকাতা, মিত্রালয়, ১৩৬৯। ৪৪০ পৃ।
বইটির প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রতিলিপি; ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র; ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় ইংরেজ; মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস; চার্লস উইলকিনস ও পঞ্চানন কর্মকার; শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।
সবিতা চট্টোপাধ্যায় (দাশ)। জন মারডক ও বাঙ্গালা বর্ণমালা সমস্যা। শ্রীসরস্বতী; ৩, ২ (১৯৬৫): ৫৬-৬৮।
প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরকে লেখা মারডকের চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে।
—বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২। ৫৪০ পৃ।
বইটিতে মুদ্রিত বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রাচীন ইতিহাস; ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত মিশনারী গ্রন্থ; বহির্ভারতে প্রকাশিত মিশনারীদের কয়েকটি স্মরণীয় বাঙ্গালা গ্রন্থ; বাঙ্গালায় প্রটেস্টান্ট মিশনারীদের বাঙ্গালা গ্রন্থ; ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির মূল্যায়ন; ইউরোপীয়দের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও গ্রন্থ রচনায় নতুন যুগ; চার্লস উইলকিনস; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটার্সদের রচনা (১৭৭৯-১৭৯৯); বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রকাশে কেরী যুগ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।
—বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালা মুদ্রণ শিল্প। দেশ; ৩২ (২৭ চৈ ১৩৭১, ১০ এপ্রি ১৯৬৫): ৯৫৯-৬১।
সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়। শরৎবাবুর গ্রন্থ ব্যবসায়। শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ। ১৯১৭। পৃ ২৫৮-৬১।
এস. কে. লাহিড়ী এন্ড কোম্পানী এবং কটন প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ীর গ্রন্থ ব্যবসা সম্পর্কিত আলোচনা।
সাধন চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন শিল্পের মূল্যায়ন। গ্রন্থজগৎ; হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ২৩-২৭।
সিদ্দিক খান, মুহম্মদ। ফেলিক্স কেরী: একটি বৈচিত্রময় জীবন। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় (শীত সংখ্যা ১৩৭৮)।
—বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনে কেরীযুগ। ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২। ১১৬ পৃ। সচিত্র।
শ্রীরামপুরে মিশন প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত (১৮০০ থেকে ১৮৩৪-৩৫ খ্রীঃ) বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের তালিকা সম্বলিত। প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য পত্রিকা'-র বর্ষা সংখ্যায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে।
—বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের গোড়ার কথা। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৩৭১। ২১৮ পৃ। সচিত্র।
—বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা। সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ৩ (শীত সংখ্যা ১৩৬৬): ৫৭-৯৮।
—বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা; গোলোকেন্দু ঘোষ অনূদিত। শ্রীসরস্বতী; ২, ১ (১৯৬৪): ৮-১২, এবং ২, ২-৩ (১৯৬৪): ১৮-২১।
চিকাগোর *Library Quarterly* (32, 1. Jan 1962) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।
—বাংলা মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস। গ্রন্থাগার; ১২ (আশ্বিন ১৩৬৯); ২৪৩-৫৮।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। গ্রন্থজগতের সংকট: লেখকের চোখে। বই (বাংলাদেশ); জাতীয় গ্রন্থমেলা সংখ্যা (মে ১৯৭৪): ১৬-২০।
সুকুমার রায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়। প্রবাসী, ১৫(২) (মা ১৩২২): ৪০৬-১১।
প্রবন্ধটি উপেন্দ্রকিশোরের শ্রাদ্ধ বাসরে লেখক কর্তৃক পঠিত। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপেন্দ্র-কিশোর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সংযোজন করেছেন ৪১০-১১ পৃষ্ঠায়।
সুকুমার সেন। বটতলার বেসাতি। বিশ্বভারতী পত্রিকা; ৭ (শ্রা-আশ্বিন ১৩৫৫): ১৬-২৫।
—বাংলা ছাপা অক্ষর ও ছাপাখানার কথা। দক্ষিণীবার্তা; শারদীয়া সংখ্যা (১৩৮৫): ৯-১৬।
সুধাময় দাশগুপ্ত। সুমিতুল সাহুআন। কথাসাহিত্য (বৈ ১৩৭০): ১৫-১৭।
ব্লক নির্মাণের নবতর প্রণালী 'স্ক্রীনোটাইপ' এবং রে টিন্ট' প্রণালীর উদ্ভাবক উপেন্দ্রকিশোর সম্পর্কে লেখা।

সুধাংশু সরকার। প্রকাশক—গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ১২৪-২৫।

সুধীর বেরা। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। দৈনিক বসুমতী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। ১৩৭১। পৃ ১৪১-৪২।

সুধীর ব্রহ্ম। কলিকাতায় মুদ্রণ ইতিহাসের এক অধ্যায়। মন্দিরা (জ্যৈ ১৩৬৪): ১১৯-২২।
অমৃতলাল ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত স্ট্যান্ডার্ড প্রেসের কথা।

—মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাস। মন্দিরা; (কা ১৩৬৪): ৫১৪-৭।
মূলতঃ স্ট্যান্ডার্ড প্রেসের ইতিহাস।

সুধীর মুখোপাধ্যায়। ব্লকের ইতিকথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী স্মারক-গ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১। ১৩৮১। পৃ৩২-৩৪।

সুধীরকুমার মিত্র। বাঙ্গালার প্রথম গদ্য পুস্তক। দেশ; ১০ (১৮ শ্রা ১৩৫০, ৩ আগ ১৯৪৬): ৫৩৫-৩৬)।
১৮০১ খৃষ্টাব্দে ১০ ফেব্রুয়ারী টমাস-বসু-কেরী-ফাউণ্টেন অনুদিত এবং কেরী সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেস্টামেণ্ট-এর বঙ্গানুবাদ 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়। লেখকের মতে এটাই বাংলায় প্রকাশিত প্রথম গদ্য পুস্তক।

সুধীরচন্দ্র সরকার। আমার কাল আমার দেশ। কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৭৫। ২০৪ পৃ।
লেখকের এই স্মৃতিচারণে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা প্রকাশনার অনেক তথ্য আছে।

—বাংলা পুস্তক প্রকাশনের ইতিহাস। গ্রন্থজগৎ, ৩ (মার্চ ১৯৬০): ১-৩।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রবেশক। পাদ্রি মানো এল্-দা-আসসুম্পসাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ও অনুদিত। ১৯৩১। পৃঃ /০-২৷৷০

—বাঙ্গালা বানান-সমস্যা। প্রবাসী, (বৈশাখ, ১৩২৪): ৯৪-৯৭।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১; ১ বৈ ১৩৮১। ২৯-৩১।

—বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন। কলিকাতা, রত্না প্রকাশন, সেপ্টে ১৯৭৪। ১৮২ পৃ।
গোড়ার দিকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

সুনীলকুমার বসু। রিপ্রোগ্রাফি: প্রকাশনা শিল্পের একটি বিপদ। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ২ (শ্রা-আশ্বিন ১৩৭৩): ১৯৫-২০২।

সুপ্রসাদ সেনগুপ্ত। স্যার চার্লস উইলকিন্স: বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণে বিদেশী পথিকৃৎ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ গ্রন্থাগার: রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৫৬-১৩৮১। ১৩৮১। পৃ ৪৯-৫০।

সুপ্রিয় সরকার। প্রকাশনা প্রণালী: অভিধান ও জ্ঞানকোষ প্রণয়ন। গ্রন্থজগৎ; প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৭৫-৭৭।

সুবোধ চৌধুরী। প্রকাশন প্রণালী: অভিধান ও জ্ঞানকোষ প্রণয়ন। গ্রন্থজগৎ, প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা (এপ্রি-মে ১৯৭৩): ৬৭-৭৪, ৭৭।

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। উইলিয়াম কেরী ও বাংলা গদ্যের আদিপর্ব। অমৃত। (১ ভা ১৩৬৮): ১৮৯-৯১।

সুরেন্দ্রনাথ সেন। এভোরো। বার্ষিক বসুমতী, ৩ বর্ষ (১৩৩৪): ২২৫-৩১।
লিসবনের কাছাকাছি অবস্থিত এভোরো শহরের গ্রন্থাগারে বাংলা রোমান হরফে ছাপা দুখানি বই আছে। বই দুটি হল: (১) Cathecismo da Doutrina Christan ordenado por modo de Dialogo em idioma Bengalae Portuguez (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) এবং (২) Vocabulario em idioma Bengalae Portuguez dividido em duas partes (বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ); বই দুটি ছাপা হয়েছিল ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনের ফ্রান্সিসকো দে-সিলভার ছাপাখানায়।

—বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন। ১৯৪২। পৃ ৮৫-৮৬।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার। বাঙ্গালা লাইনো টাইপ ও অক্ষর সংস্কার। আনন্দবাজার পত্রিকা; শারদীয়া (১৩৪২): ১০-১১।
দ্রষ্টব্যঃ দেশ (২৮ সেপ্টে ১৯৩৫): ২৬-২৯।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। বসুমতীর প্রবর্তক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দৈনিক বসুমতী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ। ১৩৭১। পৃ ৪৫-৪৮।

সাহিত্য (বৈ ১৩২৬) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী। প্রকাশক এস. কে. লাহিড়ী। গ্রন্থজগৎ; হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা; ১০ (আগ-সেপ্টে ১৯৭২): ৫-৮।

শরৎকুমার লাহিড়ী (১৮৫৯-১৯১৩) ছিলেন এস. কে. লাহিড়ী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা।

—প্রকাশক বিদ্যাসাগর। গ্রন্থজগৎ, ১৩ (জানু ১৯৭১): ৭-১৬।

সুশীলকুমার দে। ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা সাহিত্য (কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ)। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ২৩, ৩ (১৩২৩): ১৭৯-৯৫।

স্বপন বসু। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী, অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত। ৬, ৮; (১৩৮৩): ৩২৯-৩৩।

হরিশচন্দ্র রায়। কম্পোজিটরস্ প্রাইমার, ৩ সং। কলিকাতা, এস. সি. আঢ্য এণ্ড কোং, ১৯৩১ (১৩৩৮)। ১৪৬ পৃ।

প্রথম প্রকাশ: ১৯০২।

হরিহর শেঠ। ক্রোমোলিথোগ্রাফি। পূণ্য (বৈ-জ্যৈ ১৩০৬); ৩৯৪-৯৮।

লিথোগ্রাফির সাহায্যে নানা বর্ণবিশিষ্ট চিত্রের মুদ্রণকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

—চন্দননগরের পাদ্রী জ্যোতির্বিদ গেরেণের শতবর্ষের গ্রহণ গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক। ভারতবর্ষ; ১২(২) (জ্যৈ ১৩৩২): ৮৬০-৭১।

আই এফ. গেরেনের 'কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ' সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে।

—বাংলার প্রথম মাসিকপত্র। প্রবাসী; (মা ১৩৪০): ৫৬০-৬২।

দিগ্দর্শন (এপ্রিল ১৮১৮) প্রকাশনার গোড়ার কথা।

হস্টেন, এইচ। তিনটি প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ; হাবীবুর রশীদ অনূদিত। বাংলা একাডেমী পত্রিকা (ঢাকা); ১১, ৩; ১৩৭৪।

Bengal: Past and Present (July-Sep. 1914)-তে প্রকাশিত The three first type-printed Bengali Books'-এর অনুবাদ।

হীরক রায়। গ্রন্থাবলী হুজুগ না নেশা। অমৃত; ১৭, (২৪ চৈ ১৩৮৪): ৮-১৩।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বিশ্বভারতী, উদ্বোধন কার্যালয়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মণ্ডল বুক হাউস, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, হরফ প্রকাশনী, এশিয়া পাবলিশার্স, গ্রন্থালয় সংস্থা, এম. সি. সরকার, মৌসুমী প্রকাশনী, তুলিকলম প্রভৃতি কর্তৃক রচনাবলী প্রকাশনার কথা বলা হয়েছে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পুস্তক প্রকাশন ও পাঠক। দেশ, ২০ (২৬ বৈ ১৩৬০): ১০১-৪।

English

Appasamy, Jaya. Early Calcutta wood engravings, *The Visva Bharati Quarterly; 39*, 3-4, (Nov. 73-April 74): 260-67

Three illustrations.

Bagal, Jogeshchandra. Book illustrations in Bengal in the early 19th century. *All India Printers' Conference Exhibition.* 1954.

—Romance of the Bengali types. *Hindusthan Standard (Calcutta);* (2 Mar 1954): 3.

Bandyopadhyay, Brajendranath. An early chapter of the press in Bengal, *Modern Review,* 44. (Nov 1928): 553-60.

—Early history of the vernacular press in Calcutta. *Calcutta Municipal Gazette;* sixth anniversary number (22 Nov 1930).

Bandyopadhyay, Chittaranjan. Current Publishing trends in India. *Indian Literature;* 5, 2 (1962): 49-58.

Includes statistics of book publishing in West Bengal for the year 1961-'62.

—Indian Publishing: recent trends, *Indian Literature,* 9, 4, (1966): 5-14

—Publishing capacity of Indian languages. *Book Development. Today and Tomorrow.* Jaipur, Rajasthan Pustak Byabasayee

Sangha, 1967, pp. 17-23

Bandyopadhyay, Pramathanath. The University library and the press. *Hundred years of the University of Calcutta*. Calcutta University, 1957. pp 219-20.

Barns, Margarita. First Indian newspaper. *The Indian Press: history of the growth of public opinion in India, 1940*. pp 43-70.
Includes discussion on Charles Wilkins, N B Halhed and Panchanan Karmakar

Basak, N. L. Origin and role of the Calcutta School Book Society in promoting the cause of education in India, especially Vernacular Education in Bengal (1817-1835). *Bengal: Past & Present*; 78(1) (Jan-June 1959): 30-69.

Bengali types. *Statesman* (10 Dec 1974): 4.

Bishui, Kalpana. The Vernacular newspaper press of Bengal of the post-mutiny period, with particular reference to the period 1880-1892. *The Indian press*. Pub. by the Institute of Historical Studies, 1966. pp. 1-37.
Mimeographed Paper presented at the 4th Annual Conference of the Institute, Mysore, 1966 Paper also includes history of vrenacular newspaper publishing

Biswas, Haricharan. Some English orientalists. *Calcutta Review*; 128, 255 (1909): 64-98.
Discusses the activities of Halhed, Wilkins, Colebrooke and Jones

Book making in India. *Times*, London; (8 Nov 1870).

Bose, P. N. & Moreno, H.W.B. *A Hundred years of the Bengali press*; being a history of the Bengali newspapers from their inception to the present day. Calcutta, H.W.B. Moreno, 1920. 129 p.

Calcutta School Book Society. *Calcutta Journal*; (23 May, 1819)

Calcutta School Book Society. *The Days of John Company*: selections from *Calcutta Gazette*, 1834-1832; ed. by A C Dasgupta. 1959. pp. 298-304.

Calcutta School Book Society. *Reports, and accounts of the institution*, 1817-1818 to 1857-1858. Calcutta, School Book Society, 1818-1859.

Calcutta School Book Society and Vernacular Literature Society. *The Calcutta Christian Observer* (old series); v. 34 (1865): 328-29.

Carey, Eustace. *Memoir of William Carey, D.D.*, late missionery to Bengal, London, Jackson and Walford, 1836. 630 p.

Carey, S. Pearce. *William Carey*, 8th ed. London, Carey press, 1934 XVI, 447 p. illus., maps.
Life of William Carey, including his days in Serampore and Fort William College, Calcutta.

Carey, W. H. The Calcutta press. *The Good old days of Honorable John Company*; being curious reminiscences during the rule of the East India Company from 1600 to 1858, Ed. by Amarendranath Mookerjee, New abridged ed. 1964. pp 111-55.
Includes story of the Vernacular Press.

Chakraborty, Smarajit. *The Bengali press (1818-1868)*: a study in the growth of public opinion. Calcutta, Firma K L Mukhopadhyay, 1976. 252 p. 8 plates.
Covers also the background history of publications of Bengali periodicals

Chattopadhyay, Mohan, & Chaudhuri, Dilip. Scripts and printing in Indian languages. *Evolution of printing types*. 1962. pp 113-9.

Chattopadhyay, Sunitikumar. Sir William Jones: 1746-1794. *Sir William Jones Bicentenary of His Birth Commemoration Volume, 1746-1794*. Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 1948. pp.

81-96.
Includes discussion on Charles Wilkins.

Das, Sisirkumar. The Beginnings of Bengali prose. *Early Bengali Prose : Carey to Vidyasagar*, 1966. pp. 23-54.

—Printing. *Sahibs and Munshis* : an account of the College of Fort William, 1978. pp 79-86.

—Publications [of Fort William College]. *Sahibs and Munshis* : an account of the College of Fort William, 1978. pp 68-78.

Datta, Kalikinkar. Early publications. *Bengal : Past & Present* ; 87(1), (Jan-June 1968) : pp 92-98.

Datta, Prasun & Sen, Dipankar. Reform of Bengali monotype key-board. *Printers' Voice*, 12 (May 1975) : 1, 5-6 ; (Jun 1975) : 7 ; (Jul 1975) : 3-5 ; (Aug 1975) : 5-9 ; (Oct 1975) : 9.

De, Amalendu. Publication of text-books in Bengali : a movement for child education in nineteenth century Bengal, *David Hare :* Bicentenary volume, *1975-76*. Dec *1976*. pp *72-93*.

De, Sushilkumar. *Bengali literature in the nineteenth century* (1757-1857). 2nd ed. Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962. IX, 650 p.
This book covers subjects like earliest European writers, William Carey his days in Serampore and in Fort William College ; Pandits and Munshis of Fort William College ; earliest Bengali journalisim ; periodicals and newspapers published by Serampore Press and later European writers.

Diehl, Katharine Smith. *Early Indian imprints :* an exhibition from the William Carey Historical Library of Serampore. Serampore, The Council of Serampore College., 1962. v., 35 p.

—*Early Indian imprints ;* assisted in the oriental languages by Hemendrakumar Sircar. N Y, Scarecrow press, 1964. 533 p.

Editorial notes [on Vernacular Press Act] *Statesman* (30 Mar 1878).

Ellis, Norman A. Indian typography. *The Carey Exhibition of early printing and fine printing*. Calcutta, National Library, 1955. pp 10-14.

First establishment of a Press in Calcutta. *Friend of India* (Wkly) ; v. 9 (Feb 26, 1835) : 65.

Ghosh, Jogendranath. Lecture on printing. *National Paper ;* 6, 26 (6 Jul 1870).

Ghoshal, Ramesh. The illustration of books in early Bengal. *Statesman ;* (30 May 1964)

—Panchanan Karmakar. *Hindusthan Standard ;* (16 Nov *1947*).

—Pasvavali (Bengali Nature magazine, illustrated). *Statesman ;* (21 Nov 1954).

Grant, J. Warren Hastings in slippers. *Calcutta Riview ; 26* (Mar 1856) : 59-141.
Includes discussion on N. B. Halhed.

Grierson, Greorge Abraham. The early publications of the Serampore Missionaries : a contribution to Indian bibliography. *Indian Antiquary*, Bombay ; v. 32, (Jun 1903) : 241-254.

Guha, S. C. Early Bengali printing on paper. *Memoirs of the Madras Library Association*, 1941. pp 44-7

Guha Ray, S. N. Presidential address at the 5th Session of W. Bengal Printers' Conference, Calcutta, dated 28 May 1966. *Sree Saraswaty ;* 4, 1-2 (1966) : 23-32.

—U, Ray (Editorial). *Sree Saraswaty ;* 1, 4 (1963) : 1-2.
Discusses Upendrakishore Ray's contribution to block-making.

Halhed, Nathaniel Brassey. *A Grammar of the Bengal Language.* Hoogly, 1778.

Halhed's introduction offers valuable information on cutting of Bengali type-founts by Charles Wilkins.

—New facsimile ed. edited by Nikhil Sarkar. Calcutta, Ananda Publishers, 1980.

Editor's introduction contains valuable information on Halhed and Bengali printing.

Halhed, Nathaniel John. The late Mr. Halhed. *Friend of India;* 4, 189; (9 Aug 1838).

This obituary of Late Nathaniel John Halhed includes activities of his god-father Nathaniel Brassey Halhed

Higginbotham, J. J. *Men whom India has known: Biographies of eminent Indian characters.* 2nd ed. Madras, Higginbotham, 1874.

Includes life sketches of Felix Carey; William Carey, Nathaniel Brassey Halhed, and Charles Wilkins.

Hosten, H. The three first type-printed Bengali books. *Bengal: Past and Present;* 9 (1), 17 (Jul-Sep 1914): 40-43; 13(1), 25-26 Jul-Sep 1916): 67-68.

Author describes in full a copy of Fr Manoel da Assumpcao's 'Compendio dos Misterios da Fe, Or No 2 of Manoel da Assumpcao's three Bengali books printed at Lisbon in 1743

India. National Library, Calcutta. *The Carey exhibition of early printing and fine printing.* Calcutta, National Library, 1955. 41 p. illus. facsims.

An account of the early history of Indian printing with a bibliography Special emphasis on Serampore printing

Kamal, Abu Hena Mustafa. The history of Bengali printing. *The Bengali press and literary writing,* 1818-1831. 1977. pp 1-20.

Khan, Mafakhkhar Hussain. *History of printing in Bengali characters upto 1866.* 2 v. 63 plates.

Unpublished thesis Awarded Ph D degree from the University of London in 1979.

Khan, M Siddiq. The early history of Bengali printing. *Library Quarterly* (Chicago); 32 (Jan 1962): 51-61.

—William Carey and the Serampore books (1800-1834). *Libri* (Copenhagen); 11,3 (1961): 197-280.

Laird, M. A. *Missionaries and education in Bengal,* 1793-1837. Oxford, Clarendon press, 1972. XIV, 300 p.

Development and use of Bengali; Calcutta School Book Society, and Serampore College are among the topics discussed

Long, Rev. James. *A descriptive catalogue of Bengali works,* containing a classified list of Fourteen Hundred Bengali Books and Pamphlets which have issued from the press during the last sixty years with occasional notices of the subjects, the prices and where printed. Calcutta, Sanders, Cones, 1855.

Reprinted as a supplement to Dinesh Chandra Sen's *Bangabhasha O Sahitya* 8th ed. 1356 B S.

—*Descriptive catalogue of Vernacular books & pamphlets.* Forwarded by the Govt. of India to the Paris Universal Exhibition of 1867. Comp. by Rev. J. Long, to which is added a list of Vernacular works sent from the Agra Presidency. And a list of the Vernacular works published in 1865 in the North Western Provinces. Calcutta. Thacker, Spink, 1867.

—Early Bengali literature and Newspapers. *Calcutta Review;* 13, 25 (1850): 124-61.

Discusses also the activities of the Serampore press, Calcutta School Book

Society, Vernacular press etc.
—*Returns relating to the Bengali language in 1857,* to which is added, a list of the native presses, with the books printed at each, their price and character, with a notice of the past condition and future prospects of the Vernacular press of Bengal, and statistics of the Bombay and Madras Vernacular presses. Calcutta, John Gray, General Printing Dept., 1859. LXIV, 83p. *Selections from the Records of the Bengal Govt.*, no. XXXII, 1859.

Marshman, John Clark. *The life and times of Carey, Marshman and Ward;* embracing the history of the Serampore Mission. London, Longman, Brown, Green, Longmans and Roberts, 1859. 2v.
Describes the early days of Bengali printing as it devoloped at Serampore Also includes Lord Hastings' memorable declaration, and discussion on Calcutta School Book Society, and the first Bengali newspaper *Samachar Darpan*

Mitra, Subalchandra. The Sanskrit Press Depository. *Isvar Chandra Vidyasagar*. 1975. pp 353-67.

Mukhopadhyaya, Barun. Bengali printing in the 18th century. *Bulletin of the Victoria Memoral, Calcutta;* v. 344 (1969-70) : 52-56.

Mukhopadhyaya, Sambhu Chandra. A Note on the earliest Bengali punch-cutter (Panchanan Karmakar). Extracted from the note-book of Dr. Sambhu Chandra Mookerjee. *Bengal. Past & Present;* v. 13 (Jul-Sep 1916) : 140.

Murdoch, John. *Catalogue of the Christian vernacular literature of India:* with hints on the management of Indian tract societies. Madras, Caleb Foster, Foster press, 1870.

—Letter to Babu Iswarchandra Vidyasagar on Bengali typography. [Calcutta, Christian Vernacular Education Society, 1865.]. 8p.
The letter has been reprinted in the Bulletin of tho School of Printing Technology, *Impression*, v 4 (1960), and in *Vidyasagar O Bangali Samaj* (Vidyasagar and the Bengali Society), by Benoy Ghosh Longman's edition, 1870

Nag, Ramendranarayan. Crisis in publishing industry of West Bengal. *Contemporary Indian literature,* 12 (Jan-Mar 1972) : 36,63.

National Book Trust, India. New Delhi. *Books India. New Delhi.* 1972.
Issued on the occasion of World Book Fair, 1972 Survey of Bengali books since Independence, by C R Banerjee pp 41-43

Native press of India. *Calcutta Journal;* v.3 (21 Sep 1820) : 241-44.

On the effect of the Native Press in India: *Friend of India* (Qtly); (Sep 1820) : 130-54.
Wilkins, Babooram, Gangakishore, Colebrooke, and others have been discussed

On the origin of printing. *DigDurshan, or the Indian Youth's Magazine,* pt.7 (Oct 1818) : 270, 272, 274, 276, 278, 280 & 282.
Advocates introduction of printing in all parts of India

On the progress and present state of the Native Press in India. *Friend of India* (Qtly), v.4 (May 1825) : 138-56.

Potts, E. Daniel. Translations, Literature, Journalism and Printing. *British Baptist Missionaries in India, 1793-1837: the history of Serampore and its missions*. 1967. pp 79-113.
Narrates the history of publications of the Serampore Mission

Priolkar, Anant Kakba. *The printing press in India:* its beginnings and early development... Bombay, Marathi Samshodhana Mandala, 1958. 364p. 53plates.
Early history of printing press in India.

Progress of Indian literature. *Friend of India* (Jul 1818) : 59-64.

Halhed, Wilkins and others have been included in the discussion
Publication of books in Bengali. *Anthar Bharati Book Exhibition, 1973 : Souvenir*. [Bangalore] published by Kannada Sahitya Parishat. pp. 35-36.

[Ray, David T.] *Syllable and sign frequency—Bengali*. [Illinois University]. [n.d.].
Total frequency 79,945 Mimeographed No title page

Salahuddin Ahmed, A. F. The Bengali press: Vernacular and Persian. *Social ideas and social change in Bengal*: 1818-1835. 2nd ed. 1976. pp 90-114.

Sanyal, S. C. First printing press in Calcutta. *Calcutta Review*; 135, 270 (Oct 1912): 399-409.

—The Secretary's notes. *Bengal: Past & Present*; 13,1 (Jul-Sep 1916): 140.
Notes on Panchanan Karmakar

Sarkar, Hamendrakumar. Books in the Indian languages. Katharine Smith Diehl, *Early Indian imprints*. 1964. pp63-75.

Schurhammer, G. & Cattrell, G. W. The first printing in Indic characters. *Harvard Library Bulletin*: 6,2 (1952): 147-60.

Sen, Dinesh Chandra. *History of Bengali language and literature*. Calcutta, University of Calcutta, 1911. XIII, 1030p.
Relevant topics, (i) The epoch ushered in by European workers—missionaries and civilians, (ii) Dr Carey and his colleagues, (iii) Bengali works by Europeans

Sen, Dipankar. Some facts from history. *Paper, Printing & Allied Trades* (PPAT); Dec-Feb 1962-63.
Discusses early printing in Bengal

—200 years of our printing. *The Hindusthan Times Weekly* (15 Jan 1978): 3.

—Upendrakishore Ray. *Paper, Printing & Allied Trades* (PPAT); (May 1963): 35-36, 38.

Sen, Dipankar & Das, Supriya. Tagore's works. *Indian Print & paper*; 27,1; (Jul 1961).
Authors discuss typographical aspects of publications of Rabindranath Tagore

Sen, Dipankar & Datta, Prasun. Reform of Bengali code of signs. *Printers' Voice*, 14 (Dec 1977): 1, 3-7.

Sen, Nikhil. Grammar Bicentenary. *Amrita Bazar Patrika*, (7 May 1978): 6.

Sen, Ram Comul. *Dictionary in English and Bengalee*; translated from Todd's edition of Johnson's English dictionary. Serampore press, 1834— . 2v.
The preface offers valuable information on early Bengali printing

Sen, Sukumar. Early printers and publishers in Calcutta. *Bengal: Past & Present*; 87(1), 163 (Jan-Jun 1968): 59-66.
Read at the Diamond Jubilee Celebration of the Calcutta Historical Society Reprinted in 'Sree Saraswaty', v7, no 7, 1969, pp 6-11

Sengupta, Dilip. Seven gates of Wisdom. *Daily Basumati Golden Jubilee Number*, 1964. pp 27-29.
Early history of publications of Basumati Sahitya Mandir.

Sengupta, Kantiprasanna. *Christian missionaries in Bengal*; 1793-1833. Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1971. 245p.
Subjects discussed are: (i) The introduction and expansion of the printing press, (ii) Bible translation; (iii) Other missionary activities in the literary field

Smith, George. *The life of William Carey, shoemaker and missionary*. London, J. M. Dent & co, 1909. viii, 362p.
It also depicts the early history of publications and printing in Bengal.

Sur, Atul. 200 years of printing in Bengal. *Indian Journal of Library*

Science, (Oct. 1978) : 2-7

Townshend, M. Carey, Marshman and Ward. *Calcutta Review* ; 32,64 (Jun 1859) : 439-69.

Typography in Indian languages, *Indian Publisher & Book Seller* ; 19 (Apr 1969) : 91.

Vernacular Translation Society, Calcutta. *Proceedings.* Calcutta, Printed by P. S. D'Rozario, 1845. 54p.

Wakankar, L. S. Development of Indian language typography. *Vidura* ; 9 (Jun 1972) : 159-60.

Wenger, E. I. Scripture translation and literature. *The Story of Serampore and its college.* 1961. pp 7-9.

নির্ঘণ্ট

অ-কবিতা থেকে গীতিকবিতা ১৯১
অক্‌সফোর্ড ৩৭, ৪২
অক্রুর সংবাদ ২০১
অক্ষয়কুমার দত্ত ১৬৯-৭০, ১৭২, ২৩০-৩১, ২৬৪, ২৮৭, 'পদার্থবিদ্যা' ১৭১; 'চারুপাঠ' ১৭৫; 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ৩৬১
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৩৫, ২৯০
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৩৫, ২৮৯-৯০; 'সাধারণী' ২৯১
অক্ষরডালা ১১৫; অক্ষরবিন্যাস ১১৮-১৯
অক্ষর যোজনা ও বর্ণমালা ১০৩, ১০৯, ১১৫-১৯; নতুন রীতি ১০৩; হাতে, লাইনো ও মনোতে কম্পোজ ১১৫-১৬
অখিল নিয়োগী ২৬৩, ২৬৭
অগ্রসর বায়ুগতি ২২
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৫৯, ২১৬, ২১৯, ২৯৬, ২৯৮
অচ্যুত গোস্বামী ২১৬
অজিতকুমার চক্রবর্তী ২৯৭
অজিত দত্ত ২৯৮
অজেয় রায় ২৫০, ২৬২
'অর্ভাস, দি' ১৬২
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৫, ২১৬
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৩৫৫
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ২১৬, ২১৮
অদ্রীশ বর্ধন ২৬২
অদ্বৈত মল্লবর্মণ ২১৬
অধর কর্মকার ১০২
অধিরাজবন্ধ ২৭৫
'অধ্যাত্ম রামায়ণের ছবি' ৩৩৬
অনন্ত কাকবা প্রিয়োলকার ১৮
'অনাথ' ২৪২
অনাথকৃষ্ণ দেব ১৭৮
অনারেব্‌ল্‌ কোম্পানীর প্রেস ১২২
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ৩২৩-২৪, ৩৩৫
'অন্নদামঙ্গল' ২৪, ৪৭, ৯৫, ১০১, ২৮৪, ৩১৫, ৩৩৩, ৩৬৩; প্রথম সচিত্র বই ৭২, ১০৩-১৪, ৩১৬, ৩৩৩; বিক্রির জন্য প্রথম বই ৩৫২; বিদ্যাসাগর সংস্করণ ৩৫৪
অন্নদাশঙ্কর রায় ২১২, ২৬০, ২৯৬
'অপরাধ জগতের শব্দকোষ' ৩০৭
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০৬
অফসেট মুদ্রণ ১২০, ১৪২
অফসেট লিথোগ্রাফি ৩৮৪, ৩৮৯
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৬১, ২১৯, ২২০, ২৩৮, ২৪১, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৯, ২৬৫-৬৬, ৩২৮, ৩৩০; শিশু সাহিত্যিক ২৪২, ২৫৫; গ্রন্থচিত্রণে ২৯৩, ৩৩৯
'অবলাবান্ধব' ২৮৮
'অবাক জলপান' ২৪৭
'অবোধবন্ধু পত্রিকা' ১৫৮
অঙ্ক, নানারকম ২২
'অভিজ্ঞানশকুন্তল' ১৫৮, ২০২
অভিধান, প্রথম ৩০২
অভিধান ও কোষগ্রন্থপঞ্জী ৪৪৯
'অভিধান চিন্তামণি' ৩০১
'অমরকোষ' ৯৫, ৩০১, ৩০৭
অমরনাথ রায় ৩১০
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২১৬
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২০৬

অমলা দেবী ২৯৮
অমলেন্দু সেন ৩১০
অমিতাভ চৌধুরী ২৬৩, ২৬৫
অমিয় চক্রবর্তী ১৮৮, ১৯০, ২৯৮
অমিয়ভূষণ মজুমদার ২১২, ২১৯
অমিয়া চৌধুরী ২৯৬
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩৮, ৪০-৪২, ৪৩-৪৪, ১২০, ৩০৯; ভারতবর্ষ সম্পাদনা ২৯৫
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৩৮, ২৯৩; ইংরাজীতে প্রকাশ ১৪০; বাংলা সাপ্তাহিক ২৯০; ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ২৯০
অমৃতলাল মিত্র ২৭৪
'অরণ্যের দিনরাত্রি' ২১৫
অরবিন্দ ঘোষ ২৯৫
'অরুণ বরুণ কিরণমালা' ২৫৪
'অরুণোদয়' ১৬৯
অর্যামা যন্ত্র ২৭৫
'অর্কেস্ট্রা' ১৮৫
'অলিভার টুইস্ট' ১৬২
'অলৌকিক জলযান' ২১৫
অশোক কুণ্ডু ৩১০, ৩১১
অশোক গুহ ১৬২, ২৬৪
অশোক পেপারমিল ৪০৪
'অশৌচ পাঁচালি' ২৭৭
'অশ্রুমতী নাটক' ২৭৪
অসিতকুমার হালদার ২৫৮, ২৬৫, ২৯৬
অসীম রায় ২১৫, ২১৭
অসীমা চট্টোপাধ্যায় ৩১০
অস্কার ওয়াইল্ড ১৫৯
অস্টিন, জেন ২১০
অ্যাডাম, জন ১৩২; সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধিতা ১৩৬
অ্যাডামের রিপোর্ট ৭৩, ১৬৬
'অ্যাণ্টিকুইটিজ অব ওড়িশা' ৩২৬, ৩৩৫, ৩৩৬
'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' ২১১
অ্যাণ্ডারসন, হান্স ২৫৩, ২৫৬, ২৫৮
অ্যাণ্ড্রুজ, জন দ্রঃ এনড্রুজ, জন
অ্যাপউলেইয়ুস ২০৯
অ্যাবসার্ড নাটক ২০৭
'অ্যারাবিয়ান নাইটস্' ১৬৬
অ্যালবার্ট স্কুল অব আর্টস্ ৩২৩
'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' ২৪৬, ২৫৫
'আইন' ৯৮
আকবর ৬৮
আক্রাম খাঁ ২৯৭-৯৮
আখতার হুসেন ২৬৬
'আখ্যানমঞ্জরী' ২৪০, ২৫৩, ৩৫৪
'আগডুমবাগডুম' ২৫৮
'আগাথি ডাকলিং, দি' ২৫৩
'আগস্ট বিপ্লব' ২১৮
'আঙ্কল টম্স্ কেবিন' ২৫৮
'আচার্যের উপদেশ' ২৩৭
'আজব বই' ২৫৯
আড়পুলি ছাপাখানা ১৪৭
'আত্মচরিত' ২৩৭
'আত্মপ্রকাশ' ২১৯
'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ২১৮
'আধুনিক বাংলা কবিতা' ২৯৮
আধুনিক মুদ্রণ পদ্ধতি ১২০
'আনন্দবাজার পত্রিকা' ১০২, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮১, ৪০৮; প্রথম লাইনোটাইপ ব্যবহার ৮৯, ২৯৯; শারদীয়া সংখ্যা ২১১; প্রথম প্রকাশ ২৯৮; বৈচিত্র্য ৩৮২
'আনন্দমঠ' ২১০, ২১৫, ২১৮, ২২২, ৩২৭
'আনন্দমেলা' ২৬৭
আনন্দরাম ঢেকিয়াল ২৫
'আনন্দলহরী' ৩১৫, ৩৩৪
আন্তোনিও, দোম ২৩, ৯০
আপজন, এ ৯১, ৩০২
আপোলিনেয়ার ১৮৮
আবদুল হাই ১১২
আবদুল ওদুদ, কাজী ১৬০, ৩০৬
আবদুল করিম, সাহিত্য বিশারদ ২৩
আবদুল লতিফ ২৯৩
আবু সঈদ আইয়ুব ২৯৮
'আবোলতাবোল' ২৪৪, ২৪৬, ২৫৯
'আম আঁটির ভেঁপু' ৩৪৫
'আরণ্যক' ২১৫
'আরব্য উপন্যাস' ২৮০
'আরব্য রজনী' ১৫৭
'আরবীয়োপাখ্যান' ১৫৮
'আরো গল্প' ২৪৬, ২৫৯
আর্ট স্কুল ৩২০
আর্টিস্ট প্রেস ৩২৬
আর্নুন পিদ্রুসের স্কুল ১৬৫
'আর্যদর্শন' ২৩৫
'আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি' ৩২৩
'আর্লি ইণ্ডিয়ান ইম্প্রিণ্টস্' ৪৪৯
আলাওল ২৪
'আলালের ঘরের দুলাল' ২০১, ২১৬, ২৭১, ২৭২, ২৮৪, ৩২২, ৩২৩, ৪৪৩
'আলিভুলি দেশে' ২৫৯
'আলোর ফুলকি' ২৪২, ২৫৬
আশা গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৬
আশাপূর্ণা দেবী ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২৬০
আশুতোষ চৌধুরী ২৯০
আশুতোষ দেব ২৩৩, ৩৩৬, ৩৬১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২৬৩, ২৬৫
আশুতোষ লাইব্রেরী ২৫৩, ৩৬৩
'আশ্চর্য দ্বীপ' ১৬১
'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড' ২৪৯, ২৬১
আসসুম্পসাঁও, মানোএল দা ৪৫, ৯০, ৩০২, ৩৭৭
আসাম বুরুঞ্জি ২৫
'আসামী হাজির' ২১৫
আহসান হাবিব ২৬৬
ইউ. রায় এণ্ড সন্স ১০২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ৩২০
ইউ. সি. আঢ্য ৩৩৫
ইউনিয়ন ক্যাটালগ ৪৩৯
'ইউলিসিস' ২১৪
'ইংরাজী-করাসী-বাংলা অভিধান' ৩৩৭

'ইংরাজী-লাটিন-বাংলা অভিধান' ৩০৭
ইংরেজী-বাংলা অভিধান ৩০৫
'ইংরেজী-বাংলা আইনের অভিধান' ৩০৭
'ইংলিশম্যান' ১৩৭
'ইংলিস দর্পণ ব্যাকরণ' ২২
'ইঙ্গরাজি বাঙ্গালি বোকেবিলারি' ৯১, ৩০২
'ইচ্ছামতী' ২১০, ২১৬
ইডেন, অ্যাসলি ১০৯
ইণ্টারটাইপ ১১৫, ১১৭, ১২১, ১২৭, ৩৮৪
ইণ্ডিযা আপিস লাইব্রেরী ১৭১, বাংলা বইয়ের তালিকা ১৭২, ৪২৭, ৪৪৬, বাংলা বইয়ের সংগ্রহ ৪২৪, ৪২৭
'ইণ্ডিযা গেজেট' ৭৫, ১৩১
ইণ্ডিযান আর্ট কটেজ ৩২৮
ইণ্ডিযান অ্যাসোসিযেশন ১৪০
'ইণ্ডিযান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি' ৪৪৮
ইণ্ডিযান পাবলিশিং হাউস ৩৬২
ইণ্ডিযান প্রেস ২৯৩, ৩২৮
রবীন্দ্ররচনা প্রকাশ ৩৬০
'ইতিকথার পরের কথা' ২২২
'ইতিহাস সমুচ্চয' ১৭১
'ইতিহাসমালা' ১৭১, ২৪০, ২৫২, ২৫৩
'ইনগোল্ডসবি লিজেণ্ডস্, দি' ২৫৬
'ইনডেক্স ট্র্যানস্লেসানাম' ৪৪৯
'ইন্দিরা' ২১৫
ইন্দিরা দেবী ২৫৮
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ২১৭, ২৬৫
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ২৮৯, ২৯০
ইবসেন ১৫৯
ইম্পিরিযেল লাইব্রেরী ৪০৮
ইম্পে, ইলাইজা ৩৪, ৩৯, ৪১, ১৩০
'ইম্পেকোড' ৯১, ১৫৪
অনুবাদের পারিশ্রমিক ৩১
ইযং বেঙ্গল ১৪৭
ইযুগো, ভিক্তর ২১১, ২১৭
ইযেটস্, উইলিযাম ১৫৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭১ ১৭২, ৩০৭
'ইলিযাড, দি' ১৫৬, ১৬১-৬২, ২৫০
'ইল্যুমিনেটেড মিশাল' ১৬
ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি
দ্রঃ ঈস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী
'ইস্পাতের স্বাক্ষর' ২১২, ২১৬
'ঈনিড' ১৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ২৩৩, ২৮৬, ৩৫৬, ৩৮২
ঈশ্বরচন্দ্র বসু ২০১, ২৭২, ৩৫৩, ৪৪৫
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৪৬-৪৭, ১৫৭, ১৭০, ১৭২, ১৭৪-৭৫, ২৪০, ২৪১, ৩৪২, ২৪৮, ২৫২, ২৫৩, ২৮৩, ৩২৬-২৮,৩৩০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৪০৯, ৪৪৩; মুদ্রণে দান ১০০, ১০১, ১০৯; মারজেকের প্রস্তাব ১০০, ১০৯; পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতা ১০১, ১৭০; অনুবাদক ১৫৮; বর্ণমালা সংস্কার ১৭৫; রচনাবলী ২৩১; পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটির সভ্যপদ প্রত্যাখ্যান ৩৫৪; সংস্কৃত প্রেস স্থাপন ৩৫৪
'ঈশ্বর পাটনী' ২৯০
ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা ৩২৮
'ঈসপ্স ফেবল্স' ৩২০, ৩৩৫
'ঈসপের গল্প' ১১২, ১৫৬, ২৫২, ২৫৩
ঈস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানী ১৮, ২৯, ৩৪, ৩৭, ৫০, ৮৮, ৩০৪, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৪, ৪০২, ৪২৪
উইলকিনস, চার্লস ১৯, ৩২, ৪৭, ৫৩, ৫৫, ৬০, ৬৭, ৯১, ১১৫, ১২২, ১২৯, ১৩০, ১৭৮, ২৭৪, ৩০২, ৩৬৭, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৯৪, ৪০৮, ৪২৬, গীতার অনুবাদ ৩১, ৩৭, মুদ্রক ৪৭, ৯০, ভাষা শিক্ষা ৫০, হল-হেডের সঙ্গে বন্ধুত্ব ৫০, ৫২, উৎকীর্ণলিপি পাঠের সূত্রপাত ৫০, রচনাবলী ৫০-৫১, প্রযুক্তি কৌশল ৫১-৫২, কৃতিত্ব সম্বন্ধে হলহেড ৫২, ভারতের গুটেনবার্গ ৫৬, সরকারী ছাপাখানার প্রস্তাব ৫৬-৫৭
উইলসন, হোরেস হেম্যান ১৪৭, ৩০৭, ৪০২
উডনি, জর্জ ৬১, ৬৭, ৯৩
উড্রফ (বিচারপতি) ২৯০
উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি ৪৪২
গ্রন্থ সংগ্রহ ৪৩৫, ৪৩৬
'উত্তরা' ২৯৬
'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' ২৩৬
উদয-অস্ত' ২২২
উদযচাঁদ সামন্ত ৩২৬
'উদ্ভিদ বিচার' ৩২৬
'উপকথা' ২৫৮
'উপদেশ কথা' ১৬৭, ১৭৯
'উপনিবেশ' ২১২
উপন্যাসে জীবন প্রত্যয ২২৩-২২৪
উপন্যাসের আদ্যাশক্তি ২২২
উপেন ঘোষদস্তিদার ৩৪৩
উপেন মল্লিক ২৫০
উপেন্দ্রকিশোর রাযচৌধুরী ১০২, ২৪৪-২৪৯, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৬, ২৯৩, রচনাবলী ২৪২, প্রাবন্ধিক ২৪৩, শিশুসাহিত্যের ভাষা ২৫৯, প্রসেস ব্লকের পথিকৃৎ ৩২৯, ৩৯৫, গ্রন্থচিত্রণে ৩৩৭
উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায ৩১১
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায ২৯৫, ২৯৬
উপেন্দ্রনাথ দাস ২০৫
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৫৪, ২৬২
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ২৯৪, ৩৬১
উমাচরণ মিত্র ১৫৮
উমেশচন্দ্র দত্ত ২৮৮
উমেশচন্দ্র মিত্র ২৭৪
উলফ, ভার্জিনিযা ২২২
'একক দশক শতক' ২১২, ২১৮
'একদা' ২১৮
'এক নম্বর পাঁচালী' ২৭৮
'একা' ২১১
'একেই কি বলে সভ্যতা?' ২৭৮, ৩৫৬
'একোত্তরশতী' ২৪
'এখনই' ২১৯
এডমনস্টোন ৬৮, ৯১
'এডুকেশন গেজেট' ২৩২

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ২৫০, ২৫৮, ২৬২
এন্ড্রুজ, জন ৮৮, ৯০; ছাপাখানা ৩৫১, ৩৭৮, ৪০০, ৪০৮
এনগ্রেভিং ১৬, ৮৬, ৩১৩
'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস' ১৫৮
'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ৫২, ১৫৫, ৩০১, ৩০৮
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স ৩৬৩
'এরাউন্ড দি ওয়ার্লড' ১৬২
এলিয়ট, জর্জ ২১০
এলিয়ট, টমাস স্টার্ন ১৯২
'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' দ্রঃ অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড
এস. কে. লাহিড়ী কোং ১০১, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৯
এ. সি. আঢ্য ৩৬১
'এশিয়াটিক জার্নাল' ২৮৫
'এসিয়াটিক রিসার্চেস' ৫১, ৭৮, ৩২১, ৩৯৪ প্রথম খোদাই চিত্রের নিদর্শন ৩১৩
এসিয়াটিক লিথোগ্রাফিক প্রেস ৩২১
এসিয়াটিক সোসাইটি ২৩, ৩১, ৫১, ৩১৩, ৪৩২; বাংলা বইয়ের সংগ্রহ ৪৩৪; বাংলা বইয়ের তালিকা ৪৪৭
'অ্যাডভেঞ্চারস্ অব নিলস' ১৬১, ২৫৬
এ্যান্ডারসন, হান্স দ্রঃ অ্যান্ডারসন, হান্স
'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ২৭৪
'ওডিসিয়ুস' ১৬১, ২৫৮
'ওফাত-ই-রসুল' ২৩
ও'ম্যালি ২৪
ওয়াং চিয়েহ ১৩
'ওয়াকিয়াহনবীস' ৭৪
'ওয়াটার বেবিজ' ১৬২
'ওয়ার অ্যান্ড পীস' ২১১
ওয়ার্ড, উইলিয়ম ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৮২, ১১৬, ৪০১
ওয়ার্ডসওয়র্থ ২২০
ওয়েঙ্গার ১৭০ : ক্যাটালগ ৪৪৫
ওয়েলেসলি ৬৯, ১০০, ১০১
'ওয়েস্টওয়ার্ড হো' ১৬২
ওয়েস্ট বেঙ্গল মাস্টার প্রিন্টার্স অ্যাসোসিয়েশান ৪০৮
'ওরা কাজ করে' ২১৬
'ওরিয়েন্ট পার্লস্, দি' ২৫৫
'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' ১৭০
'ওল্ড কিউরিওসিটি শপ' ১৬২
'কংসবণিক পত্রিকা' ২৯৮
'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ২১২
কণা বসুমিশ্র ২৬০
'কত অজানারে' ২১৮
'কথা ও কাহিনী' ২৫৪
'কথামঞ্জরী' ১৬৯
'কথামালা' ১৭৪, ২৪০, ২৫৩
'কথোপকথন' ৬৯, ৭৮, ১৭০, ২৫২
'কনক্লুসোরেল এ উত্তরাস কয়সাস' ১৪
কপার প্লেট এনগ্রেভিং ৩৩৪
'কপালকুণ্ডলা' ২১০, ২১৫
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দ্রঃ মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ
'কবিকাহিনী' ৩৫৭
'কবিতা পত্রিকা' ২৯৮
'কবিতাকারের প্রত্যুত্তর' ২৭০, ২৭১
কমপিউটার; অক্ষর যোজনা ৩৮৮-৮৯
কমল মজুমদার ৩৪৯
কমলালয় যন্ত্র ২৭০
কমলাসন যন্ত্র ২৭০
কমার্শিয়াল আর্ট ৩৪৪; আর্টিস্ট ৩৩৩
'কমেডি অব এররস' ১৫৯
'কয়লাকুঠির দেশ' ২১৬
করবেট, জিম ৩৪৬
'করী, দি এলিফেন্ট' ১৬১
'করুণানিধান বিলাস' ৯৫
কর্ণওয়ালিস, লর্ড ১৩১
'কর্ণওয়ালিস কোড' ৯১, ১৫৪
'কর্ত্তাস' ৪০০
'কর্মকার হিতৈষী' ২৯৮
'কর্মফল' ২১১
কলকাতা দ্রঃ কলিকাতা
'কলকাতার কাছেই' ২১৫
কলিকাতা : ছাপাখানা ৫২; ইংরেজী শিক্ষার সূচনা ১৬৫-৬৮; বিদেশী রঙ্গালয় ১৯৭
কলিকাতা প্রেস ২৭১
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৩, ৪১, ১২০, ৩০৭, ৪৪৭; বানান সংস্কার ৮২; বানান সংস্কার সমিতি ১০৯-১০; সভাবৃন্দ ১২০; বানানের নিয়ম নির্ধারণ ১২০-২১
কলিকাতা মাদ্রাসা ৩১
কলিঙ্গা বাজার ৩৫৫
কলেজ স্ট্রীট : বই ব্যবসা শুরু ৩৬১
কলোদি, কার্লো ২৬৪
কলোফোন ১৬
'কল্লোল' পত্রিকা ১৫৯, ২৯৭; অনুবাদ প্রসঙ্গে ১৫৯; বিদেশী প্রভাব ২৯৭; পাবলিশিং হাউস ২৯৭; প্রকাশিত বই ২৯৭
কসাইটোলা ২৭১
কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল ৩৮, ৪২, ৪৩
'কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো' ১৬১
কাগজ : আবিষ্কার ১৩-১৪; প্রস্তুত প্রণালী ১৪-১৫, ৪০০-০১; যন্ত্রে ও হাতে তৈরি ১৪৪, ৪০১; দেশী ও বিদেশী ৪০১, ৪০২, ৪০৫; কল ৪০৩-০৪; উৎপাদন ৪০৫-০৬;
কাঙাল হরিনাথ ২৯৩
কাঠখোদাই ৫১-৫২, ৩১৩-৩১; অন্নদামঙ্গলের ছবি ৩১৩-১৪; অবলুপ্তির কারণ ৩২৮-২৯
কাঠের তৈরি মুদ্রাযন্ত্র ১৫৫
কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৪
কান্তিক প্রেস ২৯৫
কান্তিচন্দ্র ঘোষ ১৫৯, ২৯৬
'কামা ঘাম রক্ত' ২১৮
'কাজি দাস' ১৫৭
'কাব্য পরিক্রমা' ২৯৭
'কাব্যগ্রন্থাবলী' ৩২৯, ৩৬০
কাব্যনাট্য ২০৯
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৫৮

কামাখ্যাচরণ ঘোষ ১৭২
'কামালপাশা' ১১১
কামিংস, ই. ই ১৮৮
কামিনীকুমার রায় ৩০৬
কামিনীসুন্দরী দেবী ১৭১
'কায়স্থ পত্রিকা' ২৯৮
কারপেনটার, মেরি ৩২৬, ৪৩৫
কারলাইল ২৮৩
কার্ক প্যাট্রিক, উইলিয়াম ৩৭৭
কার্ত্তিক দাশগুপ্ত ২৫৮
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ১৬৮
কালি দ্রঃ ছাপার কালি
'কালিকামঙ্গল' ৩৮, ৪৭
কালিদাস ৯১, ১৫৮
কালিদাস মৈত্র ৩২৯
কালিদাস রায় ২৪৫
'কালিন্দী' ২১০, ২১৬
কালিপদ পাঠক ১৭৯
কালীকুমার রায়ঃ হস্তলিপি শিক্ষক ৭৫; লেখা অনুসরণে হরফ ৯৭, ৪৮৩
কালীদাস পাল ৩২৬
কালীপদ বিশ্বাস ৩১০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২৩৫
কালীপ্রসন্ন দাশ ২৫৪
কালীপ্রসন্ন সিংহ ২০৩, ২৮৭, ৩১৬, ৩৫৬
কালীময় ঘটক ২৫৩
'কালীয়দমন' ১৯৭, ১৯৮, ২০০, ২০১
'কালীর সহস্র নাম' ১৪৭
'কালোদ্রমব' ২৬১
'কাল্পনিক সংবদল' ২০০
'কাশীখণ্ড' ২৭৪; যন্ত্র ২৭৪
কাশীটোলা দ্রঃ কসাইটোলা
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২২৯
কাশীনাথ মিস্ত্রি ৩১৪
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৩৭
কাশীরাম দাস ২২, ৩৮, ৪৭, ৭২, ৯০
'কিং কঙ' ১৬১
'কিং সলোমনস্ মাইনস্' ১৬২
কিং, স্যর জর্জ ৩২৭
কিংসেলি, চার্লস ১৬২, ২৬৪
'কিনু গোয়ালার গলি' ২১০
'কিমিয়া বিদ্যার সার' ১৫৬
কির্থে, আতানাসিউস ৮৯
কীটস্, জন ২২০
কীথ ৪৬, ১৭০; বাংলা ব্যাকরণ ১৬৮
'কীর্তিবিলাস' ২০২, ২০৪
কুজ্যা, ভিক্তর ১৫৯
কুন্তলীন প্রেস ২৯৩
কুপার, জেমস ফ্যানিমোর ১৬২
কুমুদনাথ চৌধুরী ২৬২
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৪৪
কুম্ব, জর্জ ২৩০
কুলদারঞ্জন রায় ১৬১, ২৪২, ২৪৪, ২৫৮
'কুলীনকুলসর্বস্ব' ২০৩
'কুসুমাবলী' ১৭২
কৃত্তিবাস ৩৮, ৪৭, ৭১, ৯০, ২৭০; রামায়ণ ৭১, ২৭৩
'কৃপার-শাস্ত্রের অর্থভেদ' ৯০, ১১২; রোমান অক্ষরে প্রথম বাংলা বই ১১২
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৫৮, ২৭১, ২৯১
'কৃষ্ণকান্তের উইল' ২১৫, ৩৫৬
কৃষ্ণকুমার মিত্র ২৮৯
'কৃষ্ণকুমারী নাটক' ২৭৮, ৩৫৬
কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ২০, ৮৪-৮৭, ১০২, ১১২, ২৭৪, ৩১৮, ৩৯৪
কৃষ্ণচরণ পাল ৩২৪
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২৩
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ২৯০
কৃষ্ণভাবিনী দাসী ২৯৩
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮, ১৭০-৭১, ২৩৬
কৃষ্ণহরি দাস ৩২৭
কে. ভি. সেন ৩২৯-৩০
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৯, ২৯৬
কেদারনাথ মজুমদার ৭৩
কেরী, উইলিয়াম ৪৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৮১-৮৩, ৮৯, ৯৩, ১৭০, ২৫২-৫৩, ২৭৪, ৩০২-০৩, ৩০৫, ৩৭৩, ৪০১, ৪০৮, ৪২৩; শ্রীরামপুর প্রেস ১১; নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ ৬১, ৬৯, ৭১, ১৫৫; উডনির কাঠের প্রেস ৬১; মদনাবাটী ত্যাগ ৬২; বহুভাষিক শব্দ-কোষ ৬৪; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে অবসর ৬৫; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান ৬৯; পাঠ্যপুস্তক রচনা ৬৯; বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান ও পুস্তক রচনা ৭৪, ৭৮, ১৪৭, ১৭০, ৩০২-০৪; কেরীর মৃত্যু ৯৯; দি গুড ওল্ড ডেজ ৩৭৭; কাগজের কল স্থাপন ৪০৩
কেরী, ফেলিক্স ৬২, ৯৭-৯৮, ১৫৫, ১৬৭, ১৭০, ২৮৩, ৩০৪, ৩০৮, ৩৫৫
'কেরী সাহেবের মুন্সী' ২১২, ২১৬
কেশবচন্দ্র সেন ২৩৭, ২৬৬, ২৮৮-৮৯
'কোড অব জেণ্টু লজ' ১৯, ৯০; বাংলা হরফের নমুনা ৪৯
কোম্পানীর ছাপাখানা ৫৬, ৯০-৯১; হিকির গেজেট, বাংলা মুদ্রণের ব্যবস্থা, পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, আইনের বই, কর্ণওয়ালিস কোড প্রভৃতি বইপত্র ছাপা ৯১
ক্যাকসটন, উইলিয়াম ১৭, ৮১
ক্যানিং লাইব্রেরী ৩৬১
ক্যারল, লুইস ২৫৪, ২৫৮, ২৫৯
ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও ৩২৩-২৫
'ক্যালকাটা ক্রণিকল' ৯১
ক্যালকাটা খ্রীশ্চিয়ান ট্রাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি ১৬৯
'ক্যালকাটা গেজেট' ১০৫, ১২২, ১২৪, ১৩১, ১৯৯; বাংলা হরফের নমুনা ৯১; হলহেডের বাংলা ব্যাকরণে বাংলা টাইপ ব্যবহারের সংবাদ প্রকাশ ৩৫১
'ক্যালকাটা জার্নাল' ৭৫, ১৩৬, ৩২০
ক্যালকাটা থিয়েটার ১৯৯
'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি' ১৪৮, ৪০২-০৩, ৪০৮; বাংলা তালিকা ৪৪৭
'ক্যালকাটা রিভিউ' ৩৮, ৩৯, ৪৩

ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ১৫৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ২৮৩, ৩১৪, ৩১৮, ৪৪১; পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ৯৬, ১৬৬-৬৮; প্রকাশিত বইয়ের নাম ৯৭; বার্ষিক রিপোর্ট ১১০; প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী ১৬৬-৬৭, ৩৫৩; নিজস্ব ছাপাখানা ২৭৭; দিগ্‌দর্শন ২৮৩; বাঙালী চিত্রকরের ছবি প্রকাশ ৩৩৪; বইয়ের দোকান ৩৫২, ৩৫৫; গ্রন্থাগার ৪৩২
ক্রনিকল প্রেস ৩০২; হরফ ঢালাই কারখানা, প্রথম বাংলা অভিধান ছাপা ৯১
'ক্রন্দসী' ২৯৮
ক্রমওয়েল, অলিভার ৩৪
'ক্রিস্টাল গবলেট' ৩১০
'ক্রোম ইয়েলো' ১৫৯
ক্রোমোলিথো পদ্ধতি ৩২৮, ৩২৯
ক্লাইভ, রবার্ট ৩৬৯
'ক্ষণিকা' ১৮৩, ৩৬০
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ১৬২, ২৬৪
'ক্ষীরের পুতুল' ২৫৫, ২৫৬, ৩২৮
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ২০৬
'ক্ষেত্রতত্ত্ব' ১৬৮
'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ' ১৫৬
ক্ষেমানন্দ ২৩, ২৪, ৪৭; মনসামঙ্গল ৪৭
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১৬২, ২৪১, ২৪৬, ২৬২, ৪৪৯
'খাই খাই' ২৪৬, ২৫৯, ৩৪৬
'খাতাঞ্চির খাতা' ২৫৬
'খাপছাড়া' ২৫৪-৫৫
'খুকুমণির ছড়া' ২৪৩, ২৪৭, ২৫৬
'খেলাঘর' ১৫৯, ২৬৮
'খোকাখুকু' ২৬৬
'খোকার দপ্তর' ২৫৯
খোদাই শিল্প ৮৬; ভারতবর্ষ ৩১৪-১৫
খ্রীশ্চিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি ১৬৯
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯১, ৩২৯, ৩৩৯;
'গঙ্গা' ২১৬
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ২৪, ৯৫, ১৪৭, ১৭৮, ৩৬৩; বহড়ায় প্রেস স্থানান্তরিত ৯৯; অন্নদামঙ্গল প্রকাশ ৩১৩, ৩৩৩; সাংবাদিকতা ৩১৩; বই-এর ব্যবসা ৩৫২, ৩৫৫; ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ৩৫২-৫৩
গঙ্গাচরণ সরকার ২৯১, ২৮৯
'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ৯৯, ৩১৫, ৩৩৪, ৩৫৩
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ২১৫
'গড্ডলিকা' ৩৪০
'গড়শ্রীখণ্ড' ২১২, ২১৬
'গণদেবতা' ২১২, ২১৬
'গণবাণী' ২৯৮
গদ্যছন্দ ১৮১
গদ্যের বিকাশ ২২৭
গনসালভেস ১৮
গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল ৩২৩
গভর্নমেণ্ট গেজেট ১৫৬
গভর্নমেণ্ট গেজেট প্রেস ২৭৮
গভর্নমেণ্ট প্রেস ১২২
গভর্নমেণ্ট লিথোগ্রাফিক প্রেস ৩৯৪
গলসোয়ার্দি ২১১
'গল্পস্বল্প' ২৫৪-৫৫
'গল্পের বই' ২৫৯
গান্ধীজী ৩০৯
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ২৯৫
গিরিধারী কুণ্ডু ২৬৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৫৯, ২০৫-০৬, ২৯৫
গিরিশচন্দ্র বসু ১৫৬
গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ১৬৭
গিরীন্দ্রকুমার দত্ত ২৯২, ৩২২-২৩
গিরীন্দ্রশেখর বসু ২৬৪
গিলক্রাইস্ট, জন ৯৫, ১১২, ১৫৬, ১৭০, ১৭১; হিন্দুস্থানী প্রেস ৭০
'গীতরত্ন' ১৯২
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০
'গীতাপাঠ' ২৩৭
'গীতালি' ৩৬৩
গুজরাটি ছাপাখানা ১৮
গুটেনবার্গ, জোহান ৮৮, ৯০, ১৪২, ১৪৪; বাইবেল প্রকাশ ১৫, ৭১
'গুটেনবার্গ ম্যান' ১৪২-৪৩, ১৪৮
গুণময় মান্না ২১৬
'গুপ্তকথা' ২৮১
গুপ্তপ্রেস ৩০৫
'গুরুদক্ষিণা' ২৫৩
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০৬, ২৯৫, ৩৫৬-৫৮, ৩৬০; প্রকাশনা ২৯৫; 'সঞ্জীবনী সুধা'র প্রকাশক ৩৫৬-৫৭; শরৎচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্ব ৩৬০; বটতলার বই সম্পর্কে ৩৬০; বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স ৩৬১
'গুলেবকাউলি' ১০২
গুস্তাভাস, তৃতীয় ৩৬৯-৭০
'গে-নেক' ১৬১
'গেজেট অব ইণ্ডিয়া' ১২২
গৈরিশছন্দ ১৮০
গোকুল নাগ ১৫৯, ২৯৭
গোপাল উড়ে ২০১
গোপাল ভাঁড় ২৪৮
'গোপাল ভাঁড়ের গল্প' ২৫০
গোপাল হালদার ২১৮, ২২২
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৮৬
গোপীনাথ কবিরাজ ২৯৬
গোবর্ধন ভট্টাচার্য ৩১৮
গোবিন্দ অধিকারী ২০১
গোবিন্দ দাস ৪৭
গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৭
গোয়ায় ছাপা বই ১৮
গোয়ায় মুদ্রাযন্ত্র ৩৭৭
গোয়েন্দা কাহিনী ২৮১
'গোরা' ২১১, ২১৫, ২১৮, ২২২
গোর্কি ১৬২, ২১০
গোলকনাথ দাস ১৯৯
গোলকনাথ শর্মা ১৫৬, ২৫৩
'গোলেবকাওলি' ১৫৮, ২০৯
গোলোকেন্দু ঘোষ ২৬৪

গোল্ডস্মিথ ১৫৫
'গোল্ডেন অ্যাস, দি' ২০৯
'গোল্ডেন গল্প মালা' ২৫৬
'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' ৩১০
'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন' ৩১০
'গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ' ৩১০
'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ২৭৭
গৌড়ীয় যন্ত্র ২৭০
গৌড়ীয় সমাজ ১৫৭
গৌরকিশোর ঘোষ ২১৯, ২৬৩
গৌরী ধর্মপাল ২৫০
'গৌরীবিলাস' ৩১৫, ৩৩৪
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ১৫৮, ১৭০, ২১২, ২১৬, ২৮৬
'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' ২৬১
গ্যারিক, ডেভিড ৩৭
গ্যেটে ১৬০
গ্রন্থ চিত্রণ ৩৩২-৫০; ইতিহাস ৩২৯
গ্রন্থতালিকা; বাংলা বই, তামিল বই ৪৪১; লং সংকলিত ৪৪১-৪২
গ্রন্থসজ্জা ৩৩১
গ্রন্থাগার ৪৩২; বই সংরক্ষণ সমস্যা ৪৩৩
গ্রাফিক ডিজাইনার ৩৩৩
গ্রাভিওর ৪০৯
'গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ, এ' ১৯, ৩৮, ৪৫, ৫২, ৮৮, ৩৩২, ৩৭৪, ৩৭৭
'গ্রামে চলো' ২১৮
গ্রামোফোন রেকর্ডে কবিকণ্ঠ ৩১১
গ্রিফো, ফ্রানচেসকো ১৭
'গ্রিম্ ভ্রাতৃদ্বয়' ২৫৬, ২৫৮
'গ্রিমের গল্পসমগ্র' ২৫৮
গ্রীক হরফ ১০৯
গ্রীন, ডব্লু ফ্রিজ ৩৮৪
গ্রীয়ার্সন, জি. এ. ৩৭৮
'গ্রীসের ইতিহাস' ১৬৭
'গ্রেট এক্সপেকটেশনস্' ১৬২
'গ্রেট ক্লজ এ্যান্ড লিট্ল ক্লজ' ২৫৩
গ্র্যান্ট, কোলসওয়ার্দি ৩২১
গ্র্যাফিক আর্ট ৮৬, ৩১৪
গ্ল্যাডউইন, ফ্রান্সিস ১২২
'ঘুণপোকা' ২১৯
'ঘুম তাড়ানী ছড়া' ২৬০
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২৬, ৩২৮
চণ্ডীচরণ মুন্শি ১৫৬, ২৫০
চণ্ডীচরণ সেন ১৫৯
'চণ্ডীমঙ্গল' ১০৬
'চতুরঙ্গ' ২২০, ২৯৫
চন্দ্রনাথ বসু ১৭০, ২৩৬, ২৮৯
'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' ২০৯
'চন্দ্রশেখর-চিত্রে' ৩৩০
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ২৮৯, ৩৫৪-৫৫
চন্দ্রিকা যন্ত্র ১৪৭
চন্দ্রোদয় প্রেস ৮৪-৮৭, ১০২, ২৭০, ২৭৪, ৩১৮, ৩৩৩
'চরকাসেম' ২১৬
'চরিতাবলী' ২৪০
'চরিতাভিধান' ৩১১
'চরিত্রহীন' ২১৮
'চর্যাপদ' ১৮০
'চর্যাপদ গীতি' ১৭৭
চাইল্ডন ৪৮০
'চাঁদের পাহাড়' ২৫৩
'চায়না ইলাস্ট্রেটা' ৮৯; বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি ৮৯
'চার অধ্যায়' ২১৮
'চার ইয়ারী কথা' ২১৭
'চারিত্রপূজা' ৩২৬
চারু রায় ৩৪৩
চারুচন্দ্র গুহ ৩১৫
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৭, ৩৬৩
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ১২০, ২৬৪
'চারুপাঠ' ১৭৫, ২৩০
'চারুমুখ চিত্তহরা নাটক' ১৫৮
চার্ণক, জোব ২১৯
'চাহারে দরবেশ' ১৫৮, ২০৯
'চিকিৎসার্ণব' ৩৫৩
চিত্তরঞ্জন দাশ ২৯৫
চিত্তরঞ্জন দেব ৩১১
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪, ১১০
'চিত্রগ্রীব' ১৬১
'চিত্রপুস্তক' ৪৫০
'চিত্রবিজ্ঞান' ৩২৩
'চিত্রাঙ্গদা' ১৮০, ৩২৮, ৩৩৯, ৩৬০
'চিন্তামণি' ২৩৭
চিন্তামণি ঘোষ ২৯৩, ৩২৮, ৩৬৩; রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ৩৬৩
'চিরঞ্জীব বনৌষধি' ৩১০
'চীনা রূপকথা' ২৫৮
চুঁচুড়া ১৭০ : বুধোদয় প্রেস ২৭৪; স্কুল প্রেস ৯৭
চেম্বার্স, উইলিয়াম ৩৮, ৪৮
'চৈতন্যচরিতামৃত' ৩৫৫
'চৈতন্যভাগবত' ৩৫৫
চৈতন্য লাইব্রেরি ৪৪৭
'চোরকাঁটা' ২১৭
চৌরঙ্গী থিয়েটার ২০১
'ছন্দবোধ শব্দসাগর' ৩১০
ছন্দ সাহিত্যের পঞ্জী ৪৪৯
'ছবি ও গল্প' ২৪৪
ছাপার কালি, প্রকার ভেদ ৪০৬; কালি তৈরির উপাদান ৪০৬-০৭
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ২৯, ৩০
'ছেলেদের মহাভারত' ২৫৮
'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ' ২৫৪
'ছেলেদের রামায়ণ' ২৪৩, ২৫৮
'ছেলেবেলা' ২৫৫
'ছোট কৈলাশ এবং বড় কৈলাশ' ২৫৩
'ছোটদের পুরাণের গল্প' ২৫৮
'ছোটদের মহাভারত' ২৫৮
'ছোটদের রামায়ণ' ২৫৮
'ছোট্ট রামায়ণ' ২৪৩

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৩৮
জগদানন্দ রায় ২৪৪, ২৬৪
জগদীশ গুপ্ত ২৯৬
'জগদীশচরিত্র বিজয়' : পুথির আকারে ছাপা ২৭০, ৩৩৪, ৩৫৩
জগমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৪৯
'জঙ্গম' ২৯২
'জনবুল' ১৩৭
জনসন, এস. ৭৪, ১৫৭; অভিধান ৩০৬
'জন্মভূমি' ২৯১, ৩২৭
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪৪৩; বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠা ১৫৭; উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ৪৩৫;
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ৮১; বানান সংস্কার ৮১-৮২
জয়নারায়ণ ঘোষাল ৯৫, ২৭৪
'জয়বাবা ফেলুনাথ' ২৬১
জয়েস, জেমস্ ২১৪
জর্জ, তৃতীয় ৩৯
'জল জঙ্গল' ২১৬
জলধর সেন ২৯৫
'জলপরী' ১৬২
জসীমউদ্দীন ২৫৯
'জাঁ ক্রিস্তফ' ২১১, ২১৭
'জাগরী' ২১৮, ২২০
'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী'; বাংলা বিভাগ ৪৪৮
জাতীয় গ্রন্থাগার ৪২৪, ৪৩৭-৩৮; বই সংগ্রহ, ইতিহাস ৪৩৮-৩৯; আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ ৪৩৯; সাময়িকপত্র সংগ্রহ ৪৩৯; বাংলা বইয়ের তালিকা ৪৪৬-৪৭
'জানোয়ারের কাণ্ড' ২৪৮
'জাপানী ফানুস' ২৫৮
'জার্নি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ' ১৬২, ২৬২
'জাল প্রতাপচাঁদ' ৩৫৭
জি. পি. রায় এন্ড কোং যন্ত্র ২৭২
জিয়েগেনবালগ, বারথোলোমিউ ১৯
'জীব অভিধান' ৩১০
'জীবতত্ত্ব' ১৬৭
'জীবনস্মৃতি' ২৫৫, ৩২৯
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯-৯০, ২৯৮, ৩৪৬
'জীবনী অভিধান' ৩১১
'জীবনীকোষ' ৩১১
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ২৯৫
'জেন্টুলজ' ৩৮, ৪৩, ৩৭১; সহায়ক পণ্ডিতদের নাম ৩২; বাংলা অক্ষরের নমুনা ৪৭
জেনসন, নিকোলাস ১৭
জেবউন্নিসা আহমদ ২৬৮
জেসুইট ধর্মযাজক ৯০
জোনস, উইলিয়াম ১৯, ৩১, ৩৪-৩৫, ৩৭, ৪৩, ৪৭-৪৮, ৫১; ভাষা শিক্ষা ৪২; সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ভাষার সাদৃশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ৪৫, ৪৭; ভাষাচর্চা ৪৭; উইলকিনসের নিকট ঋণ ৫০; এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ৫১
জোয়াদ আলি ১৭০
জোলা, এমিল ২১৭
জ্যাকসন, জোসেফ ৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৭
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৯, ২০৫, ২১১, ২৭৪, ২৯৫, ৩২৭-২৯
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২১২
'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' ১৫৬
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ২৪২, ২৪৯, ২৬৫-৬৬
'জ্ঞানভারতী' ৩০৯
জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র ২৭০
'জ্ঞানাঙ্কুর' ১০৬
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' ২৮৯; লেখক গোষ্ঠী ২৮৯,
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১১০, ৩০৬, ৩২৮, ৩৬৩
'জ্ঞানোদয়' ২৪০
'ঝর্ণা' ২৫৯
'ঝালাপালা' ২৪৭
'ঝাঁসির রানী' ১৫৯
'ঝুমঝুমি' ২৫৮
'টমকাকার কুটির' ১৫৯
টমাস, জন ৬০, ৯৩; বাইবেল অনুবাদ ১৫৫
টলস্টয়, ২১০-১১, ১৬২
টাইমস রোমান ১৭
'টাকডুমা ডুম ডুম' ২৪২
'টিউটর, দ্য' ৯১
টিপু সুলতান ৩৭০
'টীকাসর্বস্ব' ৩০১
'টুকটুকে রামায়ণ' ২৫৮
'টুনটুনির বই' ২৪৩, ২৫১; ছবি ৩৩৭
'টেন লিটল নিগ্যার বয়েজ' ২৫৭
টেম্পল, অ্যালবার্ট ৩২৩
'টেম্পেস্ট' ১৫৬
টেরেসা, মারিয়া ৩৬৯
'টেল অব টু সিটিজ' ১৬২
'টেলস অব প্যারট' ১৬৬
'টেলিগ্রাফ' ২৯০
'ট্যালিসম্যান' ১৬১, ২৫৮
ট্র্যাংকোবর দ্রঃ ত্র্যাংকুবার
'ট্রিস্ট্রাম শ্যানডি' ২১৪
'ট্রেজার আইল্যান্ড' ১৬২
'ঠগী কাহিনী' ২০৯
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ২৩৬
'ঠাকুরমার ঝুলি' ২৪২, ২৪৮, ২৫৫, ২৫৭-৫৮, ৩২৭, ৩৩৭
'ঠানদিদির থলে' ২৫৭
'ডন কুইকজোট' ১৬১, ২৫৮, ২৬৪
'ডন কুস্তি' ১৬১
'ডলস্ হাউস' ১৫৯
ডস্টইয়েভ্স্কি ২১০, ২১৯
ডসপ্যাসোস, জন ২১১
'ডাক্তারী অভিধান' ৩১০
ডানকান, জোনাথান ৪৮, ৬৮, ৯১, ১৫৪
ডাফ, আলেকজান্ডার ২৮৫
ডালহৌসি, লর্ড ২৮৭
'ডালিমগাছের মৌ' ২৬০
ডিস্অয়লি, স্যার চার্লস ৩২১
ডি. ই. রডরিকস্ প্রিন্টিং এ্যান্ড লিথোগ্রাফিক প্রেস ২৭৪

ডি-এন-বি ৪৩
ডিকিনসন, জন ৪০২
ডিকেন্স, চার্লস ১৬২, ২১০,২১৭, ২৬৫
'ডিপ্লোম্যাট' ২১৮
'ডি রোজারিও কোম্পানী' ৪৪২
ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান ১৩৭, ১৪৬, ১৬৫, ২৭১
'ডিসগাইস, দি' ১৯৯-২০০
ডুরার, এ্যালব্রেকট ১৬
ডেলিভারি অব বুকস্ অ্যাক্ট ৪০৮, ৪৪৭
ড্যানিয়েল, টমাস ৫৩
'ড্রাগনের নিঃশ্বাস' ২৫০
ড্রামন্ড সাহেবের স্কুল ১৬৪
ঢাকা ৪২, ১৭০; বাঙ্গালাযন্ত্র ২০৪
'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ২১৬
'তত্ত্বকৌমুদী' ২৮৯
'তত্ত্ববিদ্যা' ২৩৭, ২৭১
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ২৩৭, ২৮৫-৮৭; লেখক-গোষ্ঠী ২২৯
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, পাঠ্যপুস্তক ১৭১
তত্ত্ববোধিনী সভা ১৫৭, ১৭১
'তত্ত্বাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' ২১৬
তমোহর প্রেস ২৭৪, ৩২০
'তাই তাই' ২৫৮
তামিল বই; প্রথম ছাপা ১৮-১৯
তামিল হরফ ৩৭৭
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৯, ৩৬১
তারাচরণ শীকদার ২০২
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ৩০২
তারাচাঁদ দত্ত ১৬৭, ২৮৪
তারাপদ মুখোপাধ্যায় ৪১, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ১০৬
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২১২, ২১৫-১৬, ২৬২
তারিণীচরণ মিত্র ১১২, ১৫৬, ১৭০, ২৫২-৫৩
'তিতাস একটি নদীর নাম' ২১৬
তিনকড়ি চক্রবর্তী ২৫৮
'তিন্তিড়ী' ২৫০
'তিলি সমাজ পত্রিকা' ২৯৮
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ১৮০, ২৭৪, ৩২৩, ৩৫৬
তুং হুয়াং গুহা ১৩
'তৃণভূমি' ২১৬
'তোতা ইতিহাস' ১৫৬, ২৫৩
ট্রাংকোবারে মুদ্রণ ৩৭৭
ত্রৈলোক্য দেব ৩২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৩০৮, ৩৯৪
থ্যাকার ৩৫১, ৩৫৬
থ্যাকারে ২১১
'থ্রী মাস্কেটীয়ার্স' ১৬২
'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' ২৪৬
দক্ষিণারঞ্জন বসু ২৬২
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ২৪২, ২৪৮, ২৫৭-৫৮, ২৬৬, ৩২৭, ৩৩৭
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ২৮৬-৮৭
দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ ৪৪৯
'দশমহাবিদ্যা' ৩২৬
'দাতাকর্ণ' ২৫৩
'দাদামশায়ের ঝুলি' ২৫৭
'দাদামশায়ের থলে' ২৫৭
'দানলীলা' ২০১
দামোদর মুখোপাধ্যায় ২৮৯
'দায়ভাগ' ৩৫৩
দাশরথি রায় ১৭৭, ১৭৮, ১৯১, ২৭৮
'দিগদর্শন' ৭৪, ৯৮, ২৪০, ২৬৬, ২৮৩
দিগম্বর মিত্র ৩৫৬
দিননাথ দাস ৩২০
দিনময়ী দেবী ৩২৬
দিব্যেন্দু পালিত ২১১
দিলীপ গুহ ৩৬৩
দিলীপকুমার রায় ২১৬
দীনবন্ধু মিত্র ২০৩-০৪, ২৫৩, ২৮৬, ৩৬০, ৪০৯
দীনেন্দ্রকুমার রায় ১৫৯, ২৬২
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩১০
দীনেশচন্দ্র সেন ৩২৮, ৪৪২
দীনেশরঞ্জন দাশ ২৯৬-৯৭
দীপঙ্কর সেন ১০৮, ১১৯
'দুইবোন' ২১১
দুনে, উইলিয়াম ১৩১
দুপ্রে, জঁ্য ১৪৪
দুমা, আলেকজাণ্ডার ১৬১-৬২
দুর্গাচরণ গুপ্ত ৩০৫
'দুর্গেশনন্দিনী' ২৪, ২১৫; রোমান হরফে ১১২; ছাপার ইতিহাস ৩৫৬
'দেওয়াল' ২১২
'দেড়শো খোকার কাণ্ড' ২৬১
দেবপ্রসাদ ঘোষ ১০৯
দেবসাহিত্য কুটির ৩৬১
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৬৪
'দেবীযুদ্ধের ছবি ৩৩৬
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৭, ১৬৯-৭০, ২০১, ২৭৪, ২৮৬-৮৭
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৮৭
দেবেশ দাশ ২১৮
'দেশ' ৪১, ৪৩; রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা ২১১
'দেশ বিদেশের রূপকথা' ২৫৮
'দৈত্য ও দানব' ২৪৪
'দৈনিক বসুমতী' ১১৯, ২৯৪, ২৯৯, ৩৬২
দৌলৎ কাজী ২৭৯
'দ্যুতিরিনা খ্রীষ্টা' ১৮, ৩৭৭
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ২৮৯
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৩৭, ১৬৫, ২৮৫
দ্বিজমাধব ৪৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬, ২৩৭, ২৭১, ২৮৯, ২৯১, ৩২৮
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৩, ২০৬, ২৪৭, ২৫০, ২৯৫
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৬১, ২৬৪
'ধরণীসুত্র' ১৩
'ধর্মজীবন' ২৩৭
'ধর্মতত্ত্ব' ২৩৪

'ধর্মপুস্তক' ৭২, ৯০, ৩০৩, ৩০৫, ৪০৯
ধাতু খোদাই : অন্নদামঙ্গলের ছবি ৩১০-১৪; তামার পাত খোদাই ৩১৪; অবলুপ্তির কারণ ৩২৮-২৯
'ধাত্রী দেবতা' ২১৬
'ধারাপাত' ১৬৭
ধীরেন বল ২৬৬
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ২৬২
ধীরেন্দ্রলাল ধর ২৫০, ২৬২
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫০, ২৯৬
'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৮৯
'ধোড়াকাক' ২৫৬
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৫৮, ২৬৭
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৯০
নগেন্দ্রনাথ বসু ৩০৮-০৯
নজরুল ইসলাম, কাজী ২৫৯, ২৯৬-৯৮
'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' ২৯৬; ছবি সম্পর্কে ৩৪১-৪৩
'নদী' ২৫৪
ননীগোপাল চক্রবর্তী ২৬৪
ননীগোপাল মজুমদার ২৫০, ২৬৪
নন্দকুমার, মহারাজ ৩৪
নন্দলাল বসু ৩৩০, ৩৪৬; রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-চিত্রণ ৩৪১-৪৩
নবকুমার বিশ্বাস ৩২৪
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৫৮
'নবজীবন' ২৩৭
'নবজ্ঞান ভারতী' ৩১১
'নবনাটক' ২০৩
নবনীতা দেবসেন ২১২, ২৫০
'নবনূর' ২৯৭
'নববাবু বিলাস' ২০৯, ২১৬, ২৭০, ২৮৪
'নবযুগ' ২৯৭
'নবশক্তি' ২৯৮
নবীনচন্দ্র ঘোষ ৩২০
নবীনচন্দ্র বড়াল ২৯১
নবীনচন্দ্র বসু ২০১-০২
নবীনচন্দ্র সেন ২০৫, ৩৬০
'নবীন তপস্বী' ১৬৯
নব্যহিন্দু আন্দোলন ২৯০
নরেন্দ্র দত্ত ২৯৯
নরেন্দ্রনাথ বসু ২৪৪
নরেন্দ্রনাথ সরকার ৩৩০
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ২১৬, ২৯৬, ২৯৮
নরোত্তম দাস ২৬
'নরোত্তম বিলাস' ৭২, ২৭০, ৩৩৪, ৩৫৩
নর্টন, এ. জে. ১২৩
নর্থব্রুক, লর্ড ১৩৩, ১৩৮
'নলদময়ন্তী নাটক' ২৭২
নলিনী দাশ ২৪৮, ২৫০, ২৬০
নলিনীকান্ত গুপ্ত ২৯৬
'নষ্টনীড়' ২১১
'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ২১৬
নাট্য আন্দোলন ২০৭
নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ১৩৮
'নানাচিন্তা' ২৩৭
নানাফাড়নবিস ৩৭০
'নারায়ণ' ২৯৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২১২, ২১৮, ২৬১, ২৬৩, ২৬৫
'নালক' ২৪২
নিউবেঙ্গল প্রেস ৩৫০
নিউজপ্রিন্ট ৪০৫-০৬
নিকোবর দ্বীপ ৩৬৯, ৩৭৪
'নিকোলাস নিকলবি' ১৬২
নিজামকে মুদ্রাযন্ত্র উপহার ১৩৩
'নিজে পড়' ২৫৯
নিত্যানন্দ দে ৩২৩
নিধুবাবু দ্রঃ রামনিধি গুপ্ত
নিধুবাবুর টপ্পা ১৭৭
নিমাই ভট্টাচার্য ২১৮
'নিমাই সন্ন্যাস' ২০১
নিরুপমা দেবী ২১৬
'নিরেট গুরুর কাহিনী' ২৪৬, ২৬০
'নির্জন শিখর' ২১৮
'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' ৪৪৭
নির্মল দাশ ৪১, ৪৩
নির্মলকুমার বসু ২৯৬
নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী ৩১১
'নিশিকুটুম্ব' ২১২, ২১৭
'নিষ্কৃতি' ২১৫
'নীতিকথা' ১৬৭-৬৮, ২৪০, ২৫২
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২৬০
নীরেন্দ্রনাথ রায় ২৯৬-৯৭
'নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে' ২১৬
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ২০১
'নীলদর্পণ' ২০৪, ৪৪৩
'নীলপাখি' ১৬২
'নীলপাখী' ১৫৯
'নীলভূঁইয়া' ২১০
নীলমণি পাল ২৭৪
নীলমণি বসাক ১৫৭
নীলরতন ধর ২৯৬
নীলরত্ন হালদার ১৩৭, ২৮৫, ৩১০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ২৬১, ২৬৩
'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' ৩০৬
নূতলাল শীল ১০২, ২৭৮
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৫৯, ১৬২, ২৫৪
'নেতাজী সুভাষচন্দ্র' ২৫৪
'নেপালে বাংলা নাটক' ২৩
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৩২, ১৫৯
'নোটস ফ্রম দি আণ্ডারগ্রাউণ্ড' ২১৯
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৬৩
'পঞ্চগ্রাম' ২১২, ২১৬
পঞ্চানন কর্মকার ১৯, ৫৫-৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৭৫, ৮৪, ৯০, ৯১, ৯৩, ১১২, ১১৫, ১৭৮, ২৭৪, ৩১৮, ৩১৪, ৪০৮; উইলকিন্সের সহকারী, শ্রীরামপুর প্রেসে হরফ তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ ৪৭, ৬৯; প্রথম বাঙালী হরফ নির্মাতা ৬৯; অক্ষর ঢালাই ও ব্লক তৈরি ৩৩৩; হরফের দাম ৪২০
পঞ্চানন তর্করত্ন ২৯১

পঙ্কজলাল ২৪২, ২৪৪, ২৪৮
পঞ্জিকা ৯৯, ১২০, ৪০৯; ফেরিওয়ালা ৮৬; চন্দ্রোদয় প্রেসের ৩১৮
'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' ২১৭
'পত্র কৌমুদী' ১৬৭, ১৬৮
'পথের দাবী' ২১৫, ২১৮
'পথের পাঁচালী' ২১২, ২১৬
'পদাতিক' ২৯৮
'পদার্থবিদ্যাসার' ১৬৭
'পদ্দীপিসীর বর্মীবাক্স' ২৬০
'পদ্যপাঠ' ১৭২
'পদ্যশিক্ষা' ২৫৩
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ২৪
পদ্মলোচন চূড়ামণি ৩৫৩
'পদ্মানদীর মাঝি' ২১০, ২১৬
'পদ্মাবতী' ২৪
পদ্মিনীমোহন নিয়োগী ২৯১
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৯, ১৬২
'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ৩৫৬
পরাণচন্দ্র, দেওয়ান ৩১৬
'পরিচয়' ২৯৭
'পরিব্রাজক' ২৩৭
'পরিভাষাকোষ' ৩১০
পরিমল গোস্বামী ২৪৫, ২৬৪, ২৯৮
'পরীস্থান' ১৫৯
পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ ৯০, ৩০২, ৪২৮
পর্তুগীজ মিশনারী ৮৮, ৩০২, ৩৭৭
'পলাতকা' ১৮৩
'পলিপ্লট ঈসপ' ১৭০
'পল্লীসমাজ' ২১০, ২১৫
'পশুপক্ষী' ২৪৪, ২৪৮
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয় ১২০
'পশ্চাবলি' ১৬৭, ১৬৮, ২৪১, ২৬৬, ৩১৪, ৩১৬, ৩৩৪, ৩৯৪
পাউণ্ড, এজরা ১৮১
'পাকরাজেশ্বর' ১৫৮
'পাগলা দাশু' ২৪৬, ২৫৯, ৩৪৬
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৫, ৩৫৪
পাণ্ড তৈরির ব্যয় ৩৭৩
পাঠশালা ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯
'পাঠাবলী' ১৭২
পাঠ্যপুস্তক ৬৯, ৭০-৭৩, ১৬৫-৭৫, ৩২৬, ৩২৮; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৭৩; কেরীর ব্যাকরণ ৭৪; বিদেশী ছাত্রদের জন্য ৮১; বিদেশী প্রভাব ১৭০; ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটির দান ১৬৬-৬৯; দ্বি-ভাষিক ও বহু ভাষিক ১৭০; প্রকাশনার কেন্দ্র, দেশী ও বিদেশী লেখক, রচনা বৈচিত্র ১৭০;
'পাতাল কন্যা' ২৯৮
'পাতালে পাঁচ বছর' ২৫০
পান্নালাল শীল ৪০২
পাপড় ২৬৫
পার, স্যামুয়েল ৩৭-৩৮
'পারস্য ইতিহাস' ১৫৭
'পারিবারিক প্রবন্ধ' ২৩২
পার্চমেন্ট ৪০০
'পাল ও বাঁজনিয়ার কাহিনী' ১৬৯
'পালামৌ' ২৩৫
'পাল্কীর গান' ২৫৯
'পাষণ্ড পীড়ন' ২২৯
পি-সেঙ ১৪
'পিটার প্যান' ২৫৬
'পিটার শ্যাম' ৪১
'পিনাকিও' ২৪৮
'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' ১৫৫
পীতাম্বর সেন ৩১৬
পীয়ার্স, ডব্ল. এইচ. ১৫০; মুদ্রাক্ষরের সংস্কার ৯৭; মাত্রাব্যবহার ১১০
পীয়ার্সন ১৬৭, ১৭০
পুষ্পলতা চক্রবর্তী ২৪৪
'পুতুলনাচের ইতিকথা' ২১৬
পুঁথি; সূত্রপাত ২১; লিপিকর-আঙ্গিক, লিপিবৈচিত্র্য, এসিয়াটিক সোসাইটির, শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরির ২৩; পৃষ্ঠা নির্দেশ ২৪; লিপিকরের নাম ২৪-২৫; মূল্য, বিনামূল্যে বিতরণ, অনুবাদ, লেখক পরিচিতি ২৫; মুদ্রণে প্রভাব ২৪-২৫; পড়া, ছাপা ৭৩
পুঁথির আকারে ছাপা বই ৩৩৪, ৩৫৩
'পুরুষ পরীক্ষা' নাটক ১৫৬
পুরুষোত্তম যন্ত্র ২৭৫
পুলিনবিহারী সেন ১০৬, ৪৫০
পুষ্পেন সরকার ২৬৫
'পূরবী' ১৮৭
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ২৬৫, ২৬৬; গ্রন্থচিত্রণে ৩৪৩-৪৪
পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র ২৭১
'পূর্ব পাকিস্থানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ১১২
'পূর্বপার্বতী' ২১৬
'পৃথিবী ছাড়িয়ে' ২৫০
'পৃথিবীর রূপকথা' ২৫৮
'পেনি ম্যাগাজিন' ২৮৭
'পৌরাণিক অভিধান' ৩১০
'প্যান' ১৫৯
প্যাপেটোগ্রাফিয়া ৯০
প্যাপিরাস ৪০০
প্যারাগন প্রেস ২৯৫
'প্যারাডাইস লস্ট' ১৫৬
প্যারীচরণ সরকার ১৭০
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৫৭, ২১২, ২৩৩, ২৮৯, ৩২৪, ৩২৫, ৪০৭, ৪০৯
প্যারীমোহন সরকার ১১৬
'প্রকৃতিবাদ অভিধান' ৩০৫
'প্রজাপতি' ২১৯
প্রজ্ঞাবন্দ্য ২৭৭
প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ৩২২
প্রতিভাসুন্দরী দেবী ৩২৭
প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৬; গ্রন্থচিত্রণে ৩৪৩-৪৪
'প্রথম পাঠ' ১৬৭
'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ২১০, ২১৫, ২১৭, ২১৮
'প্রদীপ' ৩২৯; লেখকগোষ্ঠী ২৯৩

প্রফুল্ল রায় ২১৬
প্রফুল্লকুমার সরকার ৩৮২
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ৩৪৬
প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৫, ২৮৯
প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী ২৬৫, ২৬৬
'প্রবন্ধ-মঞ্জরী' ৩২৮
'প্রবন্ধাবলী' ২০৭
'প্রবাদমালা' ১৬৮, ৩১০
'প্রবাদ রত্নাকর' ৩১০
'প্রবাসী' ২১১, ২০৭, ২৬৭, ২৯০-৯৬, ৩২৯, ৩৬৩; প্রেস ২৯৩-৯৪, ২৯৬
প্রবোধকুমার সান্যাল ২১৬, ২৯৬
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৩৫৭
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ২৯৬
প্রবোধচন্দ্র সেন ১৭৫, ১৮২, ৪৪৯
'প্রবোধচন্দ্রিকা' ৭৬, ৭৯, ৮১, ২২৮
'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক ১৫৮, ২০২, ২৭২
প্রভাকর যন্ত্র ২৭০
প্রভাত দেবসরকার ২১৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৯৩, ৩০৯, ৩১১, ৪৫০
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৯
প্রমথ চৌধুরী ২৯, ১২০, ১৫৯, ২০৮, ২৯৫, ২৯৭; 'সবুজপত্র', গদ্য সাহিত্যে দান ২৯৫
প্রমথ বিশী ২১২, ২১৬, ২১৯, ২৯৮
প্রমদাচরণ সেন ২৪৮, ২৬০, ২৬৬
প্রমদারঞ্জন রায় ২৪৪
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ২১৬, ২৯৬
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২০১
প্রসূন দত্ত ১১৯
প্রাকৃত যন্ত্র ২৮৮
'প্রাচীন কাহিনী' ১৬৯
প্রাট, রেভ. হজসন ১৫৭
প্রাণতোষ ঘটক ৩০৭
প্রাণনাথ দত্ত ২৯২, ৩২২, ৩২৩
প্রাণনাথ দত্তচৌধুরী ২৭১
'প্রাণনাথ নাটক' ২৭১
'প্রাণেশ্বর নাটক' ২৭১
'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' ৩৪৬
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ২০৭
প্রিন্স অব ওয়েলস ১৩৮
প্রিন্সেপ, জেমস ৩১৬
প্রিয়গোপাল দাস ৩২৭
প্রিয়নাথ সেন ২৯০, ২৯৪,
প্রিয়ম্বদা দেবী ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৬৪
প্রিয়রঞ্জন সেন ৪১, ৩০২
'প্রেমসঙ্গীত' ২৮২
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ২১৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০, ২১৭, ২৪৯, ২৫০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮
'প্রোফেসার শঙ্কু' ২৬২
ফটো এনগ্রেভিং ৩২৮, ২৩৯
ফটো কম্পোজিং, বিভিন্ন যন্ত্র ৩৮৫-৮৬; দাম ৩৮৬; ইতিহাস ২৮৬; উপাদান ৩৮৬-৮৭; বাংলা মুদ্রণে ৩৮৪, ৩৯০, ৪০৯
ফটোগ্রাভিওর ১২০, ৩৮৪, ৩৯৮-৯৯
ফটো মেকানিক্যাল ব্লক ৩৯৫
ফটো লিথোগ্রাফি ৩৯৭, ৩৯৯
ফণিভূষণ সেন ৩২৪
ফরবেস, ডানকান ১৭০
'ফরসাইট সাগা' ২১১
ফরস্টার, হেনরি পিট্স ৬৮, ৯১, ১৫৪, ২১৪, ৩০২
ফাউন্টেন, জন ৬০, ৬১
'ফাউস্ত' ১৬০
ফাউলার, টমাস ফ্রান্সিস ৩২০
ফাবরিসিউস ১৯
ফারদুনজি মারজাবান ১৮
ফারসী প্রেস ৯৫
ফার্গুসন, জেমস ১৫৬, ১৬৭
'ফার্স্ট বুক' ১১৬
ফিটজেরাল্ড, স্কট ২১০
'ফিদেল ক্যাস্ত্রো' ২১৮
ফিরদৌসী ৩১৮
ফীল্ডিং, হেনরি ২১২
ফুট, স্যামুয়েল ৩৭
'ফুলঝুরি' ২৫৮
'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ৪৪২
ফুস্ট ১৬
ফেরার, স্যার জোসেফ ৩২৩
ফেরিস কোম্পানী ৯১, ৩০২, ৩১৩, ৩৩৩; ছাপাখানা ৯৫; 'অন্নদামঙ্গল'-এর মুদ্রাকর ৩৫৩
'ফোক টেলস অফ বেঙ্গল' ২৪২, ২৫০, ২৫৬
ফোক, ফ্রান্সিস ৩১৩
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৪৮, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭০, ৭৩, ৮১, ৯৩, ৯৭, ১১২, ২২৬, ২৫২, ৩০২, ৪৩৮; পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাত ৬১; শ্রীরামপুর মিশন প্রেসকে সাহায্য ৬৯, ৩৫১; মুদ্রণ ব্যবস্থা ও জনশিক্ষার প্রসার ৭২; অনুবাদ চর্চা ১৫৬; প্রতিষ্ঠা ১৬৬; পাঠ্যপুস্তক ১৬৬; গ্রন্থাগার ৩১৫-৫২, ৪৩২; প্রকাশনের উদ্দেশ্য ৩৫৩, ৩৫৪; লাইব্রেরির বই ৪২৬
ফ্রাই, এডমন্ড ৯০
ফ্রাঁস, আনাতোল ১৬০
ফ্রিৎস, যোহান ফ্রিদরিখ ৯০
'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ৭২, ৮৫, ৮৬, ১৫৬, ৩৫২, ৩৫৪
'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' ১৬২, ২১৫, ২৬২
বই: প্রথম ছাপা ১৩; দোকান ২৭২, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ৩৫৯; বিতরণ ৩৫২; বিপণন ২৮১, ৪১৮; ছবি ৩১৩-৩১; ফিরিওয়ালা ৩৫৫; মেলা ৩৬৩; পরিসংখ্যান ৪১৫; পাঠ্যপুস্তক ৪১৬
'বঙ্কিম অভিধান' ৩১১
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১২, ১৭৯, ১৮২, ২০৯-১০, ২১২-১৩, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২৩২, ২৪১, ২৮৬, ২৮৯, ২৯০, ৩২৭, ৩২৮, ৩৬০, ৩৬৩, ৪০৯; সমালোচক ২৩৩; গ্রন্থাবলী ২১৫; প্রকাশনের সমস্যা ৩৫৬; কাঁঠালপাড়ায় ছাপাখানা ৩৫৬; ছাপার কাজে বিচক্ষণতা ৩৫৬-৫৭; বইয়ের অঙ্গসজ্জা

সম্বন্ধে ৩৫৭
'বঙ্গদর্শন' ১৯৭, ২০৫, ২০৪, ২০৮, ৩৫৬; লেখকগোষ্ঠী ২০৫, ২৮৯
'বঙ্গদূতে' ৭১, ২৮৬
'বঙ্গবাসী' ২৮৫, ২৯০; সুলভে পুস্তক উপহার ৩৬২; স্টীম প্রেস ৩২৭
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্র ২৭১
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৪৪২
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ১৫৭; পুস্তক-তালিকা ১৬৯, শিশুসাহিত্যে দান ২৫৬
'বঙ্গভাষাভিধান' ৩০৪
'বঙ্গভাষার লেখক' ৩১১
'বঙ্গাধিপ পরাজয়' ৩২২
'বঙ্গীয় উপকথা' ২৫৫
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ ৪৪৭
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা ৪৪৭
'বঙ্গীয় মহাকোষ' ৩০৯
'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ২৯৭
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ২৯৭
'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ৩০৬
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১২১, ৩০৬, ৩০৯, ৩১০, ৩২০, ৪২৪, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৯; গ্রন্থ-তালিকা ৪৪৭; পত্রিকা-তালিকা ৪৪৮;
বটতলার বই ১০১-০২, ২৭০, ৩৫৪-৫৫; হরফ ২৭৮; এলাকা ২৬৯-৭০; প্রকাশক ২৭৮, ৩৫৬
'বত্রিশ সিংহাসন' ১১৭, ১১৮, ১৫৭, ২২৮, ২৫৩, ২৫৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩৩৪
'বন কেটে বসত' ২১৬
'বনপলাশীর পদাবলী' ২১৬
'বনফুল' ১০৬
বনফুল দ্রঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
'বনলতা সেন' ৩৪৬
'বনে-জঙ্গলে' ২৪৪, ২৪৮
'বন্দীর বন্দনা' ২৯৯
বন্দে আলী মিয়া ২৫৯
'বন্দেমাতরম্' (গান) ২৮৯
'বন্দেমাতরম্' ৩২৭
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ২১৮, ২২২
বরেন বসু ২১৮
'বর্ণপরিচয়' ১০১, ১১০, ১৬৯, ১৭৪, ১৭৫, ২৫২, ৩৫৪, ৪৪০; বাংলা মুদ্রণে প্রভাব ১০০
'বর্ণবোধ' ১৭২
'বর্ণমালাতত্ত্ব' ২৪৬
'বর্তমান ভারত' ২০৭
বর্ধমানের ছাপাখানা ২৭৪-৭৫
'বর্ষপঞ্জী' ৩০৯
বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ২১২, ২২২, ২৯৮, ৩৫৭
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৮, ৩২৭
বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বদ্বল্লভ ২৩
'বসন্তক' ২৭১, ২৭৫, ২৯১-৯২, ৩২২
বসুমতী সাহিত্য মন্দির ২০৬; রোটারি যন্ত্র ২৯৪; দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র ২৯৪; সুলভ গ্রন্থাবলী ২৯৫, ৩৬১-৬২
'বহুদর্শন' ৩১০
'বহুরূপী' ২৪৬, ২৬০, ৩৪৬
বাংলা অক্ষরভালা ১২৭
বাংলা অক্ষরের ব্লক-চিত্র ৩৭৮
'বাংলা অভিধানগ্রন্থের পরিচয়' ৪৪৯
'বাংলা ইংরাজি ভকাবুলারি' ৩০২
বাংলা একাডেমি ১১২
বাংলা কাব্য : গানের যুগ ১৭৭; বিবর্তন ১৭৭-৭৯; কবিওয়ালা ১৭৭
বাংলা গদ্য : ইতিহাস ১৫০; নির্মাতারা ১৯০
'বাংলা গ্রন্থপঞ্জী' ৪৪৮
বাংলা দেশের 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ৩০৬
বাংলা দেশের শিশুসাহিত্য ২৬৬
বাংলা নাটক : যাত্রা থেকে বিবর্তন ১৯৭-৯৮; ভাষা ১৯৯; ইংরেজী থেকে অনুবাদ ২০১
'বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ' ৪৫, ৩০২
'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়' ৪০৯
'বাংলা প্রবাদ' ৩১০
'বাংলা-ফারসী শব্দকোষ' ৪৩
বাংলা বানান ৮১-৮২, ১২০
'বাংলা বিশ্বকোষ' ৩০৯
বাংলা ব্যাকরণের লেখক ৪৫-৪৬
বাংলা মুদ্রণ বিষয়ক গবেষণা ১২৩
বাংলা লাইনোটাইপ ৪০৮
'বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী' ৪৪৮
বাংলা হরফ ৩৮, ৫৪, ১১৫, ৪০৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২২; বিবর্তন ৭৬-৭৮; সংস্কার ১০৯; ত্রি-স্তর ১০৯-১০; 'সমাচার দর্পণে'র ২৮৩; হরফশিল্পের সমস্যা ৪২০ ২২, হরফের সংখ্যা ৪২২
বাংলাভাষীর সংখ্যা ৪১৪
'বাংলার ইতিহাস সাধনা' ৪৪৯
'বাংলার ডাকাত' ২৬১
'বাংলার রূপকথা' ২৫৮
'বাইবেল' ৯৪; অনুবাদ ৬০, ৬৯, ৭১, ৮১, ১৫৫, ৪০৯
বাইবেল পেপার ৪০৫
বাকিংহাম, জেমস সিলক ৭৫, ১০৬
'বাক্যাবলী' ১৬, ১৬৭
'বাঙলার প্রথম' ৪১
'বাঙ্গাল গেজেটি' ২৮৪; প্রেস ৩৫৩
বাঙ্গালা যন্ত্র ২৭০
'বাঙ্গালাভাষার অভিধান' ১১০, ৩০৬, ৩৬৩
বাঙ্গালি প্রেস ৯৫
বাজেয়াপ্ত বইয়ের তালিকা ৪৪৯
বাণী বসু ২৪৬, ৪৪৮
বাণী রায় ২৫০
'বাতায়ন' ২৯৭
'বাদশাহী আংটি' ২৬১
'বান্ধব' ২৩৫
বাবুরাম ১৭৮, ৩৫২; সংস্কৃত প্রেস ৭০; মুদ্রণ-রীতি ৯৫
'বামাবোধিনী' ২৪৮
বায়রন ১৫৯
'বারো ঘর এক উঠোন' ২১০, ২১২
'বালক' ২২৭, ২৪৯, ২৫৪, ২৬৬
'বালকবন্ধু' ২৬৬

'বালিকাবোধ' ১৭১
'বাল্যশিক্ষা' ১৭২
বাল্মীকি প্রেস ২৭৪
'বাহ্যবস্তুর সহিত...বিচার' ২৩০
'বি কেলাস' ২১৮
বিচল হরফ ৮৮, ৯০, ১৪৪, ৩৩০; মাটির ১৪; কাঠের ১৪; ব্রোঞ্জের ১৪; অন্যান্য ধাতুর ৫২
'বিচিত্র বিলাস' ২০১
'বিচিত্রা'; লেখক গোষ্ঠী ২৯৬; নন্দলালের অলংকরণ ৩৪১
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১২০
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ২৪৪
বিজয়চাঁদ মহতাব ৩২৯
বিজয়রত্ন মজুমদার ২৪৪
বি. জি. প্রেস ১২২, ১২৩; ছাপা বইপত্র ১২৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বই ৪৫৩
'বিজ্ঞানের অভিধান' ৩১০
বিজ্ঞাপন চিত্র ৩৪৪
'বি. টি. রোডের ধারে' ২১৬
বিদেশী রঙ্গালয় ১৯৯, ২০০, ২০১
'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ১৫৮, ৩০৮
'বিদ্যাসুন্দর' ৩৮, ২০২; নাটক ২৭২; যাত্রা ২০১
'বিদ্যাহারাবলী' ৯৮, ১৫৫, ৩০৮
'বিশ্বমোদ তরঙ্গিণী' ৯৯; অন্তর্গত চিত্র ৩১৫, ৩১৬, ৩৩৪
'বিধবাবিবাহ নাটক' ২০৩, ২৭৪
বিধায়ক ভট্টাচার্য ২৪৭, ২৬৫
বিধুশেখর শাস্ত্রী ১২০
বিনয় মজুমদার ২৪৭
বিনয়কুমার সরকার ২৯৬
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ৩৩৫, ৩৩৬
'বিন্দুর ছেলে' : গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় ৩৬০
বিপিনচন্দ্র পাল : 'মৃণালের পত্র' ২৯৫; 'নারায়ণ' ২৯৫, ৪৩৭
'বিবর' ২১৯
'বিবলিকা ভামুলিকা' ৩৭৭
'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' ৩৭
'বিবিধ প্রবন্ধ' ২৩৪
'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ১০৬, ২৩৩, ২৬৬, ২৮৭, ৩১০, ৩৩৫, ৩৯৪; গ্রন্থ-সমালোচনা ২৮৭; অলংকরণ ৩৩৬; গ্রন্থাগার সম্বন্ধে মন্তব্য ৪৩৩
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১২, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২৫০, ২৬২, ২৬০; 'আম আঁটির ভেঁপু'র গ্রন্থচিত্র ৩৪৫-৪৬
বিমল কর ২১১, ২১৯, ২২০, ২৬৩
বিমল ঘোষ ২৬৫, ২৬৭
বিমল মিত্র ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৬-১৭, ২১৮, ২১৯, ২৬৩
বিমল সেন ১৬০, ২৬৩
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ৩১০
'বিরস নাটক' ৩৪৬
'বিরাজ বৌ' : গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় ৩৬০
বিশপ কলেজ ৩০৪; প্রেস ২৭৪
'বিশ্বকোষ' ৩০৮
বিশ্বনাথ দেব ১০২, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ৩১৫; বটতলায় প্রকাশন ৩৫২, ৩৫৪; ছাপাখানা ৯৭, ২৭৭
বিশ্বভারতী : গ্রন্থনবিভাগ ৩৬০, ৩৬৩
'বিশ্বভারতী পত্রিকা' ৪৯
বিশ্বম্ভর আচার্য ৩১৫, ৩৫০; 'গৌরীবিলাসে'র চিত্রাঙ্কণ ৩৩৪
'বিষবৃক্ষ' ২১৩, ২১৫, ২৮৯
'বিষাদ-সিন্ধু' ২০৬
বিষ্ণু দে ১৮০, ১৮৫, ১৯০, ২৬০; 'রচনাপঞ্জী' ৪৫০
'বিসর্জন' ১৮০
বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৮১, ১৮২, ১৮৭, ১৯১, ১৯২, ৪৩৯
বিহারীলাল দাস ৩২৩
বিহারীলাল রায় ৩২৬-২৭
বিহারীলাল সরকার ২৯০, ৩২৬, ৩২৭
বীটন সোসাইটি ২০১
বীরচন্দ্র দত্ত ৩১৬, ৩৩৪
বীরেন্দ্র বিশ্বাস ৩০৭
বীরেশ্বর পাঁড়ে ২৩৬, ২৫৪
'বুক অব আওয়ারস' ১৬
বুক ডিজাইন ৩৩০; ইউরোপীয় প্রভাব ৩৩২
'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' ৩৫৬
'বুড়ো আংলা' ১৬১, ২৪২, ২৫৬
'বুড়ো শেয়াল' ২৫৬
বুদ্ধদেব গুহ ২৬২
বুদ্ধদেব বসু ১৫৯, ১৬২, ২০৭, ২৫০, ২৫৮, ২৬৪, ২৯৭; বানান রীতি ১১০; 'মানসী' সম্বন্ধে ১৮৫, ১৯২; ও 'কল্লোল' ২৯৭; 'কবিতা পত্রিকা' ২৯৮; 'বন্দীর বন্দনা' ২০০
'বুনোগপ্প' ২৫৮
'বুদ্ধ হিন্দুর আশা' ২৩২
বৃন্দাবন ধর ৩৬৩
'বৃহৎ ইংরাজী—বাংলা অভিধান' ৩০৫
বেইলী, উইলিয়াম ৯১
বেকন, ফ্রান্সিস : মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ২৮৩
'বেগম মেরী বিশ্বাস' ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৯
বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ৪৩৬
'বেঙ্গল গেজেট' ৭৪, ৯০, ১২২, ১৪৫-৪৬
বেঙ্গল টাইপ ফাউন্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন ৪২২
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ৩৬১
বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৭১, ৪৪৫
বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস ১২২, ১২৫
'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ২৮৭
'বেঙ্গল হরকরা' ৭৫, ৮৫, ১০৭
'বেঙ্গল হেরাল্ড' ১০৭, ২৮৬
'বেঙ্গলী রীডার' ১৭০
'বেড়াল ঠাকুরঝি' ২৫৮
বেণীমাধব দে ২৭৮
বেণ্টিঙ্ক, উইলিয়াম ১৩৩, ১০৭
'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১০১, ১৫৭, ১৫৮, ২৪০, ২৫৩, ৩৫৩
বেথুন, জে. ডি. ১৫৭, ৩২৬
'বেদান্তগ্রন্থ' ৭৫, ৯৬, ২২৮, ২৭০
'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ২২৮, ২৭০, ২৭৮
'বেদান্ত দর্শন' ২৩৮

'বেদ্ইন' ২১৮
'বেদে' ২১৬; ছবি ৩৪৭
বেল্নস ৩২০, ৩১৪
'বৈতালপচীসী' (হিন্দী) ১৫৮
'বোধেন্দু বিকাশ' ২৪৬
'বোধোদয়' ১৭৪, ১৭৫, ৩৫৪
'বোম্বাই চিত্র' ৩২৮
'বোম্বে গেজেট' ১৮
বোলট্স, উইলিয়াম ৩৮, ৪১, ৪৩, ৯০, ৩৭৭; ডাচ না জার্মান ৩৬৭; কলকাতায় চাকরি ৩৬৭; কোম্পানীর অভিযোগ, চাকরিতে ইস্তফা ৩৬৭-৩৬৮; অলডারম্যান, মেয়রস্ কোর্ট ৩৬৮; লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন ৩৬৮; 'কনসিডারেশানস্...' রচনা; ফরাসী অনুবাদ; বার্কের উপর প্রভাব ৩৬৮; ভেরেলস্টের অভিযোগ ৩৬৯; অস্ট্রিয়ান ও সুইডিশ কোম্পানী গঠন ৩৬৯; বোলট্স-হোম উপনিবেশ ৩৭০; সিন্ধুর ব-দ্বীপে কুঠির প্রস্তাব ৩৭০; সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ভাবন ৩৭০; লাইব্রেরী ৩৭০; ভাষাজ্ঞান ৩৭০; ছাপাখানার জন্য ঘোষণা ৩৭০-৭১; বাংলা হরফ তৈরি ৩৭১; হলহেড ও ব্রজেন্দ্রনাথের অভিমত ৩৭১; ব্যঞ্জনবর্ণের নমুনা ৩৭২; ডিরেক্টর জেমসকে চিঠি ৩৭৩; অর্থাভাবে কাজ অসম্পূর্ণ ৩৭৩-৭৪; বাংলা মুদ্রণবিষয়ক প্রস্তাব ৩৭৩-৭৪; বিচল হরফ ৩৭৪; মৃত্যু ৩৭৪
'বৌদ্ধগান ও দোহা' ২১
ব্যাপটিস্ট মিশন ১১০
ব্যাপটিস্ট মিশন (শ্রীরামপুর) ৮৪
ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ৬৫, ৮২, ৯৭, ২৭৪, ৩১৮, ৩৭৮; প্রতিষ্ঠা ৯৮; নতুন হরফ ১৫০
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪, ১০৫, ১২৫, ৩১১, ৪৫০
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ২৯৫
'ব্রহ্মবাদিনী' ৩২৪
ব্রাইট, জন ৪০
ব্রাউনিং, রবার্ট ২২০
ব্রাদারস, রিচার্ড ৩৯, ৪০
'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ৯০
'ব্রিটিনদেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' ১৬৭
ব্রিটিশ মিউজিয়াম ৪৩, ১৩০; হলহেডের পুথি সংগ্রহ ৪৭, পুথি সংগ্রহ ৪৭, ৪৯; বাংলা বই ৪২৪, ৪২৬; বাংলা বইয়ের তালিকা ৪২৭, ৪৪৬; বাংলা বইয়ের সংখ্যা ৪২৭-২৮
ব্রিটিশ লাইব্রেরি দ্রঃ ব্রিটিশ মিউজিয়াম
ব্লকঃ রঙিন ছবির জন্য প্রথম ব্যবহার ২৯৩; মুদ্রণ ৩৯৪; প্রস্তুত প্রণালী ৩৯৭; কাঠের ৪০৬
ব্লকবুক ১৫
'ব্লীক হাউস' ২২৭
'ব্লু বার্ড' ১৫৯
'ব্ল্যাক টিউলিপ' ১৬২
ভগবতী দেবী ৩২৬
'ভগবতীগীতা' ৩১৫
'ভগবদ্গীতা' ৫০, ৩১৬
ভট্টাচার্য এন্ড সন্স ২৫০
'ভদ্রার্জুন' ২০৪
ভবভূতি ১৫৯
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২, ১৪৭, ২৭০, ২৮৪, ২৮৫, ৩০৪-৩৫, ৩৫৬, ৪০৯
'ভানুমতীর চিত্তবিলাস' ১৫৮, ২০২
'ভাববার কথা' ২৩৭
'ভারতকোষ' ৩০৮, ৩০৯
ভারতচন্দ্র ৩৮, ৪৭, ৯০, ১৭২, ১৭৮-৯৭, ১৮০, ১৯৮-৯৯, ৩১৬, ৩৩৩
'ভারত-দর্পণ' ৩০৯
'ভারতবর্ষ' ২৯৫
'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ২৩০, ৩১২, ৩৬১
'ভারত-শ্রমজীবী' ২৮৯
'ভারতী' ৪১, ২৩৮, ২৭১; সম্পাদক ২৮৯-৯০; লেখকগোষ্ঠী ২৯০
'ভারতী ও বালক' ২৬৬
'ভারতীয় দর্শনকোষ' ৩১০
'ভারতীয় বনৌষধি' ৩১০
'ভারতীয় সংগীতকোষ' ৩১০
ভার্জিল ১৫৬
ভার্ণ, জুল ১৬২, ২৬২
ভার্নাকুলার ট্রান্স্লেশান সোসাইটি ১৫৭
'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' ১৩২, ১৩৮, ২৯০; বিরোধিতায় সভা ১৪০; সোমপ্রকাশের বিরোধিতা ২৪৮
ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি ৩৫৩, ৩৫৪; মহিলা ফিরিওয়ালা ৩৫৫
ভাস্কর যন্ত্র ২৭০
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ৩১৬, ৩২০
ভীমজী পারেখ ১৮
'ভীমের কপাল' ২৬০
ভুবনমোহন রায় ১৬১
'ভুলি নাই' ২১৮
'ভূগোল বিবরণ' ১৬৭
'ভূগোল বৃত্তান্ত' ১৭০
'ভূতপত্রীর দেশ' ২৪৪
'ভূতুড়ে কুকুর' ২৬০
'ভূতের গল্প' ২৬২
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৬৮, ১৭০, ২৩২, ২৭৪, ৩৫৭
ভূপতি চৌধুরী ২৯৬
ভূপেন্দ্রনাথ বসু ২৯১
'ভূমি পরিমাণ বিদ্যা' ১৬৮
ভূর্জপত্র ৪০০
ভেরাদ, আঁতোয়া ১৪৪
ভেরেলস্ট, হ্যারি ৩৬৯
ভৈরবচন্দ্র রায় ২৭৫
'ভোকাবুলারিও' ৩৭৭
ভোলানাথ চন্দ্র ১৬৬
'ভ্যানিটি ফেয়ার' ২১১
'ভ্রান্তিবিলাস' ১৫৯
'শব্দাভিধান' ৩০৭
মক্কটন ১৫৬
'মঙ্গল সমাচার মতিউর' ৯৩, ২৭৪, ৪২৩
মঙ্গলচণ্ডীর গীত ৪৭
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২৬০

'মডার্ন রিভিয়্যু' ৩২৯
'মডার্ন স্যানসক্রিট' ৩৭১
মণি বাগচী ২৫৪
'মণিমালা' ২৬০
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২৫৮, ২৯০
মণীন্দ্র দত্ত ১৬২
মণীন্দ্রলাল বসু ২৬২
মণীশ ঘটক ২১৭
মতি নন্দী ২১৮, ২৬৫
মতিলাল ঘোষ ২৯০
মতিলাল রায় ২০৪
মতিলাল শীল ১৬৫
'মৎস্যগন্ধা' ২১৬
মদনমোহন গোস্বামী ২০০
মদনমোহন তর্কালংকার ১০১, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪ ১৭৫, ২৫২, ২৫৩, ৩৫৪
মদনাসাটী ৬১, ৬২, ৬৭, ৯৩
মধুসূদন কান ১৯৯
মধুসূদন দত্ত মাইকেল ১৬১ ১৮০ ১৮৪ ১৯২, ২০৪, ২৫৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৯৫, ৩২২ ২৩, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬৩, ৩৭৬, ৪০৯
মধুসূদন দে ৩৫৫
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ১৭১, ২৫৩, ২৫৮, ৩৫৩
'মধ্যরাতের ঘোড়সওয়ার' ২৬০
'মধ্যস্থ' ৩৫৪
মনডে ক্লাব ২৪৭
মনসার গীত ৪৭
'মনুসংহিতা' ১৪৭
মনোজ বসু ২১২ ২১৫, ২১৬, ২১৭ ২১৮
মনোটাইপ ১৪ ১০২, ১১৫-১৭, ১১৮, ১১৯, ১২১, ৩৮৪, ৪০৮
মনোমোহন বসু ২০৪, ২৫৩
মনোমোহন সেন ২৫৯
'মনোরঞ্জন ইতিহাস' ১৬৭, ১৬৮, হস্তি ও উষ্ট্রের ২৫২
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ২৬১
'মনোরম্য পাঠ্য' ১৬৯
মনোহর কর্মকার ১৯, ৫৭, ৬৩,৬৯, ৭৫, ৯৪, ১০২ ১১২, ১৭৮, ৩১৮, কৃষ্ণচন্দ্রকে হরফ নির্মাণ শিক্ষাদান ৮৫, হরফ খোদাই ও ঢালাই এ দক্ষতা ৪০৮
মন্মথ ঘোষ ৩২২
মন্মথ রায় ২৬৫
ময়রা, আর্ল অব ৯৬, ১৩৩
'ময়ূরপংখী' ২৫৮
'ময়ূরাক্ষী' ২১৬
'মরমেড—অর্থাৎ মৎস্যনারীর উপাখ্যান' ১৬১, ২৫৩
মরিসন, স্ট্যানলি ১৭, ৭৬
'মরীচিকা' ২৯৭
'মরুতীর্থ হিংলাজ' ২১৬
মরোয়া, আঁদ্রে ১৫৯
মর্টন, রেজা উইলিয়াম ৩০৪, ৩০৬, অভিধান ৯৮
'মর্নিং ক্রনিকল' ৪১
মলিয়ের ২০০
'মশনবী' ২৭৫
মহম্মদ মিরণ ২৭৯
'মহাকালের রথের ঘোড়া' ২১৮
মহাদেবপ্রসাদ সাহা ৪২৬, ৪২৮, ৪৪৫
'মহানগর' ২১৭
'মহাপ্রস্থানের পথে' ২১৬
মহাভারত ২২, ৩৮, ৭১, ৭২, ৮১, ২৪৩, ২৭৫, ৩২৬, শ্রীরামপুরে ছাপা ৩৩৫, ছবি ৩৩৭
মহামেডান লিটারারি সোসাইটি ২৯০
মহাম্মদ দেবাযতুল্লা ২৭৯
মহাম্মদি যন্ত্র ২৭৯
'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ৭৬, ৮১
মহাশ্বেতা দেবী ২১৮, ২১৯, ২৫০, ২৬০, ২৬২
'মহাস্থবির জাতক' ২১৬
মহিলা প্রেস ২৯৫
মহীতোষ বিশ্বাস ২১৬
মহেঞ্জদারো সীল ১৪
মহেন্দ্রনাথ রায় ১৭২, ২৯৬
'মা' ১৬২
'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' ৩২৬
মাইনজ প্রথম বাইবেল ছাপা ৭১
মাখন দত্তগুপ্তঃ গ্রন্থচিত্রণে ৩৪৬-৪৭
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৫, ২১৬, ২২২, ২৯৬
মাণিক ভট্টাচার্য ২৯৬
মাধবচন্দ্র দাস ৩১৬, ৩৩৪, ৩৫০
মান টমাস ২২৪
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬২
'মানভঞ্জন' ২০১
'মানসী' ২৯৫, ৩৬০
মানুটিউস, আলডুস ১৭
'মানুষ পিশাচ' ২৬১
'মানুষগড়া দৈত্য' ১৬১
'মানুষগড়ার কারিগর' ২১৮
মামফোর্ড ১৪৪
'মায়াকানন' ২৭৮
'মারচেন্ট অব ভেনিস' ২০২
মারডক, জন বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব ১০০-১০১, বিদ্যাসাগরকে চিঠি ১০১, ১০৯, ক্যাটালগ ৪৪৫
মারসডেন, উইলিয়ম ৪২৮
'মারুতির পুঁথি' ২৫৬
'মার্কিন জাতির কর্মবীর' ২৫৪
'মার্টিন রউলের স্কুল' ১৬৫
মার্টিন, মণ্টগোমারি ১৩৭
মার্শম্যান, জন ক্লার্ক ৬৩, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৯৮, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ২৪০, ২৬৬, ৩৩৪, ৩৩৭; কেরীকে মিশনে যোগদানের অনুরোধ ৬৯; পাঠ্যপুস্তক রচনায় কৃতিত্ব ৭৩; সমাচার-দর্পণ প্রতিষ্ঠা ২৪৩
মার্শম্যান, জশুয়া ৫৫, ৮২, ৮৪, ১৫৬, ২৪০
মার্সডেন-সংগ্রহ ৩৭৮
'মা-লক্ষ্মী' ৩২৭
'মালতী-মাধব' ১৫৯

মালদার উচ্চারণ ৬১, ৬২
মালাধর বসু ২১
'মাসপয়লা' ২৬৭
'মাসিক বসুমতী' ৩৬২
'মাসিক মোহাম্মদী' ২৯৮
মিণ্টো, লর্ড ১৩৩
'মিতাক্ষরা' ১৪৭
মিল, ডেভিড ৯০, ১৫৬
মিলার, জন ৯১
মিলার, জোনাথান ১৪৩
মিলিটারী অরফ্যান প্রেস ১২২, ২৭৪
'মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড' ১৬২
মীর মশাররফ হোসেন ২০৬, ২৯৩
'মীরাৎ-উল-আখবার' ১৩৬
'মুকুট' ২৫৪
মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ ৪৭, ১৭২
'মুকুল' ২৪৩, ২৫৭, ২৬৬, ৩২৭, ৩২৯
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ১৫৮
মুণীর চৌধুরী ১১২
মুজাফ্‌র আহমদ ২৯৭, ২৯৮
মুর্দিয়ালী মিত্র যন্ত্র ২৭১
মুদ্রণ, ক্রমবিবর্তন ১৪১-৪৩, ১৪৭, চীন দেশে ১৪৪, মধ্যযুগে ১৪৪ ৪৫, ব্রাহ্মণ দ্বারা মুদ্রণ ১৪৭, মুদ্রণের আদিপর্ব ১৪৮, স্বাধীনতার অপব্যবহার ১৪৮, অশ্লীল পুস্তক ১৪৮, ব্যবসায়ের সমস্যা ৪১০-১৩
মুন্‌শি গোলাম মওলা এণ্ড সন্স ২৭১
মুভেবল টাইপ দ্রঃ বিচল হরফ
মুরলীধর বসু ২৯৮
মুসলমানী পত্রিকা ২৯৭-৯৮
মুহম্মদ কুদরত ই খুদা ১১০
মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন ২৯৭
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ১১২, ৩০৬
মুহম্মদ সিদ্দিক খান ১২১
মুর, হানা ১৫৭
মৃণালিনী দেবী ২৫৫
'মৃণালের পত্র' ২৯৫
মৃত্যুঞ্জয় দে ২৭৮
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৭০, ৭৬, ৯৫, ১৫৬, ২৫৩, ২৭০, ২৭৮, ব্যাকরণ ১৫০, নিজস্ব রচনাশৈলী ২২৮
'মেঘনাদবধ কাব্য' ১৮০, ১৮৪, ১৯২, ২৭২, ৩৫৬
মেটকাফ, চার্লস ৮৯, ১০০, ১০২, ১৩৭
মেটাবলিজ্ম ১৫৯
মে, রবার্ট ১৬৭, ১৬৮
'মে সাহেবের অঙ্ক পুস্তক' ১৬৮
মৈনুদ্দীন ৩৬১
মোকম্মুলর ১০৬
মোজাম্মেল হক ২৫৩, ২৯৭
'মোসলেম ভারত' ২৯৭
মোহন প্রেস ২৮১
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর ২৬, ৯৫, ৩০৭; অভিধান ৩০২
'মোহনভোগ' ২৫৯
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৬১
মোহিতচন্দ্র সেন ৩২৯, ৩৬১
মোহিতলাল মজুমদার ১৭৮, ১৮০, ১৮৫, ২৯৬
'মৌচাক' ২৬০, ২৬৬
ম্যালেন্স, হানা ক্যাথেরিন ৪৪২
ম্যাক, জন ৯৮, ১৫৬, ১৭০
ম্যাক্‌লিন, চার্লস ৭৫
'ম্যাকবেথ' ১৫৯
ম্যাকলুহান, মার্শাল ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮
ম্যাথিউজ, মেজর ৩৭
যখন ছাপাখানা এলো' ১০৫
'যখের ধন' ২৬১
যতীন্দ্রকুমার সেন ১০২, ১২৭, ৩৪০, ৪০৮
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ২৯৭
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩২২ ৩২৩, ৩৫৬, কুশ-পুত্তলিকা দাহ ১৪০
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৫৯
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৩০৫, ৪০৯
যদুনাথ ভট্টাচার্য ১৬৭
যদুনাথ মল্লিক ২৭৪
'যদুবংশ' ২১৯
যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২৬
'যন্ত্রকোষ' ৩১০
যাত্রা ১৯৭ ৯৮, ১৯৯, ২০০
'যাত্রীবদের অগ্রসরণ বিবরণ' ১৫৫
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ৩২৭
যামিনীকান্ত সোম ১৫৯, ১৬১, ২৫৪
যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২৮
'যুগান্তর' ২৬৭, ২৯৯
'যূথপতি' ১৬১
যোগানন্দ দাস ২৯৮
যোগীন্দ্রনাথ বসু ৩২৬
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৩১০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ২৪৩, ২৪৪ ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬২, ২৬৬, ৩০৭
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ২৯০, ২৯১
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৬১, ৩৪৯, ৩৬৩
যোগেন্দ্রনাথ বসু ২৪৪
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ২৩৫, ২৫৩
যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩২৪
যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র ৩৬০
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৮৬
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬১
যোগেশচন্দ্র বাগল ২৫৪, ৩৯৫
যোগেশচন্দ্র রায় ১০৪, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ৩০৬
য়েটস ১০৯
'রংমশাল' ২৬৭
'রক্তরুট' ২১৮
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৮, ২০৩, ২৮৬, ২৯৫
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ৩০৮
রজত সেন ২৬৩
'রজনী' ২১৫, ২২০
রজনীকান্ত গুপ্ত ২০৪, ২৫৪, ৩৬১

'রত্নমালা' ৩০৭
'রত্নসার' ১৭২
'রত্নাবলী' ১৫৮, ১৫৯
রফিকুল ইসলাম ১১০
'রবিচ্ছায়া' ৩৬০
রবিদাস সাহারায় ২৬৫
রবিনসন, জন ৩০৭
'রবিন্সন ক্রুশো' ১৫৭
রবিনহুড ১৬১, ২৫৮
'রবিবার' ২৬৭
'রবীন্দ্র অভিধান' ৩১১
'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' ১০৬, ৪৫০
'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা' ১০৮
'রবীন্দ্র নির্দেশিকা' ৩১১
'রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী' ৩১১
'রবীন্দ্র রচনাকোষ' ৩১১
'রবীন্দ্র শব্দকোষ' ৩০৭
রবীন্দ্র সাহিত্যে চিত্রায়ণ ৩১১
'রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান' ৩১১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৮, ১২০, ১৫৩-৫৪, ১৭৯, ১৮৪, ১৯১, ২০৬, ২১১, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২৩২, ২৩৮, ২৪১, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩১১, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩৯, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৪৩৯; বানান সংস্কার ১১০; গদ্যছন্দ ১৮০, ১৮২; শব্দ সংগীতের ভাণ্ডার ১৮৫; প্রথম সম্মান শিল্পী ১৮৫; স্তবক শিল্পী ১৮৭; আধুনিক কাব্যের বৈশিষ্ট্য ১৯২; শিশুদের কবিতা রচনা ২৪৩, ২৫৯; বটতলায় ছাপা গান ২৮২; 'হিতবাদী' ২৯১; 'কবিতা' পত্রিকা প্রসঙ্গে ২৯৮; গ্রন্থচিত্রণে ৩৩৯; 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' ৩৪১-৪৩; প্রেস ও প্রকাশন বিভাগ ৩৫৬; গ্রন্থস্বত্ব বিক্রির ইচ্ছা ৩৬০; বই প্রকাশে সমস্যা ৩৫৭-৫৮, ৩৬১, ৩৬৩; মোহিতচন্দ্র সেনকে প্রকাশক সম্বন্ধে চিঠি ৩৬১
রবীন্দ্রলাল রায় ২৬৩
'রবীন্দ্র-সম্ভাবিত' ৩১১
রমাপদ চৌধুরী ২১৬, ২১৯, ২৬৫
রমাপ্রসাদ রায় ২৭৪
রমেশচন্দ্র দত্ত ২১০, ২১৮, ২১৯
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩০৯
রয়াল লিথোগ্রাফিক প্রেস ৩২০
রয়েল এগ্রি-হর্টি কালচারাল সোসাইটি ১৫৬
রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ৪২৬
রলাঁ, রমাঁ ২১১
রসময় দত্ত ১৫৭, ৩৫৪
'রসায়ন ভারতী' ৩১০
রহমানি বন্ধ ২৭৯
'রহস্য সন্দর্ভ' ২৩৩
রাইমিং অভিধান ৩১০
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাংলা অক্ষরের কথা ১০১
'রাগ ভৈরব' ২১৮
'রাঙাধানের খৈ' ২৬০
'রাজকাহিনী' ২৪২, ২৫৬, ৩৩০; গ্রন্থচিত্রণ ৩৪৬
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৩৫
রাজকৃষ্ণ রায় ২০৪, ২০৬, ৩০৮, ৩৬০
রাজনারায়ণ বসু ২০২, ২৮৭, ২৯০, ৩২৮
'রাজবংশী অভিধান' ৩০৭
'রাজভাষা' ২৯৪, ৩৬১
'রাজর্ষি' ৩২৭
'রাজলক্ষ্মী' ২২০
রাজশেখর বসু ১০২, ১১১, ১২০, ১২৫, ২৯৬, ৩০৬, ৩৪০, ৪০৮; লাইনোটাইপ উদ্ভাবনে সহায়তা ৩৭৬
'রাজসিংহ' ২১৮
'রাজা ও রাণী' ১৮০, ২৮২
'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ৬৯, ১৬৯, ২২৭, ৪২৩
'রাজাবলি' ৭৩, ১৪৭
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৭৬
রাজেন্দ্রলাল আচার্য ২৬২
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১০৬, ১৫৭, ১৬৮, ১৭০, ২৩৩, ২৬৬, ২৮৭, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৫-৩৩৬
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ২৯৬
রাধাকান্ত দেব ৯৮, ১৩৭, ১৫৭, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ২৫২, ৩৫৬
রাধামাধব মিত্র ২৭৯
রাধামোহন দাস ৩৩৪
রাধামোহন সেনদাস ৩১৫
'রাধারাণী' ২৪
রাধারানী দেবী ২৯৬
রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় ৩০৯
রামকমল বিদ্যালঙ্কার ১৬৮, ৩০৫
রামকমল সেন ৭৪, ৯৫, ১১২, ১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ২৫২, ৩০৪-০৫, ৩৫৫
রামকৃষ্ণ সেন ৩০৭
রামগতি ন্যায়রত্ন ১৭২, ১৭৭, ২৭৪
রামগোপাল ঘোষ ৩২৮
রামচন্দ্র কর্মকার ৮৭
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ৩১৫, ৩৩৪
রামচন্দ্র দাস ৩৫০
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৬৯, ২৭৭, ৩০৪
রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ৩১৫
রামচন্দ্র মিত্র ৩১৬, ৩১৮
রামচাঁদ রায় ৩১৩-১৪, ৩১৫, ৩৩৪
'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ২৩৭, ৩৬১
রামদাস সেন ২৩৪, ২৮৯, ৪০৯
রামধন স্বর্ণকার ৩১৬, ৩৩৪
'রামধনু' ২৬৭
রামনাথ রায় ১৭২
রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৫৮, ২০৩
রামনিধি গুপ্ত ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৯১
রামপ্রসাদ সেন ১৭২, ১৮২-৮৩
রামপ্রাণ গুপ্ত ২৩৫
রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয় বিতর্ক ২২৮

রামমোহন রায় ২৫, ৪৬, ৭৫, ৮২, ৯৯, ১৪৬-৪৭, ১৬৭, ১৭০, ২২৯, ২০৪, ২৫২, ২৭০, ২৭১, ২৮৪, ২৮৫, ৩২০, ৩৫২, ৩৫৬, ৪৩৯; মুদ্রণশিল্পকে ব্যবহার ৭১; রচিত বইয়ের মুদ্রণ ৯৫; সংস্কার প্রচেষ্টা ও মুদ্রণ ৯৬; সেনসরশিপ ১৩৬; সংবাদপত্র পরিচালন ১৩৬-৩৭; মুদ্রণের পোষকতা ১৪৬-৪৭; ব্যাকরণ ১৬৮; মৌলিক রচনাবলী ২২৮
রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন ৩১৫
রামরাম বসু ৬৯, ৯০, ৯৪, ২২৮, ৪২৩
রামরাম মিত্র ১৬৫
রামলাল শীল ২৭৮
রামলোচন নাপিত ১৬৫
রামসাগর চক্রবর্তী ৩১৬, ৩৩৪
রামসুন্দর বসাক ১৭২
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২৪৪, ২৬৭, ২৯৩, ২৯৪, ৩৬৩
'রামায়ণ' ৪৭, ৭১, ৮১, ২৭০, ২৭৫, ৩২৬, ৩৩৫, ছবি সম্পর্কে ৩৩৭
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৩৮
'রামের সুমতি' ২১৫, ৩৬০
রিচার্ডসন, ডি. এল. ২০৯, ২১২
রিগু, জেমস ৩২১
রিবো, এলেনা লুইজা ৩৮, ৪৪
'রুশ-বাংলা অভিধান' ৩০৭
রুস্তম কারসেটজি ১৮
রূপচাঁদ আচার্য ৩১৫, ৩১৬, ৩৩৪
রূপচাঁদ রায় ৩৩৩
'রূপসী বাংলা' ৩৪৬
রেজিস্ট্রেশন অব প্রেস অ্যান্ড বুকস অ্যাক্ট ১৩৮, ৪৩৮, ৪৪৩
রেনেলের বেঙ্গল অ্যাটলাস ৩২
রোঅার, ডক্টর ২৫৩, ২৯৭
রোকনুজ্জমান খান ২৬৬
রোটারি যন্ত্র ২৯৪
রোমান অক্ষরে ছাপা বাংলা বই ৯০
'রোমিও জুলিয়েট' ১৫৮
লং, রেভা জেমস ৭২, ৭৪, ১৪৮, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ২২১, ২৭১, ২৭২, ২৮৫, ৩০২, ৩১০, ৪১৫, ৪২৬, ৪৩৫, ৪৪১-৪৩; পুস্তক তালিকা সংকলন ৪২৪, ৪২৮, ৪৪৫
'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ২৪৭
'লখীন্দর দিগর' ২১৬
লণ্ডনে পুরনো বাংলা বই ৪২৩-২৮
'লম্বকর্ণপালা' ২৫৬
লরেন্স ২৯৭
ললিতমোহন গুপ্ত ৩২৯
ললিতানন্দ গুপ্ত ২৯৮
লালুলাল ৯৫, ৯৮, ২৭৭, ৩৫২
লসন, জে. ১৬৭, ৩১৪, ৩১৬, ৩৩৪
'লা' আল্‌সেমোরা' ২১৭
লা' মিজরেবল ২১১, ২১৭
লাইনো কী বোর্ড ১১৯
লাইনোটাইপ ৮৯, ১০২, ১১৫-১৭, ১২১, ৩৮৪, ৪০৮, ১১০, ১২০, ৩৮৯; যোগেশচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা ১১০; বৈচিত্র ১২০; আনন্দবাজার পত্রিকায় ব্যবহার ২৯৯; সংবাদপত্র ও গ্রন্থ মুদ্রণে ৩৮৯
লাগেরলফ, সেলমা ১৬১, ২৫৬
'লাঙল' ২৯৮
লাডলো টাইপ ১২৬-২৭
লাডলো মেশিন ১২০
'লাফিংম্যান' ১৬২
'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' ১৬২
'লায়লি মজনু' ২০৯
লালবিহারী দে ১৬৬, ১৭৫, ২৪২, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮
'লাস্ট অব দি মোহিকান্স' ১৬২
লিটন, লর্ড ১৩৯
'লিট্‌ল মারমেড দি' ১৬১, ২৫৩
লিথোগ্রাফি ৯৯, ৩২০-২২, ২৭১, ৩১৮, ৩২১-৩২২, ৩৯২
'লিথোগ্রাফি ইণ্ডিয়া' ৩২০
লিনলি, এলিজাবেথ অ্যান ৩৫, ৩৬, ৪২, ৪৪
লিয়র, এডওয়ার্ড ২৫৪, ২৫৭, ২৫৯
লীলা মজুমদার ২৫৮, ২৬০, ২৬৫
লুইস, ক্যারল ২৪৬
লুইস, সিন্‌ক্লেয়ার ২১০
লুসিংটন, চার্লস ৩৯৪
লেবেডেফ ১৯৯-২০০, ২০২
'লেসন্‌স বা পাঠমালা' ১৬৭
লেসলি, ম্যাথু ৩১৩
লোকেন্দ্রনাথ পালিত ২৯০
লোতি, পিয়ের ১৫৯
'লৌকিক শব্দকোষ' ৩০৬
'ল্যামস টেলস' ১৫৭
শ', বার্নার্ড ৩০১
'শকুন্তলা' ৫০, ১১২, ১৫৮, ২৪২, ২৫৩, ২৫৫
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২৬৪
'শঙ্কর' ২৬৩
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৭৮, ২৬৫
শঙ্খ ঘোষ ১৮০, ১৮১, ১৮৬
শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৬২
শচীন্দ্রনাথ মজুমদার ২৬৫
'শতাব্দীর শিশু সাহিত্য' ২৪১, ২৪৬
'শনিবারের চিঠি' ২৯৮; লেখকগোষ্ঠী ২৯৮
'শব্দকল্পদ্রুম' ২৪৭, ৩০২
'শব্দাম্বুধি' ২২, ৩০৭
'শব্দের খাঁচায়' ২১০
শরচ্চন্দ্র দেব ৩০৮
শরৎকুমারী লাহিড়ী ৩৬১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭২, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২৬২, ২৯৫, ৩৬০, ৪৫০
শরৎচন্দ্র দাস ১২৪
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৯, ২৬১, ২৬৩
শর্বরীভূষণ কর্মকার ৪১৯
'শর্মিষ্ঠা' ২০৪, ৩৫৬
শশধর তর্কচূড়ামণি ২৯০, ২৯১
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৯

শান্তা দেবী ২৪২, ২৪৬, ২৫৮, ২৬০, ২৯০
'শারদকুসুম' ২৭০
শাহ্ আলম, দ্বিতীয় ২৯, ৩৭৭
শাহজাহান ৬৮
'শিখা' ২৯৮
'শিগুর্ফনামা' ৪২
শিবচন্দ্র দেব ২৮৯
শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ২৯০
শিবনাথ শাস্ত্রী ২০৭, ২৪৮, ২৫৮, ২৬৬, ২৮৯
শিবরতন মিত্র ২৫৮, ৩১১
শিবরাম চক্রবর্তী ২৫০, ২৬৩, ২৯৬
শিবশংকর মিত্র ২৬২
'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' ৩৩৫
শিল্পবিদ্যালয় ৩৩৫
শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা ৩৩৫, ৩৯৫
শিশিরকুমার ঘোষ ২৯০
শিশিরকুমার মিত্র ২৯৬
'শিশু' ২৪৩, ২৫৪, ২৫৯
'শিশু বোধোদয়' ১৭১
'শিশু ভারতী' ৩৪৯, ৩৬৩
'শিশু ভোলানাথ' ২৪৩, ২৫৪, ২৫৯
'শিশু সেবধি' ১৬৯, ২৭৭
'শিশুদের নাটক' ২৬৫
'শিশুপদেশ' ১৭১
'শিশুপাঠ' ১৭২
'শিশুবোধক' ১৭২, ১৭৪
'শিশুশিক্ষা' ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ২৫২
'শিশুসাথী' ২৬৬
শিশুসাহিত্য; অনুবাদ ১৬২, ২৬৪; সংজ্ঞা ২৪২; গ্রন্থপঞ্জী ২৪৯; এ্যাডভেঞ্চার ২৬১; বিজ্ঞান ভিত্তিক ২৬৪; প্রযুক্তিবিদ্যা ২৬৪, ২৬৫; পত্র-পত্রিকা ২৬৬-৬৮; বাংলা দেশের ২৬৬
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২১৯, ২২২, ২৫০, ২৬২
শুড়া লিথোগ্রাফিক প্রেস ৩২১
শুভেন্দুকুমার মিত্র ৩১০
শুভেন্দুশেখর বসু ২৫৪
'শূন্যপুরাণ' ২২৬
শেখর বসু ২৬৩
শেঙ, পি. ১৪৪
শেরবোর্নের স্কুল ১৬৫
শেরিডান, রিচার্ড ব্রিনসলি ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪২
শৈল চক্রবর্তী ২৬৫; গ্রন্থ চিত্রণে ৩৪৭-৪৮
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ২১৬, ২৯৬
শৈলবালা ঘোষজায়া ২১৬
শৈলেন ঘোষ ২৫৮, ২৬৫
শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৯৩, ৩৬০
'শোধবোধ' ১৬১
'শোনো শোনো গল্প শোনো' ২৬০
শোর, স্যর জন ১৩১
শৌনক গুপ্ত ২১৮
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৩১০, ৩২৬, ৩২৭
শ্যাফার ১৬
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ২১৫
শ্যামাচরণ শ্রীমানী ৩২৩
'শ্রীকান্ত' ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৭৭
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ২১
'শ্রীজান দেরোজারিও সাহেব' ১৪৭
শ্রীধর কথক ১৭৭, ১৭৮
শ্রীনাথ চন্দ ১৭২
'শ্রীভগবদ্গীতা' ৩৫৩
'শ্রীমদ্ভাগবত' ১৪৭, ১৪৮
'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' ৩৩৪, ৩৩৫
শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ৩১০
'শ্রীযুক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা' ৩১৫
শ্রীরাজরাজেশ্বরী (ধাতুচিত্র) ৩১৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫৪
শ্রীরামপুর মিশন ৮১, ৯০, ৯৩, ১৭০, ২২৬, ৩১৮, ৪০০; প্রেস ২৪, ৪৭, ৫৭, ৫৯, ৬২, ৬৯-৭৩, ৭১-৭৫, ৮৯, ৯৪, ১০২, ১৩০, ১৬৩, ২৪০, ২৫২, ২৭৪, ২৮৩, ৩৫৩, ৩৫৪, ৪০২; ছাপাখানায় অগ্নিকাণ্ড ৬৪; স্টীম ইঞ্জিন ৬৪; ফাউণ্ড্রি ৬৩, ৮৪; দ্বিধা-বিভক্ত ও অবনতি ৬৫; কলেজ ৬৫; স্কুল ৭০; বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণ ৯৪; চীনা হরফ ৮৪; মুদ্রিত বইয়ের তালিকা ১৪৭; কলকাতায় বিক্রয় কেন্দ্র ৩৫২; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা ৩৫১; কাগজের কল ৪০১; ছাপার কালি ৪০৬; কেরী লাইব্রেরি ৪০৪-৩৫
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩৬০
'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার' ৩৮২
সংবাদকৌমুদী যন্ত্র ২৭০
সংবাদপত্র ও সরকার ১৩১; সংবাদপত্র শাসন আইন ১৩১-৩২; সংবাদপত্র সম্বন্ধে আশংকা ১৩৩
সংবাদপত্র মুদ্রণ; রোটারী যন্ত্র ৩৭৬
'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ৪৪, ৩১২
'সংবাদপ্রভাকর' ১৩৮, ১৭৯, ২০৪, ২২৯, ২৩৩, ২৮৬, ৩৮২
'সংবাদসার' ১৬৯
'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' ৩১১
সংস্কৃত কলেজ ১৭০; বারাণসী ৩১
সংস্কৃত প্রেস ৯৫, ১০১, ১৬৩, ১৬৬, ৩৫৪
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি ১০১, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬১
'সংস্কৃত বাংলা অভিধান' ৩০৭
সংস্কৃত যন্ত্র (১৮০৭) ৯৫
'সওগাত' ২৯৭
'সখা' ২৪৩, ২৬০, ২৬৬
'সখা ও সাথী' ২৪৩, ২৪৯, ২৬০, ৩২৭, ৩২৯
সখারাম গণেশ দেউস্কর ২০৫
'সঙ্গীত তরঙ্গ' ৯৯, ৩১৫, ৩৩৪
সজনীকান্ত দাস ৮২, ১০৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৬০
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০৫, ৩৫৬, ৩৫৭
'সঞ্জীবনী' ২৮৯

'সঞ্জীবনী সুধা' ৩৫৬
সতীদাহ ৭৫
সতীনাথ ভাদুড়ী ২১৬, ২১৮, ২২০
সতীশ ঘটক ২৯৬
সতীশচন্দ্র সিংহ ৩৪০
'সত্য ইতিহাস সার' ১৬৮
'সত্য, মঙ্গল, সুন্দর' ১৫৯
সত্যচরণ শাস্ত্রী ২৩৫
সত্যজিৎ রায় : লেখক ২৪৪, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৬১, ২৬২, ২৬৬; চিত্রশিল্পে ৩৪৪-৪৭; নন্দলাল বসু সম্বন্ধে ৩৪৫-৪৬
সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী ২৫৮
সত্যপ্রকাশ যন্ত্র ২৭৫
'সত্যপ্রদীপ' ৮২, ৮৬, ১৬৯
'সত্যাসত্য' ২১২
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫৮, ১৫৯, ২৯১, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৩, ১৮৭-৮৮, ২৪৭, ২৫৯, ২৬০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৬০, ২৯৯
'সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস' ১৫৬, ২৫৩
সন্তোষকুমার ঘোষ ২৬৩
'সন্দেশ' ১০২, ২৪৪-২৪৮, ২৫৪, ২৫৯, ২৬৬, ৩৪৬
'সন্দেশাবলি' ৩১১, ৩১২
সফিউদ্দিন, কাজী ২৮০
সবিতা চট্টোপাধ্যায় ১০৭
সবিতা মল্লিক ২৬৫
'সবুজ পত্র' ১৫৯, ২৩৮, ২৫৮, ২৯৫, ২৯৬
'সমদর্শী' ২৮৯
সমর চট্টোপাধ্যায় ২৬৫
সমর ঘোষ ৩৪৭, ৩৪৮
সমর দে ২৬৬, ২৫৫, ৩৪৩
সমর সেন ১৮১, ২৯৮
সমরজিৎ কর ২৫৪, ২৬২
সমরেশ বসু ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২৬৩
'সমাচার চন্দ্রিকা' ২০৪, ২৮৪, ২৮৫
'সমাচার দর্পণ' ৪৪, ৭৪, ৭৫, ৯৮, ১৩৬, ১৪৮, ১৫৬, ২০১, ২৭০, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ৩২১, ৩৫২, ৪০১, ৪০২
সমীর সরকার ৩৪৮, ৩৪৯
'সম্বাদ কৌমুদী' ২৮৪, ২৮৫
'সম্বাদ ভাস্কর' ২৩, ২৮৬, ২৮৭
সম্বুদ্ধ ২৯৮
সরকারী আর্ট স্কুল ৩২২, ৩২৮, ৩২৯
সরকারী ছাপাখানা ১২২, ১৫৪; প্রস্তাব ১০০
'সরল বাঙ্গালা অভিধান' ৩০৬
সরলা দেবী ২৬৫, ২৯০
সরোজকুমার রায়চৌধুরী ২১৬
'সলটার' ১৬
সলোখভ, মিখাইল ২১০, ২১১
'সহজপাঠ' ২৫৪; ছবি ৩৪২, ৩৪৩
সাঁওতালী বর্ণমালা ১৪২, ১৪৩
'সাগরতলের সন্ধানী' ২৫০
'সাঁকের কথা' ২৫৮
'সাতভাই চম্পা' ২৪২, ৩২৭
সাতুঁজি ৩৭৮
'সাথী' ২৪৬, ২৬৬
'সাদাবাঘ' ২৬০
'সাধনা' ২৩৮, ৩২৮
'সাধারণী' ২৮৯, ২৯০, ২৯১
'সাপ্তাহিক বসুমতী' ২৯৪, ৩৬২
সাময়িক পত্র ও জনশিক্ষা ২৯০
'সামাজিক প্রবন্ধ' ২০২
সায়েন্স ফিকশান ২৫০, ২৬২
'সার সংগ্রহ' ১৬৮
সারদা দেবী ২৫৪
'সারদামঙ্গল' ১৮৪, ১৮৫
সারভেন্টিস ১৬১, ২১০
সাঁসুসি থিয়েটার ২০১
সাহনামা ৩১৮
'সাহসীর জয়যাত্রা' ২৫৪
সাহানা দেবী ২৯৬
'সাহিত্য' ২৯৪
'সাহিত্য আকাদেমি ১২০, ১৬৩; নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ৪৪৭
'সাহিত্যকল্পদ্রুম' ২৯৪
'সাহিত্যকোষ' ৩১০
'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' ৩১০
'সাহেব বিবি গোলাম' ২১২, ২১৫, ২১৭
'সাহেবদেব ঠাকুব' ৬৭
'সিক্ষ্যাগুরু' ৯১
সিগনেট প্রেস ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৬৩
সিটি বুক সোসাইটি ২৪৩, ২৪৫
সিডন্‌স ১১২
সিন্ধুযন্ত্র ২৭০, ৩১৮
'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ২৩৫, ৩৬১
সিরাজুদ্দীন আহমদ ২৬৬
সিলেটী নাগরী লিপি ২৩
সীতা দেবী ২৪২, ২৪৬, ২৫৮, ২৬০, ২৯৩
'সীতার বনবাস' ১৫৯
'সীতারাম' ২১৫, ২১৮, ২২০
সুকান্ত ভট্টাচার্য ২৬০
সুকুমার দে সরকার ২৬৪
সুকুমার রায় ১১১, ১১২, ২৪৪, ২৪৬-৫০, ২৬৫, ২৬৬, ২৯৬; উদ্ভট কবিতা ২৫৯; গ্রন্থচিত্রণ ৩৩৭-৩৮
সুকুমার সেন ১১২, ৩০৬, ৩৩৪, ৩৫২
সুখলতা রাও ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৯, ২৬৫
সুচারু প্রেস ২৭১
সুধানিধি প্রেস ২৮২
সুধাবর্ষণ যন্ত্র ২৭১
সুধাসিন্ধু যন্ত্র ২৭০
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬২, ২৯৪, ২৯৭, ৩২৮
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৫, ১৯২, ২৯৬-৯৮
সুধীন্দ্রনাথ রাহা ১৬২, ২৫৪, ২৬৪
সুধীর মৈত্র ৩৪৮
সুধীরচন্দ্র সরকার ৩১০
সুধীররঞ্জন খাস্তগির ২৬২
সুনির্মল বসু ২৪৫, ২৪৯, ২৬০, ২৬৫
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪১, ১১১, ১২০,

১২৫, ৩০২, ৩০৬, ৩০৯, ৩৭৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২১১, ২১৫, ২১৯, ২৬০
সুনীল দত্ত ২৬৫
'সুন্দরবনে সাত বৎসর' ২৬১
সুপ্রকাশ রায় ৩১০
সুবরবন যন্ত্র ২৭৩
'সুবর্ণ বণিক সমাচার' ২৯৮
সুবলচন্দ্র মিত্র ৩০৬
সুবিনয় রায় ২৪৪, ২৪৬
সুবোধ ঘোষ ২১৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৬০, ২৯৮
সুর্যাস্তত শেষ কবিতা ১৮১
সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৯৬
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪, ২৯১
সুরেন্দ্রনাথ সেন ২৩
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ২৯৬
সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১, ২৬৪
সুরেশচন্দ্র মজুমদার ১০২, ১০৫, ১১৫, ১১৬, ১১৯,১২০, ১২৭, ২৯৯, লাইনোর পশ্চাৎপট ৩৭৬, বর্ণমালা সংস্কার ৩৭৯, ৩৮১, লাইনো-টাইপে দান ৪০৮
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ২৯৪, ২৯৫
'সুলভ সমাচার' ১৩৯, ২৩৭, ২৮৯
সুশীলকুমার দে ১৫৬, ৩০৯, ৩১০
সুশীলকুমার ভট্টাচার্য ১০২, ১২৭
'সুশীলা বীরসিংহ' ১৫৮
সুশোভন সরকার ২৯৭
'সৃষ্টি' ২৩৮
'সে' ২৪৪, ২৫৪, ২৫৫
'সেই গ্রাম সেইসব মানুষ' ২১৫, ২১৬
'সেকাল আর একাল' ২৩২
'সেকালের কথা' ২৪৩,৩২৯, ৩৩৭
সেক্সপীয়র, উইলিয়াম ১০৬, ১৫৬, ১৫৯, ২০২, ২০৪, ২০৬, ২১৯, ২২০, ২৬৪, ৩২৭
সেণ্ট অ্যান্ড্রুজ ৩৫১
সেন্ডার্স অ্যান্ড কোনস ৮৬ ৮৭, ৩১৮ ১৯
সেনেফেল্ডার, আলয়জ ৩২১, ৩৯২
সেন্সরশিপ ১০৩-৩৪
'সেবক' ২৯৭-৯৯
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২১৬, ২৬৩
'সোনার আনারস' ২৬১
'সোনার কাঠি রুপোর কাঠি' ২৫৮
'সোনার কেল্লা' ২৬১
'সোনার হরিণ' ২৬১
'সোনারতরী' ১৮৭, ৩৬০
'সোমপ্রকাশ' ২০৪, ২৮৭, ২৮৮
সোমেন্দ্রনাথ বসু ৩১১
সোলেমানি প্রেস ২৮০
সোসাইটি ফর প্রোমোটিং খ্রীষ্টিয়ান নলেজ ১৯
সৌরীন সেন ২১৮
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৫৮, ২৬২, ২৯০
স্যাডিএ্যাক, দ্য ৩২০, ৩৯৪
স্কট, ওয়াল্টার ২৬৪
স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট ৩২০, ৩২২, ৩৩৫
স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ ৪২৪
স্কুল বুক সোসাইটি ৭৩, ৭৪, ১০২, ২৪০, ২৫২, ৩০৪
স্টাইন, অরেল ১৩
স্টার্ন, লরেন্স ২১৪
স্টিভেনসন, রবার্ট লুই ১৬২, ২১৯
স্টুয়ার্ট, জেমস ১৬৯
'স্টোরি অব চ্যানটিক্লিয়ার, দি' ২৫৬
স্ট্যানহোপ যন্ত্র ২০৪, ২৭২, ২৮৮
'স্ট্রাইকার' ২১৮
'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' ১৬৮
'স্বপ্নপ্রয়াণ' ৩২৮
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৯
স্বরূপচন্দ্র দাস ৩১১
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৫৫, ২৫৬, ২৬০, ২৭১, ২৯০
'স্বর্ণলতা' ৩৬১
স্মলেট, টোবিয়াস ২১৩
স্মিথ এণ্ড কোং যন্ত্র ২৭১
স্মিথ, স্যামুয়েল ৩৯
'হংসরূপী রাজপুত্র' ১৬৯, ২৫৩
হটন, উইলিয়াম ৪১, ৪৬, ৩০৫
হটন, জি সি ৩০১
হটনের অভিধান ৩০৭
'হট্টমালার দেশে' ২৪৯
হরির প্রেস ২৭৯
'হযবরল' ২৪৬, ২৫৯
হরচন্দ্র ঘোষ ১৫৮, ২০২
হরচন্দ্র রায় ২৭১, ২৮৪, ৩৫৩
হরপ্রসাদ রায় ১৫৬
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২১৯, ২৩৪, ২৯৮, ৩৫৬
হরফ চুরির মামলা ২৭৫
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৬
হরিচরণ বিশ্বাস ৪২, ৪৩, ৪৪
হরিদাস দাস ৩১০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২৬২
হরিনারায়ণ বসু ৩২৭, ৩২৮
'হরিমঙ্গল গীত' ৩১৬, ৩৩৪
হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ৩১১
হরিশচন্দ্র খাঁ ৩২৩, ৩২৬
হরিশচন্দ্র হালদার ৩২৭, ৩২৮
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৪৯, ২৬১
হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৪
হলহেড, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি ১৯, ২৪, ২৯, ৪১-৪৭, ৫২, ৭৪, ৭৫, ৯০, ১০৫, ১০৭, ১২৯, ১৪০, ১৭৮, ৩০২, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৯৪, ৪০৮, ব্যাকরণ ২৭, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯১, ১১৫, ১৪২, ২৮০, ২৮৩, ৩০২, ৩১৩, ৩৩৩, ৩৪১, ৪০০, ৪০১, 'এ কোড অব জেন্টু লজ' ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৬৭, জন্ম ও শিক্ষা ৩৪-৩৫, শেরিডনের বন্ধুত্ব ৩৭; হেস্টিংসের সঙ্গে সৌহার্দ ৩৮, প্রণয়ে প্রত্যাখ্যাত ৩৬; কলকাতা আগমন ৩৭; বিবাহ ৩৮; দেশে প্রত্যাবর্তন ৩৯; হেস্টিংসের অভিমত ৩৯; রিচার্ড ব্রান্সের প্রভাব ৩৯-৪০; লন্ডনে সর্বস্বান্ত ৪০; ইন্ডিয়া আপিসে চাকরি ৪০;

মৃত্যু ৪১, বাংলা চর্চা ৪৫-৪৯; পুঁথি সংগ্রহ ৪৫, ৪৭, ৪২৬; বাংলা ভাষা ও মুদ্রণ প্রসঙ্গে ৪৮, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অগ্রপথিক ৪৮
হস্টেন, ফাদার ৩৭৮
'হাউই' ১৫৩
হাউস স্টাইল ১৫৯
'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ২১৬
'হাজার চুরাশীর মা' ২১৮
হাজী আইজুদ্দীন আহমদ এণ্ড কোং ২৭৯, ২৮০
'হাতেমতাই' ২০৯, ২৭৫
হাণ্টার, উইলিয়াম ৪০৬
'হান্টিং অব দি স্নার্ক' ২৪৬
'হানাবাড়ী কারখানা' ২৫৬
হাফটোন ব্লক ৩২৯
হামসুন, ক্নুট ১৫৯, ২৯৭
হার্ডি, টমাস ২১০, ২১১, ২১৬
হারাণচন্দ্র রক্ষিত ৩২৭
'হাসিখুশি' ২৪৩, ২৫৬, ২৫৭, ৩৩৭
'হাসিরাশি' ২৪৩, ২৫৭, ৩৩৭
হিকি, জেমস অগাস্টাস ৭৪, ৯১, ১২২, 'বেঙ্গল গেজেট' ১২৯, ১৪৫, ১৯৯, ২৮৪, প্রথম মুদ্রাকর ও সম্পাদক ১৩০, ১৪৬, সরকারের সঙ্গে বিরোধ ১৩০
'হিতবাদী' ২৩৭, ২৯১, সুলভ গ্রন্থাবলী ৩৬২
'হিতোপদেশ' ৫০, ১৫৬, ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ২২৮, ২৪০, ২৫৩
'হিন্দী বিশ্বকোষ' ৩০৯
'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' ১৩৮
হিন্দু কলেজ ৯৭, ১৬৬, ১৬৯, ৩৫৩, ৪৩২
হিন্দু কলেজ পাঠশালা ১৬৯
হিন্দু থিয়েটার ২০১
'হিন্দু পেট্রিয়ট' ২০৪, ২৭৪, ৩২৫
হিন্দু মেলা ২০৫, ২৮৯
হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন ৪০৪
'হিন্দুস্থানী উপকথা' ২৬৪, ২৫৮, ২৬০
হিন্দুস্থানী প্রেস ৯৫, ২৭০, ৩০২
হিরণকুমার সান্যাল ২৯৭
'হীরকসূত্র' ১৩
হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ৩১১, ৪৪৯
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৯৭
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৯৭, ২৯৮
'হুক্কাহুয়া' ২৪৬
হুগলি ৮৮, প্রথম ছাপাখানা ৯০
হুগো, ভিক্টর ১৬২
'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' ২০৯, ২১৬, ২৭০, ২৮১, ৩১৬
হুমায়ুন কবির ২৯৩
হে, ডেনিস ৭১
হেইলেবারি কলেজ ৩০৪
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩, ১৮৭, ২৯৫
হেমলতা দেবী ২৬৫
হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৪১, ২৫০, ২৬১, ২৬২
হেমেন্দ্রবিজয় সেন ২৫৪
হেমেন্দ্রলাল রায় ২৬৪
হেয়ার, ডেভিড ২৮৭, ৩১৬
হেস্সে, হের্মান ২২৪
হেস্টিংস, ওয়ারেন ১১, ৩০, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৫০, ৯০, ১২২, ১৩০, ১৫৩, ৩১০, ৩৭৪, ব্যাকরণ মুদ্রণে সহায়তা ৩৮, ৪২, ৫২
'হো দেব গল্প' ২৫৮
হ্যাটম্যানের স্কুল ১৬৫
হ্যামলেট' ১১০, ২১১

সম্পূর্ণ।